একাত্তরের রণাঙ্গন
গেরিলাযুদ্ধ ও হেমায়েতবাহিনী
কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ
বীর প্রতীক

মুক্তিযুদ্ধ '৭১ জনযুদ্ধে সাফল্যের এক বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি। সশস্ত্রবাহিনীর নিয়মিত যোদ্ধাগ্রুপ প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধে ব্যর্থতার পর দেশে তিষ্ঠাতে না পেরে বিদেশের মাটিতে আশ্রয় নেয়। দখলদার বাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরে ফাঁকা মাঠে ওয়াকওভারের পথ রুখে দাঁড়ায় অভ্যন্তরীণ গেরিলা যোদ্ধা গ্রুপ। আত্মশক্তির সম্পূর্ণ আস্থায় দখলদার দেশে গজিয়ে ওঠা অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ যোদ্ধাগ্রুপের অন্যতম হেমায়েত বাহিনী। গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার মত হেমায়েত ভাগ্যে হেমায়েত নামার মতই 'একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী'।

ভূমিকা

'একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলাযুদ্ধ ও হেমায়েতবাহিনী' প্রসঙ্গে

সেক্টর কমান্ডার লে: কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গেরিলা যুদ্ধ একটি অতি পরিচিত নাম। কোনো শক্তিশালী বাহিনীকে মোকাবেলা করার মতো অনুরূপ বা ততোধিক শক্তিশালী বাহিনীর অভাবে গেরিলা যুদ্ধই একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা অতি শক্তিশালী বহিনীকেও পরাস্ত করা সম্ভব হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভিয়েতনাম যুদ্ধে শক্তিশালী আমেরিকান বাহিনীর পরাজয় তার অন্যতম উদাহরণ। ১৯৭১ সালে শক্তিশালী পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সফল গেরিলাযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য হয়ে থাকবে। শক্তিশালী পাকিস্তানি বাহিনীকে গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমেই মুক্তিযোদ্ধারা এমন ভয়াবহ পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছিল যে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তি-প্রচেষ্টায় যে ক'টি আঞ্চলিক গেরিলাবাহিনী গড়ে ওঠে কৃতিত্বের সঙ্গে পাকবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, ফরিদপুর-বরিশাল অঞ্চলের হেমায়েত বাহিনী তার অন্যতম। ভারতে প্রশিক্ষণের পর নিয়মিত বাহিনীর গেরিলারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এসব আঞ্চলিক গেরিলাবাহিনীর সহায়তা ও সহযোগিতায়ই পাকিস্তানি বাহিনীর নাভিশ্বাস ঘটাতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর বা বিভিন্ন স্তরের কমান্ডারদের রচিত যুদ্ধের ইতিহাসে গেরিলাযুদ্ধের বর্ণনা সে-ভাবে গুরুত্বসহকারে স্থান পায়নি। এটা অত্যন্ত সত্য যে গেরিলাযুদ্ধের দারুণ সে সফলতা না থাকলে পাকিদের পরাজয় আরও বিলম্বিত হতো এবং তা'হলে মুক্তিযুদ্ধের নিট ফলাফলেও ব্যতিক্রম ঘটতে পারতো। কিন্তু আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের সাহস, মনোবল, যুদ্ধ-কৌশল এবং দৃঢ়তায় পাকিদের সর্বপ্রকার যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও মনোবল ধূলিসাৎ হয়ে যায়, যার অপরিহার্য পরিণতি ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনীর লজ্জাজনক আত্মসমর্পণ।

বিচ্ছিন্নভাবে হলেও হেমায়েত বাহিনীর উত্থান ও সফলতার উপর কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ'র দূরবীণী (টেলিস্কোপিক) অনুসন্ধান মুক্তিযুদ্ধে গেরিলাদের অবদানের আলোকোজ্জ্বল প্রতিবেদন তুলে ধরতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। সত্যনিষ্ঠ

ইতিহাসের স্বার্থে যে-কোনো ঘটনা বিভিন্ন উৎস থেকে তার যথার্থতার সত্যপ্রতিপাদনের (ভেরিফিকেশন) পরই বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ঘটনারূপে তুলে ধরা প্রয়োজন। লেখকের [মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী' শীর্ষক অপর গ্রন্থে] দূরবীনী অনুসন্ধানগুলি অণুবীক্ষণী (মাইক্রোস্কোপিক) বিশ্লেষণ করা হয়নি যার ফলে "মেজর জিয়া-পত্নী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে ৮-ইবিআর"–এই মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যটি তার প্রতিবেদনে স্থান করে নিয়েছে। এটা প্রমাণিত যে বেগম খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ভারতে যাবার পরিবর্তে করাচি যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকি অফিসারদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং বাধ্যতামূলকভাবেই পরবর্তী আট মাস ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থান করেন। অণুবীক্ষণতার অভাবে এমনি আরও ভুল তথ্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে কিনা তা নিশ্চিত বলা যায় না। তথ্যের বিভিন্নমুখী অনুসন্ধান বা ক্রস-ভেরিফিকেশন এর মাধ্যমেই শুধু ভুল তথ্যের অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব। লেখক কর্তৃক সব তথ্য-উৎস প্রদানে কার্পণ্য না করাই সমীচীন।

পরিশেষে এই দুঃসাধ্য কাজ সমাধা করার আন্তরিক উদ্যোগের জন্য কর্নেল মোহাম্মদ সফিউল্লাহকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ধানমন্ডি, ঢাকা
১ জানুয়ারি ২০০৪

লেঃ কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী
মুক্তিযুদ্ধে ৮ নং সেক্টরের প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক

হেমায়েত বাহিনী প্রধান

হেমায়েতউদ্দিন, বীর বিক্রম-এর অনুভূতি

বাঙালি জাতির জীবনে ১৯৭১ একদিকে একটি নিদারুণ মর্মান্তিক বেদনাদায়ক, অপরদিকে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও অহংকারের প্রতীক। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন, ১৯৭০-এর নির্বাচন, এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে এতটাই আন্দোলিত করে যে পাকিস্তানি বর্বর কুশাসনকে দিশেহারা করে দেয়। এই বীরের জাতি স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য লড়ে আসছিল যুগ যুগ ধরে। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন তারই একটা পর্যায় মাত্র। সব মিলিয়ে ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ গণ বিস্ফোরণ ঘটে বাংলার মাটিতে। ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাখ লাখ জনতার উপস্থিতিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" "আমি যদি হুকুম নাও দিতে পারি যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর।" সে-দিন বাঙালি জাতির জয় বাংলার ধ্বনিতে পাকিস্তানি মসনদ কেঁপে উঠেছিল। পরদিন থেকে বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে উঠতে শুরু করে। ফলে প্রতিহিংসার আগ্রাসিত থাবা মারে ২৫ মার্চ কালো রাতে। ইয়াহিয়া, টিক্কার সশস্ত্র সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালির উপর। শহিদ হয় হাজার হাজার জনতা, শিশু-নারী-ইপিআর-পুলিশ। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় বাঙালি জাতির ক্ষণজন্মা পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াসে পাক বর্বরেরা এই জঘণ্যতম হত্যাযজ্ঞ চালায়। গোটা জাতি সম্মিলিত প্রয়াসে তখন প্রতিরোধ-নেশায় মেতে ওঠে এবং তারই রেশ ধরে শহরে গ্রামে গঞ্জে, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মুক্তিযুদ্ধের দুর্গ গড়ে উঠতে থাকে। এদিকে ২৭ শে মার্চ রাতে রাজনীতিবিদদের চাপের মুখে একজন সেনা কর্মকর্তা চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা পাঠ করেন। তিনি হলেন পরবর্তীকালের রাষ্ট্রপতি, তখনকার মেজর জিয়াউর রহমান।

আমি শুধু বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় সরকারিভাবে ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালিত হয়। ঠিক তার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আঞ্চলিক গেরিলা বাহিনী যারা মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধ-ক্ষমতা, রণচাতুর্য, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রদর্শনপূর্বক নিজেদের ঔজ্জ্বল্য ও

মহিমায় স্ব স্ব এলাকার স্বাধীনতাকামী জনমানুষের সমীহ ও সম্মান আদায়ে সমর্থ হয়েছিলেন। হেমায়েত বাহিনী ১৯৭১-এর রণাঙ্গনের তেমনি এক বাহিনী যাদের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসে ইতোমধ্যে সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। এই বাহিনী যুদ্ধকালে বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলের একটা উল্লেখযোগ্য এলাকার নিয়ন্ত্রণে ছিল। যুদ্ধকালে হেমায়েত বাহিনীর সদস্যদের জন্য কঠোর নিয়মকানুন, শৃংখলা ও কড়া প্রশাসন বিদ্যমান ছিল। তারই ফলে গ্রুপ কমান্ডারগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের স্বকীয়তা ও দক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছেন। মূলতঃ তাদের অবদানই হেমায়েত বাহিনীর সাফল্য।

হেমায়েত বাহিনীর উপর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে যিনি ইতিহাস লিখছেন এবং যিনি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। লেখক ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের একজন রণবীর কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, বীর প্রতীক যিনি যশোর, কুস্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুরসহ ৮ নং সেক্টরে যুদ্ধ করে ও যুদ্ধ পরিচালনার দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। আমার জানা মতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস জাতি এবং প্রজন্মের হাতে তুলে ধরার জন্য প্রয়াস পেয়ে আসছেন। তিনি চান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবদ্দশায় ইতিহাস রচিত হোক, যাতে ভ্রান্তি কম হবে। আমি তাঁর পাণ্ডুলিপির তথ্য পড়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, তিনি শুধু যোদ্ধাই নন একজন নিখাদ ইতিহাস-রচয়িতা কলম সৈনিক। হেমায়েত বাহিনীর সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মোহাম্মদ সা'দাত আলীর প্রতি যিনি অগোছালো ও বিচ্ছিন্ন কাহিনী সম্পাদনা ও গ্রন্থনা করে জাতির কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরায় প্রয়াসী হয়েছেন। হৃদরোগের রোগী হয়েও শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী গ্রন্থনা ও সম্পাদনার লক্ষ্যে লেখকের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে তিনি জাতীয় দায়িত্ব পালন করলেন যা পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিক্ষা পাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে গড়ে ওঠার এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশ গড়ার। আমি সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে, আহত মুক্তিযোদ্ধা ও সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় 'একাত্তরের রণাঙ্গন ঃ গেরিলাযুদ্ধ ও হেমায়েতবাহিনী' গ্রন্থটির ভূমিকা শেষ করছি।

হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম

১৯৭১-এর হেমায়েত বাহিনী প্রধান।

বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চল

লেখকের নিবেদন

মানুষ মাত্রই আয়ুষ্কালে বিতর্কিত। জীবনকালে মহান নেতৃত্বের মূল্যায়ন প্রশংসায় আমরা অনীহ। অনাগত ইতিহাসের কাছে হেমায়েতের সঠিক মূল্যায়নের ভার রইল। এ-গ্রন্থ ইতিহাসের মাল-মশলার উপাদানসমূহ বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষার একটি উদ্যোগ মাত্র।

মাছের ঝুড়ি মাথায় জেলের ছদ্মবেশে পাক আর্মির ক্যাম্প রেকি করেছিলেন হেমায়েত। শত্রুর চোখে তিনি ছিলেন এক চলন্ত জ্বলন্ত বিভীষিকা।

পরাধীন যুগের স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত অবর্ণনীয় রক্তপাত এবং অগণিত মহাপ্রাণ অগ্নিপুরুষের পাদস্পর্শে ধন্য ফরিদপুর। ইতিহাস বিস্মৃত জাতিকে কেউ ক্ষমা করে না। ফরিদপুর-যশোর-কুষ্টিয়ার নিরস্ত্র চাষিরাই নীলকর ব্রিটিশ-বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছে। স্বাধীনচেতা বাঙালির আসল ইতিহাস জানলে পাক-আর্মির পা-চাটা চাটুকারদের স্তুতিবাক্যে ভুলে বঙ্গ-শার্দুলদের দেশের বাঙালদের ক্ষেপাতো না। বাংলার স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অনিস্মরণীয় প্রেরণার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবের জন্য ধন্য ফরিদপুর, ধন্য বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক-আর্মির নাভিশ্বাস উঠিয়ে ছেড়েছে গেরিলা যোদ্ধারা। গেরিলা যুদ্ধের এই অবিশ্বাস্য ঘটনা-কাহিনীর নন্দিত নায়ক হেমায়েত ও রউফ। দু'জনই নিয়মিত বাহিনীর সৈনিক। তাঁরা ফরিদপুরেরই কৃতী সন্তান। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তির বিশ্বাসে ধন্য স্বদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে অভ্যন্তরীণ শক্তিতে বলীয়ান সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন। বর্ডারশূন্য জেলা ফরিদপুরের এই দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা মৃত্যুর মুখেও বিদেশের মাটি স্পর্শ করেননি। বিদেশী অর্থ সাহায্যে স্বাধীনতার যুদ্ধকে মসি লিপ্ত ও নিজের হাতকে কলংকিত করেননি। আত্মত্যাগ, স্বদেশপ্রেম, দুর্জয় সাহস, যুদ্ধ-সৃজনীর ত্বরিত গতির উদ্ভাবন-শক্তি, জনগণের আস্থা এবং বিরল নেতৃত্ব-গুণে গুণান্বিত অমিততেজা গেরিলা যোদ্ধা হেমায়েত মুক্তিযুদ্ধের এক বিরল ব্যক্তিত্ব। অনাগত ভবিষ্যতে জাতির দুর্দিনে এ-কালজয়ী যোদ্ধার কাহিনী জাতিকে প্রেরণা জোগাবে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায়ের মহতী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে রচিত হলো মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পটে এ-'হেমায়েত অধ্যায়'।

ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের বাংলার অধ্যাপক মোহাম্মদ সফিক উল্লাহর পরিবার মুক্তিযুদ্ধের ডামাডোলে প্রাণ নিয়ে পালান এপ্রিলের ২য় সপ্তাহে। ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সৈয়দ আবুল হোসেনের মরণপণ হৃদয়-ঔদার্যে

যুদ্ধোন্মত্ত সফিক-পরিবার ঝিনেদার মৃত্যু গুহা থেকে সটকে পড়ার সুযোগ পান। পাক নির্মমতায় নিহত ইতিহাসের অধ্যাপক হালিম-পত্নী তাঁদের সাথী। চরম অরাজকতার অনিশ্চতায় তাঁরা পৌঁছলেন ফরিদপুরে। কর্মিতকর্মা হেমায়েতের সাংগঠনিক শৃংখলায় ফরিদপুর তখন নির্যাতিত মানুষের অভয়ারণ্য। হেমায়েত বাহিনীর সৌজন্যে একাধিক ভয়াবহ বিপদে রক্ষা পায় মুক্তি-ক্যাপ্টেন সফিকের পরিবার। তাদের শেষ আশ্রয় বালিয়াকান্দা থানার ডোমাইল গ্রামে দুবার মুক্তি পরিবারকে অভয় দিতে আসেন স্বয়ং হেমায়েত উদ্দিন। দুর্দিনের সে এক সহমর্মিতার মর্মস্পর্শী হৃদ্যতা। লেখক দীর্ঘদিন যাবৎ মহান যোদ্ধা হেমায়েতের সাক্ষাত কামনা করছিলেন মনে প্রাণে। স্বাধীন দেশে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিমন্ত্রণে বীরত্বব্যঞ্জক পদকগ্রহণ অনুষ্ঠানে যেতে হয়। এতদুদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি থেকে ঢাকা আসার শেষ লগ্নে ১৪ ডিসেম্বর রজনীর শেষ প্রহরে ঢাকাস্থ ফার্মগেট ও পুরনো এয়ারপোর্টের মাঝামাঝি হাইজ্যাকারের হাতে পড়ে আহত হই এবং নিরস্ত্র যুদ্ধে হেরে যাই সশস্ত্র লুটেরাদের সঙ্গে। রক্তাক্ত অবস্থায় নীত হলাম ঢাকা সামরিক হাসপাতালে। মুক্তিযুদ্ধের মহাবীরদের দু'চারজনের স্মৃতিচারণ সংগ্রহের যে-প্রেরণায় ঢাকা যাওয়া, হাসপাতালের বেডেই তার সমাপ্তি। পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রমের সাথে পরিচয়। সে বীরযোদ্ধা তাঁর বীর হৃদয়ের ঔদার্যে অত্র লেখকের একান্ত চাওয়ার স্মৃতি চিত্তের 'ওয়ার ডায়রি'র দরজা উন্মুক্ত করে দেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্যই থেকে যাবে।

সৌখিন দলিলকার খোঁজে ইতিহাসের খাস দলিল। প্রত্যক্ষ সশস্ত্র যোদ্ধাদের রক্ত আখরের অভিজ্ঞতার জবানিতে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যত ইতিহাসের মূল দলিল। বড় বড় নামী-দামি, রাজা-বাদশা, উজির-নাজির, শিল্পপতি, স্থপতি, রাজনৈতিক, সেনাপতিদের নিয়েই তো ইতিহাস। প্রচুর ধন-দৌলত, বাড়ি-গাড়ির মালিকদেরই মানায় ইতিহাস। সাধারণ জনতা, সর্বহারা গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার আবার ইতিহাস কি? ইতিহাস মানেই বড়লোকের কথা। সাধারণ গরিব যোদ্ধার ক্ষেত্রে ইতিহাসের ছোট বড় কথার খৈ-ফুটানি অরণ্যে রোদন মাত্র।

লাখো শহিদের বেদনার সমাধিতে বেঁচে আছি। মুক্তি যোদ্ধারা যুগ যুগ লালিত বাঙালির স্বপ্ন সাধ স্বাধীনতার রূপকার। স্বাধীন দেশের আলো বাতাসে বেঁচে থাকার মধ্যেই রয়েছে তাঁদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আজ হোক, কাল হোক, ভবিষ্যতে একদিন না একদিন সত্যিকার ইতিহাস সত্যি কথা কইবে নীরবে। গ্রন্থকারের এ-প্রয়াস ইতিহাসের তুচ্ছাতিতুচ্ছ মালমশলা মাত্র।

আরেকটি কথা না বলেই পারা গেল না। হেমায়েত বাহিনী ছোটবড় দেড়শ' যুদ্ধ

করেছে, কিন্তু এ-গ্রন্থে সব অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সম্ভবও নয় এত সীমিত কলেবরে সব যুদ্ধের কথা বলা। সুযোগ হলে এবং হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধাদের সহযোগিতা পেলে আগামী দিনে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছে থাকলো।

'একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলাযুদ্ধ ও হেমায়েতবাহিনী' গ্রন্থের অধিকাংশ মাল-মসলার তথ্যাদি যুগিয়েছেন হেমায়েতবাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দীন, বীর বিক্রম স্বয়ং। সহযোগিতা করেছেন রণাঙ্গনের তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরেরও বেশি সময় পরে এসে রণাঙ্গনের অনেক যোদ্ধা হারিয়ে গেছেন। অনেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখছেন নানারকম সামাজিক হয়রানি ও নির্যাতনের ভয়ে। এমতপরিস্থিতিতেও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য সরবরাহে এগিয়ে এসেছেন মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট মোঃ কাঞ্চন সিকদার, আশালতা বৈদ্য, আবুল কালাম আজাদ, কাননবালা বণিক, মোঃ মোশাররফ শেখ, তাহমিনা খানম, প্রবাসী রাজ্জাক হাওলাদার, এম.ই.এ কামাল প্রমুখ। লেখক তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সম্পাদক মোহাম্মদ সা'দাত আলী অসুস্থতা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় নিয়ে এ গ্রন্থের কাহিনীর সংগ্রন্থন ও বিন্যাসে সময় ও শ্রম দিয়েছেন, আবশ্যিকভাবেই তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার্য। তিনি আমার এককালীন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বিধায় কৃতজ্ঞতার ভাষা উহ্য থেকে গেল।

পরিশেষে, এ বিশাল গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় স্নেহভাজন প্রকাশক মেছবাহউদ্দীন আহমদকে জানাই আশির্বাদ। গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের পাঠক ও দেশবাসীর স্বীকৃতি পেলেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ, বীর প্রতীক
ট্রেজারার
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, অ্যাগ্রিকালচার এন্ড টেকনলোজি (আই.ইউ.বি.এ.টি), খানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

কৈফিয়ত

অত্র গ্রন্থের যাবতীয় তথ্যের সরবরাহকারী লেখক কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, বীর প্রতীক এবং যাঁকে নিয়ে এ-গ্রন্থ হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম। সম্পাদকের দায়িত্ব ছিল কেবল ঘটনার পরম্পরা ও বিন্যাসে সহায়তা করা। কাহিনীর বিন্যাসন ও গ্রন্থনায় প্রায়শই সম্পাদকের কার্যক্রমে নানারকম বিঘ্ন ঘটেছে। যেন তথ্য-প্রবাহ আর থামছে না, সেই সুদূর ফরিদপুর থেকে লেখকের কাছে তথ্য কেবল আসছেই এবং লেখকও গছিয়ে দিচ্ছেন সে-সব সম্পাদকের ঘাড়ে। যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যাবলী দিয়ে সহায়তা করেছেন, গ্রন্থকার ও জনাব হেমায়েত সর্ববিষয়ে অবহিত।

সম্পাদনাকালে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী এ-যুগে থামার নয়, মহাকাব্যের পর মহাকাব্য হতে পারে, তবু গবেষকের কাজ ফুরোবে না। প্রয়োজনে আরেকটি খণ্ড হতে পারে, তবে এ-গ্রন্থের কলেবর আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়–এই বলে শেষেরদিকে তথ্য-সংযোজন থামিয়ে দিতে হয়েছে। তবে, এইমর্মে আশ্বস্ত হওয়া গেছে যে, মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম বয়সের ভারে অনেকাংশেই নিশ্চল হয়ে গেলেও একেবারে নীরব নন। সচেতন গবেষণা-গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা থাকলে এখনও মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল কাহিনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। এ-কথা বলার কারণ, মুক্তিযুদ্ধের ওপর গ্রন্থরচনার নাম নিলেই তথ্য-প্রবাহের জোয়ার সৃষ্টি হয়, উদোম-গায়ের মুক্তিযোদ্ধা, রিকসাওয়ালা-মুক্তিযোদ্ধা, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা সনদ ও ডকুমেন্ট হাতে নিয়ে এসে লেখক-গবেষকের কাছে তাঁর তথ্য লিপিবদ্ধ করাতে দাঁড়িয়ে যান। এটা নিজের বহির্প্রকাশ এবং সত্যিকারের ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণেরই প্রয়োজনে মাত্র।

লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার জন্য সম্পাদক একান্তভাবে ঋণী।

মোহাম্মদ সা'দাত আলী

লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫
১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

সূচিপত্র

৫. সহযোদ্ধার স্মৃতিচারণ : সার্জেন্ট মোঃ কাঞ্চন শিকদার
৬. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতির প্রামাণ্য দলিল
৭. মহিলা কমান্ডার আশালতা বৈদ্য
৮. এক শহিদ তনয়ার অনুভূতি
৯. অনারারি ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদ মিয়া (অব.)
১০. হেমায়েতবাহিনীর কমান্ডারদের মতামত
১১. গ্রুপ কমান্ডার এম.ই.এ. কামাল
১২. কোটালিপাড়ার সাংগঠনিক কমান্ডার আবুল কালাম আজাদ
১৩. গোপালগঞ্জ জেলা ইউনিট আহবায়ক শেখ আজাদুর রহমান
১৪. সহযোদ্ধা লুৎফর রহমান শেখ-এর অনুভূতি
১৫. সহযোদ্ধা রাজ্জাক হাওলাদার-এর একটি চিঠি
১৬. টুঙ্গিপাড়া সহকারী সাংগঠনিক কমান্ডার মোঃ ফেরদৌস আলম
১৭. মুক্তিযোদ্ধা মনিরুজ্জামান বিশ্বাসের মতামত
১৮. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প
১৯. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প
২০. বাংলাদেশের জাতীয় যাদুঘর
২১. ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস

একাত্তরের রণাঙ্গনে হেমায়েত বাহিনী প্রধান
জনাব হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম

হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রমকে পদক
পড়িয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
বেগম খালেদা জিয়া

হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রমকে
খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে
সম্মানিত করছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

হেমায়েত বাহিনীর গ্রুপ কমান্ডারবৃন্দ

অনারারি ক্যাপ্টেন (অব.)
মোঃ আবদুর রশিদ

মোঃ হিঙ্গুল আলী হাজরা
এস.আই (অব.)

এম.ই.এ.কামাল

হাজী আবদুল খালেক
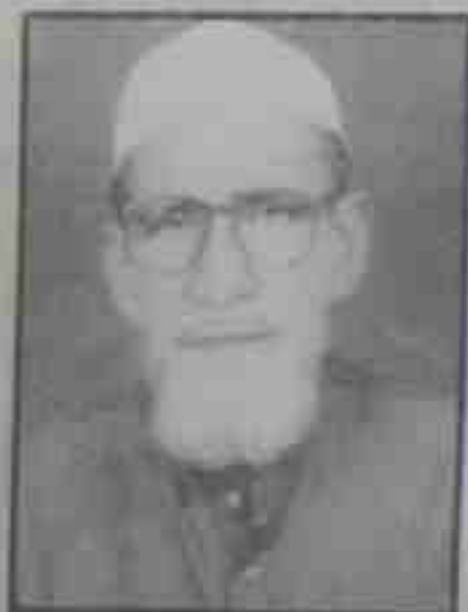
আবদুর রহমান মোল্লা

মকবুল হোসেন দাড়িয়া

আবদুল হাকিম বিশ্বাস

মোঃ মজিবুর রহমান মোল্লা

আব্দুল মালেক সরদার
(ই বি আর)

সহকারী কমান্ডার

সার্জেন্ট (অব.) কাঞ্চন সিকদার

তৈয়ব আলী সিকদার

মোঃ ফেরদৌস আলম

আবদুর রব শাহ

বিশিষ্ট যোদ্ধা

মোশাররফ শেখ

আজিজুল হক খান

মাহবুবুর রহমান

হাজি শেখ আবদুল মালেক

মোঃ সাজ্জির হোসেন

বীর-যোদ্ধা আবদুল মজিদ
মৃধা

ইশারত মোল্লা

আশরাফ আলী মিয়া

মজিবুর রহমান সরদার

মোঃ ইব্রাহিম মিয়া

আবদুস সালাম মুনশি

আবদুল হান্নান

হেমায়েত-ভগ্নী মোমেলা
খাতুন

বীরাঙ্গনা কানন বণিক
(নাজমা বেগম)

'৭১ এর মুক্তি হাসপাতালে রোগী দেখছেন ডা. রঞ্জিত ব্যানার্জি

জুরি বোর্ড সদস্য নোমান খন্দকার

মুক্তি-গোয়েন্দা পাগল বেশে আপস তথ্য সংগ্রহ করতেন মন্টু পাগলা

খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক জেমস খ্রিস্ট দাস

মুক্তি-গ্রাম ডাক্তার রাজেশ্বর জয়ধর

মুনশি আবদুল করিম
(হেমায়েতের পিতা)

হেমায়েত প্রেরণাদায়িনী
স্ত্রী হাজেরা

হেমায়েতকে রণাঙ্গনে পদক পরিয়ে দিচ্ছেন সোনেকা রানী রায়

প্রথম অধ্যায়

গেরিলাযুদ্ধ ও হেমায়েত বহিনী

প্রারম্ভিক পর্ব : দেশের ভেতরে-বাইরে এবং অন্যান্য স্থানের মুক্তিবাহিনী সংগঠনের মত হেমায়েত বাহিনীর গঠন-প্রক্রিয়াও পর্যায়ক্রমিক। হেমায়েত অঞ্চলে প্রতিটি থানা ইউনিয়নে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ যোদ্ধা দল গড়ে উঠে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বলা হতো ভলান্টিয়ার কোর। পরে এই হার্ড কোর স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপই হেমায়েত বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীতে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত এ-বাহিনী ব্রিটিশ প্যাটার্নের নিয়মিত সেনাবাহিনীর আদলে গড়ে ওঠে।

রাজনৈতিক আশ্রয় : স্বচ্ছন্দ বিচরণের প্রয়োজনে প্রথমাবধি হেমায়েত বাহিনী রাজনৈতিক সংগঠনের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নেয়। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল জয়দেবপুরের রাজবাড়ি। ২৭ মার্চ দিবাগত রাতে ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড (টু আই সি) মেজর কাজি সফিউল্লাহর নেতৃত্বে কৌশলগত নিরাপদ অবস্থান ময়মনসিংহে সটকে পড়ে। কমান্ডিং অফিসার (সি.ও.) লেঃ কর্নেল রকিব পাকিস্তানিদের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ থেকে গেলেন জয়দেবপুরে। মেজর সফিউল্লাহ গ্রুপের রাজবাড়ি ত্যাগের সময়ে এক প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন হাবিলদার হেমায়েত, হাবিলদার আজিজ ও ল্যান্স নায়েক আলম। তাঁরা রথখোলা ও জয়দেবপুরের রাস্তায় পাক আর্মির বিরুদ্ধে অ্যাম্বুশ পেতে অপেক্ষা করছিলেন। রাতেই চারিদিকে খবর রটে যায় ২-ইস্ট বেঙ্গল সরে পড়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে ২৮ মার্চ সকালে হাবিলদার হেমায়েতের নেতৃত্বে কতিপয় বাঙালি সেনা রাজবাড়ি পুনর্দখলে আসে। তারা রাজবাড়ির অস্ত্র-গোলাবারুদ লুটে নিয়ে অনতিদূরে মাত্রা হাই স্কুলে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করে।

বস্তুত, ২৮ মার্চ জয়দেবপুরের মাত্রা হাই স্কুল থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থনপুষ্ট হয়ে তারা যাত্রা শুরু করে। কাওরাইদ, আরিচা, ফরিদপুর, বরিশাল সর্বত্র বিভিন্ন দল-উপদলের সামাজিক সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট একটি অরাজনৈতিক সশস্ত্র সংগঠন এই হেমায়েতবাহিনী। ১৯৭০-এর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমর্থনধন্য হেমায়েতবাহিনী একটি গেরিলা-যোদ্ধা সংগঠন। বাহিনীর নামকরণে, বাহিনী প্রধান নির্বাচনে, বাহিনী প্রধানের পদমর্যাদা নির্ধারণে গণপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলের সমর্থনে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ও একাধিক রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সামাজিক পেশার গণ্যমান্য প্রভাব-প্রতিপত্তির মানুষ নিয়ে গঠিত ছিল বাহিনীর উপদেষ্টা কমিটি। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও ভারত সীমান্তে

অবস্থিত প্রতিটি যুদ্ধরত মুক্তি কোম্পানিতে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির মধ্যে থেকে একাধিক উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

প্রশাসনিক কমিটি : হেমায়েত-অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে গড়ে উঠা প্রতিটি প্রতিরোধ গ্রুপ হেমায়েত বাহিনীর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখত। প্রতিটি ইউনিয়নে নিজেদের সদস্য দ্বারাই তারা প্রশাসনিক কমিটি গঠন করে। তাঁরা ভলান্টিয়ার কোর থেকে হেমায়েত বাহিনী প্রতিষ্ঠা, সংগঠন, গণ-আস্থা ও বিজয় অর্জনে গঠনমূলক মূল্যবান অবদান রেখেছে। হেমায়েত বাহিনীর কার্যক্রম মূলত তিনভাবে চলতোঃ

ক। যুদ্ধ।

খ। প্রশাসন।

গ। বিচার বিভাগ

ক। সামরিক কমান্ডারগণের দায়িত্বে নিজ নিজ এলাকায় যুদ্ধের অপারেশন, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদিসহ সাংগঠনিক কার্যক্রম চলতো; এবং

খ। প্রশাসনিক কমিটির দায়িত্বে সর্বত্র চলতো বাহিনীর যাবতীয় প্রশাসন কার্যক্রম। যুদ্ধরত কোম্পানিগুলির সর্বপ্রকার প্রয়োজনের যোগান দিত এই প্রশাসনিক টিম।

গ। যথাযোগ্য বিচার বোর্ডের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম চলতো। যে-কোন মানদণ্ডে বিচার নিরপেক্ষ হতো।

ঐতিহাসিক যোগসূত্র ঃ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা অমিত বিক্রম হেমায়েতউদ্দিনের কার্যক্রম ব্রিটিশ বিরোধী ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়তউল্লাহর প্রশাসনিক প্রতিভার সাফল্য স্মরণ করিয়ে দেয়। হাজি শরিয়তউল্লাহও আজকের বৃহত্তর ফরিদপুরের অমর সন্তান। তাঁর নামেই নামাঙ্কিত আজকের শরিয়তপুর। অত্যাচারী নীলকর ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনতাকে সংঘবদ্ধ করে লড়েছেন হাজি শরিয়তউল্লাহ। সে-ঐতিহাসিক সূত্র ধরে বিচার করলে মুক্তিযুদ্ধের নন্দিত নায়ক স্বভূমিতে স্বশক্তিতে লড়া এই কমান্ডো গেরিলা নেতা হেমায়েতউদ্দিন অবশ্যই একমাত্র তুলনীয় হাজি শরিয়তউল্লাহর সঙ্গে এবং তিনি বৃহত্তর ফরিদপুরের এক প্রবাদ-তুল্য যোদ্ধা-পুরুষ।

বাহিনীর নামকরণ ঃ বাহিনী প্রধান বা ব্যক্তিবিশেষের নামে গড়ে উঠা প্রতিরোধ গ্রুপ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নতুন কিছু না। নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর দুক্ষেত্রেই যুদ্ধে লড়ার তার নজির রয়েছে। নিয়মিত বাহিনীর তিনটি ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়েছে তিন সেনাপতির নামে:

ক। 'এস' ফোর্স মেজর জেনারেল কাজি মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, বীর উত্তম।

খ। 'কে' ফোর্স ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম।

গ। 'জেড' ফোর্স মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম।

অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ গেরিলা-যোদ্ধাদের ৫টি গ্রুপ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

ক। কাদের বাহিনী–আবদুল কাদের সিদ্দিকী, বীরোত্তম, টাঙ্গাইল।

খ। হেমায়েত বাহিনী–হেমায়েতউদ্দিন,বীরবিক্রম, ফরিদপুর।

গ। আফসার বাহিনী–মেজর আফসারউদ্দিন, ময়মনসিংহ।

ঘ। আকবর বাহিনী–আকবর হোসেন, চেয়ারম্যান, যশোর।

ঙ। হালিম বাহিনী–ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

নিয়মিত ব্রিগেড শত্রুর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বিদেশের মাটিতে গড়ে উঠে। দেশের ভিতরে শত্রুর বেড়জাল ও বেষ্টনির কবলের মধ্যেও জাতির দুর্দিনে এবং জাতীয় বিশেষ প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ বাহিনী জন্ম নেয়। নিয়মিত ব্রিগেড জনশক্তির বাইরে বিদেশের সাহায্য-সহযোগিতা, রসদ, অস্ত্র ইত্যাদি লাভ করে। ভিতরের অনিয়মিত গেরিলাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে জনগণের সহযোগিতায় এবং স্বতঃস্ফূর্তায় বর্ধিত লালিত সুসংগঠিত। বিদেশের বুকে স্বস্তির নিরাপত্তার গ্যারান্টি থেকে এসে দখলদার আর্মির সাথে যুদ্ধ করে নিয়মিত বাহিনী আবার বিদেশে নিরাপদ আশ্রয়ে কেটে পড়তে পারতো; কিন্তু অভ্যন্তরীণ অনিয়মিতবাহিনী ও প্রতিরোধযোদ্ধা দলের সকল কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল দেশের ভেতরে। দেশী-বিদেশী সকল শ্রেণীর শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের জিহাদ করতে হতো দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাদের ছিল সমূহ বিপদ:

প্রথমত, নিজেদের টিকে থাকা;

দ্বিতীয়ত, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়া;

তৃতীয়ত, রসদ-খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; সাধারণ মানুষের সুখ শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;

চতুর্থত, স্থানীয় জনগণের সমর্থন অর্জন করার জন্য গোপনে গণসংযোগ কার্যক্রম জারি রাখা ইত্যাদিসহ আরো অনেক কর্মসূচি।

সকলের সম্মিলিত যুদ্ধের ফলশ্রুতি স্বাধীনতা। রাজনৈতিক গণজাগরণ মুক্তিযুদ্ধের প্রাণরসের চালিকা শক্তি। রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে যুদ্ধকালে ও পরবর্তী সময়ে অনেকের কার্যক্রম ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে যোদ্ধাদের অনেকের হামবড়া ভাবটাও স্থিতি লাভ করেছে। অপরের সাহায্যে লালিত এবং মাটির মায়ের গর্বিত সৈনিক-সন্তানে পার্থক্য থাকবেই। অহমিকার কারণে অনেকে স্বদেশের বুকে দাঁড়িয়ে আর বিদেশের আশ্রয়ে থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের পার্থক্য বুঝতে অনীহ। অনাগতকালের ইতিহাস নিরাসক্ত বিচারে সকল স্বাধীনতা যোদ্ধাকে তাঁদের যোগ্য আসন দিবে। স্বদেশের বুকে মা ও মাতৃভূমির ডাকে সাড়া জাগানো গেরিলা যোদ্ধারা জনগণ কর্তৃক শ্রদ্ধার সঙ্গে নন্দিত নায়কের আসনে পূজিত হবেন।

নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর প্রতিরোধ যুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর একটি ব্যতিক্রমধর্মী পরিচয় আছে। বাহিনী প্রধান সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক নির্ভীক তরুণ হাবিলদারের বীরত্ব সাংগঠনিক দক্ষতার চাতুর্যে হেমায়েতবাহিনীর প্রতিষ্ঠা। প্রচার বিমুখ অরাজনৈতিক যোদ্ধা হওয়ার কারণে মুক্তিযুদ্ধ

ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে হেমায়েতবাহিনীর কার্যক্রমের যথাযথ প্রচার ও উপযুক্ত স্বীকৃতি মেলেনি। আত্মশক্তিতে বলীয়ান, সাংগঠনিক প্রতিভা, নেতার প্রতি সহযোদ্ধাদের অবিচল আস্থা, পাক আর্মির মত একটি নিয়মিত বাহিনীকে একটার পর একটা যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে বাহিনী প্রধান সকলের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হন। সে-সময়ে পাক-পক্ষ ত্যাগী সৈনিক, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, অস্ত্রচালনক্ষম যুবশক্তি হেমায়েত-আকর্ষণে চুম্বকের মত ছুটে আসতো। সামান্য কজন যোদ্ধা নিয়ে যাঁর যুদ্ধ-কার্যক্রম শুরু, অবিরাম যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে তাঁর প্রতিষ্ঠা মানুষের হৃদয় ও বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে। পাক পদানত দখলদার অঞ্চলে তাঁর যুদ্ধ বিজয় হতাশাদীর্ণ জনতার মাঝে জয় বাংলার জাগরণের প্রাণ বন্যার জোয়ার আসে। হেমায়েত বাহিনী তার দখলকৃত অঞ্চলে একটার পর একটা বিজয়ের প্রতীক স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। বিজয়ী বীর সম্বর্ধনায় হর্ষোৎফুল্ল জনতা হেমায়েতকে নেতৃত্বের পদে বরণ করে নেয়। বিজয়োন্মত্ত জনতা তাঁর বাহিনীর নাম দেয় 'হেমায়েত বাহিনী'। মাটির জারক রসে লালিত সম্পূর্ণ স্বদেশের উপাদানে তৈরি গণবাহিনীর গেরিলা 'হেমায়েত বাহিনী'। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভে তিনি ধন্য। এত কিছুর পরও প্রশাসনিক ও গণপ্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির ছাড়া বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী বাহিনীর আইনগত স্থায়িত্ব হয় না। চুয়াডাঙ্গায় বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী গণপ্রতিনিধি ডা. আসহাবুল হক ওরফে হেবা ডাক্তার-এর সমর্থনে জাতীয় নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির সাহায্যে ৮ নং সেক্টরের দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গণ ফ্রন্ট খুলে দেন। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ কুষ্টিয়া বিজয়ের সাফল্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গণের ৮ নং সেক্টরের স্বীকৃতি দেন।

হেমায়েত বাহিনীর জন্যও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিকতা আছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিককালে ফরিদপুর রক্ষায় ব্যর্থ হেমায়েত তাঁর রণ-কৌশলের অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে ভাঙ্গা থানায় ৪৮ ঘণ্টা অবরোধ করেন। এখানেও টিকতে না পেরে আবারও পিছিয়ে যান। টেকের হাটেও ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ করে টিকতে পারেননি তারা। এবার স্বদলবলে চলে এলেন 'বিল বাগিয়া'। তার মানে রাজৈর, মাদারিপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ অঞ্চল জুড়ে এক বড় বিল। তারই নাম 'বিল বাগিয়া'। সে বিলে স্থাপিত হয় হেমায়েতবাহিনীর প্রথম ঘাঁটি। স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে হেমায়েতবাহিনী প্রতিষ্ঠাকালীন সময়কে স্মরণীয় করে রাখে। গৌরনদীর বাক্তা হাই স্কুলে ১৫ মে, ১৯৭১ শানশওকতের সঙ্গে জনতার মাধ্যমে হেমায়েতবাহিনীর হেমায়েত কর্তৃক স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিজয়লগ্ন ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত সে বিজয় পতাকা সগৌরবে উড়েছে। এ-সময় তৎকালীন দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তি জনপ্রতিনিধি মাদারিপুরের আসমত আলি খান, এম.পি. ও উজিরপুরের হরনাথ বাইন, এম.পি. হেমায়েতকে পূর্ণাঙ্গ সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। বরিশাল ও ফরিদপুরের আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ হেমায়েতবাহিনীকে

সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মুজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী), কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং) ও অন্যান্য ছোট বড় রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীর সঙ্গে দুই নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির নেতৃত্বে হেমায়েতের নামানুসারে এই বাহিনীর নামকরণ করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে হেমায়েতের প্রভাব বলয় এলাকায় স্বাধীনতার সপক্ষ ব্যক্তিবর্গের অনেকেই হেমায়েতকে নানাভাবে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছেন। হেমায়েত-এলাকা ছিল ২, ৮ ও ৯ নং সেক্টরের অধীন। উভয় সেক্টরের সকল সেক্টর কমান্ডার তাঁর সহযোগে কাজ করে তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে স্বীকৃতি দেন। বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার "হিমু" সাংকেতিক নামে তাঁকে আস্থায় নেন। স্বদেশ ও বিদেশের সকল প্রচার মাধ্যমে তিনি স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

বাহিনী গঠনের মূল শক্তি জয়দেবপুর অস্ত্রাগার ভেঙে আনা অত্যাধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ভারি অস্ত্র। সে-সব অস্ত্রবলে কাপাসিয়া, কাওরাইদ, বর্মি, কালিয়াকৈর, আরিচার যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তি ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে ফরিদপুর-বরিশালে তাঁর বাহিনী গঠন করা হয়। ২৮ মে, ১৯৭১ পয়সার হাট যুদ্ধ বিজয়ের পর জনতা বেজায় উৎফুল্ল হয়। আন্দাজের ওপর মুক্তি জনতা আসল নকল যাই হোক এক হেমায়েতকে পাকড়াওপূর্বক রবাহুত তাৎক্ষণিক জনসভার আয়োজন করে। বিজয় উন্মত্ত মুক্তি-জনতার গগনবিদারী আনন্দ নৃত্যের গর্জন জয়বাংলা, হেমায়েত জিন্দাবাদ, মুক্তিবাহিনী জিন্দাবাদ, নারায়ে তকবির আল্লাহ্ আকবার, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। জনতা মুহুর্মুহু মেজর হেমায়েত জিন্দাবাদে কাঁধে তুলে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকে। জনতার দেয়া মেজর ভূষণ বহমান্য শিরোপার গৌরবে ব্যবহার করেন হেমায়েত। এর পর থেকে মেজর হেমায়েত রূপেই তাঁর পরিচিতি।

মুক্তিযোদ্ধা জনতা সশস্ত্র যুদ্ধে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণের একাধিক পরীক্ষায় তাঁদের নেতা নির্বাচন করেন। মুক্তিযোদ্ধা জনতা সশস্ত্র যুদ্ধ স্থল বদলান। যাঁদের কিছুই নেই, তাঁদের কিছু হারাবারও ভয় নেই। তাঁরা বাংলার গ্রাম-জনতা। এবার যুদ্ধ শহর ছেড়ে গ্রামে। ফরিদপুর শহর রক্ষার ব্যর্থতা ডি.সি. ইউসুফ ও এস.পি.নূরুল মমিন-এর বিশ্বাসঘাতকতায় সকলের জ্ঞাননেত্র খুলে দেয়।

গেরিলা যুদ্ধ : শহর ছেড়ে গ্রামে ঃ শহর ছেড়ে গ্রামের জনগণকে গেরিলা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে স্থান থেকে স্থানান্তরে উল্কাগতির ঝড়ো সফর করেন হেমায়েত। দলের সৈন্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করেন তিনি। স্বজাতি-বিজাতি সকল শত্রুদলের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। বেশ কিছু দিন চলে পলায়নপর মুক্তিদের গেরিলা যুদ্ধ। বোয়ালমারি, আলফাডাঙ্গা, পাংশা থানায় চলে গণউজ্জীবন সঞ্চারী গেরিলা যুদ্ধ। নিজের আশৈশবের লীলানিকেতন গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া থানায় টুপারিয়া গ্রামেও স্থান হলো না তাদের। স্বজন-শত্রুর চক্রান্তে আসে বিজন শত্রু। স্বদেশী-বিদেশীর চক্রান্তে স্ত্রী মরলো, বাড়ি পুড়লো, গ্রাম জ্বললো। এবার ফরিদপুর ছেড়ে পালাতে হলো বরিশাল, তবুও হার মানেন নি হেমায়েত।

আটঘর কুড়ি আনার পেয়ারা বাগানে আশ্রয় নিয়েও মুক্তিরা মুক্তি পেলো না। তুমুল

যুদ্ধে পরাজয় ঘটে, মুক্তিযোদ্ধারা পরাজয় গ্লানির হতাশায় ম্রিয়মাণ। ইতোমধ্যে মেজর জলিল সাহায্য প্রত্যাশায় ভারত যাত্রা করেন। সৌখিন আদুরে দুলাল সুখের পায়রা কতিপয় যোদ্ধা বিদায় নেন দল থেকে। মাটির সন্তান নিবেদিত প্রাণ জানবাজ যোদ্ধারা পুনরায় সংহত হন। দুর্দিনের সাথী পরীক্ষিত নেতা হেমায়েতের নেতৃত্বে তারা সংগঠিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ততায় যোদ্ধারা হেমায়েতকে নেতার পদে বরণ করে নেয়।

এবার জানকবুল যোদ্ধাদের নিয়ে একের পর এক বিজয় মালা ছিনিয়ে আনেন হেমায়েত। বরিশালের নাজিরপুর, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, মুলাদি থানা, গোযাইর হাট থানা, শিবচর যুদ্ধের বিজয় তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের পথ প্রশস্ত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের বর্ধিত অস্ত্র ও জনবলের তাকতের আকর্ষণে জুন মাসের দিকে পঙ্গপালের মত মৃত্যুঞ্জয়ী জনতা মুক্তি প্রশিক্ষণ সেন্টারে ছুটে আসে। এখানেই গণযুদ্ধে মুক্তি হেমায়েত-এর নেতৃত্বের সার্থকতা।

ব্যক্তি স্বার্থের বাহাদুরির উর্ধ্বে ট্রুপস কমান্ডের প্রয়োজনে র‍্যাংক-স্ট্রাকচারের প্রয়োজন আছে। বাস্তবে তিনি ই.বি.আর.-এর হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন মাত্র। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কমান্ডে সিনিয়র হাবিলদার ও জেসিওগণ ছিলেন। মুক্তিবাহিনী কার্যত নিয়মিত আর্মির আদলে গড়ে উঠে। মুক্তি গেরিলাদের লিডার, দলনেতা-উপনেতা, ট্রুপস কমান্ডার, উপকমান্ডার যে নামেই ডাকা হোক, পুরা প্যাটার্ন নিয়মিত আর্মি স্টাইলে। সেকশন, কোম্পানি জাতীয় সুশৃঙ্খল মিলিটারি শৃঙ্খলায় তারা পরিচালিত হতো। তেমনি বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে এবং সৈনিক প্রশাসনের প্রয়োজনে উদ্দীপনা সঞ্চারী জনতার দেয়া মেজর পদবি গ্রহণ করেন হেমায়েত।

কার্যত মেজর পদবির সামরিক কর্মকর্তাগণই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র চট্টগ্রাম থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ডাক দেন মেজর জিয়া। ঢাকার জয়দেবপুরে ২ ইবিআর মেজর কাজি শফিউল্লার নেতৃত্বে বিদ্রোহ পতাকা উড়িয়ে মৃত্যুগুহা উৎরে সটকে পড়ে ময়মনসিংহ। ৩ ইবিআর মেজর নিজাম-এর নেতৃত্বে সংহত হয় ফুলবাড়ি এলাকায়। ৪ ইবিআর মেজর খালেদ মোশাররফ-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ পতাকা উড়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া। চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান-এর নেতৃত্বে ইপিআর বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয় মেজর ওসমানের সামরিক ব্যবস্থাপনায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্নে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বিদ্রোহের হাল ধরেন স্বল্প কজন সার্ভিং মেজর। স্বাধীনতা যুদ্ধে মেজর নামের যাদু ছিল। চট্টগ্রাম বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত কণ্ঠের 'মেজর জিয়ার ঘোষণা'র মতই ফরিদপুর-বরিশালে হেমায়েত নামের যাদু মন্ত্র সত্যিই কাজ করে যাদুর মতন। হেমায়েতও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নামের পূর্বে মেজর ব্যবহার করতেন। সশস্ত্র যুদ্ধে এ-নিয়ম নতুন কিছুই না। কুষ্টিয়া বিজয়ী মেজর আবু ওসমান চৌধুরী যশোর সেনানিবাস হামলায় উদ্যত হয়ে ব্যর্থ হয়। পরে বিজিত অঞ্চলের শেষ দুর্গ বেনাপোলে সসৈন্যে মেজর ওসমানের উপস্থিতি ঘটে। সেখানে যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনজন সিভিল অফিসারকে সরাসরি ক্যাপ্টেন র‍্যাংকে

কমিশন দেন মুক্তিফৌজ-সর্বাধিনায়ক ওসমানী। মুক্তিযুদ্ধে সাফল্যের স্বাক্ষরবাহী অফিসার তিনজন হলেন :

ক। সি এস পি তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী, এস.ডি.ও., মেহেরপুর।

খ। পিএসপি মাহবুব উদ্দিন, এস.ডি.পি.ও., ঝিনেদা।

গ। শিক্ষা বিভাগ থেকে মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, অধ্যাপক, ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনানী বাপাক (পিতা) শোয়েকার্ণ পর্যন্ত স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ফিল্ড কমিশন দেন। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের আর এক নন্দিত নায়ক টাঙ্গাইলের আবদুল কাদের সিদ্দিকী ওরফে বাঘা সিদ্দিকীকেও তাই করতে হয়েছে। ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নিয়মিত সেনা কমান্ডে যুদ্ধের মধ্যেও ইন্টার সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের (আই.এস.এস.বি.) মাধ্যমে নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করে অফিসার নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ চলেছে। এতে যুদ্ধে নতুন রক্তের সঞ্চার, নতুনতর কমান্ডের নেতৃত্ব ও ঘাটতি পূরণ হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত গেরিলা কমান্ডারদের সে-সুযোগ ছিল না। তাঁরা যুদ্ধের মৃত্যু পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ফিল্ড কমিশন দিয়েছেন। যুদ্ধচলাকালে সে-সব অবৈতনিক অফিসারদের পদবি বহাল ছিল। যুদ্ধের পরে প্রশাসনিক অজ্ঞতা ও লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে সে-সব মহান স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়। যুদ্ধকালে হেমায়েত বাহিনীর অধিনায়ক 'মেজর হেমায়েত' নামে জীবনপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। এখানেই হেমায়েতকে জনতার দেয়া মেজর ভূষণের সার্থকতা।

টাঙ্গাইলের আবদুল কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর জন্য শেষ পর্যায়ে বিদেশের সাহায্য মিলেছে। যুদ্ধে আহত কাদের সিদ্দিকীর চিকিৎসার জন্য ভারতে যেতে হয়েছে। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীও সুকৌশলে অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। মার্কিন সিনেটর পর্যন্ত হানাদার কবলিত বাংলাদেশে তাঁর সাক্ষাৎকার পেয়ে বিস্ময় মেনেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে পর্যন্ত বিদেশে প্রবাসী সরকারের দরবারে কুৎসা রটানো হয়। আগরতলা গিয়ে প্রবাসী সরকারের দরজায় নির্দোষিতার সাফাই গেয়ে আসতে হয়। হেমায়েত বাহিনীর বিরুদ্ধেও প্রবাসী সরকারের দরবারে বিরূপ প্রভাব ফেলা হয়। সত্যাশ্রয়ী নির্ভীক সেনানী নিজের সাফল্যের জয়গান ও নিজকে নিরপরাধী প্রমাণে ভারতে যাবার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রবাসী সরকারও দখলদার বাংলাদেশে পাক-বাহিনী হেমায়েত বাহিনীর মুক্তাঞ্চল দেখে বিমুগ্ধ হন। হেমায়েত-প্রতিনিধি ভারতে গিয়ে তাঁর ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করলে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। অন্যান্য স্বাধীনতা যোদ্ধা মুক্তিফৌজের পকেটমানির সম্মাননার মত ভাতা-গ্রহণ হেমায়েত সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। মৃত্যুর মুখে হেমায়েত সংজ্ঞা হারানোর পূর্বে স্বদেশের মাটিতে চিকিৎসা, মৃত্যু ও কবর কামনার মর্মস্পর্শী লিখিত বিবরণ রাখেন।

স্বজন হারানোর স্মৃতি ভাস্বর তাঁর যুদ্ধ-জীবন। প্রিয়তমা পত্নী হাজেরা আত্মাহুতির

শৌর্যে স্বামীকে যুদ্ধ উন্মাদনার মহত্তম পথ দেখিয়ে যান। এমন অবিস্মরণীয় কালজয়ী বঙ্গনারীর শৌর্যে-বীর্যে-ঐশ্বর্যের বিরলধর্মী অনন্য মহিমাধন্য হেমায়েতের যুদ্ধ জীবন। এমনি এক মহত্তম যোদ্ধার স্মৃতি চারণে লেখক ধন্য।

পরিচিতি ঃ সাবেক পাকিস্তান মুসলিম লীগের ক্ষুদে কর্মী, এলাকার প্রভাবশালী কৃষক মুনশি আবদুল করিম-এর পুত্র হেমায়েত উদ্দিন। তাঁর মা সখিনা বেগম; জন্ম ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ। তারা তিন ভাই, দুই বোন। হেমায়েত সবার ছোট। পুরো পরিবার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর ভাই নজির হোসেন ও শামসুল হক, বোন আমেনা বেগম ও মোমেনা বেগম। হেমায়েতের স্থায়ী পৈতৃক নিবাস ঃগ্রাম-টুপারিয়া, ডাকঘর-কাজুলিয়া, থানা-কোটালিপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ। পুত্র গর্বে গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত-এর পিতা ১৯৯৩ সালের রমজানে জান্নাতবাসী হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একশত উনিশ। ১৯৯৫ সালে নিরানব্বই বছর বয়সে হেমায়েত-এর মাতাও ইহধাম ত্যাগ করেন। এক কালজয়ী বীর পুত্র জন্ম দিয়ে মুক্তিমাতা ইতিহাসের অমর আসনে অধিষ্ঠিতা।

শৈশবের গুণাবলি ঃ একরোখা, ডানপিটে, গোঁয়ার-গোবিন্দ, মায়ে-খেদানো, বাপে-তাড়ানো, স্কুল-পালানো, অন্যায়ের প্রতিবাদী, ন্যায় নিষ্ঠ, বখাটে দুঃস্থ শিশু কিশোরের শোরগোল তোলা ক্ষেপাটের জীবন্ত প্রতীক হেমায়েত। পরবর্তী লড়াকু হেমায়েত শক্তির নির্ঝরণী উৎস তাঁর মা। জীবনের আট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি নির্ভেজাল পানীয়ে মানুষ। মানব শিশুর আগমনের পূর্বেই আল্লাহ পৃথিবীতে ব্যবস্থা করেন সে মাতৃস্তনের দুধ অমিয় পিযুষ ধারা। হেমায়েতের আট বছর বয়সে তার বোনের জন্ম। আর সে পর্যন্ত দুরন্ত কিশোর বাইরে থেকে এসে জোর করে মায়ের দুধ পান করত। পরবর্তী জীবনে হেমায়েতের শক্তি সাহস এবং তাকতের উৎস শৈশবে তাঁর মাতৃদুগ্ধ পান।

নয় বছর বয়সে তালপাতার উপর লেখায় তাঁর হাতে খড়ি। গোটা তল্লাটে হেমায়েতের মত কেয়ামত করা একগুঁয়ে বালক আর ছিল না। ছোটবেলা থেকেই তিনি কিশোরদের সর্দার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যেন ছিল তার নেশা ও পেশা। এসব ক্ষেত্রে অযাচিত প্রতিবাদ এবং রবাহূত উপস্থিতি-দুষ্টুমিতে তিনি সবার শিরোমণি। ফাঁকা বিরান পোড়ো বাড়ির আম, জাম, পেয়ারা, ডাব-নারিকেল, গাব, জাম্বুরা, আমড়া, শরিফা, বরই জাতীয় গাছের ডালে ডালে তাঁর বিচরণ। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণের দাদি-নানির একান্ত ভক্ত হেমায়েত। চুরির ফলমূল আম-জামের সবই তাঁদের স্টোরে জমা পড়ত।

দুরন্ত বালকের বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ। চতুর্দিকে ধর-মার-কাট-ছোঁ মার। কোন ফাঁকে নাটের গুরু চোর-লুটেরা ফসকে পালায়। পাড়া প্রতিবেশীর অভিযোগ আর অভিযোগ। যোগের খাতায় বিয়োগের কিছু নেই। নষ্ট চন্দ্র বোন চাঁদকেই যেন সুখে রাখবেন। বাবা চটেমটে লাল। মা রাগে টং। আসুক ছোঁড়া এবার ঘরে, তাকে আসত রাখব না। মা-বাবার ভীষণ শাসন কষণে মানুষ কিশোর হেমায়েত।

বাবার থাবাকে তার বড় ভয়। মায়ের আঁচলে যাতে ছুঁচো গন্ধ সন্তানের পরশ না লাগে সর্বরোগহর দাওয়াই নাগালের দূরে বাড়ির বাইরে বালকের বাস। দাদি-নানির আশকারায় লুকিয়ে-চুরিয়ে সময়-অসময় দুধ-ভাত, মাছ-মাংস, শাকান্নের কিছু না কিছু পেটে পড়ে। বাবা রাগে তড়পায়, মা শাসায়। কার কথা কে শোনে! দ্বিগুণ উৎসাহে দুরন্তপনার নতুন নতুন আইটেম চালু করে সে। গরিব সন্তানের অন্যায়ের প্রতিবাদে গোঁড়ামি ভদ্র সমাজে উপহাসতুল্য। অভিজাত আর যোদ্ধা রক্তে তফাৎ নেই। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে আয়নায় প্রতিবিম্বের মত সন্তানের মাঝে হেমায়েত যেন দেখেন অবিকল তাঁরই প্রতিচ্ছবি। নিজ সন্তানদের কড়া শাসনে চড়া হলে তাঁর মা-বাবা কন তুই নিজে কি ছিলি? আজ নাতিদের উপর এত চটসকা। সাপের মাথায় ধুল পড়ার মত চুপসে যান হেমায়েত।

আবাল্য স্বাধীনচেতা বালকটি বড়ই উদার প্রাণ। নির্ভীক অকুতোভয়, ভয় কি জানে না। আশৈশব পরের দুঃখে সাড়া দেয়া তাঁর স্বভাবধর্ম। সকল বিচ্যুতির মাঝে গ্রহবাহ্য সব সহ্য তাঁর অপূর্ব মেধা।

স্কুল জীবনের বৈশিষ্ট্য ঃ ভারতে মুসলমানদের বিদ্রোহ ও দারিদ্রের বিষয়ে তদন্ত কমিশন বসে। কমিশনের দায়িত্বে ব্রিটিশ-ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্ট (আইসিএস) স্যার ইউলিয়াম হান্টার। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থে তিনি তাঁর তদন্ত কমিশন তথ্য প্রকাশ করেন।

একশত বছর পূর্বে ভারতের যে মুসলমানের গরিব হওয়া ছিল স্বপ্নাতীত, শত বছরের ব্রিটিশ শাসনে সে মুসলমানের সুখ স্বাচ্ছন্দের ধনী হওয়া আকাশ কুসুম। চোখ মেলা বালক হেমায়েত স্কুলে দেখেন দেশের ভিন্ন চিত্র। শতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনকে হার মানায় এক দশকের পাক শাসন। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে হান্টার-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মেঘনা পাড়ের দুরন্ত কিশোর চাষি সন্তানকে শিক্ষা দেয়া টিকিধারী ব্রাহ্মণ-শিক্ষকের কর্ম নয়। স্যার উইলিয়াম হান্টার-এর বক্তব্য হুবহু ফলেছে দুরন্ত বালক হেমায়েতের বেলায়।

বাড়ির কাছে মাঝবাড়ি হাই স্কুল। বড় ভাই শামসুল হকের সাথে হেমায়েতও একই স্কুলের ছাত্র। ভাই তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী এবং স্কুল ক্যাপ্টেন। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র হেমায়েতও তার নিজের ক্লাশের ক্যাপ্টেন। বাহাত্তর জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে উচ্চতর নম্বর পেয়ে তিনি প্রথম। সব মিলিয়ে প্রতিভা, শক্তি-প্রভাব ও তারুণ্যের দাপট চতুর্দিকে থরহরি কম্পমাণ। স্কুলের সতীর্থদের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার স্বতঃস্ফূর্ততায় আগবাড়িয়ে নিবেদিত প্রাণে সাড়া দিতেন তিনি। সর্ব প্রযত্নে অসৎ সঙ্গ পরিহার করে চলতেন। সৎসঙ্গের জীবন যাপনই ছিল তাঁর ব্রত। মেধাবী ছাত্রের বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলা ছিল স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। শিক্ষকবৃন্দ ন্যায়নিষ্ঠ প্রশংসনীয় গুণের ছাত্রটিকে স্নেহ-ভালবাসার চোখে দেখতেন।

সে যুগে ছিল অতিরিক্ত যুক্তিবিদ্যার ক্লাস। মৌখিক যুক্তিবিদ্যায় উর্ধ্বতন ক্লাসের নাইন-টেনের ছাত্ররা হেমায়েতের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে হিমশিম খেত। খেলাধুলার

সংগঠনে এবং শক্তি-সাহসে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। লম্বায় পাঁচফুট চার ইঞ্চি। যাকে বলে ডানপিটে ঠ্যাংগাড়ে। হা-ডু-ডু খেলায় তিনি ছিলেন একাই একশ। দারুণ খেলে নিজের দলের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। তাঁর হা-ডু-ডু খেলার ট্রিকস ফ্লাইং চায়না ম্যান কুস্তিগির ওংবোকলি মার্কা ফ্লাইং কিক। দু'পা সরল রেখায় যুগপৎ শূন্যে উঠিয়ে প্রতিপক্ষের মুখে-বুকে দিতেন আকস্মিক কিক। ১৯৫৬ সালে ঢাকা স্টেডিয়ামে ওংবোকলির ফ্লাইং চায়না কিক সাড়া জাগায়। চায়না ম্যানের ফ্লাইং কিকের উন্নত সংস্করণ হেমায়েতের বাঙাল ঘোড়া মার্কা যুগল পায়ের লাথি। তাঁর হা-ডু-ডু খেলার প্রতিপক্ষ তাঁর আচমকা চমকের লাথির ঠেলায় আঁতিপাঁতি দাঁত হারিয়ে চোখে শর্ষে ফুল দেখে মাঠ ছেড়ে পরাজয় মানতেন। যিনি একবার হেমায়েতের লাথি খেয়েছেন, খেলার মাঠে আর হেমায়েতকে ধরতে কোনদিনই সাহস পেতেন না। তাঁর লাথির সামনে কেউ ঘেঁষত না। তিনি ডুক দিতে গেলে নাইন-টেনের প্লেয়ারের বাইরে বড় বড় প্লেয়াররা পর্যন্ত ভয় পেত। ক্লাস সাথীরা তাঁর দুই পা জোড়া লাথির ভরসায় ক্লাস নাইনকে হা-ডু-ডু খেলার চ্যালেঞ্জ মেরে বসত। কিশোর চেতনায় বালকসুলভ চাপল্যের কথা কাটাকাটি জিদের উপর খেলার আয়োজন হতো। একবার হেমায়েতের কেয়ামতি লাথির ভরসায় নিচের ক্লাস কর্তৃক উপরের ক্লাসকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয় খেলার জন্য। ব্যাপার দুই কিশোর গ্রুপের ইজ্জতের লড়াইয়ে রূপ নেয়। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সাথে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের প্রিয় সর্দার পড়ুয়াকে নিয়ে খেলা। নাটক জমছে ভাল। দুদলের টাইম টেবিল, স্থান নির্বাচন সম্পন্ন। বৃহস্পতিবার স্কুল আওয়ারে বেলা এগারটা থেকে বারটার মধ্যে ঝাড়া এক ঘন্টা খেলা, পুরা স্কুল সে খেলা উপভোগ করবে। দুদলের জিদের খেলার সরব ঘোষণার ফলাও প্রচার। সব ঠিকঠাক করে দুদলের মাথায় বাড়ি।

পাঁচফুট দশ ইঞ্চি লম্বা খিটখিটে মেজাজের রাশভারি হেডমাস্টার। নাম তাঁর বাবু সর্বেশ্বর পোদ্দার। কথা বলেন কম। পান থেকে চুন খসলে তাঁর গুন গুন রাগে খুন খুন। ভীষণ রাগী মানুষ। পোদ্দার বাবুর খবরদারে সবাই তটস্থ। সেই পোদ্দার বাবুর পূর্ব অনুমতির বাইরে ক্লাস-পিরিয়ডে স্কুল কম্পাউন্ডে খেলা, তাও দু'একটার লুকোচুরি খেলা নয় পুরা স্কুলের ক্লাস বরবাদ করে। এবার হেডমাস্টারের অনুমতির কথায় তাদের বোধোদয় হয়। ক্লাসের বেল পড়ল। সারা স্কুলে থমথমে ভাব। খেলা না ক্লাস। ইজ্জতে ঘা লাগতে হেমায়েতই আগ বাড়িয়ে ক্লাস নাইনের ক্যাপ্টেন-এর নিকটে ধর্ণা দেয়। নাইনের ক্যাপ্টেন জানান, হেডমাস্টার মশায় অনুমতি দেননি।

জিদের জি'দ বজায় রাখতে সংশয় বিঘনের জিঞ্জির ভেঙ্গে হেমায়েত ছুটেন খবরদারি করে খেলার অনুমতি নিতে হেড মাস্টার স্যারের দরবারে। হেডমাস্টার মশাই পূর্বেই খেলার ব্যাপারে জেনেছেন। হেমায়েত রুমে ঢুকতেই তাঁর রোষকশায়িত রক্ত চক্ষু তুলে বলেন, কেয়া এতনা বড়া তেড়া ঘাড়া বেতমিজ ঠ্যাংগা ছোঁকড়া। লেখাপড়া ক্লাস ছেড়ে খেলা। বেল্লিক কাহাকার মানুষ হওয়ার তোমার যায় বেলা। লেখাপড়া করে কোথায় মানুষ হবে, না ভরদুপুরে সব ছেড়ে খেলাধুলায় গোল্লায় যাও।

স্কুল আওয়ারে কাজের কাজ ক্লাস ফেলে অন্য কিছু হবে না। পড়ার সময় পড়া খেলার সময় খেলা। দুরন্ত কিশোর না মানে যুক্তি।

যত বড় ছেলে নয় তার বাড়া যুক্তি। হেমায়েত হেডমাস্টার বাবুর সামনেই দাঁড়িয়ে সহজ সওয়াল, "স্যার আমাদের খেলতেই হবে।" হেড স্যার বলেন, "খেলবে তো খেল। ১১টা ১২ টার অবেলায় কেন? ক্লাস শেষে খেলতা।" তেড়ার খাড়া যুক্তি। "স্যার ক্লাস শেষে ক্ষুধা লাগে। তখন খেলা হয় না।" নাছোড় বান্দা সর্দার পড়ুয়া রুম ছেড়ে পর্দার আড়াল গেলে হেড মাস্টার স্যার রক্ষা পান। কিন্তু তেড়া যে এক পায় খাড়া। অনুমতি ছাড়া রুম ছাড়বে না। অনুমতির অংগুলি হেলনে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। হুম দেখা যাবে যাও বলে তাঁর সাময়িক প্রশান্তি।

হেড স্যারের চড়া মূল্যের অনুমতিটাই বড় পাওনা। এ যেন বিশ্বজয়ের সেরা কীর্তি। রুমের বাইরে এসেই তাঁর বিজয় বার্তার সজোর বাঁশি বেজে উঠে। ভাবখানা যেন হেমায়েতই স্কুলের হর্তাকর্তা বিধাতা। খেলা শেষে সবাই যথারীতি ক্লাসে যাবে শর্তে খেলার অনুমতি দেন হেড মাস্টার।

রাগে শিক্ষক মণ্ডলীর কেউ বেতমিজদের খেলা দেখতে এলেন না। সাজ সাজ রবে ছাত্র-ছাত্রীদের সবাই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় হা-ডু-ডু খেলার মাঠে জড় হয়। শিক্ষকগণ তখন হেডমাস্টার বাবুর রুমে পরবর্তী রাউন্ডের প্ল্যান নিয়ে ব্যস্ত। রুদ্ধ শ্বাস প্রতিযোগিতার খেলা। হেমায়েতের লম্বা পদযুগলের শক্ত লাথিতে বিপক্ষের তিন জনের দাঁত ভেঙে রক্তারক্তি ঘটে যায়। নিচের ক্লাসের পুচকাদের হাতে উপরের ক্লাসের পরাজয়। নাইন রাগে ক্ষিপ্ত। সব রাগের ঝাল পড়ে হেমায়েতের উপর। তিন শূন্য গোলে সেভেনের কাছে নাইন গো-হারা হারে তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু খেলার মাঠে বড়দের মুখে লাথি মেরে দাঁত ফালানোর তার বড় দুর্দান্ত সাহস। তাকে দেখে নিতে হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? তার সাথে শখে লাগতে গেলে বাকি দাঁতগুলিও যাবে। পরাজিত দুর্বলের সান্ত্বনা যা নিচের ক্লাসের ছোট ছোকড়া উপরের ক্লাসের বড় ভাইরা তোরে মাপ কইরা দিল। মুখ টিপে হেমায়েত হাসে বিজয়ের বিদ্রূপ হাসি।

বিজিত-বিজেতা দুদলই খেলার নিয়ম ভুললো না। খেলা শেষে শান্ত শিষ্টভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটলো ক্লাসে। দুপক্ষের ছাত্র খেলোয়াড়গণও ধুলাবালি ঝেরে ক্লাসে যায়। এ-দিকে হেড স্যার ফুঁসছেন। স্কুল ডিসিপ্লিন ব্রেক। ব্যাপার সহজে ছেড়ে দেয়া যায় না। হেমায়েতকে শায়েস্তা করতে হেডমাস্টার সর্বেশ্বর পোদ্দার বাবু হাতে নিলেন দুষ্টের দমনে আদর্শ শাস্তি চিরাচরিত নজির বেত্রদণ্ড। চারখানা চিকন বেত একুনে করে বাঁধলেন। দপ্তরি দিয়ে তাঁর দপ্তরে ডাকালেন দুষ্টকুল শিরোমণি হেমায়েতকে। রুমে ঢুকতেই সাদা ধুতি পরা পোদ্দার বাবু রাঙা চোখে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠেন। ধীর গাম্ভীর্যে হাতে নেন চার জোড়া বেত। নায়কোচিত শৌর্যে হাঁটলেন শিকারের দিকে। মারতে মারতে 'প্রায় লাশ' করে ফেললেন কিন্তু টু শব্দ করেনি হেমায়েত। কোন কান্না নেই। বিশুষ্ক চোখে একফোঁটা পানি নেই। দোষস্বীকারের কোন লক্ষণও

নেই। রক্ত মাংসের মাস্টার বাবু এবার বিচলিত। কাঁদার বেলা কাঁদান যত নিজেও তত কাঁদেন। তাঁর রক্ত চক্ষু ঝলসে উঠে বিগলিত অশ্রুবন্যা। শ্রান্ত ক্লান্ত হতাশায় হেডমাস্টার হাল ছাড়লেন। এ-বড় সাংঘাতিক বুনো ওল। ওকে বাগে আনার সর্বহর দাওয়াই সর্বেশ্বরকে ঈশ্বর দেননি। চেয়ারে বসে তাঁর উপদেশ খয়রাত : ভবিষ্যতে আর এমন করবি না। ক্লাসে যা। বিক্ষুব্ধ ঘাউরা ছাত্রের জবাব, "ওটি সম্ভব নয়।" বিস্ময়ের আশ্বাসে শিক্ষক, "ঠিক আছে বাড়ি চলে যা।" অশান্ত ছাত্রের শান্ত উত্তর, "ঠিক আছে, নমস্কার স্যার।"

সারা স্কুলে তখন পিন পতন নীরবতার কড়া শাসনে ক্লাস চলছে। তার মধ্যেই সব ক্লাসে হেমায়েতের কেয়ামত নামার খবর গেল। সকলের দায়দায়িত্ব মাথা পেতে মার খেলো একা একজন। অন্য কেউই কোন শাস্তি পেলো না, মারও খেলো না।

ক্লাসে আর গেলো না সে। বই খাতাপত্রের সব স্কুলের ক্লাস ক্রমেই পড়ে রইল : 'আল বিদা মাঝ বাড়ি হাই স্কুল'। সিধে সোজা বাড়ি। তারপর কাঁথা মুড়িতে বিছানায়, ভীষণ জ্বরের অশনি সংকেত। কোটালিপাড়া থানার কুশলা ইউনিয়নের পরবর্তী চেয়ারম্যান হেমায়েতের বড় ভাই সামসুল হক বাড়িতে ফাঁস করে দেয় ঘাউরা ভাইয়ের কীর্তি। মা-দাদি, ছোট দুই বোনের কান্না আর কান্না। ভাই বুঝি আর বাঁচে না। বাবা বেজায় খুশি। ওস্তাদের মাইর না খেয়ে ছাত্র আবার কবে মানুষ হয়! পাঠশালায় দিছি মাস্টারের হাতে গাধা পিটিয়ে মানুষ করার জন্য। পোলার হাড্ডি আমার, মাংস হেড স্যারের। যা করার ভালই করছে। এতদিন পর জাতের জাত ওস্তাদ সর্বেশ্বরের হাতে যদি ঈশ্বর আমার গোঁয়ার ছেলের সুমতি দেন।

বাপের আদল পুত্র

"বাপকা বেটা সেপাইকে ঘোড়া
কুছ নিহি হায়তো থোড়া থোড়া।"

হেমায়েত দ্বিতীয় পুত্র নঈম যেন বাপের রিপ্লিকা। খেলাধুলায় চৌকশ ছেলে। সাঁতারে চ্যাম্পিয়ান সার্টিফিকেট। অষ্টম শ্রেণী ডিঙ্গিয়ে নবম শ্রেণীতে। বাপের মতই শিক্ষকদের প্রিয়। তারুণ্যে ভরপুর খেলাধুলায় নতুন শিক্ষক এলেন। দোতলা স্কুলের উপরের ক্লাসের ছাত্ররা আর ড্রিল পিটির গেইমস ক্লাসে আসে না। প্রাক্তন গেইমস শিক্ষকের মত আদর সোহাগের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর মধ্যে নেই। কয়েকদিন ব্যাপার দেখে তিনি চিরাচরিত প্রথার বেত্র দণ্ড হাতে নিলেন। ছাত্র শূন্য গেইমস ক্লাস ছেড়ে স্কুল বিল্ডিংয়ের দোতালা থেকে নামার পথে দাঁড়ালেন। সবকটা ফান্না থানকে লাগান পিটনি। বীরপুরুষদের অনেকে দোতালা থেকে লাফিয়ে পড়ে পা মচকালেন। বিল্ডিং সংলগ্ন গাছ বেয়ে নামতে গিয়ে অনেকে প্যান্ট-সার্ট-লুঙ্গি ছিঁড়লেন। কাপুরুষরা স্যারের বেত্রদণ্ড মেনে নিয়ে উপর থেকে নিচে নামছেন। উপরের ক্লাসের মাস্তানরা হেমায়েত পুত্র নঈম উদ্দিন ওরফে নান্নুকে ধরে। আরে তুই তো বীর বিক্রমের ছেলে, সেরা খেলোয়াড়, স্যারকে সামাল দে। নান্নুমহা বিক্রমে বেত হাতের স্যারের প্রতি

এগুলেন। বেত পিঠে পড়ার আগে ধরে ফেললেন। সতর্ক সাঙাতরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ঝড়ের বেগে পঁচিশ-ত্রিশজন চেঙা ছুটে এসে চোখের পলকে স্যারকে বানিয়ে হাওয়া। চতুর্দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ। যা কলিকাল পড়েছে। ছাত্র কিলায় মাস্টারকে। পালের গোদা নঈমের বাপের কাছে খবর যেতেই তাঁর আক্কেল গুড়ুম! এত দেখছি বাপের বাড়া। নিজের ছবি যেন আয়নায় দেখছেন। তাঁর জিদ যা তোরে পড়ামুই না। বাপকা বেটার যা পড়বই না। নিজেদের ধানভাঙ্গা কলের মিস্ত্রিকে পটিয়ে কিছু অর্থ হাতিয়ে নঈম সিদ্ধান্ত নেয় আর স্কুল পড়া নয়। এবার ভর্তি মাদ্রাসায়। হায় মাদ্রাসায় রসই নাই। অবশেষে পড়াশোনার বিরতি।

হেমায়েতের অন্যান্য ছেলে-মেয়ে

ক। ছেলে

১. মোঃ হাসিব উদ্দিন (পান্না)। মালয়েশিয়ায় চাকরি শেষে দেশে ফেরত। বর্তমানে ঢাকার পল্লবী থানার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বিবাহিত ও দু'ছেলের জনক।

২. মোঃ নাঈম উদ্দিন (নান্নু)। মালয়েশিয়ায় চাকরি শেষে দেশে ফেরত। গ্রামে পৈত্রিক সম্পদের তদারকরত। বিবাহিত ও দু'ছেলের জনক।

৩. মোঃ মাঈন উদ্দিন (মিলন)। পুলিশ বিভাগে কর্মরত। বিবাহিত। এক সন্তানের পিতা।

৪. মোঃ কাইম উদ্দিন (কিবরিয়া)। টেলিলাইনে টেকনিশিয়ান। অবিবাহিত।

৫. মোঃ রইস উদ্দিন (রুবেল)। বিবাহিত। দোকান কর্মচারি।

৬. মোঃ সাঈম উদ্দিন (স্বপন)। পুলিশ বিভাগে কর্মরত।

৭. মোঃ বসিরউদ্দিন (বাচ্চু)। ৮ম শ্রেণীর ছাত্র।

৮. মোঃ জহিরউদ্দিন (জুয়েল)। ৯ম শ্রেণীর ছাত্র।

৯। মোঃ বাহাদুর উদ্দিন (পরশ)। ৮ম শ্রেণীর ছাত্র।

১০। মোঃ সাইফউদ্দিন (সোহেল)। ৫ম শ্রেণীর ছাত্র।

১১। মোঃ হাফিজউদ্দিন (নবীন)। ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র।

খ। মেয়ে

১২। মিসেস লাবনী বেগম (লাভলী)। এসএসসি পাস। বিবাহিতা।

১৩। স্মৃতিমিলা পাঁপড়ি। ১ম শ্রেণীর ছাত্রী।

হেমায়েতের এত সন্তানের মধ্যে বীর নারী সোনেকা চার সন্তানের জননী। তাঁদের একজন পুলিশের এএসপি, একজন পুলিশ কনস্টেবল।

হেমায়েতের মত কেয়ামত মার্কা পোলারে সামলাবে কে? এবার পিতার চিন্তা বাকি শিক্ষা জীবন। পাঁচ ছয় দিন যেতেই প্রস্থান লজিং বাড়ি। স্কুল যাত্রার মহাপ্রস্থান। ১৯৫৯ শিক্ষাবর্ষের আগস্ট-সেপ্টেম্বর গিয়ে অক্টোবর গড়ায়। স্কুলের নামে গায়ে জ্বর আসে। গৌয়ার্তুমির একশেষ। ঘাড়ে চাপে জিদের খোয়াবের ছওয়াব। পড়াশোনায় অষ্টরম্ভা।

আট আনা মাত্র সম্বল করে গোপালগঞ্জ যাত্রা করেন তিনি। ১৯৫৯ সালের ২৮

অক্টোবর সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন হেমায়েত। সে যুগে সেনাবাহিনীর চাকরিতে বাঙালির তেমন আকর্ষণ ছিল না। রিক্রুটমেন্টে লোকই বিশেষ মিলত না। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র বয়স চুরি করে আর্মিতে ভর্তি হয়। গাট্টাগোট্টা লম্বা স্বাস্থ্যবান ছেলে বলেই টিকলেন। আসল বয়স তখন চৌদ্দ। আঠার বছর লিখিয়ে রিক্রুটমেন্টের খাতায় নাম এন্ট্রি করা হলো। পরবর্তীকালের মুক্তিযুদ্ধের গৌরব হেমায়েতের এভাবেই সেনা জীবনের হাতে খড়ি। যতদিন এ-দেশের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ শিয়াল তাড়ান, গরু খেদান, গাধা পিটান বেত্র দণ্ডকেই গুরুদণ্ডের শেষ মাপকাঠি ধরবেন অনুরূপ ব্যাপার চলতেই থাকবে, স্কুল ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় না হলে বিকর্ষণ তাদের বাড়বেই। শিক্ষকগণ শিক্ষা মনস্তত্ত্ব না জানলে শিক্ষার্থীর মন না বুঝলে, আত্মঅহমিকায় গর্বিত হলে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতায় হারিয়ে গেলেন কত না কালজয়ী সুপ্ত প্রতিভা। অভিভাবকদের অনেকের দুঃখ, টাকা পয়সার অভাবে সন্তানকে মানুষ করার সুশিক্ষা দেয়া গেল না। অর্থ বিত্ত-বিভবের ঐশ্বর্যে গরীয়ান পিতা অন্তিমে সন্তান শিক্ষার ব্যর্থতায় দুঃখ করেন। নির্ধন-ধনী দুজনেরই সন্তান শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী আকর্ষণে ব্যর্থতা। যতদিন পর্যন্ত গৃহের প্রিয়জনের পরিপূরক আদর সোহাগের বিদ্যানিকেতন না হবে ততোদিন শিক্ষায় ব্যর্থতার অভিশাপ জাতিকে বইতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করে, মনস্তত্ত্বে শিক্ষকদের সচেতন না করলে স্কুল-বিভীষিকা যাবে না শিক্ষার্থীর মন থেকে। প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর শিশু-কিশোররাও গুরুগৃহমুখী হবে না। ততোদিন নজরুল-হেমায়েতের মত বিদ্রোহীরা স্কুলের শিকল ভেঙে বাইরে ছুটবেন। প্রথাগত স্কুল জীবনের বাইরে সেনাজীবনেও তাঁর শিক্ষা অব্যাহত ছিল। বেসামরিক শিক্ষার সাথে সেনা জীবনের শিক্ষা মিলালে তিনি ম্যাট্রিক বা এস এস সি লেভেল পাস।

সৈনিক জীবন ঃ সেনাবাহিনীতে ভর্তির খবর কেউ জানত না। চট্টগ্রাম ট্রেনিং সেন্টার থেকে পত্রযোগে বাড়িতে খবর পাঠান তিনি। একমাস তাঁর কোনই খবর ছিল না। মা-বাবা-ভাই-বোনেরা হতাশামুক্ত হন তাঁর পত্রে। ইবিআরসি প্রশিক্ষণ শেষে কসম প্যারেডে তিনি পাক্কা সৈনিক বনে যান।

সে ১৯৬০ সালের কথা। ২ ইবিআর আসে পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে ইস্ট পাকিস্তানের যশোর সেনানিবাস। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁর পোস্টিং হয় ২ ইবিআর যশোর। ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ রাতে স্বাধীন বাংলার অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী লেঃ জেনারেল এরশাদ তখন লেফটেন্যান্ট। পরে তিনি ক্যাপ্টেন থেকে মেজর পদে উন্নীত। তাঁর পোস্টিং ২ ইবিআর ডি কোম্পানি অধিনায়ক হিসেবে। ১৯৬৩ সালে আর্মি মিউজিক স্কুলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন হেমায়েত। ১৯৬৫ সালে ইস্ট পাকিস্তানে ছুটি কাটাতে আসতেই লাগে পাক-ভারত যুদ্ধ। জরুরি পরিস্থিতিতে হেমায়েত হাজিরা দেন ২ ইবিআর যশোর ক্যান্ট।

সরাসরি তিনি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে। যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও দর্শনা বর্ডারে তাঁর যুদ্ধ। যুদ্ধে তিনি, 'সি' কোম্পানির সেকশন ইনচার্জের দায়িত্ব পালনে সাফল্যের স্বাক্ষর

রাখেন। যুদ্ধ সমাপ্তির সিজ ফায়ার পর্যন্ত উল্কাগতির দুলকি চালে রণাঙ্গণ চষে বেড়াতেন। ১৯৬৫-র লড়াইতে বাঙালির শৌর্যে রক্ষা পেয়েছে লাহোর। তবুও নির্ভীক বাঙালির সাহস ও বীরত্বকে পাকিস্তানিরা ঘৃণার চোখে খাট করে দেখতো। তখন ব্যাপার সুস্পষ্ট যে, এসব ঘৃণার জ্বলন্ত প্রমাণের চাক্ষুষ দর্শনের অবহেলা একদিন হয়ত এ-দেশের মানুষ এমনি সহজে মেনে নেবে না। সেদিন অনেকের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, দেশ বিভাগ কি আবার আসন্ন! ভারত বিভাগে পাকিস্তানের সাথে এ-বিভাগ ভিন্ন। পাকিস্তান তো পূর্ব ও পশ্চিম দুভাগে হাজার মাইলের ব্যবধানে ভাগ হয়েই আছে। দুটাকে জোড়া রেখেছে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল বিমান (পিআইএ) ও সেনাবাহিনী। অন্যায় ও বে-ইনসাফের যূপকাষ্ঠে ধর্মের মাদকতার বলি। এবার আয়-ব্যয়ের পাওনার লাভ লোকসানের হিসাব মিলাতে ভাগাভাগি আসন্ন। কিন্তু এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভাবনা তখন ভাবা হয়নি। ত্রিশলক্ষ বাঙালি শাহাদতের বিনিময়ে রক্তঝরা স্বাধীনতা ছিল অভাবিত এবং কল্পনাতীত। যা ঘটার নয় তাই ঘটল। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সাফল্যের সোপান রচিত হয় ১৯৬৫-এর বাস্তব যুদ্ধে। বাঙালি তার শক্তি সাহসে আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখে পঁয়ষট্টির পাক-ভারত লড়াইতে।

সাফল্যের স্বীকৃতি ঃ ছয় বছর চাকরির মেয়াদে পাকিস্তান আর্মি মিউজিক স্কুল এবোটাবাদে এক বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন হেমায়েত। সে প্রশিক্ষণে সারা পাকিস্তানের কোর্সভুক্ত সৈনিকদের মাঝে মেধাক্রমে হেমায়েত প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করে। ১৯৬৫ সালে সেনাশিক্ষা প্রথম মান সমাপ্তিতে তাঁর বি+গ্রেডিং। ১৯৬৫-এর লড়াই শেষে তিনি হাবিলদার পদে উন্নীত হন। ফলে মিউজিক স্কুলে প্রশিক্ষক পদে তাঁর যোগদান সম্ভব হয়। ১৯৫৯-১৯৭১ পর্যন্ত পরিসরে সিপাই থেকে হাবিলদার মেজর পদে তাঁর পদোন্নতি হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সৈনিকের এমন দ্রুত পদোন্নতি বিরল ঘটনা। যোগ্যতার মাপকাঠিতে পদোন্নতির সোপান। ছয়/সাত বছর এনসিওর চাকরিতে হাবিলদার ও হাবিলদার মেজর পদে পদোন্নতি হেমায়েতের মত ঝানু সৈনিকের যোগ্যতারই পরিচয় বহন করে। বাংলার আর এক দামাল প্রথম মহাযুদ্ধে বাঙালি পল্টনে হাবিলদার মেজর পদে উন্নীত হন। তিনি বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েতও হাবিলদার মেজর। দুজনের অপূর্ব মিল। একজন গান রচয়িতা। অপরজন গানের স্কুলের শিক্ষক। দুজনই যুদ্ধখ্যাত। দুজনই কবি। একজন বিখ্যাত অপরজন অখ্যাত। নজরুল স্বভাব কবি, হেমায়েত প্রচেষ্টাজাত। দুজনই বিদ্রোহী। লাথি মার ভাঙরে তালায় দুজনই বিশ্বাসী। দুজনই দুঃখীর দুঃখে দুঃখী, সর্বহারার চেতনায় উজ্জীবিত। দুঃখে যাদের জীবন গড়ার জীবন্ত প্রতিমূর্তি দুজনই। মুসলমান স্ত্রীর অবর্তমানে দুজনই হিন্দু রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। জেল পংগুত্ব দুজনের জীবন সাথী। দুজনই আয়ুষ্কালে প্রশংসিত ও বিতর্কিত। ইতিহাসের অপূর্ব যোগাযোগ নজরুল ও হেমায়েত। ইতিহাসে দুজনেরই অমর আসন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭১-এর ০৯ মার্চ পর্যন্ত হেমায়েত চাকরি করেন পাকিস্তান আর্মি মিউজিক স্কুল, এবোটাবাদ। আকস্মিক তাঁর জীবনে প্রবাহিত হয় উল্টা তরঙ্গ।

বিদ্রোহী সৈনিক ঃ স্কুল জীবনের ন্যায়নিষ্ঠা তাঁর সৈনিক জীবনের কর্মেও চালু ছিল। বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসে নিজকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করতে গিয়ে তিনি চিহ্নিত হন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তার ব্ল্যাকলিস্টে।

কোর্ট মার্শাল ঃ ১৯৫৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত একাধিকবার হেমায়েতকে কোর্টমার্শালের সামনে যেতে হয়েছে। প্রমাণের অভাবে বার বার বেকসুর খালাস পেয়েছেন তিনি। ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে দুটি মারামারিকে কেন্দ্র করে ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এফএফ) রেজিমেন্টাল সেন্টার কমান্ডার সমীপে তাঁর পেশি হয়। এবারও বাঙালের বেকসুর খালাশ। ১৯৬৯ সালের ঘটনা। স্থান এবোটাবাদ সিনেমা হল। হান্নান নামের কুমিল্লার বাঙালি ছেলে মার খায় একজন পাঞ্জাবির হাতে। 'বাঙালকা বাচ্চারে' বলে কাওমে বাঙালকে গাইল দিলে হেমায়েতের রক্তে আগুন ধরে যায়। অবশেষে পাঞ্জাবিকে তক্তাবৎ দোক্তার মাইর দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হয় 'বাঙালি কাকে বলে'। কওম তোলা জাত বিচারের প্রশ্নের ব্যাপার গড়ায় বাঙালি-পাঞ্জাবি পিটাপিটিতে। সময় ১৯৭০-এর ডিসেম্বর। মিউজিক স্কুলের মেজর শের আলতাফের হুকুম না মানার গোস্তাখিতে হেমায়েত বিচার দেন এফ এফ রেজিমেন্টাল কমান্ডার দরবারে। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর বেকসুর খালাস।

আর্মি স্কুলে অর্ধযুগের কৃতিত্বের চাকরি। বাংলায় ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন বুঝার চেষ্টা। ১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচন বিজয়ী বাঙালির জাতীয় দাবিতে মনে প্রাণে সমর্থন জানান। ওসমানীর সাথে সংগোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেন হেমায়েত। ১৯৭১-এর পুরাদমে অসহযোগের সহযোগিতায় বাংলাদেশে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বহুবিধ মারামারি ও অবাধ্যতার জের টানা চিহ্নিত বাঙাল বুঝলেন সময় অনুকূলে নয়। ১৯৭০-এর নির্বাচন পর্বের বিজয় ঝিমিয়ে পড়ে স্তিমিত হয়ে ১৯৭১-এর মার্চ সমাগত। কি হয় না হয় তা বলা মুশকিল। মিউজিক স্কুলের মেজরের সাথে ঝগড়ার শেষ হবে না। ঘটনার জের টেনে যে কবে জেলে পুরে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। পাকিস্তান ছেড়ে পালানোর অভিনয় শুরু হয় হেমায়েতের।

সুপথের সন্ধান না পেয়ে বাঙালের রাগ জিদের পথের সন্ধান নেন তিনি। শেষ পর্যন্ত মিউজিক স্কুলের মেজর আলতাফকে পিটানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর অফিসে ঢুকে পায়ের বুট খুলে তাঁর কপালে মারেন জোরছে আঘাত। রক্তপাতে মেজরের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। বিদ্রোহী হেমায়েত গ্রেপ্তার হন। মেজর ও হাবিলদারের পূর্ব ঝগড়ার পাঁয়তারা ভেবে বিচারক বাদি-বিবাদি দুজনের উপরই ক্ষুব্ধ হন। সৌজন্যের বেড রিপোর্টে হেমায়েতের পোস্টিং হয় ২ ইবিআর ইস্ট পাকিস্তান।

এমনি ঘটেছিল করাচি এয়ারপোর্টে হাবিলদার মেজর কবি কাজি নজরুলের বেলায়। তাঁর বাঙাল মাইরের বিরাশি শিক্কার চড় খেয়ে ব্রিটিশ সার্জেন্ট পপাত

ধরণীপাত। শৃঙ্খলিত বিচারে হাকিম জিগান এটা কি মারামারির জায়গা? নজরুল কন, সৈনিকের কাজই তো মারামারি।

চরম সুযোগকে পরম পাওয়া ভেবে বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগ লুফে নেন হেমায়েত। প্রস্তুতি পর্বে গেলেন ফ্রন্টিয়ার ফ্রন্টের পেশোয়ার সীমান্ত। একটি পিস্তল ও একটি রিভলবারের প্রতিটি পঁচাশি টাকা করে খরিদ করেন। সাথে একশ রাউন্ড করে গুলি। লাহোর, করাচি ঘুরে ১১ মার্চ, ১৯৭১ তিনি ঢাকায় পৌছেন। মানুষ বিমান ভ্রমণে পরে শৌখিন পোশাক। হেমায়েত গরমে খাকি ইউনিফরমের সাথে ইকুইপমেন্ট। বেয়াকুফ বাঙাল সৈনিকের কাণ্ড দেখে প্লেন যাত্রীদের হাসি পায়। গোপন অস্ত্র বহনের ছলনায় সামরিক সাজ-পোশাক। স্ত্রী হাজেরার হেফাজতে রিভলবার। হেমায়েত জিম্মায় সাত পয়েন্ট এম এম, এল এ এম এ পিস্তল। স্বাধীন দেশে পিস্তলটির লাইসেন্স করিয়ে নেন স্বনামে। রিভলবার জমা দেন সরকারি অস্ত্রাগারে।

বিদ্রোহী আস্তানায় ঃ জীবনের বিচিত্র চড়াই-উতরাই পেরিয়ে হেমায়েত আসেন বাংলাদেশে। অলৌকিক পরিবেশে মুক্তিযুদ্ধের পরম সৌভাগ্য যে হেমায়েতের মত একজন অমিততেজা যোদ্ধা মুক্তিবাহিনীর পক্ষে অস্ত্র ধরার সুযোগ পেলেন। ঢাকায় এসে হেমায়েত যোগ দেন নিজের আদি ইউনিট ২ ইবিআর জয়দেবপুর। ০৯ মার্চ, ১৯৭১ বিরূপ রিপোর্টে পোস্টিং। ১১ মার্চ ঢাকায়। ঢাকা মোহাম্মদপুর রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ভাইয়ের হাতে স্ত্রী পুত্র সমর্পণ করে নির্দেশ দেন, সপরিবারে দেশের বাড়ি গোপালগঞ্জে পালাও। এর পর ১৪ মার্চ যোগ দেন জয়দেবপুর। দায়িত্ব পান 'সি' কোম্পানির ৯ নং প্লাটুন হাবিলদারের। ব্যাটালিয়নের তখন যুদ্ধ প্রশিক্ষণ চলছে। তিনি আছেন রিয়ার হেডকোয়ার্টার। ১৯ মার্চ জয়দেবপুর ছাত্র হত্যার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার সরব। গণনেতাদের সাথে গোপন মিলাপের সংযোগ। ২৫ মার্চ ঢাকায় বাঙালির রক্ত রঞ্জিত পিলখানা, রাজারবাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, বস্তি এলাকা স্বচক্ষে দর্শন করেন হেমায়েত। প্রতিহিংসায় কাঁপে প্রাণ। ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী ঘোষণা। শেখ মুজিবের পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণায় রক্তে নাচন ধরে যায় তাঁর। সে রক্ত চাঞ্চল্যের উন্মাদনা। নিরস্ত্র বাঙালির ওপর জয়দেবপুরে পাক নির্দেশে গুলি চালাতে প্রথমে অস্বীকার করেন হাবিলদার হেমায়েত ও তাঁর প্লাটুন। হেমায়েত ও তাঁর সাথীরা সর্বপ্রথম পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণের সূচনা করেন।

গণ-আন্দোলনের হিড়িক আর বিদ্রোহে সারা বাংলা প্রকম্পিত। দেশের কোথায় কি হচ্ছে তার সঠিক হদিশ কেউ জানে না। স্ট্যান-টু-স্টাণ্ড বাইতে যায় আর্মির সময়। এরই মধ্যে হেমায়েতের সঙ্গে ছাত্র ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সরাসরি গোপন সাক্ষাত ঘটে। বাংলার দুরন্ত তরুণ হাবিলদার বিদ্রোহী বাঙালির সাথে সরাসরি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

স্বদেশের মাটিতে প্রায় অবিমিশ্র বাঙালির রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে জীবনের মোড় ঘুরে যায় তাঁর। বিদ্রোহের বন্যায় সবার মনে তোলপাড়। পশ্চিমা হায়েনাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে সবার মনে-প্রাণে; সময় ও সুযোগের মোক্ষম প্রতীক্ষায়।

জয়দেবপুরে পাক চক্রান্ত ঃ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সুকৌশলে নিরস্ত্র করার ঘৃণ্য পাক-চক্রান্ত ব্যর্থ করে স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী জয়দেবপুরের জাগ্রত জনতা। বিপ্লবী ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক মিলে টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত পথে পথে সৃষ্টি করে অগণিত ব্যারিকেড। ১৯ মার্চ, ১৯৭১ ক্ষিপ্ত পাক-ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব নির্দেশ দেয়, নিরস্ত্র জনতার ওপর চালাও গুলি। বিদ্রোহী বাঙালি জনতার ওপর গুলি চালনার নির্দেশ পান হাবিলদার হেমায়েত। বিচক্ষণ হাবিলদার সর্বক্ষণ নিশ্চুপ নীরব। সেদিন গর্জালো না তাঁর হাতের রাইফেল। সামরিক জীবনে কমান্ডারের নির্দেশ অমান্য করা মহা অপরাধ। তবুও তাঁর অস্ত্রের গুলি বেরোয়নি। পাক ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার জাহানজেব আরবাব জাহান্নামের গোস্যায় চটে অগ্নিশর্মা। অবাক বিস্ময়ে তিনি ইউনিফরমধারী বাঙাল পাক-সৈন্যের আদেশ অমান্যের মতিগতি লক্ষ্য করেন। এবার বিক্ষুব্ধ ব্রিগেড কমান্ডার ২য় ইস্ট বেঙ্গলের বাঙালি ক্যাপ্টেন মইনকে গুলি চালনার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। সেয়ানা বাঙালের ট্রিকস; ঊর্ধ্বে উত্থিত অঙ্গুলি নির্দেশনায় খাস বাঙাল জবানে মঈন নির্দেশ দেনঃ আকাশে গুলি চালাও। গুলি তো চলে কিন্তু মরে না বিদ্রোহী বাঙাল। হতচকিত ব্রিগেডিয়ার এবার তাঁর সঙ্গী সশস্ত্র স্কট পশ্চিম পাকিস্তানের পাক সৈন্যদের গুলি চালনার নির্দেশ দেন। নিরীহ নিষ্পাপ চল্লিশজন বাঙালি ছাত্র, যুবক, শ্রমিক হতাহতের রক্তে রঞ্জিত ঐতিহাসিক জয়দেবপুরের রাজপথ। বাঙালি হত্যায় বাঙালি সৈনিকদের গুলি করা থেকে বিরত রাখার পথ প্রদর্শনের ঔজ্জ্বল্যের সূচনা করেন হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন।

প্রকাশ্যে বাঙালি সৈন্যদের স্বজন হত্যা থেকে বিরত রাখার গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয় জয়দেবপুরে, হেমায়েতের নেতৃত্বে। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ অস্ত্রের স্থলে পাক পদাতিক রেজিমেন্টগুলিকে চায়নিজ অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু তখনও পুরনো ব্রিটিশ মডেলের সমুদয় অস্ত্রপাতি দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলে রয়ে গিয়েছিল। বাস্তবে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ব্রিটিশ-চায়নিজ মিলিয়ে দুই ব্যাটালিয়ানের সমপরিমাণ অস্ত্র জমা ছিল। শেষ মুহূর্তে ব্রিটিশ অস্ত্র সরিয়ে নিতে এসে পাক আর্মি দ্বিতীয় বেঙ্গলের ইঙ্গিতে জনতার রুদ্ররোষাগ্নিতে পড়ে। বাঙালি কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপ্টেন এজাজ আহমদ চৌধুরীর চাতুর্যে অস্ত্র জমা দেয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। সশস্ত্র গাড়ির বহরে এজাজ অতিরিক্ত ব্রিটিশ অস্ত্র জমা দিতে যান ঢাকার সিওডি। পরিপূর্ণ আত্মঘাতী পরিকল্পনায় সিওডি গেট ও অফিস বন্ধ হবার মিনিট পনর আগে ক্যাপ্টেন এজাজ-এর উপস্থিতি ঘটে সেখানে। অস্ত্র বোঝাই টনার বহর বাইরে রেখে তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। এত স্বল্প সময়ে ক্লিয়ারেন্স মিলবে না বাহানায় ঐ-রাতেই তিনি সমুদয় অস্ত্র নিয়ে জয়দেবপুর ফিরে আসেন। ক্যাপ্টেন এজাজকে নিয়ে সৈনিকদের উদ্দাম নৃত্য কে দেখে!। সেনা বিদ্রোহের জন্যই গ্রেফতার এড়ানোর সুযোগ পান এজাজ। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্রকারী পাক-আর্মি কর্তৃক জয়দেবপুর হানা দেবার আসল ইতিহাস অতিরিক্ত অস্ত্র সরিয়ে নেয়ার একটি কূট-প্রয়াস। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের প্রকাশ্য বিদ্রোহী তৎপরতার পর থম থমে অনিশ্চয়তায় দিন যায়। অন্তরে তাদের প্রতিশোধের আগুন।

কি করে বাঙালি হত্যার বদলা নেয়া যায়। ২৫ মার্চ, ১৯৭১; কাল রাতে সকল সংশয়ের অবসান ঘটে। পাক প্রীতি আর ইসলামি জোশের ধোকার মুখোশ খসে পড়ে পাকিস্তানি প্রশাসন ও সেনাদের। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর বালুচ কসাই টিক্কা খান সারা দেশে নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকার বাঙাল বিদ্রোহের সুতিকাগারগুলিই তিনি প্রথমে বেছে নেন হত্যাযজ্ঞের স্পট হিসেবে:

ক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
খ। ইপিআর সদর পিলখানা;
গ। পুলিশ সদর রাজারবাগ;
ঘ। বস্তি ও বাজার এলাকা।

ট্যাংক, কামান, মর্টার, মেশিনগানের অজস্র গোলায় ইতিহাসের ঘৃণ্যতম নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলো ঢাকায়। প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত বেঙ্গল রেজিমেন্টসমূহ বিদ্রোহ করে :

ক। ১ ইবিআর-যশোর;
খ। ২ ইবিআর-জয়দেবপুর;
গ। ৩ ইবিআর-সৈয়দপুর;
ঘ। ৪ ইবিআর-কুমিল্লা;
ঙ। ৮ ইবিআর-চট্টগ্রাম।

বাঙালি সিও লেঃ কর্নেল রেজাউল জলিলের সিদ্ধান্তহীনতায় ১ ইবিআর-এর উপর বিপর্যয় নেমে আসে। ২ ইবিআর-এর বাঙালি সি ও লেঃ কর্নেল মাসুদুল হাসান খানকে বদলি করে পাক বংশবদ বাঙালি লেঃ কর্নেল আবদুর রকিবকে আনে পাক আর্মি। শেষ মুহূর্তে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার-এর কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে এনে তাদের শান্ত করার চেষ্টা চলে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ২৫ মার্চ রাতে ২ ইবিআর-এর সাথে থেকে গেলে, ২ ইবিআর-এর সিও রকিব ব্যাটালিয়নের সাথে একাত্ম হলে, ১ ইবিআর সিও রেজাউল জলিল বাঙালির পক্ষে লড়লে ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি সংযোজন করতে পারতেন। তাঁদের মত সিনিয়র বাঙালি অফিসার মুক্তিযুদ্ধের হাল ধরলে বয়সভারে ন্যুব্জ রিটায়ার্ড কর্নেল ওসমানীকে এতো বড় দায়িত্ব প্রদানের প্রয়োজন পড়তো না। মেজর পদের এত জুনিয়র সফিউল্লাহ, জিয়া, খালেদ মোশাররফ–এদের উপরও বৃদ্ধি পেত না মুক্তিযুদ্ধের এতটা চাপ।

২৫ মার্চ কাল রাতের পরও লুকোনো নখর দন্তের বাঙালি সিও (কমান্ডিং অফিসার) রকিবকে দিয়ে ২ ইবিআর বিচ্ছিন্ন করে তাদের সংহত শক্তির যুদ্ধ করার ক্ষমতা ধ্বংস করার চেষ্টা চালান টিক্কা খান। এ ব্যাটালিয়নের অধিকাংশ সৈন্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার নামে টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। অফিসার জোয়ানদের মধ্যে ফেটে পড়ার প্রতিশোধ নেয়ার ঐকমত্য তখন খুবই মজবুত। চট্টগ্রামের কালুরঘাটের বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়ার বিদ্রোহী কণ্ঠ, "আমি জিয়া বলছি। বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে পরিকল্পনা কক্ষেই আছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু

করে দিয়েছি। আপনারা যে-যেখানে আছেন পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"- বিদ্রোহ বার্তার এমন সবুজ সংকেত পাবার পর মুহূর্তে জয়দেবপুরের বাঙালি সৈনিকরা পাকিস্তানিদের ওপর চরম আঘাত হানে। রাতের আঁধারে দুপক্ষের গুলি বিনিময় হয়। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চলে গিয়ে জয়দেবপুর তখন আঁধার মানিক। ব্যাটালিয়ানের সেকেণ্ড-ইন-কমান্ড বাঙালি মেজর কাজি মোহম্মদ সফিউল্লাহ দিনের আলোতেই সশস্ত্র যোদ্ধাদের নিয়ে সটকে পড়েন ময়মনসিংহ। অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে রাতের আঁধারে ময়মনসিংহের পথে সটকে পড়েন ক্যাপ্টেন মঈন। ২৭ মার্চ রাত ৯-টায় সুবেদার মেজর নুরুল হকের সহযোগিতায় গুলি গোলার মধ্যেই বিদ্রোহীদের জয়দেবপুর ত্যাগ করা সম্ভব হয়। শেষ মুহূর্তে বাঙালি সিও রকিব রাজবাড়িতে নীরবে অবস্থান করলেন। দু'দলের গোলাগুলি দেখেও থামাতে এলেন না। তিনি ব্যাটালিয়নের বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে ময়মনসিংহ গেলেন না; পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে সৃষ্টি করলেন জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার এক অনন্য নজির।

বিদ্রোহীদের কেটে পড়ার সঠিক সময়ে হেমায়েত জয়দেবপুরের অদূরে দক্ষিণে রথখোলায় প্যাট্রোল ডিউটিতে নিয়োজিত। তাঁর সঙ্গী আবদুল আজিজসহ প্যাট্রোল জনবল আটত্রিশ। ডিউটিতে যাবার সময়ই আজ রাতে ২ ইবিআর কোথাও বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত তাঁরা পেয়েছিলেন। গোলাগুলির আওয়াজ সংকেত সবাইকে পূর্বদিকের রাণীঘাটে সমাবেশের নির্দেশনা বুঝাবে।

রাতের কয়েকটি গুলির সিগন্যাল অনবরত গোলাগুলিতে রূপ নিলে নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েতকে পূর্ণাঙ্গ বাইরের আক্রমণ ভেবে দুই কমান্ডার হেমায়েত ও আবদুল আজিজ-এর মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। হেমায়েত জোয়ান আইউব ও আলমের মত নয়জনকে নিয়ে পাশের গ্রামে রাত পোহানোর জন্য প্রতীক্ষা করেন।

হেমায়েত-এর নেতৃত্বে রাজবাড়িতে হানা : ২ ইবিআর-এর মূল বিদ্রোহী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন হাবিলদার হেমায়েত। ২৮ মার্চের উষা লগ্নে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া তারা বিশজনের গ্রুপ একত্র হয়। তারা হেমায়েত-এর নেতৃত্বে বুকে বুকে ক্রলিং করে জয়দেবপুর রাজবাড়ি পাক শিবিরের দিকে নিঃসাড়ে এগিয়ে যান। গভীর মনোযোগে তথ্যানুসন্ধানী পর্যবেক্ষণে ভিতরে-বাইরে বাঙালি যোদ্ধা উপস্থিতির কোন নিদর্শন পেলেন না। কয়েকজন পাঞ্জাবি সৈন্য পুব দিকের গেট পাহারা দিচ্ছে। বিপর্যস্ত অবস্থায় তারা হতাশাদীর্ণ। পূর্ব পরিকল্পনায় জয়দেবপুরে ছুপিয়ে-পালিয়ে-গা ঢাকা দিয়ে বাঁচা পাক-সৈন্যদের সাহায্য পাঠানোর আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। তাই তারা বিদ্রোহী লুটেরা বাঙাল পরিত্যক্ত জয়দেবপুর পাহারা দিচ্ছিলেন। চিনা ও ব্রিটিশ অস্ত্রশস্ত্রের দু'ব্যাটালিয়ন অস্ত্রের পুরোটা পলায়নপর ভাগোড়া ২ ইবিআর নিয়ে যেতে পারেনি। পেছনে রয়ে যাওয়া অস্ত্র হাতানোর উদ্দেশ্যে জয়দেবপুরে পুনরায় হানা দেয় হেমায়েত।

অধীর আগ্রহে পাকিরা তখন বাইরের সাহায্যের প্রতীক্ষা করছে। সৈনিক-আদর্শ ও বাঙালি কাফের খতমে পাকিস্তান রক্ষার মনোবলের জন্য তাদের প্রশংসা করতে হয়। মৃত্যুর মুখেও তারা তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুৎ হয়নি। হায় পাকিস্তান এমন নিবেদিত

প্রাণ সৈনিক, অথচ গোরস্থানে তোমাদের যাত্রা। সৈনিক কর্তব্যে ভাবালুতার স্থান নেই। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছেড়ে যাওয়া ক্যান্টনমেন্ট সদৃশ রাজবাড়ির অস্ত্রাগার ভেঙ্গে সমুদয় অস্ত্র-গোলাবারুদ জঙ্গি-ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের সহায়তায় হাতিয়ে নেয় হেমায়েত গ্রুপ।

মৃত্যুপরোয়ানার সুযোগের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছামৃত্যুর আঘাতে এগুলেন মাত্র তিনজনঃ হেমায়েত, আইউব ও আলম। জয়দেবপুর বালিকা বিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে তাঁদের সন্ধানী শিকারির সতর্কতার যাত্রা। আকস্মিক বাঙাল হামলায় পাক প্রহরার পাঁচজন প্রাণ হারায়। সহজে কাজ সেরে তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করেন। ঝটিতি আক্রমণে আটজন পাক সেনার মৃত্যু ঘটে। গুলিতে তাৎক্ষণিক নিহতরা এহসানীর সঙ্গে জান্নাতবাসী হন। আহতরা বেয়নেটে শেষ। পলায়নপর সফিউল্লাহ গ্রুপ ওয়্যারলেস সেট সাথে নিয়ে যান। ২ ইবিআর অফিস সংলগ্ন বাঙালি এসএমজির ব্রাশে তারা ক্র্যাশ। শত্রু সেনা ধ্বংসে বাঙালি সাফল্যের কারণ তাদের আকাশ পর্যবেক্ষণ। তারা আকাশ পথে সাহায্য আসার ঐকান্তিক আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল। আশপাশ দেখার সুযোগ তারা নেয় নি। সুযোগ-সন্ধানী বাঙাল সেনারা শত্রুর দুর্বলতার সুযোগের পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগায়। মূল উদ্দেশ্য বাঙালি আহত-নিহত, বন্দিদের উদ্ধার করা এবং সুযোগ বুঝে পরিত্যক্ত অস্ত্র লুটে নেয়া। নানা কৌশলে রক্ষা পাওয়া পনের জন পাক আর্মি ও বিহারি সাঙাতের প্রহরার বাধা ডিঙিয়ে এবং টুকটাক গুলি চালিয়ে শত্রুদের চরম দূরে রাখার প্রয়াস পান। রাজবাড়ির ভিতর বিহারি সাঙাত বা লুটেরার যেই হোক দুচারটা চোরাগোপ্তা ফায়ার করে বাঙাল জিদের প্রতিহিংসা কার্যকর করে। চরম জিঘাংসার প্রতিজ্ঞায় পাক ও বিহারি ফ্যামিলি কোয়ার্টার সমেত সেনানিবাসের বিভিন্ন স্থানে হামলা করে। তারা নিজেরা অক্ষত থেকে ১৫ জন সশস্ত্র শত্রু হত্যার ফলে বাঙালির সাহস আরও বেড়ে যায়। বাঙালি কণ্ঠের সাড়ায় চতুর্দিকে ওত পেতে থাকা বাঙালিরা পঙ্গপালের মত রাজবাড়ি ঢুকে পড়ে। রাতের হামলায় মুমূর্ষু প্রায় আহত চার পাক আর্মির কোনই চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। জনতার হাতে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়। চাওয়া অনুসারে তাদের মাথায় গুলি করে সম্মানোচিত সৈনিকের মৃত্যু বাস্তবায়িত করা হয়। ইতোমধ্যে রাতের যুদ্ধে নিহত পাক আর্মির আটজনের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। নিহত বেঙ্গল সৈনিক, বেসামরিক জনতার আটাশ জনের লাশ একই কবরে দাফন করা হয়। প্রথম দফায় প্রতিরোধ বিচূর্ণের পরিণতিতে কমপক্ষে ষাটজন শত্রু নিধন হয়। জয়দেবপুর প্রভাতী হামলায় মুক্তি-গুলিতে নিহত শত্রুর সর্বমোট সংখ্যা ছত্রিশের মত। শত্রুর প্রতিরোধ বিচূর্ণে সেখানে বাঙালির ভূমিকা ছিল খুনির। অবশ্য যুদ্ধকালে নৈতিকতা নির্বাসিত থাকে, তা যে-কোনো দেশের সৈনিকের ক্ষেত্রেই হোক। সে-সময়ে অবুঝ শিশুর বেরিকেডের আড়ালে শত্রুরা লুকায় জীবন বাঁচানোর জন্য। সুন্দরী যুবতীর প্রলোভনে মুক্তি-সৈনিককে ফাঁদে ফেলার ছল করা হয়। ফলশ্রুতিতে অবুঝ শিশু হত্যায় মুক্তির হাত কলংকিত না করে গত্যন্তর ছিল না। স্বজাতি হত্যার প্রতিরোধে সর্বত্র বাঙালি রক্তে আগুন ধরার প্রতিফল নির্বিচারে শত্রু হত্যা।

নিতান্ত নাজুক অবস্থার বেড় থেকে মুক্তির ওপর শত্রুর আঘাত হানার অন্যতম কারণ পাক হেলিকপ্টার-বম্বার প্লেনের আনাগোনা বাঙালি হত্যায় ২৫ মার্চ রাত থেকে ঢাকায় পাক আর্মির হাতে ব্যাপক এমুনিশন গোলাবারুদ ব্যবহার। এমুনিশনের ঘাটতি পূরণে জয়দেবপুরের পাশে রাজেন্দ্রপুর এমুনিশন ডিপোতে হেলিকপ্টারের অভিদ্রুত আসা-যাওয়া। ২ ইবিআর জয়দেবপুর রাজবাড়ি সেনানিবাসে আছে ভেবে বম্বার প্লেনের রেকি চক্কর চলতে থাকে। সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড বাঙালি মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে বেঙ্গলের মূল চিড়িয়া গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বাহানায় দিনের বেলায় গাড়ি-সৈন্য-অস্ত্র-অ্যামুনিশনসহ দিনের আলোয় হাওয়া হয়ে যায়। ঢাকায় বসে টিক্কা খানের বেঙ্গল পলায়নের বার্তা জানা নেই। মৃত্যু থেকে বেঁচে যাওয়া কজন পাক আর্মি বিমানে সাহায্য এই এল ভাবনায় মুক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। বড় দুরাশায় মেতে তথমা পাবার লোভে তারা ডালে মূলে শেষ হয়।

বিদ্রোহী হেমায়েত-দলের মূল টার্গেট জয়দেবপুর অস্ত্রাগার। ২ ইবিআর বহনে ও বাহনে নেয়ার অক্ষম ফেলে যাওয়া অস্ত্র-গোলাবারুদ হাত করেন বিদ্রোহীরা। ম্যাগজিন ভেঙে হাজার হাজার রাউন্ড গুলিসহ প্রচুর গ্রেনেড দখলে আসে বিদ্রোহীদের। ২৮ মার্চ বেলা ২টা পর্যন্ত অস্ত্র লুটের মহোৎসব চলে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মুত্তালিব জয়দেবপুর অপারেশন ও অস্ত্র লুটে হাজার চারেক জংগি শ্রমিক দিয়ে সাহায্য করেন। সে-সময়ে দর কষাকষি করে কোনো শ্রমিক আনতে হয়নি। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় শ্রমিক বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। মুত্তালেব সাহেবের উৎসাহে দুহাজার জংগি যোদ্ধা শ্রমিক পান হেমায়েত। মুত্তালেব প্রেরিত বাহিনীর শ্রমিক যোদ্ধাদের সাথে ছিলেন প্রচুর নিবেদিত প্রাণ ছাত্র। ২৮ মার্চ দিনের বেলা এগারটায় সৈনিক-জংগি শ্রমিক, যোদ্ধা শ্রমিক-ছাত্র-জনতা সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে জয়দেবপুর ইপিআইডিসি দখল করেন। বিপক্ষশূন্য ওয়াক ওভারের মত জয়দেবপুর রাজবাড়িতে পাক জংগি বিমানের গোলা বর্ষণ অব্যাহত থাকে। বিকেল চারটা নাগাদ পাক আর্মির বৃহত্তর হামলার তীব্রতার মোকাবেলার ব্যর্থতা উপলব্ধি করা যায়। এ-পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ গণযুদ্ধের রূপ নেয়। শ্রমিক-জনতা-আর্মি মিলে একাকার। বিদ্রোহীরা তাদের আস্তানা জয়দেবপুরের অনতিপূর্বে মাত্রা হাই স্কুলে সরিয়ে নেন। অস্ত্র গোলাবারুদের মালে গণিমত যে যত নিতে পারে লুটে নেয়। হেমায়েত তাঁর নিজস্ব দলের সঙ্গে শতাধিক অস্ত্র, প্রচুর গোলাবারুদ, তিনটি গাড়ি নিয়ে যান। দুদিনের ব্যবধানে বিশজন সেনা সঙ্গী কেটে পড়েন।

প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ ঃ মাত্রা হাই স্কুলে সংরক্ষিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। এখানে তিন হাজার ভলান্টিয়ার ফোর্স ইতোমধ্যে হেমায়েতের নেতৃত্বে সংহত হয়। বিভিন্ন পয়েন্টে গার্ড, অবরোধ ও অ্যাম্বুশে এই ফোর্সকে ভাগ ভাগ করে দেয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদের দ্বারা চলে অবরোধ ও আক্রমণ। অন্যদের দ্রুতগতির অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়। এলাকার আনসার কমাণ্ডার আব্বাস আলি ও শিক্ষক সিরাজ

মিয়ার বিশেষ উৎসাহে ও সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি সাফল্য লাভ করে। চারদিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ক্যাডার তৈরি শেষ হয়। এবার হেমায়েতের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা কাপাসিয়া থানায় যান। বিনাযুদ্ধে কাপাসিয়া থানা চলে আসে মুক্তির দখলে। এখানেও দুর্দিনের বিশ্বাসী বিশজন সাথী তাঁর সঙ্গে মৃত্যুপথ যাত্রী হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তিন হাজার ভলান্টিয়ার ঃ কাপাসিয়ার দিকে যাত্রার পূর্বে সঙ্গের সেনা সদস্যদের সহযোগিতায় হেমায়েত আঠার জেলার বিদ্রোহী যোদ্ধা-যুব-জনতাকে আঠার ভাগ করে দাঁড় করান। উল্লেখ থাকে যে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ছিল আঠার জেলা [সর্বশেষটি টাঙ্গাইল]। যে জেলায় যেমন যোদ্ধা জনতা লাইনে ছিল তার সংখ্যা অনুসারে অস্ত্র গোলাবারুদ ভাগ করে দেয়া হয়। প্রতি গ্রুপের দু'জনকে পুরো গ্রুপের সম্মতিতে কমান্ডার বানানো হয়। জেলা ওয়ারি ভাগের গ্রুপগুলিকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কৌশলে নিজ নিজ এলাকায় চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। প্রতি গ্রুপে দু'জন করে সেনা সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার মহতী প্রেরণায় এটা করা হয়। সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ভলান্টিয়ার কোর্সের সংখ্যাধিক্যে তৈরি জেলাভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ। তাদের মাঝে অস্ত্র-গোলাবারুদ দেয়া ছিল মারাত্মক ঝুঁকির ও অনিশ্চিতপথের যাত্রা। জেলা অনুসারে ভাগ করা গ্রুপে যুদ্ধ প্রশিক্ষণের বাইরেও স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধা ছিলেন অনেক। তাই বিপদের ঝুঁকি কমাতে নিয়মিত সৈনিক সঙ্গী প্রতি গ্রুপের সঙ্গে দেয়া হয়। কাপাসিয়ার দিকে যাত্রাকালে মুক্তিযুদ্ধের বিস্তারের প্রয়োজনে এই উত্তম পদ্ধতির ব্যবস্থাটি বেছে নেয়া হয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট সকল যোদ্ধার পথ চলা নিরাপদ হয়। সব বাছাইর পরেও কাপাসিয়া যাত্রার সঙ্গী দাঁড়ায় দেড়শ'র মতন।

বর্মি দখল ঃ প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি ও প্রাথমিক সাফল্যে সবাই উৎফুল্ল। এবার লক্ষ্যযোগে দেড়শত সৈন্যের বর্মি যাত্রা। সমৃদ্ধ নৌ বন্দর বর্মি। এখানে সুদৃঢ় শক্তিশালী পাক পুলিশ ফাঁড়ি। সৌভাগ্যক্রমে ফাঁড়ির সমুদয় পুলিশ স্বাধীনতাকামী বাঙালি। তাঁরা বিদ্রোহী সেনাদলকে স্বাগত জানান। স্বেচ্ছায় তাঁরা হেমায়েতের পতাকাতলে অস্ত্র সমর্পণ করেন। বর্মিতে দুদিনের জন্য সংহতির বিশ্রাম নেয় এই যোদ্ধা দল।

কাওরাইদ রেল ব্রিজ প্রতিরোধ ঃ ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু কাওরাইদ। এই একটি মাত্র ব্রিজ কব্জায় রেখে রেল যোগাযোগ বজায় রেখেছে পাক আর্মি। ঢাকা-ময়মনসিংহ যাতায়াতের সুযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হলে ব্রিজটি উড়ানো আবশ্যক। রেল সেতুর দুপাশেই গ্রাম-গঞ্জের বর্ধিষ্ণু বন্দর আর রেল স্টেশন। পাক আর্মির রেল যাত্রা অবরোধে বেঙ্গল সুবেদার আবুল বাশার ও নায়েব সুবেদার মীর মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে একটি মুক্তিবাহিনী অবস্থান নিয়েছে। তাঁরা হেমায়েতকে সদলবলে আসার আমন্ত্রণ জানান। হেমায়েত সদলে রেল সেতু এলাকা কাওরাইদ পৌঁছেন। প্রথম পর্যায়ে দুদলের মিলিত সশস্ত্র যোদ্ধা তিনশতের মত। সুবেদার মোশাররফ হোসেন, হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন, দুদলের স্থানীয় কমান্ডার,

স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্রণী উৎসাহী রাজনৈতিক দল, আওয়ামীলীগের স্থানীয় গণ্যমান্য নেতা, স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি অন্যান্য রাজনৈতিক দল, স্থানীয় যুদ্ধ-উন্মুখ স্বেচ্ছাসেবক, যোদ্ধাদের নিয়ে নীতি-নির্ধারণী কনফারেন্স। সংগ্রামী জনতাকে কাজে লাগিয়ে পাক আর্মির যাত্রা পথ অবরোধ, অতর্কিত হামলা এবং অ্যাম্বুশে তাদের ব্যতিব্যস্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তের পর নিয়ম অনুযায়ী বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বিদেশী হানাদার নির্মূলে জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

যৌথ নেতৃত্বে বারবার আক্রমণ চলে গাজীপুর পাক আর্মির অবস্থানে। অসম্ভবের বিরুদ্ধে দেয়ালে মাথা ঠেকার মত ক্ষুদ্র শক্তিতে অবিন্যস্ত সেনাদল নিয়ে সুপ্রশিক্ষণের বৃহত্তর পাক আর্মির বিরুদ্ধে আক্রমণে মুক্তিরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মুক্তির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক হারানোর ক্ষতিপূরণ দুরূহ। পাক অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে। তাৎক্ষণিক ভাবে তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হয়ে আসছে। নাজুক অবস্থায় রয়েছে মুক্তি।

ভুল বুঝাবুঝিতে দলে ভাঙ্গন ঃ ট্রেইন্ড, আনট্রেইন্ড, হাফ ট্রেইন্ড, নামকা ওয়াস্তে ট্রেইণ্ড, নিয়মিত-অনিয়মিত বাহিনীর সৈন্যদলের ঝামেলা অনেক। আর্মি, ইপিআর, পুলিশ-আনসার-মোজাহিদ, ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীদের সবাই নিজকে অত্যধিক দেশপ্রেমিক মনে করেন। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শৃঙ্খলার বিশ্বাস ও আস্থা জন্মাতে সময় লাগছে। জনতার সাথে থেকে কাজ করার ফোর্স পুলিশ। পুলিশের প্রতি অন্যান্য যোদ্ধা গ্রুপের আস্থার অভাব রয়েছে। জনতা সকল অশান্তির হোতা মনে করে পুলিশকে। অতীতে বাঙালির ওপর পাক নির্যাতনের যা হয়েছে তার সবটাই পুলিশ টিকটিকির অতি বশংবদ হাচামিছা সংবাদের ওপর। তাই পুলিশের প্রতি কোন যোদ্ধা দলেরই আস্থা নেই। সবাই ভাবে জনতার সাময়িক চাপের ভয়ে পুলিশ তাদের ভোল পাল্টেছে মাত্র। অপরদিকে, মুক্তিযোদ্ধা-আনসারের ভুল বুঝাবুঝিতে পুলিশ অফিসারের প্রতি লাইট মেশিনগানের ফায়ার ঘটে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১। বেদনাদায়ক ফলাফলে এক পুলিশ অফিসারের করুণ মৃত্যু ঘটে, আহত হন অন্য জনাপাঁচেক। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কেমন একটা নিথর নীরব শোকের ছায়া। অস্ত্র চালনায় দক্ষ সকল নিয়মিত সৈনিক ভয়ে ম্রিয়মাণ। এখানে জমায়েত মুক্তিবাহিনীতে প্রতিভাবান বিদ্যোৎসাহী দক্ষ সৈনিকের সাথে স্বল্প প্রশিক্ষণের আনসার-মোজাহিদও আছেন। তাঁরাই সংখ্যায় বেশি। অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী নাম সর্বস্ব প্রশিক্ষণের অনিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের হাতে নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যদের প্রাণ হারানোর ভয় সকলের মনে। প্রত্যক্ষযুদ্ধে সম্মুখ সমরে নিহত হলে সম্মানের মৃত্যু। আত্মকলহের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে স্বল্প প্রশিক্ষণের সৈনিকের হাতে সুদক্ষ প্রশিক্ষণের সৈন্যের প্রাণহানির ভয়ে সবাই ভীত।

এখানে মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডারকে একাধিক উপায়ে শত্রুর সাথে লড়তে হচ্ছে। গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির সকল ঘাঁটির উপর আঘাত হানা, ঢাকা-ময়মনসিংহের সড়ক পথে ঢাকার আর্মির বহির্গমন পথ অবরোধ করা এবং শত্রুর অন্যান্য আগ্রাসী কার্যক্রমের উপর নজর রাখা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায় মুক্তি ক্যাম্পে

তাৎক্ষণিক সৈন্য প্রশিক্ষণের সময় নেই। এ-ছাড়া, নেতৃত্ব দেবার পর্যায়ে লোকবল এবং সমন্বিত সংহতির অভাবে মুক্তি ক্যাম্পে বিরাট ভাঙ্গন আসে। বৃহত্তর স্বার্থে অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ছয় এপ্রিল মুক্তি ক্যাম্পের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। তারপরও ঐক্য ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলে। ৯ এপ্রিল প্রকাশ্যে বিভিন্ন গ্রুপের ক্যাম্প ত্যাগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। যার যা ইচ্ছা সাথে অস্ত্র গোলাবারুদ নিতে দেয়া হয়। স্বতন্ত্র বা দল উপদলে সবাইর পছন্দ মত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যুদ্ধের অদম্য স্পৃহায় প্রায় সবাই বহনক্ষম অস্ত্র অ্যামুনিশন সাথে নেন। শুরু হয় মুক্তিদের স্ব স্ব এলাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা।

একটি ক্ষুদ্র দলে সাত সৈনিক ও চার মুজাহিদ। তাঁদের একজন হাবিলদার ও একজন ল্যান্স নায়েক। রাতের আঁধারে দলটির সাথে সংগোপন আলোচনায় বসেন হেমায়েত। এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ করা যাবে না। বঙ্গবন্ধুর জন্ম স্থানে গিয়ে যুদ্ধের বাসনা করে হেমায়েত। মুক্তিযুদ্ধে নবচেতনায় উদ্দীপ্ত বঙ্গ শার্দুল সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। আমাদের সাধনায় মুক্তিযুদ্ধের কষ্টি পাথরে আসুন সাচ্চা বঙ্গ শার্দুলের জন্ম দিই এই মতবাদের উপর চুম্বক আকর্ষণের মত তাঁরা হেমায়েতের সাথী হবার শপথ নেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অচিন পথে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়।

অজানার পথে হেমায়েত ঃ অজানার পথে হেমায়েতের যাত্রা শুরু হয়; পথিক সংখ্যা উনিশ। হেমায়েত-এর দেহরক্ষী হিসেবে অতন্দ্র প্রহরীর মত সদা সতর্ক ঢাকা-কাপাসিয়ার ২ ইবিআর-এর সৈনিক ইব্রাহিম । প্রতিটি বিদ্রোহীর হাতে একটি করে চিনা রাইফেল ও আটশ রাউন্ড গুলি। অতিরিক্ত অস্ত্রপাতির মধ্যে দুটি লাইট মেশিনগান, চারটি চিনা এসএমজি ও চারহাজার রাউন্ড গুলি। অচেনা বন জঙ্গলের পথে গ্রাম থেকে লোক ধরে এনে বোঝা টানিয়ে পথ দেখিয়ে অগ্রযাত্রা হয় তাদের। সাথের অতিরিক্ত অস্ত্র গোলাবারুদের কারণে গজারি বনের পথে স্বজন হারানো সৈনিকদের আহাজারির মাতমে তাদের যাত্রা। পদে পদে শংকাতুর বিপদের মুখে সামরিক নিয়মে নিয়মিত সৈকিদের চলার পথে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হয়, পথ চলতে সময়ও লাগে অনেক বেশি। সামান্য বিপদ আশংকায় যাত্রা বিরতি, রেকি, বিপদ মুক্তির নিশ্চয়তার পর যাত্রা শুরু করতে হয়। স্থানীয় জনতাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও নিজের রেকিতে পথ চলতে গিয়ে আত্মগোপনে যাত্রা হলো না। কালিয়াকৈরের দুমাইল দূরের ভীষণ বন পথে শত্রু-গাড়ির আওয়াজে সতর্ক হন হেমায়েত ও তাঁর সঙ্গীরা।

আকস্মিক পাক শিকার ঃ পদে পদে মৃত্যুভয়াল অনিশ্চয়তায় ঢাকা-টাঙ্গাইল বন পথে শনির দশায় ১৯ জনের যাত্রা। ঢাকা-টাঙ্গাইল মূল পাকা সড়কের মাইল ছয়েকের মধ্যে কালিয়াকৈর থানা। আচমকা চমকে কমান্ডো হামলায় থানা দখলের পরিকল্পনায় বিভোর বিদ্রোহী দল। কিন্তু আকস্মিকভাবে তারা পাক শিকারের সামনাসামনি পড়ে যায়।

ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের পথে তিনটি মিলিটারি ট্রাক ভর্তি আর্মস-আমুনিশন-রেশন যাচ্ছে। সাথে বারজন নিয়মিত বাহিনীর সশস্ত্র খান সেনার প্রহরা। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতার

ঝড়ো গতির ঝলকের পলকে পাক বহরে আকস্মিক কমান্ডো হামলা চালায় হেমায়েত বাহিনীর এই নির্দিষ্ট কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। বিসমিল্লাহ যাত্রায় ১২ জন খান সেনা খতম। বীর প্রসবিনী বাংলার চার বীর মুক্তিসেনা মৃত্যুপণ যুদ্ধে শাহাদতের উলা দরজায় নিজেদের বিলিয়ে দিলেন। দুপাশে গজারি বনের রাস্তায় মুক্তি অ্যাম্বুশ। রাস্তার একপাশে মর্যাদার সাথে পাক আর্মির লাশের অবস্থান। রাস্তার বিপরীতে কিছুটা দূরে উঁচু টিলায় মাটি খনন করে মুক্তির কবর দেয়া হয়। অতি ত্রস্ততায় সামরিক গান স্যালুটে সম্মান জানানো হয় মুক্তি-সমাধিতে। বাংলার মানুষ আজো গজারি বনের সে সব অজ্ঞাতনামা শহিদের খবর জানে কিনা সন্দেহ। এই যুদ্ধে মুক্তির নিট মুনাফা ১২টি অস্ত্রের সাথে প্রচুর গোলাবারুদ ও একটি গাড়ি মুক্তি দখলে।

সাটুরিয়ার পথে মুক্তি হাঁটা ঃ হেমায়েত তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের চলার পথ বদলে কালিয়াকৈরের পথ ছেড়ে সাটুরিয়ার পথে হাঁটা শুরু করেন। পিছনে পড়ে রইল প্রাণপ্রিয় ৪ সাথীর মহত্তম স্মৃতিধন্য অজ্ঞাত নিশানার কবর। হাঁটতে হাঁটতে পনেরজন সশস্ত্র মুক্তি সাটুরিয়া থানায় প্রবেশ করেন। এখানে গোলাগুলির প্রয়োজন পড়েনি। স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে বিনাযুদ্ধে সশস্ত্র পুলিশের দল মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। থানার দেশপ্রেমিক বাঙালি পুলিশ এতদিন শুধু উপযুক্ত নেতৃত্বের নির্দেশনার অপেক্ষায় ছিলেন মাত্র।

পাক জিপ অ্যাম্বুশ ঃ সাটুরিয়া বিজিত থানা থেকে এবার মুক্তিরা যাত্রা করে ঘিওর থানা অভিমুখে। আরিচা সড়কের সন্নিকটে আসতেই রাত শেষ হয়ে ততক্ষণে সকাল সমাগত। সেদিন ছিল ১১ এপ্রিল, ১৯৭১; ঢাকা থেকে আরিচার পথে ভীষণ ত্রস্ততায় ধেয়ে চলছে এক মিলিটারি জিপ। ভাবনা চিন্তার সময় নেই। তড়িঘড়ি তাৎক্ষণিক প্রস্তুতির আকস্মিক অ্যাম্বুশে পাক আর্মির প্রাণ খোশ। গাড়িতে ড্রাইভারসহ এক ক্যাপ্টেন এবং সঙ্গে থাকা তিন সশস্ত্র সৈনিক স্কটের প্রহরা ছিল। প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মুক্তির আক্রমণে সবাই প্রাণ হারায়। আর্মির লাশ পথের পাশে থাকলে প্রতিহিংসার জ্বলন্ত-দলন-মলন ভয়ে জনতা ভীত হয়ে পড়ে। জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অজ্ঞাত নিশানায় ৫ পাক আর্মির দাফন সম্পন্ন করা হয়।

সাটুরিয়া ও ঘিওর থানা দখল মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকের নবতর সৃষ্টি। এবার হেমায়েত মানিকগঞ্জ এসে ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরীর সহযোগে যৌথ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।

আরিচা হামলা প্রস্তুতি ঃ ঢাকা-আরিচা রোডে মুক্তি-ত্রাশে আরোহীসহ পাক আর্মি জিপ ক্র্যাশ হয়। এবার বিশ্রামের জন্য মুক্তিরা গ্রামের একটি বাজারে গিয়ে উপস্থিত হন। মুক্তিরা তখনো আর্মির পোশাকে। ২৫ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল, ১৯৭১ পর্যন্ত দীর্ঘদিন মুক্তিদের পোশাক বদলের সময় হয়নি। ইতোমধ্যে তাদের পোশাক ও জুতা থেকে বেরুনো দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠেছে। চলমান অবস্থায় শরীরের দিকে কেউ খেয়াল করেনি এই কদিন। এলাকার জনগণ মুক্তিদের এই অবস্থা দেখে জরুরিভিত্তিতে জোগাড় করে নিয়ে আসেন কিছু লুঙ্গি-গামছা-গেঞ্জি এবং অন্যান্য

ধরনের পোশাক। পুকুরের স্বচ্ছ শীতল পানিতে প্রাণ জুড়ানো গোসল নেয় এরা। খাস বাঙাল পোশাকে এবার সবাই সতেজ হয়ে উঠে।

আরিচা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয় সবাই। রাতে আরিচা ঘাট হামলা হবে; এ-কাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে স্থানীয় শ'খানেক স্বেচ্ছাসেবক। মুক্তিবাহিনীর সামান্য গোলাগুলির ফুটফাট আওয়াজের প্রতিদানে সন্ত্রস্ত পাক আর্মি সারারাত ধরে অবিরাম বৃষ্টির ফুল ঝুড়ির মতন গুলি ছোঁড়ে। মুক্তির চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে মাঝে মধ্যে মহাতেজে তারা মর্টার বোমা ছুঁড়তে থাকে অজানা কিংবা আকাশের উদ্দেশ্যে। মুক্তির উপস্থিতি জানানো এবং পাক আর্মির শক্তি সম্বন্ধে আঁচ করার উদ্দেশ্যে মুক্তিরাও আশপাশে রেকির রেশ জারি রাখে। সামান্য শক্তি নিয়ে সুদৃঢ় পাক অবস্থানে হামলা করা মুক্তির উদ্দেশ্য নয়। ক্যাপ্টেন হালিমের অবর্তমানে শিবালয়ের দক্ষিণ পাশ বরাবর পদ্মা পাড় ঘেঁষে দু'তিনদিন লাগাতার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয় আরিচা ঘাটের পাক-আর্মি ক্যাম্প। লোকজন জড় করে যুদ্ধ কৌশলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়। এলাকার সকল স্তরের জনগণ থেকেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের শপথ নেয়া হয়। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এর সুফল পাওয়া যায়; লোকজনের সহায়তায় ঘিওর থানার অস্ত্র লুণ্ঠন করে সে-সব দামাল ছেলেদের হাতে অর্পণ করা হয়। অতঃপর, ১৩ এপ্রিল ১১ জন সঙ্গী নিয়ে হেমায়েত ইলিশ ধরা নৌকায় উঠে রওয়ানা হন নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে। কমজোর চারজন সঙ্গী এরই মধ্যে সটকে পড়ে।

ফরিদপুরের পথে ঃ বদর বদর বলে পাল তুলে সবে মিলে। ১২ এপ্রিল ছহি-সালামতে এসে সবাই নামেন নারট্যাকিচর নামক স্থানে। শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে তাৎক্ষণিকভাবে তারা স্থান পরিবর্তন করেন। ১৩ এপ্রিল বিকাল পাঁচটায় হেমায়েত নারট্যাক চর ছেড়ে যাত্রা করেন মমিন খাঁর চর এবং ১৪ এপ্রিল সকাল ৮টা নাগাদ সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে চরবাসী পালাতে শুরু করে। ত্বরিৎ এ-খবর ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে; উৎসবের আনন্দে শত শত জনতা ছুটে আসে বিদ্রোহী বেঙ্গলের একাদশকে অভ্যর্থনা জানাতে। সে এক অবিস্মরণীয় আনন্দঘন বিরল মুহূর্ত। জনতার আনন্দ মিছিলে বিকাল ৪টা নাগাদ তাঁদের আগমন-সংবাদ পৌঁছে যায় ফরিদপুর শহরে।

ফরিদপুরের বিদ্রোহী গ্রুপ কুষ্টিয়া-যশোর প্রতিরোধ যুদ্ধের মূল নায়ক মেজর ওসমানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছেন। অস্ত্র সংগ্রহে তাঁরা দুজন দূতকে পাঠান মেজর ওসমানের নিকট। মেজর ওসমান তখন যশোর সেনানিবাস দখলের পূর্ণাঙ্গ সমর প্রস্তুতির কারণে ফরিদপুরে অতিরিক্ত অস্ত্র পাঠাতে পারেননি। উপরন্তু ফরিদপুরের অস্ত্র ও যোদ্ধা শক্তিকে বিপদের রিজার্ভ হিসাবে অক্ষত রাখার লক্ষ্যে ওসমান সংকল্প গ্রহণ করেন।

ফরিদপুরের বিদ্রোহী গ্রুপ রিজার্ভ সৈন্যের চাল বুঝতে অনীহ। তাঁরা চান সশস্ত্র যুদ্ধ ও প্রশিক্ষণ। বিকল্পের সন্ধানে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানের সাংবাদিক ভূঁইয়া ইকবাল পদ্মা চরে সশস্ত্র বেঙ্গল বিদ্রোহী হেমায়েত

উদ্দিনের সন্ধান ফরিদপুর পৌঁছে দেন। বিদ্রোহী জনতা স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে হেমায়েতকে লুফে নেয়। এভাবে সাংবাদিক ভূঁইয়া ইকবাল মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বে তাঁর বিশেষ উপকারের সংযোগ পর্বটি রচনায় বিশেষ অবদান রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমন্বয় ঃ ফদিপুরের কৃতী সন্তান ছাত্র নেতা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি জাতীয় পরিষদ সদস্য কে এম ওবায়দুর রহমান চরম বিপদের সাথী; তিনি হেমায়েতসহ দলের একাদশ সৈনিককে সাদরে বরণ করেন। হেমায়েতরা তখন কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার বৃহত্তর বিদ্রোহী দলে যোগ দিতে উসখুস করছিলেন। কিন্তু জনতা তখন একমাত্র দাবিতে সোচ্চার কণ্ঠ-হেমায়েত ও তার দলকে ফরিদপুর ছেড়ে যেতে দেয়া হবে না। যে কোন মূল্যে তাদের ফরিদপুর ত্যাগ রুখতে হবে। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতে হেমায়েত প্রস্তাব রাখেন, তা'হলে ফরিদপুর পুলিশকে মুক্তির সঙ্গে কাজ করতে হবে। ডিসি ও এসপিকে পুলিশি সহযোগিতার আশ্বাস দিতে হবে। পুলিশের সহযোগিতা পেলে হেমায়েতরা ফরিদপুর রক্ষার উদ্যোগ নিতে পারবেন। ডিসি-এসপির তখনকার মত সে প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ও ছিল না। পাক আর্মির আক্রমণের সাথে সাথে পুলিশ ফোর্স হেমায়েত কমান্ডে এসে যাবে। ডি.সি.- এস.পি. পুলিশদের মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন। যাতে তারা একই কমান্ডে যুদ্ধ করতে পারে। বহু ভাবনা চিন্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর এসপি-ডিসি হেমায়েতের এই প্রস্তাবে রাজি হন। এবার হেমায়েত একাদশ ফরিদপুর শহর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রশাসন ও দুঃশাসন ঃ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হেমায়েত বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামান্য ক'জন সৈনিক নিয়ে তিনি এলাকার সামগ্রিক যুদ্ধের দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে পারেন না। তাঁর চাই আরও অনেক যোদ্ধা, নচেৎ যুদ্ধকালীন প্রশিক্ষিত যোদ্ধারা মারা গেলে তাঁর নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী অংশে প্রচণ্ড শূন্যতা দেখা দিতে পারে। তাই প্রথমেই তিনি নতুন রিক্রুট মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন তিনি। শহরের পূর্বাংশের কমলাপুরে প্রথমটি এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণে চর কমলাপুর। হেমায়েতের নেতৃত্বে কয়েকদিন চলে নিরবচ্ছিন্ন অস্ত্র প্রশিক্ষণ।

২১ এপ্রিল পাক আর্মির হাতে গোয়ালন্দ ঘাটের পতন ঘটে। ফরিদপুর দখলে তখন ধেয়ে আসছে পাক আর্মি। হেমায়েত এবার এসপি-ডিসির পূর্ব চুক্তি স্মরণ করিয়ে দেন। পুলিশ ফোর্সকে যুদ্ধ করার জন্য মুক্তি-কমান্ডে মিলিয়ে দেবার প্রস্তাব দেন কর্তৃপক্ষের নিকটে। কি ব্রিটিশ কি পাকিস্তানি সবাই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মহাজনি পন্থায় এদেশ শাসন করেছে। এ-দেশের পা চাটা জি হুজুরদের দিয়ে শায়েস্তা করিয়েছে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের। সিরাজ-সেনাপতি মীর জাফর আলি খানকে হাত করে ইংরেজরা এ-দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। পুলিশ দিয়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিরা বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রবক্তাদের ধরে ধরে জেলে পুরেছে। স্বাধীনতার সূর্যসন্তান বিপ্লবীদের ফাঁসির মঞ্চে চড়িয়েছে পুলিশ। সেই পুলিশের আজ উল্টা সুর।

স্বাধীনতা যোদ্ধা মুক্তি-সেনাদের ধরার জন্য যেন তারা সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে ছিল। পাক-সেনারা ধেয়ে আসছে শুনে তারা এতদিনের লুকোনো নখর দন্তের থাবার ছোবল মারলেন। ফরিদপুর পুলিশের সার্বিক সহযোগিতায় ২১ এপ্রিল ফরিদপুর শহরে পাক আর্মির আক্রমণ ঘটে, অথচ এই পুলিশ বাহিনীই স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম প্রহরে লড়েছে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশলাইনসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বীরবিক্রমে, সেকথা কারও অজানা নয়।

ডি সি ইউছুফ নীরব, এসপির পিছুপা। মোক্ষম সময়ে দুর্বল মুক্তির ওপর সবলে ঝাঁপিয়ে পড়েন এসপি; এসপি+ডিসি মুক্তি-জঞ্জাল ছাফ করে নিস্পাপ হতে চায়। তারা হেমায়েতের ফোর্সকে পাকড়াও করার নির্দেশ দেয় তাদের অধীনস্ত বাহিনীকে। পুলিশ লাইন ইনচার্জ বিহারি আর আই হেমায়েতদের গ্রেপ্তারের সরাসরি নির্দেশ পান। বিদ্রোহীদের বাগে এনে ফাঁদে ফেলার জন্য নীতিনির্ধারণী আলোচনার নামে হেমায়েত ও তাঁর সাথী নিয়মিত সৈন্যদের এসপি'র বাসায় ডাকা হয়। মুক্তি-গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির মোক্ষম সময়ে 'হেমায়েত কোং' এসপির বাসায়। এদিকে, এসপির বাসায় তখন পুলিশের ঘের। ব্যাপার গুরুচরণ। বিপদে আল্লাহ আল্লাহ স্মরণ করেন হেমায়েত। মহান আল্লাহর দয়া ও রহমতে এবং উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসেই বিপদ তারণ হয় সেদিন।

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণিকের খাতিরে মরণ ফাঁদ।

হেমায়েত ব্যাপারটা শিখলেন অনেক ঠেকে। বেঈমানের ঈমানের গীত, শকুনি মামার চালকেও সব হার মানায়। এ না-হলে পাক জমানার বাঙালি প্রভু অক্ষত পুলিশ। টাঙ্গাইলের বাঘা সিদ্দিকীর হাতে তাঁরা কিছুটা বেঈমানির তেঁদর মাইরের নগদ শিক্ষা পেয়েছিলেন। পুলিশের চোরাগোপ্তা উল্লুশ কামড় কি বুঝলেন। ক্ষণিকের চিন্তায় স্থির সিদ্ধান্ত নেন, যে কোন মূল্যে পালাতে হবেই। এসপি বাসভবনের দক্ষিণ পাশের দেয়াল টপকে সটকে পড়েন হেমায়েত। দুঃশাসনের প্রশাসনের আসল নকল চেহারার পার্থক্য প্রেম ও স্বাধীনতা প্রীতির নমুনা বুঝতে পারেন হেমায়েত।

কূট চাল ব্যর্থ হতেই গণরোষের ভয়ে মীরজাফরকুল ফাঁপড়ে পড়ে যায়। মীরজাফর এসপি পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে পালানোর ধান্দায় ব্যস্ত। অবশেষে ফরিদপুর ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সপরিবারে গিয়ে গাড়িতে উঠেন। দু'চারটা উঁদুরের বাঙাল বেঈমানের পাল্লায় পুরা জাতি জিম্মি তখনো হয়নি। স্বাধীনতার প্রাণ প্রিয় সুবাতাস সবার অন্তরে। সাধারণ পুলিশগণ স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি। এস.পি.'র বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁরা বিক্ষুব্ধ। উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারের নির্দেশ মানার শৃঙ্খলে তাঁরা এ-যাবৎ চুপ ছিলেন। বীরপুংগবকে সপরিবারে পালাতে দেখে তারা নিজেদের বিপদ আঁচ করলেন। গণবাহিনী ও অতন্দ্র প্রহরী জনতার সহযোগিতায় এস.পি.'র গাড়ি ফরিদপুর বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছামাত্র এ্যাম্বুশে ফেলেন হেমায়েত।

ডিসি+এসপি পুলিশ লাইনে হেমায়েত একাদশকে ধরার নির্দেশ জারির খবরটা

চতুর্দিকে দাবানলের মত আতংক ছড়ায়। মাদারিপুরে সে খবর পৌঁছামাত্র জনতা পথে পথে সতর্ক প্রহরা বসায়। ফরিদপুর থেকে মাদারিপুর যাবার পথে ফরিদপুর বাস স্ট্যান্ডে শ্যেন দৃষ্টি রাখে মুক্তিবাহিনী। ২১ এপ্রিল সকাল ৮ টায় ফরিদপুরের ডিসি ইউছুফ আলি ও এসপি নুরুল মমিন কোং গোষ্ঠী শুদ্ধ মুক্তির হাতে গ্রেপ্তার হন। দুই প্রশাসন প্রধানকে নিজ হাতে আটক করেন হেমায়েত। পুরা পুলিশ লাইন ও থানার অস্ত্রাগারের সমুদয় অস্ত্র ছিনিয়ে নেয় জনতা। ২১ এপ্রিল, ১৯৭১ পাকিস্তানিদের হাতে ফরিদপুরের পতন ঘটে। সপরিবারে আটক ডিসি+এসপিদের দুর্গতি দেখে কে! শত শত লোকের ঢল ফরিদপুর বাস স্ট্যান্ডে। জয়বাংলার উল্লাস ধ্বনিতে জনতা বেঈমান মীরজাফরদের বিচার চায়। ঠক ঠক কাঁপেন অফিসার দু'জন। বিশ্বাসঘাতকদের মুখে রা নেই।

ফরিদপুর ক্যাপচার করতে আসা পাক আর্মিকে নগদ নজরানা হিসেবে হেমায়েত একাদশকে ভেট হিসেবে দিয়ে খুশি করতে বেচইন ছিলেন নির্লজ্জ বাঙালি ডিসি+এসপি। মুক্তি সৈনিকদের ধরিয়ে দিয়ে ছোয়াবের খোয়াবে মশগুল ছিলেন দুধারী তলোয়ারের গণদুশমনরা। পাক-শত্রু মুক্তিদের ধরে বাহবার তখমা পাবার স্বপ্ন তাদের আচমকা ভেঙে গেল। পাক-চোখে ইজ্জতের উজালা প্রমোশনের আশায় গুড়ে বালি জনতার হাতে বন্দি হয়ে। মুক্তি ধরতে এসে উল্টা তাঁরা মুক্তি ফাঁদে। জয় জনতার জয়।

সিভিল-পুলিশ অফিসার পত্নী-সন্তান সন্ততির রোনাজারিতে পাষাণ বিগলন করুণ দৃশ্য। জাত ভাই বাঙালি হত্যায় সবাইর ইতস্ততঃ ভাব। মূল মুক্তি নেতা হেমায়েতই ছিলেন তাদের টার্গেট। নারী শিশুর ক্রন্দনে তিনিও হৃদয় ঔধার্যে প্রতিহিংসা ভুলে গেলেন। অফিসার বেগম ও তাঁদের নিষ্পাপ শিশুদের মুখ চেয়ে সবার হৃদয় শাশ্বত বাঙালির মায়াময় মায়ায় ভরে যায়। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধে গেলেন না মুক্তিরা। অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশদের বিদায় দেয়া হয়। গণদুষমণদের বিচারের ভার সবাই ছেড়ে দেন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ওবায়দুর রহমানের হাতে। গোলজার, হায়দার, নুরুর মত বিশ্বস্ত মুক্তি প্রহরায় ডিসি+এসপিকে পাঠানো হয় নগরকান্দা ওবায়দুর রহমানের বাড়িতে।

পুরা ব্যাপার পর্যালোচনায় হেমায়েতের মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। প্রিয় ফরিদপুর শহরে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর তার রক্ষা ব্যবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হন তিনি। উথালপাতাল চিন্তায় পাকিস্তানি প্রতিশোধের পরিণতি ভেবে তখন তিনি পেরেশান। পাক বাহিনীকে বাধা দিয়ে আমরাও বিশেষ কিছু করতে পারব না। বরং প্রতিহিংসার কারণে ফরিদপুর শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ-যুবা বাঙালির রক্তে রঞ্জিত হবে শহরের পিচ ঢালা রাজপথ। তাই বাধার পরিবর্তে দাদাদের বৃহত্তর ফাঁদে ফেলার জন্য রণে ভঙ্গ দেন হেমায়েত বাহিনী। ২৮ এপ্রিল, ১৯৭১ হেমায়েত গিয়ে পৌঁছুলেন কোটালিপাড়া থানার আপন শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুর আবদুল গফুর মহাজন নিজেই স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা। জামাতাকে পেয়ে শ্বশুর আশ্বস্ত। ২৯ এপ্রিল

পৌঁছুলেন নিজের আবাল্য স্মৃতিজড়িত গ্রাম টুপারিয়া। এবার অদৃশ্য নিয়তি যেন জীবন স্রোত বইয়ে দিল ভিন্ন খাতে।

বন্দি উদ্ধার ঃ কোটালিপাড়া ডাক বাংলোয় আঠারজন স্থানীয় গণ্যমান্য আওয়ামী লীগ নেতা পুলিশ প্রহরায় বন্দি। ৩০ এপ্রিল প্রথম উদ্যোগে বন্দিদের পুলিশ প্রহরা থেকে উদ্ধার করেন হেমায়েত। কোটালিপাড়া থানা পুলিশ তাদের পাক নজরানার নগদ ভেট হাত ছাড়া হতে দেখে বেজায় নাখোশ। আসলে থানা পুলিশ পাক প্রভুদের নির্দেশে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আবদুল আজিজ, শেখ আবদুল গফুর সহ গোটা পঁচিশেক নেতা-কর্মীকে বন্দি করে রাখে। এ-সব ঘটেছে হেমায়েত গ্রুপের কোটালিপাড়া পৌঁছার আগেই। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বন্দি করার পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল পাক-আর্মি এলে এসব শেখ মুজিব-ভক্ত আওয়ামী লীগার ও ভারতের দালালদের তবারক হিসেবে পাকিদের হাতে সঁপে দেয়া। ইতোমধ্যে হেমায়েত গ্রুপ কোটালিপাড়া পৌঁছার খবর দ্রুত গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আরও খবর ছড়ায় যে, কান্দিতে হেমায়েত সঙ্গে করে প্রচুর গোলা-বারুদ ও অস্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে বঙ্গবন্ধুর এলাকায় যুদ্ধ করতে। কোটালিপাড়া থানার ডাক বাংলোয় বন্দিদের কাছেও এ-সংবাদ পৌঁছে যায়। থানায়/ডাক বাংলোয় পুলিশের হাতে বন্দি স্থানীয় আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি আবদুল আজিজ সিগারেটের প্যাকেটে সংক্ষেপে ব্যাপারটি লিখে পাঠান হেমায়েতকে। হেমায়েত তখন নিজ বাড়িতে আহারে রত। খবর পাওয়া মাত্রই খাওয়া ফেলে সশস্ত্র সঙ্গীদের নিয়ে তিনি বন্দি উদ্ধারে যাত্রা করেন। থানার দিকে সহযোদ্ধাদের অস্ত্র তাক করিয়ে তিনি নিজে বন্দিখানার তালা ভেঙ্গে নেতাকর্মীদের উদ্ধার করেন। উদ্ধারকৃতরা পরে হেমায়েতবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেন।

প্রাথমিক দল ঃ 'নয়ে বারি বিন্দু বিন্দু রচিত যে মহাসিন্ধু' প্রথমে মাত্র সাত জনের দল। তার মধ্যে তিনজনের নাই অস্ত্র চালনার সামরিক প্রশিক্ষণ। মূল দলের চারজনই অস্ত্র চালনায় দক্ষ। সেনা প্রশিক্ষণে ঝানু প্রাক্তন সৈনিক। কদিনের মাঝেই মনের মত যোদ্ধা-মানুষের খোঁজে চারিদিকে চলে গোপন যোগাযোগ। নরগ্রাম ও আশেপাশের মুক্তিপাগল যুবকদের সংগঠন। তারা চার দল একাত্ম হয়। হেমায়েতকে তাঁরা অধিনায়ক নির্বাচন করেন। এভাবেই অস্ত্র ও জনবলে ক্রমান্বয়ে তারা শক্তিশালী।

দোরগোড়ায় শত্রু হানা ঃ ক্রমান্বয়ে শত্রুরা অন্যান্য ছোট বড় বন্দর থানা দখলের ন্যায় নাকের ডগার কোটালিপাড়া থানায় সশস্ত্র ঘাঁটি পেতে বসেছে। অপরাপর স্থানে শত্রুর হাতে নিহত নারী-শিশু-যুবকদের ন্যায় এখানেও নিরীহ জনতার হত্যা-আশংকায় ভীত এলাকার জনগণ। বর্বর বাহিনী কোটালিপাড়ায় দু'চার গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংসের রিহার্সেল দিয়ে ইতোমধ্যে জানান দিয়েছে এলাকায়। দুই গোয়েন্দা মারফত তথ্যনিষ্ঠ খবর চলে আসে অধিনায়ক হেমায়েতের গোচরে। শত্রু শক্তিশালী হবার পূর্বেই তাদের সুদৃঢ় বাংকারের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেয়া দরকার। নতুবা স্বাধীনতাকামী জনতার মনোবলে ভাঙ্গন ধরতে পারে। পোড়া ক্ষত উপড়ে ফেলার মত থানা দখলের সিদ্ধান্ত নেয় বাহিনী অধিনায়ক।

মণিকাঞ্চন সংযোগ ঃ ১৯৬৮ সালে হাজেরা বেগমের সাথে হেমায়েতের শুভ পরিণয় ঘটে। বিয়ের একমাস পরই স্ত্রীকে নিয়ে তিনি যাত্রা করেন চাকরি স্থল পাকিস্তানের এবোটাবাদ। ১৯৬৯-এর ২৮ অক্টোবর এবোটাবাদ হাসপাতালে পুত্র হাসিব উদ্দিনের জন্ম হয়। সুখের দাম্পত্য জীবন চলছিল অপার আনন্দে যেন 'বাঁধে বাসা কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে।'

এক হাজার দু'শত মাইল দূরত্বে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশ। আর যেন থাকে না একত্রে। ১৯৭১-এর প্রথম থেকে শুরু হয় পাকিস্তান ভাঙার সহিংস খেলা। বাঙালি মাত্রেই স্বাধিকার বা স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বস্ত। পাক সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালিদের কারও কারও মধ্যে স্বাধিকার ও স্বাধীনতায় বিমুখ ছিল। স্বাধীন রক্তের হেমায়েত ব্যতিক্রমধর্মী। হঠকারী পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তিনি সদা সোচ্চার কণ্ঠ। ১৯৭১-এর মার্চ মাসের প্রথমার্ধে অভিনব কৌশলে সপরিবারে পাকিস্তান মিউজিক স্কুল ত্যাগ করেন তিনি। নিজের পয়সায় কেনা রিভলবার পিস্তলের সাথে এমুনিশন নিয়ে আসেন মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে; যেন আগেভাগেই তাঁর কাছে খবর ছিল লাগবে এসব অস্ত্র নিকট ভবিষ্যতেই। থমথমে ঢাকায় পা রেখে পড়লেন ফ্যাসাদে। হেমায়েতের বড় ভাই শামসুল হক তখন ধানমন্ডিতে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে কর্মরত। উঠলেন ভাইয়ের বাসায়। পরিস্থিতি বুঝে উভয় পরিবারকে স্থানান্তর করা হলো দেশের বাড়ি। সকল ঝঞ্ঝাট-মুক্ত যোদ্ধা এবার যোগ দেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, জয়দেবপুর।

২৫ মার্চের কালরাতের দুর্যোগে জয়দেবপুর থেকে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বেরিয়ে আসেন হেমায়েত। একাধিক বিজয় ও ব্যর্থতায় ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সৈনিক ২৮ এপ্রিল পৌঁছেন আপন জিলা ফরিদপুরের কোটালিপাড়া থানা; নিজ গ্রাম টুপারিয়া যেতেই কাল মেঘের অশনি সংকেত তাঁর সামনে।

ঢাকার নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর ততদিনে দেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে গেছে। পাক সামরিক জান্তার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য বাঙালির সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন। বাঙাল শৌর্যের দীপ্ত অহংকার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীরত্বের রণ চাতুর্য পরীক্ষিত। পাকিস্তানিরা কি ভেবে জানি না, প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলি উৎখাতে তৎপর হয়ে উঠে। যুগপৎ তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ইপিআর সদর পিলখানা ও পুলিশ সদর রাজারবাগ। ঢাকা ও তার আশপাশে কর্মরত আর্মি-ইপিআর-পুলিশের ব্যাপারে সবাই ইতোমধ্যে নিশ্চিত ইন্নালিল্লাহি পড়ে বসে আছে। এমনি অভাবনীয় দুষ্প্রাপ্য জীবন্ত বেঙ্গলের সৈনিক বাড়ি ফিরলে পরিবার পরিজনের কান্নাকাটির রোনাজারিতে এক বিয়োগ বিধুর আনন্দ-বেদনার দৃশ্যের সূচনা হয়।

পাক প্রচার মাধ্যমে রেডিও টেলিভিশন অবিরাম মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রচার চালিয়ে দালাল সৃষ্টির সুযোগ করছে। স্থানীয় জনতার চাপ হেমায়েতের ওপর পাক বিভীষণের মত হেমায়েতের চাচাতো ভাই চান মিয়া বিপক্ষের নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। হেমায়েতকে ধরিয়ে দিতে গ্রামের জনতাকে সংঘবদ্ধ করে উদ্দীপ্ত করতে তার মিটিং করা চলছে

যখন-তখন। শত্রুকে নাগালে পেয়ে চান মিয়ার জয়জয়কার। মাইকের সরব প্রচেশন পাকিস্তান জিন্দাবাদ। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাক কর্তৃপক্ষের কাছে সারেন্ডার না করলে হেমায়েতের কেয়ামত হয়ে যাবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। অন্যথায় তাঁর স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা সবাইকে পাক আর্মির হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে।

পাক দালালের তোড়জোরে ৫ মে দিন গড়িয়ে রাত এলো। হাজেরার কণ্ঠে ভিন্ন সুর। কথা বার্তায় দৃঢ় আস্থাব্যঞ্জক আত্মবিশ্বাস। অবাক বিস্ময়ে হেমায়েত দেখছেন প্রিয়তমাকে। স্বামীর আদর যতনে, পুত্র স্নেহ তাঁর অবিশ্বাস্য সোহাগের পরশ। শয্যায় যাবার পূর্বে অন্তর মন ব্যথিত প্রার্থনায় সেজদায় লুটিয়ে পড়েন আল্লাহর দরবারে। স্বামী-সন্তান, দেশ-জাতির জন্য মোনাজাত করেন তিনি। অপরূপ মোহিনী সাজে সাজলেন এই রমণী। ফাগুন হাওয়ার বাসন্তী পরশে প্রিয়তম পুত্রকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে বাসর শয্যার লজ্জা নিয়ে যেন লুটিয়ে পড়লেন স্বামীর বুকে ।

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

অন্তিম শয়নে হাজেরা

এই শোয়া কার শেষ শোয়া হবে! তাহা কি জানিত কেউ!! ঃ গভীর নিশুতির রাত। তন্দ্রাচ্ছন্ন যোদ্ধার ঘুম ভেঙে যায় পিস্তলের গুলির আওয়াজে। সুপ্ত নেকড়ে ক্ষিপ্ত তেজে লাফিয়ে উঠলেন। কিছু বুঝার আগেই অবুঝ কাণ্ড। প্রেমময়ী হাজেরার রক্তাপ্লুত 'অঙ্গের লাবনি অবনি বহিয়া যায়।' স্ত্রী হাজেরা ঢলে পড়লেন স্বামীর বুকে। শেষ ভালবাসার অনন্ত প্রণয়রাগে এক নজরে চেয়ে আছেন মন্দ ভাগ্যের নিতান্ত দুর্ভাগা স্বামীর দিকে।

প্রিয়তমার আক্ষেপের বিক্ষোভ। হায় প্রিয়তম! যুদ্ধ ছেড়ে তুমি আমার বুকে কেন? মা মাতৃভূমি স্বাধীনতার চেয়ে আমি বড় হলাম! আমার প্রেমডোরের ঘুমঘোরে তুমি বিপাকে। তোমাকে ধরতে না পারলে তোমার আত্মীয়রা আমাকে ধরিয়ে দেবেন পাক আর্মির লালসার আগুনে। বাঙালিনী কাঙ্গালিনী মরবে তবু শত্রুর সে চাল সফল হতে দিবে না। কলজের টুকরো হাসিবের নসিব আল্লাহ দেখবেন। তার প্রতি ইঙ্গিত করে আমাকে বিভ্রান্ত করো না। কত মায়ের বুক খালি হলো। কত হাসিবের হিসাব চুকে গেল পাক আর্মির গুলিতে। আমার মত হাজেরা মায়ের সন্তানই ছিল সে সব নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চারা। তোমার মত হেমায়েত বাবারা বাংলার অবুঝ বাচ্চাদের বাঁচানোর ফুরসত পায়নি। বাংলার মাটিতে অগণিত লাঞ্ছিতা মা-বোন-স্ত্রীর অপমান তোমার বুকে লাগেনি? বাংলার শিশু-যুবা-বৃদ্ধের হত্যার প্রতিশোধে তোমার রক্তের নাচন স্তিমিত কেন? আমিই তোমার যুদ্ধের পথের কাঁটা। আমার মায়ায় তুমি দুশমনের হাতে ধরা পড়বে। আমাকে ধরিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষ তোমাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে।

আত্মহত্যা মহাপাপ জানি। অবলা নারী এ-সংকটময় মুহূর্তে দেশ ও জাতির জন্য আর কি করতে পারে! একজন বীর সৈনিকের যুদ্ধের পথ দ্রুত নিষ্কণ্টক করাই আমার কাজ। আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। লা ইলাহা ইল্লাল

লাহ্ মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ...! দ্রুতসব শেষ হবার পথে। পানি পান করতে দিলেন প্রিয়তমাকে। তাঁর কথা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। 'আমার মায়ার বাঁধন কেটে গেলে তোমার বিজয় হবে।' চিরবিদায়ের অন্তিম লগনে আহা সে আরো কত অকথিত হৃদয় আকুতি।

সোয়া বছরের দুধের শিশু হাসিবের ঘুম ভেঙ্গে যায় সকলের কান্নাকাটিতে। অবোধ শিশু মায়ের বুক পড়ে লুটোপুটি খায়। এতদিনের এত আদরের মা সাড়া দেয় না। চিরদিনের জন্য এতিম-মাতৃহারা হলো হাসিব। ৫ মে, ১৯৭১ হাজেরা নাটকের বিয়োগান্ত ঘটনা।

দেশ-মাতৃকার মুক্তিপণে এক মা স্বেচ্ছা মৃত্যু বেছে নিলেন। আদ্যাশক্তি নারী এক বীর যোদ্ধাকে উদ্দীপ্ত করার অন্তিম পথ ধরলেন। আত্মবিসর্জনে এক মুক্তিযোদ্ধাকে উদ্বুদ্ধ করালেন। অমিততেজা-যুদ্ধবাজ হেমায়েত প্রেরণার তিনি নির্ঝরিণী উৎস। দেশকে তিনি কি দিতে পারলেন তার বিচার করবেন বাংলার মা-বোন। তবে এক দুর্দমনীয় যোদ্ধার সুপ্ত তেজে তিনি যে অনির্বাণ প্রেরণা সঞ্চার করলেন তারই ফলশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধের অপার বিস্ময় দুর্জয় হেমায়েত বাহিনী। পত্নী হাজেরা বেগম বেঁচে থাকলে বাংলার মাটিতে হেমায়েতের মত এমন বেপরোয়া যোদ্ধা নিজেকে আত্মঘাতী মরণজয়ী যুদ্ধে এতটা নিবেদিত প্রাণ হতে পারতো কি? সংশপ্তক হেমায়েত বাহিনী নিয়মিত পাক আর্মিকে পর্যুদস্ত করে স্বদেশ ভূমিতে আত্মশক্তির গৌরবের শৌর্যে প্রতিষ্ঠা পেত কিনা সন্দেহ।

প্রিয়তমার স্মৃতি যে মানুষকে কেমন উদ্বুদ্ধ করে তারই প্রমাণ মৃত হাজেরা। প্রেম-পত্নী প্রেরণা-দাত্রী চিরন্তন বাংলার নারী হাজেরা চিরঞ্জীব হোন।

নীরব ইতিহাস কথা কও। ইসলামের ইতিহাসে বিবি হাজেরা ও ইসমাইল এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। জিতে রহো লাখো শহিদদের রক্ত-স্নাত মুক্তিমাতা বাংলা মায়ের আদরের দুলালি মা হাজেরা। তোমার কাছে হার মানে কারবালার সখিনা। রাজস্থানের পদ্মিনী আর কৃষ্ণকুমারীরা কোন ছার! ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া-মদুনা-বীরাঙ্গনা সখিনারা তোমার আত্মোৎসর্গের দুয়ারে ম্লান হয়ে গেলেন।

স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক মাস্টার দা সূর্যসেনের মানস কন্যা প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার -এর তুমি যোগ্য উত্তরসূরি। তোমারই পাদপদ্মে লাখো মুক্তিসেনার অযুত প্রণাম। বীরাঙ্গনা মুক্তিমাতা স্মরিবে তোমারে স্বাধীন বাংলার অনাগত ইতিহাস। স্বাধীন বাংলার আজকের মা-বোন-বধূরা তোমরা কি তার কবর জিয়ারত করবে না? হাজেরার আত্মদানে কি তোমাদের অশ্রু ঝরবে না? তাঁর কবর বাঙালির সরব কান্নার মোনাজাতের অমর তীর্থ।

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতির অমিত শৌর্যে আর এক বঙ্গ নারী ইতিহাসের অমর আসনে। তিনি সেনা সার্ভিস কোরের লেঃ কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরীর পত্নী নাজিয়া ওসমান। ফোল্ডিং চেয়ার বগল দাবায় করে চুয়াডাঙ্গা ইপিআর সদর আম্রকাননে যুদ্ধ ক্লান্ত সৈনিকদের তিনি উদ্দীপ্ত করেন। নিজের হাতে সৈনিকদের ডাব পরিবেশন করেন।

প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলার নারীর নেতৃত্ব দেন। সিপাই বিপ্লবের নামে সে মহিয়সী নারীকে হত্যা করা হয় ১৯৭৫ সালে। প্রবাসী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম অমর নায়ক ওসমানকে হত্যার লক্ষ্যে আসা ঘাতকরা তাঁকে না পেয়ে স্ত্রী নাজিয়া ওসমান হত্যায় হাত কলংকিত করে। কুমিল্লা শহরে মৌলভীপাড়া পারিবারিক গোরস্থানে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিতা নাজিয়া।

ইউরোপের ইতিহাসে শত বর্ষের ব্যবধানে ফ্রান্সের বীর কন্যা 'জোয়ান অব আর্ক'-এর বিচার হয়েছে। এককালের ডাইনী জোয়ান অব আর্ক আজ শৌর্য বীর্যের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে বিশ্বব্যাপী দেবীর আসনে পূজিতা। বাংলার মুক্তি যুদ্ধের অবিস্মরণীয় নারী হাজেরা ও নাজিয়া এদেশের মাটি ও মানুষের হৃদয়-আসনে একদিন নারীর আত্মদান ধন্য নন্দিতা নায়িকার সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধার আসনে পূজিতা হবেন।

হাজেরা জিতল ঃ হাজেরার কফিন ছুঁয়ে স্বাধীনতার জন্য আমৃত্যু লড়ার শপথ নিলেন হেমায়েত। সুপ্ত বীর্যের বাঘা বাঙালি হেমায়েত কেয়ামত তক স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার কসম করলেন হাজেরার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে। জানাজার শোক সভায় বজ্রনির্ঘোষে হেমায়েত ঘোষণা করলেনঃ -

উপস্থিত গ্রামবাসী আমার স্ত্রী হাজেরার মৃত্যুর জন্য আপনারা দায়ী। সমাজের কুখ্যাত কীটরূপী চান মিয়া ও তার দোসররা দু'দিন আগে সভা করে হেমায়েতকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার উষ্কানি দিয়েছে। অন্যথায় তার স্ত্রীকে পাক জিঘাংসার লালসার ইন্ধনে ধরিয়ে দেয়ার আস্ফালনে চতুর্দিক কাঁপিয়েছে। হেমায়েত-এর মা-বাপ, শিশু পুত্রকেও রেহাই না দেয়ার ঘোষণা জাতীয় বহত্তর ষড়যন্ত্রের কারণে আজ হাজেরার মৃত্যু ঘটেছে। আমার স্ত্রী এখন আপনাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমি স্ত্রীর রক্তের প্রতিশোধ নেবই নেব ইনশাআল্লাহ।

বোবা কান্নায় ডুকরে ডুকরে কাঁদে এতিম হাসিব। প্রিয় পুত্রকে বুকে জড়িয়ে তার মায়ের নামে, বাংলার মাটির নামে, স্বাধীনতার নামে মরণ পণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন হেমায়েত। অনির্বাণ অন্তর্দাহ চাপা দিয়ে রোরুদ্ধমাণ পুত্রকে কোল থেকে নামালেন। ডুকরে কাঁদে অবোধ শিশু। বৃদ্ধা মায়ের কোলে শিশু পুত্রকে বুঝিয়ে দিলেন জাত যোদ্ধা হেমায়েত। সকলকে নিয়ে অনিশ্চিত ঝঞ্ঝা বাত্যার পথে আবাল্যের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি-ঘর ত্যাগ করলেন তিনি।

৬ মে, ১৯৭১ স্থানীয় জনসভায় জনতাকে যুদ্ধে উদ্দীপিত করেন। নেতৃত্বের যাদুস্পর্শে আমৃত্যু লড়ার প্রত্যয় শৌর্যের কিছু সাথী পেলেন। হেমায়েতের চাচাত ভাই চান মিয়া হেমায়েত বিরোধী, বাংলাদেশ বিরোধী, পাকিস্তান পন্থী ষড়যন্ত্রের নায়ক। তার কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে হেমায়েত পত্নী-হাজেরার মৃত্যু তাঁকে উদ্দীপ্ত করে। ৭ মে মুক্তির গুলিতে চান মিয়া নিহত হয়। তারই সাথে দালালির প্রতিশোধ স্মরণ করাতে দু'চারজন মার্কামারা দালালের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। স্থানীয় পুলিশ তাদের পাক সমর্থক সাঙাতের সহযোগিতায় হেমায়েতের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয় ৮ মে, ১৯৭১। পুলিশ তাদের দুষ্কর্মের সহযোগী চান মিয়াকে হারানো ও দালাল-বাড়ি

প্রজ্জ্বলনের প্রতিশোধ এভাবেই নেয়। বাস্তবে হেমায়েত নিবাস ধ্বংসের নামে পুরা গ্রাম কান্দি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সেই প্রিয়তমা হারানোর প্রতিশোধ নিতে কোটালিপাড়া থানা দখল করেন হেমায়েত ৯ মে, ১৯৭১। বিজয়ী বীরের আকর্ষণে পঙ্গপালের মতো বঙ্গ জনতা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে থাকেন। সুসংগঠিত, সংহত, সশস্ত্র যোদ্ধা হেমায়েত বাহিনীর সুশৃংখল সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়।

নিজের একান্ত চেনা মানুষটিকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেয়ার যে স্বপ্ন হাজেরা দেখেছিলেন তারই জয় হলো। তাঁর আত্মাহুতি বৃথা যায়নি। হাজেরার প্রেরণার দীপ্তিতে ভাস্বর হেমায়েতের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অভিযান। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যুদ্ধাহত বিজয়ী বীর হেমায়েতের সাথে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হাজেরা বেগমকে মুক্তিমাতার সম্ভ্রমের আসনে স্মরণ করবে এ জাতি।

চান মিয়া হত্যা ঃ হেমায়েতকে ধরতে কোটালি পাড়া পুরোটায় সবিস্তার জাল ফেলে চান মিয়া। তারা হেমায়েতকে ধরিয়ে দিতে স্থানীয় জনতার উপর চাপ দিতে থাকে। হেমায়েত উদ্দিনকে থানার হাওলা করতে তাঁর রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের ওপরও চাপ অব্যাহত থাকে, স্থানীয় জনতাকে প্রলোভিত ও প্ররোচিত করতে থানা পুলিশ বহুতর কৌশল প্রয়োগ করে হেমায়েতের হাত কড়া লাগাতে।

হেমায়েতের চাচাতো ভাই সম্পর্কিত চান মিয়াকে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে বেছে নেয় থানার কর্মকর্তাগণ। স্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধীরা চান মিয়ার নেতৃত্বে দল পাকায়। ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১ চান মিয়ারা হেমায়েতের বাড়ির পাশে দীঘির পাড়ে এক জনসভার কথা প্রচার করে। সে জনসভার রায়: হেমায়েতকে তিনদিনের সময় দিয়ে এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হোক। অথবা তাকে তার সশস্ত্র দলবল নিয়ে ঐ দিনই আত্মসমর্পণ করতে বলা হোক। তাঁর উপস্থিতিতে এলাকায় পাক-আর্মির গুলির মুখে অনেককেই মরতে হবে। পশ্চিমা সেনারা এই এলাকার সকল ঘরবাড়ি সম্পদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করবে। জনতার দাবি না মানলে তার স্ত্রী-শিশুপুত্র, মা-বাবা, ভাই-ভাবির পুরা পরিবারকে পাঞ্জাবি মিলিটারিদের হাতে তুলে দেয়ার হুমকিও জনসভায় ঘোষিত হয়। জনসভার গুঞ্জন কান কথার সবই হেমায়েত কানে আসে। এসব প্ররোচণায় প্রচণ্ড বিক্ষোভে ক্ষুব্ধ হন হেমায়েত! তাঁর অনুগত বিশ্বস্তরা চান মিয়াকে গুলিতে হত্যার অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হয়। প্রিয় সুহৃদদের ধৈর্য ধরার উপদেশ দেন হেমায়েত। দৃঢ় মনোবলের আস্থার কৌশলে নাজুক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সবাইকে শান্ত থাকতে উপদেশ দেন।

চারপাশের চাপ ও নিজেদের নিরাপত্তায় হেমায়েত পরিবারের লোকজনেরই তখন কেয়ামত দশা। ৩০ এপ্রিল, ১৯৭১-এর সকাল বেলা পারিবারিক মিটিং বসে। সবাই তাঁকে সদলে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণের জন্য আবদার করেন। এতে সব কুল রক্ষা পাবে। পাক পক্ষের অত্যাচার থেকে বাঁচা যাবে। এলাকাও বাঁচবে ধ্বংসের হাত থেকে। হেমায়েতকে নমনীয় মনে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ করতে প্রত্যেকে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালান। কথায় বলে সবার কথা শুনবে। মনের কথায়

চলবে। হেমায়েতের এবার 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি না প্রাণে বাঁচি'। সুস্তবীর্যের মানুষটি জাগলেন। পরিবারের সবাইকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন বেঙ্গল সৈনিক প্রতীক সুন্দরবনের রয়েল বেংগল টাইগার মারে বা মরে আত্মসমর্পণ জানে না। দেশকে শত্রুমুক্ত করার শপথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ক্যান্টনমেন্টে ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। সাফল্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়ব। স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে কেউ তিল পরিমাণও আমাকে নড়াতে পারবে না। এর জন্য যদি প্রাণ যায় যাবে। আমৃত্যু লড়ে যাবো। নিজের পরিবার সদস্যদের স্বমতে প্রভাবিত করতে হেমায়েত গলদঘর্ম। এ-সময় তাঁর আশপাশ বাড়ির শুভানুধ্যায়ী লোকজন এসে তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে গরমাগরমকে নরমানরমে আনতে চান। পরিবার-পরিজন আশেপাশের বাড়ির লোকজন ও গ্রামজনতার ঘেরে হেমায়েত। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে রুদ্রমূর্তির সশস্ত্র হাবিলদার ইব্রাহিম রংগমঞ্চে হাজির হন। জয়দেবপুর থেকে তিনি হেমায়েতের দেহরক্ষীর ভূমিকায়। সবাইকে শাসন কষণের তীব্র নির্দেশনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি। সবাইকে শাসন-কষণের তীব্র নির্দেশনায় মোজাহিদ হাবিলদার ইব্রাহিমের সর্বোচ্চ সরোষ-ঘোষণা। আর কোন কথা নয়। কথা না শুনলে সবাইকে গুলিতে ঝাঁজরা করার উদ্দেশ্যে রাইফেল তাক করে। ঢাকার কাপাসিয়া থানার ইব্রাহিম-এর গর্জনে মুহূর্তে জায়গা সাফ। সমাগত পরিবার-জনতা তাৎক্ষণিক স্থান ত্যাগ করেন। নাজুক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আসতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে গ্রামের গোপন আস্তানায়, সুইসাইডেল গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে চলে যান। স্থানীয় কিছু পরিক্ষিত আওয়ামী লীগ নেতাও তাঁকে অনুসরণ করেন। বেঙ্গল শৌর্যের গর্বোদ্যত অহমিকার অনমনীয় মনোভাব সবাই বুঝলেন। এমন ভয়ভীতিতে দমবার পাত্র নন হেমায়েত। চান মিয়াকে লেলিয়ে দেয়া থানার কর্মকর্তারা সুকৌশলে হেমায়েতকে শায়েস্তা করার বিকল্প পথে এগুলেন এবার।

১৯৭১-এর ১লা মে হেমায়েতের বড় ভাই শামসুল হক ঢাকা থেকে বাড়ি আসেন। তিনি তখন কাজ করেন ঢাকা রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলে। বড় ভাইয়ের আগমনে হেমায়েত-এর মনোবল তুঙ্গে। তিনি এবার পার্শ্ববর্তী গ্রামের গোপন আস্তানা থেকে বাড়ি আসেন। পরিবারের সকলকে একত্র করে ঢাকায় মানব ইতিহাসের ঘৃণ্য নরমেধযজ্ঞের পাক বর্বরতার বিশদ বর্ণনা দেন। বিদ্রোহী হেমায়েত কর্মকাণ্ডে আবেগ আপ্লুত হন বড় ভাই। হেমায়েত-কার্যক্রমের প্রশংসায় সক্রিয় সমর্থনের নিশ্চয়তা দেন তিনি। শামসুল হক পুরা পরিবারকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনতে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করান। সবশুনে ও দেখে সবাই বুঝলেন মরতে যখন হচ্ছেই, যুদ্ধ করে মরাই ভাল। এবার পুরা পরিবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার, যে কোন মূল্যে হেমায়েতকে রক্ষার এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রতিজ্ঞা নেয়। আম্মাজা হেমায়েতের মাথায় হাত বুলিয়ে মা-বাবার দুহাত তুলে দেয় ঊর্ধ্বাকাশ লক্ষ করে। পুত্রের সাফল্যে আল্লাহর দরবারে করুণা ভিক্ষা চান তাঁরা। আপন পরিবারের ছত্রছায়ায় এবার নিজেকে হালকা মনে করেন

হেমায়েত। জগদ্দল বাধার বিন্দাচল ডিঙানোর সাফল্যের মত উল্লসিত তিনি। নতুন উদ্যমে শত্রু ধ্বংসের মরণ যমুনায় ঝাঁপ দেবার প্রেরণা পেলেন হেমায়েত।

সশস্ত্র অবস্থায় হেমায়েতের গ্রামে আসার কারণেই তাঁর স্ত্রী হাজেরা শিশুপুত্র হাসিবকে নিয়ে তাঁর পুরা পরিবার অনিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকার জাঁতা কলে। হেমায়েত গ্রাম ত্যাগ করলেও বিপদ কাটিবে না। হেমায়েত-এর অবর্তমানে স্বাধীনতা বিরোধী গ্রুপ, সিটের নিচে ওত পেতে থাকা চোরাই কামরের উলুশের মত পুলিশ মোক্ষম সুযোগটি হাত করে চরম অত্যাচারে ঝাঁপিয়ে পড়বে পরিবারের ওপর। সে অনাহুত দুর্যোগ সামাল দেয়ার ভাবনায় সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন দূর অজানার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের বাড়িতে সাময়িক আত্মগোপন করা হবে। হেমায়েত গ্রাম ছাড়ার সাথে সাথে পুরা পরিবার গ্রাম ছাড়বেন অজানার গন্তব্যে। পাড়াপরশি গ্রামজনতা ভাববে সপরিবারে পালিয়েছে হেমায়েত। মৃত্যু ভয়াল যাত্রা পথের অনিশ্চিত আত্মগোপনে যাবার দুরূহ কাজটি করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেন হেমায়েতের বড় ভাই সামছুল হক।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও পনের মাসের শিশুপুত্র হাসিবকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় হেমায়েত। ৫ই মে নিশুতি রাতে হেমায়েত স্ত্রীর কাছে তাঁর করণীয় জানতে চান। নিজের শরীরগত যুদ্ধ যাত্রার অপারগতায় হাজেরার দুঃখ। স্বামীকে যুদ্ধে উদ্দীপিত করেন আজীবন লড়া স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। তিনি নিজের সম্বল পাকিস্তান থেকে আনা লোডেড পিস্তল দেখিয়ে নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে স্বামীকে জানান। স্বামীর যুদ্ধস্থল ত্যাগে বাড়ি এসে সমস্যায় জড়ানো তিনি পছন্দ করেননি মোটেই। হেমায়েতের সাথে আঁটিতে গিয়ে শত্রুকুল তাঁর পরিবারের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। বাঘিনীর মায়ায় বাঘ বশে আসবে বলে শত্রুর বিশ্বাস। পরম মমতায় স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে নিজের পিস্তলের সদব্যবহার করলেন নিজের মাথায় গুলি করে। সে রাতে ও পরদিন ব্যাপার জানাজানি হতেই বিরোধী পক্ষ তার পুরা সুযোগ নেন। হেমায়েত-এর চাচাত ভাই চান মিয়া হাজেরার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে কোটালিপাড়া থানায় পৌছেন। থানা থেকে দালাল চান মিয়াকে দিনে দুপুরের মধ্যে বিশেষ গণ্ডগোল পাকানোর বন্দোবস্ত করান। কারণ নিয়মিত পাকসেনার অস্ত্রবলের সাহায্যে হেমায়েতকে গ্রেফতারে থানার পুলিশ সাহস পাচ্ছে না। হেমায়েত গ্রুপের অস্ত্র দু'মেশিন গান, দু'এল এম জি, এক-এসএমজি, চার রাইফেলের ভয়ে ভীত থানার পুলিশ। চান মিয়ার সঙ্গী-সাথীরা সাড়ম্বরে চারিদিকে রটিয়ে দেয়, 'হেমায়েত তার স্ত্রীকে গুলিতে হত্যা করেছে'। হাজেরার বালিশের নিচে নিজের হাতে লেখা চিরকুটে, "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ-ই দায়ী নহে। আমি নিজেই এ পথে বেছে নিয়েছি। স্বামী এবং পরিবারের সকলকেই মুক্তি দেবার জন্যই এ কাজ করেছি-----"। এমনিতর জীবন্ত প্রামাণ্য মৃত্যুপরোয়ানার দলিল বেমালুম চেপে যান চান মিয়া গ্রুপ। গ্রামজনতাকে একত্র করে চান মিয়া প্রতিবাদের ব্যবস্থা করে। তার ইঙ্গিতের পোষ্যরা সুনির্দিষ্ট স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্যেই এমন জমায়েত। যাতে ব্যাপক গোলযোগ-হট্টগোলের সংবাদে অস্ত্রে সজ্জিত হেমায়েত গ্রুপ অকুস্থলে আসবেন। পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে তখন পিছন থেকে হেমায়েত গ্রুপকে ঘেরাও করে ধরা হবে।

আগাম ব্যবস্থাপনায় বেলা নটা নাগাদ বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র গ্রামবাসী জমায়েত হয়ে কেয়ামতের আলামতের মত চিৎকার, হৈ হুল্লোড়, দেশী অস্ত্র লাঠি-শোটা, বল্লম, রামদা, তীর ধনুক সজ্জিত প্রতিটি সশস্ত্র জনতার হাজার খানেক জনতা। হাজার জনতার সশস্ত্র বলে বলীয়ান চান মিয়া শক্তি প্রদর্শনের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। চরম অরাজকতার জোর যার মুল্লুক তার পাক নীতিতে চান মিয়ার জয়জয়কার। তার সাহায্যে আশপাশ গ্রামের মত্ত মাতঙ্গের মত বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র জনতা ছুটে আসে। বিপক্ষ হেমায়েতের বাড়ির উত্তর পাশের একখণ্ড ধানি জমির পাকা ধান কেটে নিতে থাকে চান মিয়া গ্রুপ। হেমায়েত-এর ভাই নজির হোসেন খালি হাতে তাৎক্ষণিকভাবে দৌড়ে যান ঘটনাস্থলে। অন্যায়ভাবে জমির ধান কাটা বন্ধ করতে বিপক্ষদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। এমনি সুযোগে বিপক্ষের রণাংগনে আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন চান মিয়া। এবার তিনি দলবল নিয়ে নিরস্ত্র নজির হোসেনের ওপর আক্রমণ চালান। হেমায়েত-এর যুদ্ধসঙ্গী ইব্রাহিম রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে হেমায়েতকে আক্রান্ত ভাই বাঁচানোর গুরুতর সংবাদ জানান। স্পর্শকাতর স্ত্রী হারানোর বেদনার অশ্রুসিক্ত হেমায়েত নিমিষে শোকাশ্রু মুছলেন। প্রতিশোধ প্রতিকারে নিজের লোডেড এসএমজি ফায়ারিং পিনে চড়িয়ে ভাইয়ের উদ্ধারে জোর কদমে দৌড়ে এলেন যুদ্ধস্থলে। এবার আসল প্রতিপক্ষের দলের নেতাকে রণস্থলে পেয়ে শত্রুপক্ষের রণদামামা তুংগে। সশস্ত্র হেমায়েত পাকা ধানে ছাইয়ের মত ধান কাটা জমির আইলে পৌঁছতেই চারিদিকের বাড়িঘর থেকে শত শত জনতার ইসলামি জোশে রণসঙ্গীত, "নারায় তকবীর আল্লাহু আকবর"। জংগে ওহোদ, কারবলার তেজে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, দীন ইসলাম জিন্দাবাদ ধ্বনির মহারবে জঙ্গি জনতা হেমায়েত গ্রুপদের ঘিরে ফেলতে ধেয়ে আসে। সশস্ত্র হেমায়েত সাথীরা পূর্ব প্রস্তুতির অনড় পায়ের রণাঙ্গনে দল নায়ক হেমায়েত স্বয়ং আপন রক্ত সম্পর্কের চাচাত ভাই চান মিয়াকে এমনি বেয়াকুবের মত সংঘাতের অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার আবেদন জানান। সোজা আংগুলে ঘি না উঠলে বাঁকা আংগুলের গুলি চালাবেন বলেও চান মিয়াকে সতর্ক করে দেন। চান মিয়া তার আসমানের চাঁদ প্রেরণাতায় উচকানির সশস্ত্র পুলিশের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। পুলিশ বাবারা মুক্তি বাবার থাবা থেকে চান মিয়াদের বাঁচাতে এই এলেন বলে। এমনি তো উৎসাহের মাঁত্তে ডাকে পুলিশের আসার কথা। পুলিশের হস্তক্ষেপের একান্ত বিশ্বাসের আস্থায়-উল্টা বুঝিলি রাম। পুলিশ তাকে বুঝিয়েছিলো একটা খুনাখুনির রক্ত গঙ্গা না বইলে তো আর পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাই তিনি এবার সত্যি সত্যি রক্তা-রক্তিতে লাগলেন। এক রাম দার কোপ বসিয়ে দিলেন হেমায়েতের মেজো ভাই নজির হোসেনের ওপর। এসএমজি'র বাইরে স্ত্রী হাজেরার লোডেড পিস্তলও ছিল হেমায়েতের হাতে। তাৎক্ষণিক অব্যর্থ নিশানার সৈনিক ছাড়লেন পিস্তলের গুলি চান মিয়ার ডান হাত লক্ষ করে। গুলিবিদ্ধ জখমের হাত থেকে খসে পড়ে ঘাতক চান মিয়ার রাম দা। একই গুলি চান মিয়ার হাত ছেদা করে তার পিছনে দাঁড়ান ছোট ভাই সোহরাবের হাতেও আঘাত হানে। পাক দালালদের নিমক হালাল করতে চান মিয়ার তখনো নতি স্বীকারের,

অন্যদের যুদ্ধ বিরতির নির্দেশের লক্ষণ নাই। তার যুদ্ধংদেহী রক্তাক্ত হাত নেতিয়ে পড়লেও অপর হাত তড়পাচেছ যুদ্ধনির্দেশনায় সাথীদের প্রেরণা যোগাতে। দালালদের দালালি, পাকপ্রেরণার খোশ নসিব পাকিস্তান জিন্দাবাদের লুটেরা চান মিয়ার মনোবলের প্রশংসা করতে হয়। শত্রুর নিপাত করতে পাক ট্রেইন্ড সৈনিক হেমায়েত ছুঁড়লেন রিভলবারের দ্বিতীয় গুলি চান মিয়ার বুকের সঠিক নিশানায়। নিকট দূরত্বে রক্ত ঝরা হাতের চান মিয়া তাৎক্ষণিক পাক জমিনে লুটিয়ে পড়ে। দুই বীর যোদ্ধা ভাইর গুলিতে রক্ত ঝরতে দেখে সশস্ত্র গ্রাম জনতা চরম উত্তেজনার শোরগোলে মেতে ওঠে। "নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ" ধ্বনির জংগনামায় তারা জোর কদমে সামনে বাড়েন। পরিস্থিতির সামাল দিতে মোজাহিদ হাবিলদার ইব্রাহিম তাঁর লোডেড মেশিনগানের গুলি আকাশে ছুঁড়েন। তরতাজা দু'গুলিবিদ্ধ ভূমিতে লুটায়। তার ওপর আবার প্রাণান্তক প্রাণের তাজা গুলি আকাশে। গুলির চোঁ শোঁ আওয়াজে মত্তমাতংগের জংগি জনতা থমকে দাঁড়ায়। ঠাটা মারা ব্যাঘ্র গর্জনের সর্বোচ্চ কণ্ঠের হুশিয়ারির সতর্কতায় হেমায়েত জনতাকে, "তারা যদি আর এক পাও সামনে এগুতে চেষ্টা করে তা হলে তিনি মেশিনগানের গুলি আঘাতে তাদের সকলকেই হত্যা করতে বাধ্য হবে না।" গুরু বিদ্যায় দীক্ষা নেয়া মুজাহিদ। ইব্রাহিম ওস্তাদের আদেশ-তামিলের কাজে লাগলেন। ফিরতি পথে মুহূর্তেই ইব্রাহিমের মেশিনগান গর্জে ওঠে। হল্লারত জংগি গ্রামজনতার ওপর দিয়ে সবিরাম কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়তেই হাওয়া উল্টে যায়। জনতা বুঝতে পারেন উন্নত মরণাস্ত্রের হাতে তারা অসহায়। যতই যুদ্ধ প্রেরণার যোশ থাকুক প্রাণে বাঁচতে তাঁদের ভোঁ-দৌড়। স্বল্প সময়ে পুরাগ্রাম জনশূন্য। মৃতের প্রতি বেরহম হতে পারলেন না হেমায়েত গ্রুপ। কবর খুঁড়ে শরিয়ত মোতাবেক দাফনের ত্বরিৎ অকুস্থল ব্যবস্থা নেওয়া হলো। এ-যেন বেনিপোড়া হিন্দুর দেহ দাহের মত। তবু যৎসামান্যই মৃতদেহের দাফনের সৎকার হলো।

হেমায়েত এবার সসংগী পিঠাবাড়ি গ্রামে উঠতেই হিন্দু সংখ্যাধিক্যের গ্রামে থরহরি ভূমিকম্পের আতংক দেখা দেয়। মুসলমান গ্রামবাসী পাকিস্তান ভাঙ্গার বাংগাল সৈনিকের অবস্থান ভাল মনে গ্রহণ করেনি। অপরদিকে, হিন্দু-মুসলমান দুদলেরই পাক আতংকের দিশেহারা দশা। আশার আলো হিন্দু যুবক শ্রেণী-গোপনে সাহায্যের জন্য শপথ নেয়। দু'কুল শামলাতে পিঠাবাড়ি গ্রামের পিঠার মজা ছেড়ে রাতারাতি পাশের হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে আশ্রয় নেন হেমায়েত।

পাক পুলিশ চান মিয়াকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। পরদিন একশ পঞ্চাশ জন পাক পুলিশের সশস্ত্র সদম্ভ উপস্থিতি হয় হেমায়েত-চান মিয়ার গ্রাম কোটালিপাড়া। প্রতিপক্ষশূন্য খেলার মাঠে পুলিশের ফ্রি ওয়াকওভার। হেমায়েতও তাঁর অনুগতদের বাড়ি ঘর লুটপাটের পর ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরদিন নিজের গ্রাম বরাবর আগুন দেখে গুপ্তচর পাঠান সঠিক তথ্য জানতে। ঘণ্টা দুয়েকের মত পাক পুলিশ বর্বরতায় লুট-অগ্নি সংযোগের তথ্য ও সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পান হেমায়েত। উত্তেজিত প্রতিশোধ প্রতিকার থেকে সবাই হেমায়েতকে নিবৃত্ত করেন।

এবার অঘটনের হোতা চান মিয়ার সাঙাতদের খোঁজে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু হয়। তার আস্থাভাজন ও সাথীদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে আগুন লাগানো হয়। প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসার আগুনের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন হেমায়েত। সেদিন দুপুরের খাবার খেয়েই পরবর্তী আত্মরক্ষা, আত্মগোপন ও প্রতিরোধ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। সমর সাথী ও পরিবারের সাথে আলোচনাক্রমে গ্রাম ছেড়ে পালানোর সর্বসম্মত মতামত গৃহীত হয়। সাঁঝের আঁধার নামতেই গ্রাম ছেড়ে দূরদূরান্তের গ্রামে আত্মীয় বাড়ির আশ্রয়ে ছুটলেন পুরাপরিবার ও যুদ্ধসাথীরা। বিজয় উন্নত পুলিশকে অ্যামবুশের পরিকল্পনা থেকে বহু কষ্টে হেমায়েতকে দমিয়ে রাখা হলো। কিছু সহজ সুযোগকে হাতছাড়া করে বিপক্ষকে স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ দেয়া পরবর্তী বৃহত্তর মওকার জালপাতে মুক্তি।

যোদ্ধার হাত ঘাতকের হাত। রক্তাক্ত খুনির হাত। সংযত যোদ্ধার হাতই বিজয় ছিনিয়ে নেবে। যোদ্ধা হেমায়েতের বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যা ও প্রতিপক্ষ হত্যায় হাত রাঙানোর অভিযোগ আছে। পুলিশের রিপোর্টই যদি সব চলত তবে আদালত বা হাকিমের প্রয়োজন হতো না। পুলিশ হেমায়েতের বিরুদ্ধে দু'খুনের মুখরোচক অপবাদ সাজায়। পাকিস্তান আর্মি, বাংলাদেশের মোহাজের বিহারি, বাঙালি দোঁআশলা রাজাকার-আলবদর-আল শামসরাই শুধু বাংলাদেশে হত্যা লুট-অগ্নি সংযোগের জন্য দায়ী নয়। তার বাইরেও স্বজন বৈরী মীরজাফর তৈরি করে বাঙালির ঘরে ঘরে আগুন লাগানোর কেমন সর্বনাশা খেলায় মেতেছিল পাক নেক বক্ত বাঙালি পুলিশ তারই জীবন্ত নমুনায় চান মিয়া হত্যা অধ্যায় বর্ণিত হলো। চান মিয়া সাঙাতরা পাকিস্তান জিন্দাবাদে জংগি জনতার সহায়তায় পরের জমির ধান লুটে নেবে। পাকিস্তান জিন্দাবাদের রোষে নিরস্ত্র প্রতিপক্ষকে রামদার কোপে শেষ করবেন!! তারপরও বিপক্ষ দল পাকিস্তান রক্ষায় খামুশ থেকে হত্যাপর্ব মেনে নেবেন!! কি পাক আর্মি আর পাক পুলিশের কারও পক্ষেই এমন ভাবাটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

আত্মহননে কোন জাতিকে যতই লেলিয়ে দেয়া হোক, একদিন তারা জাগবেই। ভারত ও বাংলার সাম্প্রদায়িক হানাহানির হিন্দু-মুসলমান-শিখ দাংগা লাগিয়ে ব্রিটিশ পাত্তা পায়নি। লেজ গুটিয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে প্রাণ নিয়ে সাদা চামড়া সাগর পাড়ি দিয়েছে। পাকিস্তানিদের হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি -অবাঙালির রক্তগঙ্গার উচ্চাকাঙ্ক্ষা উতরে এসেছে সোনার বাংলার স্বাধীনতা। নেতা নয়, দেশ বড়। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছে। বিজয় এসেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়েছে।

পৃথিবীর মুক্তিকামী ছোট শক্তির স্বাধীনতাপ্রেমী যোদ্ধারা আত্মহনন ত্যাগে একত্র হলে বিজয় সুনিশ্চিত। যেমন হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে। মুক্তিপাগল যোদ্ধারা বাংলার মুক্তিসেনার আত্ম-উৎসর্গের প্রেরণায় আপনারা দিক নির্দেশনা পেতে পারেন।

রেফারেন্স :

ক। একান্ত সাক্ষাৎকার - হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম।

খ। মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী - লে: কর্নেল এস আই নুরুন্নবী খান, বীর বিক্রম।

হাজেরার হাজিরা ঃ প্রিয়তমা পত্নী হাজেরা আত্মবলিদানের মাধ্যমে হেমায়েতকে শক্তিমান করে গেলেন। প্রিয়তমার চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমির আজাদি। ৫ মে হাজেরার মৃত্যু। ৬ মে স্থানীয় জনসভা। ৯ মে স্ত্রী হারানোর প্রতিশোধে প্রথমবারের মতো স্থানীয় কোটালিপাড়া থানা দখল। এবার মুক্তিবাহিনী সংগঠনের বিরামহীন প্রস্তুতি।

ফরিদপুরের প্রাথমিক অবস্থানকালে অভ্যন্তরীণ প্রভাব বলয় কামারখালি ফেরিঘাটের

নিম্নলিখিত থানায় ছড়িয়ে পড়ে ঃ

ক। বোয়ালমারি।	ঙ। পাংশা।	ঝ। টেকের হাট
খ। আলফাডাংগা।	চ। গোয়ালন্দ।	ঞ। রাজৈর
গ। বালিয়া কান্দি।	ছ। ভাটিয়া পাড়া।	
ঘ। রাজবাড়ি।	জ। ভাঙ্গা	

হেমায়েতের নেতৃত্বে এসব থানা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি মুক্তিযোদ্ধারা সংহত হয়। তখন প্রতিবোধ গ্রুপ মুক্তিযোদ্ধাদের সাধারণ নাম ভলান্টিয়ার পার্টি। এসব সিংহ হৃদয় ভলান্টিয়ার পার্টিই শেষ নাগাদ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার হার্ডকোর বা আত্মঘাতী বাহিনীর মরণ-মারণ শক্তিতে পরিণত হয়। অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ সংগঠনে প্রাথমিক বিভীষিকার কালরাতের ক'জন অত্যুতশাহী বীর :

ক। বালিয়া কান্দির এম পি শ্রী গৌরচন্দ্র বালা,

খ। সিরাজ মৃধা,

গ। আলফাডাংগার এম. এ. মান্নান (মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত) [আগস্ট ২০০৩ সালে তিনি পরলোক গমণ করেন : সূত্র মোঃ আজাদ আলী, বিপি],

ঘ। কাওসার কমান্ডার,

ঙ। বোয়ালমারির জাফর দুলাল, এবং

চ। হেমায়েতউদ্দিন (পরবর্তী বীর বিক্রম)।

ব্যক্তি বিশেষের চাইতে গণশক্তির সম্মিলিত কার্যক্রমে হেমায়েত বাহিনী অতি শীঘ্র বাংলার মাটিতে শিকড় গাঁড়ে। জনতা যেন প্রতিরোধ তৈরিতে সহযোগিতার জন্য এক পায়েই খাড়া ছিল। বারুদে অগ্নি সংযোগের মতো উপযুক্ত নেতৃত্বের খোঁচাটার অপেক্ষায় ছিল মাত্র। হেমায়েতের সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দীপ্তি ইতিহাসের আর এক কালজয়ী সন্তানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনিও ফরিদপুরেরই অমর সন্তান। অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। প্রথমে তিনি বাংলার মুসলমানদের ইসলামের আদি তরিকায় ফিরিয়ে এনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করতে আন্দোলনে নামেন। স্থানীয় অত্যাচারী জমিদার ও বিদেশী বেনিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুগপৎ তিনি সংগ্রাম করেছেন। গরিবের পক্ষ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সংগ্রাম। ইতিহাসে তাঁর আন্দোলন ফরায়জি আন্দোলন নামে খ্যাত। তাঁর ন্যায় বিচার

ও চরিত্র মাধুর্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিপীড়িতরা এক পতাকাতলে সমবেত হন। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতাযোদ্ধা ফরিদপুরের এই কিংবদন্তির নায়ক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের নাম হাজি মোহাম্মদ শরিয়তউল্লাহ। ইতিহাসের সূত্র ধরেই স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে রক্তস্নাত স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরিদপুর অঞ্চলে নেতৃত্বের গৌরবে এগিয়ে এলেন ফরিদপুরের অপর এক কৃতী সন্তান হেমায়েত উদ্দিন। আজো ঝঞ্ঝা বাত্যা বিধ্বস্ত মানুষটি জীবিত। মানুষ মাত্রই আয়ুষ্কালে বিতর্কিত। জীবনকালে মহান নেতৃত্বের মূল্যায়ন প্রশংসায় আমরা অনীহ। অনাগত ইতিহাসের কাছে হেমায়েতের সঠিক মূল্যায়নের ভার রইল। এ-গ্রন্থ ইতিহাসের মাল-মশলার উপাদানসমূহ বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষার একটি উদ্যোগ মাত্র।

মানুষ বাঁচলে দেশ। যুদ্ধ সংগঠনের সাথে নির্যাতিত জনতাকে রক্ষা, তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের উদ্যোগ নেন হেমায়েত। যুদ্ধ প্রস্তুতির সমান্তরাল চলে জনতাকে রক্ষার তাঁর জন-কল্যাণ-কার্যক্রম। সবকিছুর অন্তরালে একটা অদৃশ্য হাত তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। বাইরে যত লাফ-ঝাঁপ মারুন না কেন অন্তরে ও অন্তিম বিচারে তাঁর মমতার মন নারীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসায় দুর্বল ছিল। তাঁকে ধরিয়ে দেবার বাঙালি অফিসারদের স্ত্রী পুত্রদের কান্নায় তিনি সংযত হন। তাঁকে হত্যায় উদ্যত বিধর্মী তন্বী নারী একাধিক বিচার ও পুনর্বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। বিশেষ ক্ষমতাবলে আপন হত্যাকারিণীকেও হৃদয়-ঔদার্যের পরাকাষ্ঠায় তিনি ক্ষমা করেন। নারী বাহিনী সংগঠন, আর্তের সেবায় হাসপাতাল, মৃত্যুর মুখেও যুদ্ধাহত মানুষটির চিকিৎসার জন্য বিদেশের মাটিতে পা রাখতে অস্বীকৃতি, সবকিছু যেন অবাক করা নির্বাক কাণ্ড! "০৫ মে স্ত্রী বিয়োগের পর দেশপ্রেমের মাঝেই আমি নিজকে ডুবিয়ে দেই।" ভয়ভীতি, মরা-বাঁচা, সর্বপ্রকার মানবিক মানসিক দুর্বলতা ঝেঁটিয়ে বিদায় জানান তিনি। জীবন-মৃত্যু পায়ের নৃত্যের খেলা চলতো সবিরাম অবিরাম। এতদিনের চেনা-জানা মানুষটির এমন অভাবিত দুঃসাহস দেখে অনেকে হতবাক। ঢাকা-বরিশাল রুটে শিকারপুরের ফেরি উড়িয়ে পাক-শিকারিদের দেখিয়ে দেন বাঙাল মাইর কারে কয়! মাছের ঝুড়ি মাথায় জেলের ছদ্মবেশে পাক আর্মির ক্যাম্প রেকি করেন হেমায়েত। সশস্ত্র পাক আর্মির বাস থেকে বিপন্ন বন্দি জনতাকে রক্ষায় মরণবান আঘাত করেন তিনি। আকস্মিক আঘাতের পাল্টা আঘাত প্রতিহত করে বিপন্ন নারী-শিশু-যুবা-বৃদ্ধের উদ্ধারকারী দেশ-মাতৃকার প্রতি নিবেদিত এক আত্মঘাতী মুক্তিযোদ্ধার নাম হেমায়েত। একান্ত বিশ্বাসের আত্মঘাতী মুক্তি সাথীরা পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি আক্রমণের নবতর উদ্ভাবনী চাতুর্যের ক্ষিপ্রতায় চমৎকৃত ও আশ্চর্য হতেন। শত্রুর চোখে তিনি ছিলেন চলন্ত জ্বলন্ত বিভীষিকা।

বৃক্ষ তোর নাম কি, ফলেন পরিচয়তে। নামের চেয়ে কামে যোদ্ধার প্রতিষ্ঠা। নির্লোভ সততা, দুর্জয় দুঃসাহসের মালা ভূষণ তাঁর নেতৃত্ব। মৃত্যুপণ যুদ্ধের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ মন্ত্রমুগ্ধ সাথীরা তাঁকে নেতার আসনে বরণ করেন। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকার দুর্যোগে সঙ্গীসাথী সহযোদ্ধা ও জনতার চোখে পার্টি কমাণ্ডারের মূল্য অপরিসীম। পার্টি কমাণ্ডারের শাহাদতে সে পার্টির চেহারাই পাল্টে যেত। সে পার্টি

নতুন রূপের ধ্যান-ধারণার আত্মঘাতী দীক্ষামন্ত্রে উদ্দীপ্ত হতো। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বিপন্না নারী মাত্রই হাজেরার রূপে হাজির হতো হেমায়েত অন্তরে।

শরণার্থী স্মরণে ঃ ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীর সংখ্যা শেষ পর্যায়ে এক কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থায়ী-অস্থায়ী শরণার্থীর সংখ্যা তার দ্বিগুণেরও বেশি। আজকের বাংলাদেশ সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান। সেদিন এদেশে যে-সব বাঙালি বসবাস করতেন আজও তাঁরাই বাস করছেন। সবাই বাংলায় কথা বলেন। সুখে-দুঃখে আত্মীয় হেন মিলেমিশে ছিলেন। তবু কেন সোনার বাংলার সোনার মানুষ স্বদেশের ভিটে-মাটি ছেড়ে ভারতের মাটিতে শরণার্থী ক্যাম্পে হাজিরা দিল? ব্রিটিশ সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক হানাহানির মুখে যারা এদেশ ছাড়েন নি, পাকিস্তান সৃষ্টির পর্বে স্বার্থান্বেষী লুটেরার হাত উতরে যারা দেশের মাটি কামড়ে রইলেন, তারা কেন স্বদেশ ছাড়লেন মুক্তিযুদ্ধের সময়ে? দেশের ভিতর এক এলাকা ছেড়ে মানুষ কেন অন্য এলাকায় আশ্রয় নিল? সশস্ত্র পাক আর্মির প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে হত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংসের কারণে এলাকা ছাড়ার, দেশ ছাড়ার যুক্তি থাকতে পারে। যেখানে পাক আর্মি যায়নি, যাবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না সেখানকার মানুষ ঘর-বাড়ি প্রিয়জনসহ কেন পালাল?

পাক আর্মিকে কে গিয়ে বাঙালির খবর দিল? কার ঘরে সুন্দরী যুবতী তন্বী আছে? কে মালদার হিন্দু? কে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগার? কে মুক্তিবাহিনী? কে মুজিবাহিনী সংগঠন করে, ভারতে আসে যায় এ-সব তথ্যাদি স্বাধীনতার শত্রুদের দেয়?

কেন সেদিন ভাই ভাইকে, ছেলে বাপকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতো? কিভাবে এক বাঙালি অপর বাঙালির বোনকে সজ্ঞান বিবেকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেয় ধর্ষণের ইজ্জতহানির নির্মম নিষ্ঠুরতায়। এমনি হাজারো প্রশ্ন আজো অনেকের মন তোলপাড় করে। দেশপ্রেমিক অগণিত জনতার মাঝে হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ ছিল না বললেই চলে। পাকিস্তান পন্থী মুষ্টিমেয় বাঙালি 'মালাউন' নামের আখ্যায় হিন্দুর উপর লুটপাটের তাণ্ডব চালায়। পাক আর্মির নিকট সান্নিধ্যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগানের জয়গানে বিধর্মীর সম্পদকে মালে গণিমতের প্রাপ্যরূপে জবর দখলে লাগে। হিন্দু এলাকা লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণ, বাস্তুভিটা ত্যাগে বাধ্য করে অমুসলমানের ঘর-বাড়ি সহায়-সম্পত্তি দখল তারই ফলশ্রুতি। অরাজকতা সৃষ্টিতে লুটতরাজের ইঙ্গিত যোগানে বেশি লোক লাগে না। আইন শৃংখলার অভাবে লুটেরা ঠগি সৃষ্টি সহজ। ধর্মের নামে, ইসলামের নামে, পাকিস্তান রক্ষার নামে পরনারী ও পরসম্পদ মালে গণিমত দখলের নামে বিতিকিচ্ছিরি পাপের ফল সারা দেশে শরণার্থীর খেলার মেলা। ঠুলি পরা বাঙাল ভুলাতে বিদেশী প্রভুরা প্রথমে হিন্দুর সম্পদ দখলে বাঙালি পেয়ারদের লেলিয়ে দেন। সে লুটের সিংহ ভাগ কালনেমির লংকা ভাগের মতো পাক প্রভুরাই হাতিয়ে নেয়। প্রথমে হিন্দুর সম্পদ লুট। পরে পাক দুশমন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগারের সম্পদ লুট। তারপর দুষ্কর্মের হোতা ভারতের অনুচর বিচ্ছুর বাচ্চা হিন্দুজাদা মুক্তিবাহিনীর যা পাও লুট জ্বালাও পোড়াও। তখন বাঙালি মাত্রেই পাকিস্তানের শত্রু; তাদের নিশ্চিহ্ন কর। পাক পেয়ারের অনেক দালালও শেষ রক্ষা করতে পারেননি।

অনেক দালালের জ্ঞান নেত্র উন্মিলিত হতে, নূরানি পাক চেহারার অন্তরালের না-পাকি চেহারার মরতবা বুঝতে সময় লেগেছে।

নির্লজ্জেরও কিছুটা লজ্জা থাকে, বেহায়ারও কিছুটা হায়া থাকে। এদেশে কয়েক যুগ বাস করেও বিহারি, ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমান বাংলাদেশকে আপন ভাবতে পারেনি। বিহারিরা এদেশে উর্দু অধ্যুষিত বিহার শরিফ স্থাপনের খোয়াব দেখতো। বিহারি ও অবাঙালি এদেশে মোহাজের সূত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের নাগরিক, বাঙালি পদচাটা দোসররা এ-দেশের পরিত্যক্ত সম্পদ আত্মসাতের লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন পাক সরকারের কাছে। পরিত্যক্ত সম্পত্তি অবাঙালি ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের পুনর্বাসনে কাজে লাগানো হোক। এদেশের মানুষের উপর ট্যাক্স বসিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবাঙালিদের পেনশন দেয়া হোক। এদেশ ত্যাগী ভারতে আশ্রয় প্রার্থী কাফের হিন্দু ও কমজোর ইমানের বেইমান মুসলমানদের স্থান পূরণে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সাচ্চা দিল মুসলমান আনা হোক। তারা নাপাক পূর্বপাকিস্তানিদের ইমানদার এলেমদার মুসলমান বানাবেন। বাঙালি নারীর পেটে সাচ্চা দিল মুসলমান পয়দায়েশের জন্য তারা পাক সৈন্যদের জন্য বাঙালি নারী জায়েজের ফতোয়া দেয়। পুরা প্ল্যানটা যেন ইহুদি শূন্য জার্মানির আর্যায়নের মতো। এদেশে আগমনকারী-উর্দুভাষীদের না হয় এ-দেশকে পর ভাবার কারণ থাকতে পারে। কিন্তু দেশী দালাল পাক দোসররা বিদেশীর খপ্পরে লোভের পা রাখা অভাবিত মনে হয়। এসব লুটেরা দমন, শরণার্থী রক্ষা, নির্যাতিত নর-নারী রক্ষায় যুদ্ধের উন্মাদনার মাঝে নিপীড়িত নির্যাতিত আর্ত জনতার ডাকে হেমায়েত সাড়া দিতেন। তাঁর কোমল অন্তরের দুর্বলতা ছিল নারী নির্যাতনের প্রতি। দুঃস্থ মা-বোন, নির্যাতিতা নারীর নামে দিকবিদিক হিতাহিত জ্ঞান ভুলে উল্কা বেগে শত্রুর ওপর আপতিত হতেন হেমায়েত। অবলা নারীর আর্তনাদ তাঁর মানস পটে ভেসে উঠতো একটি প্রিয়তম মোহন আনন হাজেরা। শয়নে স্বপনে হাজেরা-স্মৃতি সর্বত্র তাঁকে প্রেরণা দিত, শক্তি সাহস যোগাত। চরম হতাশার মাঝেও প্রিয়তমা হাজেরা যেন তার চালিকা শক্তি।

হেকমতে হেমায়েতকে শেষ কর ঃ বাঙাল দুষ্কৃতকারী, পাক আতংক সন্ত্রাসী হেমায়েত শত্রু-চোখে এক বিভীষিকা। যুদ্ধ শুরুর পর তাঁর সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ পেত হাতে গোনা গোটাকয় অতি বিশ্বস্ত অনুচর। বাস্তবে শত্রু-মিত্রের চেনা জানার বাইরে থাকতো হেমায়েত। সকলের প্রতি কঠোর হলেও নির্যাতিতা মা-বোনদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা সবাই টের পেলেন। 'পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে'র মতো শত্রু তার সুযোগ নিল। বার বার হেমায়েতের হাতে দুর্বার মার খেয়ে পাক আর্মি ও তার দেশী দোসররা দিশেহারা বিভ্রান্ত। দালাল সৃষ্টির ব্রতে কৌশলে দলপতি হেমায়েতকে হত্যার হীন ষড়যন্ত্রে মাতে প্রতিপক্ষ।

বাঙালির ষোল চুংগা বুদ্ধির বেশির ভাগ কূটকৌশলে মাথা খেলে মানুষের রক্ত চোষা উলুশের মতো কোটালিপাড়া থানার পুলিশের দারোগা আব্দুল বারি জোয়ার্দার মুক্তি নেতা হেমায়েতের হত্যা-পরিকল্পনার মূল হোতা। আজীবন থানার ইনফরমার এক

হিন্দু দালালকে দিয়ে হত্যা পর্বের কলকাঠি নাড়ান থানার ওসি। স্থানীয় দালালরা মিলে এক অনিন্দ্য সুন্দরী ষোড়শী তন্বীকে ঠিক করেন। সে অপরূপা রূপসী হিন্দু কন্যা যেন অনাঘ্রাতা কানন কুসুম। সে কি পাগল করা রূপ! তার দিকে চাইলে মন ফিরান যায় তবু চোখ ফিরে না। মুনি জনমনলোভা কমলাবতী সুন্দরীকে একলক্ষ টাকার প্রলোভনে হেমায়েত-হত্যার ফাঁদে ফেলা হয়। কমলার মা-বাবাকে হাত করে সূক্ষ্ম সুতার জাল বুনা হয়। এদেশে তখন হিন্দুর নাভিশ্বাস দশা। হিন্দুর ওপর জোর জুলুমের অত্যাচারের কাহিনী শুনলে সবার মন গলে যায়। তায় আবার সমাতা বিপন্না হিন্দু নারী হেমায়েত-এর স্মরণাপন্ন!

বৃদ্ধা মাকে সঙ্গে করে পদ্মকোরক ভুবন মোহিনী মোহজালের মায়াপাশে মুক্তি দলপতির সঙ্গে দেখা করতে আসেন কমলাবতী। ক্যাম্পে এসে সানুনয় কান্নাকাটির মাতম। কোন মহিলার মুক্তি ক্যাম্পে প্রবেশে দলপতির কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু মা-মেয়ের কান্নায় ক্যাম্প হাবিলদার মেজর বিচলিত। অগত্যা নিরুপায় হয়ে দলপতির সামনে হাজির করেন এঁদের। দলপতির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া সুপ্তোত্থিত বাঘের ক্রুদ্ধ চাহনি। হাস্যলাস্যের মোহিনী কন্যাকে মায়ের সাথে দেখে তিনি খামুশ।

কমলাবতী যশস্বী যোদ্ধার নারী দুর্বলতার পুরাপুরি সুযোগ গ্রহণ করেন। দুর্গত নারীর বেদনা তিনি সইতে পারেন না। তাঁদের প্রতি দেশী-বিদেশী শত্রুর ভয়ভীতি নির্যাতনের করুণ ও মর্মস্পর্শী বিবরণ দেন। সরোদন সে সব বেদনা-বিধুর বর্ণনায় পাষাণ বিগলন দশা।

চলছিল সব সুপরিকল্পিত প্ল্যান মতো ঠিকই। সুন্দরীর বিলোল কটাক্ষ যেন কি বলে! কমলাবতীর সুটোল স্তন যুগল কমলাকে হার মানান। তাঁর বুকের দিকে চাইতে পুরুষের বুক করে ধুক ধুক! নতুন মুক্তির মাথা বিগড়ানোর দশা।

'উচ্ছল আবেগে থর থর তুলে ধর বিকচ অধর
শুনে নিও প্রকৃতি কি বলে অধরার পদ্ম প্রতিভা সে।'

পুরুষের বুকে আগুন ধরানোর কামাতুর লোভাতুর যৌন ইঙ্গিত দলপতির চোখ এড়াল না। কমলা ভেবেছিলেন সদ্য বিপত্নীক প্রেমের দরিয়ায় ডুবে কামের অনলে ঝাঁপ দিবেন। স্ত্রী হারানো যুবককে তাঁর ইস্তিরি করা সহজ হবে। মুক্তি সেনানায়ককে নারী প্রেমের দুর্বলতার সুযোগের ফাঁক-ফোঁকড়ের ফাঁদে ফেলার নিশ্চয়তায় তিনি অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। ভেবেছিলেন নারী লোভী না হলে নারীর প্রতি তিনি কেন এমন সদয় ও দুর্বল চিত্ত। কামশরে জর জর তাঁর শরীর যেন কাঁপছে। নারী যে প্রকাশ্যে এমন বেহায়া প্রেমাভিনয় জানে তা যোদ্ধার বুদ্ধির বাইরে। তার সব রং-ঢংয়ের সার বেরসিক যোদ্ধা বুঝলেন। হায় প্রিয়া হাজেরা! সব কিছুতে যে তোমার প্রতিচ্ছবি! নারী-মদ-অর্থ লোভের উর্ধ্বে সত্যিকার মুক্তি যোদ্ধাটি জেগে উঠলেন।

যোদ্ধার সোজা প্রশ্ন, "মা তুমি কি চাও? সেটা বলে বিদায় নাও।" গুটনা বুদ্ধি সৈনিকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতবাক কমলা। সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধায় যোদ্ধা বলেন, "মা-বোন আমাকে দিয়ে বেহুদা কিছু আশা করে পস্তাবেন।" যে কামনার মোহনায় স্নান করতে

এখানে এসেছেন সে আশায় গুড়ে বালি। ওসব নীচ প্রবৃত্তি পূর্ণ করা যোদ্ধার কাজ নয়। ওসব আমার দ্বারা হবে না। কোন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে সে ধরনের দুর্বলতা থাকলে তাঁর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। উপস্থিত বন্ধুদের যাঁদের সে খায়েশ এখনও আছে সময় থাকতে কেটে পড়ুন। যাঁরা মা ও মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মনিবেদন ছাড়া যাঁদের অন্য জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার আশা নাই তাঁরাই শুধু মুক্তিযুদ্ধে থাকতে পারেন। যাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব তাঁরা দেশ ও মাটিকে কিছু দেবার মতো ক্ষমতা রাখেন না। হুজুতে বাঙাল কমজোর বুঝ দিল বন্ধুদের বলি, 'বুঝহ লোক যে জান সন্ধান।' সুখের পায়রা বন্ধুরা সময় থাকতে সাবধান। এখনও সময় আছে স্বেচ্ছায় মুক্তিযুদ্ধের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে বিদায় হোন।

মুক্তিযোদ্ধার যোদ্ধা কথায় কমলা থ'। কি অকথিত কথা বলি বলি করে তিনি থমকে যান। কাঁপা কাঁপা আবেগে তার বাষ্প রুদ্ধ আকুতি। সড়সড় কণ্ঠে নারী হৃদয় নিংড়ান সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য তিনি দলপতিকে নিবেদন করতে চান। চূড়ান্ত ডুবন্ত তরীর শেষ হাল ধরার চাল চালেন ছলনাময়ী। জনগণ বন্দিত বিজয়ী মুক্তি বীরের জন্য সামান্য দুধ ও ফলাদির উপহার এনেছেন। মহান মুক্তিযোদ্ধা সেসব আহার করলে তিনি নিজকে ধন্য মনে করে গর্বিত হবেন। দুধের জগ ও ফলের ব্যাগ মুক্তি নেতার সামনে রেখে পানাহারে মাতৃ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সকাতর আবেদন।

ছলনাময়ী নারীর খেলনার শেষ পর্যায়। অকস্মাৎ সাদা পোশাকের এক উপস্থিত ভদ্রলোক ছোঁ মেরে দুধ-ফল সরিয়ে নেন। সালাম বিনিময়ে আল্লাহর কালামে তাঁর নিবেদন, "এসব চেক করতে হবে।" দুধ ও ফল চেক করলেন। সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলল দুধে বিষ মিশ্রিত। ফলের ব্যাপারেও একই নিষ্ফল চেষ্টা। বিষ মিশানো ফল খাইয়ে হেমায়েত হত্যার ষড়যন্ত্র। প্রত্যক্ষ নিদর্শনে ঘাতিনী কমলা ধরা পড়েন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষিত দুধ হাতে সশস্ত্র স্কট হাজির। এবার নিয়মানুসারে কাম। দলপতিকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতির অপেক্ষা নয়। কমলাবতী ও তাঁর মাকে উঠে দাঁড়ানোর বজ্র কঠোর হুংকারের নির্দেশ। দলপতির হতবাক নির্বাক চাহনি। স্কট কমাণ্ডারের দিকে তাঁর বোবা দৃষ্টি। সাদা পোশাকের ছদ্মবেশি ডাক্তার গ্লাসে দুধ ফেলে পরীক্ষা করে বিষের ক্রিয়া দেখান। ইতোমধ্যে স্কট কমাণ্ডারের ইঙ্গিত মাত্রে কমলা ও তাঁর মাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলে স্কটরা। যাবার পূর্বে দলপতিকে জীবন-রক্ষার বিনয়ের অনুরোধ জানায় মা-মেয়ে। তাৎক্ষণিক কোন চরম জিঘাংসায় না যাবার নির্দেশ দেন দলপতি। বাহ্য কার্যক্রমের অন্তরালে গোপন নিগূঢ় সত্য থাকতে পারে। সত্য উদ্ঘাটনে ধৈর্য ধরে কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দেন। পুলিশ রিমাণ্ড ধরনের রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা সত্য আবিষ্কারের মতন সবিরাম তৎপরতা চলে এবার।

আসামি আবার বিচারপতি দলপতির সামনে। কাজির সামনে হাজিরার সাথে সাথেই কমলার মনের কপাট খুলে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বেই আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তিনি অকপটে বলে যান। শারীরিক-মানসিক চাপ, ফুসলানি, প্রাণের ভয়, একলক্ষ টাকার প্রলোভন জাতীয় বহুতর কারণে তাঁরা মানুষ হত্যার মতো ঘৃণ্য কাজে

নেমেছেন। পিন পতন নীরবতার জনসমক্ষে হত্যা পরিকল্পনার পূর্বাপর বর্ণনা শেষ হতে না হতেই মা ও মেয়ে হাহাকার বেদনার্ত কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাদের ভাবনা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর আতংক। মৃত্যুর বিভীষিকায় শেষ নিবেদন পেশ করেন কমলা। অন্তর্জ্বালার অনুশোচনায় কমলার বার বার স্বেচ্ছা কানমলার হাহাকার বুক চাপড়ানো আর্তনাদ। আমি সর্বনাশী। আমি কালগ্রাসী। আমি মীরজাফর। আমি কলংকিনী সেরা রাক্ষুসী। মৃত্যুই আমার কাম্য। আমার মৃত্যু হোক। আমাকে ক্ষিপ্ত কুকুর, পাগলা নেকড়ে বাঘ দিয়ে খাওয়ানো হোক। আমাকে হত্যা করা হোক। দুনিয়ায় সেরা যন্ত্রণায় আমাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হোক। আমার শাস্তি অন্যের জন্য হোক আদর্শ শিক্ষা। আর যেন বাংলার কোন মেয়ে জাতির সাথে এমন বিশ্বাসঘাতকতা না করে। স্বাধীনতা যোদ্ধাদের হত্যায় যেন বাংলার আর কোন মা-বোন সাহস না পায়। হায় ভগবান, তুই চুপ কেন! সাপিনী-পাপিনীকে উঠিয়ে নে।

এবার দম বন্ধ করে বন্দিনীর আত্মঘাতী উদ্যোগ। নিজের বুকে নিজের হাতে দমাদম সজোর চাপড় আর চাপড়। এমন স্পর্শকাতর বিপন্না নারীর আর্তনাদ দলপতির অসহ্য। তিনি মুখ খুললেন এবং উভয়কে ক্ষমা করার সিদ্ধান্তের অনুরোধ রাখেন। তবে পূর্ণাঙ্গ বিচারের ভার তিনি নিরপেক্ষ বিচার সভা ও জনতার হাতে ছেড়ে দিলেন।

হেমায়েত বাহিনীর সদর দপ্তরে বিচার। এলাকার জনতাকে প্রকাশ্য বিচারে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আদালতে উপদেষ্টামণ্ডলী সমাসীন। সমস্ত বিষয়ের ওপর বিস্তারিত পর্যালোচনা ও পুংখানুপুংখ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা চলছে। উপস্থিত বিচার সভা, উপদেষ্টাবর্গ, স্বতঃস্ফূর্ত গণজমায়েতের সিদ্ধান্ত হয় অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মুক্তি প্রশাসন ও জনতার কেউ দণ্ডিতের সপক্ষে নমনীয় শাস্তির সুপারিশ করলেন না। বিচারকমণ্ডলী তাঁদের বিচারের প্রশাসনিক কাজ অবিলম্বে শেষ করে রায় দিলেন। মৃত্যুদণ্ডের বেলায় মুক্তি আইনে পুনর্বিচারের সুস্পষ্ট রূপরেখা আছে। আবার পুনর্বিচারের বোর্ড বসলো। তাতেও পূর্ব রায় প্রাণদণ্ডই বহাল থাকল।

স্থানীয় মুক্তিফৌজ সুপ্রীম কমাণ্ডারের বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রাণভিক্ষা/মৃত্যুদণ্ড মওকুফের বিশেষ প্রাধিকার আছে। দণ্ডিতদের শেষ কোন নিবেদন আছে কিনা জানতে চাওয়া হলো। তারা প্রাণভিক্ষা চাইতে পারেন। তাদের বিশেষ কোন চাওয়া-পাওয়ার নিবেদন শেষবারের মতো জানাতে পারেন। সকলকে অবাক করে দণ্ডিতের নিবেদন, "আমরা দোষ স্বীকার করছি। আমাদের মতো হীন পাপীর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এমন কলংকিত জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই। দেশ জাতি আত্মীয়স্বজনের কেউ আমাদের গ্রহণ করবে না। এমন কুলকলংকিনীর কোন কূলে ঠাঁই নেই। মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হোক।"

এবার মুক্তি কমাণ্ডার মরণ কামড়ের ফাঁপড়ে পড়ে। ভাবনার অতলে তলিয়ে বীর হৃদয়ের শাশ্বত মহিমায় উদ্দীপ্ত মুক্তি। মনের পর্দায় ভাসে একটি প্রিয় মুখ। আজ সে কোথায়? ইতিহাসের হাজেরা শয়তানের সত্য কথা বিশ্বাস করেন নি। ছেলে ইসমাইলকে নিজ হাতে সাজিয়ে পিতার সাথে কোরবানির জন্য পাঠান। প্রেরণা দায়িনী

হাজেরা বেঁচে থাকলে আজ তুমি আমাকে নারী হত্যায় হাত কলংকিত করা থেকে বাঁচাতে। এই ফরিদপুরেরই জন্মেছিলেন ইতিহাসের আর এক কালজয়ী পুরুষ। বঙ্গবন্ধু, বিশ্ববন্ধু, করুণা সিন্ধু শেখ মুজিব তাঁর নাম। নির্জীব জাতির প্রাণে স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চারে তিনি বাংলার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অমর আসনে। বিপ্লবী বাংলায় সশরীরে উপস্থিত থাকলে তিনি নারী হত্যার রায়ে সম্মতি দিতেন কিনা সন্দেহ। সমর জগতে অমর হওয়ার বাসনা ত্যাগ করলেন মুক্তি কমাণ্ডার। ঘাতকের প্ল্যান কার্যকর হলে এতক্ষণ তিনি থাকতেন মৃত্যুর হিমশীতল শান্ত অতল ঘুমঘোরে। আল্লাহর অপার করুণায় তিনি বেঁচে আছেন। বিশ্বের সুপ্রীম কমাণ্ডার করুণা নিদান আল্লাহর স্মরণ নিলেন। নিজের বিশেষ ক্ষমতাকে করুণার উদারতায় ভরিয়ে দিলেন। নারী মৃত্যুর দণ্ড কার্যকর করে ইতিহাসে কলঙ্কিত হতে চাইলেন না। সকল রায়ের উর্ধ্বে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত কমাণ্ডার মাতা ও কন্যা উভয়কে ক্ষমা করেন। মুক্ত দুই মহিলার যেখানে খুশি চলে যাবার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হলো।

দল নায়কের এমন অভাবিত ক্ষমার ঔদার্য চতুর্দিকে অভাবিত প্রাণ বন্যার সঞ্চার করে। মুক্তিযোদ্ধা যে এমন উদার হতে পারেন তা কেউ ভাবেন নি। আপন প্রাণ সংহারিণীকে সাতখুন মাফ, বেকসুর খালাস! দলমত, শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ সবাই বাহিনী প্রধানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। ক্ষমার অবতার হেমায়েত-এর উদারতা তাঁকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কিংবদন্তির নন্দিত নায়কের আসনে সমাসীন করে।

ক্ষমার প্রতিদান ঃ নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে বদলে গেলেন কমলাবতী রাণী। মুক্তিবাহিনীর মানবতার মাহাত্ম্যে তিনি অভিভূত। তাঁর মুখে উল্টা বোল। মুক্তিবাহিনী আমারে নিয়া তোমাদের ফায়দা কামাইতে দিমু না। আমার মতো অক্ষম পাপীকে ক্ষমা কইরা তোমরা মোক্ষম দাওয়াইর উদারতা দেহানোর সুযোগ পাবা না। হয় তোমরা আমারে কাজে লাগাইবা নয়ত আমি নিজে আত্মঘাতিনী হমু। সব দোষ পড়ব তোমাগ ঘাড়ে। তাৎক্ষণিক অবস্থা বিবেচনায় এবং বহু ভাবনা চিন্তার সতর্কতায় কমলাবতী রাণীকে মুক্তি গোয়েন্দার কাজে লাগান হয়। স্বেচ্ছা মৃত্যুর মানসিকতায় তিনি মুক্তি গোয়েন্দার কাজে আত্মনিবেদন করেন। যাওয়া আসা শুরু করেন কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জের পাক আর্মির ক্যান্টনমেন্ট সদৃশ নিশ্ছিদ্র অবস্থানসমূহে। গোয়েন্দার দুরূহ কাজে নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সম্ভ্রম পর্যন্ত তাঁকে বিকাতে হয়েছে। পাক আর্মি অফিসারের শয্যাসঙ্গিনীর অন্তরালে মুক্তির জন্য মহামূল্যবান তথ্যাদি তিনি এনে দিতেন। ভগবান শুধু তাঁকে অপূর্ব সুষমার দেহ লাবণ্যই দেননি, কাম কলার বাইরে তিনি নিজের চেষ্টায় নাচ শিখেছেন। অপূর্ব মূর্ছনার তাঁর গানের গলা। অপূর্ব দেহ বল্লরির নাচের সঙ্গে মিষ্টি মধুর গানে তিনি সবাইর মনোরঞ্জন করতে পারতেন। নাচনেওয়ালি গায়িকার মোহিনী মায়ার দাগ নিশানায় বিপক্ষ ঘায়েলের মহামূল্যবান তথ্যাদি নিয়মিত তিনি মুক্তিদের পরিবেশন শুরু করেন।

কমলা রাণীর নির্ভুল তথ্যে মুক্তি সাফল্যের উজ্জ্বল নিদর্শন আছে। ৪ঠা জুন, ১৯৭১

দ্বিতীয় বার কোটালিপাড়া থানার পাক পজিশন আক্রমণে মুক্তির বিপুল সাফল্য কমলা রাণীর গোয়েন্দা কার্যক্রমেরই ফলশ্রুতি।

যুদ্ধের নিষ্ঠুর খেলায় সবার আগে মরে ন্যায় ও সত্য। কমলা রাণী ন্যায় করছেন না অন্যায় করেছেন সে বিচার করবেন অনাগত কালের বাংলার বীর জনতা। শত্রুর প্ররোচণায় প্রথমে তিনি মারতে আসেন মুক্তিবাহিনী। পাক বাহিনীকে শেষতক তিনি বেমক্কা ব্যুমেরাং যে মাইরটা দিলেন সে এক ঠমকের চমক। নারীকে হেলা করতে নেই। তারা যে কি পারে বা পারে না এ তার খোরাছা নমুনা মাত্র। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' যদি যুদ্ধ নীতি হয়, কমলা রাণীর যোদ্ধার সম্মান পাওয়া উচিত। দুর্ভাগ্য এ-দেশ ও এ-জাতির। কমলাবতী রাণী আজ দেশান্তরি, ভারতের বাসিন্দা। ভারতের জনারণ্যে তাঁকে খুঁজে পেলে মুক্তি গোয়েন্দা কার্যক্রমের মূল্যবান তথ্যনিষ্ঠ উপাদান মিলত।

নকল হাজেরা : মুক্তিযুদ্ধকালের সবচাইতে উল্লেখের দাবি রাখে এ-দেশের স্থানীয় দালাল-দোসরদের পাকিস্তানপ্রীতির ঘটনাসমূহ। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় সুযোগ সন্ধানী মুসলিম লীগার ও জামাতে ইসলামীর নেতা-কর্মীবৃন্দ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনির উল্লাসে মালে গনিমতের ভোগ দখলের মতো হিন্দু এলাকা দখল, হিন্দুর জিনিসপত্র লুটপাট, মেয়ে ছিনতাইসহ অনুরূপ কাজে লাগে তারা। নেপথ্য শক্তির প্রেরণা যোগান পাক আর্মি। নির্যাতিত সংখ্যালঘু শরণার্থীর প্রাণ, ধনসম্পদ, ইজ্জত, নারী সম্ভ্রম রক্ষায় জিহাদের চেতনায় আত্মঘাতী দলের সাথে ঘূর্ণিবাতের দ্রুততায় ঘুরছেন হেমায়েত। শরণার্থীর শরণে আল্লাহ্ মিলায় অবিস্মরণীয় শরণার্থী। অদৃশ্য নিয়তির প্রেমের জালে জড়ালেন যুদ্ধবাজ।

প্রথমা স্ত্রীর শাহাদতে অবিরাম যুদ্ধ পরিকল্পনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন হেমায়েত। তাঁর একটাই কথা প্রতিশোধ-প্রতিকারে শত্রুর রক্ত চাই। লা-পরোয়া বেপরোয়া যুদ্ধবাজ দলনেতাকে নিয়ে হেমায়েত সঙ্গী-সাথীরা বিপাকে পড়ে। তাঁর ভাবিরাও চিন্তিত। যুদ্ধবাজ হিটলারের ছিলেন ইভা ব্রাউন। হেমায়েতের যুদ্ধখোর কেয়ামতি থামাতে সবাই হেমোতী খুঁজছেন। হাজেরাকে ভুলাতে অন্য হাজেরা চাই। হোক না নকল হাজেরা। যুদ্ধপ্রেমিক যোদ্ধার সাথী রণাঙ্গনই মিলিয়ে দিল।

সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিবর্জিত বেপরোয়া সাহসের যুদ্ধে দলনেতা হেমায়েত স্বয়ং দখল করে নেন পাক আর্মির বাংকার। সরাসরি বেয়নেট চার্জে দুই শত্রু সৈন্য নিহত। ব্যাপার দেখে সাথীরা হতবাক!

জুন মাস, প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। কোটালিপাড়া থানার ভুয়া গ্রামে লুটেরা পাক আর্মি আক্রমণ করে। থানা থেকে মাইল কয়েক দূরে লুটপাটে আর্মি চড়াও হয়েছে 'ভুয়াগ্রামে'। চলছে লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বন্দিনী হাত পা বাঁধা নারীর হাহাকার ক্রন্দন। পাক আর্মির সাড়াৎ রাজাকার, দালাল দোসর মহা উল্লাসে শিকার হাতানোতে তৎপর। আর্যবীর পাক সৈন্যদের অনার্য ম্লেচ্ছ কাফের অঞ্চলের মালে গনিমত গণনায় লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার নারী-শিশু-যুবা-বৃদ্ধ

নিজেদের প্রাণ নিয়ে দিকবিদিক পালাতে থাকে। আপন হাতে গড়া ভিটেমাটি সহায়-সম্পদ ফেলে তারা পলায়ন করে। দুঃসংবাদ পৌঁছে যায় মুক্তি ক্যাম্প জহরের কান্দি। মুক্তিবাহিনী অকুস্থলের চার মাইল দূরে। মুক্তি রক্তে টগবগ করে প্রতিশোধের আগুন। বিষয়, সম্পদ, লুটপাটের ধ্বংস সহ্য করা যায়। যুদ্ধে তো এসব সাধারণ ব্যাপার। এক স্কুল ছাত্রীকে পর্যন্ত বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে পাক হায়েনা। সব সহ্যের অসহ্য বাঙাল মা-বোনের ইজ্জত। প্রতিশোধ স্পৃহায় মুক্তি রক্তে নাচন ধরে।

স্বয়ং মুক্তি অধিনায়ক ছুটলেন এর প্রতিকারে, সঙ্গে তাঁর জান-কবুল মুক্তি 'টাইগার ফোর্স'। শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে এসে তাদের মুখোমুখি পড়ে মুক্তিবাহিনী ভীত-বিহ্বল, বিভ্রান্ত, হতবুদ্ধি ও দিশেহারা। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত সাহস, রণচাতুর্য এবং কমান্ডার-সুলভ বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষিপ্রতা দিয়ে সঙ্গীদের উদ্দীপ্ত করেন মুক্তি-কমান্ডার। বাংলার মা-বোনের ইজ্জতের নামে বজ্রকঠোর হুংকারে শত্রুর ওপর আপতিত হয় মুক্তিবাহিনী। হয় জয়, না হয় নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যুদ্ধের মরিয়া চেতনায় মুক্তিরা যুদ্ধ করে। পাক আর্মির অবস্থান থেকে নারী কণ্ঠের বেদনার্ত আকুতি ভেসে আসে : 'মুক্তি ভাইরা আমাদের বাঁচাও'। সংশয় বিঘনের সকল জড়তা উপড়ে শাহাদতের উদগ্র জ্বালায় শেষ কলেমা পড়ে মুক্তিরা আক্রমণ শানায়। দু'দলে তুমুল যুদ্ধ চলে। যুদ্ধের ফলাফল : মুক্তির বিজয় ও পাক-আর্মির ঘৃণ্য পরাজয়। কিন্তু পাকিস্তানি নরপশুরা এর মধ্যেও কয়েকটি সুন্দরী কচি বালিকা নিয়ে পলায়নের উদ্যোগ নেয়। গেরিলা রণকৌশলে মুক্তির মালকোচামারা চোরাগোপ্তা দুর্বার সাহসী আক্রমণের আঘাতে ভেবাচেকা চামচিকার মতো লুটের মাল মেয়ে ফেলে কোনরকমে পালায় পাক আর্মি। শত্রু পজিশন দখলের সাথে অন্যান্য সম্পদের বেশ কিছু গোলাবারুদ দখলে আসে মুক্তিবাহিনীর। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছয়টি মেয়ে নিয়ে তারা নৌকায় পালাচ্ছিল। মুক্তি-আক্রমণে নারী খাদকদের বেশ কজন নিহত হয়; কিছু পাক আর্মি পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে পালায়। তাদের লুটের ধন সব মালামাল মুক্তিরা কেড়ে নেয়। ছয় মেয়ের সাথে ছয় পশ্চিমা সৈনিক নরপশু মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দি হয়। এর মধ্যে স্থানীয় জনগণের সাহায্যে বন্দিনীদের আপনজন খুঁজে আনা হয়। নিজ নিজ পরিবারের হাওলায় বন্দিনীদের হস্তান্তর করে এবার মুক্তিবাহিনী স্বস্তি লাভ করে। সে-দিনের যুদ্ধে বহু নিষ্পাপ জনতা সেখানে নিহত হয়। স্বজন হারানোর দুঃখে মুক্তিরা দুঃখিত ও ব্যথিত। তাঁরা আবারও প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

মুক্তিযুদ্ধের তাণ্ডবতা ক্রমে গণযুদ্ধের রূপ নিলে জনতা মুক্তিবাহিনীর শৌর্যে বিমুগ্ধ হন। আজ গণমুক্তিরা পাশে না থাকলে কে বাঁচাত নির্যাতিতা নারীদের! দেশের মানুষ আগে, দেশ পরে। দেশের মানুষ বাঁচলে দেশের স্বাধীনতা। দেশের মানুষই যদি না বাঁচল কার জন্য স্বাধীনতা! বিপন্ন মানুষের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিরা গণমানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার অক্ষয় আসন রচনা করে। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে পুরা এলাকায় বিপুল গণজাগরণের জোয়ার আসে। বিজয়ী মুক্তির সম্বর্ধনায় স্বতঃস্ফূর্ত হাজার হাজার জনতার জমায়েত ঘটে। বাহিনী প্রধানসহ অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সে সমাবেশে বক্তব্য

রাখেন। বিজয়ীর ঔদ্ধত্য ছেড়ে হেমায়েত আল্লাহর রাহে শোকরিয়া জানান, জনতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের দোয়া কামনা করেন। উপস্থিত জনতা সে-দিন সবকিছুর বিনিময়ে হলেও মুক্তির জন্য যে-কোন মূল্যের আত্মত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে জানায়। বাস্তবে, গণসমর্থনই মুক্তির সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

সভা শেষে পাক প্রতি আক্রমণের বিপদ থেকে জনতাকে রক্ষার জন্য মুক্তি-প্রতিরক্ষার লে-আউট রচিত হয়। বিভিন্ন পয়েন্টে প্রহরী মোতায়েনের পর কমান্ডার যাত্রা করেন হেডকোয়ার্টার অভিমুখে। বহু পরিবার নৌকাযোগে মুক্তিবাহিনীর অনুগমন করেন। সবাই পৌঁছেন মুক্তি সদর জহরের কান্দি। তাঁদের স্থান হয় শরণার্থী শিবিরে।

বন্দিনী ৬টি মেয়ের একজন সোনেকা রানী রায়। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। পরনে হাফ প্যান্ট ও ফ্রগ। বড় মায়াময় চোখের চঞ্চলা হরিণী। বয়স বড়জোর তিন এজ শুরু; বাবার নাম সুরেন্দ্র নাথ রায়, শুয়া গ্রামে বাড়ি, থানা কোটালিপাড়া। মুক্তি-শরণার্থী শিবিরে সোনেকা পরিবারও স্থান নিয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কিছুটা শৃঙ্খলায় আসতেই চঞ্চলা কিশোরী গিয়ে দাঁড়ান মুক্তি কমান্ডারের সামনে। তিনি বলেন ঃ "দাদা, আপনাকে ছেড়ে যাব না। আমার মা-বাবা পরিবার পরিজনের কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ব্যাপার দেখে ঠেকে শিখলাম। দেশের ডাকে আগে যুদ্ধ শিখতাম। নিজের হাতে একটা একটা করে পাকিস্তানি হানাদার মারতাম। আপনার এখানে আজ শরণার্থী হতাম না। হায় কপাল! আমি মুক্তিযোদ্ধা হব। বাঙালি হত্যার, প্রিয়জন হারানোর প্রতিশোধ নিব। দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিব। প্রমাণ করব আমি একজন বীর বাঙালিনী।" সোনেকা পাগলের প্রলাপ বকে যায়।

সকলে ভাবলেন কিশোরীর সাময়িক চাপল্য থামলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সময়ে সব ভুলে সে মা-বাবার বুক জুড়াবে। পাক-আক্রমণের প্রচণ্ডতা তার চিত্ত বৈকল্য ঘটিয়েছে। কি যাদু জানে মেয়ে আল্লায়ই জানে ! পাষাণ প্রাণ যোদ্ধার মনে নারী দুর্বলতা ! মানস নেত্রে ভাসে একটি ফুটন্ত গোলাপ আনত ব্রীড়ানত মুখ 'হাজেরা' !! মুক্তি ক্যাম্পের কঠোর শৃঙ্খলায় নারীর স্থান নগণ্য। সোনেকা সব তচনচ করে দেয়। যখন তখন হেমায়েত-দরবারে তার হানা। একই আবদার আমি যুদ্ধ শিখব।

মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে এসে এত যোদ্ধা, জনবল, অস্ত্র, শানশওকত দেখে তার মনোবল বহুগুণ বেড়ে যায়। বার বার তাঁর একই আবদার, অস্ত্র হাতে শত্রু মারতে চাই। এত ছোট মেয়ের এমন অনমনীয় জিদ ! বালিকার অবাক কাণ্ডে সবাই হতবাক। ঘটনা না দুর্ঘটনার তল খুঁজে বাহিনী প্রধান আশ্চর্য হন। অনেক অনুরোধ করা হয় তার প্রতি, মরণ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকার জন্য। রীতিমত ভয়ভীতির মাধ্যমেও তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চলে। কাকস্য পরিবেদনা। কোন মন্ত্রই কাজে লাগে না। মোম গলার আগে দলনেতা নির্মম। অবশেষে পরিস্থিতির মোকাবেলায় আঠার লেঠা ছুটাতে নিজ পরিবারের সাথে সোনেকাকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সোনেকার স্থান হয় মুক্তি ক্যাম্পের বাইরে শরণার্থী শিবিরে আপন পরিবারের সঙ্গে।

সব শৃংখলায় বিশৃংখলার জলাঞ্জলি। প্রতিদিন দুই তিনবার মুক্তি ক্যাম্পে

সোনেকার শুভাগমন। স্যান্ডি রাইফেলের কুঁদায় তাঁর পা জুদা করে দিতে পারেন। একে মরণের পার থেকে ফিরে আসা কচি মেয়ে। মুক্তির হাতেই তার উদ্ধার। তায় আবার সংখ্যালঘু হিন্দু ছাত্রী। কত মেয়েই তো এলো গেলো। কতজনকেই না মুক্তিরা উদ্ধার করে চিকিৎসা, সুশ্রুষা, আহার, আশ্রয় দিল। সবাই এলো আর গেল। কৈ কেউ তো মুক্তি ক্যাম্পে থাকতে চায় না। নিশ্চিত মরণের যোদ্ধা হতে কেউ বায়না ধরে না। বড় বিদঘুটে জেদের মায়া হরিণী। বাহিনী প্রধানের দুর্বলতা ও সবার আদরের সাশ্রয়-প্রশ্রয়ে সোনেকার দুরন্তপনা বাড়ে। ক্যাম্পের অস্ত্রপাতির এটা সেটা ধরাধরি করে। তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়, সে পাগল হয়ে গেল কিনা। ক্যাম্প ডাক্তারের প্রতি নির্দেশ রইল সবার অজান্তে তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের পর রিপোর্ট দিতে। কোন দিক থেকেই উল্টা রিপোর্ট আসে না। মেয়ে শারীরিক মানসিক সকল দিকে থেকেই সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে ব্যাপার কি ? আসলে তার মনে তখন মরণ জ্বালার প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে। সে যুদ্ধ করে মরতে চায়। কাঙালিনী শরণার্থীর জীবনে সে বাঁচতে চায় না। তার কথা আমাকে মুক্তিবাহিনী প্রধানের কাছে নিয়ে চল আমি অস্ত্র চালনা শিখতে চাই। বেশ কদিন সকলের সকল বিধিনিষেধ পদদলিত করে ভয়ভীতির উর্ধ্বে সে সরাসরি বাহিনী প্রধানের সামনে এসে দাঁড়ায়। আবেদনের একই নিবেদন যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র চালনা শিখতে চাই। বাহিনী প্রধানের কাছে আসা যাওয়ার বিশেষ রেস্ট্রিকশন ছিল। কিন্তু মায়াময় সোনেকার জন্য সৈনিক সর্দারের দ্বার অবারিত।

'মুক্তদ্বার গবাক্ষে পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে।' ফুটন্ত কিশোরীর দুরন্তপনার পাগলামি তাকে বেশ আকর্ষণ করত। এই আকর্ষণের বিকর্ষণ প্রেম পরিণতির দিকে গড়ায়। নির্মম যোদ্ধা এবার পাষাণে বুক বাঁধেন। হাজেরার প্রেমে কাউকে ভাগ দিতে চাইলেন না। এবার তিনি নিজেকে রক্ষার পথ খুঁজেন। শেষে না একূল ওকূল দুকূল যায়! যুদ্ধ ছেড়ে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে যায়!! দেশ না প্রেম বড় !!! মুক্তির কষ্টি পাথরে দেশ প্রেমের বিজয় ঘটে। নিজের আত্মীয় পরিবারের সাথে সোনেকা পরিবারকে স্থানান্তর করা হয় বরিশালে। পরিবারের সঙ্গে সোনেকা যান উজিরপুর থানার বার পাইকা গ্রামে। মুসলিম লীগ প্রভাবিত 'বার পাইকা' মুক্তি সদর থেকে তার দূরত্ব ষোল মাইল।

চোখের আড়াল মানে তো আর মনের দেয়াল না। সংগ্রামী যোদ্ধার আনমনা মন। যুদ্ধ চলছে। ১৪ জুলাই রামশীল রণাঙ্গনের যুদ্ধে ব্রক্ষশেল সদৃশ গুরুতর আঘাতে হেমায়েত আহত হন। জীবনের আশা নেই। তিনি চেতনাহীন। শত্রুর গুলি তাঁর মুখের বাম চোয়ালে আঘাত হানে। উপরের চোয়ালের এগারটি দাঁত বিচূর্ণ করে ডান চোয়ালের নিচ দিয়ে গুলি বের হয়ে যায়। মুখের বাম চোয়ালের উপরের পাটি উড়ে যায়। জিহ্বা কেটে দ্বিখণ্ডিত। শহিদ মকবুলের লাশ ছুঁড়ে আমৃত্যু যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করেন, জীবন বাজির হারজিতে শত্রুকে ধাওয়া করেন, পাক-শত্রু বিতাড়িত করে নিশ্চিত বিজয়ের সিগন্যাল ফায়ার দেন তিনি। সঙ্গীরা ছুটে এলেন রামশীলে। শহিদের লাশের সাথে মুমূর্ষু হেমায়েতকে উদ্ধার করেন তারা।

কথা বলার যন্ত্র জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত। বিচলিত যোদ্ধা সাথীদের ইঙ্গিতে সান্ত্বনা দেন। যুদ্ধের পরবর্তী করণীয় নির্দেশনা লিখে দেন। নিজের চিকিৎসার বিষয়ে লিখে জানান। সবাইকে হতাশা থেকে মুক্তির আশ্বাস দেন নিজেই। জীবন মরণ খোদার হাত। সবাইকে একদিন মরতে হবে। কারও প্রয়োজনই সংসারে অপূর্ণ থাকে না। উপস্থিত সবাইকে আকুল নিবেদন তাঁর, হেমায়েতের অবর্তমানে যুদ্ধ যেন থেমে না থাকে। বিজয় আসবেই। জয় বাংলা, জয় রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা। সংজ্ঞাহীন মানুষটিই সবাইকে নিঃসঙ্গ করে দিল।

মুক্তি বিজয়ের আনন্দ বার্তা ছাড়িয়ে হেমায়েত আহত হওয়ার বার্তাও চতুর্দিকে বিদ্যুত গতি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। আহত নেতার সংজ্ঞাবিলোপ-পূর্ব যুদ্ধ পরিকল্পনার উদ্দীপনা বাঙালি মাত্রের অশ্রু ঝরায়। মৃত্যু-পথ যাত্রীকে দেখতে তাঁর পরিবারবর্গ ত্বরায় চলে আসেন। পাগলিনী সোনেকাকে বেঁধেও রাখা গেল না। সেও হেমায়েত পরিবারের সাথী। সকলের পাষাণ বিগলন কান্না। হেমায়েত ভাবিদের কাছে শেখা মুসলমানের আল্লাহর নামগুলি আউড়ে সোনেকার সে কী কান্না। দুহাত উপরে তুলে আল্লাহ-রসুল স্মরণে সরব রোদনে সোনেকার ফরিয়াদ : 'আমি হেমায়েতের জীবন ভিক্ষা চাই।'

হে হিন্দুর ভগবান তুমি বড় নিষ্ঠুর। বৃথাই তোমার পাষাণ প্রতিমা পূজা। আল্লাহর বান্দা মুসলমান হেমায়েত আমারে বাঁচাইল। আমার ইজ্জত রক্ষা করল। আমি তোমারে ছাড়লাম। আল্লার স্মরণ নিলাম। লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ...। হে প্রভু আল্লাহ মালিক, আমি আজ থেকে মুসলমান হলাম। আমার ইসলাম গ্রহণের বদৌলতে তুমি তাকে রক্ষা কর। সোনেকার পরিবারের সাথে হাজার হাজার হিন্দু পরিবারের মানুষের মনে তখন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নি। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-পেশার উর্ধ্বে মুক্তিযুদ্ধ মানবতার জয় ঘোষণা করেছে।

বিজয়ী মুক্তি সদরে আগত অগণিত জনতার আবদারে মুক্তি প্রশিক্ষণ সেন্টার জহরের কান্দিতে একটি শরণার্থী ঘাঁটি করে দেয়া হয়। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে তারা ধীরে সুস্থে আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যান। অবুঝ মেয়ের সান্ত্বনায় সোনেকা পরিবার বেশ কিছু দিন থেকে যান। মুক্তিবাহিনী প্রশিক্ষণ সেন্টারের প্রশিক্ষণ দেখতে আসা তার নিত্য কর্ম। নিজ পরিবারের সাথে সে রাত কাটায় না। রাতে ঘুমায় মুসলিম শরণার্থী হেমায়েত-পরিবারের সাথে। হেমায়েতের মা-ভাবিদের সাথে তার বেজায় ভাব। মুসলিম পরিবারের ইসলামি কালচারে সে তরি ভাসায়। মুসলিম জীবন ধারায় অভ্যস্ত হতে থাকে। মেয়ের মতিগতি ঠিক করতে মা-বাবার দুশ্চিন্তায় গেল বেশ কিছুদিন। এবার তাঁরা ভারত যাত্রী শরণার্থী। কিন্তু কিশোরী নাছোড়বান্দা পণ ভারতে যাব না।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
প্রেম ভ্রমরার গুঞ্জন গোপনে।

মেয়ের প্রেমের আবদার। খবরদার আমাকে নিতে পারবা না। আমি হেমায়েতকে

কেয়ামত তক ভালবাসি। সোনেকার মা-বাপ কয় হায় ভগবান কানে এসব কি শুনি ! পিচকি মেয়ের মুখে খিস্তি খেউড় ! আমাগ মেয়েরে মুসলমান তাবিজ করছে।

কিশোরীর শোরগোলের বোল। যিনি আমারে উদ্ধার করছেন মনে মনে আমি তারে জীবন দান করছি। তাঁর বউ মরেছে। মরা বউয়ের এতিম শিশু পুত্র মা মা করে কাঁদে। কে দেখবে সে মাসুম বাচ্চাকে ! জানি পাক বর্বরদের হাতে সবাই মরব। মরার উত্তম পথ বেছে নিলাম। মুক্তিযুদ্ধ করে মরব। আর কিছু না পারি মুক্তিযোদ্ধাকে সাহায্য করে মরব। সোনেকার মা মেয়েকে সর্বপ্রকার ভয়ভীতির কৌশলে বশে আনার প্রয়াস নেন। বাহিনী প্রধান হেমায়েতের জীবন অনিশ্চিত। তার জীবনের নিরাপত্তা নেই। কোন দিন পাক ফুটশ ফাটুশ গুলিতে কুটুশ করে মরে যায় তার ঠিক নেই। তাতেও মন টলানো যায়নি এই কিশোরীর। অগত্যা মেয়েকে হেমায়েত পরিবারের হাওলায় রেখে তাঁরা ভারত যাত্রা করেন।

বুকে পাষাণ বেঁধে সোনেকার মা-বাবা ভগবানের নামে মেয়েকে বলিদান করেন। তাঁদের আশীর্বাদ, "ভগবান আমাদের মেয়েকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। তুমি আমাদের কন্যা দান গ্রহণ কর। এই অবুঝ প্রাণ নাবালিকার মুখের দিকে চেয়ে দেশ ও জাতির নামে স্বাধীনতার প্রয়োজনে হে ভগবান তুমি হেমায়েতের প্রাণ রক্ষা কর।"

প্রেমের অক্টোপাশের কারেন্ট জালে ঝিটকার মত আটকা পড়েন হেমায়েত। তাঁর কাছে আশ্রিতা মেয়েদের সবাই নেতার যুদ্ধবাজ মন্ত্রে দীক্ষা নেন। যোদ্ধার যোগ্য সঙ্গিনী যোদ্ধা সোনেকাও যুদ্ধবাজ। হেমায়েত ভাবিদের প্ররোচণায় বেপরোয়া যুদ্ধের ধান্দাবাজ সাথীরা মিলে সুকৌশলে হেমায়েতের প্রতি লেলিয়ে দেয় সোনেকাকে। এত কিছুর পরও মায়ার বাঁধনে ঘুঘু ধরা দেয় না।

শত শত নারী পুরুষ হেমায়েত-শোকে মুষড়ে পড়ে। যার যার ধর্ম মতে মসজিদ, মন্দির, গির্জায় তাঁর রোগ মুক্তির মানত করেন। এমন মরণেও সুখ আছে ! সকল মুখে একই রবের ফরিয়াদ, "খোদা তুমি আমাদের সকলের জীবনের বিনিময়ে হেমায়েত ভাইয়ের জীবন ভিক্ষা দাও।" সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় সশস্ত্র যুদ্ধের ঝটিকা আক্রমণে জলিল পাড় মিশন হাসপাতাল দখল করেন তারা। সেখানে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রাতের আঁধারের মরিয়া অভিযানে মুক্তিরা নেতাকে নিয়ে সটকে পড়ে তাদের নতুন সদর লখণ্ডা স্কুল কেন্দ্রে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মুক্তি কোম্পানি নেতার আশু রোগ মুক্তির খবরের উদ্বেগে প্রশান্তি আনে। শত শত জনতা নানা ধরনের ফলমূল, খাবার নিয়ে আসেন অসুস্থ মুক্তিকে দেখতে। সিকিউরিটির কারণে কাউকেই তাঁকে দেখার সুযোগ দেয়া হয় নি। দূর থেকেই সকলকে খাদ্য-উপহার রেখে যেতে হতো। সকলকে তাঁর জন্য দোয়া করতে বলা হতো। বাহিনী প্রধান সুস্থ খবরের সন্তুষ্টিতেই সবাই বিদায় নিতেন। হায় মুক্তি পাগল মানুষের এমন সৈনিক ভালবাসা ! এখানেই স্বাধীনতা যোদ্ধা ও সৈনিক জীবনের পবিত্রতার গৌরব।

বাহিনী প্রধান আস্তে আস্তে সুস্থ হন। ইশারায় কথা বলতে পারেন। তাঁর অসুস্থতার পুরা সময় দিবা-নিশি নিঃশব্দ নীরবতায় সেবাপরায়ণতা সোনেকার সেবাযত্ন রূপ কথার

মত। দশরথ পত্নী কৌশল্যার কৌশল বেছে নেন সোনেকা। সেবার কৌশলে চিকিৎসকের ইতি'র রোগী দশরথকে বাঁচিয়ে তোলেন রাণী কৌশল্যা। যমে মানুষে টানাটানির যুদ্ধাহত হেমায়েত সোনেকার সেবায় নতুন জীবন ফিরে পান। অচৈতন্য মানুষটি হাজেরা ভ্রমে সোনেকার হাত চেপে ধরত। সেবিকা সোনেকা সে হাত সরিয়ে নিত না। পরম মমতায় কপালে হাত বুলিয়ে দিত। চোখ খুলেই কমান্ডার সেবিকা সোনেকাকে পায়ের কাছে বা মাথার কাছে পেতেনই। এই মেয়ে সোনেকা না প্রেমের শান দেয়া ছুরি। মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাপার বুঝে খুশি হয়। হেমায়েত ভাবিরা মুখ টিপে হাসেন।

বাহিনী প্রধান গুলিতে শয্যাশায়ী। সে জীবন্মৃত মানুষটিকে কোলে নিয়ে সোনেকার কান্নায় কারও চোখই শুকনা থাকতো না। সে কাঁদন দৃশ্যে নিতান্ত শক্ত প্রাণও নমনীয়তায় শিথিল না হয়ে পারতো না। সোনেকার কান্না না মুক্তার পান্না। মানুষ কি মানুষকে এমন ভালবাসতে পারে ? যুদ্ধাহত অনিশ্চিত মৃত্যুর মানুষকে কি এমন হৃদয় উজাড় মন প্রাণ কেউ সমর্থন করতে পারে ? অঘটন ঘটন পটিয়সীর আরেক নাম নারী। কিশোরী বালিকাকে এত বুদ্ধি দিল কে ? সব অস্ত্রে শান দিয়ে যেন প্রেমের যুদ্ধে নামছে সোনেকা। তার কাছে কোন কামে লাগে মেনকা। প্রেম বিজয়িনী সোনেকা। কামনার পান্না আর সেবার অভিনয়েই প্রেমের মালা পরিয়ে দিল কমান্ডারের গলায়। পাষাণ কাটল, মোম গলল, বেচইন কঠোর প্রাণ মুক্তি কমান্ডার। মনের মানুষটিকে বাজিয়ে নিতে চাইলেন। আপাতত প্রেম থাক। যুদ্ধ চলুক। পরে হবে সব ফয়সালা। সোনেকার যুদ্ধের প্রশিক্ষণ চলে। সে নারী মুক্তিযোদ্ধা। সঙ্গিনী হেমায়েতকে পুরাপুরি মায়ার ফাঁদে ফেলতে পারেন নি। রণরঙ্গিনী সব সময় হেমায়েত দেহরক্ষী। রামশীলের যুদ্ধে আহত হবার সময় তিনি সাথে ছিলেন। আহত মুমূর্ষুর রক্তে তাঁর দেহ রঞ্জিত। এ যেন "কান্দেরে ঐ সখিনা বিবি কাশেমের লাশ কোলে করি।" দুল দুল আসোয়ার তীরবিদ্ধ কাশেমের শত্রু গুলিতে ঝাঁঝরা মুখমণ্ডল হেমায়েত। রক্ত রঞ্জিত রণাঙ্গনই শেষ পর্যন্ত প্রেমাঙ্গনের ফুল শয্যার উপহার পরিয়ে দিল।

জুন মাসের ত্রিশ তারিখে কোটালিপাড়া থানা দ্বিতীয় আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর আশাতীত সাফল্যে বিজয়-উল্লাসের বুন ফায়ারে হিন্দু মুসলমান যোদ্ধারা বাহিনী প্রধানের সৌজন্যে কিশোরীকে উপহার দেন। সোনেকাকে বাধ্য করেন প্রেম বিজয়িনী কাহিনী শোনাতে। বহুতর যুক্তিজালের হেমায়েত মা-মাটি-স্বাধীনতার নামে সোনেকাকে জীবন সঙ্গিনী করার ওয়াদা করেন। মুক্তিরা কন হেমায়েত ভাই যাবার যে জন গেছেন, তিনি তো আর আসবেন না। হাজেরাকে আমরা ভুলবো না। এবার আমরা হাজেরার শূন্য স্থানে পুণ্যবান কাউকে বসাতে চাই। দীর্ঘশ্বাসে নীরব হেমায়েত। তাঁর কথা দেশ স্বাধীন আগে। ওসব প্রেম ট্রেম পরে হবে। নাছোড় বান্দা সহযোগী মুক্তিরা। সবই মানলাম, আমরা কে কবে মরি তার ঠিক নাই। আমরা মিষ্টি মুখের সৃষ্টি দেখতে চাই। সোনেকাকে কিছু জিগানের ভাবনা ঢুকছে। ও মেয়ে তো প্রেমে ডুবেছে। এখন আত্মঘাতিনী না হলেই সব কূল রক্ষা হয়।

'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' ধরে নিয়ে মুক্তিরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় হেমায়েত-সোনেকার পান চিনি মার্কা বিয়ের পূর্বরাগ সম্পন্ন করে। দেশ স্বাধীন হলে অনুরাগের প্রণয়ের বিয়ে। অজস্র ফাঁকাগুলি, গ্রেনেড ফাটিয়ে মুক্তিরা উৎসব করে। আপাতত যুদ্ধ ভাবনায় ফিরে যাওয়া যাক।

১৪ জুলাই রামশীল যুদ্ধে মারাত্মক আহত হেমায়েত-এর পাশে মূর্তিময়ী সেবা প্রেমের করুণার সোনেকা। মুমূর্ষু সেনাপতির একান্ত সেবার কাছের মানুষ প্রেমময়ী নারী অসহায় কিশোরী। বাহিনী প্রধানের মরণ শয্যার পাশ থেকে তাঁকে সরান যায়নি। যুদ্ধ স্থলে আশীর্বচনে আবার যোদ্ধাকে রণাঙ্গনে বিদায় জানান।

১৫ জুলাই বিকেল চারটায় আহত হেমায়েতের সংজ্ঞা ফিরে। ১৬ জুলাই জলিল পাড় মিশন হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। ২১ জুলাই মেশিনগান হাতে আবার কমান্ডার মৃত্যু পরোয়ানার সম্মুখ রণে। ব্যক্তিগত শৌর্যের মনোবল যে যুদ্ধ সাথীদের কেমন উদ্বুদ্ধ করে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ রূপকথার নন্দিত নায়করূপী মুক্তি কমান্ডার হেমায়েত।

ডিসেম্বরে বিজয়ের বাজনায় মুক্তিরা আনন্দে বাগ বাগ। মুক্তিরা কন স্বাধীন দেশে কার মতিগতি ঠিক থাকে না। কখন কি হয় কে জানে ! আমরা মুক্তিরা আবার জীবনে একত্র নাও হতে পারি। মিষ্টি মুখ না করে ছাড়ছি না হেমায়েত ভাই। এবার কাঁচুমাচু হেমায়েত কাত হয়। মুক্তিরা কার কথা কে শোনে। স্বতঃস্ফূর্ত বিজয় উল্লাসে হাজার হাজার রাউন্ড গুলির তুবড়ি ফুটিয়ে বিয়ের বাজনা-বাদ্য বাজায়। সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী আনন্দ উৎসবে বিয়ের অনুষ্ঠানে মেতে উঠে। জোর করে টেনে হিচড়ে দুটাকে বিয়ের আসরে নেওয়া হয়। হেমায়েত ভাবিরা লেলিয়ে দেয়া সোহাগিনীর মত মেহেদিয়ানা উৎসব করেন।

মুক্তিযোদ্ধার প্রেমের পরিণতি প্রণয় ও পরিণয়। পরিপূর্ণ ইসলামি শরায় তাঁদের বিয়ে হয়। হেমায়েত নিজের থেকে সোনেকাকে একটি কাবিন নামা দেন। সোনেকা-হেমায়েত সাক্ষাৎ, উদ্ধার, পরিচয়, প্রেম, পরিণয় এক সত্যনিষ্ঠ রোমান্টিক ঐতিহাসিক অধ্যায়। যুদ্ধ বাজ দেশ প্রেমিকের মনের মণিকোঠায় পুঞ্জিভূত ভালবাসার অমর প্রদীপের স্বাক্ষর সোনেকা-হেমায়েত প্রেম পারিজাত। তাঁদের প্রেমের অনির্বাণ শিখা আজো সবাইকে সুবাস ছড়ায়।

দেশ স্বাধীনের পর সোনেকাদের পোড়া ঘরের জোড়ায় হেমায়েতদের ঘরকন্যা শুরু হয়। দুঃখ সায়রের সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে কিবা ভয়। রুদ্ধদ্বার বোবা কামনায় সোনেকাদের জন্য। আজো সে চোখের জলে ভাসে অহর্নিশ। স্বাধীন দেশে সশস্ত্র হেমায়েত বাহিনীর ঢাকা আগমন চব্বিশ জানুয়ারি, ১৯৭২। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রাঙ্গণে হেমায়েত উদ্দিন ও হেমায়েত বাহিনী অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবকে অভিভাদন জানিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করেন। ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ হেমায়েত দলের অস্ত্র জমা দেয়ার সে সাদামাটা অনুষ্ঠানের তেমন চমকপ্রদ প্রচার হয়নি। সে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব উপস্থিতির কারণে হেমায়েতের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদ অনেকের

চক্ষুশূল। ফরিদপুরের এলাকা ও ঢাকা প্রবাসী ফরিদপুরের কিছু পরশ্রীকাতর ব্যক্তি ব্যাপারটা আড়চোখে দেখেন। তাঁদের দুঃখ, কোথাকার এক অজ্ঞাত কুলশীল হাবিলদার হেমায়েত শেখ পেয়ারে! আর আমরা এতদিনের নিবেদিত রাজনৈতিক কর্মী, সমাজ সেবক, আমাদেরই খবর নাই !! আচ্ছা দেখা যাবে!!!

হৃদয়-ঔদার্যে শেখ মুজিব হেমায়েতের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁর তখনকার চিকিৎসা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ৮ নং নিউ কেবিনে তাঁর এডমিশন। পুরা এক বছরের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হবার ব্যবস্থার নিশ্চয়তা নেই।

যমে মানুষে টানাটানির চিকিৎসা। রণাঙ্গন সাথী আজ হাসপাতালের শয্যা পাশে। বিনিদ্র রজনী প্রেম বিজয়িনী স্বামীর শিয়রে সেবিকার বেশে নিবেদিতা। স্বদেশের চিকিৎসায় কাজ হয় না। বাংলাদেশ সরকার তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করান ফ্রান্সের প্যারিসে। 'সোল প্যাথেরিয়া' হাসপাতাল। চিকিৎসা শেষে ১৯৭৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটে।

১৯৭৩ এর জাতীয় নির্বাচনে ফরিপুরের জাতীয় সংসদ প্রার্থীর ক্ষেত্রে শেখ মুজিব বিশেষ দুএক স্থলে তাঁর একান্ত ভালবাসার বিশ্বস্ত যোদ্ধার মতামত নেন। শেখ প্রেমের অতি আদরের কদর হেমায়েতের মরণ বাণে রূপ নেয়। নির্বাচনী কোন্দলে খুনের কেইসের আসামি বনে যান হেমায়েত। জেল-জামিন-কেইস সমানে চলছে তাঁর জীবনে। পঙ্গু যোদ্ধাকে নিয়ে কেমন চলছে সোনেকার প্রেমের জীবন ! তেত্রিশটি বছর পঙ্গু বিরামহীন নীরব কান্না স্রোতে ভাসছে সোনেকার সংসার। বাংলার আর এক হাবিলদার যোদ্ধা পঙ্গু কাজি নজরুলের জন্য প্রাণপাত করে গেছেন প্রমিলা নজরুল। পঙ্গু যোদ্ধা হাবিলদার হেমায়েতের সেবায় জীবন বিলিয়ে দিলেন সোনেকা। প্রমিলা ও সোনেকা দুজনই হিন্দু কন্যা। দুজনই ইসলামে দীক্ষা নেন। দুজনই বাংলার দুই দিকপাল যোদ্ধার জীবনের সঙ্গে অবিস্মরণীয় সেবার অনাগত বাঙালির নমস্য। জয়তু প্রমিলা। জয়তু সোনেকা।

সোনেকা হেমায়েত সংসারে জাগতিক ঐশ্বর্য নেই। আছে অনটন। তবু অফুরন্ত ভালবাসার আনন্দ সায়রে তাঁরা আদর্শ যুগল। প্রথম প্রিয়তমা হাজেরার মাঝে হারিয়ে গেছেন আজকের সোনেকা। তাঁর বর্তমান মুসলমান নাম হাজেরা বেগম।

সোনেকার বাবা সুরেন্দ্র নাথ রায়। তাঁর বাড়ি কোটালিপাড়া থানার 'ভুয়া গ্রাম'। আজ তিনি দেহান্তরিত। সোনেকার পিতা গোপালগঞ্জের অমর সন্তান শেখ মুজিবের মতই ইতিহাস খ্যাত হলেন মেয়ের কারণে। তাঁদের অবদানে বাংলার হিন্দু মুসলমান সমর্থক জামাই আবদারের মধুরেন সমাপেত সুসম্পর্কের মহিমার দীপ্তিতে ভরে উঠুক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুদ্ধ পর্ব-১ ঃ হেমায়েতবাহিনীর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ

কোটালিপাড়া যুদ্ধ

প্রারম্ভ ঃ নির্ভেজাল বাঙালি শৌর্যে গড়া হেমায়েত বাহিনী। অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধে গেরিলাযুদ্ধের অপার বিস্ময় 'হেমায়েত'। তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার মৃত্যুঞ্জয়ী কমান্ডো একশনের প্রথম সার্থক সাফল্য কোটালিপাড়া বিজয়। মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েতনামার পূর্ণাঙ্গ বিবরণের অংশ বক্ষ্যমান কোটালিপাড়া ১ম যুদ্ধ। তাঁর ছোটবড় দেড়শত যুদ্ধ অপারেশনের প্রাথমিক সর্বাধিক সাফল্যের বিজয় ফলক কোটালিপাড়া থানা দখল। এ-থানা দখলের পাঁচটি যুদ্ধের প্রথমটির বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

কোটালিপাড়াথানা আক্রমণ

(প্রথম আক্রমণ ০৯ মে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)

যোদ্ধা পরিচিতি ঃ হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন, পাকিস্তান আর্মি মিউজিক স্কুল এবোটাবাদের ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় ১৯৭১ সালে সস্ত্রীক চলে আসেন ঢাকায় এবং যোগ দেন ২ ইবিআর জয়দেবপুর। জয়দেবপুরে অবস্থিত ২য় ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করে অস্ত্র জমা নেয়ার পাকিস্তানি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বাঙালি জনতার ওপর গুলি চালনার পাক ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব-এর নির্দেশ অমান্য করার সূচনা করেন হেমায়েত। ২৫ মার্চ পরবর্তী সময়ে হেমায়েত ব্যাটালিয়ানের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর সফিউল্লাহ গ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান কিন্তু ২৮ মার্চ সকালে জয়দেবপুরের অবশিষ্ট পাক প্রতিরোধ বিচূর্ণ করে দেন তিনি। পাক রণকৌশল প্রশিক্ষণের নয়ানীতি অনুসারে পদাতিক ব্যাটালিয়ানগুলি ব্রিটিশ অস্ত্রের স্থলে চিনা অস্ত্রে সজ্জিত ছিল কিন্তু পূর্বেকার ব্রিটিশ অস্ত্র তখনো সরিয়ে নেয়া যায় নি। সফিউল্লাহ গ্রুপ তাড়াহুড়ার মধ্যে শুধুমাত্র নতুন চিনা অস্ত্রগুলো হাতিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এবার হাজার হাজার জংগি শ্রমিক ছাত্র-জনতার সহায়তায় হেমায়েত প্লাটুন জয়দেবপুরের অস্ত্রাগার লুটে নেন এবং পরে পাক-বিমান হামলার মুখে সটকে পড়েন।

পরবর্তীতে জয়দেবপুরের মাস্রা হাই স্কুল, কাপাসিয়া, বর্মি, কাওরাইদ, কালিয়াকৈর, সাটুরিয়া, আরিচা প্রভৃতি স্থানে সশস্ত্র যুদ্ধ করেন এবং এক পর্যায়ে পৌঁছেন আপন জিলা ফরিদপুর। এখানে প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধে সশস্ত্র জনবলের অভাবে প্রতিরোধবাহিনীর ব্যর্থতায় গোয়ালন্দের পতন ঘটে। ফলে, পাকিস্তানিদের

অগ্রযাত্রা চালু থাকে। জনতার ওপর পাক প্রতিহিংসার ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম এড়াতে এবং পাক-আর্মিকে গেরিলা যুদ্ধের ফাঁদে ফেলতে আপাতঃ রণে ভঙ্গ দেন হেমায়েত। অকুতোভয় যুদ্ধসাথীদের নিয়ে ভাঙ্গা, টেকেরহাট, বাঘিয়ার বিল, রাজৈর-এর পথে পথে হতাশায় ম্রিয়মাণ জনতার মাঝে স্বাধীনতা যুদ্ধের বীজ মন্ত্র ছড়িয়ে কয়েকদিনের সবিরাম যাত্রার পর তিনি পৌঁছলেন গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া থানার নিজগ্রাম 'টুপারিয়া'; সেদিন ছিল ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১।

পুনর্বিন্যস্ত সংগঠন ঃ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি মাত্র সতের জন জানবাজ যোদ্ধা নিয়েই বঙ্গ বিজয় করেছিলেন। হাবিলদার হেমায়েতউদ্দিনও তেমনি প্রতীকী হিসেবে সেই সংখ্যাটিই বেছে নিলেন। প্রথমে মাত্র সাতজনের গোপন সশস্ত্র সংগঠন গড়তে সমর্থ হন হেমায়েত, তাদের তিনজনই অস্ত্র চালনায় অনভিজ্ঞ। মূলদলের চারজন অস্ত্র চালনায় দক্ষ প্রাক্তন ঝানু সৈনিক। সহযোদ্ধা বাড়ানোর লক্ষ্যে জরুরিভিত্তিতে দক্ষ ও নিবেদিত মানুষের খোঁজে চারিদিকে সংগোপন যোগাযোগ চালানো হয়। তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টায় নবগ্রাম ও আশপাশের মুক্তিপাগল যুবসংগঠনসহ চারদল একাত্ম হলে হেমায়েত তাঁদের সর্বসম্মত অধিনায়ক নির্বাচিত হন। এভাবে অস্ত্রে ও জনবলে তাঁরা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেন।

দোড়গোড়ায় শত্রু হানা ঃ শত্রু ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ছোট বড় শহর-বন্দর-থানা দখলের ন্যায় কোটালিপাড়া দখল করে নেয়। নাকের ডগায় থানা কোটালিপাড়ায় সশস্ত্র শত্রু তাদের ঘাঁটি শক্তিশালী করছে। অপরাপর স্থানে শত্রুর হাতে নিহত নারী-শিশু-যুবক হত্যার ন্যায় এখানেও নিরীহ জনতার ওপর নেমে আসতে পারে পাকিস্তানি পশুদের নির্মম অত্যাচার। এমন আশংকায় ভীত এলাকার মানুষ; সবার ধারণা ধ্বংসযজ্ঞ আসন্ন প্রায়। কোটালিপাড়ায় স্থান নেয়া বর্বর বাহিনী হত্যা-ধ্বংস-জ্বালাও-পোড়াও গর্বের হুংকার ছেড়ে এরই মধ্যে হত্যা পর্বে নেমেছে। দুচার গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তারা ধ্বংসযজ্ঞের রিহার্সেল দিয়েছে মাত্র। পরিস্থিতি অনুকূলে না-হলেও পাকবাহিনীকে আক্রমণ করে হেমায়েত তাঁর নিজ দলের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে চান এলাকার মানুষের কাছে। ৩০ এপ্রিল, ১৯৭১ কোটালিপাড়া ডাক-বাংলোর পুলিশ প্রহরায় বন্দি জনার্দচিশেক স্থানীয় গণ্যমান্য আওয়ামীলীগ নেতাকে মুক্ত করে নিজের উপস্থিতি ও আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন। পুলিশ নিজেদের দুর্বলতা কাটাতে পাক-আর্মির সাহায্য কামনা করে। তারা হেমায়েতকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়।

অধিনায়কের সিদ্ধান্ত ঃ দুই গোয়েন্দার মারফত তথ্যনিষ্ঠ খবর সংগৃহীত হয় যে শত্রু শক্তিশালী অবস্থানের চারপাশে সুদৃঢ় বাঙ্কারে আস্তানা গাঁড়ছে। অনতিবিলম্বে তাদের আস্তানার বিস্তার কার্যক্রম স্তিমিত করে দেয়া আবশ্যক। বিলম্বে ঘরের শত্রু বিভীষণরূপী স্বদেশী স্বাধীনতা-বিরোধীদের শক্তির দম্ভ বেড়ে যেতে পারে, যার কারণে স্বাধীনতাকামী জনতার মনোবলে ভাঙ্গন ধরা স্বাভাবিক। পোড়া ক্ষত উপড়ে ফেলার মত কোটালিপাড়া দখলে অধিনায়ক হেমায়েত উদ্দিন অটল সিদ্ধান্ত নেন।

যুদ্ধ-পূর্ব রেকি সাফল্য ঃ 'হরিণা হাটি' এলাকায় 'হাইড আউট' (গোপন আশ্রয়-প্রস্তুতি-ফিরে আসার পূর্ব নিশানার স্থান) স্থাপনে খবরা-খবর সংগ্রহ বা রেকির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্থান: কোটালিপাড়া থানা সদরের মাইল ছয়েকের ব্যবধানে ঘাঘর বাজারের সন্নিকটবর্তী এলাকা।

৩ মে, সন্ধ্যা লগনে এক নৌকায় করে হেমায়েত, ইব্রাহিম ও সোলেমান রেকিতে যান। পথে হিরণ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি মুনশি আবুল কাসেম-এর সঙ্গে কাকতালীয়ভাকে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁদের। চরম বিপদে কাজে লাগতে পারে ভেবে একান্ত বিশ্বাসে তাঁকে সব ব্যাপার খুলে বলেন। তিনি দু'হাত আকাশে তুলে মুনাজাত করে মুক্তিবাহিনীর সাফল্য কামনা করেন। রেকি নৌকা ঘাঘর নদীতে পড়তেই বিপদ সংকেত পান হেমায়েত।

শত্রু পক্ষ থেকে নৌকা থামানোর নির্দেশ আসে। নৌকা কূলে ভিড়াও-ছ'সাত জনে একসঙ্গে হুকুম করে মুক্তির রেকি নৌকাকে। এবার প্রথম নৌকা থেকে জিজ্ঞেস করে, 'এই নৌকা কোথায় যাবে?' হেমায়েত মেয়েলি স্বরে জবাব দেয় "জাঠিয়া সাধু বাড়ি, নৌকায় কলেরা রোগী আছে।"

ছলনায় কাজ হয় না। পুলিশের নৌকা থেকে কড়া হুকুম আসে, 'ভিড়াও নৌকা এখানে, থানার সাহেবরা ডাকে'। চারিদিকে অনেক প্রহরা নৌকা, পুলিশকে এ-মুহূর্তে কোনক্রমেই এড়ানো যাবে না মনে হলো। পাশাপাশি গোটাপাঁচেক শত্রু নৌকা সশস্ত্র। শত্রু নৌকা থেকে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল তাক করে আছে এ-নৌকার দিকে। আবার হুকুম হয়, "ভিড়াও নৌকা, নইলে গুলি করবো।"

অবস্থা বেগতিক দেখে হেমায়েত বলেন, "ভাই ভিড়াইতেছি কিন্তু দয়া করে গুলি করবেন না। নৌকায় কলেরার রোগী আছে।"

সঙ্গী রেকি ইবরাহিম মেকি কলেরা রোগীর মতন বমির অভিনয় করেই চলছে। বমির গড় গড় আওয়াজে পুলিশের একান্ত বিশ্বাস হয়। এবার একজন পুলিশ বলে, আসলেই নৌকায় কলেরার রোগী, শুন না রোগীর বমি করার কি মারাত্মক আওয়াজ!

সামনে চরম বিপদ। নিজেদের জীবন বাঁচাতে অস্ত্র তাক করে সঠিক নিশানায় তৈরি হয়ে আছে তিন জনেই। নেতার ইশারা পেলেই ফায়ার ওপেন হবে, জীবন তো বাঁচাতে হবে। অথবা মরণের আগে এটাই হতে পারে শেষ লড়াই!

নেতার ইঙ্গিতে নৌ-মাঝি শত্রু-নৌকার ঠিক পাশাপাশি নিজেদের নৌকা ভিড়ান। ত্বরিৎ লাফিয়ে এসে স্থানীয় পুলিশের ইনফরমার মাঝবাড়ির "মালেক" মুক্তি-নৌকার গলুইতে মাঝির পাশে এসে বসেন। তিনি নৌকায় কারা আছেন তার তদারকিতে লেগে যান।

এরই মাঝে আকস্মিকভাবে দুই জানবাজ মুক্তি-রেকি ইব্রাহিম ও নায়েক সোলেমান সশস্ত্রভাবে লাফ দিয়ে গিয়ে ওঠেন শত্রু নৌকায় এবং নিজেরা ফায়ারিং পজিশনে। একইসঙ্গে স্বয়ং হেমায়েতও ফায়ারিং পজিশনে। সবার অস্ত্র শুধু ট্রিগার চাপের অপেক্ষা মাত্র। অবস্থা দেখে বাঙালি পুলিশ যার যার অস্ত্র ফেলে 'যো পতি

পলায়তি'। পুলিশের অবস্থা দেখে রাজাকার কখন পালিয়েছে অন্যেরা না দেখলেও মুক্তিরা ঠিকই দেখেছেন। বিনা যুদ্ধে একটিও গুলি না ছুঁড়ে তিনটি রাইফেল দখলে এলো মুক্তির। হিপ হিপ হুররে। পরবর্তী অভিযানের হাইড আউট কোটালিপাড়া থানার মাইল ছয় দূরে ঘাঘট বাজার সন্নিহিত গ্রাম।

[রেফারেন্স : মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েতবাহিনী, কৃত লে: কর্নেল (অব.) এস. আই. এম. নূরন্নবী খান, বীর বিক্রম]

মুক্তির শক্তি পরীক্ষা ঃ শত্রুর আঘাতের মাত্রা যত প্রচণ্ড, প্রতিশোধের মাত্রাও জ্বলে তত ধিকি ধিকি। হেমায়েতকে শেষ করার আর আছে কি ? তিনিও মরিয়া প্রতিহিংসায় শত্রুর প্রতি আপতিত। দুর্যোগের সাথীদের বিদায়। তাঁরা সব নিজ নিজ গ্রামে পরিবারবর্গ দেখতে গেছেন। ডান-বাম হাতের শক্তি সাহসের দুজন মাত্র সাথী। বডিগার্ড ঢাকার কাপাসিয়া থানার ইব্রাহিম ও নিজ গ্রাম সেনারগেতির সোলায়মানকে সঙ্গে নিলেন। আত্মশক্তির টেস্ট কেইস কোটালিপাড়া থানা। হাতের কাছে পাওয়া স্বদেশী পাক শত্রু পুলিশকে টার্গেট করা হলো। কারণ তারাই পাক আর্মির পক্ষে দেশে যত অঘটনের অশনি সংকেতের ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

মৃত্যুর দুয়ারের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যোদ্ধা হারানোর রিস্ক নিলেন না। তাই তিনজনের দুঃসাহসী কমাণ্ডো হামলা। পরিপূর্ণ সুইসাইডেল স্কোয়াড। তাঁরা অতর্কিতে মৃত্যু-গহ্বরের চোয়ালে প্রবেশ করেন ৯ মে, ১৯৭১ দিবাগত রাত চারটায়।

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা ঃ মে মাসের শেষ দিকে হেমায়েত বিশাল পরিবার নিয়ে মহা বিপাকে পড়েন। মাশাআল্লাহ, মা-বাবা-ভাই-ভাবি-বোন-পরিজন নিয়ে ১৯ জনের সংসার। এখন তারা থাকেন এক হিন্দু বাড়িতে। নামাজ-রোজায় পা-বন্ধ মুসলমানের জন্য ব্যাপার তেমন সুবিধার নয়। খাবার-দাবাড়েরও অমিল আছে কয়েক বিষয়ে, দু'দলেরই পস্তানোর দশা। তারা আছেন কেবল বন্ধুত্বের মহত্বতে, তবে দু'দলেরই মানসিক পীড়ন আছে।

কমান্ডার কুরা মিয়া ব্যাপারটি সুরাহার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কুরা মিয়া একদিন নিজের অস্ত্র লুকিয়ে মুক্তি-আত্মীয়ের পরিচয়ে আজিজ চেয়ারম্যানের বাড়িতে যান। বরিশালের গৌরনদী থানার বার পাইকা গ্রামের অধিবাসী আজিজ চেয়ারম্যান। বংশ গরিমা এবং ধনসম্পদে কোথাও কমতি নেই। লাঠিয়ালের জোরও ভাল। গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তিতে বাঘে-মহিষে এক ঘাটে পানি খাওয়ার মতন অবস্থা। পাক আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানিদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলেন তিনি। বরিশাল সার্কিট হাউসের পাক আর্মি যেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সুহৃদ। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই লুটে নেন এলাকার হিন্দুদের বেশকিছু বাড়িঘর। সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তিনি। পাক দাপটের আনুকূল্যে সে এলাকার সুন্দরবনের বড়ে মিয়া বাঘ মামার চেয়েও হামবড়া 'কিয়া হুজুরে'! সব ধরনের লোকজন ধর্না দেয় তাঁর কাছে, আত্মপ্রসাদের চূড়ায় তাঁর অবস্থান। শতাব্দীর শেষ আগের ওড়ানো সম্পদ হাতানোর সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেন নি। দূর

সম্পর্কে তিনি হেমায়েতের আত্মীয়। ছদ্মবেশী মুক্তি হেমায়েতবাহিনীর কুরা মিয়া আত্মীয়তার সুবাদে উঠে পড়েন আজিজ চেয়ারম্যানের বাড়িতে। কুরা মিয়াও আজিজ-বংশেরই লোক। তিনি নৌকার সশস্ত্র যোদ্ধাদের দূরে সরিয়ে যেন একা একা বেড়ানোর ছলে এসেছেন আত্মীয় বাড়ি। কিন্তু কুরা মিয়া যে গুঁড়াদুধের বেপারী মত ছদ্মবেশী মুক্তি তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি আজিজের বাড়ির কেউ, এমনকি স্বয়ং আজিজও। পরম আত্মীয়তার সুযোগে পুরা সুযোগ নেন কুরা মিয়া।

আত্মার আত্মীয়কে রক্ষায় কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করেন কুরা মিয়া: "আহা কখন কি হয়ে যায়! মুক্তিরা কখন আপনাকে মেরে ফেলে! মুক্তিরা সব জানে আপনি কি কি করে বেড়াচ্ছেন। আপনি পাকিদের সাহায্য করার কারণে মুক্তির দাগ-নম্বরে আছেন, যে-কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে!"

এবার আত্মীয় বাঁচাতে কুরা মিয়া ও আজিজের চূড়ান্ত পরামর্শ হয়। ফেরেববাজি ছেড়ে সুযোগ বুঝে মুক্তি কুরা মিয়া স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। "ভাই আজিজ, আমিই মুক্তি কমান্ডার, নৌকায় আমার সশস্ত্র স্কট অপারেশনের অর্ডারের অপেক্ষায়। এখানে আমিই অপারেশন কমান্ডার। এই দেখুন আমার অস্ত্রপাতি।" এই বলে গোটা তিনেক অস্ত্র ভর্তি নৌকার ঘটনা বর্ণনা করেন কুরা মিয়া। নৌকাগুলি কাছাকাছিই আছে। হুকুম দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে উপস্থিত হবে।

আজিজ চেয়ারম্যানের আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার পর শুকনো প্রাণে রস সিঞ্চনের জন্য অভয় দিয়ে কুরা মিয়া বলেন, ভয় নেই। হাজার হলেও আমি আপনার আত্মীয়। আপনার মারার অর্ডার দিই কী করে! এবার আপনি বেঁচে গেলেও পরে কি হয় আল্লায় জানেন। বহুতর অভয়দানে দু'জনের গোপনীয় পরামর্শ হয়। তাদের কথাবার্তার ফাঁকে মুক্তি নৌকায় সশস্ত্র যে মুক্তিরা ছিল চিকন চালের ভাত, ডাল ও হাঁসের মাংসে তাদের খাবারের ব্যবস্থা হয়। আত্মীয় রক্ষায় কুরা মিয়া সূক্ষ্ম চাল চালেন, রাতে দু'জনের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে চুক্তি হয়।

"আজিজ ভাই, আপনি পাক মিলিটারিদের কাছের লোক, আর আমি হেমায়েতের অতি বিশ্বাস ও আত্মার একান্ত কাছের লোক। সুতরাং আপনাকে বাঁচাতে যা করার সবই করবো আমি ইনশাআল্লাহ। হেমায়েত আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে মারার জন্য, তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন বলেই এ-দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। কাজেই আমার কথা তিনি অবশ্যই রাখবেন। হেমায়েত ভাই যাতে আপনাকে না মারেন, হিন্দুদের বাড়িঘর ও মালামাল লুটের প্রতিশোধ না নেন সে দায়িত্ব আমার। আপনি যা করেছেন সবই হেমায়েত ভাই জানেন। আপনার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে সহায়সম্পদ সে লুটবেই। আপনাকে পেলে তো রক্ষাই নেই, জীবন্ত কবর দিবে। এমতাবস্থায় সর্বরোগহর বালাই একটাই দাওয়াই আমি বাতলাতে পারি, তবে সে কাজ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। হেমায়েত ভাইর পরিবার রাখার বর্তমানে কোন নিরাপদ জায়গা নেই। আপনি এ-সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেন। আপনি যদি তাঁর পরিবারবর্গকে স্বজন করে নিজের বাড়িতে জায়গা দেন তো এক গুলিতে দুই বাঘ। নিজেও বাঁচবেন, সে-ও

কৃতজ্ঞ থাকবে আপনার প্রতি। হেমায়েত কর্তৃক আপনাকে ধ্বংসের সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে চিরতরে।

বুদ্ধিমান আজিজ চেয়ারম্যান প্রস্তাবটি লুফে নিলেন। "আসলে তো সত্যি কথা, মিলিটারির তো আর সব সময়ে আমার এখানে এসে থাকে না। তয় মুক্তি গো লইয়া আইলেই মুশকিল।" কুরা মিয়া এবার আগবাড়ন্ত হয়ে বলেন," শুনুন আজিজ ভাই, আমরা যারা একবার অস্ত্র হাতে তুইলা নিছি, হয় তো সবাই বাঁচবো না, তবে দেশ স্বাধীন হবেই। আর হেমায়েত পরিবারের যদি কিছু হয়, তবে সমূলে আপনি ধ্বংসে হয়ে যাবেন। কথাডা মনে রাইখেন। আরও মনে রাইখেন, কমান্ডারের পরিবাররে এখান রাইখা আট-দশ জন কেউ রাখবো না এইডা আবার ভুইলা যাইয়েন না। সুযোগ পাইলেই বিড়ালের বাচ্চার মতন চুবাইয়া ফালাইবো। আশেপাশে ছদ্মবেশী মুক্তিরা থাকবেই।

হেমায়েতের কাল তালিকায় আপনার নাম আছে, সেখান থেকে বাঁচানোর জন্যই আমার এই প্রস্তাব মাত্র। বিপদকালে তো আর নিজের আত্মীয়কে ভুলে যেতে পারি না! হেমায়েত যাতে আপনাকে না মারে সে-কারণেই এটা আমার নিজের ব্যবস্থা। এর পরেও তার কাছে থেকে অনুমতি নিতে হবে।

চেয়ারম্যান আজিজের নাম আজরাইলরূপী হেমায়েতের কাল তালিকায় আছে শুনে সাকরাতুল মওতের নিশানায় যেন তার হার্ট ফেল করার অবস্থা। কমান্ডার কুরা মিয়া মাটিতে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে চেয়ারম্যান আজিজকে। এর আগে মিষ্টি মিষ্টি কথায় মরণ ছোবলের পরিণতিটা বুঝিয়ে দেন চেয়ারম্যানকে। মুক্তিযোদ্ধা বিগড়ালে এ-দেশে কারও রক্ষা নেই। যারা যুদ্ধ করে মরছে দালাল মেরে মরতে তাদের আর ভয় কি?

এবার আজিজ মিয়া গররাজি থেকে নিমরাজি এবং নিমরাজি থেকে নুনরাজি হয়ে হেমায়েতকে বাড়িতে থাকতে দেয়ায় পুরোপুরি রাজি হন এবং হেমায়েতের পরিবার-এর থাকার জন্য একটি সুবৃহৎ ঘর বরাদ্দ করেন। গ্রামের হিন্দু বাড়ি লুট করে আনা নতুন সে-সুবৃহৎ ঘরে উঠে যায় হেমায়েতের পরিবারবর্গ।

ইতোমধ্যে পুরো ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়। এক মাসের ব্যবধানে গোয়েন্দারা এসে বাহিনী প্রধানকে জানিয়ে দেয়, দু'চারদিনের মাঝেই বরিশাল থেকে বার পৈকা ও সাইবের হাটে পাক আর্মি আসবে। মরা গরুর গন্ধে শকুনিরা আসবে সেটাতো দিবালোকের মতই স্পষ্ট। বাহিনী প্রধান হেমায়েত যেন ব্যাপারটি দিব্যনেত্রে আঁচ করতে পারলেন।

মুক্তিরা বাহিনী প্রধানের পরিবার রক্ষায় মরণ পণ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তাৎক্ষণিক এক সুসজ্জিত শক্তিশালী মুক্তি-কোম্পানি যাত্রা করেন শৈলধর পাঁড়েবাড়ি থেকে। বার পৈকার হেমায়েত পরিবার রক্ষার নিরাপত্তায় এক প্লাটুন সুইসাইডাল স্কোয়াড রণসাজে প্রস্তুতি নেয়। দশ ঘন্টার মধ্যে তারা হেমায়েত পরিবারকে সাথে নিয়ে আসেন শৈলধর পাঁড়েবাড়ি। তার পাশের গ্রাম চলবল। দু'গ্রামের দূরত্ব আধা

মাইলের মত। যাতায়াতের একমাত্র বাহন নৌকা। হেমায়েত পরিবার কোন সময়ে থাকে চলবলে, কোন সময় শৈলধার পাড়েরবাড়ি। এ-যেন নাইয়রির শ্বশুরবাড়ি আর বাপেরবাড়ি যাতায়াত।

হেমায়েত পরিবার বার পৈকার আজিজ চেয়ারম্যানের বাড়ি ছেড়ে আসার দিন তিনেকের মধ্যে পাক-আর্মি ঘটনাস্থলে এসে পুরো ব্যাপার জানতে পারে। তাদের রাগ এখন কেবলি আজিজ চেয়ারম্যানের ওপর। আজিজের শ্যাম রাখি না কুল রাখির খেসারত দিতে হয় বিভিন্নভাবে। এই খেসারতের বিনিময়ে পেশ করতে হয় হিন্দু কুলবধূ এবং পরের ঘরের সেয়ানা মেয়েদের। এ-খবর পেয়ে রাগে ফোঁসে ওঠেন হেমায়েত। গোয়েন্দা রিপোর্টের অপেক্ষায় থাকেন তিনি। মুক্তি-তদন্তে ঘটনা সত্য প্রমাণিত হয়। দোষী চেয়ারম্যানকে মুক্তিরা ধরে আনে বাহিনী সদরে, কিন্তু বাহিনী প্রধান তখন লখণ্ডা তালুকদার বাড়ির দালানে চিকিৎসারত।

মুক্তিরা বিচারকার্যে চেয়ারম্যানকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। কিন্তু হেমায়েত পরিবারের সকল সদস্য দুর্দিনে চেয়ারম্যানের নুন-নিমক খেয়েছেন। তারা এবং স্বয়ং বাহিনী প্রধান হেমায়েত দানাচিজের ঋণ অস্বীকার করতে পারলেন না, তাই দণ্ডিত চেয়ারম্যানের মৃত্যুদণ্ড রহিত করে ঔদার্যের পরিচয় দেন। তবে তার জন্য ভিন্নতর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, একমাস চেয়ারম্যানকে মুক্তি-সদরে হাজতবাস করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি সপ্তাহে সশরীরে এসে হাজিরা দিতে হবে। এ-যাত্রা অর্থ জরিমানায় প্রাণে বাঁচেন আজিজ। অন্যদিকে তাঁর ভাই ও আত্মীয়-স্বজনকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে হয়। এভাবেই ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় কাটে আজিজ চেয়ারম্যান এবং তার সহযোগীদের। ফেরাউনের ঈসা নবীর প্রতিপালনের মত পাক বশংবদ লীগারের বাড়িতে আশ্রয় পান মুক্তি পরিবার, মুক্তিযুদ্ধের এটাই এক বিচিত্র রূপ।

যুদ্ধ স্থল ঃ থানার দক্ষিণ ও উত্তর পাশে প্রতি দরজায় মাত্র একজন করে ফিক্সড বেয়নেট লোডেড রাইফেলের সশস্ত্র প্রহরা। থানার ফ্রন্ট উত্তর মুখে। তাই থানার মূল প্রবেশ পথের স্যান্ট্রিকে ডিসপোজাল করার ভার পড়ে মোজাহিদ হাবিলদার ইব্রাহিম খানের উপর। বহির্গমনের লোকজন প্রতিরোধের দায়িত্বে রইলেন সোলেমান। ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় যার যার কাম সারতে হবে।

যুদ্ধ সাথী ও যুদ্ধ টার্গেট ঃ হেমায়েতের কান্দি গ্রাম জ্বালিয়ে তাঁর ঘরবাড়ি ভস্মিভূত করা হয়েছে। এ-কার্যে নেতৃত্ব দেন কোটালিপাড়া থানার বাঙালি ওসি আবদুল বারি জোয়ার্দার; তার বাড়ি যশোর। লোকজন শূন্য পোড়া বাড়িতে গোস্যার ক্রোধে জ্বলেন হেমায়েত। দুদিন আগে বাড়ি জ্বালানো পুলিশ অফিসার-এর থানা আজ মুক্তিবাহিনীর টার্গেট। গ্রামের ছেলে সোলেমান ও মুজাহিদ ইব্রাহিম মাত্র হেমায়েতের সঙ্গী।

ক্যামোফ্লেজ কমান্ডো ঃ সবাই পরিপূর্ণ খাকি ইউনিফরমে; সশস্ত্র ইকুইপমেন্টে সজ্জিত। অতি চমৎকার এবং নিখুঁত ক্যামোফ্লেজ। পাকিস্তানি সশস্ত্র ক্যাপ্টেন-এর আগমন। সঙ্গে তাঁর দুই বডিগার্ড সৈনিক। মুখে দুচার নির্ভেজাল উর্দু বাত। বিনা

গোলাগুলিতে থানার প্রবেশ পথে স্যান্ট্রির সশস্ত্র সবিনয় সালাম গ্রহণের মাধ্যমে পশ্চিমা আর্মি ক্যাপ্টেনের থানার অভ্যন্তরে প্রবেশ নিশ্চিত হয়। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত সব কয়টারে কব্জা করে তিনজনারই আচমকা চার্জ হুংকারে থানায় প্রলয় কম্পন শুরু হয়। বায়ান্নজন পুলিশ তখন গভীর ঘুমে অচেতন। তাদের অনেকেই প্যাট্রল ডিউটি সেরে এসে শেষ রাতের নিঃসাড় ঘুমে। সারা রাত তারা শত্রু হেমায়েতের দলবলের অপেক্ষায় অন্যত্র প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। হন্যে হয়ে সবাই তাদের আতিপাতি খুঁজে বেড়ায়। রজনীর শেষ প্রহরে শত্রু আক্রমণের আশঙ্কার ধাক্কা তাদের কেটেছে। শঙ্কা মুক্ত পুলিশ ঘুমের নেশায় অসাড় দেহটি যার যার বিছানায় এলিয়ে দেন। অচেতন শত্রুর দুর্বলতায় আঘাত হানে সুচতুর রণকৌশলী মুক্তি।

ভেলকি মারা উক্তি ঃ তিন কমান্ডোরই পরনে খাকি পোশাক। মত্ত মাতঙ্গের জংলি চেহারা। মুখে উর্দু বোল যেন খাস পশ্চিমা খান সেনা। প্রচণ্ড তর্জন গর্জনের আকস্মিক চার্জ আওয়াজে হচকচিয়ে যান ঘুমন্ত পুলিশ। তন্দ্রা কাটতেই লাফিয়ে উঠেন বিশ্রামের আশ্রমের পুলিশ সিপাই। "গাদ্দারে বাঙাল নড়না চড়না হিল না মত্। সুয়োর কা বাচ্চে ইয়ে তোমহারা আসলি কাম। ডিউটি ছোঁড়কে তামাম শালা বিলকুল ঘুমাতে হেঁ। শেখ জাদে হারামখোর বাঙাল ইয়ে পুলিশ কা নকরি নেই। নাখান্দা বেইমান আভি তোমকা আসলি সবক শিখলায়েঙ্গে।" খাকি পোশাকের ক্যাপ্টেনের ধমকে প্রাণ ভয়ে থরহরি কাঁপে থানার পুলিশ।

সময় মাপা অপারেশন ঃ সকল পুলিশ কর জোড়ে দাঁড়িয়ে যান। পাশের বেয়নেট লাগানো, লোডেড রাইফেলটি পর্যন্ত হাতে নেয়ার সাহস কারোরই হলো না। সামরিক উর্দু জবানের এয়ছা-ই মরতবা। "হাতিয়ার পর হাত লাগানা মানা। মরণেকা খায়েস নিহি হায় তো খাড়া হো যাও। জো যেই সি হালত পর হো বেগার হাতিয়ার খালি হাত ফলিং হো যাও কমজোর নিমক হারাম।" প্রাণের মায়া বড় মায়া। এক মিনিটের মধ্যে জো হুকুম ভয়ে ভীত সিপাই দল দাঁড়িয়ে গেলেন সুশৃঙ্খল লাইনে। ঘড়ির কাঁটায় তখন সাড়ে চারটা।

বিপর্যস্ত শত্রু ঃ থানার ভুঁড়িওয়ালা দুই পুলিশ অফিসারের উদ্দেশ্যে সবেগে দৌড়ে গেলেন সোলেমান ও ইব্রাহিম। হাতের মেশিনগান সঠিক নিশানায় পুলিশের প্রতি তাক। সবার চোখে সর্ষে ফুল। হেমায়েতের মুখে এবার খাস বাঙলা। লড়ছ কি মরছ। আর কথা মানলে জীবন ভিক্ষা মিলবে। সবাই প্রাণ ভিক্ষার জন্য জীবনের উচিত শিক্ষা পাক দালালির নতিজা স্মরণে হাত উঁচু করে কাঠ হয়ে দাঁড়ান। এবার পেট মোটা কাঠের পুতুল ৩ পুলিশ পুঙ্গব হেমায়েতের সামনে এসে দাঁড়ায়। সোলেমান-ইব্রাহিম তাদের পিছনে অস্ত্র তাক করে হাত উঁচু করিয়ে দৌড়ে নিয়ে আসেন। হুকুম মাত্রই তারাও সাধারণ পুলিশের সাথে একই লাইনে দাঁড়ান। প্রথমে বিচার হয় আসল কুলাঙ্গারের।

শত্রুর প্রতি মুক্তি ঔদার্য ঃ ৫৪ জন পুলিশসহ থানা দখলের পর ওসি আবদুল বারি জোয়ার্দারকে তলব করা হয়। কান ধরে তাকে টেনে আনা হয়। তার কলেজ

পড়ুয়া কন্যার অঝোর কান্না বেহায়া ওসি জোয়ার্দার ভার্যার প্রাণ বিগলন বিলাপ আর বিলাপ। তিনি লোভী স্বামীর অর্থ, সম্পদ আত্মসাতের জীবন্ত ঘটনার বিবরণ দেন। স্বামীর প্রাণ রক্ষায় তার আকুল আকুতির কাকুতি মিনতি। মা ও মেয়ের সে যে কত ভাষার কত বিনয় বচনের প্রাণ ভিক্ষা, সেসব ভাষায় বর্ণনার উর্ধ্বে। মেয়ে চান আদরের পিতার প্রাণ ভিক্ষা। আর স্ত্রী-কন্যার কারণে নির্লজ্জ ওসি আবদুল বারি জোয়ার্দার ভবিষ্যতে অন্যায় থেকে বিরত থাকার কড়ারের পর মুক্তির ঔদার্যে ক্ষমা পান তিনি। ওসির স্ত্রী-কন্যার ক্রন্দনের অন্তরালে হেমায়েতের চোখে ভেসেছে অনির্বাণ মূর্তি হাজেরার মুখ। হেমায়েতের অন্তরে নারী মমতার দুর্বলতায় পরবর্তীতে দুবার মুক্তির হাতে ধরা পড়েও ছাড়া পান জোয়ার্দার।

অত্যাচারী অত্যাচারীই। কি হিন্দু কি মুসলমান। দালালিতে কেউ কম যান না। মুসলমান বড় দারোগা আবদুল বারি জোয়ার্দারের গর্হিত কাজের জোয়ারে ভাসলেন হিন্দু ছোট দারোগা সুনীল বাবু। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধে গেলেন না হেমায়েত। পুলিশ অফিসার সুনীল বাবুরও স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে দূর হবার সুযোগ মিলে মুক্তি-ঔদার্যে। স্ত্রী-কন্যার অন্তরমন সঞ্চিত কান্নার বিলাপে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে রক্ষা পান পুলিশ অফিসার দুজন।

থানায় মুক্তি ডাকাতি ঃ আবার পুলিশদের উদ্দেশ্যে তাঁর খাস বাঙলা জবানের হুকুম। যে যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় থাকুন। কেউ পিছনে তাকাবেন না। সবাই হাত উপরে রাখবেন। অফিসার দুজন নিশ্চুপ দাঁড়ানো। অন্যদের জন্য নির্দেশ, "নিমেষে এক দৌড়ে সবাই আমার চোখের আড়ালে চলে যান। মনে রাখবেন পিছনে তাকানো মাত্র গুলিতে উড়বে খুলি।" খুশিমনে পুলিশ সিপাই ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলে দৌড়ে পালায়। পুলিশ অফিসারদের প্রতি সৌজন্য দেখানো হলো, কারণ পরিবারবর্গ সাথে রয়েছে। তবে এতক্ষণে তাদের দাঁতে ঠক ঠক, হাঁটু হাঁটু কাঁপার টক্কর, শরীর ঘামে চুবা চুবা। কিছুক্ষণ ভয়ভীতি দেখানোর রিহার্সেল করে স্বল্পক্ষণ পরে মুক্তিরা বিদায় নেয় থানা থেকে।

অন্ধকার মুক্তির আলোতে পলায়ন ঃ কমান্ডো একশন শেষ। কোটালিপাড়া থানা সাফ। এবার মালে গণিমত পাক অস্ত্র হাত করা শুরু। বিকাল দুটা পর্যন্ত চলে থানা লুট। পয়েন্ট থ্রি নট থ্রি রাইফেল, সিভিল গান, পিস্তল, রিভলবার ধরনের শতাধিক অস্ত্র উঠানো হলো দু'নৌকায়। অন্যান্য গোলাবারুদ, খাদ্য-শস্য, পোশাক জাতীয় সব লুট করা হয়। বিদ্যুৎ চমকের মত চতুর্দিকে অবিশ্বাস্য দুঃসাহসের মুক্তি সাফল্যের বিজয় বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। লুটের মালে ভর্তি তিন নৌকায় তিন কমান্ডো চলছেন গোপন আড্ডায়। দুই তীরে হাজার হাজার জনতার বিজয় উল্লাস। জয় বাংলা, নারায়ে তকবির আল্লাহ্ আকবার ধ্বনিতে উল্লসিত জনতা তিন বিজয়ী বীরকে অভিবাদন জানান। ডাকু পার্টি যতই এগোয় জনতার ভিড় তত বাড়ে। পথে পথে জনতার অভিনন্দন বার্তার উষ্ণ অভ্যর্থনা। দুই নৌকায় অস্ত্র ও এক বড় নৌকায় খাদ্য সামগ্রীর অন্যান্য লুটের মাল নিয়ে তাঁরা পৌঁছেন নেতৃস্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা বাবু

চিত্তরঞ্জন পাইনের বাড়ি। স্বল্প সময়ে নদী তীর লোকারণ্য। হাজার হাজার জনতায় ভরে যায় চিত্তরঞ্জন বাবুর বাড়ির আঙিনা। স্বাধীনতার জন্য জনতাকে উদ্দীপ্ত করে ত্রয়ী বীর মুক্তির বন্দনা গানে অনেকে বক্তব্য রাখেন। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরার যোগ্য পুত্র, দুর্দিনে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করা হেমায়েতের সাহসের তারিফ করেন নেতারা। স্বাধীনতাকামী নেতারা হেমায়েতের যোগ্য নেতৃত্বের পতাকাতলে সমবেত হতে যুব শক্তিকে আহ্বান জানান। জনতার চাপের আতিশয্যে কমান্ডো নেতাকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে হয়। তিনি বলেন : "আমার শক্তি আল্লাহর মদদ। জাগ্রত জনতা আমাদের প্রেরণার উৎস। যে জাতি মরতে জানে তাকে কেউ মারতে পারে না। আমি আপনাদেরই সন্তান। আপনাদের দোয়াই আমার পাথেয়।" বিজয়ীর বিনয় জনতাকে মায়াবশের মত অভিভূত করে।

হেমায়েত হেকমতে দালাল : নিশাচরের কোটালিপাড়া থানা দখল। ভোরের আলো ফোটার আগে থানার শীর্ষে উড়ে স্বাধীনতার পতাকা। অন্ধকার প্রিয় পেঁচার মত আঁধারে লুকায় মুক্তি। পরদিন কোটালিপাড়া থানা হাটবার। কৌশলগত পদ্ধতির ছদ্মবেশে জনারণ্যে মিশেছে মুক্তি। গা ঢাকায় তারা অকুস্থলে। থানায় উড়া স্বাধীনতার পতাকায় পাক দরদি দালালের মাথা চড়া। থানালুটের ভারতের নকশাল চর দিনের আলোয় আইয়ো না পাক আর্মির গুঁতা খাইয়া যাও। মুক্তি শূন্য থানার বাজারে দালাল আসফালন করে। খদ্দেরের ছদ্মবেশে বাজারে মুক্তিসেনা। বিনয়ের কৃষ্ণ-অবতাররূপী মুক্তি চররা দালালদের জোরছে ঠুকেন রাজ সালাম। কর্তার ইচ্ছায় কীর্তনের মত পাক দরদে তাঁদের মাছের মার পুত্রশোক। মুক্তি লুটেরা চোরের বাপান্ত গালি তাদের মুখে। মুক্তি ফাঁদে পা দিলেন দালাল বন্ধুরা।

বাজারের জনতার সাথে কেনা-কাটায় ব্যস্ত প্রচ্ছন্ন লুকান অস্ত্রে শান দেয়া লুকানো ব্যাঘ্রনখের মুক্তি। দুচারজন তাদের চিনলেও আত্মীয়ের কানে কানে ফুসুর ফাসুর করে। গমগমে বাজারে কমকমে হলেও ছয় দালালের পদার্পণ। দুচার চক্করে হাওয়া বুঝে তাদের হাউইবাজি। পাক পতাকার স্থলে স্বাধীনতার নামে কুফরি পতাকা দর্শনে তাদের দর্পহরি ভূকম্পনের তর্জনগর্জন। আকস্মিক মুক্তি অস্ত্রে ছয়ছন অক্কা পেলে আবার খবর খবর হয়ে যায় বাজারে। সুযোগ বুঝে হাওয়ায় মিলায় মুক্তি। তাদের প্রস্থান হয় গোপন পুরে।

বিজয়ের ফলশ্রুতি : হেমায়েতের বিজয়ে জনমানুষ আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু এ-বিজয় সংহত করতে চাই সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ। শত্রুর নিকট থেকে ছিনিয়ে আনা একশত অস্ত্র চালাতে এক শত মুক্তি চাই। সভাশেষে বাছাই করা শত মুক্তির হাতে শত অস্ত্র। অনেকেই অস্ত্র হাতে মুক্তি হতে না পারায় মুখ বেজার করে। ধৈর্য ধারণের জন্য তাদের সান্ত্বনা দেয়া হলো। শত্রুর নিকট হতে ছিনিয়ে আনা অস্ত্রে অতি শীঘ্রই তাদের প্রশিক্ষণ দেবার আশ্বাস প্রদান করা হলে তারা আশ্বস্ত হয়। সনাক্তকৃত নতুন রিক্রুট মুক্তির অনেকেই প্রাক্তন আর্মি, আনসার, মোজাহিদ। সবাই রাইফেল, সিভিল গান চালাতে পারেন। তবু তিন দিনের প্রশিক্ষণ ঝালাইর রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা করা

হয়। আশপাশের পুলিশ ফাঁড়ি ও ঘাঁটি পর পর রেইড সাফল্যে এক সপ্তায় অস্ত্রধারী মুক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশত বায়ান্ন।

কোটালিপাড়া দখলের কৃতী সন্তানের কৃতিত্বে বিমুগ্ধ মুক্তি পাগল জনতা তাঁর হাত শক্তিশালী করেন। দলে দলে যুব শক্তি এসে যোগদান করে হেমায়েত বাহিনীতে। প্রশিক্ষণ চেতনায় উৎসাহীদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়; ২ জুন, ১৯৭১ কোটালিপাড়া থানার জহরের কান্দি হাই স্কুলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। মুক্তির সুনিশ্চিত ধারণা, পাক পক্ষ প্রতিশোধ নিবেই। তাই অবিরাম যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। রেইড অ্যাম্বুশে শত্রু থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রে মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র সজ্জা চলে। দিন দিন মুক্তি-প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

যুদ্ধ প্রশিক্ষণ ঃ এই বিরাট ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্ব পরিচালনায় ছিলেন পঁচিশ জন নিয়মিত বাহিনীর লোক। তাঁদের কাজের সমন্বয়ের অগ্রণী ভূমিকায় বিমান বাহিনীর শেখ জবেদ আলি ও ইঞ্জিনিয়ার্সের আবদুল খালেক কমাণ্ডার। এখানে সর্বমোট সাড়ে তিন হাজার মুক্তি প্রশিক্ষণ নেয়।

ছোট বড় বেশ কিছু যুদ্ধ সাফল্যে মুক্তিদের বোধোদয় হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুপ্ত আস্তানার কোন কিছুই গোপন থাকবে না। দলবল যত বাড়ে সিকিউরিটি তত ঢিলা হয়। মুক্তির দুর্বলতার খবর যাচ্ছে শত্রুর দুর্গে। সব অঘটনের উৎস স্থানীয় দালাল। এবার মুক্তির কড়া দৃষ্টি নিপতিত হয় স্থানীয় দালালদের হালচালে। পাক পক্ষের দখল বিস্তৃতির পাকাপোক্ত ব্যবস্থা চলছে। তাদের সাথে স্বার্থের লুটপাটের দোস্তি পাতান বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী আর্মি ও রাজনৈতিক দল। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাশ, লুটেরা-ছিনতাইকারী জাতীয় সুযোগ সন্ধানী আর্মিও রাজনৈতিক দলের আশ্রয় নেয়। দেশে তখন আইন শৃঙ্খলা নেই। জনগণের নিরাপত্তা নেই। বিদেশী শত্রু ছেড়ে হেমায়েত দেশী ফিফথ কলামিস্ট বিভীষণদের উপর ভীষণ চটলেন। ঘরের ইঁদুরে বেড়া কাটার মত কুখ্যাত উপদ্রব ইঁদুর নিধনে লাগলেন তিনি; নইলে জনগণের আস্থা হারালে মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত বিজয় ব্যাহত হবে।

দালালের বিচার ঃ রাখ ঢাক লুকোচুরির কিছু নাই। দালালদের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দেয়া হয় প্রকাশ্য বাজারে হাজারো জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে, উচ্চারণ করা হয় কঠোর হুঁশিয়ারির সতর্কতা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গবদ্ধ মুক্তি-সংগঠনের খবর দাগ নম্বরে পাক আর্মি পায় কি করে ? ঘরের মানুষ কেউ নিশ্চয় সে খবর পৌঁছে দিচ্ছে পাক-দুর্গে, দালালি করেছে মিরজাফরদের কেউ। এবার চালাও দালাল নিধন করা হবে দেশের প্রয়োজনে। কারণ চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

দালালের তালিকা তৈরি করে আদর্শ নমুনার অত্যাচারী কয়েকজনকে ধরা হয়। প্রকাশ্যে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় তাদের। সর্বনিম্ন জরিমানা থেকে মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত বিচারের রায় হয়। স্বাধীনতার স্বার্থে তল্লাসি চালিয়ে দালাল ধরা বিচারের রায় মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ঘোষণা করতেই হায়মাতম পড়ে যায় দালাল গোষ্ঠীতে। সপ্তাখানেক সফল অভিযানে দেশী বিভীষণদের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। দালাল বধের কর্মসূচি হাতে

নেয়ায় দলপতি হেমায়েত হত্যার প্ল্যান ব্যর্থ হয়ে যায়। ঘাতিনী নারী প্রাণভিক্ষার কৃতজ্ঞতায় মুক্তি দলে ভিড়ে যান। সে এক নাটকীয় কাহিনী।

নেতৃত্বের শূন্যতা ঃ সপ্তাখানেকের মধ্যে পুরা এলাকার হতাশাদীর্ণ মুক্তির প্রাণে নব প্রাণ সঞ্চারিত হয়। সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্বের আকর্ষণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া মুক্তিরা তাঁর পতাকাতলে জড় হন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর জল-স্থল-বিমান বাহিনীর সদস্য, প্যারা মিলিশিয়া ইপিআর-পুলিশ-মোজাহিদ-আনসার-এমওডিসি জাতীয় বহু সশস্ত্র নিরস্ত্র সৈনিক পালিয়ে এসে ফরিদপুর-বরিশালের নিভৃত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা বিক্ষিপ্তভাবে শত্রুর মোকাবিলায় কিছু হামলা চালিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম চাঙ্গা রাখতে চান। বড় বড় বুলির নেতারা আসল মরণ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে এক দৌড়ে মাসির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। রণকৌশল ও সুযোগ্য সামরিক নেতৃত্বের অভাবে অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ যোদ্ধারা হতাশাগ্রস্ত। দু'এক যুদ্ধে চরম ব্যর্থতায় তাঁরা যোগ্য সামরিক নেতার সন্ধানে ছিলেন। তাঁদের এমনই এক প্রতিরোধের করুণ পরিণতি ফরিদপুরের পথে ঢাকা-বরিশাল সিএন্ডবি সড়ক প্রতিরোধ।

ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারিপুর মুক্তি বাহিনীর হাত ছাড়া। পাক বিমান আক্রমণে মুক্তি প্রতিরোধ দুর্গ বিচূর্ণ। গৌরনদীর পথে বরিশাল দখলে স্থলপথে ধেয়ে আসছে পাক আর্মি। বরিশালের মাইল চারেক উত্তরে জুনাহারে পাক-মুক্তি জান কবুল যুদ্ধ চলছে। জল-স্থল-বিমান আক্রমণে বরিশাল দখলে মরিয়া পাক আক্রমণে বিপর্যস্ত সকলে। স্থলপথে পাক আর্মির কামান, মর্টারের সাথে নদীর গানবোট থেকে মুক্তির প্রাণ বোট থামিয়ে দিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছে। মাথার ওপর শত্রু হেলিকপ্টার, যুদ্ধ বিমানের চক্কর। এত কিছুর পরও বরিশালে মুক্তি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাথে এঁটে উঠতে পারছেন না পাক আর্মি। ঢাকা থেকে স্থল পথে বরিশালে বিপর্যস্ত পাক আর্মির সাহায্য যাচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক কর্মী যোদ্ধা কৃষক-শ্রমিক সশস্ত্র নিরস্ত্র জনতা দিশেহারা। তাদের এলাকা দিয়ে নিরুপদ্রব স্থল পথে যাবে পাক বাহিনী। জনতার ইজ্জতের প্রশ্ন। সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে ৪জন অকুতোভয় তরুণ যোদ্ধা বাধা দিতে প্রস্তুত। কয়েকটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল মাত্র সম্বল। প্রতি রাইফেলের জন্য আট/দশ রাউন্ডের বেশি গুলিও মিলে নি। মনোবল দিয়ে অস্ত্রবলের অভাব দূর করতে চাইলেন মুক্তিরা। তবুও প্রতিরোধ চাই। সাধারণ জনতাকে বুঝতে দিতে হবে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। জয় পরাজয় যাই হোক হতাশার কারণ নেই। প্রতিরোধ অ্যাম্বুশ স্থল গৌরনদীর উত্তরে কটকস্থল ব্রিজ।

সকাল থেকে পাক সেনাদের অধীর প্রতীক্ষায় মুক্তি। ইতোমধ্যে বেলা পূর্বাহ্ন গড়িয়ে মধ্যাহ্ন; মধ্যাহ্ন গড়িয়ে অপরাহ্ন। মুক্তি অ্যাম্বুশ গ্রুপ তাদের গোপন আস্তানা ছাড়লেন। সিএন্ডবি রোড সংলগ্ন সাধারণ চাষি মোল্লা জহিরউদ্দিন বাড়ি হাসি মুখে প্রবেশ করলেন। শ্রান্তি-ক্লান্তির পিপাসা দূর করতে মোল্লা বাড়ির আঙ্গিনার মায়াময় ছায়াবহুল বিরাট বট বৃক্ষের তলে এলেন। কূর্ম পৃষ্ঠরূপ সুউচ্চ ব্রিজের বিপরীত দিকে

কিছুই দেখা যায় না। অসতর্ক মুক্তি সেখানে কোন গার্ডও রেখে আসে নি। বটের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম নেন আয়েশী মুক্তি। জহির মোল্লা অধীর আগ্রহে ঠাণ্ডা পানি ঢালছেন। আর মুক্তিরা আকণ্ঠ শীতল পানি পান করছেন। কে জানে এই কি তাঁদের আখেরি আবে হায়াত।

নিশ্চুপ নিঃসাড় শৃঙ্খলায় পাক আর্মি কূর্ম পিঠের ব্রিজ পার হলেন। পাক আর্মির গাড়ির শব্দও মুক্তিরা কেউ খেয়াল করে নি। ব্রিজ পেরিয়ে পথিপার্শ্বের বেখেয়াল সশস্ত্র বাঙাল যোদ্ধা তাদের দৃষ্টি এড়াল না। নিঃশব্দে সশস্ত্র পাক সৈন্যের গাড়ি পর্যন্ত তাঁদের বরাবর এল। তবুও বেখেয়ালের চৈতন্য নেই। সঠিক নিশানায় আকস্মিক গুনে গুনে পর পর চল্লিশটা গুলি। বসা থেকে অস্ত্র হাতে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতেই পাক পক্ষের গুলি। মৃত্যুর মুখেও মুক্তিরা প্রতিপক্ষের প্রতি গুলি ছুঁড়তে কসুর করে নি। কিন্তু ততক্ষণে সময় শেষ। চার মুক্তি অকুস্থলে শাহাদত বরণ করেন। আশ্রয় বাড়ির জহির উদ্দিন মোল্লা ও তাঁর ছেলে মোবারক হারিয়ে গেলেন শহিদের মোবারক পথে। অন্তিম শৌর্যে দুজন খান সেনা হত্যা করে মুক্তি মুখের চুনকালি কিছুটা মুছে দেয় মুক্তি শহিদরা।

শহিদ পরিমল মণ্ডল ঃ কটক স্থল যুদ্ধের অন্যতম শহিদ পরিমল মণ্ডল। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের পরের ঘটনা। তখনো ৯ নং সেক্টর সাংগঠনিক রূপ নেয় নি। স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যন্তরীণ যোদ্ধারাই চালান কটকস্থল যুদ্ধ। সে যুদ্ধ পরিচালিত হয় হাবিলদার আবুল হাসেমের নেতৃত্বে। হাবিলদার হাশেম পরে হেমায়েত বাহিনীতে যোগ দেন। সে পরিমাপে শহিদ পরিমল হেমায়েত বাহিনীর শহিদের খাতায় অন্তর্ভুক্ত। শহিদ পরিমলের জন্ম ভাষা আন্দোলনের বছর ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে। তাঁর পিতার নাম কেদারনাথ মণ্ডল, গ্রাম-উত্তর চাঁদশী, পোস্ট অফিসঃ চাঁদশী, থানাঃ গৌরনদী, জিলা ঃ বরিশাল।

যুদ্ধ অবস্থায় পরিমল চাঁদশী ঈশ্বরচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। মুক্তি যুদ্ধের সংগঠন পর্বে ছাত্র হিসাবে নানাভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে তিনি গৌরনদী মহাবিদ্যালয়ের স্থানীয় অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ প্রশিক্ষণে অস্ত্র চালনায় ট্রেনিং নেন। তাঁর এলাকায় একাধিক রণাঙ্গনে সম্মুখ সমরে নির্ভীক সাহসিকতার বীরত্বে সকলের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করেন। এপ্রিলের শেষ দিকে মাদারিপুর থেকে বরিশাল এগুচ্ছে পাক আর্মি। গৌরনদী থানার উত্তরে কটকস্থলের সিএন্ডবি রোডে মুক্তির প্রতিরক্ষা ব্যূহ। সকল প্রতিকূলতার মাঝেও পরিমল বালসুলভ সাহসে পাক আর্মির সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হন। বেখেয়ালের খেয়াল হতে অন্তিম শৌর্যে পাক আর্মি হত্যায় হাত পাকিয়ে সমর শয্যা নেন পরিমল মণ্ডল।

অবিবাহিত শহিদ পরিমল দুই ভাই ও দুই বোন রেখে গেছেন। তাঁর পিতার মোক্ষধাম প্রাপ্তি ঘটেছে। বৃদ্ধা মা বীর পুত্রের স্মৃতি তর্পণে আজো বেঁচে আছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে শহিদ মাতা রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার সাথে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের দেয়া সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের হিন্দুরা কাপুরুষের

মত অধিক সংখ্যায় ভারতে পালিয়েছেন অপবাদের জীবন্ত প্রতিবাদ রেখে গেছেন শহিদ পরিমল মণ্ডল।

শহিদ সৈয়দ আবুল হাশেম ঃ শহিদ সৈয়দ আবুল হাসেমের জন্ম ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ; স্থায়ী ঠিকানা ঃ পিতা-সৈয়দ মোকসেদ আলি, গ্রাম-নাঠৈ, পোস্ট অফিস-গৈলা, থানা-গৌরনদী, জিলা-বরিশাল।

অবসর প্রাপ্ত পুলিশ আবুল হাশেমের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাস। যুদ্ধ পূর্ব অবসর জীবনে তাঁর পেশা বাড়িতে কৃষিকাজের তদারক। অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ শেষে মুক্তিযুদ্ধ শুরু। স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে স্থানীয় যুব শ্রেণীকে নিয়ে তিনি যুদ্ধ প্রশিক্ষণ শুরু করেন। কটকস্থল যুদ্ধে তিনি ছিলেন নেপথ্য প্রেরণা। তাঁর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা এ-যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এপ্রিলের কটকস্থল যুদ্ধের সম্মুখ সমরে তাঁর বীরের মরণ শয্যা হয়। স্থানীয় জনতার উদ্যোগে শহিদের কবর হয় ঈদগাহ্ ময়দানে।

মৃত্যুকালে তিনি চার ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর পিতামাতা আজ জান্নাতবাসী। শহিদ সৈয়দ আবুল হাসেমের স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কল্যাণকর দিকের সাথে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ভাতা ভোগ করছেন।

চরম বিপর্যয়ে হতাশাগ্রস্ত মুক্তিরা অবস্থার মূল্যায়নে একত্র হন। ছিন্ন ভিন্ন মুক্তি গ্রুপ এস এম রকিব, সেন্টু ও অধ্যাপক এনায়েতের মত নিবেদিত প্রাণ কর্মীর অক্লান্ত চেষ্টায় সংগঠিত। রণকুশলী নেতৃত্বের অভাব ও সাংগঠনিক দুর্বলতা কটকস্থল মুক্তি বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ বলে তাঁরা স্বীকার করেন। চব্বিশটা রাইফেল, তিনশ রাউণ্ড গুলি সংগ্রহে ভাঙ্গা মুক্তিদল চাঙ্গা হয়। সুযোগ্য নেতৃত্বের অধীনে তাঁরা হেমায়েত বাহিনীতে যোগ দেন। এমনি বহুতর লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র-নিরস্ত্র যোদ্ধা হেমায়েত বাহিনীতে যোগ দিয়ে তাঁর শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন।

বিদ্রোহী হেমায়েতকে নদীপথে খুঁজতো পাক আর্মি। তারা কেন যেন গোলক ধাঁধার জতুগৃহ বিস্তীর্ণ বিল বাওড় এলাকায় মুক্তি ধরতে সাহস পেত না। কিন্তু ইতোমধ্যে কীভাবে যেন ফরিদপুর আর্মির গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে সেখানকার সামরিক সাফল্য তাঁর বৃহত্তর বিজয় পথ খুলে দেয়।

নেতৃত্বের আকর্ষণ ঃ চমক সৃষ্টিকারী কমাণ্ডো হামলার সাফল্যজনক নেতৃত্বের আকর্ষণীয় প্রতিভা গুণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিদের সংগঠিত করেন হেমায়েত। তাঁর সমর প্রতিভার সাংগঠনিক শক্তির বহির্প্রকাশ অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ যুদ্ধে বিরাট সাফল্য। সাধারণ মানুষ বিজয়ী বীরের ডাকে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেন। তার নামে দালালের হৃদয় কেঁপে ওঠে। তাঁর কৃতিত্বে এলাকার চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে কোটালিপাড়া থানা দখলের বিরাট সাফল্য প্রেরণা সঞ্চারী কমাণ্ডো একশন।

যুদ্ধের শিক্ষা ঃ মরিয়া মরণ পণে যাঁরা যুদ্ধ করেন তাঁরা মরেন কম। কাপুরুষরা মরে সবার আগে। মৃত্যুঞ্জয়ী শৌর্যে সুরক্ষিত শত্রু দুর্গে মাত্র তিন ক্যামোফ্লেজ কমাণ্ডো

মুক্তি হামলা করেন। শত্রু কবলিত হতাশাদীর্ণ জাতির প্রাণে তার সুদূর শুভ প্রতিক্রিয়া। নেতৃত্বের উদ্ভাবনীর আত্মশক্তির প্রথম সাফল্য কোটালিপাড়া বিজয়। অধীনস্তদের ও জনতার আস্থা অর্জনে হেমায়েত আক্রমণের প্রথম সাফল্য তাঁর নেতৃত্ব লাভ। একটা পূর্ণাঙ্গ সুশৃঙ্খল গেরিলা যোদ্ধা বাহিনী গঠনে আত্মঘাতী একটা কমাণ্ডো গেরিলা একশনের বিনা রক্তপাতে সাফল্য অভাবিত। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে এমন দুর্ধর্ষ গেরিলা একশন যুদ্ধজগতে স্বদেশে ব্যাপক প্রশংসার শিহরণ জাগায়। কোটালিপাড়া থানা বিজয় মুক্তিযুদ্ধের এক বিরল সাফল।

রেফারেন্স

১. হেমায়েতউদ্দিন ঃ মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত (অপ্রকাশিত), কৃত এম.এ. খালেক (গেরিলা কমান্ডার)
২. হেমায়েতউদ্দিন ঃ যুদ্ধকালীন ডায়রি ও পত্রাবলি।
৩. সেক্টর যুদ্ধ সাথীর একান্ত সাক্ষাৎকার।
৪. মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, কৃত এস. এম. সোলাইমান।
৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিলপত্র-নবম খণ্ড সশস্ত্র সংগ্রাম, খণ্ড ১, সম্পাদক ঃ হাসান হাফিজুর রহমান।
৬. পদক প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা-(১ম খণ্ড)। সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুল হান্নান (গেরিলা কমান্ডার আলমডাঙ্গা)।

শরণার্থী সামাল

ফরিদপুর ও বরিশালের মত মাত্র দুটি জেলার সাথে ভারতের সাধারণ বর্ডার নেই। বাঙ্গাল বিদ্রোহ দমনে পাক আর্মি অভ্যন্তরীণ অশান্তি শান্ত করার দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ডার সীল করা আরম্ভ করেন। বর্ডার সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাঁরা প্রথম আঘাত হানেন। ভারতের সাথে কমন বর্ডার না থাকায় ফরিদপুর ও বরিশালে পাক আর্মি প্রবেশে কিছুটা সময় লাগে। এতে বরিশালে বিদ্রোহী মেজর জলিল ও ফরিদপুরের হেমায়েত গণবাহিনীকে সংহত করার সুযোগ পান। এবার সর্বত্র পাক থাবার মত ফরিদপুরেও পাক আর্মি আঘাত হানে। শুরু হয় বিরামহীন শরণার্থী স্রোত। সে সব দুঃস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন হেমায়েত। শুধু ফরিদপুরেরই নয় অন্যান্য জেলার শরণার্থীরাও ফরিদপুরে আসেন। ফরিদপুরের পথে যাঁরা ভারতে যান তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বও মুক্তিদের নিতে হয়।

বিভিন্ন এলাকার মানুষের জন্য শরণার্থী ক্যাম্প স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তির রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি দরাজদিলে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। দলমতের উর্ধ্বে ছাত্র-যুবক-মুক্তির নেতৃত্বে শরণার্থী ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়। শরণার্থী মানুষকে বাঁচাতে ভারতে শরণার্থী যাতায়াতের রুট খোলা হয় ঃ

ক। প্রথমটিঃ ফরিদপুর-বালিয়াকান্দি, এবং খ। দ্বিতীয়টিঃ ফরিদপুর-ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ির পথে।

লুটেরার সময়-অসময় ও মানবতা বলে কিছু থাকে না। বিদেশ যাত্রী ছিন্নমূল শরণার্থীদের বাঙালি লুটেরারাও সময়-সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্থান বিশেষে যে নির্মম অত্যাচার করেছে ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এ ব্যাপারে সবার অগ্রণী নকশাল। পরে সৃষ্টি হয় জামাতে ইসলামি ও মুসলিম লীগের তল্পিবাহক রাজাকার, আল বদর-আলশামস বাহিনী। কোন প্রকার মতাদর্শের বাইরেও লুটেরার অভাব ছিল না। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে নকশালদের অত্যাচারে মানুষ পথের মাঝে সর্বস্ব হারিয়েছে। এসব দুর্বৃত্ত মেয়েদের ইজ্জত পর্যন্ত লুটেছে। যুবতী কন্যা লুণ্ঠনে তারা এদেশের ইতিহাস কলংকিত করেছে। সর্বস্ব লুণ্ঠিত মানুষ, ইজ্জত হারানো মা-বোন হেমায়েতবাহিনী সদরে নিরাপত্তা পেতেন। তাঁদের অকথিত বেদনাদায়ক অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধের ডায়রিতে লেখা হতো।

ঘরের ইঁদুরে বেড়া কাটার মত স্বদেশী লুটেরাদের হাতে বাংলার মানুষের জিল্লতির দুর্গতি হয়েছে সর্বাধিক। যুদ্ধের হানাহানির অরাজকতায় আইন শৃংখলা ভেঙ্গে পড়লে যা হয়। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে হক+তোহা গ্রুপের সর্বহারা নামের লুটেরা বাহিনী অত্যাচারের তাণ্ডব চালায়। ফরিদপুরের পাংশা ও মাদারিপুর অঞ্চলে সিরাজ শিকদারের (এস এস ডি) পার্টির প্রবল চাপ সামলে মুক্তিযোদ্ধাদের পাক আর্মিকে ধাওয়া করতে হয়েছে। পাক পক্ষের দালালেরা ইসলাম ধর্ম ও পাক বিরোধী মুক্তি কাফের-ভারতের অনুচর হিন্দুজাদাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র জোরেশোরে ওয়াজ নসিয়ত শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বে শত্রু পরিবেষ্টিত মুক্তিদের ঘরে তিষ্ঠে থাকা ছিল বিভীষিকার মহা আতংক। জাতীয় অস্তিত্বের সে মরণপণ সংগ্রামে স্বদেশ প্রেমের বজ্র শপথ, ন্যায় ও সত্যের পথে চলার অনমনীয় দৃঢ়তায় শত-সহস্র সমস্যা পদদলিত করে সাফল্য পেয়েছে মুক্তি।

দুর্গত মানুষের শরণার্থী দলকে প্রথম পর্যায়ে স্কট করে নিত ভলান্টিয়ার পার্টি। তাতেও মাঝে মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিত। মুক্তিবাহিনী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সংহত ও অস্ত্রে সজ্জিত হলে বিপন্ন শরণার্থীর স্কটের দায়িত্ব নেয় মুক্তি বাহিনী। দেশের অভ্যন্তর থেকে ভারতের বর্ডার পর্যন্ত নির্দিষ্ট সীমা অন্তর অন্তর স্কটদের দায়িত্ব বদলাত। একদল শরণার্থীকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে পৌছে দিয়ে একদল স্কটের দায়িত্ব শেষ। সেখানে অন্য স্থানীয় স্কটরা শরণার্থী দলের ভার নিতেন। এভাবে সুশৃংখল চেইনের মত শরণার্থী পারাপার চলত। প্রাথমিক বিশৃংখলার পর শরণার্থী পারাপারে নিরাপত্তার শৃংখলা না এলে এক জোট শরণার্থীর অর্ধেক স্বদেশী-বিদেশী শত্রুর হাতে বেঘোরে পথেই মারা পড়ত। সত্য লুকিয়ে লাভ নেই। এত কিছুর পরও অনেক ক্ষেত্রে শরণার্থী বিশৃংখলা, মুক্তি দুর্বলতা, পাক আর্মির ধূর্ততা ও স্বদেশী দালালের খপ্পরে বহু বিপর্যয় ঘটেছে। সে সব মুক্তিবাহিনীর ব্যর্থতা ও গ্লানির ইতিহাস। এসবের বিশেষ কারণ ছোট খাট চোর, ছেঁছড়া, লুটেরা দালাল, স্থানীয় মাস্তান, পথে বেড়িকেড লাগান চাঁদাবাজদের হাত থেকে শরণার্থীদের বাঁচান ছিল স্কটের মূল কাজ। যাত্রা পথে স্থানীয় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত দানে

গড়ে ওঠা ত্রাণ শিবির ও লংগরে সবাই বিনামূল্যে খাবার পানীয় পেতেন। স্থানীয় জনতার দ্বার ছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে দুর্গতের জন্য অবারিত। সশস্ত্র পাক আর্মির গমনাগমন পথ ও উপস্থিতির আগাম সংবাদে স্কটরা শরণার্থীদের সতর্ক করে হুঁশিয়ে সামাল দিত।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ পাক আক্রমণ থেকে শরণার্থীর রক্ষা করা ছিল কষ্টকর। স্কটরা অনেক ক্ষেত্রে পাক আক্রমণের হত্যা, ধর্ষণ, লুট থেকে হিজরতিদের বাঁচাতে পারে নি। সে সব মুক্তিযুদ্ধের ব্যর্থতা, গ্লানি ও পরাজয়ের করুণ স্মৃতি।

সব কিছুর পরও বলা চলে স্কটরা উদয়াস্ত কাজ করে অসাধ্য সাধন করেছেন। তাদের মূল কাজ নকশাল জাতীয় দেশী পাক সাঙাত লুটেরা ও পাক আর্মির হাত থেকে শরণার্থীর জানমাল রক্ষা করে ভারতের বর্ডারে পৌঁছে দেয়া। স্কট সাফল্যের বিচারের ভার জাগ্রত জনতার।

চান্দের হাট যুদ্ধ

২৯ মে, ১৯৭১। সময়টা মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের শেষাবস্থা। বর্ডার ক্রস করা নিয়মিত বেঙ্গল-ইপিআর তখন সবেমাত্র সংহত হয়ে পরিপূর্ণ প্রত্যাঘাত শুরু করেছে পাকবাহিনীর উপর। কিন্তু তখনো অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ যোদ্ধারা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় শত্রুর ওপর আঘাত হেনে যাচ্ছে অনবরত। এমনি এক স্মরণীয় ঘটনা চান্দের হাট যুদ্ধ।

ব্যাপারটা যেন গাইতে গাইতে গায়েন আর খোঁটা শলার খোঁচায় হাতির পতনের মত। হাবিলদার আবদুল আজিজ মোল্লা ১১ জন মুক্তিযোদ্ধার সাথে নিয়ে আরও বেশ কিছু জনতার সহায়তায় চান্দের হাট পাক আর্মির অবস্থানে আক্রমণ চালান। সে এক অভাবিত ঐতিহাসিক যুদ্ধ। আনট্রেইন্ড মুক্তিদের সঙ্গে ট্রেইণ্ড ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধাদের অসম যুদ্ধ।

চান্দের বিলের পাড়ে চান্দের হাট। হাট খোলায় মুক্তির অবস্থান। বিলের অপরদিক থেকে পাক আর্মি আসা মাত্রই মুক্তি দলপতি ইস্ট বেঙ্গলের সুবেদার আজিজ মোল্লার অস্ত্র গর্জে ওঠে। বিলের দিকে নিরাপদ ভেবে প্রাণে বাঁচতে পাক আর্মি ক্রলিং করে সেদিকে এগিয়ে যায়। সামনে যে বিলের পানি, ঘাস শেওলা কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের কারণে পাকিরা তা বুঝতে পারেনি। তারা এবার বিলের পানি ও কাদা পানির গেঁড়া কলে ফেঁসে যায়। মাথা উঠাতে পারে না মুক্তির গুলির ভয়ে। শত্রুর জন্য বাংলার মাটি যে দুর্জয় ঘাঁটি, তা বড় ঠেকে বুঝলেন পাক বন্ধুরা। বাংলার জলকাদার গেঁড়াকলে ফেলে সুবেদার আজীজের রণকৌশলে মুক্তি অভাবিত সাফল্যের মুখ দেখে এই যুদ্ধে।

যুদ্ধটা অসম-শক্তির হলেও একটি কথা প্রমানিত হয় যে, যারা মরিয়া হয়ে মরণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তাদের কেউ মারতে পারে না। মৃত্যু পাগল মুক্তি-জনতা পাক আর্মিকে

সেদিন রাধাচক্করের ঘোল খাওয়ায় সেই অসম-শক্তির যুদ্ধে। যার ফলশ্রুতিতে একজন পাক ক্যাপ্টেনের সাথে ত্রিশজন পাক সেনা সে যুদ্ধে নিহত হয়।

এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকৌশল এবং শক্তি সাহসের প্রতি জনতার আস্থা বাড়ে। দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডের বিরাট পর্বের মুক্তিযুদ্ধের বহু অবিস্মরণীয় অবিশ্বাস্য কাহিনী আছে। সে সব বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শী জনতার শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে সে-সব সংগৃহীত হলে একটা কাজের কাজ হতো। ভবিষ্যত বংশধরগণ বাঙালির শৌর্য বীর্যের আসল পরিচয় পেত এসব যুদ্ধ-কাহিনী থেকে। অনাগত জাতীয় দুর্দিনে স্বাধীনতা বিপন্ন হলে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জাতিকে প্রেরণা জোগাতো।

মাটি ভাঙ্গা যুদ্ধ

৪ঠা জুন ২য় বার কোটালিপাড়া বিজয়ের পর হেমায়েতের উপর মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার আস্থা বাড়ে। সৈনিক-জনতার মনোবলেও উদ্দীপনার শক্তি কাজে লাগাতে মাঠে নামেন হেমায়েত। ৮ জুন পর্যন্ত উজিরপুর ও নাজিরপুর থানার মুক্তি শেল্টার ও ক্যাম্প সফরে বেরুলেন তিনি। আত্মগোপনের ছদ্মবেশে সর্বত্র তিনি নিজেকে বাহিনী প্রধানের পত্র ও নির্দেশনার বাহক পরিচয় দেন। তিনি হেমায়েত নামা প্রচার করছেন মাত্র। কিন্তু এই ছদ্মবেশী অনাকাঙ্ক্ষিত এক যুদ্ধে জড়িয়ে যান। আল্লাহ মিলিয়ে দেন টার্গেটে আকস্মিক হামলা। নাজিরপুর থানার মাটি ভাঙ্গা লঞ্চ স্টেশনে পাক লঞ্চ আক্রমণ তেমনি এক আকস্মিক ঘটনা।

বায়াত্তর জনের সুইসাইডাল স্কোয়াড পাক লঞ্চ বাহিনীর উপর আপতিত। আকস্মিক আক্রমণে পাক আর্মি হতচকিত। অল্প সময়ের যুদ্ধে পাক আর্মি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। মুক্তির নিট মুনাফা প্রচুর টাকা পয়সা, অস্ত্র গোলাবারুদ। মাটি ভাঙ্গার যুদ্ধে স্বদেশে বানানো তিনটি কার্গো বোটের রূপান্তরিত গানবোট মুক্তির দখলে। লঞ্চ/কার্গো/গান বোটের সব কিছু লুটে নিয়ে তা অচল বিকল করা হয়। মাটি ভাঙ্গার তিন মাইল পশ্চিমে সরিয়ে লঞ্চের সলিল সমাধি সমাপ্ত হয়।

কেয়ামতের রোদন ঃ হেমায়েতের সফর পথে প্রতিপক্ষের মধ্যে কেয়ামতের রোদন পরিলক্ষিত হয়। মধুমতি নৌ পথে টুঙ্গিপাড়ায় নদীতে তখন পাক বাহিনীর টহলদার বহর। উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। উভয় দলই যেন শো প্যারেডের খেলা খেলেন সেদিন। পরস্পরের প্রতি গোলাগুলির আতশ বাজিতেই যেন তারা তুষ্ট। কেউ কারও প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলবে এগুলো না। কারও কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই স্ব স্ব পক্ষের ছহিসালামতে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ। কে যে কাকে ভয় পেল বুঝা গেল না।

দালালি খতিয়ান ঃ ১৫ ও ১৬ জুন দালাল অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়। সে-সময়ে আকস্মিকভাবে পাটগাতি ও টুঙ্গিপাড়ার পাক দালালদের খতিয়ান চেয়ে বসেন হেমায়েত। এসব বিশ্লেষণপূর্বক বিভিন্ন অপরাধের জন্য প্রামাণ্য দলিলসহ অপরাধী দালালদের বাড়ি হানা দেয়া শুরু হয়। পাক ক্যাম্পে বাঙালি নারী পাচারকারী লোকমান

মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। প্রকাশ্য বিচারে তার অপরাধ প্রমাণিত হলে দু'চোখ উৎপাটন করে প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হয়। পাপ চোখ যেন আর নারীর সন্ধান না করে তার এমন চমৎকার বিচার করেন হেমায়েত। এক মার্কা মারা লুটেরা ধরে হাতের কব্জি কেটে মার্কা দেয়া হয়। কর্তিত হাত আর লুট করবে না মুচলেকা দিলে প্রাণ রক্ষা পায় কোন রকমে।

পয়সার হাটের যুদ্ধ

প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধ ঃ হেমায়েত বাহিনীর সদরদপ্তর ভ্রাম্যমাণ। এমনিতেও কেবল মুজিবনগর সরকার ছাড়া মুক্তি-কমান্ডারদের আর কারও স্থায়ী কার্যালয় ছিল না। কোটালিপাড়ার যুদ্ধে পাকিস্তানিদের প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ইতোমধ্যে পাক-বাহিনী প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত। সেখানকার পুলিশের সারেণ্ডারকে পাক আর্মি গাদ্দারি বলে ধরে নেয়। এবার মুক্তিদের আচ্ছা শিক্ষা দিতে চায় পাক-আর্মি। তারা 'রাজাপুর' গ্রামের মুক্তি সদর উড়ানোর দৃঢ় সংকল্পে ধেয়ে আসছে।

পূর্বের বিরূপ অবস্থার প্রতিকারে পাক আর্মি গানবোট ও তিন খানা স্টিল বডি লঞ্চ যোগে আক্রমণে এলো। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বাহিনী প্রধান লঞ্চের পিছন দিক থেকে আক্রমণ চালান। ঘাঁটির বাঙ্কার থেকে অগ্রসরমান শত্রু কলামের সামনের দিকে গুলি ছোঁড়া শুরু হয়। কেউ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান, যুদ্ধ স্থায়ী দেড় ঘন্টা চলে। পাক আর্মি পাল্টা আক্রমণের পাঁয়তারা চালায়। আগান-পিছান, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ লুকোচুরি খেলা চলে ভোর ছটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত। বেলা শেষের সাথে জীবনের শেষ করতে চাইলো না প্রতিপক্ষ। উপায়ান্তর না পেয়ে প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে নাজেহাল অবস্থা উৎরাতে সাতলা গ্রামের বাঁক ঘুরে ঝটিতি আস্তানার বাইরে এসে পাক বহরের পলায়ন সম্ভব হয়।

জলে স্থলে যুদ্ধ ও দূরপাল্লার কারণে শত্রুকে বাগে পেল না মুক্তিবাহিনী। লোকসানের মধ্যে মুক্তির গোলাবারুদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মাত্র। কিন্তু পাক আর্মিকে প্রচুর খেসারত দিতে হয়েছে এ-যুদ্ধে। অজস্র গোলাগুলির সাথে তাদের ক্ষয় হয়েছে প্রচুর সৈন্যবল। প্রত্যক্ষদর্শী গোয়েন্দা সংবাদ ও অন্যান্য সূত্রে পাওয়া খবরে পাক পক্ষের ব্যাপক প্রাণহানির খবর নিশ্চিত হয়। স্টিল বডি লঞ্চের কারণে মুক্তির গোলা স্টিল ফ্রেমে আঘাত খেয়ে ছুটে গিয়ে বিপক্ষের প্রাণ সংহার করেছে। লঞ্চে মৃত লাশের ঝুলানো উঠানো-নামানো দেখে প্রাণ ভরে অফুরান খুশিতে হেসেছে জনতা। স্টিল বডির শক্ত দুর্গে বসে যুদ্ধের কারণে তাদের হতাহতের সংখ্যা ছিল বেশি। লঞ্চের ভিতরের নিরাপত্তায় থাকার কারণে সেদিন তারা প্রচুর সংখ্যার লাশ নিয়েও প্রাণ খালাসের দৌড়ে পালাতে সক্ষম হয়।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২১ মে, ১৯৭১। বিজয়ের ফলশ্রুতিতে সাতলা, বাগধা,

পয়সার হাট জাতীয় বিশ মাইল এলাকা হানাদার-মুক্ত অঞ্চলে পরিণত। এর পর পাক আর্মি আর এ অঞ্চলের মুক্তি প্যাচের যতুগৃহে প্রবেশ করে নি। মুক্তিবাহিনী সাতলা গ্রামের নদীর বাঁকে অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি স্থাপন করে।

বিজয়ী হেমায়েতকে জনতা মেজর ভূষণে মালা ভূষিত করে। জনতার দেয়া মেজর পদবি গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধকালে এর পরবর্তীতে তাঁর যুদ্ধ কমাণ্ডার-এর পরিচিতি ঘটে 'মেজর হেমায়েত' রূপে।

কোটালিপাড়া দ্বিতীয় আক্রমণ

(০৪ জুন, ১৯৭১)

সংযোগ বিচ্ছিন্ন কোটালি পাড়া ঃ প্রথমবারের চরকধাব্বার প্রতিকারে এবার থানায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের নিয়মিত বাহিনী প্রস্তুত হেমায়েত-বাহিনীর মোকাবেলায়। 'থানার পুলিশ' পাকবাহিনীর কাছে তাদের প্যাচ ধরার জি হুজুর মাত্র। ইতোমধ্যে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক গোপালগঞ্জ-কোটালিপাড়ার মধ্যে আর্মির সকল প্রকার যোগাযোগ বন্ধ করা হয়। কোনভাবেই যাতে কোটালিপাড়ার আর্মির সাহায্য গোপালগঞ্জের আর্মির কাছে আসতে না পারে তা প্রতিহত করতে চলতি পথে বসানো হয় মুক্তি-অ্যাম্বুশ।

আক্রমণ ঃ ভোর ছয়টায় শুরু হয় মুক্তি-আক্রমণ, একনাগাড়ে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। বাস্তবে এটাকে আক্রমণ বলা যাবে না, অবরোধ মাত্র। এটি হাতে-ভাতে-প্রাণে মারার প্রস্তুতি-কৌশল। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বার ঘন্টা স্থায়ী আক্রমণে খান সেনাদের বারটা বাজার দশা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল মুক্তিরা চোরের মত রাতের আঁধিয়ারায় ফুটফাট দুচার রাউণ্ড ফুটিয়ে পাক ঘুমের ডিস্টার্ব করে চলে যাবে। কিন্তু এ-তো ডাকাতিরও বাড়া। দিনে-দুপুরে অবরোধ ও আক্রমণ। থানার আশপাশের গ্রামের জনতা মুক্তি-আক্রমণে সাহায্য করে। গাছপালা কাঁপিয়ে তাদের সমবেত কন্ঠের জয়বাংলা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মুক্তিবাহিনীর গোলা বর্ষণ। অনাহারে শ্রান্ত ক্লান্ত পাক-আর্মির নাভিশ্বাস দশা। তাদের বড় আশা ছিল গোপালগঞ্জ থেকে সাহায্য আসবেই। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে তাদের সে আশায় গুড়ে বালি। সন্ধ্যা ছটা বাজতেই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতির পাক গোলা বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। তাদের সকল অস্ত্রের সম্মিলিত অগ্নুদগার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দেয়। পাক-বাহিনীর গোলাগুলির ধরনে বোঝা যায় যে, তারা টর্নেডোর মত বেরিয়ে এসে মুক্তির ঘাড় মটকাবে।

এক পর্যায়ে অকস্মাৎ সকল পাক অস্ত্রের নিথর নীরবতা। পাক চালাকি ভেবে মুক্তিরা অস্ত্রের অব্যাহত গোলাগুলি জারি রাখে। ঘন্টা খানেক ধরে মুক্তির গোলা চলতেই থাকে। এক সাইডের খেলায় মুক্তির সন্দেহ বাড়ে। থানা নীরব। কারও আনাগোনা নেই। চুপচাপ নিঃসাড় থানায় আর অযথা হানা কেন। ব্যাপার তলিয়ে

দেখ। পাক চাতুরি বলা যায় না! এবার সুইসাইডেল গং রেডি। কভারিং ফায়ারের আড়ালে মুক্তিবাহিনী এডভান্স করে। অবিরল ধারায় গুলিবন্যার সৃষ্টি করে জয়বাংলা-আল্লাহ্ আকবার ধ্বনিতে সুইসাইডেল দলের মৃত্যুভয়াল সেনা ঘাঁটিতে চড়াও হয়।

অভাবিত ব্যাপার। পাক আস্তানা একদম ফাঁকা। চারটি শত্রু সেনার লাশ পড়ে আছে জঙ্গলের গোপনীয়তায়। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বহু অস্ত্র-গোলাবারুদ পড়ে আছে। সব ফেলে রাতের আঁধারে পালিয়েছে পাক সেনারা। সুইসাইড গং তাঁদের রেকিতে আশ্বস্ত। এবার শত্রু শূন্য শত্রু ঘাঁটির সিগন্যাল ফায়ার করলে দলে দলে বিজয়ী মুক্তির সাথে বীর জনতা শত্রু ঘাঁটিতে প্রবেশ করে। এই যুদ্ধে মুক্তির নিট মুনাফা পাক আর্মির ফেলে যাওয়া প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ, কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র জাতীয় বহুবিধ সামগ্রী। রাত তিনটা পর্যন্ত লুটপাটের পুরা মহোৎসব চলে। পরবর্তী বিজয় ধ্বনিতে রাতের নীরবতা বিদীর্ণ করে সৈনিক-জনতা। আনন্দে জনতার উদ্দাম নৃত্য চলে। জনতা লাফায় মুক্তি সেনাদের কোলে করে। গ্রামের নিরন্ন ছিন্ন বস্ত্র নগ্ন পদের জনতা, চাষি বধূ-কুলবালা বিজয়ী মুক্তির জন্য রাতের আঁধারে খাবার নিয়ে আসেন। যোদ্ধা সৈনিক জনতার সে এক মহামিলনের আনন্দঘন সম্মিলনের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

দালালের বিচার ঃ পাক আর্মি তো পাক দুর্গে পালিয়েছে, কিন্তু দালাল বন্ধুরা যাবে কোন আস্তানায় ? এতদিন তারা পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদের অবদানের বাখান শুনিয়েছেন জনগণকে। এখনও ভারতের চর ইন্দিরা বান্দানের সামান্য কটা নাপাক মুক্তির শির কুচাল দেঙ্গার আস্ফালন দেখায় তারা। কিন্তু এবার নিজেদের লাশ ফেলে পালিয়ে গিয়ে পাক আর্মি দালালদের মুখে চুন কালি মাখিয়ে দেয়। এমত পরিস্থিতিতে, পাক পক্ষে বাঙালি জনমত আনা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এবার পাকিস্তান বাঁচানো তো দূরের কথা নিজেদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। পাক প্রভুদের বাঙালি নারী ভেট দিয়ে তাদের বিপদ আরও চরমে উঠেছে। দালালদের অনেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে সাময়িকভাবে প্রাণ বাঁচায়। নানা কৌশলে মুক্তিরা দালাল পাকড়ানি শুরু করে।

নারিকেল বাড়িয়া মুক্তি-প্রশাসন কোর্টে প্রকাশ্যে দালালদের বিচার-কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর আইডেনটিফিকেশনে দালালের হালাল কাম প্রমাণিত হয়। আল্লাহ পাক সব কিছু দেখেন। তারপরও তিনি মানুষের দুই কাঁধে মনকির-নকির ফেরেশতা বসিয়ে রেখেছেন। মানুষের পাপ পুণ্যের রেকর্ড তাঁরা চলতি আমলনামায় রাখেন। আখেরাতের বিচারের চেয়ে দুনিয়ার জীবন্ত বিচার। রুদ্ধশ্বাসে নির্যাতিত নরনারী সবাই বিচার দেখেন। কোন হৃদয়ে হারামে আরাম দালালের জন্য অনুকম্পার ঠাঁই নেই। নারী লোভী নরপশুদের ব্যাপারে জনতা বিক্ষুব্ধ মারমুখী। জনতার দাবি হাত মুখের হাতুরে মাইরের জন্য পাপীদের তাদের হাওলা করে দেয়া হোক। আইন নিজের হাতে না নিয়ে বিচারের রায় কার্যকর পর্যন্ত সবাইকে সংযত রাখা হয়। বিচার সভার রায় কার্যকর করতে নারী মাংসখোরদের চোখ উপড়ান, লুটেরাদের হাত কাটা ধরনের বিভিন্ন শাস্তি দেয়া হয়। অত্যাচারী দালালদের আদর্শ শাস্তির নমুনা অন্যদের নজির

হিসাবে কাউকে হত্যা করা হয় নি। ভবিষ্যতে অত্যাচারী স্বপক্ষ-বিপক্ষ দুদলের জন্যই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে বলে কড়া নির্দেশ জারি।

জনতার আনন্দ ঃ ৫ ও ৬ জুনের পুরো দুদিন আত্মহারা মুক্তি আনন্দে মতোয়ারা। মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন এলাকার দল ছুটে কোটালিপাড়ার বাঁশ বাড়িয়া। তাদের সাথে ছুটে যায় হর্ষোৎফুল্ল জনতা। সকলের হাতে বিজয়ী বীর সংবর্ধনার উপহার। ফুলের মালা থেকে ভাঙ্গা নারকেল মালার শ্বাসের খাদ্য জাতীর উপহার আসে। পরাধীন জাতির দীন জনতার দেবার আছেই বা কি? তারা নিয়ে এলেন পাক রক্ত চক্ষুর কড়া শাশানি উপেক্ষার ভালবাসা। মুক্তির বহু আকাঙ্ক্ষিত মরণজয়ী অনশন জোয়ারের অভিব্যক্তিতে মুক্তিসেনা অভিভূত। মুক্তি-জনতার প্রাণঢালা সংবর্ধনার কেন্দ্রবিন্দু অদৃশ্য। সবাই এসেছেন বিজয়ী বীর হেমায়েতকে এক নজর দেখতে। তাঁর সাথে হাত মিলিয়ে কথা বলা, পরিচিত হওয়া, গলায় মালা দান। উৎকণ্ঠার কোন কিছুই কারও পূরণ হলো না। শত চেষ্টায়ও তারা বাহিনী প্রধানকে দেখতে পেলেন না।

বাহিনী প্রধানের কড়া হুঁশিয়ারির চড়া নির্দেশ কেউ যেন তাঁকে চিনতে না পারে। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে স্বশরীরে সরাসরি চিনতেন তাঁদের জন্য চরম হুঁশিয়ারি। চেনা জানার পাঠ চুকাও। যুদ্ধে ভাবালুতার বাহাদুরির স্থান নেই। আকস্মিক বিপর্যয়ে ধরা পড়লেও মূল নেতার হদিস যেন শত্রু না পায়। মুক্তি-জনতাকে মেরে পিটিয়েও যাতে নেতার নিদর্শন না মিলে। অপরিচিতিই নিজ বাসভূমে তাঁর বড় রক্ষা কবচ। মজার ব্যাপার চৌদ্দ বছরের দেশ ত্যাগী কিশোর। সুদীর্ঘ এক যুগের বেশি বিদেশে। দেশের মানুষের তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী ছাড়া তিনি কাউকে চিনতেন না। আর তাঁকেও কেউ চিনত না। মুক্তিযুদ্ধের হিরো বনে তাঁর নামটি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আত্ম-পরিচয়ের বাহাদুরির মাহাত্ম্যের উর্ধ্বে তিনি নিজের চেহারা সুরত গোপন রাখতেন। অন্যদের তাঁর ব্যাপারে সর্বপ্রকার গোপনীয়তার নির্দেশ দিতেন। হেমায়েত নামের ওপর অগাধ শ্রদ্ধায় জীবনবাজির যুদ্ধে শত শত মুক্তিযোদ্ধা তাঁর সাথে কাজ করেছেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁরা কেউ তাঁর সাক্ষাত পান নি। তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সমরসাথী বডি গার্ডের জন্য সর্বক্ষণের জন্য চড়া সুরের কড়া নির্দেশ কেউ যেন তাঁর চেহারা ক্ষণিকের তরে না চিনতে পারে। যেমন খুশি তেমন নানা পেশার সাজে তিনি সাজতে পারতেন। ছদ্মবেশে অপূর্ব সুন্দর সাজে তিনি নিজেকে সাজাতে পারতেন। নিখুঁত সাজের কারণে নিকট দূরের অতি পরিচিত জনও তাঁকে চিনত না। সেনা পরিভাষায় ক্যামোফ্লেজ কন্সিলমেন্টে তিনি অতি দ্রুতগতির সিদ্ধহস্ত। অপরিচিতির আশীর্বাদে তিনি ধরা পড়ার দুর্গ্রহের ভাবনা মুক্ত। সাধারণ হাজার হাজার মুক্তি-জনতা হেমায়েত নামক বীরের নামে অকৃত্রিম বিশ্বস্ততা ও আস্থার উৎসর্গীকৃত প্রাণে উদয়াস্ত যুদ্ধ করেছে। উপস্থিত অচেনা নেতার নির্দেশে বীরত্বের পরাকাষ্ঠায় রণাঙ্গণে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও

তাঁরা কাঙ্ক্ষিত নেতার নিদর্শন পান নি। জনতা তাদের একান্ত ভালবাসার বীর যোদ্ধা হেমায়েতকে দেখতে পেলেন না। তাঁর সংবর্ধনায় আনা ফুলের মালা নির্ধারিত স্থানে রেখে যান। তাঁর জন্য আনা খাদ্য সামগ্রীর উপহারও আর তাঁর হাতে দিয়ে কেউ তুষ্ট হতে পারলেন না। সবাই শুধু জানলেন মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার অভিনন্দনে তিনি বিমোহিত। মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত শুধু সকলের দোয়া ও ভালবাসা কামনা করেন। যুদ্ধ কৌশলের নিরাপত্তার প্রয়োজনে সকলের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে না পেরে যারপর নাই দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। বিগলিত বিমুগ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ও জনতা আল্লাহর দরবারে হেমায়েতের হেফাজতের জন্য দুহাত তুলে মোনাজাত করতো। মুক্তিযোদ্ধা মানুষের কোমল হৃদয়ের ভালবাসার কেমন গভীরে প্রোথিত হেমায়েতকে রক্ষার মোনাজাতের ভাষার আকুতিতে তার প্রকাশ মিলত।

একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ও মুক্তি প্রশাসনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুটিকয় নেতা হেমায়েতকে চিনতেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুঃসাহসিক কমাণ্ডো একশনে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে সাহস ও বীরত্বের মূর্ত প্রতীক। তাঁর বীরোচিত আক্রমণের ফলাফলে পাক বাহিনীর অপমানজনক পৃষ্ঠ প্রদর্শন ঘটেছে অনেকবার। সব মিলিয়ে যুদ্ধকীর্তির বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের ভূমিকায় তিনি সবার চোখে বীর নায়ক। কালো ছিপছিপে রঙের পাঁচফুট আট ইঞ্চি উচ্চতার মানুষটি মাঝারি গড়নের শক্তসামর্থ যোদ্ধা। কল্পনার হেমায়েতের সাথে আসল হেমায়েতের শারীরিক গড়নের মিল নেই।

জীবন-মৃত্যুর অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখ রণাঙ্গনে তিনি সবার সাথে মিশে এক কাতারে যুদ্ধ করছেন। তাঁরই নির্দেশে যুদ্ধ চলেছে। আর অবাক ব্যাপার যুদ্ধের মূল কমাণ্ডারকে কেউ চেনে না। গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ জয়ের পর পরই সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝ থেকে সবার অদৃশ্য নীরবতায় কেটে পড়তেন হেমায়েত। তাঁরই নির্দেশে যুদ্ধ চলে। অথচ তিনি আত্মগোপনে সবার সামনে অপরিচয়ে অদৃশ্য। গণযুদ্ধের এ এক নবরূপ। এ যুগে নক্সালরাই শুধু জনগণের মাঝে মিশে আত্মলীন অবস্থায় যুদ্ধ করছে। নক্সাল নেতা সাধারণ নক্সাল ও জনতার অপরিচিত। না নক্সাল না তাদের নেতাকে কেউ চিনে। সৈন্য পুলিশের তারা বিভীষিকা। মুক্তি হেমায়েতও আজ পাক সৈন্য-পুলিশ-দালালের বিভীষিকা। এতসবের বিশেষ একটি মাত্র কারণ গুপ্ত নরঘাতকের ভয়। জনতার নন্দিত নায়ক জনচক্ষুর আড়ালে। এটাই অপচিরিত পরিচয়ে জনতার আনন্দ।

পাক দাদারা বাঙাল গাধার হাতে নাকানি চুবানি খেয়ে নাখোশ। কোটালিপাড়া যুদ্ধের ফার্স্ট রাউণ্ড ও সেকেণ্ড রাউণ্ড যুদ্ধ শেষ। ভাগ্যলক্ষ্মী মুক্তির পক্ষে সুপ্রসন্ন। পাক পক্ষ দালালদের উৎসাহে এবার তৃতীয় রাউণ্ড খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

কোটালি পাড়ার যুদ্ধ

(তৃতীয় আক্রমণ, ১৪ জুন ১৯৭১)

রেকি : ৩রা জুনের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং মুক্তিবাহিনী নির্মূল করার লক্ষ্যে পাক বাহিনীর এক বিরাট বহরের উপস্থিতি ঘটে কোটালিপাড়া থানায়। দুদলই পরস্পরের নির্মূলে মরিয়া যুদ্ধ চালাতে থাকে। বাহিনী প্রধান নিজে থানার চারপাশে নতুন করে রেকি করে এলেন। একেক বার পরাজয়ের পর পাক আর্মি কোটালিপাড়ায় নিজেদের নতুন পরিকল্পনায় বিন্যস্ত করে। তাই আক্রমণের পথঘাট, কলা-কৌশল এবং নিখুঁত রেকিতে তিনি আশ্বস্ত হলেন। যথাসময়ে তিনি নিজে রেকি না করে আক্রমণের কোনো ঝুঁকি নিতেন না। রেকি শেষে যুদ্ধসঙ্গী সকল গ্রুপকে পূর্ণাঙ্গ অপারেশন এবং অ্যাডভান্স, উইথড্রয়াল, আক্রমণ পরিকল্পনা পুরোপুরি সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি স্যান্ড মডেলের সাহায্য নিতেন। একই বিষয় বার বার সবাইকে ব্রিফ করে বুঝাতেন। অপারেশন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি পুরাপুরি সকলে বুঝার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদের কার্যক্ষমতা নিজে পরীক্ষা করতেন। রণাঙ্গনে অস্ত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় কোন ফাঁক রাখতেন না হেমায়েত।

যাত্রায় অযাত্রা : কালকিনি থানার ছোট বিল 'চলবল'। এই চলবলের মুক্তি সদর থেকেই চতুর্দিকে অপারেশন চলে। চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্বে মূল আক্রমণকারী দলকে অকুস্থল রেকির মাধ্যমে চূড়ান্ত ধারণা দিতে চাইলেন কমাণ্ডার। কমাণ্ডো প্যাট্রোল পার্টি তথ্য :-

> তারিখ : ১৪ জুন, ১৯৭১; সময় : দিবাগত রাত আড়াইটা; জনবল : ১২। অস্ত্রবল : চিনা এল.এম.জি. -২টা, চিনা রাইফেল-২টা, চিনা এস.এম.জি.-৮টা। বাহন : দুটি ছৈয়া নৌকা।

বরিশালের দিক থেকে খাল বেয়ে কোটালি পাড়ার উদ্দেশ্যে প্যাট্রল পার্টির যাত্রা শুরু হয়। নৌমাঝি ও যোদ্ধা নিজেরাই। টিপ টিপ বৃষ্টির জমাট অন্ধকার রাত। আঁধার ভেদে চুপি চুপি নিঃশব্দ সতর্কতায় তারা যাত্রা করেন আল্লাহর নাম স্মরণ করে।

নৌপথে কিসের সন্দেহে যেন বাহিনী প্রধান নির্দেশ দেন নৌ-প্যাট্রলের যাত্রা বিরতি করাতে। দিব্যনেত্রে তিনি রঙিন আলোর সংকেত পেলেন। স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছা প্রণোদিত গণমুক্তি বাহিনীর কালোছায়ারূপী বিচ্ছুরা রঙিন আলোর গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত বাহিনী তাদের বিশেষ সংবাদটি বাহিনী প্রধানের কানে কানে জানিয়ে গেল। বেশিদূর যেতে হবে না। খান সেনাদের খান বিশেক বাহারি বোঝাই বড় বড় ছিপ নৌকা ধেয়ে আসছে। এতক্ষণে তাদের হরিণাহাটি গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছার সম্ভাবনা। সেপাইদের গোলাগুলি মিলে পাকবাহিনীর নৌপথে আগত সংখ্যা তিন শতাধিক। খবর পৌঁছে দিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন কালছায়ারূপী খবরের বাহকেরা।

মুক্তি নেতা হরিণাহাটি গ্রামের দিকে সামান্য আগ বাড়লেন। সতর্কতার রেকিতে প্রথমে তুরিং তীরে অবতরণ করেন বাহিনী প্রধান। পর্যবেক্ষণ তুষ্টিতে তীরে নৌকা

ভিড়ানোর নির্দেশ দেন। তড়িঘড়ি দুই তীরে ছয় দ্বিগুণে বার নৌকা ভিড়ে যায়। সুশৃঙ্খল বিন্যাসে মুক্তির অবতরণ ঘটে নদীর তীরে। আকস্মিক যাত্রা বিরতিতে সবাই স্তব্ধ।

বর্ষার রাস্তায় চারপাশ জলে টইটম্বুর। কোথাও আচ্ছাদনের আড়াল আবডাল রাখঢাক কভার নেই। গভীর রাতের আঁধার চিরে অতি সংগোপন ভৌতিক ইশারায় তটস্থ ত্বরার কমাণ্ড নির্দেশ প্রদান করা হলো। সিগন্যাল মাত্র অতি দ্রুত পজিশন গ্রহণ সম্পন্ন হয়। মুক্তি নৌকা নৌপথের আড়ালে ছুপানো হয় শিল্পীর সুষমায়। এখন অদৃশ্য শত্রুর অপেক্ষায় মুক্তির অধীর প্রতীক্ষা মাত্র। আকস্মিক কাকতালীয় ব্যাপারের মতই শত্রু-মিত্র দুদলই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুগপৎ একই পথে বিপরীতমুখী যাত্রা করে। নৌপথে অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে পরস্পরের মুখোমুখি হয় দু'দল। মুক্তি-নেতার উপস্থিত বুদ্ধি ও সতর্কতায় পরিস্থিতি মুক্তির অনুকূলে চলে আসে। ভরবর্ষায় রাতের নৌ-পথে বহুদূরান্তের শব্দ সহজেই সতর্ক কানে আসে। সদা সতর্ক কানের কুশলী হেমায়েত দূরাগত শব্দের আন্দাজে সতর্কতামূলক পজিশন নেন। সঙ্গীদের বিরক্তির মাঝেও তাঁর ত্বরিত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। এখানেই নেতৃত্বের দূরদৃষ্টির পরীক্ষা। গোয়েন্দা মারফত মুক্তির কাছে খবর পৌঁছানোয় হেমায়েত আগেই জানতে পারেন, জলযুদ্ধে পাক বাহিনীর প্রধান হাতিয়ার কেবলমাত্র রাইফেল। তার বিপরীতে মুক্তির আছে মেশিনগান ও সাব-মেশিনগান। ফলে পরিস্থিতি বুঝে নিজের ঘাঁটির নিরাপত্তার সন্ধানে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের স্থলে আগ বাড়িয়ে প্রতি আক্রমণে মূল পরিকল্পনা গ্রহণ করে মুক্তিরা।

হরিণাহাটি গ্রামের নৌপথে আকস্মিক দুদলের সংযোগ ঘটে যায়। বিশটি নৌকায় নিয়মিত পাক আর্মি, রাজাকার, পশ্চিমা মিলিশিয়ার তিন শতাধিকের যাত্রা। দুইশতাধিক পুলিশ যাত্রা করে স্থলপথে, পাকবাহিনীর লক্ষ্য হেমায়েতের সদরদপ্তর 'রাজাপুর' দখল করা। সে-কারণেই চৌদ্দখানা অগ্রগামী পাক নৌকার রাজকীয় আগমন। পাকবাহিনী তাদের চলমান অবস্থায় ছোটখাট নৌকা পথে দেখেছে কিন্তু আন্দাজ করতে না-পারায় আমলেই আনেনি এগুলো সম্পর্কে। মুক্তিরাও পাকবাহিনীর উপস্থিতিতে চাঙা হয়ে ওঠে। প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্বল্প সময়ে ঝুপ ঝাপ, শোঁ শোঁ, ঠন ঠন আওয়াজে নদী কাঁপিয়ে অতি কাছে এগিয়ে আসছে শত্রুর নৌবহর। জলে স্থলে প্রায় পাঁচশ শত্রুর প্রতিরোধে স্বল্প সংখ্যার মাত্র ১২/১৪ জন অকুতোভয় মুক্তিসেনা।

পূর্ব প্রস্তুতির মহাসুযোগে প্রথম আক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণের ফায়দা লুটে নেয় মুক্তিবাহিনী। সশস্ত্র পাক ফোর্সের বোঝাই বাছারী নৌকা এখন মুক্তি-অস্ত্রের নাগালে। অমারজনীর নিঃশব্দ নীরবতা বিদীর্ণ করে রাত দুটোর সময়ে শত্রু আগমনের ধ্রুব খবরে বাহিনী প্রধানের শুভ কাজের সগর্জন নির্দেশ, "ফায়ার"। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির মেশিনগান ও সাব-মেশিনগান গর্জে উঠে এবং চলতে থাকে অবিরল গুলি শত্রু নৌযানের লক্ষ্যে। পাকা আধা ঘণ্টা দুদলে তুমুল লড়াই চলে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর মেশিনগানের মোকাবেলায় পাকিদের রাইফেল ব্যর্থ হয়।

অকুস্থলে শত্রুর মৃত্যু পঞ্চাশের উর্ধ্বে। অন্ধকারে মুক্তির গুলিতেই নিহত জনাবিশ। মুক্তির হাতে জ্যান্ত ধৃত দোআঁশলা চব্বিশজন। পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর ফজলুল হক, চারজন পুলিশ, ঊনিশজন রাজাকার মুক্তির হাতে বন্দি হয়।

শত্রুর বড় দুর্বলতা তাদের অসৈনিক জনোচিত অত্যন্ত হীন মনোবল। পুলিশ-রাজাকারে শৃঙ্খলার বালাই ছিল না। আবার তেলে-জলে অমিলের মত পশ্চিমা পাক সেনা ও বাঙালি মিলিশিয়াদের কখনই মন-মত বা পথের মিল ছিল না। যুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের পাকবাহিনীর ধিক্কারজনক শোচনীয় পরাজয়। আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় ছয়টি নৌকা জলে ডুবে যায়। এভাবেই শত্রুর বারটি (১২) নৌকা মুক্তি দখলে চলে আসে। শত্রুর অগ্রগামী নৌকার পিছনে ছিল লঞ্চ ও গানবোট। আর্যবীরগণ ভাবতেই পারে নি যে খাটানাটা বাঙালের হাতে এমনতর অতর্কিত আকস্মিক হামলার মুখে তাদের পড়তে হবে। তারা এই আচমকা আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বাঙালরাও টুপটাপ ঝুপঝাপ আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়েন নদী-খাল-বিলের জলে। ডুব সাঁতারে তাঁরা চুপচাপ সটকে পড়ে মুক্তিগুলির আওতার বাইরে। পরিচিত দেশের জলে স্থলে তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়। জলাতংকের আতংকে বেঘোরে মরছে সাঁতার না জানা পশ্চিমা ঘোড়া। ঘৃণ্য পরাজয়ের কলংকে পালায় শত্রু।

ইব্রাহিমের শাহাদাত ঃ মুক্তি বাহিনী তাঁদের সবচেয়ে সাহসী বীর সৈনিক হারালেন এ-যুদ্ধে। তিনি বাহিনী প্রধানের ব্যক্তিগত বডিগার্ড। ঢাকা গাজীপুর জিলার কাপাসিয়া থানার চরমুখি গ্রামে তাঁর নিবাস। তিনি মুজাহিদ হাবিলদার ইব্রাহিম খান। জয়দেবপুর ২ ইবিআর-এর সঙ্গে তাঁর মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। হেমায়েত বাহিনীর আত্মঘাতী সুইসাইডেল স্কোয়াডের তিনি অন্যতম সাহসী বীর। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে জয়দেবপুর থেকে ইব্রাহিম খান হেমায়েতের সাথী হন। বাহিনী প্রধানের ছায়াসঙ্গীর মতন তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার গুরুদায়িত্ব আমৃত্যু বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি পালন করে যান। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র যুদ্ধের বন্ধুর পথে হেমায়েতের সাথে আসেন কোটালিপাড়া। ১৪ জুন রাত দুটায় হরিণাহাটির সম্মুখ সমরে যুদ্ধরত ইব্রাহিমের শাহাদাত। দেশ মাতৃকার মুক্তির বেদিমূলে নিবেদিত একটি গৌরব দীপ্ত প্রাণ অকালে ঝরে গেল। ইব্রাহিমের প্রিয়জন জানলেন না তাঁর আত্মবলিদানের শাহাদতের খবর। স্বাধীন দেশে হেমায়েতের উদ্যোগে 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকায় ইব্রাহিমের আত্মদানের খবর প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কাটিং হাতে ইব্রাহিমের মা-বাবা-ভাইয়ের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন হেমায়েতের সাথে দেখা করেন। সে এক বেদনা বিধুর বিষাদঘন অধ্যায়। প্রিয় সাথীর পবিত্র স্মৃতিতে সবাই শহিদের কবর জিয়ারত করেন। ইব্রাহিমের আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনার প্রবোধ দেন বাহিনী প্রধান–শহিদের আত্মদানের অমৃত ফসল স্বাধীন বাংলা।

বন্দি-বিচার ঃ ১৫ জুন, ১৯৭১। অতি প্রত্যুষে বন্দিদের বিচার হবে রাজাপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী হাই স্কুলে। ক্ষুধার্ত মুক্তিসেনাদের কজন খাবারের খোঁজে আসেন নিকুম গ্রামে। মুক্তিদের সাথে বন্দিরাও অভুক্ত, তাই সকলের জন্যই খাবার খোঁজ করা হয়। আহার ও বিশ্রাম রেখে আগে বন্দি-বিচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিচার শুরু

হয় স্বয়ং বাহিনী প্রধান কর্তৃক সাক্ষ্য প্রমাণ মিলিয়ে প্রশাসনিক কমিটির মাধ্যমে। বন্দি প্রহরার সশস্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে। স্বয়ং দলপতি বন্দিদের জন্য খাবার সংগ্রহের উদ্যোগ নেন, নিজেদের না হলেও বন্দির জন্য খাবার চাই-ই চাই।

বিচারের শুরুতেই বন্দি-প্রহরার সশস্ত্র সেনাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়, কেউ পালাবার চেষ্টা করা মাত্র বিনা সময় ক্ষেপণে তাকে গুলি করা হবে। কাকভোরে বিচার শুরু হয়। কারণ এত বন্দির টানাহেঁচড়ার নিরাপত্তায় সংশয় রয়েছে। বিচারের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। তিন দিক জঙ্গল ঘেরা একদিকে একটা তীব্র খরস্রোতা খাল। বিচার স্থলে বন্দিদের উপস্থিত করা হলে সকলে সারি বেঁধে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের মধ্যে আরও রয়েছে চব্বিশজন বাঙাল দোআশলা রাজাকার।

স্রেফ যুদ্ধ বন্দি হলে জেনেভা কনভেনশন অনুসারে প্রাণ রক্ষার সুযোগ মিলত। তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দিবালোকে নিরীহ বেসামরিক বাঙালি নরনারী হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগের কার্যক্রমেরও চাক্ষুষ প্রমাণ আছে বিচারকের হাতে। প্রথমে কিছুই জানি না বলার স্তোক বাক্য বলে বলে বাঁচতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তারা অপরাধ স্বীকার করে। বিচারকার্য চলার সময়ে এদের কারও কারও পকেটে লুটের স্বর্ণ মিলে যায়। পেশাদার আর্মি কর্তৃক দেশ লুটার, নিজের দেশের মা-বোনের ইজ্জত লুটার পাপে ভাঙছে পাকিস্তান। মাশরেকি আওর মাগরেবি (পূর্ব ও পশ্চিম) পাকিস্তান এক দেশ। মুসলমান মুসলমান ইসলামের নামে ভাই ভাই। নীতিবাক্যের সব মেনে পাকিস্তানের ইসলামিক রিপাবলিকের দুই অংশের রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান প্রচেষ্টা কেন? এ অমানবিক নিষ্ঠুর গর্হিত কাজ কোন মুসলমান কেন, এমন অমুসলমান কাফেরও করতে পারে না। এত জঘন্য কাজে সৈনিকের হাত কলঙ্কিত করতে দেশী দোসর লেলিয়ে দেয়া হয়। সূর্যোদয়ের উঁকিঝুঁকির বিচার দেখতে ইতোমধ্যে বেশ জনতা জড় হয়। বিচারের রায় উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বন্দিদের কয়েকজন 'অবিচার' বলে ধ্বনি তোলে। ঠিক এমনি সময় প্রতিপক্ষের কটি গুলির শব্দে সবাই উৎকর্ণ।

শত্রুর প্রতি আক্রমণ ঃ ১৫ জুন, ভোর ছটায় শত্রুর প্রতি-আক্রমণের টার্গেট হয় রাজাপুর মুক্তি ক্যাম্প। দুটা মেশিনগানের সুস্পষ্ট গুলি বর্ষণের শব্দ মুক্তিবাহিনীর বিচারকার্যের মুণ্ডপাত করতে এগিয়ে আসছে। সচকিত মুক্তিযোদ্ধারা এ-ঘটনায় চমকে উঠে এবং উদ্বেগে উৎকণ্ঠিত হয়। নিশ্চয়ই পরাজিত শত্রুরা প্রতিশোধ নেয়া ও বন্দি উদ্ধারে প্রবল শক্তি বৃদ্ধিসহ মুক্তিদের দমনে এগিয়ে আসছে। শত্রুর রি-ইন-ফোর্সমেন্ট সংখ্যা সম্পর্কে মুক্তিরা স্তম্ভিত। স্থির প্রশান্তির বিচারক দলনেতা যুদ্ধ সঙ্গীদের কিছুটা কাছে এগুলেন। ঝটিতি বিচার সভা স্থগিত রেখে সমর সভা করলেন আগে। সমর কাউন্সিলের মতামত চাইলেন তিনি। দুটা করণীয় পথের একটা বেছে নেয়ার উপদেশ দেয় সমর-কাউন্সিল। হয় লজ্জাজনক ঘৃণ্য আত্মগোপন, নয়তো শেষ বিচারকের হাতে নিজেদের সমর্পণ। মাতৃভূমির নামে বাঙালি শৌর্যের দীপ্ত মহিমায় শত্রুর প্রতি আপতিত হওয়া। প্রতিটি মুক্তিসেনার সমস্বর উত্তর, "আমরা যে-কোনো মূল্যে শত্রুর মোকাবেলা

করবোই।" ত্বরিত ছুটে আসা দুই গ্রাম-জনতার সংবাদ আসে, "মুক্তি সেনার খোঁজে শত্রু এদিকেই ধেয়ে আসছে। হেমায়েতের এবার কমান্ডার সুলভ ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে এবং কেয়ামতের গর্জনে রোষে উঠে, "এত বড় ঘা খেয়েও ওদের শিক্ষা হয়নি। এবার ওদের চরম শিক্ষা দিব, ইনশাআল্লাহ।"

গানবোট ও লঞ্চযোগে জলে স্থলে মুক্তিবাহিনীর রাজাপুর ক্যাম্প আক্রমণে ধেয়ে আসছে শত্রু সেনা। মুক্তিদের ত্রস্ততায় বন্দিদের মধ্যে পুলক পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমা পেয়ারে জানবাজ দোস্তগণ তাদের উদ্ধারের জন্য আসছে। তাদের গোলাগুলির শব্দও শোনা যায়। মুক্তিরা তাদের বেরাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে তাদের কি করে কে জানে? তারা তো চিহ্নিত স্বীকৃত ধিকৃত অপরাধী। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দোআঁশলা নিজেদের ভাবেন পাক সাবাসের ঝানু যোদ্ধা। বন্দিরা মুক্তি তটস্থতার মাহেন্দ্রক্ষণ বেছে নেয় নিজেদের পলায়নের জন্য।

মুক্তি-কমাণ্ডার ও তাঁর দলের ব্যস্ততার সুযোগ বুঝে বন্দিরা একযোগে খালের জলে ঝাঁপ দেয়। জাত ভাই বাঙালের মুক্তি-প্রহরীদের সতর্কতাকে তারা তাচ্ছিল জ্ঞানে অবহেলা করে। মুক্তি-কমাণ্ডারের কড়া মূল্যের চড়া নির্দেশ তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। শত্রু পক্ষের বন্দি ফস্কালে কাফফারার ব্যাপারে তাঁরা সদা সতর্ক ছিলেন। মুক্তি-অবস্থান পদদলিত করতে শত্রু আসছে কি সবাই মরছে বন্দি প্রহরার মুক্তিরা সে ব্যাপারে ছিলেন নিস্পৃহ। সে ভাবনা কমাণ্ডারের। তাদের কাজ যুদ্ধ ময়দানে ধৃত বন্দি প্রহরা। ধূর্ত বন্দিরা সতর্ক বাঙাল প্রহরীদের চোখের চেহারা পড়ছিলো। এমত পরিস্থিতিতে শটে শাট্যাং ঝোপ বুঝে কোপের মতই মুক্তি প্রহরার অস্ত্রের সঠিক নিশানার গর্জন শুরু হয়।

শত্রুর আগমন পথে মুক্তির তাৎক্ষণিক সগর্জন লাউড ওয়ার ক্রাই জয়বাংলা ধ্বনিতে ধাওয়ায় এবং মুক্তির লাইট মেশিনগান হামলার মুখে টিকতে না পেরে বাপের নাম ভুলানো মার খেয়ে শত্রুর তখন হতচৈতন্য অবস্থা। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার মত দুদলে তুমুল যুদ্ধ চলে। খতরনাক চাতুর্যের বন্দি কটার দফারফা করে আল্লাহর নামে মুক্তিরা যুদ্ধে নামে। দ্বিতীয় বারের প্রতিআক্রমণেও পাক আর্মির চরম ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে দারুন লজ্জাজনক পরাজয় ঘটে। তারা গানবোট নিয়ে রাজাপুর থেকে পয়সার হাটের পথে সাতলা, বাগদার নদী পথে পালিয়ে রক্ষা পায়।

বিচারের শেষ পর্ব ঃ মুক্তিরা যতই ভাবুন তাদের মারই শেষ মার। বিধাতার বিচার ভিন্ন। গোলাগুলির মাঝেও চব্বিশজনের চারজন রক্ষা পায়। এবার আবার বিচার সভা। শত শত লোকের উপস্থিতিতে শুরু হয় বিচারকার্য। রক্ষা পাওয়ারা বিচারের সাক্ষ্যপ্রমাণের চিহ্নিতকরণ প্যারেডে সবাই দোষী সাব্যস্ত হয়। তাদের হাতে নিহতদের আত্মীয়-স্বজন আজ বিচার প্রার্থী। বিচারক মণ্ডলীর চোখে-মুখে নমনীয়তার ছাপ। সম্ভ্রম হারানো নারীর বুক চাপড়ানো আর্তনাদ। ক্রুদ্ধ দর্শক জনতা রাগে-অপমানে ফুঁসছে। তাদের কথা, "এ আবার কেমন বিচার। আমগরে যখন মারে, আমগ পোলা মুক্তিদের গুলিতে খুলি উড়ায় তখন কোথায় থাকে হেমায়েত বিচার !! খুনিদের আমগ হাতে

দাও।" হতাশায় ম্রিয়মাণ স্বজনহারাদের সুবিচার প্রার্থনার সরব স্লোগান। বিচারক ফাঁফরে পড়ে। সবকটারে বাঁচাতে গেলে কাউকেও বাঁচান যাবেই না, উল্টা না জনগণের রোষে অঘটন ঘটে। অগত্যা বিচার সভার মতে সবকটার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে তাৎক্ষণিক ফায়ারিং স্কোয়াডে তাদের দণ্ড কার্যকর করা হয়।

রাজাপুর গ্রামের এক পুকুর পাড়ে সবকটার এক সুবৃহৎ গর্তের কবর। নিহত স্বদেশী বন্দিরা এক নৌকায় জড় হয়। তারা দাফনের জন্য সদ্য প্রস্তুত কবরস্থানে নীত। আল্লাহর শান লাশের ভুরের স্তূপে ২৪ জনের ২৩ জন মৃত্যুর পরলোকে। একজন সংজ্ঞাহীন, প্রাণ স্পন্দন আছে। তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে আছেন। অতিক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাস বইছে। বাহিনী প্রধানের নির্দেশে তার সাময়িক জীবন রক্ষা হয়।

জোয়ার্দারের বরাত জোর ঃ যশোরের আবদুল বারি জোয়ার্দার কোটালিপাড়া থানার পুলিশ প্রধান। অতীতে তিনি মুক্তি হাতে ধরা পড়েন দালালির নতিজায়। স্ত্রী-কন্যার কারণে মুক্তির ঔদার্যে সেবারে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। ১৫ জুন দিনের আড়াইটা নাগাদ পূর্বে খবরদার করা জোয়ার্দার আবার মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন রাজাপুরে। আবারো তিনি মুক্তি ঔদার্যে রক্ষা পান।

রাজাকার আজিজের অলৌকিক রক্ষা ঃ রাখে আল্লা মারে কে ? অলৌকিক রক্ষা পাওয়া রাজাকারের নাম আজিজ। বিচার সাপেক্ষে তিনি মুক্তির কঠোর পর্যবেক্ষণে।

পরবর্তী নিরবচ্ছিন্ন মুক্তি বিজয়। পাক আর্মির বিরুদ্ধে রাজাপুর, পয়সারহাট, বাগধা প্রভৃতি এলাকার যুদ্ধে একেরপর এক মুক্তিবাহিনীর বিজয় হতে থাকে। বিজয় উত্তীর্ণ মুক্তিরা বীরহৃদয় ঔদার্যের গর্বে গরীয়ান।

সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া আজিজ বিচারের কাঠগড়ায়। বন্দির অন্তর মন ব্যথিত অশ্রুবন্যার অনুশোচনা। সন্দেহাতীত বিতর্কের উর্ধ্বে দ্বিতীয় বিচারে আজিজের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু প্রমাণিত হলো না। ২৪ বন্দির ২৩ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। অলৌকিক রক্ষার আজিজের প্রতি জনতার তেমন ক্ষোভ নেই। আহা বেচারা অনুশোচনায় বেঁচে থাক। বন্দি অনুশোচনা, "হুজুর এবার আমার দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিতীয় জন্মটা আপনাদের মত দেশরক্ষার স্বাধীনতা উদ্ধারে কাটাবো। আপনারা যখন দেশের কাজে যুদ্ধ করেন, তখন আমি আপনাদের সাথেই থাকবো। আপনারা যে আদেশ করেন তাই করবো।"

আল্লাহর দেয়া বিজয়ে তুষ্ট জনতার প্রতি হেমায়েত কৃতজ্ঞতা জানান। বন্দির প্রাণদণ্ড মওকুফ করে দেন বিচারক। "বেশ আপনার আর্জি মঞ্জুর। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন।" বিজয় অর্জনের সাফল্যের শোকরিয়ায় আজিজের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়। তাঁর স্থান হয় মুক্তির নজরে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় কর্ম নিয়োগের মাধ্যমে আজিজের পরীক্ষা নেয়া হয়। অস্ত্রবাহী নৌকার মাঝি মাল্লার দায়িত্বে আজিজ। আজিজের রোনাজারির মর্মস্পর্শী দৃশ্য সত্যই এক করুণ ইতিহাস। গণ্ড মূর্খ আজিজ যে প্রাণান্ত কাকুতি-মিনতির ভাষায় প্রাণ ভিক্ষা চান

তা সত্যই হৃদয়গ্রাহী। তাঁর হৃদয় নিংড়ান প্রাণ ভিক্ষার প্রার্থনা দুনিয়ার নিতান্ত পাষণ্ড সীমার কঠিন হৃদয় কাফেরের মনও জয় করার মত।

আজিজের বেঁচে থাকা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বেরই জয়ঘোষণা। জীবনের মরা বাঁচার মালিক আল্লাহ। সে মৃত্যুবরণকারী আজিজ আজো বেঁচে আছেন। ছেলে সন্তানের গরিমায় ভরণপোষণে তিনি একটি রুটির দোকান চালান। যে মহান নেতার হৃদয় ঔদার্যে তাঁর রক্ষা তার সাক্ষাৎমাত্র দৌড়ে আসেন আজিজ। হ্যাণ্ডশেক করে কুশল বিনিময় করেন। একাত্তরের সে ভয়াবহ দৃশ্য তাঁর মনকে আপলুত করে। তাঁর কৃতজ্ঞতা, "আগে আল্লাহ, পাছে হেমায়েত আমাকে দুনিয়ার মুখ দেখার সুযোগ দিয়েছেন"। আজিজের রুটির দোকানের পাশ ঘেঁষে যেতে হেমায়েতকে একটু বসতেই হয়। নইলে অবোধ বালকের মত আজিজের অবুঝ কান্না। কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিহারে হেমায়েতকে দোকানের ধার কাছের পথ সযত্নে এড়িয়ে চলতে হয়।

শত্রু-মিত্র নিহতের সৎকারে মুক্তি ঃ মৃতের প্রতি মুক্তির বিদ্বেষ নেই। উপস্থিত গ্রামবাসীর সাহায্যে সুবৃহৎ গভীর গর্তের গণকবরে সকলের লাশ দাফন করা হয়। শহিদ ইব্রাহিম খানের লাশ দাফন করা হয় একটু দূরে ভিন্ন কবরে। ফৌজি সালামে শহিদ ইব্রাহিমের প্রতি মুক্তিরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কবরের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শহিদ রক্তের নামে মুক্তিদের মর্মস্পর্শী মোনাজাত করা হয় ঃ "আমৃত্যু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়ে আমরা শহিদদের রক্ত ঋণ পরিশোধ করবো।"

মুক্তিরা পরম আদর-মমতায় শহিদ সমাধিতে একটি রক্ত লাল গোলাপ-চারা রোপণ করে। কালে সে গোলাপ চারা পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হয়ে বছরের পর বছর লাল গোলাপ পাঁপড়ি ঝরায় শহিদের কবরে। মানুষের কাছে শহিদ আত্মার অনাদর হলেও বাংলার মাটি তাঁদের ভুলেনি। বাংলার প্রকৃতির গাছপালার শ্রদ্ধাঞ্জলির মত আজও রক্ত গোলাপ গাছটি পুষ্পাঞ্জলির অর্ঘ্য নিবেদন করছে শহিদ ইব্রাহিমের কবরে।

পাশাপাশি কবরে পরম নির্বিবাদে মিলেমিশে বাস করছে শত্রু-মিত্র। জীবনকালে যাঁরা এক হতে পারেনি, মৃত্যুর দুয়ারে তাঁরা আজ একই কবরস্থানে শায়িত। করুণাময়ের অপার করুণার শান্তির রাজ্যে অঘোর ঘুমে তাঁরা বিভোর। আল্লাহ সকল আত্মার প্রশান্তি দিন।

ম্রিয়মাণ সঙ্গীদের উদ্দীপনা দিতে রাতে শিবিরে আসেন হেমায়েত। এক পর্যায়ে তিনি বলেনঃ "ভাইসব আমাদের জীবনে বিশ্রাম হারাম। বিশ্রামের অবকাশে সব হবে শেষ। 'গতিতে জীবন মম স্থিতিতে মরণ'। দুচার ঘা শত্রুকে দমাবে না। তারা চুপচাপ বসে থাকবে না। নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা আক্রমণ চালাবে। শত্রুর সে সব আক্রমণ প্রতিহত করতে মুক্তির সদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। শত্রুকে ছোট বা হীনবল ভাবতে নেই। ঘা খাওয়া বাঘেরে বিশ্বাস নেই। পাক প্রতিশোধ আসন্ন। শত্রুর গতিবিধির খোঁজে আজই গোয়েন্দা যাবে। শত্রুরা মুক্তির অবস্থান জেনে গেছে। আজ রাতেই শিবির গুটিয়ে ফেলা হবে, পরবর্তী শিবির হবে কোদাল ধোয়া গ্রামে।

বদনসিবের শহিদ ইব্রাহিম। যদিও তাঁর স্মৃতিকে বিস্মৃতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে আলাদাভাবে সমাধিস্থ করা হয়, কিন্তু স্বাধীন দেশে কে রাখে সে খবর! কেউ আজ পর্যন্ত তাঁর স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের চেষ্টা করেনি। দেশ স্বাধীন হলো। সে এলাকায় নেতা উপনেতা প্রশাসনের সবই বহাল তবিয়তে আছেন। মন্দভাগ্য ইব্রাহিমের কবরের স্মৃতি রক্ষার জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। স্বাধীন দেশে শহিদ ইব্রাহিমদের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যে কার গত তেত্রিশ বছরে মুক্তিযোদ্ধারা তা জানতে পারেন নি। এই অপূর্ব অকৃতজ্ঞতার জন্যই কী ইব্রাহিমদের আত্মবলিদান ? বাংলার শহর তো দূরের কথা, প্রত্যন্ত গ্রামের আনাচে কানাচেও পোড়ামাটির বিল্ডিংয়ের অভাব নেই। কিন্তু এসব ইব্রাহিমদের স্মৃতি রক্ষার কবর পাকায় কি স্থানীয় প্রশাসনের কখানা ইটও জুটবেই না!। সরকারি পর্যায়ে এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার মনে হয় কেউ নেই! বুক ভরা ব্যথায় শহিদ ইব্রাহিম-এর সাথীরা আজ সমর জীবনের অমর সঙ্গীর নামে নীরবে আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত কামনা করেন।

ফলাফল : যুদ্ধের ফলাফলে মুক্তিবাহিনী বিস্মিত হয়। এমন আশাতীত সাফল্য সম্বন্ধে ইতোপূর্বে তারা ভাবে নি। মুক্তির হাতে গোনা হিসাবের বাইরেও জলে-স্থলে শত্রুর প্রচুর লাশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শত্রুর পরিত্যক্ত নৌকায় প্রচুর রাইফেল ও রাইফেলের বুলেট মুক্তির হাতে পড়ে। পরাজয়ের ভড়ং থাকলে সৈন্যের চলে না। এ-ব্যাপারে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের সৈন্যদের তো কথাই নেই। কোটালিপাড়া ৪র্থ রাউণ্ডের প্রস্তুতিতে যায় পাক হাউণ্ড।

১৫ জুন পয়সার হাট ও রাজাপুরের উভয় যুদ্ধে পাক আর্মিকে চরম ক্ষয়ক্ষতির খেসারত দিতে হয়। তাদের প্রচুর প্রাণহানি ও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবক'টি পাক গানবোট বিধ্বস্ত হয়। মুক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত বিধ্বস্ত গানবোটকে ধাওয়া করে তিন মাইল দূর সাতলা-বাগদা পর্যন্ত নিয়ে যায়।

বাস্তব যুদ্ধ স্থল : বাস্তবে কোটালি পাড়ার তৃতীয় যুদ্ধ কোটালি পাড়ায় হয় নি, হয়েছে হরিণাহাটি গ্রামে। যাত্রা পথেই যুদ্ধ জিতে যায় মুক্তিরা। এ যুদ্ধকে হরিনাহাটির যুদ্ধ বলাই সঙ্গত।

বিজয়ী মুক্তির সংবর্ধনা : হরিণাহাটির রাতের যুদ্ধের আচমকা গোলাগুলিতে সাধারণ মানুষ প্রথমে চমকে ওঠে। বিজয়ী মুক্তিদের আকাশ-ফাটা জয়বাংলা গর্জনের জয়ধ্বনিতে নৈশ নীরবতা ভেঙে গ্রামের জনতা দৌড়ে রাস্তায় নেমে আসে মুক্তিদের অভ্যর্থনায়। পরদিন দিনের আলোয় মুক্তির দাবানিতে পাকি-দালালদের নাকানি চুবানি দেখে মুক্তি কিস্মতে সবাই বিমোহিত ও চমকিত হয়। মুক্তিবাহিনীর শক্তির প্রতি জনতার আস্থা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। আহ্লাদিত জনতা মুক্তিদের কাঁধে চড়িয়ে আনন্দ নৃত্য আরম্ভ করে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বিজয়ী বীরগণ মানুষের শ্রদ্ধার আসনে এমনি নমস্য ও নন্দিত হয়।

পয়সার হাটের যুদ্ধ বিজয়ী বীর মুক্তি সংবর্ধনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমায়েত হয়

অগণিত জনতা। প্রধান বক্তা হেমায়েত বাহিনীর কমাণ্ডার হেমায়েত উদ্দিন (হিমু)। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রতিনিধিবৃন্দ ঃ-

ক। আসমত আলি খান, এম পি, মাদারিপুর।

খ। হরনাথ বাইন, এম পি, উজিরপুর।

হেমায়েত বাহিনীর কার্যক্রমকে গণপ্রতিনিধিত্বের ছত্রচ্ছায়া দেয়ার জন্য দুই নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিকে বাস্তবে ধরে রাখা হয়। তাঁদের ভারতে যেতে দেয়া হয় নি এবং নিরাপত্তার সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা করে হেমায়েতবাহিনী। যুদ্ধকালে উভয় পরিবারকে মুক্তিবাহিনী পুরা রেশন সরবরাহ করে। হেমায়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচার হত্যা, লুটপাট ধরনের দুর্নাম এড়াতে গণপ্রতিনিধির সাহায্য সহযোগিতার সর্বাধিক প্রয়োজন এভাবে পূরণ করা হয়।

কোদাল ধোয়ার যুদ্ধ ঃ মুক্তির হাতে উপর্যুপরি বিপর্যয় শত্রু সহজে মেনে নিবে না, তাই আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করেন হেমায়েত। ১৬ জুন রাতের আঁধারে অতি গোপনীয়তায় মুক্তি ঘাঁটি খালের পূর্ব পাড়ে কোদাল ধোয়া গ্রামে সরানো হয়। ইতোমধ্যেই কীভাবে যেন এ-খবর আঁচ করে ফেলে পাক আর্মি। সর্বশেষ মুক্তি ঘাঁটির লক্ষ্যে ধেয়ে আসছে পাক আর্মি। মাইল খানেক দূরে পয়সার হাটে শত্রুর সশস্ত্র সৈন্যবাহী লঞ্চের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাতের আঁধারে মুক্তি গোয়েন্দারা এ-সংবাদ দলপতিকে জানাতেই তাঁর সতর্ক প্রস্তুতি শুরু হয়। মুক্তি ফাঁদের খাল বেয়ে মুক্তি ঘাঁটি আক্রমণ করতে প্রবেশ করে শত্রু-লঞ্চ। খালের দুপাশে বাংকারে নিশ্চুপ পজিশন নিয়ে অবস্থান করছে সশস্ত্র মুক্তি। সময় গড়ায় ধীরে ধীরে। ঘন্টার বেশি সময় যায়। এত অল্প পথ আসতে এত সময় তো লাগার কথা নয়। লঞ্চের দেখা নেই। অবশেষে খবর পৌঁছে মুক্তির কাছে, পয়সার হাটে বিনা পয়সার খানায় মেতেছে পাকবাহিনী। বাজারের দোকানের সমুদয় খাবার জোর জবরদস্তি করে লুটে খাওয়ায় ব্যস্ত হানাদার পাকিস্তানি আর্মি।

লুটপাটের জবাব ঃ বিনা পয়সার খাবারের প্রতিদান দিতে চাইলেন হেমায়েত। মূল বাহিনীকে স্ব-স্থানে মোতায়েন থাকার কড়া নির্দেশ দেন এবং নিজে অপর একটি দল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে লঞ্চশুদ্ধ শত্রুদল ঘিরবেন তিনি। পরিকল্পনা কার্যকর করতে তাঁকে বেশি দূর যেতে হয়নি। ততক্ষণে অতি সন্নিকটে এসে গেছে শত্রু লঞ্চ। বড় বেকায়দার অবস্থানে রয়েছে মুক্তি। দাঁড়ানো অবস্থায় তারা শত্রুর নজরে পড়ে গেলেন। এমনি অসুবিধা যে দাঁড়িয়ে পজিশন নেবারও সুযোগ কম। অগত্যা উপায়ান্তর না পেয়ে ত্বরিৎ পজিশনে যায় মুক্তিরা। এবার শত্রুর যেন পোয়া বারো। অপ্রস্তুত মুক্তিকে বেমক্কা ধাক্কার সুযোগটা তারা হাত ছাড়া করে নি। দেখামাত্র চালায় বেধড়ক গুলি আর গুলি। উল্টা বুঝিলি রাম! শত্রু ভেবেছিল অগোছালো মুক্তি লেজ গুটিয়ে পালাবে। কিন্তু সকল বিরূপ পরিস্থিতি উপস্থিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সাহসে সামলে নেয় মুক্তিরা। তাঁদের মেশিনগান ও রাইফেল গর্জে চলে সমানে। সঠিক নিশানায় গুলি চালায় মুক্তিবাহিনী। শত্রুর লঞ্চ স্থানে স্থানে ছিদ্র হয়ে যায় মুক্তির ছোঁড়া গোলাগুলির আঘাতে; কেবল

কোনরকমে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় পাকিরা। পাক-পরিকল্পনায় মুক্তি মারার বদলে এখন মুক্তির হাতে পাক-ফৌজ পাল্টা বেধড়ক মাইর খায়। দুদলে ঝাড়া ঘন্টা দেড়েক যুদ্ধ হয়। মুক্তিবাহিনী লঞ্চের পিছনে ধাওয়া করতেই দ্রুতগতিতে তারা হাওয়া হয়ে যায়। লঞ্চের পিছনে বহু দূর ছুটেও ধরার চান্স পায়নি হেমায়েতবাহিনী। হানাদাররা ছজন নিহত ও আহতের মাধ্যমে বিনে পয়সার খানার ঋণ শোধ করে।

পাক-আর্মির পোড়া কপাল ঃ এত বড় খেসারতের পরেও বিকেলের পড়ন্ত বেলায় দুদিক থেকে আবার পাক-সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হয় মুক্তিবাহিনীর ওপর। তাদের ইচেছ, কোদাল ধোয়া'র মুক্তি ঘাঁটি এবার ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। কিন্তু তাদের সাথে মেশিনগান নেই। মুক্তিবাহিনীর মেশিনগানের ধ্বংস শক্তিতে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে আর আগ বাড়িয়ে মুক্তির মেশিনগানের খোরাক হতে চাইলো না পাকিরা। অবশেষে ক্ষোভের প্রতিহিংসায় প্রতিপক্ষ-শূন্য নিরীহ জনতার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তারা প্রতিশোধের ঝাল মিটায়।

গৌরনদী, উজিরপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ থেকে চারটি স্পিড বোট ভর্তি সৈন্য কোদাল ধোয়া যাত্রা করে। মাদারিপুর গ্রুপ বিপরীত দিক থেকে যুগপৎ এগুলে দুদিকের শত্রু সামলাতে মুক্তিকে চরম বিপাকে পড়তে হতো। আল্লারই শান, মুক্তি মেশিনগানের ভয়ে মাদারিপুর থেকে আগত পাকিস্তানি সৈন্যবাহী স্পিড বোট মহা স্পিডে আগেই কেটে পড়ে। এবার অন্য ৪ স্পিড বোট গ্রুপকে আগ বাড়িয়ে প্রতিরোধ করে মুক্তি-দল। শুরু হয়ে যায় দু'দলে প্রবল গোলাগুলির যুদ্ধ। মুক্তির শক্তির দাপটে নয় জনের গচ্ছায় পাক আর্মি পালায় পয়সার হাটের আট মাইল দূরে। এবারও মুক্তির বিজয়ে আনন্দে প্রকম্পিত হয় কোদাল ধোয়া। মুক্তিবাহিনীর তরুণদের বিজয়-শৌর্যে গ্রামীণ সাধারণ মহিলারাও আবেগে-আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে নানারকম উচ্ছ্বাস-মন্তব্য করতে পিছপা হয় না। জনগণের সমর্থনধন্য যুদ্ধ চেতনার এমনি সাফল্য।

বাঁশবাড়িয়ার বাঁশ

মুক্তি প্রহরার সুফল ঃ জল-স্থলে মুক্তি প্রহরা। বর্ষার সাগর সদৃশ নদী-বিল-হাওড়-খালের ফরিদপুর-বরিশালে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। ইতোমধ্যে বেসামরিক যাত্রীবাহী লঞ্চ-নৌকায় মুক্তিরা একাধিকবার শত্রুর প্রতারণার শিকার হয়। বাঙালি পোশাক ও খাস বাংলা জবানের জয়বাংলা স্লোগানে মুক্তি দুর্গে ঢুকে পড়ে পাক জলযান। ঠেকে শিখে মুক্তি প্রহরার কড়াকড়ি শুরু হয়। ২৪ জুন, ১৯৭১ বাঁশবাড়িয়া লঞ্চ ঘাটের মাইল আড়াই পূর্ব-দক্ষিণে এমনি এক পাক যানবাহী নৌবহর মুক্তি প্রহরায় ধৃত হয়।

সৈন্যদের পাক রসদ ঃ মুক্তিবাহিনী কর্তৃক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার কৌশল এবং জনতার অসহযোগিতার কারণে পাক সৈন্যদের রসদ ঘাটতি পড়ে বিভিন্ন পাক-

ক্যাম্পে। গোপালগঞ্জ আর্মির কপাল মন্দ: চট্টগ্রাম থেকে খুলনার দিকে পাঠানো–চট, তৈল, খাদ্য শষ্যের দুটি সুবৃহৎ বার্জ ও দুটি শিপ পথে মুক্তির হাতে আটক হয়। দশজন সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী থেকেও কাজ হলো না। মুক্তিবাহিনীর আকস্মিক হামলায় কুপোকাত পাক-বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষীরা। পাক স্কটের পক্ষে একটি গুলি করারও সুযোগ হয় নি। গুলিতে উড়ে যায় দশটার খুলি। মধুমতির পানিতে তাদের অন্তিম বিসর্জন ঘটে। পাকিদের এই অবস্থা দেখে বাঙালি সারেং-সুকানিরা মৃত্যু ভয়ে কাঁপতে থাকে। মুক্তিরা তাদের অভয় দেয় ঃ 'জাত ভাই বাঙালি মারা আমাদের কাম-না। এবার বুঝে দেখ আমাদের কথা মানবি কি না মানবিনা ! বার্জ-শিপ সোজা চালাতে থাক বাঁশবাড়িয়া ছোট নদী পথে কোটালিপাড়ার দিকে। অতঃপর এভাবেই চলতে থাকে বার্জ-শীপ। তারাইল বাজারের কাছে অগভীর পানিতে এসে বার্জ দুটি আটকে যায়। শিপ দুখানিও আটকে যায় কোটালি পাড়ার মাইল সাতেক উত্তরে কলাবাড়ি। পানি কমতির কারণে বিশ্রাম নেয় শিপ দুটি।

জনতার অন্নে মুক্তিরা ধন্য ঃ দেশে দারুণ খাদ্যাভাব। বন্যা প্লাবিত দেশে জমির ফসল সম্পূর্ণ ধ্বংসে। খাদ্যাভাবে দিকে দিকে আকাল। মরার উপর খাঁড়ার ঘার মত জনতার মুক্তি খাওয়ানোর দায়। অভুক্ত জনতার অন্নের গ্রাস মুখে নিতে মুক্তির বাধত। গরজ বালাইর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পর-খাওয়া মুক্তিদের সব করতে হচ্ছে। বেমক্কা আল্লায় জনসেবার সুযোগ দিলেন। নৌবহরের মাল খালাসে জনতার সাহায্য পায় মুক্তিরা। স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যে জনতা ত্রস্তে দৌড়ে আসে।

মালে গণিমত লুটে জনতা ঃ আটকে পড়া বার্জের মালামাল যে যত পার তাড়াতাড়ি লুটে নাও। আর পাবে না এমন সুযোগ। সানন্দে জনতা বার্জের মাল লুটে নেয়। পুরা চারটি দিন লাগে চট ও তৈল ভর্তি বার্জ খালাসে। এলাকার জনগণ নিজেদের মন মত গরুর মশারি, শামিয়ানা, নৌকার বাদাম জাতীয় প্রয়োজনে লুটের চট ব্যবহার করেন।

তেলের বেরেল জনগণের সৌজন্যে সস্তা দরে অকশন দেয়া হয়। অতি দরিদ্র জনতার মাঝে বিনা মূল্যে রিলিফ সামগ্রী বিবেচনায় তৈল বিতরণ করা হয়। তৈল ও ভোগ্যপণ্য ইউনিয়ন ওয়ারি বিতরণের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাতে অর্পণ করা হয়।

শিপ খালাসেও প্রায় বার্জ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নিহত পাক প্রহরীদের দশটি অস্ত্র, হাই-এক্সপ্লোসিভ ৩৬ নং গ্রেনেড গুলির পেটি ধরনের অস্ত্র গোলাবারুদ হেমায়েত বাহিনীর সদরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছু ভোজ্য তৈল ও ভোগ্যপণ্য নেয়া হয় মুক্তি ক্যাম্পের খাবারের জন্য। শিপের অন্যান্য সমুদয় মালামাল ইউনিয়ন অনুসারে রেশন পদ্ধতিতে জনতার মাঝে ভাগ বন্টন করা হয়। দরিদ্র অভাবী জনতার আশ্চর্য সংযম। তারা ভেবেছিলেন বেগার কামলা খাটার মাল বহনে তারা দেশ সেবার কাজ করছেন। মালামাল লুটে নেয়ার নির্দেশে তারা হতবাক। মালে গণিমত নেয়াতেও তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি বা বিশৃঙ্খলা নেই। মহান খলিফা ওমর বিন খাত্তাবের (রা.) সুবিচারের

রীতিতে যেন বাইতুল মালের মত গণিমতের লুটের মাল বণ্টন করা হয়। স্বাধীনতার সুফলের বিমূর্ত রূপ দেখে জনতা বিমুগ্ধ। জনতার মাঝে মালামালের বণ্টনরীতি ব্যাপক শিহরণ জাগায়। জনতার আশীর্বাদ ধন্য মুক্তিবাহিনীর শিকড় আরো শক্ত হয়।

পাকিস্তানিদের নির্মমতা ঃ মুক্তিবাহিনী কর্তৃক খুলনাগামী পাকিস্তানি শিপ থেকে খাদ্য লুটে নেয়ার ঘটনায় পাক-আর্মি রেগেমেগে আগুন। খবর পেয়ে মানিকদা ও বাঁশবাড়িয়া থেকে বিপুল সংখ্যায় ধেয়ে আসে পাক আর্মি গোপালগঞ্জের উদ্দেশ্যে। মুক্তিরা কলাবাড়িয়া গ্রামে আছে ধারণায় সেখানে আক্রমণ শানানো হয়। মুক্তিশূন্য জনতার ওপর চলে পাক নৃশংসতা। বন্যা প্লাবিত গ্রামের দুশ আশিজন মানুষকে ধরে নেয় তারা। কমতি পানিতে আটকে পড়া বার্জ উদ্ধারকালে পাক আর্মির দর্পভরা আচরণ মুক্তিদের চোখে পড়লেও তখন করার কিছুই ছিল না। পাকবাহিনী বন্দি জনতাকে ধরে নিয়ে বার্জে উঠায় এবং চোখ, হাত-পা বেঁধে বেয়নেট চার্জ করে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করে। ঘৃণ্য পাক-পশুরা এখানেই থামে নি, তারা এসব নিরীহ বাঙালির লাশ বার্জ থেকে নদীতে ফেলে দিয়ে আনন্দ-নৃত্যে মেতে উঠে। পরবর্তী প্রজন্মের জীবন্ত ইতিহাসের সাক্ষী হতে ২৮০ জনের মধ্যে একমাত্র কালু নামের একজন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অলৌকিকভাবে রক্ষা পান। সেদিন অসহায় বাঙালি ছিল এ-হত্যাযজ্ঞের শুধুমাত্র নীরব দর্শক।

মুক্তির প্রতিক্রিয়া ঃ কোটালিপাড়া খাদ্য গুদাম খালি করার পাক-পরিকল্পনায় মুক্তির মাথায় বাজ পড়ে। জনতা না খেয়ে মরলে আর রক্ষা নেই। জনতা না বাঁচলে নিজেরাই খাব কি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানি জুজুর নামে জনতার মুখের অন্ন সরানো ব্রিটিশের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির সুযোগ পাক আর্মিকে দেয়া হবে না। যে কোন মূল্যে ব্যাপার রুখতে হবে।

কোটালিপাড়া খাদ্য গুদামে মালবাহী নৌযান আহ্বান ঃ বাহিনী প্রধানের কাছে গোয়েন্দা দফতরের সুনির্দিষ্ট এ-খবর পৌছতেই ত্বরিত কর্মতৎপরতা গ্রহণ করেন তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সকল ইউনিয়ন প্রশাসন কমিটিকে তলব করা হয় ঃ "আগামী ২৮ জুন, ১৯৭১ কোটালিপাড়া খাদ্য গুদামে মালবাহী নৌকা নিয়ে হাজির হোন। যার যত প্রয়োজন খাদ্য গুদাম লুটে নিন। পাক আর্মি গুদাম খালি করার ষড়যন্ত্র করছে।" এ-খবরে নিম্নলিখিত থানার মালবাহী যান আসে কোটালিপাড়া থেকে খাদ্য নিতেঃ-

ক। উজির পুর	বরিশাল জিলা।	ঞ। সাইবের হাট	মাদারিপুর জিলা
খ। সরূপকাঠি	"	ট। রাজৈর	"
গ। নাজিরপুর	"	ঠ। মুকসেদপুর	গোপালগঞ্জ জিলা
ঘ। গৌরনদী	"	ড। কোটালি পাড়া	"
ঙ। বাবুগঞ্জ	"	ঢ। পাটগেতি	"
চ। শিকারপুর	"	ণ। গোপালগঞ্জ সদর	"
ছ। কালকিনি	মাদারিপুর জিলা	ত। কাশিয়ানি	"
জ। মাদারিপুর সদর	"		
ঝ। মোস্তফাপুর	"		

অনুরূপভাবে আরও বহু এলাকার মালবাহী নৌকার ঢল নামে কোটালিপাড়ায়, উদ্দেশ্য মুক্তিবাহিনীর সৌজন্যে থানা গোডাউন রিলিফ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা।

মালবাহী নৌযান ও মালামাল নিরাপত্তা ঃ কোটালিপাড়া খাদ্য গুদামের তিন মাইল দূর পরিমণ্ডলে মুক্তিবাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনি দেয়া হয়। প্রত্যেকটি নদী পথ ও অন্যান্য জল-স্থল পথঘাটে বসানো হয় মুক্তি নিরাপত্তার সশস্ত্র অ্যাম্বুশ। গোডাউন নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা প্রহরা জারি থাকবে। মালবাহী নৌকা নিজস্ব এলাকার নিরাপদ সীমায় না যাওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তার সচল ব্যবস্থা জারি রাখা হয়। আর্মি আগমনের সম্ভাব্য সকল পথ মুক্তিবাহিনীর ক্র্যাক সৈন্যদের হাতে অবরুদ্ধ।

খাদ্য গুদাম লুট ঃ সশস্ত্র প্রহরায় দিনে দুপুরে ডাকাতি। আর্মির হাত থেকে জনতার খাদ্য রক্ষার লক্ষ্যে মুক্তিরা সে-সব খাদ্য সামগ্রী লুট করে। বিদেশী দুশমনদের খাদ্য না দিয়ে স্বদেশী মিত্র জনতাকে দিয়ে খাদ্য লুট করানো হয়। পুরা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ক্যাডারকে খাদ্য-নৌকার মালামালের নিরাপত্তায় নিয়োগ করা হয়। অবশিষ্ট পুরা মুক্তি প্রশাসন সরকার নিয়োজিত খাদ্য গুদাম নিয়ন্ত্রণের মালামাল বিতরণে ব্যস্ত। মুক্তি বাহিনীর নির্ধারিত নির্দেশ মতো তিন দিন উদয়াস্ত গোডাউনের মালামাল বিতরণ চলে। মালে গণিমতের লুটের রেশন ভর্তি নৌকা তাৎক্ষণিক স্ব-স্ব এলাকায় যাত্রা করে। সকল মাল বোঝাই নৌকা নিরাপদে নিজস্ব এলাকায় পৌঁছলে মুক্তির নিরাপত্তা দায়িত্ব শেষ হয়। নিরাপত্তা কার্যক্রম শেষের সিগন্যাল মাত্র মুক্তিবাহিনী দ্রুত নিজেদের আপনা-আপনা দায়িত্ব এলাকায় চুপিসারে সরে পড়ে।

চাল-গম ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর প্রায় ষোল হাজার মন মাল বিতরণ করা হয়। খাদ্য পেয়ে জনতা খুশি। কিন্তু টগবগে ফুটন্ত কড়াইর মতো ফুলতে থাকে গোপালগঞ্জ ও তার আশপাশের পাক আর্মি কমাণ্ডার। যার ফলশ্রুতিতে, কোটালিপাড়া মুক্তি ট্রেনিং সেন্টার জহরের কান্দির ওপর রাগের কহরে আপতনের পাক প্রস্তুতি শুরু হয়।

কোটালিপাড়া চতুর্থ আক্রমণ

(৩০ জুন, ১৯৭১)

বিক্ষুব্ধ শত্রু ঃ স্থলে জলে মুক্তি বিচ্ছুর হাতে বার বার শোচনীয় অপমানজনক পরাজয় ঘটছে পাক-আর্মির। সামান্য উদোম গায়ের খাটোনাটা নাখান্দা বাঙ্গালের হাতে এশিয়ার দীপ্ত গৌরব পাক আর্মির নাকানি চুবানি অসহ্য। এর প্রতিশোধ নিতে ৩০ জুন সুসজ্জিত সুবিশাল পাক আর্মি বহর কোটালিপাড়া প্রবেশ করে। হেমায়েত সদর-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জহরের কান্দি নির্মূলের লক্ষে চলবে এই সাঁড়াশি অভিযান। তাদের

খাদ্যবাহী বার্জ-লঞ্চের সাথে খাদ্য গুদাম লুটে নিয়েছে মুক্তিরা। গোপালগঞ্জ ও তার আশেপাশে এলাকার নিয়মিত আর্মি কমান্ডারগণ এই ঘটনায় রাগে ও ক্ষোভে ফুঁসছে। 'এবার মুক্তিকো এয়ছা টাইট ফাইট দেঙ্গে ওনকা বাপ দাদাবি কবরছে ইয়াদ করেংগে।'

তোড়জোড় পাক প্রস্তুতির খবরে মুক্তিদের মধ্যেও ত্বরিত প্রতিক্রিয়া হয়। মুক্তি গোয়েন্দা রিপোর্টে খবরের সত্যতা পাওয়া যায়। পাক গোডাউন লুটা ষোল হাজার মন খাদ্য শস্য বিতরণ করা প্রতিটি থানার মুক্তি কমান্ডারকে বাহিনী সদর দফতরে তলব করা হয়। প্রতি থানার দেশপ্রেমিক জনতাকে বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার আকুল আহ্বান জানানো হয়। পাক গোডাউন লুট করার কারণে পাক আর্মির ক্ষেপে যাবার বিষয় জনতা জানে। জনতাকে সাহায্য করতে গিয়ে এবার মুক্তিরা বিপাকে পড়ে। এমত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য প্রস্তুতি নেন। মুক্তি কমান্ডারগণ স্বাধীনতা ও বাংলার মাটির নিমকের নামে, মাতৃভূমির ইজ্জতের লড়াইয়ের ৪র্থ রাউন্ডে কমান্ডারের পাশে আমৃত্যু লড়াই করে যাবার জন্যে শপথ গ্রহণ করে।

মুক্তি রেকি ঃ মুক্তির হাতে সময় খুবই কম। কিন্তু কোনভাবেই পাক আর্মিকে কোটালিপাড়া থানায় সংহত অবস্থায় সুদৃঢ় আস্তানা পাততে দেয়া যাবে না। হেমায়েত বাহিনীর রণ-জরুরি বোর্ডের মিটিংয়ে ৩০ জুন থানায় আগত সুবৃহৎ আর্মি বহরকে সে-রাতেই আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে বাহিনী প্রধান হেমায়েত দ্রুত আক্রমণ স্থল রেকি করে আসেন। থানার বাইরেও কোটালিপাড়ায় আরো তিনটি স্থানে পাক আর্মি ক্যাম্প রয়েছে ঃ ঘাঘোর গুদাম ঘর, কুরপালা কমিউনিটি সেন্টার এবং গোপালপুর মাদ্রাসা। উক্ত মিটিংয়ে বাইরে থেকে পাক আর্মির জন্য সম্ভাব্য সাহায্য আসার পথে অ্যাম্বুশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চারপাশ থেকে চারটি কোম্পানির যুগপৎ আচমকা এটাকের সময়ে এক কোম্পানির উপর অভাবিত আকস্মিক বিপদ সামলানোর দায়িত্বে থাকবে। বাহিনী প্রধানের উপস্থিত নির্দেশনায় আক্রমণ চলবে।

মূল আক্রমণ

পাঁচটি কোম্পানির প্রস্তুতি :

ক। বাহিনী প্রধান হেমায়েত;

খ। কমান্ডার কমলেশ বেদজ্ঞ;

গ। কমান্ডার লুৎফর রহমান;

ঘ। কমান্ডার রকিব সেরনিয়াবাত এবং

ঙ। কমান্ডার আহসান হাবিব।

এ-ছাড়াও অন্যান্য সাপোর্টিং গ্রুপ কাজ করবে।

প্রতি কোম্পানিতে একশ সত্তরজন যোদ্ধা। বারবার দ্রুত রিহার্স করা কমান্ডার নির্ধারিত প্ল্যান-প্রোগ্রাম অনুসারে নৈশ আক্রমণ চালাবে। নতুন স্থানে দিনের বেলায়

আসা শ্রান্ত ক্লান্ত আর্মির উপর চালাতে হবে অতির্কিত আক্রমণ। অতি উৎসাহী দালাল এবং পাক-আর্মির অহমিকাকে আহত করে দ্রুত প্রস্তুতির মাধ্যমে মুক্তি হামলা চালাতে হবে। পাক দৃঢ়তার মধ্যেও তারা নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তায় কাজ সারছে। জনগণের সহযোগিতার ফলে এবং গোয়েন্দা কার্যক্রমের নির্ভুল তথ্য যোগান দেয়ায় অসম্ভবকে সম্ভব করা হচ্ছে। মুক্তির নারী গোয়েন্দা কমলাবতী রাণী পাক অফিসারের অংক শায়িনী হয়ে মানসাংকে মিলিয়ে আনছেন। সব মিলিয়ে বাঙ্গালের খাঁড়ার কোপে রয়েছে হানাদার পাকিস্তানি আর্মি।

রাতের শেষ প্রহরে নিঃশব্দ নীরবতায় মুক্তি এড্ভান্স করে। প্রস্তুতি ও যাত্রাপথের কোনো প্রকার ইঙ্গিত পাক-ইন্টেলিজেন্স ও দালালরা পায়নি। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত শত্রুর উপর মুক্তিবাহিনী চালাবে আঁধার রাতের অপারেশন। পরিকল্পনা মতন মধ্যরাতের পর সুপ্তিমগ্ন শত্রুর ওপর গর্জে উঠে মুক্তির অস্ত্র। স্বল্প সময়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাক আর্মিও তাদের জড়তা কাটিয়ে মুক্তির আক্রমণের জবাব দিতে আরম্ভ করে। চারপাশ থেকে প্রবল আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় 'ওয়ার ক্রাই' জয়বাংলা গর্জন। দূরদূরান্ত থেকে জয়বাংলা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গগণবিদারী আওয়াজে; এ-যেন এক আনন্দ-ধ্বনি। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা সেদিন জয়বাংলা ধ্বনির প্রতিধ্বনি ছিল না, সেটি ছিল গোলাগুলির শব্দ থেকে বাতাসে ভেসে আসা বাঙালি নরনারীর যোজন যোজন ব্যাপী জয়বাংলার ধ্বনির এক কল্পনা-বিলাস; মনের জগতে বিরাজিত স্বস্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। সারা মুল্লুক জুড়ে যেন মুক্তিবাহিনী তাঁদের প্রাণ সংহারে তেড়ে আসছে। আর রক্ষা নেই পাকিদের; ভরবর্ষার রাতের শব্দগর্জন বহুদূর থেকে শোনা যায়। জয়বাংলার গর্জন তাই দূরদুরান্তের মানুষকেও সচকিত গর্জনমুখর উল্লসিত করে। পুরা এলাকায় মাইলকে মাইল যেন যুদ্ধক্ষেত্রের গর্জন। পাক আর্মি তো দূরের কথা, পৃথিবীর যে-কোনো শক্তিমান আর্মির এতে হৃদকম্পন হবার কথা। অতীতে এখানে তাদের পরাজয়ের ভরাডুবি স্মরণে তারা আতঙ্কিত। রাতের আঁধার বলে রক্ষা, নইলে যে কি হতো বলা অসম্ভব। খোলামেলায় এসে যুদ্ধ খায়েশ ছেড়ে প্রতিরক্ষকতার আড়ালে আবডালে গুলি চালনার কৌশল তারা বেছে নেন। জয়পরাজয় যাই হোক, পাক অস্ত্র যাতে মুক্তির হাতে না পড়ে তার বিশেষ সতর্কতা নেয় তারা। সে-সব হাত করেই আজ মুক্তির এত তেজ।

তাদের আগ বাড়ানো পথের সন্ধান নিতে উৎসাহ জোগায় সঙ্গী রাজাকার। মুক্তি আক্রমণের চাপে দিশেহারা পাক আর্মি। গোলাগুলির ফাঁকে মুক্তি প্রতিরক্ষার অরক্ষিত দুর্বল দিক তারা সনাক্ত করেন। মুক্তির অসতর্কতায় অরক্ষিত ফাঁক দিয়ে রাতের আঁধারে পলায়ন করতে সমর্থ হয় সুশৃঙ্খল পাক-বাহিনী। সারা রাতের আক্রমণে ভোর হবার মধ্যে কোটালিপাড়া থানা আর্মি হেডকোয়ার্টার মুক্তি বাহিনীর দখলে চলে আসে।

বিজিত আর্মি সদরে স্থানে স্থানে প্রচুর চাপ চাপ রক্তের দাগ। এতে তাঁদের প্রচুর হতাহতের নিদর্শন আন্দাজ করা যায়। বহুদূর পর্যন্ত গেছে রক্তের দাগ। পাক আর্মির স্পিরিট ডি কোরের পারস্পরিক সহমর্মিতা অবিস্মরণীয়। তারা জাত ভাই কোন আহত

নিহতকে ফেলে যায়নি, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সমুদয় অস্ত্র, কেবল রেখে গেছে বাঙাল সাঙাত রাজাকারের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণার নিদর্শন। চারজন রাজাকারের লাশ এক বাংকারে পাওয়া যায়। নিহত বাঙালির অপ্রয়োজনীয় মৃতদেহ সাথে নেয়ার বোঝা তারা বাড়ায়নি। হায় প্যারামিলিশিয়ার বাঙাল রাজাকারের প্রতি পাক আর্মির দরদের এই নমুনা!

বিজয়ের সাফল্য অর্জনের জন্য মুক্তিবাহিনীকে জনপঁচিশেক ছোট বড় আহতের খেসারত গুণতে হয়েছে। এ-যুদ্ধে আহতদের ক'জন :

ক। মুজিবর; খ। সিরাজ; গ। আলাউদ্দিন; এবং ঘ। মনিরুল ইসলাম সেন্টু।

পাক আর্মির অঢেল অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুক্তির দখলে আসে। প্রচুর বস্ত্র ও সামরিক পোশাক-কম্বল-মশারি-ঝোলা-লোটা, চাউল-চিনি-লবণ-তেল-চা পাতা জাতীয় খাদ্য সামগ্রীর মালে গণিমত আল্লায় মিলিয়ে দেন গরিব মুক্তির ভাগ্যে। পাক আর্মির প্রচুর ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। বিজয় সাফল্যে মুক্তিরা আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন।

পলাতক পরাজিত পাক বাহিনী রাতের আঁধারে পালানোকালে কিছু গ্রামবাসী তাদের দেখে ফেলে। ফেরার পথে মুক্তি গোয়েন্দাদের শ্যেণ দৃষ্টিও তারা এড়াতে পারেনি। খাকি পোশাকেই নিশাচোর পাক আর্মিকে পালাতে হয়। দু'চারজন গ্রামবাসী রাতের ফৌজকে মুক্তি ভেবে সহমর্মিতায় এগিয়ে আসেন কিন্তু উর্দু কথাবার্তা শুনে তারা পিছিয়ে যান। অল্পক্ষণের মধ্যেই এ-কান সে-কান করে পাকিদের পলায়নের রসাল বাখান বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ভোরের আলো স্পষ্ট হওয়ার আগেই কোটালিপাড়ায় আনন্দ মিছিল বেরোয়। জনতার আনা খাবার বহুপুণ্য জ্ঞানে মুক্তিরা উদরস্থ করেন।

এবার শুদ্ধ চারবার কোটালিপাড়ায় মুক্তির হাতে পাকবাহিনী নাকানি চুবানি খায়। মুক্তির গেরিলা-রণকৌশলের কিস্মতের প্রতি জনগণের আস্থা বেড়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর সাফল্য জনতা চোখের সামনে দেখছে। ফলে তাদের মনোবল প্রচুর বেড়ে যায় এবং তার ফলশ্রুতিতে আরো অধিক জনতা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এবার তারা দাবি তুলে, 'আমাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হোক।' আগ্রহী জনতার যাদের অস্ত্র সম্পর্কে কিছুটা পূর্ব-জ্ঞান আছে তাঁরা প্রশিক্ষণ-ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেলেন। অন্যরা পরের দিনের অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য রিজার্ভ থাকলেন। এ-ছাড়াও, অন্যান্য আগ্রহী জনতাকে মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণে উপযুক্ত ও আগ্রহী বলে উল্লেখ করে তাদেরও একপ্রকার সনদ পত্র দেয়া হলো যাতে ভাবষ্যতে মুক্তিপ্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে নিয়োজিত মুক্তি সেনার পক্ষে যুদ্ধ প্রশিক্ষণের সুযোগ ও সামর্থ সীমিত। তাঁদের প্রশিক্ষণ সেন্টার সঞ্চরণশীল। জহরের কান্দির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইতোমধ্যে নারিকেলবাড়িয়ায় স্থানান্তরিত হয়। হেমায়েতবাহিনী- প্রশাসনিক সদরে মুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। সেখানে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও

স্থাপিত হয়। নার্সিং প্রশিক্ষণের সাথে নারিকেলবাড়িয়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষিতা ও সাহসিনীদের রীতিমত অস্ত্র প্রশিক্ষণে দক্ষ যোদ্ধায় গড়ে তোলা হয়। দক্ষ নারী প্রশিক্ষণ সংগঠনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুক্তি প্রশিক্ষণ যোগ্যতার সনদ দেয়াদের গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য লিখিত পত্রযোগে দলে দলে ভারতে পাঠানো হয়।

কোটালি পাড়ার চতুর্থ বিজয় মুক্তির জন্য যত না বৈষয়িক সাফল্য এনেছে তার চেয়ে বেশি বয়ে এনেছে মুক্তিযোদ্ধা ও এলাকার সাধারণ জনতার মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। বস্তুত এ-সব বিজয়ই মুক্তির পক্ষে গণসমর্থনকে করেছে আকাশচুম্বি। রাতের আঁধারে পাক আর্মি না পালালে দুপক্ষেরই এখানে জয়পরাজয়ের কেয়ামতের দশা হতো।

গোপালগঞ্জ যুদ্ধ

(প্রথম রাউন্ড ; ১১ মে, ১৯৭১)

কোটালিপাড়া যুদ্ধের প্রথম বিজয় ফরিদপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ অঞ্চলে তখন পাক আর্মির শক্ত আস্তানা গোপালগঞ্জে। এখান থেকেই তারা এলাকার চতুর্দিকে আক্রমণ, লুটতরাজ, বিভিন্ন থানা সদর, আর্মি ও রাজাকার ক্যাম্পে রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠায়। মুক্তিরা গোপালগঞ্জকে ঘোলাজল খাওয়াতে উঠে পড়ে লাগে। এখান থেকে ভবিষ্যতে যাতে কোটালিপাড়া ও অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করার আর সাহস না পায় পাকি আর্মি, সে-রকম সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে হেমায়েত বাহিনী।

তিন মুক্তি কমান্ডার গোপালগঞ্জ আক্রমণের পূর্ণাঙ্গ প্ল্যান তৈরি করেন। ভারত ফেরত ট্রেইন্ড গেরিলা ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের গেরিলাদের বাস্তব যুদ্ধ অভিজ্ঞতার ব্যাটল ইনকুলেশনই বস্তুত গোপালগঞ্জের প্রথম যুদ্ধ। গোপালগঞ্জ শহরের কয়েক মাইলের ব্যবধানে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্তানা ছিল, তিন কমান্ডার সেখানে সদলে অবস্থান করেন :

ক। গোপালগঞ্জ শহরের মাইল চারেক উত্তর-পূর্বে গোপীনাথপুর গ্রামে কমান্ডার ওমর কাজি।

খ। শহরের সাত মাইল পশ্চিমে চন্দ্রদিঘলদি গ্রামে ক্যাপ্টেন জালাল আহমদ-এর ঘাঁটি। তাঁর সৈন্য সংখ্যা একশত পঞ্চাশ।

গ। শহরের দুই মাইল দক্ষিণে মানিকদহ গ্রামে কমান্ডার মীর নওশের আলির ত্রিশজনের দলের আস্তানা।

তিন দিন ধরে দলের অভিযান পরিচালনা ও সমন্বয়ের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ

চলে। পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে শত্রু অবস্থানের সর্বশেষ অবস্থান রেকি করা হয়। তিন গোয়েন্দা হাফেজ আবদুর রহমান, মহিউদ্দিন ও জাহিদ হোসেনকে শহরে পাকসেনাদের অবস্থান সরেজমিনে দেখতে পাঠানো হয়। সর্বশেষ গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডাক্তার ফরিদ আহমেদ, ক্যাপ্টেন জালাল, কমান্ডার ওমর এবং কমান্ডার নওশেরদের গোপন সভার সিদ্ধান্তক্রমে আক্রমণের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৯ মে, ১৯৭১।

সাধারণত পাক আর্মি লুটপাট অভিযানের ধান্ধায় সকাল দশটার দিকে শহর থেকে বেরিয়ে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাই আক্রমণের সময় বেছে নওয়া হয় দিনের বেলা এগারটা।

১৮ মে দিবাগত রাতে ক্যাপ্টেন জালাল সদলে শহরের পশ্চিমে ঘোষেরচর গ্রামে নিশ্চুপ পজিশনে যান। রাতের আঁধারে কমান্ডার ওমর অবস্থান নেন শহরের পূর্ব পাশে বেদ গ্রামে। কমান্ডার নওশের আলির দল মানিকদাহ্ ছেড়ে শহরের দক্ষিণে নবীনবাগে অবস্থান গ্রহণ করেন। দিনের আলো প্রকাশের পূর্বেই শত্রু অবস্থানের নিকট-ব্যবধানে গোপালগঞ্জ শহরের ভিতরে তিন দিক ঘিরে মুক্তিরা অবস্থান নেয়।

বেলা সাড়ে এগারটায় যুগপৎ তিন দলের গোলাবর্ষণ শুরু হয়। তিন দিক ঘিরে গুলিবন্যায় বেড়জাল সৃষ্টি করে শহরের কেন্দ্র অভিমুখে মুক্তিরা এডভান্স করে। পাক দালাল রাজাকার বাহিনী তাদের নিমক হালাল করতে মুক্তি-গুলির তাৎক্ষণিক প্রতিউত্তর দেয় : গুলির জবাব গুলিতে। মুক্তি ফৌজের আক্রমণের জবাবে গোলাগুলির প্রতি-আক্রমণের মাধ্যমে গোপালগঞ্জের দালাল-যোদ্ধা গ্রুপ তাদের সরব উপস্থিতি ঘোষণা করে। একই সময়ে তিন দিকের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অযুত কণ্ঠের জয়বাংলার সগর্জন যুদ্ধ-ধ্বনি দালালদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। বুদ্ধিমান দালালরা এরই মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে মুক্তিবাহিনীর শহরে প্রবেশের পথ সহজে সুগম হয়।

এবার মুক্তিবাহিনী সরাসরি ট্রেজারি আক্রমণ করে। এ-যুদ্ধে ট্রেজারির পাকিস্তানি সেকেন্ড অফিসার অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়ে প্রাণ দিলেন। পাক বশংবদ পুলিশের কোটালিপাড়ার কোটাল হেমায়েত-আতংকের জলাতংক তখনো কাটেনি। তারা প্রথম চোটেই

> "নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম
> জননী বঙ্গভূমি..."

বলে আনত মাটিতে চুমা খেয়ে রাইফেল ফেলে কোনরকমে নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়। ট্রেজারির বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয় এবং তাদের অস্ত্র ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে।

দালাল শিরোমণি মুসলীম লীগার ওয়াহিদুজ্জামানের বাড়িতে হামলা করে মুক্তিরা। মুক্তির গুলির জবাবে বাড়ির ভিতর থেকে পাল্টা গুলি করা হয়। ওয়াহেদুজ্জামানের

বাড়িতে ঘন্টা খানেক চলে দেদার গোলাগুলি। আসল চিড়িয়া হাত করতে না পেরে মুক্তিরা উল্টা পিঠ টান দেয়।

শহরের দুই সেরা দালাল কাফু ও আফসারউদ্দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় মুক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করে। গুরুতর আহত হবার কারণে কাফু ও আফসার পরে মারা যান। সৌভাগ্যক্রমে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ সে-যুদ্ধে আহত হন নি। বিনা ক্যাজুয়েলটির বিজয়ে আল্লাহর দরবারে মুক্তিরা শোকরিয়া জানায়!

গোপালগঞ্জ প্রথম রাউন্ড যুদ্ধের অভিযান-সাফল্যে তিন দালাল হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র লাভ হয় মুক্তির। মুক্তিবাহিনীর এ-সাফল্যে গণমনে শুভ প্রতিক্রিয়া হয়। তবে মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্যে নিরীহ জনতাকে কড়ায় গণ্ডায় কাফফারা শোধরাতে হয়। পরবর্তীতে গোপালগঞ্জে পাক সেনা সন্নিবেশ ঘটলে শহরবাসীর ওপর মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচারের স্টিমরোলার চলে; স্বাধীনতার এমনি অগ্নিমূল্য।

গোপালগঞ্জে চমক সৃষ্টিতে বিশেষ সাফল্য দেখান ক্যাপ্টেন হালিম। তাঁর নেতৃত্বে ট্রেজারি লুটে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন কাফু, আফসার ও সেকেন্ড অফিসার। এ-ধরনের টাকা লুপপাট সর্বত্রই হয়েছে। ঝিনেদা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুরের মত স্থানে এমন ট্রেজারি লুট সুসংবদ্ধ সামরিক ও বেসামরিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় হয়েছে। সাতক্ষীরায় ট্রেজারি লুটের নেতৃত্ব দেন খুলনা পাইকগাছার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি জনাব গফুর। কিন্তু সাতক্ষীরা ব্যাংকের টাকার পুরোটা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার-এর হাতে জমা না পড়ায় পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে গফুরকে জীবন দিতে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধ সাফল্যে খ্যাত ক্যাপ্টেন হালিমের শিয়াল তাড়া ভারত যাত্রা ছিল ভয়-ভীতি ও বাঁচার তাগিদ। দেশ স্বাধীন হলে ক্যাপ্টেন হালিম দেশে ফিরে আসেন এবং পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল পদ অলংকৃত করেন।

গোপালগঞ্জ যুদ্ধ
(দ্বিতীয় রাউন্ড)

সূত্র ঃ কোটালিপাড়ার নৈশ আক্রমণ পাক আর্মিকে সন্ত্রস্ত করে। কোটালিপাড়ার পর মুক্তি টার্গেট হতে পারে গোপালগঞ্জ। রাতের বিচ্ছু তাড়াতে আর্মি অবস্থানের চতুর্দিকে রয়েছে কাঁটাতারের লোহার বেড়া। তাতেও সংশয় যায় না। এবার কাঁটাতারে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়। ২রা জুলাই গোপালগঞ্জের কারেন্ট সংযোগ যেন মুক্তিবাহিনীর রক্তে কারেন্টের শকের মতন উত্তেজিত করে তোলে। রাতে মুক্তিবাহিনী যাতে ক্যান্টনমেন্ট হামলা করতে না পারে তারই দাওয়াই এই কারেন্ট সংযোগ। এ-ঘটনা হেমায়েতকে প্রবলভাবে উত্তেজিত ও ক্ষেপিয়ে তোলে।

প্রস্তুতি রেকি ঃ বাহিনী প্রধানের আহ্বানে দূরদূরান্তের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগণ সদর দফতরে সমবেত হন। তাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, গোপালগঞ্জের পাক-আর্মিকে আচ্ছা শিক্ষা দিতে হবে। তাদের এত দুঃসাহ যে বিদ্যুতে মারে দেশপ্রেমিক মুক্তি! ইতোমধ্যে কোম্পানি কমান্ডারদের সাথে রণকৌশলের নীতিনির্ধারণী কনফারেন্স সম্পন্ন হয়। সম্মুখ সমরে ক্ষয় করার মতন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত বাহিনীর মুক্তি সেনা কম। প্রচুর যুক্তিতর্কের পর হেরাসমেন্ট এটাকের পরিকল্পনা করা হয়। পাক আর্মির ক্ষতি সাধনের সাথে তাদের মনোবল যাচাই করাই এর মূল উদ্দেশ্য। জুলাই মাসের চার তারিখ দিবাগত রাতে আক্রমণের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। পুরো প্ল্যান গোপন রেখে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কমান্ডারদের স্ব স্ব নির্ধারিত স্থানে প্রেরণ করা হয়।

বাহিনী প্রধান স্বয়ং একজন জেলের সাজে রেকিতে যান গোপালগঞ্জ। তিনি মাছ বেচার ছদ্মাবরণে জেলের পোশাকে শহরের পূর্ব-দক্ষিণ এলাকার পথ দিয়ে সেনাদুর্গে প্রবেশ করেন। অতি সহজেই তাঁর রেকি শেষ হয়। এরই মধ্যে গোপনে রাখা টেস্টারে তারকাঁটার বেড়া চেক করা হয়।

হেরাসমেন্ট ফায়ার ঃ রেকির মাধ্যমে আক্রমণের দিক নির্দেশনা ঠিক করা হয়। গোপালগঞ্জ ক্যান্টনমেন্টের পূর্ব দিক থেকে হেরাসমেন্ট ফায়ার শুরু হয়। ৪ঠা জুলাই রাত দুটায় প্রথম গুলি চলে। যুগপৎ বহুবিধ অবস্থান থেকে ফায়ার ওপেন করা হয়। যে দলের যা দায়িত্ব তা কয়েক মিনিটে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ত্বরিৎ কার্যক্রম শেষে মুক্তিরা রাতের আঁধারে নিরাপদ দূরত্বে কেটে পড়ে। ঠিক যার যা করণীয় ততটুকু মাত্র করে মুক্তিরা সতর্কতার সঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে আসে। মুক্তির সকল দলের সর্বমোট বুলেট ফায়ার হয় মাত্র পঞ্চাশ রাউণ্ড। ভয়ার্ত পাক আর্মি রাতের অবশিষ্টাংশে পাঁচ হাজারের অধিক রাউন্ডের খৈ ফুটায়।

মুক্তিরা সামান্য হেরাসমেন্টের ফায়ারে পাক প্রতিক্রিয়া সতর্ক পর্যবেক্ষণে পরীক্ষা করে। তাদের ভয়ভীতির সন্ত্রস্ততা সংশ্লিষ্ট পক্ষের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঘরে বসে ও টেন্টের ভেতর থেকে শূন্যে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ে তারা মুক্তিভীতি দূর করে। পাক দোসর বাঙাল রাজাকাররা মুক্তি আতঙ্কের জুলাতংকের নির্মম সত্য বাইরে ফাঁস করে দেয়।

"পাগলারে সাকোঁ নারিস না
আরে ভালা কথা মনে করহস।"

পাক দুর্বলতা মুক্তিরা ধরে ফেলে। হেরাসমেন্ট ফায়ারে তাদের মনোবল দুর্বল করা মুক্তির নতুন রণকৌশল। অনেকবার এ-খেলা খেলে সাফল্য পায় মুক্তিবাহিনী।

ভাটিয়াপাড়া ওয়্যারলেস সেন্টার যুদ্ধ

(৬ নভেম্বর, ১৯৭১)

গোপালগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কাশিয়ানি থানার ভাটিয়াপাড়া। এই ভাটিয়াপাড়ায় অবস্থিত পাক-আর্মির ওয়্যারলেস সেন্টার। অত্র এলাকায় পাক-আর্মির 'বেতার যোগাযোগ'-এর প্রধান কেন্দ্রস্থল সেই সেন্টারটি রক্ষায় পাক-বাহিনীর শক্তিশালী ক্যাম্প বসানো হয়েছে সেখানে। ভাটিয়াপাড়া পাক-আর্মি ক্যাম্প দখলে মুক্তিবাহিনীর জীবন পণ যুদ্ধের পরিকল্পনা হাতে নেয়। পাক-আর্মির বেতার যোগাযোগ ধ্বংস করতে না পারলে তাদের নাভিশ্বাস উঠান যাবে না,

এটাই মুক্তিবাহিনীর আপাতঃ পরিকল্পনা মাত্র।

হেমায়েত ও ইসমত কাদির গামার নেতৃত্বে যুদ্ধ চলছে। ত্রিমুখী আক্রমণ রচনা করেছে মুক্তিযোদ্ধারা :

ক। মূল নেতৃত্বে হেমায়েত। তাঁর দলে যোদ্ধা সংখ্যা পঞ্চাশ। দলের অংশ বিশেষের অবস্থান ভাটিয়াপাড়া পশ্চিম তীরে।

খ। ইসমত কাদির গামার নেতৃত্বে যোদ্ধা সংখ্যা পঞ্চাশ। পিপলাই গ্রামের ভিতর দিয়ে গোপন অগ্রযাত্রায় শত্রু ক্যাম্পের দক্ষিণে অবস্থান গ্রহণ।

গ। কমান্ডার সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে যোদ্ধা সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। বরাসতের খাল পেরিয়ে তাঁদের শত্রু অবরোধের জাল বিস্তৃত করা হয় ভাটিয়াপাড়া পূর্ব দিক ঘিরে।

ভাটিয়াপাড়া শত্রু অবস্থানের পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্ব দিকে ঘিরে মুক্তি আক্রমণ ব্যূহ রচিত হয়। ভোর পাঁচটায় মুক্তি আক্রমণের সূচনা করে একযোগে ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু হয় এবং অবিরাম পনের ঘন্টা যুদ্ধ চলে। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুলের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। মূলত তিনি ছিলেন পাক নেভীর কর্পোরাল। বাবুলের সাথী মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে শহিদ হন। পাক এয়ার স্ট্রেপিংয়ে মুক্তিবাহিনীকে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি মেনে নিতে হয়।

দু'দলের জন্যই এটি একটি জীবন-মরণ সমস্যা। এর ফলাফলে যে-কোন দলের ওপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে, সে-কারণেই উভয় পক্ষে বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা; বিশেষ করে মুক্তিবাহিনীর জন্য এটি একটি মর্যাদার লড়াই। কেননা, জানা মতে এতদএলাকায় পাকবাহিনীর সঙ্গে কোন যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী এখনও হারে নি।

পাক-আর্মির সাহায্যে এগিয়ে আসে তাদের বম্বার প্লেন। পাক বিমানের সহযোগিতায় চলে ব্যাপক এয়ার স্ট্রেপিং। বিমানের ব্যাপক গুলি বন্যার মাঝেও মুক্তিবাহিনী অনড়। পাক বিমানের গোলায় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর শাহাদত অন্যদের আত্মোৎসর্গ করতে আরও উদ্দীপ্ত করে। মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলার সম্মুখ সমরে শাহাদতের উলা দরজায় লুটিয়ে পড়েন সাধুহাটির জয়নাল ও রামদিয়া কলেজের ছাত্র ইয়াসির। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ প্রান্তে পিছু হটার ঘৃণ্য পরাজয়ের চেয়ে আত্মোৎসর্গের

গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যু পরোয়ানা বেছে নিলেন মুক্তিরা। পররাজ্য-গ্রাসী পাক-সেনা ও স্বাধীনতা যোদ্ধা বঙ্গ-সেনার মরণ-মারণ যুদ্ধ একটি নিশ্চিত পরিণতির অপেক্ষায়। অবশেষে মুক্তি-শৌর্যের বিজয় ঘটে। শত্রুকে ত্রিশংকু অবস্থায় ফেলে পাক আর্মির পলায়নের জন্য একটি দিক খোলা রাখে মুক্তিবাহিনী। চতুর্দিকের পুরাপুরি বেড়জালে আটকালে নিশ্চিত মৃত্যুর গুহা উৎরাতে শিয়ালও বাঘের চেয়ে বীরত্বে লড়তে পারে। মুক্তির রাখা উত্তর দিকের মুক্ত-পথে পাকিরা পলায়ন করে। এ-যুদ্ধে পাক বাহিনীর জেহাদি জোশের প্রশংসা করতে হয়। অমিত বিক্রমে লড়ে তাদের পঁচিশজন রণাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে; আহত ত্রিশজনের সবাই ধৃত হয় মুক্তির হাতে।

সকল প্রতিকূলতার মাঝেও মুক্তিবাহিনী পাক-আর্মির ওয়্যারলেস সেন্টার ও ক্যাম্প দখল করে। এই যুদ্ধে মুক্তির নিট মুনাফা হয় :

ক। মর্টার-২; খ। এল এম জি-৭; গ। এস এল আর-১০; ঘ। চায়নিজ রাইফেল-১১০; এবং ঙ। এমুনিশান-প্রচুর পরিমাণ।

স্বাধীন দেশে কৃতজ্ঞ ভাটিয়াপাড়াবাসী শহিদ মিন্টুর স্মৃতি রক্ষার্থে ভাটিয়াপাড়ার নামকরণ করেন মিণ্টু নগর।

নকল হেমায়েত যুদ্ধ ঃ হেরাসমেন্ট যুদ্ধে শত্রুকে নাহেজাল করে মুক্তিরা মজা পায়। এতে রিস্ক কম লাভ বেশি। বেশ কিছু হেরাসমেন্ট ফায়ার যুদ্ধে শত্রু বিভ্রান্ত হয়। এবার শুরু হয় মুক্তির চালবাজি যুদ্ধ: নকল কমান্ডারের নেতৃত্বে যুদ্ধ হবে। নকল হেমায়েতের আসল নামে স্বয়ং রণাঙ্গণে সম্মুখ সারিতে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। দ্রুত যুদ্ধের কৌশল বদলে পক্ষ-বিপক্ষ দুদলকে বিভ্রান্ত করার কৌশল বেছে নেন হেমায়েত।

জনগণ বিজয়ী হেমায়েতকে দেখতে উৎসুক। পাক আর্মি তাঁকে ধরতে ফাঁদের পর ফাঁদ পেতে ব্যর্থ। গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁকে হত্যার চেষ্টায় বিফলে যায়। পাক আর্মি তো দূরের কথা নিমকহারাম দালাল পর্যন্ত তাকে চিনে না। বাঙাল মুলুকে অচেনা পাক ত্রাস সন্ত্রাসী দুর্বৃত্ত হেমায়েতকে হন্যে হয়ে খুঁজে পাক প্রশাসন।

যুগপৎ যুদ্ধ ঃ ৪২টি কোম্পানি কমান্ডারকে হেডকোয়ার্টারে তলব করা হয়। সম্মিলিত সভায় পাক আর্মির সমর্থনপুষ্ট সকল সশস্ত্র অবস্থানে একই দিনক্ষণে মুক্তি হামলার নির্দেশ জারি করা হয়। দুপুর বারটা নাগাদ গুলিবাজি শুরু, সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত জারি থাকে। প্রতিটি কোম্পানিতে একজন হেমায়েত কমান্ডার হাজির। একজন সুদর্শন তাগড়া মোটা তাজা লম্বা বাবরি চুলের হেমায়েতের নেতৃত্বে যুদ্ধ চলবে। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা ও জনসাধারণের মধ্যে সাহসের প্রেরণা সঞ্চার উদ্দেশ্যে এই অভিনব কৌশল।

প্রত্যেক এলাকায় একই সময় গোলাগুলি চালু করা হয়। প্রত্যেক যুদ্ধে হাজির একজন করে সাজানো নকল হেমায়েত। ব্যক্তি হেমায়েতকে এলাকার কোন লোকই সঠিক চিনে না। ৪২টি স্থানেই সাজানো হেমায়েতকে দেখে জনতা তুষ্ট। তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সাধ পূরণ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে উদ্দীপ্ত। পাতানো সাজানো খেলা আসল

খেলা রূপ নেয়। স্থানে স্থানে জনতা উৎসাহের আতিশয্যে জয়বাংলা, হেমায়েত ভাই জিন্দাবাদ ধ্বনির উল্লাসে ফেটে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর সাথে পরিচিতির সুযোগে হাত মিলিয়ে বুক মিলানোর কোলাকুলিতে লাগে। সবার জন্য এক দুর্লভ মুহূর্ত। এতদিন শত চেষ্টায় যার দর্শন মিলেনি তিনি আজ সশরীরে স্বয়ং যোদ্ধা জনতার মাঝে। প্রতিটি রণাঙ্গণ জয়বাংলা, হেমায়েত ভাই জিন্দাবাদ স্লোগানে মুখর। দুদিনের মধ্যেই গুজবের গজব জনতার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি। এ কেমনতর আজব ব্যাপার একই কমান্ডার হেমায়েত একই সময়ে এতস্থানে গেলেন কি করে? কয়েক ক্ষেত্রে ছেলে-বুড়া, যোদ্ধা-অযোদ্ধায় পরস্পরকে গুল মারিস না বলে হাতাহাতিও হয়ে যায়। পাক ইনটেলিজেন্স গুজবের সত্যতা স্বীকার করেন। তাঁরাও প্রকাশ্যে একই সময় বহু স্থানে তাঁর যুদ্ধ নেতৃত্বের স্বীকৃতি দেন। দালালরা মহাআতংকে ৪২ স্থানে দেখা যাওয়ার জলাতংক ছড়ায়। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বর, ফরিদপুরে সত্যাশ্রয়ী সেরা পাক কৌতুক। ভেদরগঞ্জ থানার দামুড্যার প্রতিহিংসার ভয়াবহ পাক অপারেশন। সাড়ে তিন মণ ওজনের অধিক সদুর্শন তাগড়া জওয়ান এক ভদ্র সন্তানকে হত্যা করে পাক আর্মি। অপারেশন স্থলে মাইক ও পোস্টারিং মারফত হেমায়েত হত্যার প্রচারণা চালায় পাক আর্মি। কাফের, "হেমায়েত কো মারকে উসকি লাশ লায়ে আয়া হুঁ।" কাফের কা সর্দার খতম।

বাস্তবে নিজেদের ফালপাড়া তড়পানি থামাতে পাক আর্মির কিল খেয়ে কিল হজম করার মতন অবস্থা। মূর্তি পূজার (বুতপরস্তির) যাদু টোনার বুজুরগির ফাঁদে পা দিলেন আল্লাওয়ালা নেকবকত পাক্কা পাক মুসলমান-আর্মি। হেমায়েত যাদু জানতা হ্যায়। ও জরুর জাদুকর হ্যায়। আচমকা হাওয়ামে গায়েব হোনা হেকমত হেমায়েত জানতা হ্যায়। এতনা বড়া তাজ্জব কি গজবকা বাত! এক আদমি একই টাইম মে এতনা আছলি জংকো ময়দানমে দিনকা রোশনাইমে কেইছা কমান্ড করতা হায়! ফ্রন্ট লাইনমে ও হুকুম জারি করে। এতনা খালেস নিশানার গোলাগুলি ওনকা ঘায়েল করতা নিহি। বাঙ্গাল মুলুকমে ইয়ে কিয়া বেফজুল তামাশা! আসল রহস্য দুচারজনের যাঁরা জানতেন তাঁরা না জানার ভান করে আচানক মুচকি হাসতেন।

মুজিব নগর কোড ঃ অতি প্রচারে মুক্তি গোপনীয়তার দুর্বলতায় হেমায়েতকে রক্ষায় প্রবাসী মুজিব নগর সরকারের সতর্কতা লক্ষ্য করা যায়। অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসের দুর্দান্ত পাক ত্রাস হেমায়েতকে ধরার নিশ্ছিদ্র বিনিদ্র প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যৌথ সামরিক বেসামরিক পাক প্রশাসন। বিভীষণরূপী দেশী দোসরাও হন্যে হয়ে তাঁকে ধরার লক্ষ্যে গলদঘর্ম। মুজিব নগর সরকার সাংকেতিক নাম ব্যবহার করতেন। সে কারণে প্রবাসী অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসার যুদ্ধের শেষ পর্যায় পর্যন্ত হেমায়েত বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিনের নামও শুনেন নি। হেমায়েতের মুজিব নগর সাংকেতিক কোড নাম 'হিমু'। গ্রন্থকার ১৯৭১ সালে ৮ নম্বর সেক্টরের 'ই' কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত হেমায়েতের নাম শুনেন নি।

রামশীল যুদ্ধ

(১৪ জুলাই ১৯৭১)

পূর্ব তরঙ্গ ঃ ১৯৭১ সালে বাংলার স্বাধীনতাযুদ্ধ অকুতোভয় সংশপ্তক বাঙালির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির অফুরন্ত উৎস। সকল গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক অবদানে ধন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ। ক্র্যাক যোদ্ধা গ্রুপের বিরাট অংশ প্রাথমিক পুনর্বিন্যাসকরণ এবং সংহত হতে বর্ডার ক্রস করে বিদেশে পা রাখে। দখলদার দেশে তখন প্রতিরোধ যুদ্ধে কিছুটা সাময়িক বিভ্রান্তি এবং কিছুটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের সে-সন্ধিক্ষণে জনতার মনোবল চাঙা রাখতে মুক্তিযুদ্ধ জারি রাখেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এবং অভ্যন্তরীণভাবে সংগঠিত গেরিলা দল। নিয়মিত যোদ্ধারা এদের যতোই হালকাভাবে দেখুন না কেন, বস্তুত গেরিলা যোদ্ধারাই প্রাথমিকভাবে শত্রুর মনোবলের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দেয়। দখলদারদের বিরুদ্ধে জীবনপণ করে সশস্ত্র গেরিলারা নিজের দেশ রক্ষার যুদ্ধে না জড়ালে এতো সহজে শত্রুপক্ষের অহমিকা ভাঙতো না। দেশের অভ্যন্তরে পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ শক্তিতে গড়ে উঠা গেরিলা দলের অন্যতম হেমায়েত বাহিনী। প্রাক্তন বৃহত্তর ফরিদপুর-বরিশাল-যশোর জেলা হেমায়েত-প্রভাবিত যুদ্ধ এলাকা। হেমায়েতউদ্দিন, বীর বিক্রম-এর ওপর লিখিত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ বিবরণীর একটি অংশ বক্ষমাণ 'রামশীল যুদ্ধ'।

ছোট বড় একশত পঞ্চাশটি যুদ্ধে শত্রুর চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে ছেড়েছেন হেমায়েত। হেমায়েত নাম শুনলে কেয়ামতের জলাতংকে ভুগতো পাকিস্তানি আর্মি। দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যম ও জানা মতে ছিয়াশিটি প্রামাণ্য প্রকাশনায় ইতোমধ্যে তাঁর যুদ্ধ কীর্তির স্বীকৃতি ও বিবরণ গ্রন্থিত হয়েছে। তাঁর শৌর্য-বীর্য-স্থৈর্যের ধীরোদাত্ত গুণান্বিতের অত্যুত্তম নিদর্শন রামশীল যুদ্ধ।

পাকিস্তানি আতংক ঃ ১০ জুলাই ৪২ টি মুক্তি কোম্পানি পাকিদের ৪২টি সামরিক অবস্থানে আক্রমণ চালায়। রাতের মুক্তি প্যাঁচা এবার দিনের কুড়াল পাখির মতো উড়াল মারে। আচমকা আক্রমণে তারা পাকিস্তানি শিবির তছনছ করে দেয়। পাকিস্তানিরা সিদ্ধান্ত নেয়ঃ দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তাদের চলাফেরা এবং সন্ত্রাসী ঔদ্ধত্য থামাতেই হবে। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অবিলম্বে মুক্তিদের সদর কার্যালয় উৎখাত করা জরুরি, নতুবা ভারতীয় চরের ঘর ধ্বংস করা যাবে না। শক্তিশালী পাকিস্তানিবাহিনীর এসব আক্রমণ-পরিকল্পনার নির্ভুল সংবাদ সংগ্রহ করে আনে মুক্তিবাহিনীর গোয়েন্দারা।

লোভের ফাঁদে ঃ বহুতর ওয়াদা বরখেলাপের পর নানা কসম-কড়ারে পশ্চিমা সেনাদের উদ্বুদ্ধ করেন বাংলার দালালশ্রেণী। "শরণার্থী ক্যাম্প প্রয়োজনের ধুয়ায় মুক্তি ওধার তইন তাজা গরু, খাসি, মুরগি জমা কিয়া। খুশবুদার চাল-আটা-ময়দা-ঘি ভি ও-জায়গামে জিয়াদা মজুদ হায়। সবচে আসলি পয়গাম ওয়াতান হরহামেশাকা লিয়ে

পরীসতান। ওধার মিলতা বহুত হুরপরী আওরত। খুবসুরত বহুতর হিন্দু লাড়কি ওধার লড়াইকা নিয়ে ট্রেনিং লেতা হায়। জংকা লিয়ে আওরত পেরেশান। এধার লড়াই ফতেহ হোলে চলবল দখল বহুত জরুরত।" চলবলে মুক্তি সদর, শরণার্থী প্রশিক্ষণ, নারী যোদ্ধার কোনোটাই অতিরঞ্জিত হলেও মিথ্যা ছিলো না। যুদ্ধ জয়ের অন্তরালে পাকিস্তানি নিয়ত নাপাক কুৎসিত লোভাতুর নারী লোলুপ উদ্দেশ্যে ভরপুর। তারা পাপের ফাঁদে পা দিলেন।

কৌশলগত বিন্যাসে মুক্তি ঃ ১৪ জুলাই মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর চলবলে বড় ধরনের একটি পাকিস্তানি আক্রমণ নিশ্চিত হয়। আক্রমণ ঠেকানো যাবে না। এমত পরিস্থিতিতে মুক্তিবাহিনীর এখানকার মূল টার্গেট পাকিস্তানি এটাক হ্রাস করার উদ্যোগ নেয়। ১০ জুলাই পর্যন্ত বিয়াল্লিশটি সশস্ত্র অপারেশনের পর ১৩ জুলাই পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকে হেমায়েতবাহিনী। তারা কৌশলগত কারণে নতুনতর বিন্যস্ত এলাকায় মুক্তিসেনারা নিরিবিলি অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য বাঙালি রাজাকার সহযোগে মে মাসের মাঝামাঝি টুংগিপাড়া শেখ মুজিবের বাড়িতে যায় এবং কারও বিনা প্ররোচণায়ই বলা যায়, তারা শেখ মুজিবের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বন্দি করে। হেমায়েত বাহিনী তাঁদের উদ্ধার করে এনে মাননীয় সংসদ সদস্য ইলিয়াস চৌধুরীর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তবে স্বস্তি লাভ করে। টুঙ্গিপাড়া থেকে সাধারণ ছৈয়া নৌকায় সোজা বিল পাড়ি দিয়ে কাজুলিয়া ঘাটে বঙ্গবন্ধুর মা-বাবাকে আনা হয়। মুক্তিযোদ্ধা ফারুকুজ্জামানসহ কয়েকজনের সাহায্যে তাঁদের নিরাপদেই পৌঁছানো হয় শিবচর। হেমায়েত এখনও মনে করেন, সেদিনের শেখ মুজিব-এর মা-বাবার পাষাণ বিগলন অশ্রুধারা ন'মাসের যুদ্ধ স্মৃতির মাঝে তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

এ-সময়কালে টুংগিপাড়ায় টুংটাং অপারেশন কার্যক্রমও স্মৃতি থেকে বাদ দেবার নয়। যেমন ঃ-

ক) শেখ মুজিবের বাড়িতে অবস্থানরত দেড়শত পাকিস্তানি আর্মি-রাজাকারকে আচ্ছা-ধোলাইর শিক্ষা প্রদান করা। আক্রমণের দায়িত্বে ছিলেন কমান্ডার লুৎফর রহমান ও ছালাম; দিনক্ষণ তের জুলাই রাত চারটা।

খ) স্থানীয় প্রভাবশালী চেয়ারম্যান নুরু মিয়ার বাড়িতে ছাউনি ফেলা পাকিস্তানি আর্মি-রাজাকার দুর্গ আক্রমণ করা; নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার শ্রীকমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ; সহায়তায় খালেক পাইক ও ফুরু কমান্ডার। দালালের নাটের গুরু নুরুকে গুরুমারা বিদ্যা শিখানো হবে। হামলার দিন ও ক্ষণ নির্ধারিত হয় ১৩ জুলাই রাত চারটা।

মুক্তিবাহিনীর গুপ্তচর এই তারিখটাকে ১৪ জুলাই হিসাবে প্রচার করতে থাকে; আরো প্রচার করে যে এ-রাতে ৪ টায় টুংগিপাড়ার ২ টি টার্গেটে একই সময় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক আক্রমণ করা হবে। উদ্দেশ্য, যাতে মূল টার্গেটের মুক্তি সদর চলবল আক্রমণে পাকিস্তানি আর্মি বিভ্রান্ত হয়।

চলবল রক্ষার চাল ঃ মুক্তি সদরদপ্তর ও প্রশিক্ষণ সেন্টার ভ্রাম্যমাণ সঞ্চরণশীল। জহরের কান্দি হাই স্কুলের অপারেশন ঘাঁটি কালকিনি থানার চলবলে স্থানান্তরিত হয়। এই চলবলের উপরই সবল পাকিস্তানি আক্রমণ পরিচালিত হয়। তিন দিক থেকে জলযানে ধেয়ে আসছে পাকিস্তানি আর্মি ঃ ক। মাদারিপুর; খ। গোপালগঞ্জ; গ। টেকের হাট থেকে।

মুক্তিবাহিনীর সর্বশেষ অপারেশনস্থল টুংগিপাড়া ও চলবলের দূরত্ব বিশ মাইলের মতো। টুংগিপাড়ার দায়িত্ব পড়ে পাঁচ কোম্পানির উপর। মূল সদর চলবল ১৩ জুলাই রাতের মধ্যেই তিন মাইল দূরে স্থানান্তর করা হয়। শরণার্থীরা ইতোমধ্যে মুক্তিবাহিনীর অনুরোধে স্থান ত্যাগ করেন, মুক্তিবাহিনীকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও আক্রমণের সুবিধা দেন। ফাঁকা মাঠে ওয়াকওভারের মতো খালবিল নদীনালা উতরে কিলবিলে ছুটছে পাকিস্তানি সেনা।

চলবলের এক মাইল দক্ষিণে রামশীল গ্রাম। রামশীলের বুক দিয়ে গৌরনদী থানার বাসাইল গ্রামের দিকে চলে গেছে এক ছোট খাল। নদী পথে মুক্তি সদরে যেতে সে খাল ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই। চার দিকে থৈ থৈ পানি। বর্ষায় গ্রাম-বাংলার বাড়িঘর যেন ডুবু ডুবু দ্বীপ। অশনি সংকেতের মতো কি যে হয় কে জানে? ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয় স্থানীয়ভাবে। সকল মুক্তিযোদ্ধাকে দূরদূরান্তে ও আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন কমান্ডার। চলবল রক্ষায় প্রয়োজনীয় তৎপরতার ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। চারিদিকে বাংকার খনন করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ মজবুত করা হয়ে গেছে। এবার ফাঁকা মাঠের চলবল যেন মুক্তিবাহিনীর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

রামশীলের পথে হানাদারদের সম্ভাব্য গৌরনদীর দিকের খালে পূর্ব মুখে তিনজন, দক্ষিণে তিনজন ও সংকেতদাতা ১ জন মিলে মোট সাতজনের অগ্রঘাঁটি প্রতিরক্ষা। দলপ্রধান স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসে ছয়জনের সুইসাইডেল পার্টির সাথে শত্রু আগমনের অপেক্ষায় পশ্চিম মুখে অবস্থান গ্রহণ করেন। কোটালিপাড়া বান্দাবাড়ি খাল বেয়ে নদী পথে লঞ্চ ও ছোট বড় ছান্দি নৌকা যোগে চলবল যাত্রার সকল অগ্রগামী সেনাকে এ-পথে আসতেই হবে। দূরদর্শী ভাবনার চূড়ান্ত রামশীল অ্যাম্বুশ পয়েন্ট।

শত্রু আক্রমণ প্রশমনে মুক্তি ঃ ১৩ জুলাই রাতে পাটগাতি নুরু চেয়ারম্যানের বাড়ি ও টুংগিপাড়া শেখ মুজিবের বাড়ির পাকিস্তানি অবস্থানে মুক্তি যুগপৎ আক্রমণ করে। রাত ৪টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত বিগত দুদিনের একদম শান্ত মুক্তির আকস্মিক চোরাই হামলা এটি। বেপরোয়া মুক্তি আক্রমণে পাকিস্তানি আর্মি বেহাল অবস্থায় পড়ে। এমতাবস্থায় পৈতৃক প্রাণ নিয়ে ভোঁ দৌড় দেয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। বাঙাল মিলিশিয়াদের চিন্তা তারা আমলেই নেয় নি। নিজে বাঁচলে তবে তো বাঙাল বাপের এয়াদ।

বেশ কিছু রাজাকার মুক্তিবাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করে প্রাণে রক্ষা পায়। পালিয়ে যাবার পথে পশ্চিমা খান সেনার বেশ কিছু হতাহত হয়। প্রচুর অস্ত্র

গোলাবারুদ মুক্তির হাতে পড়ে এবং এগুলো তাদের পরবর্তী আক্রমণের জন্য অস্ত্রাগারের সঞ্চয় বাড়ায়। কিন্তু হরিষে বিষাদ, রণ-বিক্রমে যুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে কমান্ডার সালামের সমর জীবনের অমর অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে, মৃত্যুঞ্জয়ী শৌর্যের সম্মুখ সমরে তিনি শাহাদত বরণ করেন। মারাত্মকভাবে আহত কমান্ডার সালামকে টুংগিপাড়া থেকে চলবল আনার পথে রক্তক্ষরণে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেদিন মুক্তির হাতে গজ-ব্যান্ডেজ-সেভলন ধরনের ফার্স্ট এইডের উপকরণ থাকলে হয়তো কমান্ডার সালাম প্রাণে রক্ষা পেতেন। কেমন উপকরণ-স্বল্পতা ও প্রতিকূলতার মাঝে মুক্তিদের লড়তে হয়েছে কমান্ডার সালামকে হারানোর স্মৃতিময় বেদনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

দু'কোম্পানির রানার নৌপথে সে-সব নিয়ে আসছে। ১৪ জুলাই দূরত্বের মাঝামাঝি পৌঁছুতে তাঁদের চলবল মুক্তি সদরের দিকে বিপদ সংকেত। দুপুর ১২টা নাগাদ পাকিস্তানি আর্মির চলবল আক্রমণে গুলির আওয়াজ।

পাকিস্তানি আক্রমণ ঃ বাঙাল ফাঁদে এগিয়ে আসছে পাকিস্তানি আর্মি। মুক্তি হাতে দুটি চায়নিজ লাইট মেশিনগান ও পাঁচটি চিনা এসএমজি। শত্রুর অগ্রগামী বাহিনী দেখেও মুক্তির সুকঠোর নীরবতা ও ফায়ার কন্ট্রোল এক আশ্চর্য ঘটনা। প্রতিপক্ষ মুক্তি অস্ত্রের পুরাপুরি আয়ত্তের কব্জায়। কাছাকাছি আসতেই হেমায়েত-এর মেশিন গান গর্জে উঠে। পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ সূচনার সংকেত হয়ে গেল। এবার শুরু হয় সমুদয় মুক্তি অস্ত্রের অবিরাম গর্জন। দু'দলে তুমুল গোলাগুলি। ৪০ মিনিট স্থায়ী হয় এ-মরণপণ যুদ্ধ। বিপক্ষের ভাবনার বাইরে অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে মুক্তিবাহিনীর বাধায় তারা এমন নাজুক ও বেকায়দা অবস্থায় পড়বে ভাবতেই পারে নি। পথিমধ্যে হঠাৎ আক্রমণে ভড়কে গিয়েও সুদক্ষ প্রশিক্ষণের পাকিস্তানি আর্মি ক্ষণিকের বিভ্রান্তি কাটিয়ে গুলির জবাব গুলিতেই দেয়। একটা প্রতিষ্ঠিত আর্মির ইজ্জত রক্ষার মতো বীরত্বের পরাকাষ্ঠায় লড়াই করে পাকিস্তানি বাহিনী। স্থল সৈনিকের জল যুদ্ধে যা বিপদ। মোঘল বাদশা হুমায়ুনের বাঙলার ঘোলাজলে ঘোড়া শুদ্ধ খোরা চুবানি এখনও ইতিহাসের খোরাক। ভিশতিওয়ালাকে বাপ ডেকে কিশতি বাঁচান তিনি। পাঞ্জাবি ঘোড়ার কানে পানি ঢুকার মতো পাকিস্তানি সেনার জলাতংক। যাবেন কই? চারদিকে থৈ থৈ পানি। উপরন্তু, বহুরূপী হেমায়েত আতংকে তারা পেরেশান। ব্যাপক হতাহতের বিভীষিকায় তাদের হৃদয়ে ভূমিকম্পের হৃৎকম্পন। বাধ্য হয়ে পাকিস্তানি বাহিনী পিঠ টান দেয়।

এই যুদ্ধে পাকিস্তানি পক্ষের হতাহতের সংখ্যা একশত আটান্ন। পাকিস্তানি-অধিনায়ক মেজর সেলিম ও ক্যাপ্টেন ফয়েজ 'বাহিনী প্রধান' হেমায়েত-এর এল.এম.জি-র গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হয়। চল্লিশজন পাকিস্তানি সেনা অকুস্থলে নিহত এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চৌদ্দটি লাশ ফেলে অবশিষ্টরা পলায়ন করে। একটি ৩ ইঞ্চি মর্টার, একটি এল.এম.জি. ও অন্যান্য ছোট-খাট বারটি চিনা অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। এক পেটি হাই এক্সপ্লোসিভ ৩৬ নং গ্রেনেড, তিন হাজার রাউণ্ড গুলিসহ

বহুতর অস্ত্র-গোলাবারুদ মুক্তিবাহিনীর খেদমতে রেখে যায় পলায়নপর পাকিস্তানি আর্মি। মুক্তিদের দখলে আসে বিভিন্ন ধরনের তিনশত অস্ত্র।

বিজয় অর্জনের জন্য মুক্তি বাহিনীকেও চরম মূল্যের খেসারত দিতে হয়। মেশিনগান অপারেটরম্যান-২ ইপিআর-এর দুঃসাহসী ল্যান্স নায়েক মকবুল মারাত্মকভাবে আহত হন। বিপক্ষের আকস্মিক গুলিতে তাঁর মাথা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়। নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে অপূর্ব সহমর্মিতার টানে যোদ্ধাহত সাথীর লাশ টানতে যেতেই শত্রু শেলের টুকরা ও গুলির ঝলক ব্রহ্মশেলের মতো মারাত্মক আঘাত হানে বাহিনী প্রধান হেমায়েতকে। মুখের বাম পাশে গুলি আঘাত হেনে ডান চোয়ালের নিচ ভেদ করে চলে যায়। এগারটি দাঁতসহ তাঁর মুখের বাম পাটির উপর অংশ উড়ে যায়। জিহবা কেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। অতুলনীয় শৌর্যের পরাকষ্ঠায় শহিদ মকবুল ও যন্ত্রণাকাতর মারাত্মক আহত দলপতির মধ্যেই মুক্তির ক্ষয়ক্ষতি সীমিত থাকে। গোপালগঞ্জ জেলার কালকিনি থানাধীন গোপালপুর গ্রামের অমর শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের স্মৃতিধন্য এই রামশীল।

যুধিষ্ঠির ঃ যুদ্ধে যিনি অকুতোভয়, বিপর্যয়ে যিনি স্থির থাকেন তিনিই যুধিষ্ঠির। মহাভারতের যুদ্ধে ধর্মাবতার যুধিষ্ঠির বিশ্ব নমস্য। সকল দুঃসংবাদ শুনেও তিনি অটল হিমাদ্রির স্থির প্রজ্ঞায় কুরুক্ষেত্র জয়ের পতাকা ছিনিয়ে নেন। ব্যক্তিগতভাবে অক্ষত অনাহত যুধিষ্ঠির সৈনাপত্যের নির্দেশনা দেন। রামশীলের যুদ্ধে বিশেষ সংকটজনক জীবন-মৃত্যুর চরম সন্ধিক্ষণে আহত হেমায়েত যে ধৈর্য-সহ্য, প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা, অধঃস্তনদের নির্দেশনা, শত্রু ধ্বংসে-নিজের চিকিৎসায় যে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার তুলনা বিরল। আহত ব্যাঘ্র হেমায়েত বেনজির শৌর্যে বেলুচ রেজিমেন্টের হাবিলদার-মেজর ফজলে রাব্বি, বি.আর. সি-কে জাপ্টে ধরে পরাভূত করেন। বশ্যতা স্বীকারে বন্দি বালুচ অস্বীকার করায় বিক্ষুব্ধ মুক্তিরা তাঁকে লুচি বানিয়ে হত্যা করে। তার পরিচয় পত্র স্মারক-স্মৃতিরূপে রেখে দেয় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে শৌর্যে-বীর্যের এক অনুপম অত্যুজ্জ্বল উপমা হেমায়েত।

নিজের পরিণতি জীবন মরণ যাই হোক, এতো বড় আঘাতের ধকল উপেক্ষা করে বাহিনী প্রধান পরিপূর্ণ শক্তিতে শত্রুকে ধাওয়া করেন। পলায়নমাণ পাকিস্তানি-বাহিনীর পিছু পিছু গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যান হেমায়েত, আক্রমণাত্মক হুমকিতে নদীর পাড় পর্যন্ত তাদের তাড়া করেন। অসীম প্রতাপের প্রত্যাঘাতে আঘাতের পাল্টা আঘাতে শত্রুর মনোবলে ভীমরতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেন তিনি। নির্ভীক সাহসের শৌর্যে হতাশাদীর্ণ সাথীদের উদ্দীপ্ত করেন। নেতার মরণ বাঁচন যাই হোক, যুদ্ধ চলবে। নেতা বড় না যুদ্ধ বড়। যুদ্ধ করে বন্ধুরা মর। দেশ স্বাধীন করে মরতে দাও। কাটা জিহ্বার ফাটায় কথা বেরোয় না। বিড়বিড়ে কথা অস্পষ্ট। যুদ্ধ সাথীদের করণীয় এবার নিজ হাতে কাগজে লিখে দিচ্ছেন। নিজের মারাত্মক আঘাত বুঝতে পেরে নিজের চিকিৎসার ব্যাপারে লিখে রাখলেন প্রয়োজনের শেষ নির্দেশ। আল্লাহ মরণ রাখলে দেশের মাটিতে মরণ হোক। বাংলার মাটিই হোক আমার শেষের শয়ন।

হেমায়েতের হাতের কেয়ামতের তুলাধুনায় বিজিত দল ৭ দিনের শোক পালন করে। বিজয়ী পক্ষও বিশ্রাম নেয় কয়েকদিন। স্ব স্ব পক্ষের শোকে দু'পক্ষই ম্রিয়মাণ। মুক্তিবাহিনী সাতদিন সকল অপারেশন স্থগিত রাখে। পূর্ব-নির্ধারিত বিজয় সিগন্যালের সবুজ আলোতে চতুর্দিকে বিজয় বার্তা। পাকিস্তানি-বাহিনী মুক্ত রণাঙ্গন বিজয়। স্থানান্তরিত হেডকোয়ার্টার থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ছুটে আসে রামশীল। টুংগি পাড়ার যুদ্ধে শহিদ সালামের লাশ নিয়ে ছুটে আসে রানার। টুংগি পাড়া ও রামশীল যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মির ফেলে যাওয়া সমুদয় মালামাল হাত করে মুক্তি। শহিদ সালাম, শহিদ মকবুল ও আহত হেমায়েত বার্তায় চতুর্দিকে শোকের মাতম। মৃত্যুতে শেষ নয় জীবনের পরাজয়। শহিদ সালাম-মকবুলের কফিনে মানুষের বেদনাতুর অশ্রুর শ্রদ্ধা নিবেদনে মুক্তি জন্মের সার্থকতায় সবাই অভিভূত। ইপিআর সৈনিক ছিলেন শহিদ ছালাম। কৃতজ্ঞ স্থানীয় জনতা ও গ্রামবাসী শহিদ ছালামের নামে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন। ইপিআর নায়েক শহিদ মকবুলের নামে আজও কোনো স্মৃতির মিনার গড়ে ওঠেনি।

সুস্থতা প্রার্থনায় জনতা : সকলের মুখে হায় হায়, একই ফরিয়াদ, আল্লাহ তুমি রাহমানুর রাহিম। হেমায়েতকে রহম করো। আমাদের সকলের জীবনের বিনিময়ে হেমায়েত ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা দাও। জাতি ধর্ম বয়স নির্বিশেষে নরনারী দু'হাত আকাশে তুলে আল্লাহর দরবারে হেমায়েতের জীবন ও তাঁর সালামতের জন্য দোয়া করে। চতুর্দিকে দুঃসংবাদ এ কান-সে কান করে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দু মুসলিম-বৌদ্ধ খ্রিস্টানের প্রাণের টানঃ-

প্রতিটি চিত্ত করিছে নিত্য বিভুর দুয়ারে আরতি
মহাপ্রভু, হেমায়েত রক্ষায় তোমার দুয়ারে মিনতি।

পূর্ব পশ্চিম বিপরীত মুখে হিন্দু-মুসলমানের প্রার্থনা-মোনাজাত। ভগবান তুমি হেমায়েতকে রক্ষা করো। আল্লাহ তুমি হেমায়েতকে ফানা দাও। 'বৌদ্ধং শরণং গচ্ছামি'তে জীবনদানের উপাসনা। 'ও গডের মার্সি' ভিক্ষায় মর্সিয়া গীতি। মসজিদে মসজিদে স্বতঃস্ফূর্ত মিলাদ, খতমে কোরান, দোয়া খায়ের মোনাজাত। নফল নামাজ-রোজার মানতের মুমূর্ষুর প্রাণ ভিক্ষার ফরিয়াদ। মন্দিরে পূজা-অর্চনায় আহতের নামে বলিদান। গীর্জার উপাসনায় ঘন্টা বাজে। স্ব স্ব ধর্ম মতে মানুষের শত শত জীব উৎসর্গের মানত করে। মুক্তিযোদ্ধারা মানুষের মনের মণিকোঠায় কতটুকু আসন জুড়ে আছেন আহত হেমায়েতের জীবন ভিক্ষা প্রার্থনায় তার পরিচয়। শহিদের জামাতে পাকিস্তানি রক্ত চক্ষু অগ্রাহ্য করে অগণিত শোকাহত মানুষের দোয়ার মাহফিল অভাবিত। আল্লাহ মানুষের দোয়ার বরকতে মুখ তুলে চাইলেন। ১৪ জুলাই বেলা দুটায় আহত হেমায়েত সংজ্ঞা হারান। ১৫ জুলাই বিকাল চারটায় তাঁর জ্ঞান ফিরে। অচেতন মানুষের জন্য সচেতন মানুষের জমে মানুষে টানাটানির এক আকুল আরতির স্পর্শকাতর দৃশ্য।

হেমায়েতের চিকিৎসা : সচেতন থাকতে সজ্ঞানে তিনি নিজের চিকিৎসার বিষয়ে লিখিত পরামর্শ রেখে যান। আহত ক্ষত স্থানের ধোলাই, সেলাই ব্যান্ডেজ, ঔষধ জাতীয় ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে লিখে দেন। তাঁর চেতনা লুপ্তির অন্যতম কারণ অবিরল রক্তক্ষরণ। সেলাই করে ঔষধ প্রয়োগের পর রক্তপাত বন্ধ।

আহত হবার পরপরই তাঁর অবর্তমানে রণাঙ্গণ ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধ পরিচালনা, মুক্তিযোদ্ধাদের করণীয় সব নিজ হাতে লিখেন তিনি। পরবর্তীতে, অচেতন নেতার নির্দশনা মতোই কাজ চলে। আশ্চর্য শৃংখলায় যথানিয়মে চতুর্দিকের সব কাজ কর্ম সঠিকভাবেই চলেছে।

হুঁশ ফিরতেই হাতের ইশারায় কাগজ কলম চেয়ে নেন। লিখেন, "আমি অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছি। যে-কোনোভাবে মুখ থেকে বুলেটের টুকরা বের করো। নয়তো পাগল হয়ে যাবো।" এসময় উপস্থিত বকুল মজুমদার ও সুশিল মজুমদার গোপালগঞ্জ টেকের হাট সংলগ্ন জলিল পাড় মিশনে বুলেট বের করা সম্ভব বলে জানান। সে মিশন তখন পাকিস্তানি-দখলে। পাকিস্তানি আর্মি মুক্ত না করলে মিশনে চিকিৎসা করানো দুরাশা মাত্র। এতো বড় আঘাতে আহত বাহিনী প্রধানের নিকট থেকে এবারো জলিল পাড় আক্রমণের লিখিত প্ল্যান পাওয়া যায়।

বাহিনী প্রধানের জীবন রক্ষার বাজিতে জলিল পাড় পাকিস্তানি আর্মি অবস্থান আক্রমণে স্বেচ্ছা মৃত্যুর আত্মঘাতী স্কোয়াড এগিয়ে যায়। কমান্ডার কর্তৃক লিখিত নকশা অনুযায়ী আক্রমণ চলবে। ১৬ জুলাই সকাল ৬ টায় সর্বশক্তির মরিয়া উদ্যোগে জলিল পাড় মিশন আক্রমণ করা হয়। মুক্তিবাহিনীর অত্যুত্তম সাহসী আক্রমণে দখলদার হানাদাররা কোনোরকমে পালিয়ে রক্ষা পায়। পূর্ব পরিকল্পনা মতে গোপালগঞ্জ ও টেকেরহাট অবরোধ করা হয়, যাতে পাকিস্তানি-আর্মি নতুন সাহায্য নিয়ে জলিল পাড় মিশন দখলে আসতে না পারে।

মিশনারি ইটালিয়ান ডাক্তারের নেতৃত্বে মেডিক্যাল টিম গঠিত হয়। তাঁর সহযোগীদের সাথে যোগ দেন মুক্তিবাহিনীর ডাক্তার সুরেন সরকার ও শ্যামাপদ বৈদ্য। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিন ঘণ্টার অপারেশন সম্পন্ন হয়। তাঁরা ডান চোয়ালের চারটি বড় বড় বুলেট সরান। দাঁতের শত শত ভাঙ্গাচোরা টুকরা মুখ থেকে বের করতে মেডিক্যাল টিমের সাফল্য প্রশংসনীয়। প্রতিকূল ঝুঁকিতে ডাক্তার কাজ করেছেন, রোগীকে সংজ্ঞাহীন করার ব্যবস্থা নেই। প্যাথেড্রিন ইংজেকশন মাত্র ভরসা। মারাত্মক দুরবস্থা ও রিস্কের মধ্যে মানবতার নামে অপারেশন সম্পন্ন করেন মেডিক্যাল টিম। ইটালিয়ান মিশনারি ডাক্তারের প্রতি এ দেশ চির কৃতজ্ঞ।

জলিল পাড় মিশনে ইতালিয়ান ফাদার ও ডাক্তার নরেন চরম ঝুঁকির চিকিৎসা করেন। তিনি ঝুঁকি না নিলে হয়তো অবধারিত মৃত্যু ছিল হেমায়েতের কপালে। বিদেশী চিকিৎসা টিমের সঙ্গে হেমায়েত বাহিনীর ডাক্তার ও সরকারি চাকরি ছেড়ে ১৪ জন ডাক্তার বাহিনী প্রধান হেমায়েতউদ্দিন ও অন্যান্য আহতদের চিকিৎসায় সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করেন। সরকারি চাকরি ছেড়ে আসা জনা পনের সেবিকাও উদয়াস্ত কাজ করেছেন

আহতদের চিকিৎসায়। তন্বী-তরুণী হেমায়েত প্রেমিকা সোনেকা রানী রায় আহত হেমায়েতের পাশে সার্বক্ষণিকভাবে নার্সের কাজ করেছেন।

পাকিস্তানি-আর্মি পরাজিত হলেও মুক্তিদের বিপর্যয় তারা জেনে গেছে। চিকিৎসার সময় তারা আহত বাহিনী প্রধানকে গ্রেফতার করার বিশেষ উদ্যোগ নেয়। অবশ্য অনুরূপ ভীতি আঁচ করেই মুক্তিবাহিনীর সুসাইডেল গ্রুপ পূর্ব থেকেই রোগী অপারেশনের সংকটময় ৩ ঘণ্টা সময় মরণপণ প্রতিজ্ঞায় শত্রু আগমন পথ আগলে রাখে। পুরা সময় গোপালগঞ্জ ও টেকের হাটের দিক থেকে মুক্তিবাহিনীর ওপর বার বার আক্রমণ চলে। রোগীর অপারেশন শেষ না হতেই শত্রুপথ অবরোধকারী মুক্তিবাহিনীর ওপর শত্রুবাহিনীর দুর্দান্ত হামলার মুখোমুখি হতে হয়। মুক্তিবাহিনীর সংকল্পের দৃঢ়তা ও সাহসের নিকট শত্রুর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুক্তিবাহিনীর আত্মত্যাগী উদ্যমকে কোনো ভয়ভীতিও দমাতে পারে নি। শত চেষ্টায়ও মিশনের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি পাকিস্তানি আর্মি। চিকিৎসা সংক্রান্ত জীবন সংকট কেটে উঠতেই বাহিনী প্রধান নিরাপদ রক্ষা ব্যূহে স্থানান্তরিত হন। রাতের আঁধারে হেমায়েতকে নতুন মুক্তি-হেডকোয়ার্টার লখণ্ডা স্কুলে সরিয়ে নেন মুক্তিবাহিনী।

অস্থিরতার সংশয়ে দুলছে ৪২টি মুক্তি কোম্পানি। বিস্তীর্ণ এলাকার গোয়েন্দারা আসে বাহিনী প্রধানের অবস্থার খোঁজে। তাঁর আশু শংকামুক্তির সুখবর পৌঁছে দেয় স্ব স্ব কোম্পানিতে। চারজন ডাক্তার উদয়াস্ত তত্ত্বাবধানে থেকে বাহিনী প্রধানের চিকিৎসা-নার্সিং করেছেন। গুরুতর আঘাতের পুরাপুরি চিকিৎসায় দীর্ঘদিন রাজ্যেশ্বর ডাক্তারের মেডিক্যাল কেয়ারে তাঁকে থাকতে হয়।

হেমায়েত দর্শনে জনতার শ্রদ্ধার আকুতি অপূর্ণ থেকে গেল। সিকিউরিটির কারণে তিনি সবার অলক্ষে রইলেন। কারো সাধ্য হয় নি তাঁকে দেখার। দূর থেকেই জনগণের দেয়া খাদ্য সামগ্রী, ফুলের তোড়া ও অন্যান্য উপহার রেখে দেয়া হতো। সকলকে দোয়া করতে বলা হতো। বাহিনী প্রধান সুস্থ খবর জেনেই সবাই বিদায় নিতেন।

হেমায়েত নামের ভীতি ঃ যুদ্ধ উন্মাদনার মাদকতায় স্বাধীনতা যুদ্ধের টানে শারীরিক অসুখ-বিসুখের জ্বালা-যন্ত্রণা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ছিলো তুচ্ছ ব্যাপার। এমনি এক যুদ্ধ পাগল, মাতৃভূমির স্বাধীনতার পাগল, স্ত্রীর আত্মাহুতির বেদনা কাতর, যুদ্ধসঙ্গীদের নিরাপত্তা পাগল মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত। যুদ্ধ জীবনের ৭টি দিন ১৪ জুলাই থেকে ২১ জুলাই; আত্মবিস্মৃত যোদ্ধা জীবনের স্মৃতিধন্য অধ্যায়। ১৪ জুলাই যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সংজ্ঞাহীন হন। ১৫ জুলাই জ্ঞান ফিরে। ১৬ জুলাই সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে হাসপাতাল দখল করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ১৬ জুলাই রাতের মধ্যে হাসপাতাল ত্যাগ করতে হয় পাকবাহিনীর ভয়ে। জননী জন্মভূমির টানে ২১ জুলাই মেশিনগান হাতে পুনরায় রণাঙ্গনে যোগ দেন এই বীর যোদ্ধা। ৭ দিন যুদ্ধের স্থিতাবস্থার ঝিমুনি কাটিয়ে প্রাণ সঞ্চারের জন্য তিনি ঝটিকা সফরে যান।

মুক্তি নায়ক ধরাশায়ী। তার বাহিনীকে টাইট করতে ফাইট দেয়ার এটাই মোক্ষম সময়। সাইনের হাট অঞ্চলের মুক্তি কমান্ডার মালেক গ্রুপকে পাকিস্তানি আর্মি মরণ

জালের প্যাঁচে ঘেরাও করেছে। অসুস্থ হেমায়েতের কানে পৌঁছে সে দুঃসংবাদ। তিনি তড়াক লাফিয়ে উঠেন। যেন কাজের মতো কাজের সন্ধান পেলেন-'উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।'

শতাধিক নৌবহরের মুক্তিযোদ্ধা রেডি। শত্রুকে বেকায়দায় ফেলতে মূল শক্তি কেন্দ্রের পার্শ্ব-আক্রমণের সিদ্ধান্ত। মুক্তিযোদ্ধার নৌবহর হেমায়েতের নেতৃত্বে কালনাগিনীর মতো ছুটে চললো কালকিনি থানার ঘোশাইর হাট অঞ্চলে। সাইবের হাটের পক্ষে আর্মিরা মুক্তি অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে যায়। ঘোশাইর হাটের পথে ঘোঁত ঘাঁত ছলাত ছলাত দাঁড় ফেলে বাঙাল গোঁসাইরা ডুগডুগি বাজিয়ে আসছেন। কেয়া বাত হেমায়েত মরা নেহি। হামারা কেয়ামাত মুক্তি হেমায়েত আতা হায়!! মহাপ্রলয়ের হেমায়েত আতংকে সাইবের হাটের পাকিস্তানি আর্মি বিনা যুদ্ধে সটকে পড়ে। মালেক কমান্ডার নদী তীরে হেডকোয়ার্টার সুইসাইডেল দলকে মুক্তি সেনাদের মাধ্যমে অভিবাদন জানান।

তড়িঘড়ি অকুস্থল স্কুল মাঠে স্বতঃস্ফূর্ত জনসভা আয়োজিত হয়। পাকিস্তানি ত্রাস বিজয়ী বীর হেমায়েত এসেছেন। সবাইর মুখ চাওয়া-চাওয়ি সার। আসল হেমায়েত ক্যামোফ্লাজ। হেমায়েতের পক্ষে জনসভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কমান্ডার মালেক। আসল আর নকল হেমায়েত তো আসছে। জনতার আনন্দ উপছে পড়ে। মানব তরঙ্গের উচ্ছ্বাস সাগর তরঙ্গ ছাড়িয়ে যায়। নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবার, জয় বাংলা, মুক্তি ফৌজ জিন্দাবাদ, গাজি হেমায়েত জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে হর্ষোৎফুল্ল জনতা। জয় বাংলা ধ্বনির বজ্রনির্ঘোষে দালালবাহিনীর হৃদ-কম্পে পুনরায় ধ্বনিত হয় কেয়ামতের প্রতিধ্বনি।

উপসংহার ঃ রামশীল যুদ্ধে শিলনোড়ার বাটনা বাটা পাকিস্তানি বন্ধুরা ভালো করে বুঝে যায় 'যুদ্ধ কাকে বলে'। বাঙালের ক্যাঁচকি মাইরের ভেচকিকে তারা আর খাটো করে দেখে নি। কোটালিপাড়ার হেমায়েত বড় বজ্জাত কোটাল। কান মলি ভাই আর যদি কোনোদিন কোটালিপাড়া যাই। রামশীল যুদ্ধে চরম শিক্ষার দাবানির চুবানির শোকে ভূতের মুখে রাম নামের মতো তারা হেমায়েত নামে চরক ধান্দার সর্ষে ফুল দেখতো।

রেফারেন্স

ক। মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত, কৃত লে: কর্নেল (অব.) এস.আই.এম.নুরুন্নবী খান, বীর বিক্রম।

খ। হেমায়েত লিখিত ওয়ার ডায়রি, পত্র।

গ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিলপত্র-নবম খণ্ড সশস্ত্র সংগ্রাম (১)।

ঘ। সৈনিক যুদ্ধসাথীর একান্ত সাক্ষাতকার। হেমায়েতউদ্দিন, আজিজ, রাফায়েল বেপারি (প্রধান গোয়েন্দা), আশালতা বৈদ্য, আশ্রাফ প্রমুখ।

শিকির বাজার যুদ্ধ

(৪ অক্টোবর, ১৯৭১)

৩রা সেপ্টেম্বর। এক ব্যাটালিয়ান পাকিস্তানি আর্মি গোপালগঞ্জ থেকে যাত্রা করবে, এটাই তখনো পর্যন্ত শিকির বাজার মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পের গোয়েন্দাদের কাছে নিশ্চিত তাজা সংবাদ। কিন্তু আকস্মিকভাবে পাকবাহিনী শিকির বাজার আক্রমণ করে বসে। তিন কোম্পানি কমান্ডার আহসান হাবিব, কমলেশ বেদজ্ঞ, লুৎফর রহমান এঁদের নেতৃত্বে অসীম বীরত্বের শৌর্যে তিনশ মুক্তি-সৈনিক পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করে। তাদের পাল্টা আক্রমণের তোড়ে পাকিস্তানি আর্মি তখন প্রায়-আতংতিক।

আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে দু'দলের তুমুল যুদ্ধ। আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণে দুদলের জয়পরাজয় অনিশ্চিত। মুক্তি-আক্রমণের তীব্রতায় চারজন হারিয়ে পাকিস্তানি মনোবলে ভাঙ্গন ধরে। নিজের নিরাপত্তা বিস্মৃত মুক্তি গোলাম আলি হাওলাদার পাকিস্তানি অবস্থানে দৃষ্টান্ত মূলক বীরত্বে মরণ আঘাত হানেন। সমর জীবনের শ্রেষ্ঠ শৌর্য প্রদর্শন করে সমরাঙ্গনেই শাহাদতের বীর শয্যা বেছে নেন গোলাম আলি হাওলাদার। তাঁর মহত্তম বীরোচিত আত্মত্যাগ শত্রু মনে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুক্তি মরতে জানে, মারতে জানে, পালাতে জানে না। ইনসানের এ-কেমনতর যুদ্ধ! দিশেহারা পাকিস্তানি আর্মি পিছু হটে শেষ রক্ষা করে নিজেদের।

মোঃ গোলাম আলি হাওলাদার মুক্তিযুদ্ধের একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর জন্ম ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে, পিতা : মোঃ সৈজদ্দিন হাওলাদার, গ্রাম: পূর্ণবতি, ডাকঘর-পিনজুরি, থানা-কোটালিপাড়া, জিলা-গোপালগঞ্জ।

এইচ এস সি পাস ব্যবসায়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনা লগ্নে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারতের বিহার প্রদেশের চাকুলিয়ায় তাঁর গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ হয়। উন্নত রণকৌশল ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। মুক্তিযুদ্ধ প্রেরণার জ্যোতির্ময় উৎস শেখ মুজিবের জন্মস্থান ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বলতা ছিল। ফরিদপুরেই সর্বাধিক গেরিলা প্রবেশ করায় ৮ ও ৯ নং সেক্টর। ৮ নং সেক্টরের তিন হাজার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলার প্রবেশ ফরিদপুর জেলায়। ফরিদপুরে গেরিলা প্রেরণে ৮নং সেক্টরের তত্ত্বাবধান করেন ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হুদা, এএসসি। ফরিদপুর গোপালগঞ্জের জানবাজ গেরিলা যোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর গৌরবের স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রাখতে ঐকান্তিক বীরত্বে যুদ্ধ করতো। গোলাম আলির নাম শেষের আলি নামের সার্থকতা তাঁর যুদ্ধ-শৌর্যে। শিকির বাজার যুদ্ধে সম্মুখ সমরে শত্রুর গুলিতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের প্রথম ও শেষ যুদ্ধ শিকির বাজার যুদ্ধ। যুদ্ধসাথীরা তাঁর লাশ উদ্ধার করেন এবং রুখিয়ার পাড় গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের কোয়াটারে তাঁর দাফন করা হয়। দেশমাতৃকার জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ শৌর্যে লড়ে শাহাদত বরণ করেন বীর যোদ্ধা গোলাম আলি। শহিদ গোলাম আলির শৌর্যের জন্য অন্ততঃ একটি মরণোত্তর খেতাব তাঁকে দেয়া যেতো।

কুরপালা যুদ্ধ

৩রা সেপ্টম্বরের পরাজয়ের প্রতিশোধ ও মুক্তি দমনে পাকিস্তানি পক্ষ কুরপালায় ঘাঁটি স্থাপন করে। মুক্তি চলাচল, যোগাযোগ স্থাপন ও যাতায়াতের জন্য কুরপালা গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিদের আচ্ছা শিক্ষা দেবার লক্ষ্যে প্রলুব্ধ করে যুদ্ধে নামানোর জন্য পাকিস্তানিদের ফন্দি টের পেয়ে যায় মুক্তিরা এবং সেভাবেই তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৬ সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তানি ক্যাম্পে মুক্তি আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয়। পাঁচটি কোম্পানি যৌথভাবে আক্রমণ করবে পাকিস্তানি ক্যাম্প। কোম্পানি কমান্ডারগণ হচ্ছেন : ক। আবদুল বারি সরদার, খ। ইউছুফ আলি শিকদার, গ। লুৎফর রহমান, ঘ। আবদুল মালেক সরদার, এবং ঙ। বেলায়েত হোসেন। যুদ্ধকালে কমান্ডার বেলায়েত হোসেনের আকস্মিক শাহাদত বরণে মুক্তিবাহিনীকে বিপর্যয় বরণ করে নিতে হয়। তবে এ-যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মিরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বস্তুত, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণকালীন ব্যর্থতাই পাকিস্তানি আর্মির সাহস বাড়িয়ে দেয়।

বেলায়েত টুঙ্গিপাড়ার শ্রীরাম কান্দি গ্রামের সন্তান। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দলে বলে কমান্ডারের শৌর্যে প্রবেশ করেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। তাঁকে পেয়ে হেমায়েত প্রাথমিকভাবেই আন্তরিক পরিবেশে ডেকে পরামর্শ প্রদান করেন ঃ 'মিয়া, যুদ্ধ এত সহজ নয়। তুমি প্রথমে একজন কমান্ডারের অধীনে সহকারি কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধে যাও।" এ-কথা শুনে তাঁর চেহারায় ভীষণ রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশ পায়। অবস্থা আঁচ করে কোন প্রকার ঝামেলা না বাড়িয়ে কমান্ডার হিসেবেই তাঁকে যুদ্ধে পাঠানো হয়। কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম ও শেষ যুদ্ধ। সম্মুখ সমরে শত্রুর গুলিতে তাঁর মাথার খুলি উড়ে যায়। তাঁর শাহাদতের কারণে অন্যান্য কোম্পানি শত্রুর উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে।

চৌধুরী হাটখোলা যুদ্ধ

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

চৌধুরীর হাটখোলায় পাকিস্তানি-মুক্তি মারাত্মক সংঘর্ষ হয়, সে দিনটি ছিল ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় দু'দলের মধ্যে। মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন দুইজন কোম্পানি কমান্ডার আলম ও হাসান। আলম ও হাসান সর্নামতের দু'জনেই আর্মির নায়েক। রক্তাক্ষরে লেখা এই যুদ্ধে দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা রতন কুমার ও তৈয়ব আলি বখতিয়ার শাহাদত বরণ করেন। পাকিস্তানি বাহিনীর ছয়জনকে চিরতরে হারাতে হয়। তবে অত্যুত্তম বীরত্বে যুদ্ধ করে রণাঙ্গণে ধরাশায়ী হয়েছে পাকিস্তানি আর্মি। বহু পাকিস্তানি আহতের আর্তনাদে সেদিনের চৌধুরী হাটখোলার বাতাস ছিল প্রবল ভারাক্রান্ত।

স্বদেশের মাটির রসে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তৈয়ব আলি বখতিয়ার। তাঁর পিতার নাম মোঃ ইউনুছ আলি বখতিয়ার, গ্রাম-চান্দ, পোস্ট অফিস-পয়সার হাট, থানা-আগৈলঝাড়া, জিলা-বরিশাল। ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যার মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধপূর্ব পেশা ছোটখাট ব্যবসার সাথে চাষাবাদ। অভ্যন্তরীণ স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হেমায়েত বাহিনীর যোদ্ধা তৈয়ব আলি বখতিয়ার কোটালিপাড়া, কুচপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, শিকির বাজার, হরিনাহনা প্রভৃতি যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর শেষ যুদ্ধ কোটালিপাড়া থানার চৌধুরী হাট/কাশাতলির যুদ্ধ।

সম্মুখ সমরে তাঁর মত বীরের মরিয়া মরণ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে আধাডজন হারিয়ে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে হয়। শত্রুর বুকে মরণ আঘাত হেনে তাদের পরাজয় নিশ্চিত করে নিজের মৃত্যুর মধ্যে গৌরব ও মহত্ত্ব আছে। এমনি মহিয়ান বীর তৈয়ব আলি বখতিয়ার। যুদ্ধে বীর তৈয়ব আলি বখতিয়ার-এর পাশাপাশি ছিলেন উনশিয়া গ্রামের রতন কুমার। রতনের পরিবারবর্গ তখন ভারতে। ১৯৪৭ সালে তাঁরা স্বদেশ ছেড়ে ভারতের চব্বিশ পরগনায় চলে যান। রতনের তখন জন্মও হয়নি। জন্ম-পরবর্তীকালে তিনি তাঁর পূর্ব-পুরুষদের ফেলে যাওয়া মাটিকে স্বদেশ বলে ভাবেন। পৈত্রিক নিবাসের বাড়িঘরের কথা তিনি জানতে পারেন মুক্তিযুদ্ধের সুবাদে। ভারতে বসে শহিদ গোলাম আলির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সূচনা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সংস্পর্শে এসে তিনি গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে এসে তাঁর গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ এক বিরল অধ্যায়।

রতনকে হেমায়েত প্রশ্ন করে, "তুমি তো ভারতের বাসিন্দা, কেন এসেছো এই মরণ যুদ্ধে?" জবাবে রতন জানায়, "আজ এপার বাংলার যুদ্ধে এসেছি আপনাদের আকর্ষণ নিতে; কারণ, কাল তো ওপার বাংলায়ও স্বাধীনতা যুদ্ধ হতে পারে!" ইন্টারমিডিয়েট পাস এই যুবক যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন, তাতে বোধশক্তি হারিয়ে কতক্ষণের জন্য সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। রতন মাতিয়ে রেখেছিলেন তাঁর যুদ্ধ ময়দান। বাংলার স্বাধীনতা রতনের কাছে ঋণী।

রতনের পূর্ব পুরুষেরা এই বাংলার সন্তান। রিফিউজি বেশে তাঁরা আজ বসবাস করছেন ভারতের নালাগাঁয়। রতন এপার বাংলার যুদ্ধে যোগ দেন। তৈয়ব আলি বখতিয়ারের সাথে সম্মুখ-সমরে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবন বিসর্জন দেন এবং শোধ করেন তাঁর পিতৃঋণ; তাঁর পিতা এই বাংলার আলো-আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন। শিকির বাজার যুদ্ধে সেদিন শাহাদত বরণ করেন রতনের আরেক বন্ধু গোলাম আলি হাওলাদার।

এখানে বলে রাখা ভাল এবং অপ্রিয় হলেও সত্যি, যে-সব যোদ্ধা দেশের ভেতরে থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে গেরিলা যোদ্ধা হয়েছেন, তাঁদের যুদ্ধ প্রশিক্ষণ ভারত ফেরতা গেরিলাদের চাইতে তুলনামূলকভাবে নিম্ন মানের হলেও বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে রণকৌশল শিখেছেন বলে মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের ক্যাজুয়ালটি অত্যন্ত কম।

শহিদ স্মৃতির ধারক হয়ে বেঁচে আছেন এক ছেলে ও তিন মেয়ে। স্ত্রী ও সন্তানদের

এতিম করে তিনি শাহাদত বরণ করেন। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে তাঁর পিতা-মাতাও আজ জান্নাতবাসী। বখতিয়াররা তিন ভাইবোন। শহিদ বিধবা-স্ত্রী আজ দৃষ্টিহীনা; সন্তানদের নিয়ে স্বামীর ভিটা আগলে আছেন কায়ক্লেশে। উত্তরাধিকার সূত্রে শহিদ পরিবার রাষ্ট্রীয় ভাতা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সুবিধা পাচ্ছেন।

টিহটি মিয়ার হাট যুদ্ধ

কয়েকটি সাম্প্রতিক যুদ্ধে মুক্তির বিশেষ ক্ষয়ক্ষতিতে পাকিস্তানি আর্মি তখন দারুণ আস্থায়। ১৮ সেপ্টেম্বর রাতের আঁধারে টিহটি মিয়ার হাট মুক্তি ঘাঁটিতে পাকিস্তানিরা আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। তিন কোম্পানি মুক্তি শত্রুর চোরাই হামলাকে থোরাই পরোয়া করে। তাৎক্ষণিক প্রস্তুতির পাল্টা আঘাতে শত্রু-পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয় তারা। এই আঁধার রাতের আকস্মিক প্রতিরোধ-যুদ্ধের নেতৃত্বের তিনজন কোম্পানি কমান্ডার হচ্ছেন : ক। কলিমুল্লাহ, খ। মকবুল হোসেন দাড়িয়া, এবং গ। আবদুল হাকিম বিশ্বাস।

মুক্তি বিপদ এড়াতে অসীম শৌর্যের সাহসে সবাইকে উদ্দীপ্ত করেন কমান্ডার মকবুল। শত্রু শিহরণ ধরানো ছিল তাঁর প্রতিটি আক্রমণ। অবিস্মরণীয় শৌর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কমান্ডার বেলায়েত হোসেন দাড়িয়া শাহাদতের দৃষ্টান্তে অন্যদের প্রেরণা যুগিয়ে গেলেন।

এই যুদ্ধে মকবুল হোসেনের সহকারি কমান্ডার শাহাদত বরণ করেন। এই যুদ্ধের মূল পরিকল্পনায় ছিলেন সুবেদার কলিমুল্লাহ। তাঁর ক্যাম্প হেড কোয়ার্টার ছিল মিয়ারহাট তাহমিনাদের বাড়িতে। তাহমিনার বাবা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক। এই যুদ্ধে আরও দু'জন শহিদ হন। মুক্তিযোদ্ধা কদবানু যুদ্ধ অবস্থায় ছেলেকোলে শত্রুর শেলে শহিদ হন। পাক পক্ষে নিয়মিত বাহিনীর ৬ জন ও অনিয়মিত বাহিনীর ৩ রাজাকার নিহত হয়। যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয় এই গ্রাম।

মুক্তি-ঔদার্য

তখন বাংলা আশ্বিন মাস। স্থান রামদিয়া। মুক্তি অপারেশনে তিন নিয়মিত সশস্ত্র পাকিস্তানি আর্মি ধৃত হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে যায়ঃ সুন্দরী মেয়ের খোঁজে গাঁয়ের পথে পাকিস্তানি আর্মির এই নৌ অভিযান। নারী লোভের কোপে পাকিস্তানি আর্মি ঘায়েল হয়। ইনফরমার মারফত মুক্তিরা এই খবর পায়। শত্রু নৌকা পুরোপুরি বাঙ্গাল ঘেরের বেড়ে পড়ে। বাঙ্গালের কাঁচকি মাইরের ডরে তাদের সকলের শরীরে থরহরি কাঁপন ধরে। গুলি চালনার কোনই সাহস তারা পেলো না। ফৌজি কায়দায় হাত উঁচিয়ে আগ বাড়িয়ে তাদের তিনজনেরই আত্মসমর্পণ করতে হয়।

সৈনিকের সাথে সৈনিকের আচরণ। তাদের প্রতি বাঙ্গাল আতিথ্যের সৌজন্য

প্রদর্শন করা হয়। শত্রুকে বাগে পেয়েও ঘৃণ্য হত্যা পর্ব থেকে বিরত থাকে মুক্তিবাহিনী। অস্ত্র গোলাগুলি শুদ্ধ বন্দিদের মুক্তি ক্যাম্পে আনা হয়। তিন চারদিন তারা মুক্তি ক্যাম্পের আতিথ্যে থাকে। মুক্তি ঘাঁটি ও মুক্তি আচার-আচরণ, চালচলন, নামাজ-কালাম, জামাতে নামাজ, দোয়াখায়ের-মোনাজাত, কোরান পাঠ ধরনের পাক্কা দ্বীন-দার এলেমদার মুসলমানের আকিদা তারা স্বাভাবিক নিয়মে দেখতে পায়। তাঁদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের রীতিমত নামাজ পড়তে দেখে পাকিস্তানি সৈনিক চোখে বিস্ময় প্রকাশ পায়!

মুসলমানের রেওয়াজ দেখে স্বেচ্ছায় তাদের জবান খোলে। আমরা জানতাম বাংলাদেশে শুধু বিধর্মী কাফের ব্যুতপরসতি (মূর্তিপূজার) হিন্দুর বাসস্থান। মাশরেকি পাকিস্তানকে বাংলাদেশের নামে হিন্দুস্থান বানাবার জন্য শুধু মালাউনরা যুদ্ধ করছে। আপসোস কি বাত তার সাথে হাত মিলিয়েছে এ-দেশের কিছু বিভ্রান্ত দালাল হিন্দুজাদে ইন্দিরা ফরজন্দ মুসলমান।

পাকিস্তান মুসলিম সেনার মুক্তিবাহিনীর দুয়ারে প্রাণ ভিক্ষা চায়। আমরা প্রাণে বাঁচলে আর যুদ্ধ করবই না। মুসলমান হয়ে মুসলমান হত্যায় হাত কলংকিত করবো না। সাথী সৈনিকদের মাঝে প্রচার করবো মুক্তিবাহিনী সাচ্চা মুসলমান। এ-দেশের মুসলমানরাই তাদের ওয়াতান (দেশ) স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করছে। মুক্তিবাহিনী মরণ কবুল জানবাজ যোদ্ধা। ওয়াতান স্বাধীন না করে তারা ক্ষান্ত হবে না। তাদের সাথে যুদ্ধে জিতা যাবে না।

শত্রুর ওপর মনস্তাত্ত্বিক বিজয়ের পথ বেছে নেয় মুক্তি। বাহিনীর সিদ্ধান্ত হয় শত্রুর প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হোক। তাঁরা আপন বেরাদরানদের মাঝে ফিরে যান। মুক্তিবাহিনীর আসল চিত্র শত্রু দুর্গের সাধারণ সৈনিকরা জানুক এ-ঘটনা এবং মুক্তিদের আচরণ ও জীবন। মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে শত্রু পাকিস্তানি সেনাদের গোপালগঞ্জ ক্যান্টমেন্ট পাঠিয়ে দেয়া হয়। হেমায়েতবাহিনী প্রধান এ-সময়ে মর্মাহত হয়ে গোপালগঞ্জের মেজর সেলিমকে পত্র লিখেন। তখন থেকেই আশেপাশে আক্রমণ ও গ্রামে পাক-আর্মির আগমনহ্রাস পায়।

জলির পাড় যুদ্ধ

স্থান: মোকছেদপুর থানার জলিল পাড় হাট। পাকিস্তানি-মুক্তি যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভারতে ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তি গেরিলা নওশের আলি। সম্মুখ যুদ্ধে না পেরে পাকিস্তানি আর্মি অয়্যারলেসে তাদের সদর দপ্তরে এয়ার সাপোর্ট চায়। মুক্তিবাহিনীর তখনকার মত বড় দুর্বলতা, তাদের কোন এয়ার সাপোর্ট নেই। পাকিস্তানি এয়ার শেলিংয়ে আবুল বাশার খান শাহাদত বরণ করেন। এই যুদ্ধে শহিদ আবুল বাশার অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখে সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ

অক্টোবর থেকে বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ। চারিদিকে পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে হেমায়েত বাহিনীর এলোপাথাড়ি যুদ্ধ হয় মাঝে মাঝেই। আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণের ধুন্ধুমার যুদ্ধ। জয়-পরাজয়, আঘাত-প্রত্যাঘাতের বিপর্যয়ে হেমায়েত বাহিনী ক্ষণকালের জন্যেও মনোবল হারায়নি। কৌশলগত কারণ ছাড়া তাদের আক্রমণে শৈথিল্য ছিল না কখনো। বড় বড় যুদ্ধ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে তারা বহু ছোটখাট অপারেশন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে হেমায়েতবাহিনী।

সন্ত্রাসী যুদ্ধাভিযান

যুদ্ধের ঝটিকা গতির তীব্রতায় একশত পঞ্চাশটির মত ছোট বড় যুদ্ধে অভিযান চালায় হেমায়েত বাহিনী। পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে তিনি সন্ত্রাসী হেমায়েত নামে খ্যাত। হেমায়েত বাহিনীর হাতে বিভিন্ন থানা এলাকার পঁচাশিজন পাকিস্তানি দোসর প্রাণ হারায়।

বিজয়ের শেষ লগ্নে হেমায়েত বাহিনী

পাকিস্তানি পরাজয় আসন্ন ঃ পাকিস্তানি পরাজয়ের তখন মন্দ মন্দ গন্ধবহ বাতাস বইছে। সবার আগে ব্যাপারটি টের পায় পাকিস্তানি দোসর বাঙালি মিলিশিয়া-রাজাকার। আগে তারা গোপনে সারেন্ডার করতো। ডিসেম্বর ৩ তারিখ থেকে শুরু হয় তাদের প্রকাশ্য স্যারেন্ডার। পুরো সশস্ত্র রাজাকার ক্যাম্পের আত্মসমর্পণে শেষ রক্ষা হয় তাদের। পাকিস্তানিদের সারেন্ডারে চলে গড়িমসি।

৪ঠা ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী কমান্ডারদের কনফারেন্স হয়। গোপালগঞ্জ আক্রমণের স্থির সিদ্ধান্ত হয়। ৬ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে গোপালগঞ্জ পাকিস্তানি আর্মি অবস্থানের চতুর্দিকে মুক্তিবাহিনীর বাংকার খোড়াসহ সর্ব প্রকার আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। পূর্ব দাপটে আর পাকিস্তানি আর্মি মুক্তি নির্মূলের যুদ্ধে এগিয়ে আসে না। মুক্তিদের তারা তাদের গুলির রেঞ্জে আসতে দেয় না। ছলাকলার কালক্ষেপণ লুকোচুরি খেলার যুদ্ধ যেন।

৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে আকস্মিকভাবে মুক্তি আক্রমণ শুরু হয়। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। রাতের আঁধারে মুক্তিরা শিয়াল-আক্রমণ চালায়। আর আঁধারের কভারে পাকিস্তানি সিংহ পলায়ন করে যথাস্থান থেকে। মুক্তিবাহিনীর অজস্র গুলির প্রতি-উত্তরে পাকিস্তানি পক্ষ থেকে গুলির কোন জবাবই নেই। বেয়াকুফ মুক্তি অনর্থক গুলি বৃষ্টির খৈ ফুটায়। পাকিস্তানি আর্মি আরামসে চুপিসারে ইতোমধ্যে পালিয়ে গেছে। প্রতিপক্ষ শূন্য ওয়াক ওভারের বিজয়। ৯ ডিসেম্বরের ভোর ৪-টায় বিজয় নিশান উড়িয়ে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি দুর্গে প্রবেশ করে।

মুক্তিবাহিনীর গোপালগঞ্জ শহরে প্রবেশ আর গোমরা মুখো পাকিস্তানি ফৌজের ফরিদপুর থেকে পাততাড়ি গুটানো–এ পর্যায়ে হেমায়েত বাহিনীর সাথে অপরাপর মুক্তিবাহিনী একই কমান্ডে পাকিস্তানি বাহিনীর পশ্চাদধাবন করে। ১১ ডিসেম্বর বাখুণ্ডা ব্রিজে পাক-মুক্তি দুদল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। পাকিস্তানি আর্মি পালাতে চায় কিন্তু নাছোড় মুক্তি তাদের পথ ছাড়ে না। অগত্যা উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ। বীর মুক্তি ওসমান শেখের শাহাদতের গৌরবে বঙ্গবাহিনী বিজয়ী হয়। বাখুণ্ডা ব্রিজে মুক্তির অখণ্ড বিজয় স্বীকারে পরাজিত পাকিস্তানি আর্মির ফরিদপুর অভিমুখে পলায়ন অব্যাহত থাকে।

কয়েক দিনের বিতাড়িত পাকিস্তানি আর্মি ফরিদপুর শহরে এসে জড় হয়। মুক্তির অনুসরণ এড়াতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় যাত্রা করে রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। বত্রিশ ভাজার মত রাজবাড়িতে মরণ জালে কষে ফেলে মুক্তিরা, অগত্যা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় তারা। দোঁআশলা পাকিস্তানি দোসর বিহারিরা আত্মসর্পণে অস্বীকার করে। রাজবাড়ি শহরে বসবাসরত ও বাইরে থেকে আগত সশস্ত্র বিহারি দল তখনো যুদ্ধ জারি রাখে। ব্যাপক রক্তক্ষয় এড়াতে মুক্তিবাহিনী সতর্কতা অবলম্বন করে। মুক্তি সংযমের কাফফারায় বিহারি-বাঙ্গালির যুদ্ধে অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াসসহ অনেকে হতাহত হন। মার্কিন 'সপ্তম নৌ-বহর'-এর বঙ্গোপসাগর উপস্থিতি ও চিনা ছত্রী সেনা অবতরণের নেশাগ্রস্ত খোদাই মদদ মার্কা বিহারিদের চৈতন্যোদয় হয় খোদ পাকিস্তানি আর্মির আত্মসমর্পণের অনেক পরে। তারা এখন ভীত ও সন্ত্রস্ত। ফরিদপুর ও রাজবাড়ি অভিযানে মাত্র তিনশত মুক্তিসেনার দাপটে হাজার হাজার পাকিস্তানি সেনার ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে তাদের চক্ষু স্থির। শেষ পর্যন্ত মুক্তি ঔদার্যের আশ্বাসে ১৫ ডিসেম্বর রাজবাড়ি বিহারিরা অস্ত্র সংবরণসহ আত্মসমর্পণ করে। হেমায়েত বাহিনীর অপরাপর কয়েক হাজার মুক্তি সেনা ফরিদপুর শহর, গোপালগঞ্জ, কোটালিপাড়া ও তার আশপাশ অঞ্চলের বিজয় সংহত করে। অপূর্ব সংযমের স্থৈর্যে তারা স্বদেশী-বিদেশী আত্মসমর্পণকারী শত্রু সৈন্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

ফরিদপুরের পাক-আর্মির আত্মসমর্পণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল। অন্যান্য স্থানে পাক আর্মির আত্মসমর্পণে হেমায়েতকে চাওয়ার অন্যতম কারণ, তিনি পাকিস্তান আর্মির ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার। বেসামরিক গণমুক্তিদের প্রতি পাক-আর্মির আস্থা নেই। যুদ্ধের নিয়ম, আত্মসমর্পণের পর শত্রুর প্রতি আন্তর্জাতিক নিয়মে আচরণ করা, কিন্তু বেসামরিক বাহিনীর এসব জানা নেই। যুদ্ধের সময়ে পাক আর্মি হেমায়েতকে জমের মত ভয় পেলেও তাঁর সৈনিক-হৃদয়ের ঔদার্য সম্পর্কে তারা নিশ্চিত ছিল। স্বজাতির স্বাধীনতার জন্য নিজে লড়লেও তিনি অপর দলের যোদ্ধার প্রতি উদার হবেন, যদিও পাক আর্মি যে-কোন অবস্থায় পেলে হেমায়েতকে হত্যা করতো।

হেমায়েত বাহিনী ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় মূলত বিন্যস্ত ছিল। ফরিদপুরে আত্মসমর্পণ করলেও বরিশালের উত্তর অংশে অবস্থিত শক্তিশালী পাকিস্তানি আর্মির দল আত্মসমর্পণের বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। তারা সরাসরি হেমায়েতের হাতে আত্মসমর্পণ

করতে আগ্রহী। গৌরনদী পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্প তো হেমায়েত ছাড়া আত্মসমর্পণে সম্মতই হচ্ছে না। কারণ সিভিল মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণে তারা আস্থা পাচ্ছে না। তাদের ধারণা, আত্মসমর্পণ মাত্র সিভিলিয়ান মুক্তিরা পাকিস্তানি আর্মিদের মেরে ফেলবে। হেমায়েত তখন রাজবাড়ি অভিযানে ব্যস্ত। হেমায়েত তখন দূরদূরান্তে অভিযানে ব্যস্ত। ফরিদপুরের রাজবাড়ি, খুলনার মোল্লার হাট, যশোরের কালিয়া এলাকায় তিনি একটার পর একটা অপারেশনে জড়িয়ে পড়ছেন। গৌরনদী দখলের গৌরবে কোম্পানি কমান্ডার রকিব সেরনিয়াবাত, শাহা সেকান্দার, নূর মিয়াসহ পাঁচটি কোম্পানির ঘেরে রয়েছে গৌরনদীর পাকিস্তানি আর্মি। কিন্তু কোন কমান্ডারকেই পাকিস্তানি আর্মি আস্থায় নেয় না। তাদের কথা ইস্ট বেঙ্গলের হেমায়েত বাদুর আশ্বাসের বিশ্বাস ছাড়া কাজ হবে না।

অনন্যোপায় হয়ে সিভিল মুক্তিদের তখন অন্যত্র অভিযানে ব্যস্ত হেমায়েতকে খবরের পর খবর পাঠাতে হয়। অগত্যা হেমায়েত ছুটলেন গৌরনদী। মাইকে হেমায়েত উপস্থিতির ঘোষণা দিতেই সুবোধ বালকের মত আত্মসমর্পণ করে পাকবাহিনী। বিজয়ের গৌরব ধন্য উজ্জীবনে হেমায়েত। বিজিতের প্রতি আজ ঘৃণা নাই। মহাবিজয় আল্লাহরই দান। এবার সকল বন্দির জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিশ্চিত করতে হবে। সবাইকে নিরাপদে বরিশাল স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন হেমায়েত ।

যশোরের কালিয়া থানায় একই নাটকের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কালিয়া থানার কালান্তক কাল অত্যাচারী পাকিস্তানি আর্মিকে মাইকে হেমায়েত-এর আগমন সংবাদ জানানো মাত্র সুড় সুড় আত্মসমর্পণ করতে থাকে। একই নাটকের দৃশ্য ঘটে গোপালগঞ্জে, সেখানেও পাকিস্তানি আর্মি বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে আত্মসমর্পণ করে ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১। ফরিদপুর ও রাজবাড়িতে একই পদ্ধতিতে পাকিস্তানিরা স্যারেন্ডার করে। সর্বত্র কঠোর হস্তে সিভিল মুক্তি-জনতাকে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে সংযত রাখা হয়। নতুবা, পাকিস্তান আর্মির মত একই বর্বরতার কারণে বিশ্ববাসীর সম্মান ও আস্থা হারাবে গৌরবোজ্জ্বল বীরত্বের মুক্তিবাহিনী। বিশ্বনন্দিত মুক্তি বাহিনীর আজ বীর হৃদয়ের ঔদার্য প্রদর্শনের পালা। প্রতিশোধের দিন শেষ। ক্ষমার মহত্ত্বে বীর প্রসবিনী বাংলা বিশ্বে অক্ষয় কীর্তি রচনা করবে। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া-খুনাখুনি করেও মানুষ একই বাড়িতে বাস করে। আমরা আজ স্বাধীন। বিজিত ভাইকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। অত্যাচারীদের থেকে তাঁরা শিক্ষা নিবেন।

হত্যা-মৃত্যু, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও, ধ্বংস-হাহাকার প্রতিশোধ-প্রতিকারের নাম যুদ্ধ। সর্বদেশে সর্বকালে এটাই যুদ্ধের রীতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধও তার ব্যতিক্রমধর্মী কিছু না। পাকিস্তান ধ্বংস হয়েছে পাকিস্তান আর্মির হাতে। পাকিস্তান নামক দেশের অংশ হিসেবে নিজের দেশের কথিত আর্মির হাতে বাঙালির দুর্ভোগ। এত স্বল্প সময়ে এত সর্বাধিক আত্মত্যাগে পৃথিবীর কোন অত্যাচারী আর্মি পার পায় নি। স্বদেশের দালাল মিলিশিয়া শত্রু সহযোগী ও বিদেশী আর্মির দুদলই বাঙালি জাতি ও ফরিদপুরের অমর সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের দূরদৃষ্টির রাজনৈতিক প্রজ্ঞার

ঔদার্যে ক্ষমা পায়। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সুসভ্য দেশ ইরানের নীতি অনুসরণ করে দেশকে মৃত্যুশীতল স্থবিরতায় আনতে পারতেন শেখ মুজিব। ইরানের শাহকে সরিয়ে বিচারের নামে নির্বিচারে ডজন ডজন জেনারেল হত্যায় হাত কলঙ্কিত করেন বিপ্লবী বীর আয়াতুল্লাহ খোমেনী; বিজয় সংহত করতে বিপক্ষ হত্যার উগ্রতায় মুসলিম বিশ্বের গৌরব শক্তিশালী ইরান তার আর্মি হারিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। দশ বছরের ইরাক-ইরান খামাখা যুদ্ধ নীরবে দেখল মুসলমি বিশ্ব। শেখ মুজিব সে পথে গেলেন না। বিরাট হৃদয় ঐশ্বর্যের শেখ সীমাহীন ক্ষমার রঙ্গমঞ্চে নিজেই বলি। তিনি সঠিক কি বেঠিক করেছেন তার বিচার করবে অনাগত ইতিহাস। ১৯৭১ সালের বিজয় পরবর্তী ঔদার্যে বাঙালি জাতিকে সার্বিক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন শেখ মুজিব। তাঁর জন্মস্থান ফরিদপুরেরই অপর কৃতী সন্তান কোটালিপাড়ার হেমায়েত উদ্দিন। বিজয় লগ্নে তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে বিজয় মহত্ত্বের সাথে ক্ষমার ঔদার্য যোগ করে শত্রুকে ক্ষমা করা। অনাগত ইতিহাস স্বাধীনতার স্মৃতিধন্য ফরিদপুরের দুই কৃতী সন্তানের কৃতিত্ব শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

কোটালি পাড়া থানা ৫ম আক্রমণ

(৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১)

সূচনা ঃ কোটালিপাড়া থানায় মুক্তি হেমায়েতের প্রথমবার কমান্ডো রেইড হয় ৯ মে, ১৯৭১। প্রথম রেইড থেকেই সাফল্যের জয় যাত্রার সূচনা হয়। কোটালিপাড়া বেদখলের হাত সাফাইর লুকোচুরি চলেছে বার বার। এবার তার ফাইনালে ৫ম রাউন্ড; ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭১ দিবাগত রাতে মুক্তি আক্রমণ হয় সেখানে।

পারস্পরিক শক্তি

মুক্তিবাহিনী

ক। জনবল : মুক্তিযোদ্ধা ৩৫০ জন (সব ধরনের যোদ্ধা নিয়ে) ;

খ। অস্ত্র :

২ ইঞ্চি মর্টার-২; এল এম জি-৬; এস এল আর-৭২; থ্রি নট থ্রি রাইফেল-২০৫; জি এফ রাইফেল-২; এনারগ্রা রাইফেল-২; এবং এস এম জি-৪।

পাকিস্তানি আর্মি

ক। জনবল : পাকিস্তানি আর্মি, পুলিশ, রাজাকার, ব্যাটালিয়ান-৬০০ জন

খ। অস্ত্র : গোলাবারুদ স্বয়ংসম্পূর্ণের সাথে প্রচুর রিজার্ভ।

মুক্তি আক্রমণ ঃ যৌথ কমান্ডে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ পরিচালিত হয়। মুক্তি আক্রমণে বার বার পর্যুদস্ত কোটালিপাড়া থানার পুলিশ ও রাজাকার থানা থেকে বেরিয়ে যায়। তারা থানায় থাকে না। পশ্চিমাদের আরাম আয়েশের জন্য তারা থানা ছেড়ে দিয়ে নদীর অপর পাড়ে মসজিদ ও সরকারি গুদামে আশ্রয় নেয়। ক্যাপ্টেন বাবুল ও

হেমায়েত বাহিনীর মিলিত শক্তির জীবন পণ যুদ্ধ চলছে। চারিদিক ঘিরে মুক্তির শাঁড়াশি চাপের নৈশ আক্রমণ। এক নাগাড়ে দশ ঘন্টা চলে যুদ্ধ।

ফলাফল ঃ পরাজয়ের প্রমাদ গুণে দিশেহারা পাকিস্তানি আর্মি। বেশ কিছু পাক-সেনা পালিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। পশ্চিমাদের সেবাদাস বাঙালি পাকিস্তানি-আর্মি ও মিলিশিয়ারা বিপাকে। তাদের বিপদের মুখে ফেলে পশ্চিমা ভাইরা পালিয়েছে। অবস্থা দেখে পুলিশ, রাজাকার, আলবদর, আলসামস বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করে। বাঙালি মিলিশিয়াদের সাথে নিয়মিত পাকিস্তানি আর্মির ৭২ জন বাঙালি সেনাও আত্মসমর্পণ করে। সব মিলিয়ে ৩০০ শত্রুর আত্মসমর্পণ সম্পন্ন হয় ইতোমধ্যে। যুদ্ধ করে ও যুদ্ধরত অবস্থায় ২০ শত্রুসেনা নিহত। মুক্তিবাহিনীর একজন মাত্র মারাত্মকভাবে আহত হন; তিনি আলিউজ্জামান। আত্মসমর্পণকারী কাউকে প্রাণে মারা হয় নি। তাদের প্রতি সৈনিকোচিত ঔদার্যের ব্যবহার করা হয়। ৩রা ডিসেম্বর সকাল ৯-টায় কোটালিপাড়া থানা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। অস্ত্র গোলাবারুদের মধ্যে ১২০টি রাইফেল, ২টি এল এম জি সাথে দশ হাজার রাউন্ড অ্যামুনিশন এবং ৩৬ হ্যান্ড-গ্রেনেড ৬ বাক্স মুক্তি কব্জায় আসে।

উপসংহার ঃ কোটালিপাড়া থানা আক্রমণের মাধ্যমে সূচিত হয় হেমায়েত বাহিনীর সগৌরব জয় যাত্রা। আর সর্বশেষ দখলের মাধ্যমে তাঁর অক্ষয় কীর্তি রচিত হয়। বাস্তবে কোটালিপাড়া দখলের পর ফরিদপুর গোপালগঞ্জ নিয়মিত পাকিস্তানি আর্মির প্রতিরোধের অবসান ঘটে। পরবর্তী যুদ্ধ যা হয়েছে সেগুলি কেবলি পলায়মান পাকিস্তানি আর্মির আত্মরক্ষার যুদ্ধ।

তৃতীয় অধ্যায়

যুদ্ধপর্ব-২ ঃ নেতৃস্থানীয় যোদ্ধা ও তাঁদের যুদ্ধ

'চোরের মার বড় গলা'

প্রথম অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ টিকিয়ে রাখাই হেমায়েতের বড় রকমের রণ-কৌশল। মুক্তিযুদ্ধ জারি রাখার নৈমিত্তিক কর্মসূচি বন্ধ হলে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে উপস্থিতিই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। সে রণ-কৌশলে ফেল মারলে মুক্তির আর রক্ষা নেই। আমৃত্যু বাংলার মাটিতে লড়ার এবং ভারতে হিজরতে না যাবার গোঁ-তে হেমায়েত ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেন। অবশ্য তাঁর ভারত যাত্রায় অপারগতার পিছনে বিশেষ কারণ রয়েছে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলা হয় পূর্ব পাকিস্তান। বাংলার মুসলমান লোভের পাঁয়তারায় নারায়ে তকবির ধ্বনিতে যুগযুগান্তর ধরে এ-দেশে বাস করা হিন্দুদের বাস্তুচ্যুত করে। হিন্দুরা ভারতে হিজরত করে শরণার্থী হয়েছেন। অনেকে দক্ষিণ ভারতে রাম-সীতার বনবাস খ্যাত দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। খেটে খাওয়া চাষি মজুরের ভারতে শরণার্থী হতে অসুবিধা ছিল না। কারণ ভারতে ভাল পাট ফলাতে কম জানতো পশ্চিম বঙ্গের ভদ্র চাষি ও ব্রাহ্মণ ঠাকুর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ব বাংলার চাষিদের জমি বরাদ্দ, হালের বলদ ও আর্থিক অনুদান দিতো। সরল প্রাণ পূর্ব বাংলার অমুসলমান চাষি পরিবারকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ত্রিপুরা রাজ্য ও আসামে হিজরতে প্রলুব্ধ করতো। ভারতের কিছু রিক্রুট এজেন্ট এ-ভাবে কামলা চাষি সংগ্রহে পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করতো। ফলে গ্রামকে গ্রাম উজার করে নারী-পুরুষ সবংশে দলবদ্ধ দেশ ত্যাগের হিড়িক পড়ে। প্রথম অবস্থায় জুজুর ভীতির আতংক ছাড়া তাতে কোন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়া মোহাজেররা অল্প দিনেই ভারতের আদর আপ্যায়নের মরতবা বুঝলেন। ফেলে যাওয়া সোনার পূর্ব পাকিস্তানের মাছ-ভাত, দুধ-কলার সাধ সেখানে নেই। তাঁদের দশা রবীন্দ্র ছোট গল্পের মাখন ও ফটিকের মত। কলকাতা মহানগরে তারা কোথায় পাবেন দিগন্ত জোড়া খেলার মাঠের উদার হাওয়া। প্রতিকারে তাদের কাজ অতিরঞ্জিত ও বানোয়াট পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করা। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় রাজ্য আসাম-ত্রিপুরা-পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করা। উপমহাদেশে যেন সস্তা শ্লোগান হিন্দুর আবাস হিন্দুস্তান। মুসলমানের নিবাস পাকিস্তান। পরিণতিতে ভারতের মুসলমান পাকিস্তানে যাও। পাকিস্তানের হিন্দু ভারতে যাও। অতীতে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে মুসলমানদের ভারতকে 'দারুল হরব' বা ইসলাম বিপন্নের মত বলা হতো। মুসলমানরা বিধর্মী ব্রিটিশ রাজ্য ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যের

মুসলিম দেশে হিজরত করবেন। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের ধারনা ছিল না কি পরিমাণ মুসলমান ভারতে আছেন। হিজরতের বহর দেখে তা বন্ধ হয়ে যায়। ভারত বিভাগের পূর্বে দু'দেশের সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে নিশ্চিত গ্যারান্টির কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার অভাবে এই পরিণতি।

একই কাণ্ড ঘটেছে ভারতের মুসলমানদের বেলায়। অবিভক্ত ভারতে আত্মীয়-স্বজন ভারত-পাকিস্তান দু'দেশের মানুষই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। প্রথম রেষারেষিতে দু'দেশের মানুষের প্রথমে আগমন আত্মীয় বাড়ি, পরে দল বেঁধে হিজরত। শুরু হলো পৃথিবীর ভয়াবহতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিহারের দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের মুসলমান যখন তাঁদের হতাহতদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসে, এখানকার গণমানুষের মনে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ-দেশের সংখ্যালঘুরা ভয় পায়। দু'দেশেই এমন অরাজকতার সুযোগ নেয় স্বার্থান্বেষীরা। হেমায়েত শৈশবে এক পেশে দৃষ্টিতে এই সংখ্যালঘু বিতাড়ন দেখেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা পেঁয়াজ খোরের ঝাঁঝে যেন জিন্দাবাদ ও নারায়ে তকবিরে হিন্দুদের ভারতে তাড়িয়েছে। আজন্মের বাসভূমি পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হবার যে কি জ্বালা তা ভুক্তভোগীর ব্যথার ব্যথী ছাড়া কেউ বুঝবে না। একই কারবার ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে আসা মোহাজেরদের বেলায়। দু'পক্ষের দুঃখই সমানে সমান। তারই উপশমে ভারত-পাকিস্তানের দুটি যুদ্ধ। ১৯৬৫'র এবং ১৯৭১-এর লড়াই। দু'দেশের শরণার্থীদের জ্বালা যেন "বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিশে দংশেনি যারে"। হেমায়েত-এর বাড়ি টুঁপারিয়ায় তিনশ ষাট ঘর ব্রাহ্মণের বাস। তাঁরা হেমায়েতের প্রতিবেশী। তাঁদের বেদনাতুর আহাজারি হেমায়েত নিজের চোখে দেখেছেন, মনে ব্যথা পেয়েছেন। সে ছোটবেলার অন্তরের দুঃখের কথা হেমায়েত ভুলেন নি। ঠাকুর মশায়রা হেমায়েতের বাবা করিম মুনশিকে বলতেন, "ও মুনশি না যাইয়া তো আর পারি না! শেহের পোরা এখন মাইয়াগোও টাইনা লইয়া-যাইতে চায়। তোমরা যারা বাল ঠেহ, তোমরা তো সংখ্যায় কম, রক্ষা করতে তো পারবা না"। করিম মুনশি বলতেন, "ঠাকুর মশায়, কি হরব (করব)। হারামাজাদাগো পেটটাইতো আর ভরলো না। ভগবানরে ডাহেন, হে-ই আপনাগো রক্ষা করবো। ছোট্ট বেলার সেই হেমায়েত খোকার চোখের দেখা স্মৃতি তাঁকে ভারত যাত্রায় বাধা দিচ্ছে। যাঁরা তাদের প্রিয় জন্ম ভূমি ছেড়ে হিজরত করলেন। সে স্বদেশ বিচ্যুত ভিটে মাটি ছাড়া হিজরতিদের দেশে কোন গায়রতে হাজির হবেন হেমায়েত। ১৯৬৫-এর যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান রক্ষায় লড়েছেন হেমায়েত। ১৯৬৫-এর রণাংগনে মরিয়া মরণ পণে লড়েছেন বিধর্মী কাফের ভারতীয় সৈন্য মারার ফাঁকতালে। শেষ রক্তবিসর্জনে বিপক্ষ ভারতীয় সৈন্য মেরে সুনাম অর্জন করতে কোশেশ করছেন হেমায়েত। সৈনিক হবার কসম প্যারেড সামনে রাখা কোরান ছুঁয়ে আপনা ওয়াতান (জন্মভূমি) রক্ষার শপথ নিয়েছেন। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধে কসম খাওয়া উদ্দীপনায় লড়েছেন হেমায়েত। ১৯৬৫-এর ভারত বিরোধী যুদ্ধের বারুদের গন্ধ হাত থেকে না মুছতেই পাকিস্তান

ধ্বংসের যুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ ঃ যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার যুদ্ধ। স্বদেশী বিধর্মীদের তাড়িয়ে ভারতে প্রেরণ আর ভারতের বিরুদ্ধে লড়া ১৯৬৫ লড়াই স্মরণে ভারত যাত্রায় জীবনপণ অসম্মতি তাঁর। চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে না! স্বদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বশক্তিতে লড়ে বিজয় অর্জনে তিনি সুদৃঢ় আস্থাবান। বীর মরতে জানে টলতে জানে না। হেমায়েতও কেয়ামত তক লড়বে স্বদেশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে, তবুও ভারত যাবে না বাংলার এই বীর যোদ্ধা। ১৯৭১-এর রণাংগন ছেড়ে বাংলার মাটি নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে বেহায়ার মত অন্য দেশে যেতে ঘৃণা বোধ করলেন হেমায়েত। প্রতিকারে আত্মশক্তির দক্ষতায় অসম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ সম্পদের কৌশলের উপাদানে গড়তে চাইলেন বঙ্গবাহিনী। বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবের গুণে তিনি বিমুগ্ধ। তাই বঙ্গবন্ধুর বাসস্থানের আশেপাশটাকে উত্তম রণাঙ্গনরূপে বেছে নেন। জয়দেবপুর থেকে বহুতর যুদ্ধের মাধ্যমে নিজ এলাকায় এসে যুদ্ধের বাসনাও শেখ মুজিব উদ্দীপনায় শিহরিত হবার অন্যতম কারণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও হেমায়েত উদ্দিনের বাসস্থান একই এলাকায়। মুক্তিযুদ্ধের নিয়ামক শক্তির প্রেরণার উৎস শেখ মুজিবের বাড়ির এলাকায় একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধা দল গড়তে পারলে পৃথিবীর প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টি এদিকে পড়বেই। কিছুই না করে সময় ক্ষেপণ করলে মুক্তিযুদ্ধ ঝিমিয়ে পড়ে নেতিয়ে যাবে। ফরিদপুরের বঙ্গ শার্দুলদের দিয়েই গড়ে ওঠে হেমায়েত বাহিনী। বাহিনী গড়ার প্রাথমিক খেসারতেও দমলেন না হেমায়েত।

প্রাথমিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব সবারই মনের অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন। কে কি করবেন, কোথায় যাবেন, ভেবে পান না। অনেক ভেবে চিনতে কেউ যান ভারতে, কেউ যান মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে ধর্ণা দিতে। ঘরে ঘরে লোক দেখান শৌর্যে ওড়ে পাকিস্তানি পতাকা। গায়ে জ্বালা ধরা দশা অনেকের মত হেমায়েতের। অন্তর মনের মাতম থামাতে মাত্র দু'জন সহযোগীর চমক লাগানো শৌর্যের আতংকে দখল করেন সশস্ত্র দখলদার পুলিশের আস্তানা কোটালিপাড়া থানা। নির্বাক জনতাকে তাক লাগানো শৌর্যে সবাক সজিব করতে চরম ঝুঁকির অপারেশনে যাওয়া হয়। কোটালিপাড়া থানা দখলের পরই পুরা অঞ্চলে প্রাণ সঞ্চারী জয়বাংলা ধ্বনির আওয়াজে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। হরিষে বিষাদের মত মূর্ছা যাবার মত বিপদের পর বিপদ। অরাজগময় পরিস্থিতির সুযোগ নেয় সারা বাংলা জুড়ে চোর-ডাকাত-লুটেরারা। মারধোর শুরু হয় সংখ্যা লঘু হিন্দুদের ওপর। কোটালিপাড়ার কান্দি ইউনিয়নের হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমান নামের লুটেরা। সত্তর জন হিন্দুকে হত্যাসহ লুটপাট করে তাদের বাড়ি-ঘর। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘার মত চোর-ডাকাতও শুরু করে দিনে-রাতে ঝোপ বুঝে কোপ। নরম প্রকৃতির ভদ্র মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দেখেন জোর যার মুল্লুক তার। আর রক্ষক বেশী মুসলিম লীগের যেন শাঁখের করাত, শুঁটকির নৌকায় বিড়াল চৌকিদার। অগত্যা সংগোপন সতর্কতায় পাক বশংবদ লুটেরাদের অত্যাচারের হাত থেকে ধনে প্রাণে রক্ষা পেতে যোগাযোগ করেন মুক্তিদের সাথে। হেমায়েত বাহিনী

তখন প্রতিষ্ঠা লগ্নে। সাংগঠনিক লোকজনের প্রায় সবাই প্রাণে বাঁচতে পালিয়েছেন প্রতিবেশী দেশ ভারতে। দু'চারজন যারা আছেন তারাও ভাবনা চিন্তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে চিন্তা করছেন কি করবেন না করবেন ভাবনায়। এমনি দুর্যোগের সময় উত্তরে টিকে থাকা সত্যিই দুরূহ। কোটালিপাড়া থানা দখলের পর নায়েক সাহেবালিকে দিয়ে সাজানো হয় 'মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ ভাগোড়া'। ছদ্মবেশে তারা করে রাতের ডাকাতি। হায়রে হা হতোস্মির মুক্তিযুদ্ধ। মে মাসের শেষ দিকে শেখ মুজিবুর রহমানের চাচা মোশাররফ হোসেন সপরিবারে আশ্রয় নেন আওয়ামী লীগার আইনদ্দির বাড়ি। কোটালিপাড়া থানার কান্দি ইউনিয়নের হিজলা বাড়ি গ্রামে সে আশ্রয় দাতা আইনদ্দির বাড়ি। চরম ঝুঁকির মুখে তিনি বঙ্গবন্ধুর চাচাকে আশ্রয় দেন। কারণ তার পাশের বাড়ি মুসলিম লীগ-পন্থী খোরশেদ সাহেবের। মুসলিম লীগার খোরশেদকে ভয় দেখান হয় যে খোরশেদ সাহেব যদি খান সাহেবের পরিবারের ব্যাপারে নাক গলান, তবে হেমায়েতকে বলে শায়েস্তা করা হবে।

দু'চারদিনের ব্যবধানে আইনদ্দির মাথায় বাড়ি পড়ে। বঙ্গবন্ধুর চাচা মোশাররফ হোসেন খান সাহেবের সর্বস্ব লুটপাট হয়। মাঠের নৌচলা পথে ডাকাতের আগমন ঘটে। ডাকাতদের ভয় আইনদ্দিন তার লোকজনদের উৎসাহ যোগান ডাকাতদের ওপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বাঁচার পথ উৎরাতে ডাকাত ছলনার প্রতারণার কৌশল নেয়। ডাকাতরা হেমায়েতের নাম ভাঙ্গিয়ে পার পাবার চেষ্টা করে। ডাকাতের অভিনয় "হেমায়েত ভাই এদিকে আসেন, এইখানে মেসিন গান লাগান। হেমায়েত ভাই তাড়াতাড়ি মেশিন গান টানেন।" ডাকাত হেমায়েত নামের আতংকে দেয়ালে পিঠ ঠেকার মত দুর্বলতায় সর্বপ্রচেষ্টায় ফেল মেরে আইনদ্দিন কাবু। সবারই মনে ভাবনা রক্ষকই যখন ভক্ষক, নিজ হাতই যখন গালে চড় মারে তখন করবার আর কিইবা থাকে? দুর্বলের বিচারই বা কোথায়? মুক্তির প্রথমাবস্থায় কোটালিপড়া এলাকায় চোর-ডাকাত-লুটেরা হেমায়েতের নাম ব্যবহার করে তাকে নাস্তানাবুদ করতে লাগে। অবস্থার প্রতিকারে নাছোড়বান্দা হেমায়েত উঠে পড়ে লাগেন। যে নাটের গুরু নেপথ্য নায়কের কাল থাবার গুণে খান পরিবার সর্বস্ব হারিয়েছে, হেমায়েতের নামে বদনাম হয়েছে, তাকে কখনই ছাড়া হবে না। উপযুক্ত বিচারে তার প্রতিকার হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই একশনের কাউন্টার রিএকশন। মুসলিম লীগের খোরশেদ-এর বাড়িতে মুক্তি আক্রমণ। চরম প্রতিশোদের ভয়ে খোরশেদ সাহেব পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। অগতির গতি রক্ষায়, পরবর্তীতে আত্মসমর্পণ করেন। এমনি করে বাড়ি-ঘর ছেড়ে বহুত শরণার্থী পরিবার বিল বাওড়ে আশ্রয় নেন। তাঁদের ওপরও নেমে আসে ডাকাতির নগ্ন হামলা। যতদোষ নন্দঘোষের মত সব ডাকাত নাম ভাঙ্গায় হেমায়েতের। রাতের অন্ধকারে "হেমায়েত ভাই চেইন টানেন" শব্দটি বলে দুর্বল জন-গোষ্ঠীর পরিবারগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা বিচূর্ণ করে দেয়। অবস্থার মূল্যায়নে সরলপ্রাণ গ্রামীণ জনতা ভীষণ বিব্রত যে মুক্তিযোদ্ধা এলাকায় পদার্পণ করেই কোটালিপাড়া থানা ডাক বাংলোয় আটক আওয়ামী লীগের সদস্যদের উদ্ধার করে। যে যোদ্ধা ঝুঁকিতে থানা

দখলে চমক লাগায়। সে কিনা ডাকাতি করে? এমনি বিদঘুটে প্রশ্নে আক্কেলমান-বুদ্ধিমানরা ভাবনার অতলে! এলাকার লোকজন চোর-ডাকাত-লুটেরা বাহিনীর আতংকে সন্ত্রস্ত। হেমায়েত তাঁর গুটিকয় মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বিপর্যয়ের মুহূর্তের বিপাকে পড়ে। চারিদিকে সাধারণ মানুষের মরণ কান্না। কে কোথায় পালাবে না শরণার্থীর খাতায় নাম লিখাতে ভারতে যাবে, না দিকবিদিক স্থান পরিবর্তনে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। বহু ভেবে চিন্তে বহুতর গ্রামের কিছু সাহসী লোকজন হেমায়েতের সাথে যোগাযোগ করেন। হেমায়েতও চোর-ডাকাত আর লুটেরা বাহিনীকে চমক লাগাতে এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে ঝটিকা সফর শুরু করেন যাতে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে আসে। হেমায়েত এলান করে দেন, "এবার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, আগে স্থানীয় চোর-ডাকাত-লুটেরা ধ্বংসের যুদ্ধে নিয়োজিত হলাম, তার পর হবে মুক্তিযুদ্ধ।" মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন চোর-ডাকাতকে গুলি করে হত্যা করে জনগণকে দেখাতে হয়েছে মুক্তিবাহিনীর সুবিচারের নমুনা। ফলে অতিদ্রুত গণ আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং এর সুফলে মুক্তিযুদ্ধ বেগবান হতে থাকে। রাতের আঁধারে মেশিনগানের চেইন টানা, ডাকাত আজ জনতা রক্ষার আগ কাতারে। কাজ দেখে গুণ বিচারের ন্যায় জনতা মুক্তিযোদ্ধা নেতা হেমায়েত-এর প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ। জনগণের যোগাযোগে মুক্তিবাহিনীর দল বাড়তে থাকে। এবার শুরু হয় চোর-ডাকাত ও অপরাধীদের বিচারের জন্য বোর্ড গঠন করে প্রশাসনিক কমিটিকে শক্তিশালী করার পালা। কোটালিপাড়া থানা এলাকাসহ পুরা এলাকার জন্য নারিকেল বাড়ি মিশনে শক্তিশালী প্রশাসনিক কমিটির বোর্ড গঠন করা হয়। চোর-ডাকাত দমনের জন্য গ্রামে গ্রামে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হয়। সে-সব ভলান্টিয়ার মুক্তিবাহিনীকে ছোট ছোট অস্ত্র দিয়ে শক্তিশালী করা হয়।

এমনিতর প্রশাসনিক বিন্যাসে হেমায়েত বাহিনীর দখলিকৃত এলাকার প্রশাসনকে সংহত করা হয়। প্রশাসনিক পর্ষদ নিজ নিজ এলাকার হেমায়েত বাহিনীর মুক্তাঞ্চলে প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝে উদয়াস্ত কাজ করে। হেমায়েত বাহিনীর দখলি এলাকার থানাগুলিকে একই প্রশাসনিক ধারায় সাজানো শুরু হয়। সুসংহত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় উপদ্রুত এলাকার মানুষের মনে আস্থা ফিরে আসে। নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে বিল-বাওড়ে আশ্রয় নেয়া বিভিন্ন এলাকার মানুষের মনে আস্থা ফিরে আসায় তারা নিজেদের গ্রাম গঞ্জে ফিরে আসে। চোর-ডাকাত-লুটেরা দমনে ভলান্টিয়ার বাহিনী বিশেষ তৎপরতায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা চোর-ডাকাত-লুটেরা ঠকবাজ ধরে ধরে নিয়ে আসেন প্রশাসনের কাছে। প্রশাসন জুরি বোর্ডের কাছে তাদের হস্তান্তর করে বিচারের জন্যে। বিচার বোর্ড আদ্যোপান্ত জেনেশুনে বিচারের রায়ের বিবরণ পাঠান উপদেষ্টা মণ্ডলী সমীপে। উপদেষ্টা মণ্ডলী বিচার রায়ের সঠিক মূল্যায়ন করে কার্যকর করার নির্দেশনার জন্য পাঠান বাহিনী প্রধানের কাছে। বিচারের রায় কার্যকর করার জন্য গঠিত হয় জল্লাদ স্কট। যার কমাণ্ডার ছিলেন শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ।

এ-ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো কোটালিপাড়া থানার মত হেমায়েত দখলিকৃত অন্যান্য থানায়ও গঠন করা হয়। সর্বত্রই অনুরূপ প্রশাসনিক পর্ষদ গঠিত হয় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে। এ-সব পর্ষদ হেমায়েত বাহিনীর নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তি ফিল্ডে কাজ করেছে।

এমনিতর ব্যবস্থাপনার বাইরেও ছিলেন বেশ কিছু সরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র যাঁরা কর্মস্থল ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। অনেকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শারীরিকভাবে নাজুক বিধায় তাঁদেরও বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয়। তাঁদের অনেকে গোয়েন্দাগিরি পর্যন্ত করেছেন। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে তারা খবরাখবর আনা নেয়া করতেন। গোয়েন্দাগিরির ঊর্ধ্বে সুপরামর্শ দিয়ে তাঁরা প্রশাসনকেও চাংগা করতেন। তাঁদের ক'জনের নাম ঠিকানা নিম্নে দেয়া হলো-

খোন্দকার মোঃ ইসমাঈল	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোঃ সাহাবউদ্দিন মিয়া	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
কবি গোলাম মোস্তফা	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
সৈয়দ আবুল হোসেন	কালকিনি, মাদারিপুর, ছাত্রনেতা
প্রফেসর আবদুল হালিম	রামদিয়া কলেজ, গোপালগঞ্জ
মানিক মিয়া	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
গণেশচন্দ্র হালদার	শশিকর কলেজ, কালকিনি, মাদারিপুর
বাবু দ্বিজেন ঘট	বাসাইল, গৌরনদী, বরিশাল
অধ্যাপক সুশীল কুমার কর	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর
মাস্টার বাবু লক্ষীকান্ত বল	কোটালিপাড়া গোয়েন্দা বাহিনী গঠনে প্রথম উপদেষ্টা
মাস্টার আনোয়ার হোসেন	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ছাত্রনেতা
শেখ আনোয়ার হোসেন চুন্নু	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ছাত্রনেতা
শেখ সেকান্দর আলি	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
ডা. সুনীল মজুমদার	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
ডা. বকুল মজুমদার	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
ডা. রঞ্জিত ব্যানার্জি	পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, গৌরনদী।

হেমায়েত বাহিনীর গোয়েন্দা কাজ নানা পেশার লোকের অবদানে ধন্য। ডাক্তারের পেশায় তাঁদের বিভিন্ন গ্রামে যেতে হয়। পেশার আড়ালে তাঁরা গোয়েন্দার কাজটি বেশ ভালভাবেই করতেন। গোয়েন্দারা সরাসরি বাহিনী প্রধানকে তাঁদের রিপোর্ট প্রদান করতেন।

মন্টু দাসগুপ্ত ও রাফায়েল বেপারিসমন্বয়ে গঠিত মুক্তি গোয়েন্দা টিম যথানিয়মে সকলের অগোচরে তাঁদের কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। এমনসব দায়িত্বসচেতন কাজ নিয়মমাফিক সম্পাদিত হবার ফলে হেমায়েতবাহিনী অতি অল্পসময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার সাফল্য অর্জন করে।

'দি লয়েল সান' পত্রিকার ব্রিটিশ সাংবাদিক মি: লরেন্স একজন দোভাষীর মাধ্যমে হেমায়েতের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন ৪ঠা আগস্ট, ১৯৭১. স্থান কোটালিপাড়ার সিদ্ধির মৃধার বাড়িতে অবস্থিত হেমায়েত বাহিনীর রানিং (চলমান) হেডকোয়ার্টারে। অকুস্থলে সকলের উপস্থিতিতে ভূগর্ভস্থ অস্ত্রাগার দেখে লরেন্স বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেনঃ "এত অস্ত্র পাচ্ছেন কোত্থেকে?" হেমায়েতের তাৎক্ষণিক জবাব ঃ "দখলদারবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে এই অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়।" সাংবাদিকদের ভিন্নতর প্রশ্নের জবাবে বাহিনী প্রধান বলেন ঃ "এই যুদ্ধ যদি দীর্ঘ মেয়াদি হয় এবং বিশ বছরও লাগে তবু আমার অস্ত্রের অভাব হবে না। এমনকি আমার বাহিনীর অস্ত্রের জন্য পরদেশ মুখাপেক্ষীও আমাকে হতে হবে না। এ-জন্যই জহরের কান্দি হাই স্কুলে ট্রেনিং সেন্টার ও নারিকেল বাড়ি মিশনে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।" এ-সব ব্যবস্থাদি দেখে এবং বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর শুনে বিদেশী সাংবাদিক মন্তব্য করেন ঃ "অবশ্যই বাংলাদেশ স্বাধীন হবে।"

হেমায়েত বাহিনীর সৈন্যরা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বহুতর উপায়ে অস্ত্র-গোলাবারুদ পারাপার করতো। ধান কাটার মওসুমে নৌকায় অস্ত্র রেখে ধান কাটতো নিজেরাই। বাহিনী প্রধানের আফসোস, নয় মাসেরও কম সময়ে দেশ স্বাধীন হওয়ায় আসল-নকল-মেকি, দৃঢ় আস্থা-বুজদিল মুক্তির যথাযথ মূল্যায়ন হবার সুযোগ হয়নি। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মেধা ও উচ্চতর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হাজির হয়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কমে আসতে থাকে। অনেক বুদ্ধিজীবী-আমলা-সরকারি কর্মকর্তা-অধ্যাপক দখলদার অঞ্চলে কাজে যোগ দেন। বিদেশের শরণার্থী জীবনের জামাই আদর তাঁদের ভাল লাগেনি। এমন কি অনেক নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিও দখলদার এলাকায় চলে এসে পাক আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সহায়-সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে দেখানো বিভিন্ন অজুহাত হয় তো একেবারে মিথ্যা নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ত্যাগের মনোবলের অভাব। এমনি এক জীবন্ত প্রমাণ সাতক্ষীরার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি আবদুল গাফফার। তাঁর স্ত্রীর চ্যারিটা, তাঁর গাড়িটা ধরনের সব যুক্তিই সত্য। তাঁর আত্মসমর্পণে যাবার যাত্রাপথের সময়-নিশানার তথ্যনিষ্ঠ সব খবরই অত্র লেখক-গেরিলার কাছে পূর্বাহ্নেই পৌঁছে যায়। কারণ, সাতক্ষীরা সীমান্ত ছিল অত্র লেখক-গেরিলার যুদ্ধ এলাকা। ঊর্ধ্বতনের সকল নির্দেশ সজ্ঞানে এড়িয়ে গেলেন লেখক। কারণ, মুক্তিযোদ্ধার আসল শত্রু পাক-আর্মি, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির গায়ে হাত দেয়া একজন যোদ্ধার যুদ্ধ-কার্যক্রমের বাইরে। এমনি বহুতর উদাহরণ আছে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের পুরোধা আওয়ামী লীগ নামের রাজনৈতিক দলের। কারণ সাতক্ষীরার সেই নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি আওয়ামী লীগের টিকেটে ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী হন। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘ মেয়াদি হলে হেমায়েত বাহিনীও বাংলার মাটিতে দৃঢ়তার সঙ্গে আস্থা ও বিশ্বাসের দৃঢ়ভরে যুদ্ধ

চালিয়ে অক্ষয় কীর্তির সুনাম অর্জন করতে পারতো। অভ্যন্তরীণ যোদ্ধাদের মূল্যায়ন আপন শক্তির বাহুবলে মেধার গণ-আস্থায় বাংলাদেশের ভিতরে পাক আর্মির রাহুগ্রাস ও দো'আঁশলা তাঁবেদার দালাল মুক্ত স্বাধীন-মুক্তাঞ্চল গঠনের মাধ্যমে। অভ্যন্তরীণ যোদ্ধাদের আত্মত্যাগী শৌর্যের পরাকাষ্ঠায় ভারতীয় হাজি মুক্তি ও মিত্র বাহিনী বিদেশ থেকে এসে বাংলার মাটিতে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। যোদ্ধা গ্রুপ সবাই যদি একযোগে ভারতের আঁচলের আড়ালে আশ্রয় নিতেন, কে জারি রাখতো দখলদার দেশে মুক্তিযুদ্ধ! বরং ঘরে ঘরে সৃষ্টি হতো পাকিস্তানি দালাল নামে নতুন এক মহাজাতি যারা সর্বত্র সগৌরবে উড়াতো পাক পতাকা। তেমনি পরিস্থিতিতে মুক্তি আর মিত্ররা ভারত থেকে এসে হুড় হুড় করে ঢুকে রাজধানী ঢাকা দখল করতে পারতেন না। পাকিস্তানিদের পরিকল্পনা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় লোকজন দিয়ে রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী বানিয়ে সাচ্চা দিল পাক ফৌজ দিয়ে নিরাপদে পাক সেনানিবাসে রাজত্ব করবেন। তাদের সে পরিকল্পনার বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ মুক্তিরাই ছিল পাকিস্তানিদের বড় শত্রু। পাক মদদে স্থানীয়ভাবে দালাল সৃষ্টি হলেও দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট মুক্তি-গেরিলাদের ভয়ে এসব স্থানীয় দালালদের থাকতে হয়েছে পাক আর্মির ঘাঁটিতে। দালাল বাহিনী গ্রামে এসে তাদের প্রতাপ দেখিয়ে সংগঠিত হতে পারেনি। কারণ, অদৃশ্য মুক্তি আতংকে তারা ছিলেন নিজেদের জীবন রক্ষায় পাক প্রভুর অনুগ্রহের দাস। পাকিস্তানি দালাল প্রধান এ্যাডভোকেট সরাফত হোসেন চৌধুরী। তাঁর সংগে সব সময়ে থাকত শ'দুই রাজাকার। স্থানীয় রাজাকারদের সবার বাড়িই কোটালিপাড়া থানা এলাকায়। মুক্তির ঠেলার গুঁতোর তোড়ে তারা এলাকা ছেড়ে পাক আর্মির ঘাঁটিতেই আশ্রয় নিয়েছিল স্বাধীনতার ন'মাস। পাক সমর্থক-রাজাকার-দালালির অভিযোগে তাদের বাড়িঘরও মুক্তিরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে। শরাফত হোসেন চৌধুরী সহ সে-সব পাক দোসর বর্বরেরা ন'মাস বাস্তুভিটা ছেড়ে পাক ঘাঁটিতেই ছিলেন। এ-কোন বিচ্ছিন্ন বিরল ঘটনা নয়। বহুল সংবর্ধনার পরীক্ষিত আওয়ামী নেতা এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির পক্ষেও এমন জঘন্য পাক দালালির নজির আছে।

মুক্তিযুদ্ধের ছোটবড় ফিল্ড কমান্ডারগণ যেমন গণযুদ্ধে তাঁদের জাতভাই প্রতিবেশী আত্মীয়দের ক্ষমা করে তাঁদের স্ত্রীদের বৈধব্য ও সন্তানদের এতিম হবার হাত থেকে বাঁচিয়ে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। এককালে অনুপস্থিত ও পরবর্তীতে স্বদেশে উপস্থিত রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু করুণাসিন্ধুর মহিমায় মুক্তিযুদ্ধের সকল দায়দায়িত্ব মাথায় নিয়ে সকলকে ক্ষমা করেন। যেমন জাপান সম্রাট পরাজিত জাপানি আর্মির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সকল দায়দায়িত্ব মাথায় করে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। শেখ মুজিবকেও তাই করতে হলো।

স্বাধীনতার লগ্নে হৃদয় ঔদার্যে প্রতিহিংসা পরিহার করেন হেমায়েত। যুদ্ধাপরাধী দালালদের ধরে ধরে জেলে পুরা হয় পরবর্তী বিচারের জন্য। হাতে পেয়েও কাউকে

প্রাণে মারা হয় নি। তবে তাদের পাশা উল্টালে মুক্তিরা পরাজিত হলে বিজয়ী বর্বর প্রতিপক্ষের হাতে মুক্তি নিধন ছিল অবধারিত। তারা দুধের শিশুকেও রেহাই না দিয়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে বাংলার মাটিতে।

হেমায়েত বাহিনীর গঠন, বিস্তার, প্রসার, সাংগঠনিক কাঠামোর সাফল্য, বিজয়, সুনাম, দুষ্টের দমন জাতীয় শৌর্য যতই বাড়ছে পরশ্রীকাতরতায় স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর মিত্র ততই কমেছে। হেমায়েত অঞ্চল তিন সেক্টরের অধীন-২, ৮ ও ৯ নং সেক্টর। তাঁর দোর গোড়ায় ৮ ও ৯নং সেক্টরে তাঁর বিরুদ্ধে গিবতের পাহাড় জমে ওঠে। প্রবাসী সরকারের কান ভারি করতে লাগেন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। সব রহস্যের একই সওয়াল ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব না অন্য কারও হাতে চলে যায়। হায় রে পরশ্রীকাতরতার শিকার বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত! সবকিছুর ফলশ্রুতিতে হেমায়েতের বিরুদ্ধে একাধিক পক্ষের তদন্ত হয়ে যায়, তবুও সাধ মেটে না অনেকের।

হেমায়েতের বিরুদ্ধে তদন্ত

অভ্যন্তরীণ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ঃ ভারতীয় গোয়েন্দার 'র'-এর ট্রেনিং, মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং, গেরিলা ট্রেনিং, নিয়মিত-অনিয়মিত মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং, মস্কো বাহিনীর কমিউনিস্ট গ্রুপের ট্রেনিং জাতীয় নানা মুনির নানা মত ও পথের সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধায় তখন ভরপুর দখলদার বাংলা। ভারত ফেরতাদের হামবড়া ভাব। তারাই একমাত্র খাস মুক্তিযোদ্ধা। আর সব ফালতু। দেশের নিরস্ত্র অসহায় জনতাকে সশস্ত্র শত্রুর তোপের মুখে ফেলে ভারতে ভাগোড়াদের চক্ষু লজ্জার শরম থাকা উচিত। অসহায় জনতাকে বাঁচানোর কোনই ব্যবস্থা তারা করতে পারেন নি। তখন অভ্যন্তরীণ যোদ্ধারাই মুক্তিযুদ্ধ জারি রেখেছে। ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলা গ্রুপ অভ্যন্তরীণ যোদ্ধাদের কল্যাণেই দেশে ফিরে ঠাঁই পেয়েছে। তাঁদের অনেকে যুদ্ধ প্রশিক্ষণের মন্ত্রণা কাজে লাগান ব্যক্তি-স্বার্থ উদ্ধারে। পরের শেখানো বুলি, বাংলাদেশের ধ্বংসের কাজে লাগাতে বাধ সাধে অভ্যন্তরীণ যোদ্ধারা। বাংলাদেশ একটি শত্রু এলাকা-এই ধারণাটিই ভুল। এখানে 'অস্বাভাবিক অবস্থার সন্ত্রাস সৃষ্টি করলে পাকিস্তানি আর্মির পতন হবে' ভাবনার মত যুদ্ধ কৌশল একটি মারাত্মক ভুল ছিল। কার পাপে কাকে শাস্তি! যে জনতার সুখ স্বাচ্ছন্দ ও ভালবাসার ওপর মুক্তির অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তাদের শত্রু ভাবার কোন কারণ নাই। এখানেই দেশী মুক্তি ও বিদেশী মুক্তিতে গুণগত পার্থক্য।

স্বার্থপর লুটপাট গ্রুপ হেমায়েত-এর চোটপাটে তটস্থ। মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যায়ের শাস্তি হয় আর্মির কায়দায়। অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে বিচার করা হয়। অন্যায়ের প্রতিকারে লক্ষ্যে তাদেরকে আবার ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। স্থানীয় লুটেরা গণদুশমনদের

প্রতি মানুষ মারমুখী। দেশের মানুষ তাদের গ্রহণ করছে না। সে-কারণে দলে দলে তাদের আবারও ভারত যাত্রা করতে হয়। তারা ভারতে গিয়ে মুজিবনগর সরকারের কাছে হেমায়েত বাহিনী ও বাহিনী প্রধানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়, ভারতীয়দের বলে হিন্দু নিপীড়ণের কাল্পনিক কাহিনী। মেজর জলিলের এলাকা বিধায় তার কানেও ঢালে লোমহর্ষক বিষ। প্রতিকারে তদন্ত ব্যবস্থা করে তখনকার যথা-কর্তপক্ষ।

মুজিব নগর সরকার তদন্ত ঃ ফরিদপুর সাব-সেক্টর কমান্ডের দায়িত্বে আসেন ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ (বাবুল)। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খ্যাত। প্রবাসী মুজিব নগর সরকারের পক্ষ থেকে তিনি বিষয়টি তদন্ত করেন। এ-কাজে তিনি সরাসরি হেমায়েত বাহিনী হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হন। হেমায়েতের সাথে তাঁর সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। হেমায়েত প্রস্তাব রাখেন ঃ "আপনার জন্য হেমায়েত এলাকা ও তার বাহিনীর দ্বার উন্মুক্ত। আপনি যেখানে যখন খুশি যাবেন। যা খুশি তাই দেখবেন। যাকে খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যে কোন অভিযোগের তদন্ত করে নিজের সিদ্ধান্তে আসবেন।" নূর মোহাম্মদ ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত শেষ করেন। হেমায়েত বাহিনী তৎপরতায় তিনি দারুণভাবে খুশি। ভারত থেকে আগত সশস্ত্র গেরিলা গ্রুপের লুটপাট বন্ধে হেমায়েত উদ্দিনের ত্বরিৎ সাহসী কার্যক্রমের জন্য প্রশংসা করেন। তাদের নিরস্ত্র করে আত্মসমর্পণ করানোর জন্য ধন্যবাদ দেন। ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ 'হেমায়েত বাহিনী ও বাহিনী প্রধান'-এর মত নিবেদিত প্রাণ বীর যোদ্ধার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্বক তাঁর তদন্ত রিপোর্ট মুজিব নগর সরকারকে জমা দেন। রিপোর্টে তিনি আরও লেখেন ঃ "হেমায়েত বাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলা গণকল্যাণে আদর্শ স্থানীয়।"

মেজর জলিল-এর তদন্ত ঃ বাড়িঘর ছেড়ে বাঙালি হিজরত করলেও পারস্পরিক ঝগড়া দেশে রেখে যায় নি, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে পৈতৃক অভ্যাস ও খাসিয়ত। বিদেশের মাটিতে বসেও বাঙালির কুৎসা রটনা কমে না। ৯ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের নিকট হেমায়েতের বিরুদ্ধে রিপোর্টের পর রিপোর্ট দাখিল হতে থাকে। কারণ তাঁর এলাকাতেই মূলত হেমায়েত বাহিনীর কার্যক্রম। সেক্টর কমান্ডার হিসাবে মেজর জলিলকে তাঁর এলাকার দায়িত্ব বহন করতে হয়। ভারতের মাটিতে বসেও সেক্টর কমান্ডারদের বাংলাদেশের ভিতরের সকল অঘটনের জন্য দায়ী হতে হয়। এতসব চাপের মুখে পড়ে বাধ্য হয়েই হেমায়েতকে নাস্তানাবুদ করে শাস্তি দিতে তিনি পাঠান ক্যাপ্টেন শাজাহান ওমরকে।

বরিশাল প্রথম মুক্তি ক্যাম্প দরগাহ বাড়ি বড়কোঠা থেকে ওমরের চরম পত্র, "মিঃ হেমায়েত আপনাকে চূড়ান্ত নোটিশ। আপনি আপনার সমস্ত লোকজন নিয়ে তিনদিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করবেন। অন্যথায় আপনাকে আত্মসর্ম্পণে বাধ্য করা হবে।" স্থির গাম্ভীর্যে চরমপত্র গ্রহণ করেন হেমায়েত। উপদেষ্টা কমিটির সভা ডাকেন তিনি। আলোচনার পর নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নোটিশের জবাব দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যে কোন উপায়ে ভুল বুঝাবুঝির অবসান চাই। অন্যথায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্তর্কলহের হানাহানির রক্তপাতের যুদ্ধ শুরু হবে। এতে লাভ হবে স্বাধীনতা

বিরোধীদের, ক্ষতি হবে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলার অগণিত স্বাধীনতাকামী মানুষের। উপদেষ্টা কমিটির পক্ষ থেকে টিম যাবে ক্যাপ্টেন ওমরের কাছে। সমন্বয় কমিটিতে থাকবেন মাদারিপুরের এম পি আসমত আলি খান, উজিরপুরের এম পি হরনাথ বাইন ও অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। উজিরপুর থানার বড় কোঠা দরগাহ বাড়িতে ক্যাপ্টেন শাহজাহান (ওমর ছদ্মনামে) প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করেন। শাহজাহান ওমরের পত্রটি হেমায়েত পৌঁছে দেন এম.পি. হরনাথ বাইন এবং এম.পি. আসমত আলি খানের হাতে। ভিতরে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতকে সতর্ক করার ব্যাপারের চাক্ষুস প্রমাণে তাঁরা অগ্নিশর্মা। 'ধৈর্যং রহু' হেমায়েতকে বিজয় এনে দেয়। হেমায়েতবাহিনী প্রধান নির্দোষ প্রমাণিত হলে ৯ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল তাঁকে নায়েব সুবেদার থেকে পরবর্তী উচ্চতর 'সুবেদার' পদে পদোন্নতি দেন।

হেমায়েত-এর তরফ থেকে উপদেষ্টা পর্ষদ যাত্রা করেন ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর-এর ক্যাম্প বরিশালের বড়কোঠা। হেমায়েতবাহিনীর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সতর্কতার অংশ হিসেবে সুইসাইডেল স্কোয়াডের তিন শত পঞ্চাশ জন সশস্ত্র যোদ্ধার একটি গ্রুপ দ্বারা বড়কোঠার আশেপাশে টেকটিক্যাল অবস্থান গড়ে তোলা হয়। যে কোন মূল্যে নেতার জীবন রক্ষার প্রতিজ্ঞায় আত্মসমর্পিত সুইসাইডেল দলের একটি ক্র্যাক প্লাটুন সদা প্রস্তুত হেমায়েতের সাথে। যদি ক্যাপ্টেন শাহজাহান অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে খামখেয়ালিপনার আশ্রয় নেন তবে অভ্যন্তরীণ যোদ্ধার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে স্বাধীনতার নামে রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে ফয়সালা হবে। তবে এর আগে যে কোন মূল্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আপোষ ফর্মূলায় যাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চলবে। সর্ব প্রযত্নে চরম উস্কানির মুখে ধৈর্যধারণে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

শান্তির অন্বেষণার বৈঠক। সম্ভাব্য সময় সেপ্টম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। সমর নীতির সাথে প্রাজ্ঞ ধীশক্তির ঝানু রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেন ওমর। দুজন এমপির সমাবেশ ঘটেছে হেমায়েত-এর উপদেষ্টা পরিষদে। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ও পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত সমাদরে বরণ করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নিজের রূঢ়তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। গণপ্রতিনিধির উর্ধ্বে কারো বক্তব্য নেই। তদন্ত কর্মকর্তা হেমায়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বার্থবাদী মহলের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কুৎসা রটনার অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্যের পরিচয় পেলেন। দুদলে ঘন্টাখানিক প্রাণখোলা বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক ক্যাপ্টেন ওমর প্রত্যক্ষ তদন্ত ও সরাসরি আলোচনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বরিশাল অঞ্চলের সাব-সেক্টর কমান্ডার ওমর মুজিব নগর সরকার ও ৯ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের পক্ষ থেকে হেমায়েত বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান। হেমায়েত উদ্দিনের প্রতি তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। উভয় পক্ষ সাধারণ শত্রু পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করেন। স্ব স্ব এলাকায় পূর্ণোদ্যমে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অঙ্গীকার ঘোষণা করেন দু'জনে মিলে।

উপরের স্তরে সমঝোতা হওয়ায় গেরিলাদের অশান্তি ও অন্তর্কলহ এখন একেবারে শান্ত। এবার দায়িত্ববান গেরিলাদের অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার মুক্তিযুদ্ধ আরো জোরদার, বেগবান ও গতিশীল হয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় যুদ্ধের রূপ নেয়। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধ এখন আর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের যুদ্ধ নয়, দলমত নির্বিশেষে সর্বাত্মক জাতীয় যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মির নাভিশ্বাস উঠে যায়। একমাত্র সদর রাস্তা ছাড়া পাকিস্তানি আর্মি নামার আর পথ নেই। মাঝে মাঝে সড়ক ব্রিজে রাজাকার প্রহরায় থাকে মাত্র। বরিশাল-ফরিদপুর প্রধান সড়ক ব্রিজ মোস্তফাপুর, ইল্লা, সাউদ প্রভৃতি স্থানের ব্রিজ পাহারায় রাজাকারগণ সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে সমন্বয়ের যুদ্ধের এটাই সুফল।

কয়েকজন ডাকাত ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধা

ভূমিকা : দেশটা সকল শ্রেণীর মানুষের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দেশের সকল পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। ৯ মে, ১৯৭১; কোটালিপাড়া থানা দখলের মাধ্যমে হেমায়েতউদ্দিনের বিজয় রথের জয় যাত্রা। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার মত এদেশে বীরপূজারীর অভাব নেই। দুর্ধর্ষ ডাকাত ধরনের বেশকিছু লোক সদিচ্ছায় হেমায়েত বাহিনীতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং পরবর্তীতে তারা তাদের আসল ও আদি অ-মনুষ্যোচিত চিত্রে আবির্ভূত হন। এখানে তাঁদের ক'জনের খাস চিত্র :

১। সাহেব আলি ঃ আর্মির সদস্য সাহেব আলি। যুদ্ধের কৃতিত্বের গুণে তিনি গ্রুপ কমান্ডার পদে উন্নীত হন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি তাঁর মূল চরিত্র ডাকাতের পেশায় চিহ্নিত হয়ে যান। আচার-আচরণে তাঁর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী কাজের প্রমাণ পাওয়া গেলে এবং এক-পর্যায়ে ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে বাহিনীর জুরি বোর্ডের বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে তা কার্যকর করা হয়।

২। আবুবক্কর ঃ গোপালগঞ্জ থানার আবুবক্কর যুদ্ধকালীন স্বাভাবিক যোগ্যতার পরিচয় দেন। দেশ স্বাধীনের সুমহান ব্রত নিয়ে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধ করে যেন তাঁর মহত্ত্বও শেষ। হায় দুর্ভাগা স্বাধীন দেশ! একজন স্বাধীনতা যোদ্ধা অবলম্বনের জন্য কোন মহতী কাজ না পেয়ে অবশেষে ফিরে যান তাঁর প্রাক্তন পেশায়।

৩। শামসুল হক কাজি ঃ যতদিন যুদ্ধ চলেছে সব ভুলেছিলেন যুদ্ধের নেশায়। যুদ্ধ শেষে ক্ষুব্ধ আবেগে পুরনো পেশার আকর্ষণে মরীচিকায় মায়াভ্রমে ঘুরলেন বেশ কিছু দিন। ডাকাত সৈনিকদের বিজয়ীর হাত খুনের নেশায় ঘৃণা ধরলো। বীর পিতার ঔরসে জন্ম নিল এক সুলক্ষণা মেয়ে। চিত্র জগতে নেমে পিতাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনেন তিনি। পিতার সংসারের হাল ধরেছে মেয়ে। দর্পিতা মেয়ের ক্ষোভ, বাবা

মুক্তিযোদ্ধার হাতে কি ডাকাতির অস্ত্র মানায়? কন্যা ভাগ্যে এক কালের ডাকাত মুক্তিযোদ্ধা আজ সুস্থ জীবনে ভোগ করছে অনাবিল শান্তি।

৪। মুজিবুর রহমান ঃ মুক্তিযুদ্ধের উন্মাদনার শত্রু মারার নেশায় স্বাধীন দেশে তিনি মানুষ মারা শুরু করেন। ডাকাতের পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না। চারিত্রিক বিচ্যুতির বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। পুনর্বিচারে যুদ্ধের প্রয়োজনে তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করা হয়। সাহসী যোদ্ধার সুবাদে তিনি প্রাণে রক্ষা পান। কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না –স্বাধীন দেশে তিনি তাঁর খাসলত ভুলতে পারেন নি। এ-দেশ তাঁকে মহত্ত্বর বিশেষ কিছু উপহার দিতে পারে নি। হায় দুর্ভাগা দেশ!!

৫। ঠাণ্ডা মিঞা ঃ ঠাণ্ডা মিঞা ডাকাত ঠাণ্ডা মাথায় যুদ্ধ করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। স্বাধীন দেশের বেহিসাব স্বাধীন পেশা প্রাক্তন ডাকাতিতে আবার হাত পাকায়। চোরের দশদিন গৃহস্তের এক দিনের মত তিনি একদিন ধরা পড়ে শ্রীঘরে আটকা পড়েন। মার্ডার কেসে জেল খেটে তাঁর মোহমুক্তি ঘটে। বর্তমানে তিনি সুস্থ এবং মুক্ত-জীবনের সাধ নিচ্ছেন।

৬। শহর আলি চোরা ঃ যুদ্ধের ময়দানে সাহস, বুদ্ধি ও দৃঢ়তার গুণে গ্রুপ কমান্ডারের পদ পান শহর আলি। বীরোচিত আত্মোৎসর্গীকৃত যুদ্ধ প্রেরণায় তাঁর জুড়ি মিলতো কম। যুদ্ধ কৃতিত্বের মূল্যায়নে তিনি বীরত্বব্যঞ্জক পদকের যোগ্য। যে কোন মানদণ্ডে তাঁকে ন্যূনপক্ষে বীর প্রতীক খেতাব দেয়া যেত। 'কাজের বেলা কাজি কাজ ফুরালে পাজি'র মত কে রাখে তার খবর। মুক্তিযুদ্ধে নিজের অবদানের মূল্যায়ন না পেয়ে স্বাধীন দেশের উল্টা স্রোতে তিনি গা ভাসালেন। গৌরবদীপ্ত যোদ্ধা ঘৃণ্য ডাকাতির পুরনো পেশায় মাতলেন। সব কিছুর বিনিময়ে যে মুক্তিযোদ্ধাদের জনতা পেলেছে আজ তাদের ডাকাতের ভূমিকায় দেখে তারা মর্মাহত। যুদ্ধকালীন কমান্ডার হেমায়েত তাঁকে সুস্থ জীবনে আনার চেষ্টা চালান। ১৯৭৪ সালে শহর আলির নিকট থেকে একটি স্টেনগান, দুটি ম্যাগজিন, দেড়শ রাউন্ড গুলি ও অন্যান্য অস্ত্রাদি উদ্ধার করেন হেমায়েত। সে সময়ের স্থানীয় সি আই ডি এস পি আবদুল রাশেদের নিকট উদ্ধারকৃত অস্ত্র জমা করে যোদ্ধাকে সুপথে আনতে ব্যর্থ হন। অকস্মাৎ একদিন জনতা তাঁকে ধরে ফেলে এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তে দুটি চোখই উপড়ে ফেলেছে। ভবি ভুলবার নয়; চোখ হারিয়ে তিনি চির অন্ধ।

এক কন্যার সাহায্যে পাথর বেচে যায় তাঁর দিন। পাপ বাপকেও ছাড়ে না-এর অধ্যায় স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর সমাচার। আজমিরে খাজা বাবার দরবারে আসা যাওয়ার মাধ্যমে অধুনা তিনি পাপ স্খালনের কোশেষ করছেন। হায়রে কপাল!

৭। ইউসুফ ঃ বরিশাল গৌরনদী এলাকার পাঁচজন ডাকাত সহযোগীদের সঙ্গে এসে হেমায়েত-এর পতাকাতলে একত্রিত হন ইউসুফ। যুদ্ধ উন্মাদনার উদ্যাম গতি ও সাহসের খ্যাতির আলোকে গ্রুপ কমান্ডার পদে উন্নীত হন তিনি। মুক্তি কমান্ডার ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে প্রথমে দুটি মাস ছিলেন নিবেদিত

প্রাণ যোদ্ধা। অচিরেই পুরনো পেশা ডাকাতির প্রতি আবার তিনি নজর ফিরান। বিড়ালের শুটকি প্রেমের মত মুক্তিযুদ্ধের ক্ষণস্থায়ী প্রেম উবে গেল।

আগৈলঝাড়া থানায় ডাকাতির সংবাদ কমান্ডার-এর কানে আসে। বরিশাল জেলার গৈলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-এর বাড়িতে তাঁকে অপারেশনে পাঠানো হয়। হায়! সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য বিরোধী কাজে তিনি ঝুঁকে পড়েন। তিনি চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিনকে গুলিতে হত্যা এবং তাঁর কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে ধর্ষণ করে মুক্তিযুদ্ধকে কালিমা লিপ্ত করেন।

এবার ডাকাত-মুক্তির বিচার। যে যতবড় মুক্তিযোদ্ধাই হোক কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। প্রকাশ্য বিচারে ডাকাত গ্রুপের অন্যদের শিক্ষণীয় নজিরের কষ্টকর ঘৃণ্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা প্রেমের হারানো ইউসুফ যেন আর কেনানে ফিরে না আসে তারই ব্যবস্থা। পাপী অপরাধীর অর্ধাংশ মাটিতে গুঁজে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর এক সহযোগীকেও একই পাপের প্রায়শ্চিত্যের ভাগী হতে হয়। তাঁর পাপের অপর তিন সহচর পালিয়ে রক্ষা পান।

৮। আবুল তাহের ঃ বরিশাল, উজিরপুর, বিল্লোগ্রাম অঞ্চলের বারজন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ডাকাত সহযোগী নিয়ে আবুল তাহের হেমায়েত বাহিনীতে যোগ দেয়। কাজ ও ব্যবহারে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের পর তিনটি রাইফেল নিয়ে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাঁড় ডাকাতের চোখের চাহনি যেন দলনেতার বিশ্বাসে ফাটল ধরায়। দলনেতা হেমায়েত উক্ত ডাকাত গ্রুপকে গোয়েন্দার কড়া দৃষ্টিতে রাখেন। ইউসুফের শাস্তি দেখে তাঁর যাত্রা নাস্তি। তিনি ভাবলেন বাবারে বাবা হেমায়েতের কেয়ামতের আগুনের জ্বালার পোড়া বড় কঠিন। ইউসুফের মাটিতে অর্ধ পোঁতা মৃত্যু। আমার দেশ প্রেমের বড় বড় বুলির বদলায় ভাগ্যে যে কি আছে আল্লায়ই জানেন। আমি ধরা পড়লাম কিরে? থাক দেশ উদ্ধার। এবার প্রাণে বাঁচলে বাপের নাম। ডাকাত গংয়ের 'যো গতি পলায়তি।'

আহারে কেমন বাহারের ডাকাত তাহের। অনিন্দ্য কান্তির সুন্দর চেহারা মোবারকের তাঁর বিশাল বপুর ওজন তিন মনের অধিক। বাস্তবেই তাঁর সেনানায়ক মার্কা মানানসই বীরোচিত চেহারা। পাকা ঘু ঘু কাঁচা কাম করতে চান না। তাই দলে ভিড়ান আর্মির সিপাই কাঞ্চন আলিকে। 'একা রামে রক্ষা নাই আছে সুগ্রীব দোসর'-এর মত সেনা সাপলাই কোরের হাবিলদার আবুল হাশেমকে সাথী করে নেন। সে হাশেমও চেহারার জৌলুসে কম যান না। তারও পুরো ছয় ফুট লম্বার সার্থক সেনা নায়ক চেহারা। তাহের, হাশেম, কাঞ্চনের তিনজনই রাগ জিদ জোশের যোশেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। রাজার দোষে রাজ্য নষ্টের মত নেতা তাহেরের দোষে মুক্তিযোদ্ধার গৌরব থেকে তাঁরা বঞ্চিত। পুরাটা মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিরোধী গর্হিতকৃত নিজেদের পাপ চরিত্রে লিপ্ত ছিলেন। একবার মুক্তিযোদ্ধার ছাপ মারা ডাকাত গঙের মুক্তিদেরও জনতা মুক্তিযোদ্ধাই ভাবতো। সুপ্ত গেরিলার গুপ্তবাহিনীর কাজের এমনই নমুনা। স্বাধীনতার প্রয়োজনে এমনি কত না অন্যায়কে বরদাস্ত করেছে জনতা। মুক্তিযোদ্ধাদের অমিততেজা আত্মাহুতির যুদ্ধের তাঁরা চিরন্তন কালিমা।

কালান্তক কাল আজরাইল হেমায়েতের নাগালের আওতার বাইরে তারা সটকে পড়েন। আল্লাহর ইচ্ছায়ই যেন তারা যুদ্ধকালে রক্ষা পান। পাপের ফল কাউকে না কাউকে একদিন পেতেই হয়। দেশ স্বাধীনের সাথে সাথেই ভোল পালটে হাবিলদার হাশেম আবার আর্মিতে। কেউ তাঁর যুদ্ধকালের চারিত্রিক অধঃপতনের খোঁজ পান নাই। পাক পক্ষ ত্যাগী সকলকেই পাক অসহযোগী বা মুক্তিযোদ্ধা ভাবা হতো। সাপলাই কোরের হাশেম স্বাধীন বাংলায় সেনাবাহিনীতে যোগ্য সম্মান পেলেন। সুবেদার পদে তিনি অবসর নিয়েছেন। কাঞ্চন আলির মণিকাঞ্চন সংযোগের ডাকাতি শুরু। স্বাধীন দেশে ডাকাতির স্বাদ পেতে তাঁর বেশি দিন লাগে নি। ক্ষিপ্ত জনতার হাতে ধরা পড়ে তিনি চিরতরে পঙ্গু। মা যেমন তাঁর সুপুত্রদের সাথে কুপুত্রদেরও ভুলতে পারেন না। তেমনি এক কালের মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তীতে যতই অন্যায় করুক দেশ মাতা তাকে ক্ষমার চোখে দেখেছে। আশা একটাই তাদের রক্তে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তারা শোধরাবে। ঢাকার মোহাম্মদপুরে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাড়ি পান কাঞ্চন আলি। আল্লায় তাঁর সৎচরিত্রে বেশ স্বাচ্ছন্দ ফিরিয়ে এনেছেন। অন্যরা যদি এমনি শোধরাতেন।

৯। কুদ্দুস মোল্যা ঃ একাত্তরের মাঝামাঝি কুদ্দুস মোল্লা হেমায়েত বাহিনী প্রধানের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি নিজের পরিচয় ও জীবন বৃত্তান্ত জানিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর সাহস ও স্বদেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে হেমায়েত তাঁকে অস্ত্র ও গোলাবারুদে সজ্জিত করে তাঁর নিজ এলাকায় পাঠান যুদ্ধের জন্য। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সাহসিকতা রূপকথার গল্পের মত।

মুলাদির ডাকাত কুদ্দুস মোল্লার নামে আজো ত্রাসে কাঁপে সর্বজন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের অক্ষয় কীর্তির জন্য তিনি বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। সশস্ত্র যোদ্ধাদের মাধ্যমে তাঁর নেতৃত্বে সর্ব প্রথম মুলাদি এলাকায় লঞ্চ অপারেশন করানো হয়। জাত ডাকাত কিন্তু ডাকাতির লুণ্ঠিত ধন দৌলত নিঃস্ব দরিদ্র মেহনতি জনতার মাঝে বিলিয়ে দিতেন তিনি। ধনাঢ্য পিতার সন্তান কুদ্দুস মোল্লার দরিদ্র সেবার বিলাসের নৃশংসে ডাকাতি রূপকথার মত। পরাধীন আমলের তাঁর নেশার মত পেশা স্বাধীন দেশেও তিনি ভুলতে পারলেন না। মুক্তিযুদ্ধের উজ্জ্বল ইতিহাসের মানুষটি স্বাধীন দেশে আইনের শাসনে বিশ বছরের কারাবন্দি। পাপ মার্জনায় কারামুক্তির ছয় মাসের ব্যবধানে ১৯৯৩ সালে তিনি মৃত্যুর পরলোকে। আল্লাহই সকলের শেষ বিচারের মালিক।

১০। জাহাঙ্গীর বাহাদুর ঃ সরূপকাঠি থানার জাহাঙ্গীর বাহাদুরের আসল রূপ কিন্তু ডাকাতের নয়। হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর মুক্তিযুদ্ধ হয়। একাধিক যুদ্ধে তিনি সাহস ও বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন যা সহযোদ্ধারা চিরদিন স্মরণে রাখবেন। স্বাধীন দেশে মহৎ ও উজ্জ্বল কিছুর সন্ধান না পেয়ে ডাকাতির ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হন। তাঁর পাপের পরিণামে এলাকার অন্যান্য মুক্তিদের লজ্জায় মুখ দেখানো দায় হয়ে পড়ে। বিপথগামী মুক্তিবন্ধুকে পথে আনতে হেমায়েতের সহযোদ্ধা অন্যান্য মুক্তিরা ব্যর্থ হয়। সকল অপকর্মের পরিসমাপ্তিতে এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে মেরে ফেলে। সময়ের কি অপরূপ খেলা। মুক্তিযোদ্ধার হাতে ঠাণ্ডা মাথায় মুক্তিযোদ্ধা খুন!!

১১। আবদুল আজিজ ঃ যশোর, লোহাগড়া থানার তেলকেড় গ্রামের সন্তান আবদুল আজিজ। যেমন সুন্দর তাঁর মানানসই কমনীয় মুখ তেমনি সুন্দর তাঁর অনিন্দ্য কান্তির রমণী মোহন চেহারা। রমণী মাত্রেই তাঁর রূপে মজতেন। জোর করে তিনি কারও পাণি পীড়ন করেন নাই। স্বেচ্ছায় প্রেমাতুর আজিজের বক্ষলগ্না হতেন কামাতুরা মহিলারা। যে কোন রমণীকে তিনি তাঁর নিটোল চেহারা ও অভিনয়ে ভুলিয়ে ফেলতেন।

জীবনের সবকটি ডাকাতি তিনি পুলিশের ড্রেসে করেছেন। তাঁর শ্বশুর বাড়ি কোটালিপাড়া থানার কুশলা গ্রামে। মুক্তিরা কুশল জিজ্ঞাসার নামে অগ্রসর হয়ে শ্বশুরালয়ে তাঁকে পাকাড়ও করেন। অত্যন্ত সাহসী ও সুচতর মানুষটি হাওয়া বুঝে সঠিক গানের কলি ভাঁজেন। সে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। স্বেচ্ছায় দুটি রাইফেল ও দুইশ রাউন্ডের মত গুলি নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে আসেন। জাত ডাকাতের এত শীঘ্র আকস্মিক ভোল পাল্টানো মুক্তিরা সহজে নিতে পারেন নি, মুক্তির বিচারের অপেক্ষায় পর্যবেক্ষণে রাখা হলো তাকে। এতদপ্রয়োজনে তাকে কিছু অপারেশনের সুযোগে শোধরানোর সুযোগ দেয়া হয়। গণযুদ্ধ প্রক্রিয়ায় এক কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে পটিয়ে তিনি বাগে আনেন। মেয়েটির বাড়ি কোটালিপাড়া থানার ভূতের বাড়ি গ্রামে। বিগলিত প্রেমিকার প্রেম যমুনায় হাবুডুবু খেয়ে মেয়ের গায়ে হাত দিলেন না। সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রেখে চললেন। নিজের কালিমা লিপ্ত জঘন্য জীবনের কাহিনী মেয়েকে শোনালেন। রাতের আঁধারে যুবতী মেয়ে একাকিনী পুরাপুরি ডাকাতের কব্জায়। অবলা মেয়ের প্রতি ডাকাত মুক্তির দুর্বলতা জন্মায়। মেয়েটির প্রতি ডাকাতের মায়ার আকর্ষণ বেড়ে যায়। ডাকাতের আসল গল্প শুনে প্রেমিকার শুরু হয় অঝোর কান্না; যেন আর থামে না সেই বিষাদের বিলাপ। ডাকাত আজিজ মেয়েটাকে সকল লালসার বাঁধন মুক্ত করে সম্মান ও ইজ্জতের সঙ্গে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেন।

ব্যাপার জানাজানি হলে মুক্তিরা ক্রুদ্ধ হয়। এবার তিনি শক্ত মুক্তি বিচারের কাঠগড়ায়। ডাকাত আজিজ ধরা পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে। পুরা এলাকায় ঘটনা জানাজানি হতেই আলোড়নের সৃষ্টি করে। বেশ কদিন ধরে তার বিচার চলে। পুরা বিচারকালে তার অভিনয় ও বিচারের রায় পর্যন্ত তার চালচলন, আচরণ ও কথাবার্তায় বিশেষ আকর্ষণ দেখা দেয়। তার প্রভাবশালী শ্বশুরকুলের ধরপাকড়ের আশ্বাস, জামাইকে সংশোধনের সুযোগ দেয়া হোক। নির্মম মুক্তি প্রাণে দয়া নেই। তাঁরা ডাকাতকে প্রাণে মারবেনই। শেষ পর্যন্ত সে কলেজ পড়ুয়া মেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তির পায়ে। ডাকাত আজিজের জন্য আকুল কান্নায় প্রাণ ভিক্ষা কামনা করে মেয়েটি। ব্যাপার দেখে বিস্মিত হেমায়েত বলেন, "ডাকাতেরও ধর্ম আছে।" শেষ পর্যন্ত নারী প্রাণের আকুতিই আজিজকে রক্ষা করে।

এবার তিনি মুক্তির পর্যবেক্ষণ সংশোধনে থাকেন ডাক্তার বকুল মজুমদারের হাওলায়। ডাকাতের প্রাণে পশুত্বের স্থলে মনুষ্যত্ব জন্মিয়ে তাঁকে যুদ্ধে লাগাতে অসাধ্য সাধন করেন ডাক্তার জেমস বকুল মজুমদার।

ডাকাত আজিজ-এর চিকিৎসা ঃ কত রঙ কত ঢঙের বিবর্তিত মানুষ নিয়েই মুক্তি বাহিনী। ডাকাত আজিজও মুক্তিযুদ্ধে নিখাদ সোনা যাচাইতে পর্যবেক্ষণে থাকেন। সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং হেমায়েতের অনুগ্রহে ডাকাত আজিজ আজ ডাক্তারের মানসিক চিকিৎসায়; তিনি যেন আর বিভ্রান্ত হবার সুযোগ না পান। তাঁকে নিয়ে শংকাতুরে ভয় ছিল। তিনি না অপমানের প্রতিশোধ উদ্ধারে মুক্তির জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনেন। কারণ মুক্তির ভিতরের খবর তাঁর নখদর্পণে।

যুদ্ধময়দানে জীবন-মৃত্যুর উপত্যকায় ডাকাত প্রহরা! সবার অলক্ষ্যে তাঁর কার্যকলাপ অনুসরণ করা হয়। পরশ পাথরের সংস্পর্শে লোহাও সোনা হয়। হেমায়েত সংস্পর্শে এসে ডাকাতের আচরণে বদল হয় এবং সবাই মুগ্ধ হন। অতি আকস্মিক তাঁর আচরণে অভাবিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর মনে নতুন জীবনবোধের জন্ম দিয়েছে। তিনি এখন নতুন মনের মানুষ।

মহৎ কিছু করে বেঁচে থাকার প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ। বাংলার স্বাধীনতা অর্জন, ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মুক্তি মানসিকতায় আজিজ অনুপ্রাণিত হন। জালিমের হাতে শোষিত বাঙালির জ্বালাও পোড়াওর বিষকরুণ দুর্ভোগে তাঁর চোখে শ্রাবণের অশ্রুধারা।

পরিবর্তিত আজিজকে না দেখলে মুক্তির বুঝতে অসুবিধা হতো যে ডাকাতও মানুষ। আর দুজন বাঙালির মত তারও মন আছে। তিনিও স্নেহ-ভালবাসায় ভরপুর। অন্তরের অন্তঃসলিলে লুকিয়ে থাকা দেশ প্রেমই তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে টেনেছে। জীবন মরণের জুয়া খেলায় তাসের তুরুপের মত তুচ্ছাতিতুচ্ছতায় আজিজ জীবন হারাতে চান না।

"আর হবে না মানব জনম
কুটলে মাথা পাষাণে।"

মরতে একদিন হবেই। মৃত্যুর তুষার ধবল স্পর্শে আত্মসমর্পণের পূর্বে জীবনের স্বাদ চাই, মহত্তম কিছু রেখে যেতে চাই। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য অবিস্মরণীয় স্মৃতির মাঝে মৃত্যুর অমরলোকে প্রস্থানের ব্রত নিলেন আজিজ।

মুক্তিযুদ্ধ, বাংলার স্বাধীনতা, এ-দেশের গণমানুষের স্বাধিকার আন্দোলনের দীক্ষামন্ত্রে জীবন উৎসর্গের দীপ্ত শপথ নিলেন আজিজ। ডাকাত আজিজ মুক্তির যাদুস্পর্শে আজ কাত। হেমায়েত দর্শনে ডাকাত আজিজের জীবনের মোড় ঘুরে যায়, জাগতিক লাভ লোকসানের উর্ধ্বে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার মৃত্যুপণ রক্ত শপথের উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর। পাকিদের বিচারে অন্যতম সন্ত্রাসী হেমায়েত-হৃদয়ের বিরাট ঔদার্যের ডাকাত আজিজ মৃত্যুর দুয়ারে সমর্পিত-প্রাণ মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তি মন মানসিকতার স্বাধীনতা মন্ত্রে তিনি অনুপ্রাণিত। মুক্তিযোদ্ধাদের মতই তাঁর চোখে প্রতিশোধ প্রতিকারের জ্বলন্ত আগুন। পাক অত্যাচারে সর্বস্বহারা প্রতিবেশী বাঙালির প্রজ্জ্বলিত ঘর বাড়ির দিকে চেয়ে চোখে ঝরত তাঁর শ্রাবণের ধারা।

মুক্তি যুদ্ধে আজিজ ঃ মুক্তি-অনুকম্পার পুরোপুরি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন আজিজ। পনের-বিশ দিনের মানসিক মগজ বিশুদ্ধিকরণের পর মুক্তিযুদ্ধের এক দুর্ধর্ষ সংঘর্ষে তাঁকে পাঠানো হয় মিয়ার হাটের যুদ্ধে। পাক-মুক্তি জানবাজির এই মারাত্মক

যুদ্ধে তিনি দারুণ সাহসের পরিচয় দিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এমনি বহুতর যুদ্ধের সফল যোদ্ধা আবদুল আজিজ। কোটালিপাড়ার বাঙালি খ্রিস্টান ডাক্তার বকুল মজুমদারের দাওয়াই যেন তাঁকে অকূলে কূলে ভিড়িয়েছে।

শিয়ালের মুরগি চুরির অভ্যাসের মত আদত স্বভাবটি যেন ভুলতে পারছেন না আজিজ। স্বাধীন দেশে পুরনো পেশায় ফিরতে গিয়ে দেখেন বেজায় খেসারত। শহর আলির উৎপাটিত চোখ, পাথর বেচার জীবন, আজমিরের দরগার ধন্না তাঁর মর্মমূল নাড়িয়ে দেয়। তিনি সুপথের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন, বদনামি হওয়ার হাত থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন সহমুক্তিদের সহায়তায়।

নিখাদ সোনা ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্তঝরা স্মৃতি মানুষকে যে কেমন নিখাদ সোনায় পরিবর্তিত করে যুদ্ধ পরবর্তী জীবনে বিভ্রান্ত মুক্তিদের জীবনের করুণ পরিণতি থেকে অনন্য শিক্ষার জীবন্ত উদাহরণ গাজি আবদুল আজিজ। যুদ্ধ পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য মেয়ে পটকানো প্রেমিক চেহারাটি সম্বল করে ঘর ছাড়লেন আজিজ। কারণ পুরনো সাথীরা তাঁকে স্থির থাকতে দিবে না। ভাগ্যান্বেষণে এলেন বগুড়া।

মুক্তিযুদ্ধের কারণে বিধবা এক অগাধ সম্পদশালী মহিলার সাথে তাঁর প্রেমের সার্থক অভিনয় হয়ে যায়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিধবার করুণ হৃদয় আর্তিতে প্রেমাশ্রু বিগলন করতে সমর্থ হন আজিজ। স্বামীহারা নিরাশ্রয়ের দুঃস্থ মহিলার সকরুণ হৃদয় আর্তিতে যেন তাঁর মনকে নাড়া দিল তীব্রভাবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বিধবাকে উদ্ধারে আজিজের আহাজারি সকলেল দৃষ্টি কাড়ে। সে বিধবার সাথে তাঁর নতুন প্রেমের পরিণতিতে পুনরায় তিনি তাঁর পাণি গ্রহণ করেন।

প্রেমের রাজ্যে সবই জায়েজ। বাস্তব সত্য স্বেচ্ছায়, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তিনি ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে এসেছেন। যুদ্ধ পরবর্তী দরদি মন তাঁকে পরিশুদ্ধ মানুষে পরিণত করেছে। নিয়মিত নামাজ রোজার স্বাভাবিক ধর্মকর্মে তিনি পাক্কা পাবন্দ। অসহায় মানুষের আর্তচিৎকারে আজো তাঁর দুস্থ মানব প্রেমের মনটি সাড়া দেয়।

যোদ্ধার হাত কর্মীর হাত ঃ রাজার ধনও ফুরোতে বেশিদিন লাগে না। নারী সম্পদলোভীর অপবাদ মুক্ত হতে চাইলেন আজিজ। কর্মসংস্থানে বগুড়ায় আছে আজো তাঁর ছোট্ট ওয়ার্কশপ। সে ওয়ার্কশপে সারাদিনের শ্রান্ত ক্লান্ত পরিশ্রমের ঘামঝরা রোজগারে চলে তাঁর সংসার। একদিনের মানুষমারা ডাকাতের হাতে উঠে স্বাধীনতা হননকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অস্ত্র। সে ডাকাতের হাত, যুদ্ধবাজ যোদ্ধার হাত আজ কর্মীর হাত, সৎ রোজগারের ভালবাসার হাত। তাঁকে সৎ জীবনে ফিরিয়ে আনার মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডারদের তিনি আশাতীত পুরস্কার দিতে চেয়ে ব্যর্থ হন। আজিজকে সৎ জীবনে প্রতিষ্ঠা দেবার আনন্দে সবাই আনন্দিত। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? ডাকাত জীবনের পরিবর্তন ও মুক্তিযুদ্ধে তার সাহসিকতা বীরত্বব্যঞ্জক খেতাব পাবার যোগ্যতা রাখার মত।

কুশলার শহিদ মিলু চৌধুরী

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মিলু চৌধুরীর বাবার নাম মোঃ বজলু চৌধুরী। গ্রাম-কুশলা, থানা-কোটালিপাড়া, জিলা-গোপালগঞ্জ। পঞ্চম শ্রেণী পাস বিশ বছরের অবিবাহিত যুবক হেমায়েত বাহিনীতে ভর্তি হয়ে জহরের কান্দি কেন্দ্রে যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ নেন। পিতার একমাত্র পুত্র পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পিতার অনুমতি চেয়ে পায়নি। অবশেষে দেশের টানে বিনানুমতিতেই ঘর ছেড়ে এসে যোগ দেন হেমায়েত বাহিনীতে। ৯ নং সেক্টরের ইপিআর সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে তাঁর যুদ্ধ শুরু হয়। এলএমজি ও রাইফেল চালনায় তাঁর দক্ষতা সবার প্রশংসা অর্জন করে।

কোটালিপাড়া, রামশীল, মধুরনাগরা, মিয়ার হাটের মত বহুতর যুদ্ধে তার সাহস ও নেতৃত্ব আকৃষ্ট করে সংশ্লিষ্ট সকলকে। মিয়ার হাট যুদ্ধে, ১৯৭১ সালের ২রা নভেম্বর সম্মুখ সমরে শহিদ হন মোঃ মিলু চৌধুরী। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদে সংজ্ঞা হারান পিতা মোঃ বজলু চৌধুরী। পুত্রের মর্মান্তিক শাহাদতে বেদনাহত পিতা। দেশ স্বাধীন করে তাঁরা মিলুর শাহাদতকে বৃথা যেতে দিবেন না। শহিদ-মুক্তির গাজি-পিতাকে তাঁদের পিতার আসনে বরণ করে নেন। মুক্তি-পুত্রদের মাঝে শহিদ পিতা তাঁর সন্তান হারানোর সান্ত্বনা খুঁজে পান। সন্তান হারা পিতার অবিরল অশ্রু রোধ মানে নি। পুত্রশোকের অশ্রুধারা তাঁর চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। আজ স্বাধীন দেশে শহিদ পিতা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে দিন গুজরান করেন। মুক্তিযোদ্ধার পিতা ভিক্ষার মাধ্যমে বেঁচে থাকার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের জানান দেয়া হচ্ছে ঃ এটাই কি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত সার্থকতা? অন্যান্য দেশেও (ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, গণ প্রজাতন্ত্রী চিন, ভারত) কি মুক্তিযোদ্ধার পিতারা এমনিভাবে ভিক্ষে করে দিন গোজরান করে? হায়, এ-দেশে মুক্তিযুদ্ধের জয়জয়কারে কতকিছু হচ্ছে। শহিদ পিতাকে কাঁধে নিতে হয় বাঁচার উপায় ভিক্ষার ঝুলি। শহিদ পিতার আক্ষেপ এ-জন্যই কি আমার ছেলে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে? এই কি শহিদ পিতার পুরস্কার! এই দেশে কি কেউ কোন দিন তাঁর আয়ুষ্কালে খোঁজ নিবে? জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মস্থান গোপালগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা শহিদ পিতার ভাগ্যে যদি এই পুরস্কার! তা'হলে অন্যদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে!! হায় পোড়া কপাল শেখ মুজিব কন্যা হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের কালেও ফইকরা শহিদ পিতার খোঁজ কেউ নিল না। আসলে দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই কবে, এখন আর মুক্তির খবর নিয়ে কি লাভ?

হারিয়ে গেল মানিহারের ২২ মাণিক

মে মাসের প্রথম দিকের ঘটনা। গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ থানার মানিহার গ্রাম। সময় মাগরিবের সন্ধ্যা। গ্রামের জনতার অপরাধ তারা মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলার স্বাধীনতা সমর্থন করে। এ-ছাড়া, স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হেমায়েত বাহিনীতে যোগ

দেয়া ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া তাদের মস্ত বড় পাপ। মানিহারের-জনতা আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবের পোষ্যপুত্রের মতন। কোটালিপাড়া থানায় প্রথম আক্রমণের ফলশ্রুতির দখলের দিনে মানিহারের লোকজন দলে দলে গিয়ে জয়বাংলা ধ্বনির প্রতাপে ধরণি কাঁপিয়ে তোলে। কোটালিপাড়া দখলের পর বেছে বেছে মানিহারের কিছু প্রশিক্ষিত যুবকের হাতে অস্ত্র দিয়ে গ্রামটিকে একটি দুর্গ-সদৃশ গড়ে তোলার কথা বলা হয় প্রকাশ্যে। পাকিস্তানি দোসরবা এ-খবর পৌঁছে দেয় গোপালগঞ্জের পাক-ঘাঁটিতে। তারই পরিণতিতে মানিহারের এই হত্যাযজ্ঞ। এমনকি লাশ দাফন করতে যাবার সময়ে লাশের সঙ্গে যাওয়া মানিহার গ্রামের লোকজনকে হত্যা করে পাকিস্তানি হায়েনারা। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সময়ে হেমায়েত তাঁর বাহিনী সমেত কালকিনি ও গৌরনদী থানার দশ গোহাতে অপারেশনে ব্যস্ত ছিলেন। তাই প্রতিপক্ষ মুক্তিপ্রতিশোধের তাৎক্ষণিক বিনিময় নেয়া থেকে রক্ষা পায়।

এই গ্রামের সর্বাধিক লোক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। রাতের আঁধারে যোদ্ধারা হাওয়ায় মিলিয়ে এ-গ্রামে আসতো, এখানে আসলে জনগণের কাছে তারা পেত নিরাপদ আশ্রয়, প্রশ্রয়, আহার ও শুশ্রূষা। গ্রামের সাধারণ জনতার দোষ তারা হেমায়েত বাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল, জয় বাংলা সমর্থন করে এবং শেখ মুজিবের ভক্ত। এ-কারণেই শেখের জন্মস্থানের প্রতি ঘৃণায় গোপনে পাক-আর্মি বেছে নেয় এই নির্মমতা। এই নিষ্ঠুর নতিজা যেন অন্যদের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা-প্রীতির বিরুদ্ধে কাজ করে সেটাও হত্যাকাণ্ডের আরেকটি কারণ।

স্থানীয় রাজাকার ও দালাল পাক-আর্মিকে খবর দিলে তারা এসে গ্রাম ঘিরে ফেলে। ভয়ে থর থর করে কাঁপে জনতা। মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রাজা মোল্লাকে বাড়িতে পায় পাক আর্মি। বাঙালি মুক্তি সৈনিক পাক-সৈনিকের পায়ে পড়ে সারাদিন প্রাণ ভিক্ষা চান। পশ্চিমা মুসলমান পাক সেনাদের পাষাণ হৃদয় গলে না। তাই বেরাদরদের সাথে দাঁড় করিয়ে পিছন থেকে গুলি করে পাকসেনারা। রাজা মোল্লার পুত্র কওছার মোল্লা আহত অবস্থায় রক্ষা পান। বাঙালি মুক্তি মোঃ আক্রামুজ্জামান শেখ, মনসুর আলি শেখ মাগরিবের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হতেই পাক সেনার গুলিতে প্রাণ হারায়। মুক্তিযোদ্ধা বজলু মোল্লার বাড়ি ঘিরে ফেলে পাক আর্মি। তাই বেরাদরদের সাথে তাঁকেও গুলি করে শেষ করে দেয়। ঘর দরজা ভেঙ্গে বাড়িতে লাগিয়ে দেয় দোজখের আগুন। গ্রামের লোকজন আগুন নিভাতে এসে পাক আর্মির বাধার মুখে ব্যর্থ হয়, জনতার চোখের সামনে জ্বলে পুড়ে সব খাক হয়ে যায়।

জ্বালাপোড়া শেষ। বেঁচে থাকারা নিহতদের দাফনের ব্যবস্থা নেন। এবার কবরস্থান ঘিরে ফেলে পাক আর্মি। দাফন করতে আসাদেরও ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। মানিহারে এভাবে একই দিনে হত্যার শিকার হয় বাইশ জন বাঙালি। পাক আর্মি সরে গেলে গেরামের লোকেরা সবাই মিলে মৃতদের লাশ একই গণকবরে দাফন করেন। মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জে এমন মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ দ্বিতীয়টা আর জানা নেই।

স্বাধীন দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হৃদয় ঔদার্যে দুহাজার

টাকার আর্থিক সাহায্য পান শহিদ মোঃ আকরামুজ্জামান শেখ ও মনসুর আলি শেখ-এর পরিবার। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে কে রাখে শহিদ পরিবারের খবর? দুই বিধবা ফাতেমা বেগম ও লিলিয়া বেগম আজো হাহাকারে কাঁদেন সরকারি সাহায্যের প্রত্যাশায়। দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গেলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী এলেন আবার ক্ষমতায় এলেন বেগম জিয়া। কিন্তু এ-সব শহিদ বিধবার কপালে তো ভিক্ষা মিলে না। যাঁদের স্বামী দেশের জন্য প্রাণ দিলেন স্বাধীন দেশ যেন তাঁদের কথা ভুলে গেছে। হায় করুণা সিন্ধু, বঙ্গবন্ধু তুমি নেই। তোমার সোনার বাংলার সোনার ছেলে মুক্তিযোদ্ধারা তো আছে। হেমায়েত বাহিনীর প্রধান হেমায়েত-হৃদয় উজাড় ভালবাসা দিয়ে বিধবাদের মাথায় হাত বুলান। মুক্তিযোদ্ধাদের কবর জিয়ারত করেন হেমায়েত। হায় বঙ্গবন্ধু তোমার আমলে তোমর বড় আদর ও গর্বের হেমায়েত তোমার আদর্শের ধ্বজা ধরে ফাঁসির আসামি হলো। বাংলার বুকে এভাবেই মুক্তিযোদ্ধারা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। কেউ নেই তাদের পক্ষে কথা বলার! তেমনি হেমায়েতের বেদনা কেয়ামতের মত তাঁর বাহিনীর শহিদ পরিবারের বুকে বাজে।

শহিদ ফজলু মোল্লার ছেলে পাক আর্মির গুলিতে আহত হন। পিতৃহীন এই পঙ্গুর পড়াশোনা হয় নি। তার ভাগ্যে কোন সাহায্য বা কাজকর্ম জুটে নি। শহিদ রাজা মোল্লার ছেলে যুদ্ধাহত কওছার মোল্লার ভাগ্যেও কোন সাহায্য বা কর্ম সংস্থান জুটে নি। মানিহারের শহিদ ২২ মানিকের ৪ জনের এই বিবরণ। অন্যদের কথা কহন না যায়ে।

দেশের অগণিত শহিদের মত হেমায়েত বাহিনীর শহিদ ও গাজি পরিবার অধৈর্য আশায় বুক বেঁধে আছেন। মুক্তিযুদ্ধের ধারক বাহক ক্ষমতায় এলে হয়তো তাদের ভাগ্য ফিরতে পারে। সেদিন কি তাদের আয়ুষ্কালে সত্যি আসবে?

স্বাধীনতার পরে দেশের অভ্যন্তরে মাটির জারক রসে দেশীয় সম্পদে পাকিদের থেকে লুটা সম্পদে গড়ে ওঠা মুক্তিদের ভারত ফেরতা মোহাজের মুক্তিরা একটু আড় চোখে দেখতেন। বাস্তব সত্য এই যে, শুরু থেকে স্থানীয় মুক্তিরা স্বাধীনতা যুদ্ধ টিকিয়ে রাখতে না পারলে বাংলার ঘরে ঘরে অগণিত পাক পোষ্য ও দোসর সৃষ্টি হতো। মীর জাফরে ভরে উঠতো দেশ। বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধারা সহজে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে যুদ্ধ করতে পারতেন না। দেশজ অভ্যন্তরীণ মুক্তিরা পেছন থেকে আক্রমণ করে, শুধু মাইর দিয়ে, পাকিদের নাজেহাল করে তাদের নাভিশ্বাস উঠিয়ে ছাড়ে। এমতাবস্থায়ই বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা দেশে ঢুকে সুযোগ মত আক্রমণ আরও জোরদার করে। দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, আজও বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধার তালিকা তৈরি হয় নি। সরকার যায়, সরকার আসে। সবাই মুক্তিদের নিয়ে হায় আফসোস করে যেন তারা ক্ষমতাই এসেছেন শুধুমাত্র মুক্তিদের ভালমন্দ দেখার জন্যে। কিন্তু হায়! 'যথা পূর্বং তথা পরং।'

বাস্তবতা হচ্ছে দেশে অভ্যন্তরীণভাবে স্বতঃস্ফূর্ততায় জেগে উঠা মুক্তিদের অবিলম্বে

যথা মূল্যায়ন হওয়া উচিত। নতুবা মিলুর মত অনেক মুক্তিযোদ্ধার মা-বাবা-স্ত্রী ভিক্ষা করে একাত্তরের মুক্তিদের সম্মান বৃদ্ধি করবে। ইতিহাসে লেখা হবে সেসব, অনাগত কালে মূল্যায়ন হতে জাতির কর্ণধারদের।

দেশের ভেতরে যুদ্ধ করে পূর্বাহ্নে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখার কারণেই অভ্যান্তরীণ যোদ্ধাদের প্রতি সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। শেষ মুহূর্তে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ নিয়ে যে-সকল যোদ্ধা দেশে ঢুকেছেন তারা অনেকেই একটি বুলেটও কাজে লাগানোর সুযোগ পান নি। তাদের প্রতিও সকলের স্বীকৃতি থাকতে হবে, তারা দেশের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

মোঃ মুজিবুর রহমান সরদার ঃ কালকিনির কাল নাগ

সূচনা ঃ হেমায়েতের প্রভাব বলয়ে বহিরাগত বহু গেরিলা আসছে গেছে। তাঁদের ভাল-মন্দ মিলিয়ে অগণিত আত্মত্যাগধন্য কালজয়ী অধ্যায় আছে। এমনি এক গেরিলা গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন খলিল। হেমায়েতের এলাকার কালকিনি থানার খলিল কমান্ডার গ্রুপের গেরিলারা অপারেশন চালায়। খলিল গ্রুপের গেরিলা মোঃ মুজিবুর রহমান সরদারের বীরত্বপূর্ণ কার্যক্রমে নিয়ে চলমান এ-অধ্যায়।

পরিচিতি ঃ মোঃ মুজিবুর রহমান সরদার, পিতা : মোঃ হোসেন আলি সরদার, গ্রাম : কৃষ্ণনগর, পোঃ+থানা : কালকিনি, জেলা : মাদারিপুর।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ঃ ষোল বছরের যুবকের উপর পাক আর্মির অসহ্য অত্যাচার। প্রথমে নিজ বাড়ির পার্শ্ববর্তী মুনশি বাড়িতে হুড় হুড় করে ঢুকে পাক আর্মি। পার্শ্ববর্তী ঘেরসহ চতুর্দিক ঘিরে বাড়িতে আগুন দেয়। বাড়ির ঘরগুলি জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে ফেলে। সব শেষে বাড়ির মহিলাদের নির্যাতন করে তারা বিজয় গর্বে স্ফীত হয়ে নাচে। সত্যাশ্রয়ী যুবকের চোখের সামনে বিদেশী সৈন্যের হাতে স্বদেশ প্রজ্জ্বলন সহ্য হয় না। বুকে জ্বলে ছাই চাপা আগুন। প্রকাশ্য দিবালোকে স্বদেশ রক্ষা, ইসলাম রক্ষার নামে বাংলার মাটিতে অবাঙালি পশ্চিমা সেনার মরণ মারণ দাপট অসহ্য। আগুন ঝরা চোখে সে নিজ বাড়িতে আসে। প্রতিশোধ স্পৃহা জ্বলে তার মনে, জামা কাপড়ের সাথে চার হাজার টাকা নিয়ে শান্তির নীড় মায়াময় বাড়ি-ঘরের বাঁধন ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশ্যে। যাবার আগে মায়ের আশীর্বাদের পা ছুঁয়ে মাতৃভূমির উদ্ধারের সংকল্প করেই যাত্রা করে সে। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাতা মহানবীর অনুসারীদের আরব ভূমি ছেড়ে আফ্রিকার আবিসিনিয়া হিজরতের ইতিহাস স্মরণে এলো তার। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রস্তুতির উদগ্র বাসনায় ভারত যাত্রার সিদ্ধান্ত নেয় এই যুবক।

থানা সদর কালকিনি যাবার সাহস হলো না। কারণ রাজাকার ফেউয়ের ভয়ে কেউ শান্তিতে নেই। পালিয়ে গিয়ে হাজির হয় তৎকালীন মহকুমা মাদারিপুর। সাংবাদিক মুজিবুর রহমান-এর সৌজন্যে ভারত যাত্রী কাফেলা পেয়ে গেল সে। হিজরতি গ্রুপ

নিতান্ত বাচ্চাকে নিতে চায় না। পুরা গ্রুপের ভাড়ার টাকা পরিশোধের কড়ারে সুযোগ হয় তার।

গেরিলা প্রশিক্ষণ ঃ ভারতের চাঁদপুর ক্যাম্পে ভর্তি হয় এই যোদ্ধা, নাম রেজিস্ট্রি হয় ৮নং সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায়। বিহারের চাকুলিয়ায় গেরিলা প্রশিক্ষণ লাভের পর একুশ দিনের সফল প্রশিক্ষণ শেষে খলিল কমান্ডারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রবেশ করে গেরিলা মোঃ মুজিবুর রহমান সরদার ।

গেরিলা একশন ঃ মাদারিপুর থানার কালকিনিতে গেরিলা শেলটার। কালকিনির উত্তর-পার্শ্ব সংলগ্ন কুমার বাড়ি আক্রমণ করা হবে; মূল আক্রমণ রাত তিনটায়। চতুর্দিকের গুলি বন্যার বেড়ে পড়ে মুক্তিদের তিষ্ঠানো দায় হয়ে ওঠে। মুজিবুর রহমান জলাভূমির কচুরিপানা মাথায় নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা নেন, কাঁধে তাঁর স্টেনগান। হাতে দুটি গ্রেনেড ও এক প্যাকেট গুলি। পরনে হাফ প্যান্ট আর হাফ হাতা জামা গায়ে তরুণ মুক্তি। কমান্ডার খলিল নির্দেশ দেন স্থান ছেড়ে কেটে পড়। আক্রান্ত কুমার বাড়ির ভাঙ্গা চাড়ায় হাত পা কেটে রক্তারক্তির জখম হয় মুজিবের। অবশেষে উপেন বলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে রক্ষা পায়। ডাক্তার এলে কাটা ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুশ্রুষা করা হয়। এরই মধ্যে মুক্তি বিচ্ছুর উপস্থিতি টের পেয়ে যায় জানী দুশমন রাজাকার। এবার আশ্রয় নেয় নিজ বাড়ি। কোথাও নিরাপত্তা নেই। বাড়ির চারপাশে শকুনের শ্যেন দৃষ্টিতে রাজাকারের আনাগোনা বেড়ে যায়।

কালকিনি কমান্ডারের সান্নিধ্যে ঃ তখনকার কালকিনি থানা মুক্তি কমান্ডার মিঃ রহমানের শেলটার থানা সদরের তিন মাইল পশ্চিমে শশিকর বিলে। কমান্ডারের সান্নিধ্যে তার আশ্রয় হয়। বেশ কিছু দিন সেখানে থেকে বিশ্রাম ও পরবর্তী করণীয় ঠিক করার নির্দেশনা পায় সরদার মুজিব।

মুক্তি গোয়েন্দা মাদারিপুর, শরিয়তপুর, গৌরনদী, ভুরঘাটা জাতীয় বহুবিধ স্থানে গোয়েন্দার কাজ করে। ময়লা, ছেঁড়া, ফাটা, তালি-রিপুর জামা কাপড়ে ভিক্ষুক সেজে পায়ে হেঁটে দিনে শত্রু অবস্থান রেকি করে। দিনে রেকির ফলাফল প্রস্তুতি এবং রাতে শত্রু-অবস্থানে আক্রমণ করা বলতে গেলে রুটিনে পরিণত হয়। নৈশ আক্রমণের ক্ষেত্রে ভাঙ্গা ব্রিজ অপারেশন স্মরণীয়। সেদিন দশজন সশস্ত্র রাজাকার অস্ত্র ফেলে ভাঙ্গা ব্রিজে ঘুমিয়ে আছেন। কালকিনির কালনাগিনীর মত চুপিসারে সশস্ত্র মুক্তি মুজিবুর নৈশ অভিযানে ভাঙ্গা ব্রিজ গিয়ে অসতর্ক রাজাকার দশককে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে যান। শুরু হয় মুক্তির চোরা-গোপ্তা খেলা। অকস্মাৎ ঘুমন্ত শত্রুর ওপর 'হ্যান্ডস আপ' হামলার হুংকারে চড়াও হন তিনি। ফিক্সড বেয়নেটের দশটি রাইফেল ও পাঁচশ রাউন্ড গুলি ফেলে চোখ রগড়ে রাজাকার আত্মসমর্পণ করে। রাজাকারগণ মালে গণিমত আদায়ের ধান্দায় দশজন গণ্যমান্য স্থানীয় মুরুব্বি স্থানীয় লোককে বেঁধে রেখেছে সেখানে। কিশোর মুক্তির বাল্যছান্দা মুরুব্বিদের প্রশ্ন, "আপনারা এখানে কেন?" সরোদন কৃতজ্ঞতায় তাঁদের আর্জি, "রাজাকাররা আমাদের থেকে বিশ হাজার টাকা দাবি করেছে মুক্তি পণ হিসাবে। এরই মধ্যে দশ হাজার টাকা তারা হাতিয়ে নিয়েছে, বাকি টাকা না

দিলে মৃত্যুর ফরমান জারি আছে আমাদের ওপর।" আকস্মিকভাবে এক মুরুব্বির স্ত্রী কোথা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হওয়ার মত সেখানে উপস্থিত হন। সন্তানসম মুক্তির পায়ে হাত দিয়ে তাঁর বেদনার অশ্রু বর্ষিত হতে থাকে। "আমাদের বাঁচান" আকুতিতে তাঁর বুক ফাটা আর্তনাদ পীড়িত করে সরদার মুজিবকে। তরুণ মুক্তি সবার হাতের বাঁধন খুলে দেয় বিজয়ীর আনন্দে। দুহাত আকাশে তুলে আল্লাহর অসীম করুণার ছত্রচ্ছায়ার বর্মের আচ্ছাদন কামনা করেন মুক্তিযোদ্ধার হেফাজতে। অপত্য স্নেহে মুক্তি পুত্রকে তাঁরা বুকে জড়িয়ে ধরেন। চুমায় চুমায় কপাল মাথা চিবুক ভরিয়ে দেন। গরিবদের খেদমতের রক্ষার খেদমতে মুক্তি পুত্রকে পুরস্কৃত করতে তারা আল্লাহর হাওলায় সমর্পণ করেন। এভাবেই দোয়া করে সবাই মুক্তির পাওনা মিটিয়ে দেন। মুক্তি কমান্ডার আনন্দের অভিনন্দনে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। কমান্ডার যোদ্ধার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার কি হতে পারে জানতে চান। 'মাটির সন্তান বলেন, 'শত্রু-দমনের সাফল্যই আমার পরম পাওয়া।' সকলের দোয়ার আশীর্বাদের সাথে কমান্ডারের শুভেচ্ছার উষ্ণ অভিনন্দনের বাইরে যোদ্ধার অতিরিক্ত কোন প্রাপ্য নেই।

পশ্চিমা হারাধন ঃ হারাধনের দশটি ছেলে হারিয়ে যাবার মত বাস্তব বিচ্ছেদ বেদনা ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধকালে এই বাংলার মাটিতে। পশ্চিমা সোদর দশ ভাই এলেন বাঙাল কাকের দলনে। নয় জনেরই বাঙাল মুক্তি হাতে বেমক্কা অক্কা। নয়টি হারিয়ে দশমটি পাগল। দুঃখ ভুলতে যোশে পাকিস্তান সঙ্গী সাথী কিছু মিলিটারি নিয়ে বঙ্গ ললনার ইজ্জত মারার বেইজ্জতি কাজকে বিজয় পর্বের পরাজয় ভুলার নিদর্শনরূপে বেছে নেন শেষ হারাধন। কালকিনি থানার এক মাইল পশ্চিমে ভুরঘাটার হিন্দু বাড়িতে ছিল মুক্তি আশ্রয়। সে-সময়ে পাশের বাড়িতে হয় পশ্চিমা মিলিটারি হামলা। অল্প বয়সী সুন্দরী মেয়ের ইজ্জত মারা ফূর্তিতে নয় ভাই হারা পশ্চিমা মেজর তখন ভাবে গদগদ। ব্যাপারটি মুক্তিদের একেবারে অসহ্য। আপন নিরাপত্তা বিস্মৃত মুক্তি। মা-বোনের ইজ্জতের নামে মুক্তি রক্তে নেচে ওঠে কালনাগিনীর গর্জন। কয়েক গজের ব্যবধানে গর্জে উঠে মুক্তি অস্ত্র। নারী লোলুপের রিরংসা পূর্ণ হবার পূর্বেই অনেককে ধরণী ছাড়তে হয়। মুক্তি অস্ত্রে নিখরচা হয় বহু পাক সেনা। বাঙাল মারতে এসে বেঘোরে ভাইদের সাথে সাথী হারিয়ে বেজায় ক্ষেপে যান হারাধনের শেষ মণি মেজরজি। বদ্ধ পাগল পাক মেজর বাঙালি দর্শন মাত্র কুড়াল হাতে তাদের ফেড়ে ফেলে নদীতে ফালায়। বহুতর যুদ্ধের জয়পরাজয়ের পরিণতিতে হারাধনের শেষ নিধি পাক মেজর এখন মুক্তি ঘেরে। "বুঝ পশ্চিমা, বাঙাল নারী কেমন আছি মা!! মরে নয়, বেঁচে থেকে বুঝবা বাঙাল মুলুকের পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া কি!!!"

পিলে চমকানো রাজাকার ঃ পাক পক্ষে বহে মন্দ মন্দ গন্ধবহ পরাজয় বার্তা। সবার আগে সজাগ রাজাকার। ইতোমধ্যে অসংখ্য দুর্ভেদ্য পাক দুর্গ মুক্তিবাহিনীর দখলে। হেলায় মুক্তিরা গুঁড়িয়ে ফেলে রাজাকার আস্তানা। বহুতর শত্রু-অবস্থান দখল করে মুক্তিরা। যুদ্ধের সাফল্যে মুক্তিদের সুদৃঢ় আস্থা বৃদ্ধি পায়। জয়বাংলার পতাকা কোমরে বেঁধে মরণযজ্ঞের আত্মাহুতিতে শত্রু-অবস্থানে আঘাত হানে মুক্তি সেনা।

অবস্থা অনুকূলে এলে কালকিনির কালনাগিনী সদৃশ মুক্তি সেনারা মিটিংয়ে বসে। যে-কোন মূল্যে কালকিনি থানা শত্রুমুক্ত করা চাই। সবার আগে হালাল করতে হবে স্বদেশী বিভীষণ দোআঁশলা রাজাকারদের।

মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজাকারদের উদ্দেশ্যে চিঠি দেয়া হয়, "তোমরা যদি বাঁচতে চাও রাতের মধ্যে আমাদের কাছে স্যারেণ্ডার করবা। পাল্টা গুলি করবা না। চারিদিক ঘিরে কালকিনিতে আসছে মুক্তির নৈশ অভিযান। বুঝে দেখ তোমরা কি করবা? চারিদিকে কান পেতে শোন শুধু জয়বাংলার জয়ধ্বনি।" চিঠি পেয়ে রাজাকারদের অন্তরাত্মায় ঢুকে পিলে চমকানো বাপের নাম ভুলানো ভয়।

অমারজনীর নিঝুম নীরবতা কাঁপিয়ে জয়বাংলার ওয়ার ক্রাই তুলে মুক্তিরা ব্লাংক ফায়ার করে। জয়বাংলার পতাকা হাতে সশস্ত্র সগর্জন ব্লাংক ফায়ারে নৈশ অভিযানে আগ বাড়িয়ে এগুলেন সংশপ্তক মুজিবুর রহমান সরদার। মুক্তি-আক্রমণের মুখে রাজাকারদের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। তারা সম্মিলিতভাবে বলতে থাকে ঃ "ও মুক্তি ভাই, আমগরে মাইর না"। জয়বাংলা ধ্বনি করে সকলে পাক আনুগত্য ছেড়ে মুক্তিবাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করে। এখানকার নামকরা রাজাকার কমান্ডারদের কজন : হোসনে, লালু, আলতা, খাদেম ধরনের অনেকে।

ভাঙ্গা ব্রিজের মরণজয়ী যুদ্ধ ঃ কালকিনি বিজয়ে গর্বিত কালনাগিনী মুক্তিদের পরবর্তী টার্গেট মাদারিপুর পাক আস্তানা। এতদুদ্দেশ্যে খলিল কমান্ডারের নির্দেশে মুক্তি সমাবেশ ঘটে মাদারিপুরে। সিদ্ধান্ত হয় ব্রিজে পাক প্রহরার ওপর আক্রমণ করা হবে। সে-মতে, বিলের পথে হাড় কাঁপানো শীতের রাতে আট মাইল হেঁটে কালকিনি মুক্তিরা মাদারিপুর যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আরেক মুক্তির মাধ্যমে সংবাদ আসে কলাবাড়ি ভাঙ্গা ব্রিজ আক্রমণে ফেঁসে গেছেন কমান্ডার খলিল ভাই। সেখানে পলায়নপর পাক সেনার ওপর মুক্তি আক্রমণ চলছে। আচমকা চমকের মুক্তি এটাকের টক্কর সামলাতে পশ্চিমারা তাৎক্ষণিকভাবে মরিচায় প্রবেশ করেছে। তাদেরই পূর্বে করা কোন গ্রুপের মরিচার আশ্রয় যেন আল্লায় মিলিয়ে দেন তাদের ভাগ্যে। উষা লগ্নে পাঁচটার মধ্যে কালকিনির কালনাগিনীরা কমান্ডার খলিল ভাইর সাহায্যে কলাবাড়িয়া ভাঙ্গা ব্রিজে গিয়ে হাজির হন এবং যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে নেন।

একমাইল ঘুরে সুবিধাজনক পজিশনে অবস্থান নেয় মুজিবুর। ব্রিজের চারপাশের খালে পানি আর পানি। প্রচণ্ড শীতের দাপটে মুজিবের দাঁতে কপাটি লেগে গেল। চারিদিকে গুলি বন্যার বেড়জাল। মাথা জাগানো দায়। স্টেনগান ফায়ার দিয়ে গরম অস্ত্র শরীরে চেপে ধরে উত্তাপ সঞ্চার করে মুজিবুর। উষ্ণ অস্ত্রের উত্তাপে কতক্ষণ পরে তাঁর দাঁত কপাটি ছেড়ে যায়।

স্বাধীনতার পরে মাদারিপুর কাপড় কলে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় তার চাকরি হয়। বেতন পনর শত টাকা। চার বছরের নকরির পর সে চাকরি খতম। এর পর তাঁর সেই আগের অবস্থা, অভুক্ত অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অন্যের ঘরের নিচে দিন-গুজরান করেন। এই ছিল ভবি বাংলাদেশের মুক্তি কপালে!

গণপ্রতিনিধি সৈয়দ আবুল হোসেন-এর অবদান

১৯৮৮ সালে ঢাকায় কালগ্রাসী বন্যার পানিতে সয়লাব। এ-সময়ে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে দানখয়রাতের লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় খসান আবুল হোসেন। সে সব খয়রাতি কাপড় নিয়ে তাঁর আগমন ঘটে কালকিনি। সে-সময়ে মুক্তিযোদ্ধা মুজিবের সাথে এম.পি. আবুল হোসেন-এর পরিচয় হয়। যুদ্ধাহত মুক্তির পরণে তখন একটা ছেঁড়া লুঙ্গি ও জামা মাত্র। তিনি নতুন একটা লুঙ্গি ও জামা কিনে সাজিয়ে তোলেন, সাথে করে নিয়ে যান ঢাকা। রিলিফের প্রচুর শাড়ি ও ক্যালেন্ডার দেন আহত মুক্তিযোদ্ধাকে এবং সাথে নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে তাঁকে দেশের বাড়ি কালকিনি পাঠান।

সৈয়দ আবুল হোসেন হেমায়েত বাহিনীর একজন সংগঠক। স্বাধীন দেশে তিনি প্রচুর সম্পদ অর্জনে ধন্য হয়েছেন। জনকল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্তদের পুনর্বাসনে নীরবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

দানবীর মুক্তি ঃ প্রথমে বাপের জমি জনসেবায় বিলিয়ে মুজিব ততদিনে ঠুঁটো জগন্নাথ। ইতোমধ্যে মিলের চাকরি গিয়ে বেকার। অভাব-অনটনে কোনরকমে দিন গোজরান করেন, এতে তাঁর কোন দুঃখবোধ নেই। এবার শাড়ি ক্যালেন্ডারের সাথে লক্ষ টাকা হাতে আসে। তাতেও আখের গোছানোর লোভের ফাঁদ থেকে নিজেকে উৎরালেন একাত্তরের বিজয়ী মুক্তি। সমুদয় অর্থ ও শাড়ি তিনি দুঃস্থ জনতার মাঝে বিলিয়ে দিলেন। মুক্তি হৃদয়ের বিরাট ঔদার্যে দুঃস্থ জনতা অভিভূত। দু'হাত তুলে দুঃস্থ জনতা আহত মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মাগেন আল্লাহর দরবারে ঃ "হে আল্লাহ, তাঁকে তুমি সুখ দাও।"

এম পি আবুল হোসেন একবার কালকিনির বিশটি ইউনিয়নের জন্য বিশটি রঙিন টেলিভিশন পাঠান। সে-সব বিতরণের ভার দেন আহত মুক্তিযোদ্ধা ছেঁড়া লুঙ্গির মুজিবুরকে। প্রলোভনের রঙিন খোয়াব দমিয়ে যথাস্থানে টেলিভিশনগুলি পৌঁছে দিয়ে মুক্তি-মুজিবুর স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন। এমন সুযোগ হাত ছাড়া করা বেয়াকুফ মুক্তির অলিক ব্যাপার ঔৎসুক্য নিয়ে জনতার মুখে শোনেন এমপি সৈয়দ আবুল হোসেন। এমন নির্লোভ নিঃস্বার্থ আহত মুক্তিযোদ্ধার নিজের থাকার কোন ঘর নেই। স্বাধীনতার পরও যার পৈতৃকসূত্রে পাওয়া জমি-জমা ঘর-বাড়ি বিত্ত-বৈভবের অভাব ছিল না। হায়রে আপন ভোলা মুক্তি।

এম পি আবুল হোসেনের দান খয়রাত শুরু হয়। এবার আহত মুক্তি মুজিবের আসল পরীক্ষা সমুপস্থিত। যুদ্ধাহত সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া মুক্তিযোদ্ধা মজিবুরের ঘর তোলার নামে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠান এমপি সাহেব। তখন স্থানীয় আশেপাশের প্রতিবেশী ও গ্রামীণ জনতা অন্ন-বস্ত্রের অভাবের তাড়নায় মরছে। টাকা পেয়ে অভাবী গ্রামীণ জনতাকে ডাকলেন অর্থের প্রতি নিস্পৃহ সিংহ-হৃদয় মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর। আবুল হোসেন কর্তৃক দানের টাকায় ঘর তোলার ব্যাপারে অভাবী

জনতার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধা বলেন ঃ "আমার ঘরের দরকার নাই। মুক্তিযুদ্ধের সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও আপনাদের ঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের ঠাঁই দিয়েছেন। আপনাদের ঘর পুড়েছে। আপনারা অনেকে প্রাণে মরেছেন। তবু প্রতি ঘরে ঠাঁই পেয়েছি আমরা। আজো আপনাদের প্রতি ঘরই হোক আমার আপন ঘর। মরণে আপনাদের হাতে জানাজার শেষ কবরই হোক আমার সগৌরব পাওনা।" ভুখা-নাঙ্গা জনতা নাটকের শেষ দেখতে উন্মুখ। এবার পঞ্চাশ হাজারের শেষ পাইতক গরিব-দুঃখির মাঝে বিলিয়ে দিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসেন মুক্তি মুজিবুর। হ্যাঁ, শেখ মুজিবের পুণ্যস্নাত ফরিদপুরকেই মানায় এমন দানবীর মুক্তিযোদ্ধায়।

কমান্ডার খলিল তখন এক মর্টার পজিশনে। মুজিবুর গেলেন কমান্ডারের পাশে। শ্রুতিগ্রাহ্য দূরত্বের শত্রু-মরিচা থেকে পাক-মিলিটারির করুণ আর্তনাদের স্যারেন্ডারের আবেদন ঃ "ভাই খলিলো হামকো বাঁচালো। হাম স্যারেন্ডার করুঙ্গা।" মরিচা থেকে উঠে বাইরে এসে পাক আর্মির স্যারেন্ডার আবদার। মুজিবুর ও বাচচু নামের দুই মুক্তিযোদ্ধা পাক অবস্থানের অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। মরিচা ছেড়ে উঠে খোলামেলায় দাঁড়ায় পাক আর্মি। মূল মুক্তি কলাম তখনো মরিচার গর্তে অন্তরীণ। দুই পিচকে মুক্তিকে দেখে পাক বিস্ময়! আকস্মিক চমকের ধাক্কায় দুই মুক্তিকে গুলিতে ধরাশায়ী করে সারেন্ডারের আহ্বান রাখা পাক আর্মি। পাক আর্মির আত্মসমর্পণের আবেদনের ধোঁকা বুঝার গলতিতে গুলিবিদ্ধ দুই কিশোর মুক্তি এভাবে অকালে প্রাণ দেয়।

সশস্ত্র দুই মুক্তির কেউ পাল্টা গুলি করার সুযোগ পায় নি। গুলিবিদ্ধ দুই সশস্ত্র যোদ্ধা পানিতে পড়ে যায়। আহত অন্যান্য মুক্তি ঘণ্টাখানেকের মত পানিতে পড়ে আছেন। রক্তক্ষরণে তাঁরা কাবু। আহত মুক্তির রক্ষা যে আগ বাড়িয়ে পাক আর্মি তাঁদের ধরেনি। কারণ আপনা জান বাঁচানোর ধান্দার ভয়ে তারা ভীত। ধৈর্য ও শৌর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি বীর মুক্তি বাচচু মৃত্যু যন্ত্রণার মুখেও কোন প্রকার সাড়া শব্দ করে শত্রুকে নিজের অবস্থানের নিশানা দেয়নি। আহত সঙ্গী মুজিবুর বাঁচতে পারে ভেবে মৃত্যু যন্ত্রণার বেদনা নীরবে সইলেন বাচচু। এক মহীয়ান শাহাদতের গৌরবের সৌরভে ঝরে গেলেন বাচচু। মুক্তি সহমর্মিতার তিনি উজ্জ্বলতম প্রতীক। আল্লাহর দরবারে আহত মজিবুরের বাঁচার প্রার্থনা।

কমান্ডার খলিল আহত মুমূর্ষু মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুরকে ত্বরিৎ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। যমে-মানুষে টানাটানির চিকিৎসায় রক্ষা পান মুজিবুর।

বিজয়ী বীর সংবর্ধনা ঃ মাদারিপুর হাসপাতালের বেডে শুয়ে দেশ স্বাধীনের সুসংবাদ পান মুজিবুর। জীবনের উদ্দীপনা ও বাঁচার তাগিদ বাড়ে তাঁর। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অগণিত জনতা ফুলের তোড়া নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে আসে মাদারিপুর হাসপাতালে। আহত মুক্তিকে সামনে রেখে জনতা প্রচেশন করেন। প্রকাশ্য দিবালোকে বিপুল জনতার সামনে বিজয়ী বীরকে নিয়ে পুরা মাদারিপুর চক্কর দিয়ে বেড়ায় বীর গৌরবে ধন্য জনতা। স্বাধীন দেশের জনতার ভালবাসায় অভিসিক্তধন্য বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা। হায় এমনি সাধের সুখ-স্বপ্নের স্বাধীনতা চিরঞ্জীব হোক।

মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কার : দেশ স্বাধীনের জন্য যুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। বাঙালির স্বপ্ন-সাধ একুশের চেতনা বাংলা ভাষায় কথা বলবো। আল্লাহর অসীম করুণা জনতার দোয়ায় মরণ পারের শেষ যাত্রী যুদ্ধাহত পঙ্গু আজ বেঁচে আছি। স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। পাওয়া না পাওয়ার বেদনা থাক। আল্লাহ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কোন ভাতার জন্য তেমন চিন্তা ভাবনা করিনি। কোন কল্যাণ ভাতা পাইও না।

জীবন সংগ্রামে : দেশ স্বাধীনের পূর্বে আব্বার অনেক জমিজমা ও বিত্ত-বেসাত ছিল। দেশ স্বাধীন হলে দেশে আকাল দেখা দেয়। ঘরে ঘরে হাহাকার। হা অন্নের বিলাপ। অভাব-অনটন। যে জনতার মাঝে প্রতিপালিত মুক্তিযোদ্ধা সে জনতার অভাব অনটনের মৃত্যু দৃশ্য তাঁর অসহ্য। ১৯৮৪ সালে আব্বার জমিজমা বেচে স্থানীয় দুঃস্থ জনতার মুখে অন্ন জুগিয়েছি। নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে যায় দিন।

জনতার শ্রদ্ধাঞ্জলি : মাদারিপুরের কালকিনির জনতা নিখাদ সোনা চিনার সুযোগ পেলেন। এমন অবাক করা অভাবিত দান জনতার হৃদয় স্পর্শ করে। কালকিনির ঘরে ঘরে সৈয়দ আবুল হোসেন ও মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুরের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯০-র জাতীয় নির্বাচনে কালকিনির আইন মজলিশের জাতীয় নির্বাচনে আবুল হোসেনকে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে প্রচারণা চালান নির্লোভ মুক্তি। জনসমর্থনের বিপুল ভোটে আবুল হোসেন বিজয়ী হন।

ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদে মুক্তি এবার স্থানীয় ইউনিয়ন নির্বাচনে মেম্বার পদে দাঁড়ান। ১৯৯১ সালে স্থানীয় ইউনিয়ন নির্বাচনে কৃতজ্ঞ জনতা দু'হাজার চারশ ভোটে তাঁকে মেম্বার পদে বিজয়ী করেন।

আজকের মুক্তি : যথৌ নথৌ। পূর্বে যার অনেক কিছু থাকলেও আজ যার কিছুই নেই, তারই নাম যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মুজিবুর রহমান সরদার। বিবাহিত মুক্তি পাঁচটি কন্যারত্নে ধন্য : শিল্পী, লিপি, পপি, মুক্তা ও ঝিনুকমালা। রতনে রতনে চিনে সযতন অন্বেষণে। দূরপল্লির অখ্যাত-অজ্ঞাত নিভৃত কোণের নিবেদিত প্রাণ যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে বের করেন এম পি সৈয়দ আবুল হোসেন। তাঁর মহতী উদ্যোগে কালকিনিতে দুটি কলেজ, একাধিক বেরসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অজপাড়া গাঁয়ের খুঁজে নেয়া মুক্তিযোদ্ধার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে দ্রুত এগিয়েছে।

বিজয় চেতনার আসফালনের মেদিনী কাঁপায় বহুতর ফালতু মুক্তি। নিভৃত গ্রামের মাটির মানুষের সেবাকে মূলধনের পুঁজি করার মৌলিক উপাদান তাঁরা ভুলে গেছেন। এখানেই জনগণ প্রত্যাখ্যাত মুক্তির পতন শুরু। হায় অন্যান্য মুক্তিরা যদি যোদ্ধাহত মুক্তি মুজিবুরের পদাংক বেছে নিতেন।

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ওরে তার ক্ষয় নাই ক্ষয় নাই।

বীর প্রশস্তি : মুক্তিযুদ্ধের বহু বীর জন্ম দিয়ে ফরিদপুর ইতিহাসে অক্ষয় আসন লাভ করেছে। বিখ্যাতদের নিয়ে অনেকে ব্যস্ত আছেন বিধায় নাম না জানা বহু বীর যোদ্ধা অবহেলায় তলিয়ে যাচ্ছেন স্মৃতির অতলে। আয়ুষ্কালে তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষণ না করলে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ও যোদ্ধার বিবরণ হারিয়ে যাবে। ১৯৭১-এর প্রবাসী সরকার, ভিখিরি আর্মি, ২, ৮ এবং ৯ নং সেক্টরের যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে যোদ্ধাহত গেরিলা মুক্তি মোঃ মুজিবুর রহমান সরদারের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কৃতজ্ঞ দেশবাসীর পক্ষ থেকে গাই বীরপূজার বন্দনা গীতি। বীর প্রশস্তিতে জেগে উঠুক লক্ষ প্রাণ। অনাগত ভবিষ্যতে জাতীয় দুর্দিনে জাতি এসব মহাপ্রাণ বীর হৃদয়ের চেতনায় উজ্জীবিত হোক। বীর রক্তের কন্যাদের যশোগাথায় দশদিক আমোদিত হোক। প্রণতি লহ বীর মুক্তি। তোমারি প্রেরণার উদ্দীপনার স্মৃতিতে হাজার সালাম।

রেফারেন্স :

ক। স্মৃতি চারণ-হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম।

খ। স্মৃতি চারণ যোদ্ধাহত মুক্তি মোঃ মুজিবুর রহমান সরদার।

গ। বৃহত্তর ফরিদপুর গেরিলা গ্রুপের সাক্ষাৎকার।

গেরিলা যোদ্ধা মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

অসংখ্য বীর গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার পাদস্পর্শে ধন্য ফরিদপুর। জেলার প্রাক্তন মহকুমা মাদারিপুরের দুর্ধর্ষ গেরিলা মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ওরফে খলিল কমান্ডার। গেরিলা যুদ্ধের অভাবিত সাফল্যে জনতার দেয়া প্রিয় উপাধির ভূষণ 'মেজর'; তাই যুদ্ধকালে তাঁর পরিচয় ছিল 'মেজর খলিল' নামে।

মুক্তিযুদ্ধের ডাক : ১৯৭১-এ খলিল ছিল সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজের এইচ এস সি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। স্বাধীনতার ডাক পেয়ে সতের বছরের তরুণ রক্তে টগবগিয়ে বান আসে, পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের বিভীষিকা, জুলুম-নির্যাতনের প্রতিকারের লক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র যুদ্ধে।

যুদ্ধ প্রশিক্ষণ : প্রথম একশ ষাট জন প্রশিক্ষণার্থী যারা মুক্তিযুদ্ধে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করেন, গেরিলা খলিল তাঁদের অন্যতম। সেখানে কাঁঠালিয়া, মেলাঘর, কমপিনগর প্রভৃতি স্থানে তিনি যুদ্ধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের ভারতীয় অফিসারদের দুজন স্মরণীয়-বরণীয়ের নাম এখনো তাঁর স্মৃতিতে ভাসে–ক্যাপ্টেন মালাম্বা ও ক্যাপ্টেন হানিফ। উচ্চ প্রশিক্ষণের সহমুক্তিযোদ্ধার মাঝে কজনের ছবি সর্বক্ষণ মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করে ওঠে :

১. তসলিম আহমেদ-মাদারিপুর;

২. হারুন-অর-রশিদ, পিতা মৃত বছর উদ্দিন শরীফ, গ্রাম : কলেজ রোড, মাদারিপুর;

৩. আবদুল মালেক, থানা : কালকিনি, জেলা : মাদারিপুর (মুক্তিযুদ্ধে শহিদ);
৪. আলমগীর হোসেন, পিতা : আবদুল গফুর ভূঁইয়া, গ্রাম : শহিদ বাচ্চু সড়ক, জেলা : মাদারিপুর;
৫. এফ এম জাহাঙ্গীর হোসেন, পিতা : আবদুল গফুর ভূঁইয়া, গ্রাম : শহিদ বাচ্চু সড়ক, মাদারিপুর। আলমগীর হোসেন ও এফ এম জাহাঙ্গীর হোসেন দুভাই মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা বীরত্বের অভাবিতপূর্ব স্বাক্ষর রেখেছেন, যে-কারণে তৎকালীন প্রজন্মের কাছে এখনো তাঁরা অতি সম্মানিত নাম।
৬. কাজি আলি হোসেন;
৭. টি এম শহিদুল্লাহ রাজা;
৮. মোনাছের হোসেন শরিফ;
৯. কাজি কামাল;
১০. আমীর হোসেন;
১১. কাজি আবদুর রহমান;
১২. লোকমান;
১৩. হাসমত;
১৪. নাসির উদ্দিন জমাদার;
১৫. আবুল বসার চৌধুরী।

এমনি আরো বহু বীর সৈনিকের যুদ্ধ স্মৃতিতে ভরপুর খলিল বাহিনী।

যুদ্ধ এলাকা : মে মাস পর্যন্ত ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন যোদ্ধা দল দেশে প্রবেশ করেন নি, তখন আত্মরক্ষার জন্য সবাই দলে দলে ভারতে যাচ্ছেন। মুজিবনগর সরকার গঠনের পর প্রশিক্ষণ শিবির চালু হয়। জুন মাসের শেষ দিকে খলিল কমান্ডার দর্শনা শশিকর এলাকায় আসেন। প্রায় কাছাকাছি সময়ে সুবেদার সিরাজও একটি যোদ্ধা-গ্রুপ নিয়ে ওই নিরাপদ এলাকায় আস্তানা গাঁড়েন। ইতোমধ্যে দুই গ্রুপের আধিপত্য নিয়ে গুলি বিনিময় হয়, যেন যোদ্ধাদের আর কোন কাজ নেই। সুবেদার সিরাজের ভাই ডা. মালেক নিহত হন খলিল গ্রুপের গুলিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের পারস্পরিক কোন্দল থামাতে অকুস্থলে আসেন হেমায়েত। পরবর্তীতে খলিল রাজৈর থানার আইশের কমলাপুরে ঘাঁটি গাঁড়েন। পাক আর্মির অতর্কিত আক্রমণে সেখানে খলিল গ্রুপ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। দল পুনর্গঠনে তারা আবার ভারত যাত্রা করেন। সুসংগঠিত খলিল গ্রুপ পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেন সেপ্টেম্বরে। ইতোমধ্যে যুদ্ধমাণ গ্রুপের অপর নেতা সুবেদার সিরাজ-গ্রুপ তাদের স্থান বদল করে উত্তর মাদারিপুরে গিয়ে ঘাঁটি ফেলেন।

খলিল কমান্ডার মুক্ত চেতনার স্বাধীন পরিবেশে গড়ে ওঠা যোদ্ধা; সুবেদার সিরাজ নিয়ম-শৃংখলার আর্মি প্রশিক্ষণে বেড়ে ওঠা। যুদ্ধ-সাহস, সৃজনী ও গণ আস্থায় খলিল

কমান্ডার সুবেদার সিরাজের চাইতে বহুগুণ বাড়া। স্বাধীন দেশে খলিল রাজনৈতিক চেতনায় জাসদ-পন্থী। তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে একাধিকবার মাদারিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে আসীন করেছে। যুদ্ধকালে খলিল কমান্ডার হেমায়েতবাহিনীর সঙ্গে সখ্য ও যোগাযোগ স্থাপন করে যুদ্ধ করেছেন।

'ফরিদপুর জেলা' ছিল ২, ৮ এবং ৯নং সেক্টরের মিলিত এলাকা। ২নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশারফ-এর নির্দেশে কর্ণেল শওকত আলি গেরিলা খলিলকে মাদারিপুর থানা কমান্ডারের নিয়োগপত্র দেন। তাঁর সাথে প্রশিক্ষণ নেয়া ১৬০ জনের তিনি কমান্ডার নিযুক্ত হন। সেই ১৬০ জনের মধ্যে ২১ জনের প্রাথমিক যোদ্ধা দল নিয়ে খলিল বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। প্রাথমিক অস্ত্র প্রতিজনে দুটি করে হ্যান্ড গ্রেনেড-২১X২=৪২+২=৪৪ টি এস এম জি। মুক্তির পরবর্তী অস্ত্রের কিছু আসে ভারত থেকে। এ-ছাড়া, অস্ত্রের সিংহভাগ তাঁরা শত্রুর সাথে লড়ে দখল করেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ঃ মুক্তিরা বুঝেছিলেন বিদেশে প্রশিক্ষণের বিপদ অনেক। বিদেশে আসা যাওয়ার গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং ধরা পড়ে গোপনীয়তা ফাঁস করা ধরনের বহু ঝুঁকি ইত্যাদির মোকাবেলা করতে হয়। দেশী দালাল, শত্রুগোয়েন্দার চোখে সব করতে বহু শ্রম ও শক্তির অপচয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। বিদেশের প্রশিক্ষণ যে-কোন সময় বন্ধ ও কিংবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। বহু ভেবে-চিন্তে অবশেষে বাংলাদেশের ভিতরে স্থানীয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলা হয়।

খলিল কমান্ডার প্রভাবিত এলাকার তিনটি প্রধান মুক্তি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প :

১. কলাগাছিয়া-মাদারিপুর;
২. কেন্দুয়া-মাদারিপুর; এবং
৩. পাতুল্লা-রাজৈর থানা।

স্বয়ংসম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ঃ খাদ্য, চিকিৎসা, ঔষধ, সংবাদ আদান-প্রদানের কুরিয়ার পদ্ধতি, গোয়েন্দা বিভাগ, যুদ্ধ প্রশিক্ষণ, অর্থ সংগ্রহ ধরনের কাজে মুক্তি খলিলের প্রশাসন ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ডাক্তার শ্যামাচরণ বৈদ্য ও ডাক্তার রায়মোহনের সাহায্যে ঔষধ সংগ্রহ, চিকিৎসা, টাকা পয়সা জোগাড়, খাদ্য ভাণ্ডার পূর্ণ করা ও সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ চলতো। ডাক্তারের কাছে রোগীর ছদ্মবেশে যাতায়াতের মাধ্যমে সহজে কাজ চালানো হতো। ডাক্তারেরও রোগী দেখার নামে সর্বত্র ছিল অবাধ যাতায়াত। ফলে ডাক্তারগণ সহজে সবদিক সামলে মুক্তির কাজ করতে পারতেন। ভারতের সাথে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতেন স্বয়ং কমান্ডার খলিল। বহুবার এজন্য তিনি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আসা-যাওয়া করেছেন। তাঁর কোম্পানিতে মুক্তি গোয়েন্দা কার্যক্রমে দুজনের অবদান সর্বাধিক :

১. শাহজাহান হাওলাদার, থাকন্দি-মাদারিপুর এবং
২. শহিদ মানিক শরীফ, থাকন্দি-মাদারিপুর।

মুক্তি বিচার ব্যবস্থা ও দালালবাহিনী ঃ মুক্তিদের দেশী-বিদেশী দুধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সহায়তার কারণে অগণিত অজ্ঞাতনামা মানুষের বাড়ি ঘর জ্বলেছে, লুটপাট হয়েছে, অনেকে নিহত হয়েছেন। এসবের মূল হোতা স্থানীয় দালাল। উল্লেখযোগ্য দালালদের ক'জন:

১. আঃ হামেদ খন্দকার-মাদারিপুর,
২. মহিউদ্দিন খন্দকার-মাদারিপুর,
৩. জাহাঙ্গীর উকিল-মাদারিপুর,
৪. মোস্তফা মৌলভী-মাদারিপুর, এবং
৫. হায়দার মিয়া-মাদারিপুর।

স্থানীয় রাজাকার, আলবদর, আল শামসদের দ্বারা আহত-নিহত-গুম-খুনের হিসাব কোন কালেই মিলবে না। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক। দোর্দণ্ড প্রতাপের পাকিস্তানি মদদে তারা তাদের গায়রে ইসলামি হুকুমতের নামে ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে এলাকায়। সমরে-শান্তিতে মুক্তি-বিচার কখনো সীমা লঙ্ঘন করে নি। স্থানীয় দালাল ও অত্যাচারীদের মুক্তি ক্যাম্পে ধরে আনা হতো। তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হতো। সব ধরনের জিজ্ঞাসাবাদে দোষী প্রমাণিত হলে উপযুক্ত শাস্তির খড়্গ নামতো তাদের ওপর। ত্রিশ লক্ষ শহিদের দেশে মুক্তি বিচারের ঔদার্যে অগণিত দেশী দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-শামস, জামাত, লীগার রক্ষা পেয়েছে। মুক্তি বিচারের উদারতায়ই তারা পরবর্তীকালে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হবার সুযোগ পায়। স্বাধীন দেশে কোন রাজাকার, আলবদর, আল-শামস গুম খুন, গুপ্ত খুন, রাজনৈতিক খুন, প্রতিহিংসার শিকার হয় নি। আজও যত গুম খুন, রাজনৈতিক হত্যার শিকার সবাই মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তি-বিচার ক্ষমতার উদারতার এই পরিণতি! বাঙালির আত্মকলহের রক্তপাত বন্ধে করুণা সিন্ধুর মতই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদারতা দেখিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকেই প্রাণ দিয়ে ক্ষমার উদারতায় হারিয়ে যেতে হলো। ইতিহাসে ক্ষমার শীর্ষ নজিরের এমনি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। পৃথিবীর সকল নবীর উম্মতের সম্মান দেখাতে তিনি নিজের উম্মতদের শিক্ষা দেন। ইহুদিদের প্রতি তাঁর উদারতা অবিস্মরণীয়। আর সে ইহুদিদের হাতেই আজ চরম মার খায় তাঁরই উম্মতে মোহাম্মদী। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর ইজরায়েলের অত্যাচার তারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর। ধাক্কা না খেলে শিক্ষা হয় না। ফিলিস্তিনের মুসলমানরা অবশেষে জেগেছে বলে মনে হয়। মরে মরে ছাফ হবার আগে যদি মুক্তিযোদ্ধাদের চৈতন্যোদয়ে আত্মকলহ বন্ধ হয়, তা'হলেই ভাল।

মুক্তি-বিচারের সুফলে বিজয় লগ্নে বিপক্ষ যোদ্ধার দেশী-বিদেশী দুদলই স্বেচ্ছায় মুক্তি হাতে আত্মসমর্পণ করে রক্ষা পান।

নিজেদের নিরাপত্তা ঃ সত্য লুকিয়ে লাভ নাই। বাংলাদেশের ব্রিজ কালভার্টের সব যে পিছানোর পথে পোড়া মাটি নীতিতে ধ্বংস করেছে পাকিস্তানি আর্মি, তা ঠিক নয়। মুক্তিবাহিনী নিজেদের নিরাপত্তায় অনেক কিছু ধ্বংস করেছে। এমনি মুক্তি ক্যাম্প

ছিল সমাদার হাট ব্রিজ। তার পার্শ্ববর্তী কিছু ব্রিজ উড়িয়ে পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিরোধে মুক্তিরা নিশ্চিত হতে চেয়েছে।

সম্মুখ সমরে খলিল বাহিনী ঃ পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের দোআঁশলা দোসর স্বদেশী বাহিনী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়তে হয়েছে খলিল বাহিনীকে। পাকিস্তানি আর্মির বড় খুঁটা দেশী প্যারামিলিশিয়া ও দালাল। এদের পর্যুদস্ত করে নির্মূল করার মধ্যে পাকিস্তানি ভিত্ নাড়িয়ে দেয়ার নীতি বেছে নেয় খলিল বাহিনী। তাই দেশী দোসর পাকিস্তানি ভক্ত প্যারামিলিশিয়াদের সাথে সর্বাধিক যুদ্ধ করেছে তারা। দেশী প্যারামিলিশিয়াদের মনোবল, শক্তি বৃদ্ধি, ও যুদ্ধ কৌশল শিখানোর নামে তাদের সঙ্গে থাকতো পশ্চিমা নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী। পাকিস্তানি প্রভাবের দেশী প্যারামিলিশিয়া অবস্থান আক্রমণে বাঙাল মিলিশিয়ার সাথে খলিল গ্রুপের সঙ্গে যুদ্ধে বেঘোরে মরেছে পশ্চিমা নিয়মিত ও অনিয়মিত পাকিস্তানি সেনা। মাদারিপুরের বহু স্থানে এমনি খণ্ড যুদ্ধে লড়ছে খলিল বাহিনী। অনিয়মিত বাহিনীর সাথে লড়াকে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা ভাবতো মুক্তিরা। শেষ পর্যায়ে দক্ষতা, সাহস, যুদ্ধ কৌশল ও যোদ্ধা সংখ্যা বাড়তে মুক্তিরা নিয়মিত পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়।

মাদারিপুর মুক্ত করার যুদ্ধ ঃ মুক্তিযুদ্ধের তখন শেষ পর্যায়, মিত্র বাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভারতীয় আর্মি দখলদার বাহিনীর সদরদপ্তর ঢাকা যাত্রায় ব্যস্ত। তাদের প্রধান যাত্রাপথের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করতে হয়েছে। এর বাইরেও দেশের সর্বত্র ছোট বড় শহর-গঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানি আর্মি অবস্থানের ওপর আক্রমণ চালায় মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানি আর্মির পলায়নের সব রাস্তা বন্ধ করে দেয় বাংলার মুক্তিসেনা।

মাদারিপুর মুক্ত করতে খলিল বাহিনী তিনদিন যুদ্ধ করে। তারা এবার সরাসরি নিয়মিত পাকিস্তানি আর্মির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১; পাকিস্তানি আর্মির যাত্রা পথের তথ্যনিষ্ঠ গোয়েন্দা সংবাদ পৌঁছে মুক্তির হাতে। মাদারিপুরের পাকিস্তানি আর্মি ফরিদপুর যাচ্ছে। তাদেরকে অ্যাম্বুশের সিদ্ধান্ত নেয় খলিল বাহিনী।

পারন্যাল মাইক সমাদার ব্রিজ অ্যাম্বুশ পয়েন্ট। ব্রিজে এন্টি ট্যাংক মাইন পোঁতা হয়। ব্রিজের চারপাশে এন্টি-পার্সোনাল মাইন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাটির নিচে বিছিয়ে রাখা হয়। ব্রিজের কাছাকাছি নিকট দূরত্বে লুপানো রয়েছে মুক্তি জমায়েত বা আরতি। ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যার মধ্যে মুক্তি-অ্যাম্বুশ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়।

৮ ডিসেম্বর সকালে শত্রু ফরিদপুরের পথে মাদারিপুর ত্যাগ করে। ঘটকচরে তারা মুক্তি আক্রমণের পাল্লায় পড়ে। দু'দলে তুমুল যুদ্ধ চলে। চোরাগোপ্তা আক্রমণে অভ্যস্ত মুক্তির এমন সদর রাস্তায় দিনে দুপুরে খোলাখুলি আঘাতের জন্য পাকিস্তানি পক্ষ বিস্মিত হয়। মুক্তি-আক্রমণ প্রতিহত করে ফরিদপুরের মূল পাকিস্তানি আর্মি কলামের

সাথে মিলতে না পারলে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি গ্রুপ মুক্তিবাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হবার ভয়ে মরিয়া লড়াই চালায়। প্রশংসনীয় মনোবলের সঙ্গে ইয়া আলি, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবার ধ্বনির মেদিনী উদার মহা আরবে তারা মুক্তিবাহিনীর উপর আপতিত হয় বাঁচার লড়াইয়ে। ইসলামি জিহাদের উন্মাদনার সুতীব্র আক্রমণে তারা মুক্তির ওপর চড়াও হয়। নিজেদের হতাহতের পরোয়া না করে তাদের অগ্রাভিযান জারি রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মুক্তিসেনার ইজ্জত, খলিল বাহিনীর সম্মান, বাংলার স্বাধীনতার নামে শাহাদত, মাদারিপুর মুক্তির চরম লড়াইতে মুক্তিবাহিনী লা-পরোয়া। তারাও ইয়া আলি, আল্লাহু আকবর, জয় বাংলার রণোন্মাদনায় আত্মঘাতী লড়াইয়ে নিবেদিত। যুদ্ধের তীব্রতায় দুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। একদিনের যুদ্ধ তিন দিনে গড়ায়, ৮-১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে বিরামহীন যুদ্ধ।

হিট এন্ড রান (আঘাত হেনে দৌড়) লড়াই ছেড়ে মুক্তির আঘাতের প্রত্যাঘাত (হিট এন্ড স্ট্যান্ড) লড়াই চলছে। মুক্তি স্বভাবের এমন ব্যতিক্রমী যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মি হতচকিত হয়ে পড়ে। সর্বত্র মুক্তি হিট এন্ড স্টেন্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পাকিস্তানি আর্মিকে পর্যুদস্ত করছে। পাকিস্তানি আর্মির পরস্পর বিচ্ছিন্ন গ্রুপকে মুক্তিরা চরম আঘাত হেনে নিশ্চিহ্ন করে চলছে। এরপরও মুক্তির সকল বাধা দলিত মথিত করে পাকিস্তানি আর্মি অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখায় সচেষ্ট।

বিজয়ী পাকিস্তানি বাহিনী তাদের যাত্রাস্থল ফরিদপুর অভিমুখে ধেয়ে চলে। লুঙ্গি, নেংটি, উদোম গা, খালি পা'র ভেঁদর মুক্তিদের হটিয়ে বিজয়োন্মত্ত বাহিনীর অগ্রযাত্রা। এবার তাদের উপস্থিতি মুক্তি ফাঁদ সমাদার ব্রিজ।

মুক্তি পরাজয়ের পশ্চাদপসরণ যে ফেইন্ট এটাক বা আক্রমণের ভান মাত্র তা পাকিস্তানি আর্মি কোন ক্রমেই বুঝতে পারে নি। একাধিক দিনে মূল আক্রমণ স্থলের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের চাতুরি তাদের ধারণার বাইরে। মুক্তির মূল আক্রমণ স্থল সম্পর্কে পাকিস্তানি গোয়েন্দা খবরের ব্যর্থতা পাকবাহিনীকে মুক্তি ফাঁদে টেনে নেয়।

সমাদার নামক স্থানের ব্রিজে মুক্তির পাতা এন্টি ট্যাংক মাইনে তাদের যানবাহন বিধ্বস্ত হয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। যানবাহন ছেড়ে পায়ে দল যাত্রায় তাদের লড়াই হয়। এবার ব্রিজের নিচে, আশেপাশে পুঁতে রাখা এন্টি পার্সোনাল মাইনে তাদের প্রচুর হতাহত হয়। পূর্বে খনন করা পাকিস্তানি বাংকারে ঢুকে তারা লড়াই জারি রাখে।

ফাঁদে ফেলা অবরুদ্ধ পাকিস্তানি আর্মির সাথে এখানে মুক্তির তুমুল লড়াই হয়। সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন মুক্তিযোদ্ধা সরোয়ার হোসেন (বাচ্চু)। আহত হন মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন।

শত্রু দখল বিচূর্ণ করতে মুক্তির মৃত্যুপণ দৃঢ়তা প্রদর্শন এখানকার একটি আলোচ্য বিষয়। মুক্তিরা দশ ডিসেম্বর সকালে শত্রু বাংকারে সরাসরি গ্রেনেড নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়। এই গ্রেনেড আক্রমণে সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা শত্রুর গুলিতে শাহাদত বরণ করতেই যেন মুক্তি-রক্তে আগুন ধরে যায়। ১০ই ডিসেম্বরের লড়াইয়ে খলিল বাহিনীর

জীবনের শেষ দৃঢ়তার কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় ঘটে। ত্রিশজন নিয়মিত সেনা, বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি প্যারামিলিশিয়ার রাজাকার-আল বদরের সাথে পাকিস্তানি মেজর খটক মুক্তি ঔদার্যের দুয়ারে আত্মসমর্পণ করে।

মাদারিপুর শেষবারের মত শত্রুমুক্ত করার আনন্দে মুক্তিরা শত্রুর প্রতি জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করেন। নিজেদের হতাহতের সামনে শত্রুর প্রতি এমন উদারতা কমান্ডার খলিলের মত বীর হৃদয় যোদ্ধার পক্ষেই সম্ভব।

খলিল বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা ঃ এ-যুদ্ধে খলিল বাহিনীর হতাহতের ক'জন :

শহিদ ঃ

১. শহিদ সরোয়ার হোসেন বাচ্চু-মাদারিপুর;

২. শহিদ মানিক শরিফ-মাদারিপুর, এবং

৩. শহিদ আবদুল মালেক-কালকিনি।

শেষোক্ত জন পরবর্তীকালে মুজিব বাহিনীর নৃশংসতায় নিহত হয়। দেশকে নেতৃত্বশূন্য করার, প্রতিপক্ষ শূন্য করার আওয়ামী রাজত্বের মুজিববাদের বাইরে সব বরবাদ করার সংকল্পে মুজিব বাহিনীর প্রতিপক্ষ হত্যার ষড়যন্ত্রে নিহত তিনি। নাম নিশানাহীন উর্ধ্বতনের সূক্ষ্মচালের নির্দেশে সারাদেশে মুজিব বাহিনী এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায়।

আহত ঃ ১. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান-খলিল বাহিনী প্রধান স্বয়ং; ২. আকতার-মাদারিপুর।

আত্মশুদ্ধি ঃ খলিল বাহিনীতে সপক্ষত্যাগী কোন বিশ্বাসঘাতকের অস্তিত্ব ছিল না। নেতৃত্বের গুণে আত্মকলহের কোন ঘটনা ঘটেনি তাদের মধ্যে। ব্যক্তিগত শত্রুতা, রাজনৈতিক শত্রুতা, ভবিষ্যত নেতৃত্বের পরশ্রীকতারতা জনিত প্রতিহিংসার খুন বা লাঞ্ছনার কোন কাণ্ড ঘটে নি।

অন্যান্য বাহিনীর সাথে সম্পর্ক ঃ রাজনৈতিক ও ব্যক্তি প্রভাবাধীন বহুতর বাহিনী প্রভাবিত মুক্তিবাহিনী। একই এলাকায় একাধিক বাহিনী। মত ও পথের পার্থক্য থাকলেও সকলের মূল উদ্দেশ্য দখলদার বাহিনী ধ্বংস করে দেশ স্বাধীন করা। অন্যান্য স্থানের ন্যায় মুজিব বাহিনীর সাথেও খলিল বাহিনীর সম্পর্ক ছিল।

ফরিদপুরের কালজয়ী হেমায়েত বাহিনীর সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক রেখে কাজ করেছে খলিল বাহিনী। বৃহত্তর ফরিদপুরের প্রতিটি গাছের পাতার সাথে হেমায়েত বাহিনীর অবদান জড়িয়ে আছে। যুদ্ধকালের ভাল কার্যকলাপের ফলেই মুক্তিযোদ্ধারা এত শীঘ্র দেশ স্বাধীন করতে পেরেছে। মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কারে হেমায়েত ও খলিলের মিল আছে।

মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কার ঃ যুদ্ধ শেষে মাদারিপুর মিলিশিয়া ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সনদ/সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। খলিল বাহিনী সেখানে অস্ত্র জমা দেয় এবং বাহিনী প্রধান নিজেও সেখান থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে

শিক্ষা জীবনে ফিরে যান। সরকারি নাজিমুদ্দিন কলেজ থেকে এইচ এস সি ও বি এ ডিগ্রি লাভ করেন।

যুদ্ধ পরবর্তী জীবনে নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাসদের সাথে জড়িয়ে পড়েন খলিলুর রহমান। তিনি ১৯৭৩ সালে মাদারিপুর ছাত্র লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে ৮ জানুয়ারি স্থানীয় এক আওয়ামী লীগার খুনের মামলায় তাঁকে জড়ানো হয়। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি হত্যা মামলায় জড়িয়ে তিনি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। সর্বহারা পার্টির হাতে নিহত বহুতর আওয়ামী লীগার মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়। স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টে ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক থাকেন তিনি। অকথ্য নির্যাতনে যোদ্ধার ধৈর্য পরীক্ষা করা হয়। ১৯৭৭-এর মে মাসে ফরিদপুর কারাগার থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরস্কার ধন্য ফরিদপুরের দুই কৃতী মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত ও খলিলের অপূর্ব মিল। ১৯৭৩-এর নির্বাচন-পরবর্তী কোন্দলে কোটালিপাড়া লেবু হত্যা মামলার আসামি হন হেমায়েত। ১৯৭৪-এ আওয়ামী লীগার হত্যার আসামি হন খলিল। দুজনই জেল নির্যাতনের শিকার। মুক্তিযুদ্ধে যার অবদান যত বড় নির্যাতনের শাস্তিও তত বড় বেদনার। তাই হেমায়েতের শিরে নামে ফাঁসির আসামির বিচার। হায়, এটাই মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কার!

আওয়ামী লীগের পতাকাতলে মুক্তিযুদ্ধ করে আওয়ামী লীগার হত্যার আসামি হন জানবাজ মুক্তিযোদ্ধারা। স্থানীয় রাজনৈতিক কোন্দলের, রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ঘৃণ্য পরিণতির শিকার নিষ্পাপ মুক্তিযোদ্ধা। এসব থেকে পরিত্রাণের জন্য আওয়ামী লীগের বাইরে আশ্রয় না খুঁজে মুক্তিযোদ্ধার আর উপায় কি? প্রাক্তন রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করে বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য।

মুক্তিযোদ্ধার প্রতি জনতার কৃতজ্ঞতা : মাদারিপুরের সন্তান খলিল। যত খুনের মামলা জেল অত্যাচার চলুক জনতা তাদের প্রিয় মুক্তিযোদ্ধাকে ভুলেনি। তিনি আজ মাদারিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান। যোদ্ধার হাত এবার জনগণ কল্যাণে ভরে উঠুক।

আজকের খলিল : জীবনের উত্থান-পতনে সমাজ সেবাকে মানব সেবা হিসাবে বেছে নেন তিনি। দেশ সেবার অংশ হিসেবে পরবর্তীকালে নিম্ন-লিখিত স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হন মুক্তিযোদ্ধা খলিল :

১. সহ-সভাপতি-মাদারিপুর ক্রীড়া সংস্থা,
২. জেলা সহ-সভাপতি-শিল্প কলা সংস্থা,
৩. মাদারিপুর পাবলিক লাইব্রেরির স্থায়ী সদস্য,
৪. রেডক্রিসেন্ট আই জি'র আজীবন সদস্য,
৫. স্থানীয় ক্রিকেট ক্লিনিক ক্লাবের সভাপতি,
৬. শহিদ স্মৃতি ক্লাবের সভাপতি,
৭. উদীচী শিল্প গোষ্ঠীর উপদেষ্টা,
৮. মাদারিপুর লিগেল এইড এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা।

খলিল কমান্ডারের রক্ত-সম্পর্ক ও ঠিকানা : জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৪। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- কলেজ রোড, পোঃ+থানা+জেলা : মাদারিপুর, পিতামৃত আবদুল জলিল খান, মাতা-জরিনা বিবি। স্ত্রী-তাহমিনা বেগম (লিলি), ছেলে- তৌহিদুল ইসলাম, মেয়ে-রাবেয়া রহমান (লিজু)। বড় বোন-রাজিয়া বেগম-পেশা-গৃহকর্ম, মেজ বোন-শাহানা বেগম-পেশা-গৃহকর্ম, বড় ভাই-আবদুল জলিল-পেশা-চাকুরি; ছোট ভাই-খবির উদ্দিন, পেশা-চাকুরি।

শূন্য হতে কিছু গজায় না। যে পরিবার ও পরিবেশ দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত বীর যোদ্ধার জন্ম দিয়েছে লেখক তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বীর প্রসবিনী বাংলায় অনাগত ভবিষ্যতে এমন অগণিত বীর যোদ্ধা জন্ম নিক। মুক্তি-রক্তের সন্তান সন্ততিদের গৌরবের সৌরভে দশদিক আমোদিত হোক।

মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য : যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা আজো বাস্তবায়িত হয় নি। সকল রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যাবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম। একটি রাজনৈতিক দলও মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মহতী অবদান সম্পর্কে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার পবিত্র দায়িত্ব।

বীর বন্দনা : মুক্তিযুদ্ধে কার অবদান কত বেশি তার মূল্যায়ন করবে অনাগতকালের নিপেক্ষ গবেষণা ও তার ফলশ্রুতিতে রচিত ইতিহাস। স্বাধীনতা যোদ্ধার পূজনীয় সম্মান যুগে যুগে। একাত্তরে যে সর্বকনিষ্ঠ যোদ্ধা মাত্র পনের বছর বয়সে যুদ্ধে অংশ নিয়ে লড়েছে দেশমাতৃকার জন্যে, আর মাত্র কিছুদিন পরে তিনি হারিয়ে যাবেন এই মাটির পৃথিবী থেকে। তখন লক্ষ-কোটি টাকা দিয়েও একজন মুক্তিযোদ্ধা খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেশের শতসহস্র মুক্তিযোদ্ধাসহ মাদারিপুরের সংশপ্তক মুক্তিযোদ্ধা খলিল কমান্ডারকে ফরিদপুরের জনতা, এ-দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। অনাগত ভবিষ্যত গাইবে ফরিদপুরের যোদ্ধার যশোগাথা। অনাগত ভবিষ্যতের জাতীয় স্বাধীনতার দুর্বিপাকে জনতা তাঁদের সংগ্রামী জীবন থেকে অনুপ্রেরণা পাবে। তাঁরা এ জাতির দুর্দিনের দিশারি। (একান্ত সাক্ষাৎকার-মাদারিপুর খলিল বাহিনী কমান্ডার মোঃ খলিলুর রহমান)।

ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল

ফরিদপুর-গোপালগঞ্জ মুক্তি দুর্বলতা : বাংলাদেশের প্রাক্তন বৃহত্তর দুটি জেলা ভারতের সাথে বর্ডার শূন্য। ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার ভারতের সঙ্গে কোন বর্ডার না-থাকায় ওই এলাকায় পাকিস্তানি আর্মি বিলম্বে প্রবেশ করে। তখনকার পরিস্থিতিতে পাকিস্তান আর্মির প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল বাঙালি দুষ্কৃতকারীদের তাড়িয়ে বর্ডার পার করে দেয়া। বিদেশের সাথে ফরিদপুর ও বরিশালের বর্ডার না-থাকায়

প্রাথমিকভাবে সে-সব জেলায় দুষ্কৃতকারী মুক্তি খোঁজার প্রয়োজন হয়নি। পাকিস্তান আর্মির চাপ বিমুক্ত ফরিদপুর-বরিশালের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ গ্রুপ প্রতিষ্ঠা লাভের প্রাথমিক সুযোগ পায় ওই সময়টাতে। অন্যান্য বিদ্রোহীরা এই দুই জেলার প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির সুযোগ লাভ করে। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের প্রতি মুক্তি দুর্বলতার অন্যতম কারণ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বাড়ি গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়া। তিনি তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। তাঁর পিতা-মাতা আপন আলয়ে শত্রুর হাতে বন্দি। এমন বহুতর মনস্তাত্ত্বিক কারণে ফরিদপুরের প্রতি মুক্তির সর্বাধিক দুর্বলতা। ফরিদপুর ২, ৮ ও ৯ সেক্টরের আওতায় পড়ায় এই তিন সেক্টরই সর্বাধিক গেরিলা প্রেরণ করে উক্ত জেলায়। ৮ নং সেক্টরের কোম্পানি কমান্ডার মেজর খোন্দকার নাজমুল হুদা ফরিদপুর গোপালগঞ্জ এলাকার মুক্তিকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ আর্মির ইজ্জতের সওয়ালের মতই গ্রহণ করেন। ইন্দোনেশিয়ার বা-পাক (জাতির পিতার) মতই বিশ্বনন্দিত বা-পাক মুজিবের জন্য বাঙালির ইজ্জতের সওয়াল গোপালগঞ্জের মুক্তি। গোপালগঞ্জের যুদ্ধ-বার্তা বিশ্ব-সংবাদ সম্প্রচারে সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে ফলাও করে প্রচার হতো। তার চেয়েও দুরন্ত আবেগময় উত্তেজনায় ফরিদপুর মুক্তির উদ্যোগ নেয় ৯ নং সেক্টর। সেখানে ফরিদপুরের কিছু নিবেদিত মুক্তি অফিসার মিলে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও শেখ মুজিব-এর প্রতি আনুগত্যে তাঁরা ছিলেন ঐতিহাসিক পলাশির যুদ্ধের মোহন লাল ও মীর মদনের মত। এমনি দুজন মুক্তি অফিসার খোন্দকার নাজমুল হুদা ও ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল। তাঁরা দুজনই আগরতলা তথা পিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আসামি ছিলেন। এখানে মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ফরিদপুর প্রসঙ্গ মৃত্যুঞ্জয়ী যোদ্ধা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা খ্যাত ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুলের কিছু বিখ্যাত যুদ্ধ বর্ণিত হলো।

ভাটিয়াপাড়া আক্রমণ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে ৯নং সেক্টর-এর কমান্ডার মেজর এম.এ. জলিল-এর নির্দেশে ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল যুদ্ধ স্থানে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল মেজর জলিল-এর ক্যাম্পের ৮৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি কাশিয়ানি থানার ওরাকান্দি স্কুলে তাঁর বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করেন। তাঁর প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাত পড়ে ভাটিয়া পাড়ায় পাকিস্তানি ক্যাম্পে। এই আক্রমণে বাবুলের ডান হাতের মত সদা সহায়ক ও সক্রিয় ছিলেন কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন মোল্লা। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলায় তিনি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। এই আক্রমণে ইসমত কাদির গামারও একটি ছোট দল শামিল ছিল।

রাত ১-৩০ মিনিটে মুক্তি-আক্রমণ শুরু হয়। ভোর ৬-৩০ মিঃ যুদ্ধ বিরতি। ভোরের আলো ফুটতেই পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান স্যাভর্ জেট-এর স্ট্রেপিংয়ে পড়ে মুক্তিরা। গত্যন্তর না পেয়ে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে হয় মুক্তিদের। এই যুদ্ধে প্রথমাবস্থায় ১৯ জন নিয়মিত পাকিস্তানি সেনা হালাক হয়। মুক্তিবাহিনী তাদের হেডকোয়ার্টার ওরাকান্দি ঠাকুর বাড়ি (হিন্দুদের তীর্থ স্থান) প্রত্যাবর্তন করে। পরবর্তীতে আরও একবার ভাটিয়া

পাড়ায় মুক্তি আক্রমণ হয়। তখনকার ফলাফলে তিনজন খান সেনা অকুস্থলে নিহত হয়।

ভেদরগঞ্জ থানার যুদ্ধ ঃ ১০ অক্টোবর, ১৯৭১; বাবুল ভেদরগঞ্জ থানা আক্রমণ করেন। ইতোপূর্বে সে থানার মুক্তি কমান্ডার আবদুল মান্নান রেকি-বিষয়ক সার্বিক তথ্যাদি প্রদান করেন বাবুলকে। থানার পাকিস্তান ভক্ত বাঙালি পুলিশ-রাজাকারদের সঙ্গে যোগ দেন পাকিস্তানি রেঞ্জার পুলিশ। মুক্তি-পাকিস্তানি দু'দলে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুক্তি-হাবিলদার সরদার মহিউদ্দিন এই যুদ্ধে বীর-জীবনের অত্যুত্তম শৌর্য প্রদর্শন করে শাহাদত বরণ করেন। স্থানীয় শাহজাহানপুর বাজারের কাছে তাঁকে দাফন করা হয়। যুদ্ধে পাকিদের পক্ষে নিহত হয় সর্বমোট ৮৭ জন। পাকিস্তানি রেঞ্জার, বাঙালি পুলিশ-রাজাকারদের হাহাকারের কারবালায় পরিণত হয় সেদিনের ভেদরগঞ্জ থানা।

দামোদিয়া বাজার যুদ্ধ ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১; ভেদরগঞ্জ থানা যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পাক-বাহিনী দামোদিয়া বাজার আক্রমণ করে। স্থানীয় দামোদিয়া বাজার মুক্তি ক্যাম্পে পাকিস্তানি আক্রমণের সংবাদে চাঞ্চল্যের শিহরণ ছড়িয়ে পড়ে মুক্তিদের মধ্যে। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব। স্থানীয় গোসাইরহাট থানা মুক্তি কমান্ডার বাচ্চু ক্যাপ্টেন বাবুলের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর শক্তি সাহস বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। বেলা ১২-৩০ মিনিট নাগাদ তিনটি সৈন্য ভর্তি পাকিস্তানি লঞ্চের আগমন দেখা যায়। মুক্তিরা তাদের সুরক্ষিত পরিখায় অবস্থান নেয়। গোসাইরহাট থানা মুক্তি-কমান্ডার বাচ্চুকে নদীর তীরের রাস্তা প্রহরায় রাখা হয়। অনুমান করা হয় যে, সে রাস্তা ধরেই পাকিস্তানি-আর্মি দামোদিয়া বাজারে প্রবেশ করতে পারে।

শত্রু সৈন্যকে প্রথম দর্শনেই এলএমজি'র ব্রাশ ফায়ার করার নির্দেশ দেন ক্যাপ্টেন বাবুল। শুরু হয়ে যায় দুদলের তুমুল লড়াই। এই যুদ্ধে ব্যবহৃত মুক্তি অস্ত্র ছিল নিম্নরূপ:

ক. এল এম জি-৬;
খ. ২ ইঞ্চি মর্টার-২;
গ. এস এল আর-২;
ঘ. থ্রি নট থ্রি রাইফেল-৪০।

দুপুর সাড়ে বারটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত দু'দলে চলে জীবন পণ যুদ্ধ। নদী তীরের মুক্তি সেনা পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্রযাত্রা রোধে ব্যর্থ হয়। পাকবাহিনীর মর্টারের তীব্র গোলা বর্ষণের মুখে তারা তিষ্ঠাতে পারেনি। মুক্তিবাহিনী প্রহরা-মুক্ত নদী-তীর ধরে পাকিস্তান-আর্মি দামোদিয়া বাজার প্রবেশ করে। বাজারে আগুন ধরাতে মুক্তি আক্রমণকারীর দল দুভাগে বিভক্ত হয়। মুক্তিদের তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে পাকিস্তানি আর্মি। সাঁড়াশি পাকিস্তানি আক্রমণের জাঁতাকলে পড়ে মুক্তিবাহিনীর শৌর্যের চরম পরীক্ষা শুরু হয়।

পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় মুক্তিরা অবরুদ্ধ মুক্তিসেনা ক্যাপ্টেন বাবুল-এর নেতৃত্বে দাঁড়ান, কমান্ডারকে ছেড়ে না যাবার এবং যে কোন মূল্যে

আমৃত্যু লড়ে যাবার শপথ নেয়। বাংলার মাটি ছুঁয়ে, স্বাধীনতার নামে আত্মোৎসর্গের উন্মাদনায় শেষ কলেমা পড়ে যুদ্ধ ময়দানে অবতীর্ণ হয় মুক্তিবাহিনী। স্বেচ্ছা মৃত্যুর অগ্রগামী সুইসাইডেল স্কোয়াড মুক্তি সেনাগণ জীবন দেয়ার জন্য তৈরি। শহিদী উন্মাদনা স্বাধীনতার নামে লড়াইয়ের সে এক অবিস্মরণীয় বিরল মুহূর্ত। বীর নেতৃত্বের উদ্দীপনায় সমর সঙ্গীদের মরণযজ্ঞে ঠেলে দেয়ার উজ্জ্বল কীর্তি রচনা করেন ক্যাপ্টেন বাবুল।

দামোদিয়া বাজার যুদ্ধ ছিল দেশের স্বাধীনতার নামে মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুরের ইজ্জতের লড়াই। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনার দাবি রাখে:

ক। মুক্তিবাহিনীর পক্ষে শহিদ হন: ১১ জন।

খ। পাকিস্তানি পক্ষে নিহত ও আহত হয়েছে:

১. মেজর-১, ক্যাপ্টেন-২, এবং সেনা-৭৬।

২. বাঙ্গাল রাজাকার-৮৪।

ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধের এমন বড় ধরনের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ সংঘটিত হবার নজির বিশেষ আর জানা নেই।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বীরপুত্র বিজয়ী মুক্তিদের পুষ্পমাল্যে বরণ করেন স্থানীয় জনতা। শহিদ মুক্তির দাফনে হাজার হাজার জনতা অশ্রুসিক্ত হয়ে মোনাজাতে অংশগ্রহণ করে। দাফন-কার্যে অগণিত জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে অভিভূত হয় বাংলার দামাল মুক্তি সেনা। হ্যাঁ, শহিদের রক্তরাঙা পথেই মুক্তির অমোঘ যাত্রা। জীবনে ও মরণে মুক্তি পাগল বাঙালি জনতার ভালবাসাই মুক্তিযোদ্ধার পরম সম্পদ।

ফুকরা ও মধুমতি নদী যুদ্ধ : ১. কাশিয়ানি থানায় মধুমতি নদী তীরে ফুকরা-তারাইলে পাকিস্তানি আর্মি ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সাতজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহদত বরণ করেন। মুক্তির হাতে পাকিস্তানি পক্ষে মারা যায় ৭৬ জন নিয়মিত সেনা।

২. সাগর সদৃশ ফরিদপুরের বিল বাওরের গোলক ধাঁধায় পাকিস্তান-আর্মি সহসা যেত না। ফলে সে সব দুর্ভেদ্য অঞ্চল ছিল মুক্তির অভয়ারণ্য। নদীপথে সশস্ত্র পাকিস্তানি লঞ্চের প্রহরা মুক্তিদের বিপাকে ফেলত। মধুমতি নদীতে একাধিক বিপর্যয়ের পরও পাকিস্তান-আর্মি প্রহরায় বেরোয়। রমজানের ঈদের পবিত্র দিনে মধুমতি নদীতে পাকিস্তান-আর্মি ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আহত এক মুক্তি সেনাকে পাকিস্তানি আর্মি ধরে নিয়ে যায়।

লুণ্ঠিত সম্পদ উদ্ধার : যুদ্ধের ডামাডোলে দেশে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। ৯ অক্টোবর, ১৯৭১ সকল কমান্ডারকে কনফারেন্স ডেকে যুদ্ধ নীতি ও আইন শৃঙ্খলার অবনতির ব্যাপারে নীতি নির্ধারণী নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কাশিয়ানি ও মুকসেদপুর থানায় তখন ডাকাতি বেড়ে গেছে। সে-সময় ডাকাতির এক ঘটনায় এক পরিবারেরই একশ তোলা সোনা ডাকাতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার মুক্তি কমান্ডার বাবুলের দ্বারে বিচার চেয়ে প্রতিকার প্রার্থী হয়।

নিজ এলাকায় ডাকাতিকে ব্যক্তিগত পরাজয় ও অপমান হিসাবে গ্রহণ করেন ক্যাপ্টেন বাবুল। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ডাকাতির ১০০ তোলা স্বর্ণ উদ্ধার করে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেন তিনি। মুক্তির এ-জাতীয় বিচারে মুক্তি-প্রশাসনের প্রতি গণ-আস্থা বৃদ্ধি পায়।

দুই বীর যোদ্ধার সাক্ষাৎকার ঃ পল্টনের এক সভায় শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে 'পিন্ডিষড়যন্ত্র মামলা' নামে আখ্যায়িত করেন; সেই মামলা খ্যাত নূর মোহাম্মদ বাবুল। তিনি ছিলেন পাকিস্তান নেভীর কর্পোরাল, মুক্তিযুদ্ধকালে 'ক্যাপ্টেন' পদবি লাগিয়ে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাঁর ছদ্মনাম বাবুল।

ক্যাপ্টেন বাবুল প্রায় ৮০ জনের মত মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গোপালগঞ্জের সাত পাড় আসেন। সে-দিন তাঁর উপদেষ্টা-সঙ্গী ছিলেন (স্বাধীনতা-পরবর্তী শেখ হাসিনা সরকারের প্রধান মন্ত্রীর উপদেষ্টা) ডা. এস. এ. মালেক। প্রকৃতপক্ষে হেমায়েতবাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র রচনার জন্যই বাহিনীর সদর দপ্তর কুমিরায় তাঁদের আগমন। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ আর্মির প্রতিনিধিত্বের প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা মুজিবনগর সরকার প্রদত্ত নিয়োগপত্র বার করে হেমায়েতবাহিনী প্রধানের নিকট পেশ করেন। উক্ত প্রমাণপত্রে হেমায়েতকে হাবিলদার থেকে নায়েব সুবেদার হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তেমন আরেক পত্রে ক্যাপ্টেন বাবুলকে ফরিদপুরের সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগপত্র দেয়া হয়। ডা. এস. এ. মালেককে অর্পণ করা হয় ফরিদপুরের প্রশাসকের দায়িত্ব। মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণস্বরূপ বাহিনীর পক্ষ থেকে আগত অতিথিদের 'গার্ড অব অনার' প্রদান করা হয়।

এই ঐতিহাসিক যোগাযোগ ফরিদপুরের মুক্তিযুদ্ধকে আরও বেগবান করে তোলে। হেমায়েতবাহিনীর নিয়ম-শৃংখলা ও কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি তাৎক্ষণিকভাবে হেমায়েতবাহিনীকে একটি দুই ইঞ্চি মর্টার, একটি ব্রিটিশ এলএমজি, দশটি এসএলআর, এক পেটি ছত্রিশ-হ্যান্ড গ্রেনেড উপহার প্রদান করেন। হেমায়েত বাহিনীর জন্য এটাই বন্ধু রাষ্ট্র ভারত থেকে আগত প্রথম উপহার। প্রতিদানে হেমায়েতবাহিনীর পক্ষ থেকেও বেশ কিছু চিনা অস্ত্র ক্যাপ্টেন বাবুলকে উপহার দেয়া হয়। এর সঙ্গে কিছু নিয়মিত বাহিনীর মুক্তিসেনাও বাবুলের সাহায্যে ন্যস্ত করা হয়। ফলে এঁদের সাহায্যে বাবুল তাঁর নিজস্ব বাহিনী গড়তে বিশেষ সুবিধা লাভ করেন। বস্তুত, এদের সাহায্য ও শক্তি বলেই বাবুল তেদরগঞ্জের দামুড়িয়ায় আক্রমণ চালান। সে-অসফল আক্রমণে হেমায়েতবাহিনীর এগারজন মুক্তি শাহাদত বরণ করেন, অন্যান্যরা হতোদ্যম হয়ে মূল বাহিনীতে ফিরে আসেন।

বাংলার প্রায় এক কোটির মত জনতা মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের শরণার্থী হয়। তারা সব কিছু দেশে ফেলে গেলেও 'পরস্পরের প্রতি কুৎসা' ও 'পরশ্রীকতারতা'-এই দুটি জিনিস সঙ্গে নেয়। ভারতে হিজরতকারীরা অভ্যন্তরীণ যোদ্ধাদের সাফল্যে শংকিত।

তাদের নেতৃত্ব না চলে যায়। শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে সাহস লাগে, প্রবাসে বিনে পয়সায় খানাপিনা পাওয়া যায়, চলুক না যুদ্ধ যতদিন লাগে।

সে যুদ্ধে প্রাণ যেতে পারে। সব কিছু ছেড়ে ভিতরে গজিয়ে উঠা যোদ্ধাদের বদনাম করতে, কুৎসা রটাতে কিছুই লাগে না। ফরিদপুর গোপালগঞ্জের অমিততেজা যোদ্ধা হেমায়েতের যুদ্ধ সাফল্য যত বাড়ে, নেতৃত্বাভিলাসী কাপুরুষদের গাত্রদাহ তত ফুঁসে উঠে। তারা বিদেশে অবস্থান রত প্রবাসী সরকার ও আর্মির কান ভারি করে নানা বিষয়ে। অবস্থা এমন পর্যায়ে যে ৯নং সেক্টরে হেমায়েতকে তাঁর সশস্ত্র বাহিনীর সাথে আত্মসমর্পণের চরম পত্র দেয়া হয়। অবস্থা আত্মবিধ্বংসী যুদ্ধে রূপ নেয়। অবশেষে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাখ্যাত ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুলের তীক্ষ্ণধীর মেধা, ধৈর্য, দূরদৃষ্টির প্রজ্ঞায় মুক্তির আত্মকলহের অবসান ঘটে।

সকল সংশয় বিঘ্নের অনিশ্চয়তা কাটাতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ৯নং সেক্টর থেকে অকুস্থলের তদন্তে তাঁদের একান্ত বিশ্বাস ও আস্থার ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুলকে পাঠান।

বীর পুরুষ চিনে আরেক বীর পুরুষকে। প্রবাসে নেতৃত্বাভিলাসী কাপুরুষদের গাত্রদাহের ফলে হলেও প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এই ঘটনায় মুক্তিযুদ্ধের দুই বীর-হৃদয়ের এক অবিস্মরণী মিলন ঘটে যায় বাংলাদেশের গভীর অভ্যন্তরে। বাবুল স্বয়ং উপস্থিত হন কোটালিপাড়ায় হেমায়েত স্থাপিত ভাসমান মুক্তি-ক্যাম্পে। তিনি অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হেমায়েত বাহিনীর একটি চৌকশ দলের প্রধান অতিথি হিসাবে পাসিং আউটের ফৌজি সালাম গ্রহণ করেন। ২৫ নভেম্বর, ১৯৭১ তিনি পুনরায় যুদ্ধ পরিকল্পনায় কোটালিপাড়ায় হেমায়েত ক্যাম্পে আসেন। ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাবুল ও হেমায়েতের যৌথ উদ্যোগে কোটালিপাড়া শত্রু মুক্ত হয়।

গোপালগঞ্জ দখল ঃ পাকিস্তানি মেজর সেলিম গে.পালগঞ্জ রক্ষায় তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এদিকে ক্যাপ্টেন বাবুল ফরিদপুর দখলের পূর্ব ঘোষণা দেন। ৭-১২-১৯৭১ গোপালগঞ্জ দখলে যাবে মুক্তিবাহিনী, মেজর সেলিমকে প্রকারান্তরে মুক্তিবাহিনীর শক্তিমত্তার খবর জানিয়ে দেয়া হয়। হেমায়েত বাহিনী প্রধান নিজেও ঐ রাতে টাইপ করা দুইশত ছোট আকারের চরমপত্র গোপালগঞ্জে পৌঁছানো নিশ্চিত করেন।

পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ০৮-১২-১৯৭১ ক্যাপ্টেন বাবুল-এর নেতৃত্বে 'কাঠি' নামক স্থানে মুক্তি জমায়েত ঘটে। বাবুল নামের 'কেরামত' স্মরণ করে আট ডিসেম্বর রাতেই পলায়ন করে পাকিস্তানি মেজর সেলিম। মহাবলদীপ্ত পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মসেনা অফিসার মেজর সেলিম পালিয়ে গিয়ে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়। যুদ্ধে পাক-বাহিনীর নেতৃত্ব শূন্যতার সুযোগে ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মুক্তিবাহিনী কর্তৃক অনায়াসে গোপালগঞ্জ দখল নিশ্চিত হয়।

ইতোমধ্যে মেজর সেলিম ধরা পড়লেন টেকের হাট এলাকায়। মাদারিপুরের মুক্তি কমান্ডার খলিলের হাতে তিনি বন্দি হন। বন্দি সেলিম নীত হন মাদারিপুর। মুক্তি

সেনার হৃদয় ঔদার্যে তিনি রক্ষা পান। তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দির সাথে ভারত আর্মির সৌজন্যে তিনি ফিরে যান তাঁর সাধের খণ্ডিত পাকিস্তানে।

একটি বিশেষ ঘটনা ঃ মুক্তিবাহিনী কর্তৃক গোপালগঞ্জ বিজয়-উপলক্ষ্যে ৯ তারিখের রাতে গোপালগঞ্জ স্টেডিয়ামে গণজমায়েতের আয়োজন করা হয়। ঘণ্টাখানিক আমোদ-ফূর্তির পর বিশেষ বাহক মারফত একটি সংবাদ আসে যে, চার থানা পাক গানবোট খুলনা থেকে এদিকে ধেয়ে আসছে। তাদের ইচ্ছে গোপালগঞ্জকে এড়িয়ে বরিশালে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

এমন নাজুক পরিস্থিতিতে শহরের কিছু উচ্ছৃংখল ছাত্র-জনতা ও কিছু মুক্তি তখন লুটপাটে ব্যস্ত। দু'জন মুক্তি নায়কের উপস্থিতিতে লুটপাট! ব্যাপার সামলাতে তাঁরা দু'জন গেলেন দু'দিকে। হেমায়েত পাকিদের সামলানোর এবং বাবুল অকুস্থলের বিশৃংখল অবস্থা দেখবাল করার দায়িত্ব নিলেন।

পাক আর্মি অভ্যর্থনায় গোবরাঘাটে এলেন হেমায়েত। মানিকধা স্টিমার স্টেশন থেকে নাজিরপুর মাটিভাঙ্গা লঞ্চ স্টেশন পর্যন্ত ন্যূনপক্ষে তিন হাজার তিনশ' মুক্তি এমনভাবে সাজানো হয় যে পাকিরা তখন মুক্তি ফাঁদে আটকা পড়ে। চরম বিপদ আঁচ করে শেষ পর্যন্ত পাক-বাহিনী তাদের লঞ্চবোটে শাদা নিশান উড়িয়ে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করে। হেমায়েত সে-মুহূর্তে সিংহ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত পাক-বাহিনীকে বিশেষ ব্যবস্থায় বরিশাল পর্যন্ত যাবার অনুমতি প্রদান করেন।

ফরিদপুর দখল পরিকল্পনা ঃ ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাবুল তাঁর মূল মুক্তি সদর কাশিয়ানি থানার ওরাকান্দি হাই স্কুলে প্রত্যাবর্তন করেন। কাশিয়ানি ও মুকসেদপুর থানার মুক্তি কমান্ডার ইসমত কাদির গামা ও হাসানকে ভাটিয়াপাড়া মুক্ত করার পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া হয়। ফরিদপুর আক্রমণে যাতে বাইরের পাকিস্তানি আর্মি সাহায্য পেতে না পারে তারই পূর্বাঙ্গ প্রস্তুতি এটি।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভাঙ্গা থানায় এক হাজার মুক্তিযোদ্ধার সমাবেশ ঘটে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর আক্রমণের পূর্বাঙ্গ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। ষোল ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ফরিদপুর মুক্ত করার উদ্দেশ্যে চলবে মুক্তি অভিযান। ফরিদপুরকে শেষবারের মত হানাদার মুক্ত করার লক্ষ্যে মুক্তিরা মরিয়া উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এর সারাদিনের জন্য মুক্তিবাহিনী বিরামহীন প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সন্ধ্যার আঁধার নামা মাত্রই মুক্তিবাহিনী মার্চ করবে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এর বিকাল পাঁচটায় বেতার ঘোষণা মারফত পাকিস্তান আর্মির আত্মসমর্পণ সংবাদ প্রচার করা হবে। ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান আর্মির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সময় নির্ধারিত হয়েছে এই খবরে সারাদেশে বয়ে যাচ্ছে খুশির আলোর বন্যা। সন্ধ্যা সাতটায় শীতের আমেজেও গরমে ঘামছে সশস্ত্র মুক্তিরা। বোধ করি হৃদয়ের আনন্দ এমনি হয়। এই আনন্দ-বার্তা সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় বাবুলের মুক্তি দলের ফরিদপুর যাত্রা শুরু হয়। এবার আয়েশের গান বাজনার বিজয়

মার্চ। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সকাল ৭-টায় মুক্তি দল উপস্থিত হয় ঐতিহাসিক ফরিদপুর ময়দানে।

পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণ ঃ ফরিদপুর পৌঁছে ১৯ ডিসেম্বর সকালে মুক্তি ক্যাপ্টেন বাবুল পাকিস্তানি রিয়ার হেডকোয়ার্টার ব্রিগেডিয়ার-এর উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী প্রচার করেনঃ "আমার নিকট আত্মসমর্পণ করুন।" পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার ত্বরিৎ অনুকূল সাড়া দেন। কিন্তু কিছু পদ্ধতিগত কাজের জন্য তিনি কিছুটা সময় প্রার্থনা করেন। বিজয়ী বাবুল সরল বিশ্বাসে রক্তপাত এড়াতে পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ারকে সময় দেন। আদতে পাকিস্তানি চাল ছিল সময় ক্ষেপণ করা। তাদের পরাণের পরাণ এককালের জানী দুশমন ভারতীয়দের জন্য তারা প্রতীক্ষা করতে থাকে। বাস্তবে হলোও তাই। অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার রাজন নাথ আসলেন ফরিদপুরে। যৌথ কমান্ডের নিকট ফরিদপুরের পাকিস্তান আর্মি আত্মসমর্পণ করে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে ফরিদপুর শত্রু মুক্ত হয়। সে-সময়টাতে ভারতীয় আর্মি ব্যস্ত লুটপাটে এবং মুক্তিফৌজ তখন প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত।

মুক্তিযোদ্ধার মহানুভবতাঃ ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের হাতে একশত তোলা লুটের স্বর্ণ জমা দিয়ে প্রশাসন সংহত করার কাজে লাগেন বাবুল। ডাক্তার এস.এ.মালেক তখনকার ফরিদপুরের মুক্ত অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন। দেশ এখন স্বাধীন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশক্রমে যুদ্ধ-পূর্ব জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন ক্যাপ্টেন বাবুল।

বীর প্রশস্তি ঃ বাংলার ইতিহাসে কজন প্রথিতযশা অমর পুরুষ নিয়ে ফরিদপুর ধন্য। তাঁরা হলেনঃ ১. নওয়াব আবদুল লতিফ, ২. হাজি শরিয়তুল্লাহ, ৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৪. হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম, এবং ৫. ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল।

এমনি আরো অসংখ্য বিরল-প্রতিভাধর বীর পুরুষদের পাদস্পর্শে ধন্য ফরিদপুর। এঁদের প্রথম চারজন ইতিহাস খ্যাত। পঞ্চমজন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও মুক্তিযুদ্ধের কারণে বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয়। বাংলার স্বাধীনতার পুনর্জাগরণ, ১৯৭১-এর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও আর্মি, স্বাধীনতা যুদ্ধের ২, ৮ ও ৯ নং সেক্টর, দুর্ভাগা দেশের মন্দভাগ্যের মুক্তিযোদ্ধা, এদেশ ও এজাতির পক্ষ থেকে বীর প্রসবিনী ফরিদপুরের কালজয়ী স্বাধীনতা যোদ্ধা ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুলকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

উপসংহার ঃ এদেশে যোদ্ধা আছেন ও থাকবেন। যুদ্ধ হচ্ছে ও ভবিষ্যতেও হতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ বার বার হয় না। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরল গৌরবে ধন্য, পাকিস্তানি জিঘাংসায় ক্ষতবিক্ষত ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল ফরিদপুর ও বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যক্ষ সংগ্রামী ও প্রত্যক্ষ যোদ্ধার প্রত্যক্ষ বিবরণের মূল্যই আলাদা। তাঁর আয়ুষ্কালে কেউ নূর মোহাম্মদ বাবুলের সংগ্রামী জীবন ও যুদ্ধ কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করলে একটা কাজের কাজ হত, দেশ পেত সত্যিকারের ইতিহাস।

মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মুজিবুর রহমান মল্লিক

যোদ্ধা পরিচিতি ঃ বাংলার জাতীয় জাগরণের মূল নকিব শেখ মুজিব গোপালগঞ্জের সন্তান। এই গোপালগঞ্জের হেমায়েত বাহিনীর প্রখ্যাত কমান্ডার মোঃ মুজিবর রহমান মল্লিক। কোটালিপাড়া থানার বান্ধাবাড়ি গ্রামে তাঁর জন্ম ১৯৫০ সালে। পিতা সিরাজউদ্দিন ও মা চাঁন বড়ু বেগমের কোল আলো করা সন্তান মুক্তিযুদ্ধে অক্ষয় কীর্তি রচনা করেন।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা, বিশ্বাস বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী শিক্ষা বান্ধাবাড়ি জে. বি. পি. উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে সিপাই নির্বাচিত হন আজিমপুর রিক্রুটিং সেন্টার থেকে। সফিনা আরব জাহাজ যোগে চট্টগ্রাম থেকে সাগর পথে করাচি যাত্রা করেন। এক সপ্তাহের ব্যবধানে করাচি থেকে স্থানান্তরিত হন কোয়েটা শহরে।

নয় হাজার রিক্রুটের মাঝে বাঙালি মাত্র পাঁচ জন। প্রশিক্ষণে ভেতো বাঙালির ভেতো খোঁটা। তিন বেলা ভাতে অভ্যস্ত বাঙালির ভাগ্যে তিন বেলাই জুটে রুটি। পরের ব্যবস্থা দুবেলা রুটি একবেলা ভাত। সিনা টান পাঞ্জাবি-পাঠান বাবুর্চির হাতে পাকানো ভাতে বাঙালির অরুচি। ভেতো বাঙালির ভাত সবার অপছন্দ। ব্যাপার বুঝে বাবুর্চি ভাতে মিশান বালু। কোনেভাবেই বাঙালি যাতে ভাত খেতে না পেরে। ক্রুদ্ধ ভেতো বাঙালি বাবুর্চিরে দেয় ধোলাই। পরিণামে একবেলার ভাতও বন্ধ। অন্যতম সাচ্চা পাকিস্তানির মতো তিনবেলা রুটিতে ছয় মাসের প্রশিক্ষণ শেষে অর্ডন্যান্স কোরে ভর্তি। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত লাহোর, যশোর হয়ে সর্বশেষ পোস্টিং কুমিল্লা ময়নামতি সেনানিবাস।

কাল মেঘের পূর্বাভাস ঃ কুমিল্লা ময়নামতি সেনানিবাসে টেলিফোন ডিউটি। তখন মার্চ, ১৯৭১-এর শেষ পর্ব। গোলজার নামের অতি বিশ্বস্ত এক পশ্চিমা সিপাই খাস চোস্ত উর্দুতে যা বলেন তার মর্মার্থ ভয়াবহ। গতকাল বেগার বাঙালি শুধুমাত্র খাস পাকিস্তানি কজন সিনিয়র অফিসার মিটিং করেন। আগামীকাল বাঙালি মাত্রকে ফল-ইন করিয়ে গুলিতে খুলি উড়ানো হবে। আক্কেল মানকা লিয়ে ইশারা কাফি। ব্যাপার আঁচ করে সে রাতেই বাঙালির অনেকে গা বাঁচাতে পালায়। ব্যারাকের পিছন দিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পালান মুজিবর। প্রাণে বাঁচতে প্রাথমিক আশ্রয় কুমিল্লার দাউদকান্দি গ্রামে। রাত আটটা নাগাদ দাউদকান্দি গ্রাম থেকে পঁচিশ জনের মতো সেনানিবাস ত্যাগী বাঙালি আসেন কুমিল্লা রেল স্টেশন। এবার ট্রেন যাত্রা কুমিল্লা টু চাঁদপুর। চাঁদপুর থেকে নৌ-পথে পালানোর উদ্দেশ্যে স্টিমার ঘাটে। ইতোমধ্যে লঞ্চ টার্মিনাল পাকিস্তানি আর্মিতে গিজগিজ। অবস্থা বুঝে দ্রুত বাজারে গা ঢাকা দেয় মুজিবর। কলা কিনে টুকরি ভরে ফেরিওয়ালার সাজে লঞ্চে উঠেন মুজিবর। পাকিস্তানি আর্মি পলায়নপর বাঙালি সেনার খোঁজে লঞ্চে অনুসন্ধান চালায়। প্রাণের ভয়ে মুখে গামছা বেঁধে তক্তার নিচে লুকিয়ে গতর বাঁচান মুজিবর। ছদ্মবেশীকে পাকিস্তানি আর্মি চিনতে না পারায় প্রাণে

রক্ষা পান তিনি। রাত এগারটায় চাঁদপুর থেকে লঞ্চ ছাড়ে ফরিদপুরের পয়সার হাটের উদ্দেশ্যে। সাত ঘাট পেরিয়ে দলছুট পলাতক সৈনিক পৌঁছেন গ্রামের নিজ বাড়ি।

হেমায়েত সংযোগ ঃ হেমায়েত তাঁর যুদ্ধ সঙ্গী ইব্রাহিমের সাথে মুজিবরকে খুঁজে বের করেন। মুজিবর সখেদে পাকিস্তানি অত্যাচার থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে যুদ্ধ করে মরার সাধ ব্যক্ত করেন হেমায়েত সমীপে। কুকুরের মতো পালিয়ে না মরে পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মরার মাঝে গৌরব আছে। রতনে রতন চেনে, এভাবে মিলন হয় দুই যোদ্ধার। হেমায়েতের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে মরণ ঝাঁপ দিলেন মোঃ মুজিবর রহমান মল্লিক।

প্রত্যক্ষ যুদ্ধে হাতে খড়ি ঃ মাত্র তিন সশস্ত্র মুক্তির হাতে কোটালি পাড়া থানা দখল মুক্তিযুদ্ধের শিহরণ জাগানোএক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সকলকে পালানোর সুযোগ দিয়ে এক পালের গোদা দারোগা যশোরের আবদুল বারি জোয়ার্দারকে পিঠমোড়া বাঁধা হয়। তিনি হেমায়েত-এর পা জড়িয়ে ধরে বাপ ডেকে প্রাণ ভিক্ষা নেন। অকুস্থল বিজয় ঘটে তিনজনের হাতে। থানা লুটে মুক্তিজনতা মিলে। পুরো দৃশ্য দেখে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রেরণা পান মুজিবর।

মুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ কোটালি পাড়া থানা লুটের অস্ত্রে জহরেরকান্দি হাই স্কুলে মুক্তি প্রশিক্ষণ সেন্টার খোলা হয়। চতুর্দিকের দূরদূরান্তের আনসার, মোজাহিদ, পুলিশ, ইপিআর, আর্মি, ছাত্র, যুবজনতা প্রশিক্ষণ সেন্টারে ছুটে আসে। এখানকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধারা বিভিন্ন যুদ্ধে সাফল্য দেখায়।

পাকিস্তানি প্রতিকার ঃ কোটালিপাড়া থানার পুলিশ অফিসার উর্ধ্বতন কমিশনারকে অস্ত্র হারানোর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। প্রতিশোধ ও প্রতিকারে বিপুল সমর সজ্জার পাকিস্তানি আর্মি কোটিলিপাড়া আগমন করে। তারা আশ্রয় নেয় কোটালিপাড়া নদীর পশ্চিম পাড়ে গোডাউন বিল্ডিং-এ। পাকিস্তান বাহিনীর সিকিউরিটির সেন্টু নামের এক বাঙালি সদস্য মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে এসে সংবাদটি পৌঁছে দেন। ত্বরিত মুক্তিবাহিনী যাত্রা করে কোটালিপাড়ার উদ্দেশ্যে। ইতোমধ্যে শূন্য হয়ে যায় শত্রুপুরী। কোটালিপাড়া থানা পাকিস্তানি পুলিশ ও আর্মি শূন্য। তবে আগাম টাটকা সংবাদ আগামীকাল পাকিস্তানি সেনা মাদারিপুরের পথে গৌরনদী যাবে।

পানতাপাড়া ব্রিজে মুক্তি-অ্যামবুশ ঃ দ্রুত প্রস্তুতি নেন মুজিবর। পঞ্চাশটি টাবুরি নৌকায় মুক্তিবাহিনী যাত্রা করে নতুন ঠিকানায়, পাকিস্তান বাহিনীকে ঠেকানোর লক্ষে। শেয়ানা পাকিস্তানি আর্মি পূর্বেই পানতাপাড়া ব্রিজ দখল করে অবস্থান নিয়েছে। ব্রিজের হাজার গজ দূরে এক কবরস্থানে মুক্তিবাহিনী অবস্থান নেয়। পানিতে ডুবো ডুবো এক কবরের বাঁশ ভাংতে গিয়ে নিচের দিকে বুক পর্যন্ত ডুবে গেলেন তিনি। কবরের ভিতরের জোঁক-বিচ্ছু-কেঁচো ধরনের বহুতর আজব প্রাণীর খপ্পরে মৃত্যু দশায় পড়েন তিনি। অন্য পোকামাকড় সরলেও রক্তচোষা জোঁক পায়ে, গায়ের বুকে-পিঠে-বাহুতে শরীরের সর্বত্র লেপ্টে থাকে। শত্রু পর্যবেক্ষণে এসব তুচ্ছ বিষয় যোদ্ধার খেয়াল নেই। যুদ্ধসাথীরা তাঁকে টেনে

কবরের উপরে উঠান। গায়ের জোঁক খুঁজে খুঁজে টেনে টেনে ছাড়িয়ে নেন। এবার শত্রু পর্যবেক্ষণে যোদ্ধা উঠলেন কবর স্থানের খেজুর গাছে।

ব্রিজের উপর রাজাকার সাহচর্যে তখন গর্বিত মৌজে পাক-আর্মি। ইতোমধ্যে কবরস্থান ছেড়ে মুক্তিরা আসেন রাস্তার পাশে। পাকা রাস্তার দু'পাশ পানিতে টইটুম্বুর। রাস্তা বাঁধার মাটি কাটাতে পথের দুপাশে সুবৃহৎ খাল, বর্ষাকালে দেখতে মনে হয় যেন ভরা নদী। সেসব জলাশয়ে প্রচুর কচুরিপানা। মাথা ও শরীরে কচুরিপানা জড়িয়ে মাইনসহ মুক্তিরা ধীর গতিতে পাক-আর্মির নাকের ডগায় ব্রিজের নিচে পৌঁছে যায়। অতি সন্তর্পণে ব্রিজের দক্ষিণ অংশে ব্রিজ বিধ্বংসী মাইন লাগিয়ে মুক্তিরা নীরবে সটকে পড়ে। কবরস্থানে ফিরে গিয়ে মাইন ব্লাস্টের প্রতীক্ষায় থাকে মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানি আর্মিরাও তখন অহংকারে মদমত্ত। এমন আমোদিত অবস্থায় বাঙাল ক্যাচকি মাইরের মাইনের ব্যাপার তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি।

প্রতীক্ষায় সময় যায় মুক্তিবাহিনীর। সামান্য সময়কে মনে হয় যুগযুগান্তর। অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত মাইন ব্লাস্ট হয়। ব্রিজের অর্ধেকটার মতো সশব্দে উড়ে যায়। ফলে হায়াত উত্তীর্ণ রাজাকার ও পাক-আর্মির অনেকেই নিহত হয়।

মূল ব্রিজ প্রহরার বাইরেও পাশের বাড়িতে ছিলো রাজাকার আস্তানা। সেখানেও ত্বরিৎ হানা দেয় মুক্তিরা। মহাশক্তিধর পাক-আর্মি সমেত ব্রিজ উড়ে যাওয়াতে কেয়ামত-ভয়ে ভীত রাজাকারদের তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে মরি' দশা। এমতাবস্থায় সব কিছু ছেড়ে শূন্য হাতে গাত্রবস্ত্র মাত্র সম্বল করে সবাই পালিয়ে যায়। ব্রিজ ও তার আশপাশসহ, আশ্রয় বাড়িতে পরিত্যক্ত পাকিস্তানি অস্ত্র, গোলাবারুদ, পোশাক, বেডিং, তাঁবু মজুদ খাদ্যের রসদ জাতীয় বহু কিছু মালে গণিমতের মতো প্রাপ্তিতে মুক্তিদের সম্পদ বাড়িয়ে দেয়।

মাইন অ্যামবুশে মোস্তফাপুর ঃ পাকিস্তানি লুণ্ঠিত মালে সমৃদ্ধ হয় পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি। এ-বাড়িটি অবস্থিত পাকা সড়কের কাছে মোস্তফাপুর ব্রিজের পশ্চিমে। সে-রাতেই ভোর চারটার মধ্যে পান্তাপাড়া মোস্তফাপুর ব্রিজের মধ্যবর্তী পাকা রোড সেন্টারে রাস্তা খোদাই করে গোটা পাঁচেক মাইন পুঁতে ফেলে মুক্তিবাহিনী। এবার দিনমানের কর্মচাঞ্চল্যের অপেক্ষায় তারা। সকাল দশটায় মাদারিপুর থেকে পাক-আর্মি বহর যাত্রা করে গৌরনদীর পথে। মুক্তিবাহিনীর সাফল্য এই যে, তাদের আনাগোনার কারণে পাক-আর্মির সংবাদ আদান-প্রদানে আশ্চর্যরকমভাবে ব্যর্থতা দেখা দেয়। মাদারিপুর থেকে পাকিস্তান-আর্মি কর্তৃক গৌরনদীর যাত্রা পথে পড়ে পান্তাপাড়া ও মোস্তফাপুর ব্রিজ। রাতের ব্রিজ ধ্বংসের দুর্ঘটনার খবর মাদারিপুর পৌঁছুলে পাকিস্তানি-আর্মি নিশ্চয়ই এ-মুখো হতো না। লাফরমান রাজাকারগণও সে-সংবাদ মাদারিপুর পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। মুক্তি বিধ্বস্ত পান্তাপাড়া ব্রিজ থেকে আরও সামনে বেড়ে মাদারিপুরের দিকের রাস্তায় পুনরায় মুক্তিরা মাইন পেতে রাখে যাতে মুক্তি-মাইন উত্তরে পাকিস্তানি-আর্মিকে বিধ্বস্ত পান্তাপাড়া ব্রিজের পথে গৌরনদীর দিকে এগুতে হয়।

পাক-বাহিনীর কাছে এতদবিষয়ক কোন খবরাখবর না-থাকায় মুক্তিবাহিনীর পোঁতা মাইন-ফাঁদে আটকা পড়ে পাকবাহিনী। এধার ক্রমেই পাকিস্তানি কনভয় এগোয় সামনের দিকে। মুক্তি-মাইনের প্যাঁচকলে পড়ে গোটা নয়েক পাক যানবাহন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। দ্রুতগতির ধাবমান গাড়ির চাপে দু'একটা মাইন বিধ্বস্ত হতেই অপরগুলি পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে উল্টে যায় এবং আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয়। বিপুল সংখ্যক পাক-সেনা নিহত হয়; আহতের মরণ চিৎকারের বিভীষিকার মাঝে অবশিষ্ট পাক-কনভয় মাদারিপুর পালিয়ে গিয়ে জীবনে রক্ষা পায়। অপরদিকে, স্থানীয় জনতা আক্রোশবশতঃ আহত পাক-সেনাদের পিটিয়ে মেরে ফেলে। বিজয়ী বীর মুক্তিরা বীরদর্পে ক্যাম্পাসে ফিরে যায়।

হরিণা হাটির যুদ্ধ ঃ কোটালিপাড়া থানার দখল নিয়ে পাকবাহিনী ও মুক্তির দখল-বেদখলের খেলা চলতে থাকে। বিধ্বস্ত কোটালিপাড়া থানার স্থলে গোডাউনে আশ্রয় নেওয়া পাক-বাহিনীকে শিক্ষা দিতে মুক্তিরা যাত্রা করে সে-দিকে। মুক্তিরা সর্বমোট পঁচানব্বইটি এক মাল্লাই নৌকায় করে সে-দিকে অগ্রসর হয়। পয়সার হাট নদী পথে তারা পৌঁছে হরিণাহাটি গ্রামে। প্রথম নৌকায় আছেন হেমায়েত ও মুজিবর। মাঝি সাহেব আলি। এস.এম.জি. হাতে নৌকার সামনে বসে শত্রু পর্যবেক্ষণে এবং কমাণ্ডার হেমায়েতকে প্রহরায় আছেন বিনিদ্র অতন্ত্র প্রহরী মুজিবর মল্লিক তালুকদার। কমাণ্ডার হেমায়েত নৌকার ভিতর সুপ্তি মগ্ন।

আকস্মিক সামনে আর্মি স্পিড বোটের উপস্থিতি আঁচ করলেন মুজিবর। মুক্তি অবস্থানের পিছনে হরিণাহাটির আফতাবউদ্দিনের বাড়ি সংলগ্ন বাঁশের পুলে পুলিশের স্পিড বোটটা। কে যে কার শত্রু কে জানে? অনাকাঙ্ক্ষিত অনভিপ্রেত অপ্রস্তুত স্থানে দু'দল পরস্পরের কাছাকাছি। পুলিশ নৌকায় ছুপিয়ে অবস্থা দেখছে। মুজিবর সাহসে ভর করে নৌকার সামনে দাঁড়ান। হাতের ইশারায় নিজেদের নৌবহর থামান এবং নেতা হেমায়েতকে হাতের পরশে জাগিয়ে তুলেন। আগে-পাছে পাকিস্তানি পুলিশ, রাজাকার ও আর্মির নিঃশব্দ উপস্থিতির ব্যাপার তিনি কমান্ডারকে জ্ঞাত করান। এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এরই মাঝে শেয়ানা রাজাকার-পুলিশ পানিতে লাফিয়ে পড়ে। সাঁতার না জানা পাক-আর্মি আকস্মিকভাবে গুলি চালাতেই দুদলে শুরু তুমুল লড়াই। রাত সাড়ে এগারটায় লড়াইর সূচনা। দু'পক্ষেই শুরু হয় প্রবল যুদ্ধ। মর জগতের অমর শৌর্যের নিদর্শনে মুক্তি-মোজাহিদ হাবিলদার ইব্রাহিমের শাহাদত মুক্তিবাহিনীর সবাইকে শত্রু প্রতিরোধে যেন আরো শক্তি ও সাহস যোগায়। পাক-আর্মির গুলিটি সরাসরি এসে তাঁর মাথায় লাগে। মুজিবরের সামনে তিনি ডাঙার রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। সহমর্মিতার নিদর্শনে মুজিবর আহত ইব্রাহিমের দিকে এগিয়ে যান। আহত ইব্রাহিমের মাথার পুরো মগজ সহযোদ্ধার হাতে বেরিয়ে আসে। আহতকে রাস্তায় শুইয়ে দিতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। শহিদের কোমরবন্দের গুলি ও চায়নিজ রাইফেল সরিয়ে নেন সহযোদ্ধারা। পুরোদমে গোলাগুলির মাঝেও শহিদ ইব্রাহিমের লাশের প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। গোলাগুলির মাঝেই রাত পেরিয়ে যায়। সকালে দেখা গেলো, শত্রুর সাতাশজন পুলিশ-

রাজাকার জীবন্ত বন্দি। অন্যরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে গেছে। ১৪ জুন, ১৯৭১ তারিখের এই হরিণাহাটির যুদ্ধ সংশ্লিষ্টদের স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল।

হেমায়েত বাহিনী বিনা বিচারে কাউকে হত্যা করেনি। হরিণাহাটি যুদ্ধ-বন্দিদের উপযুক্ত বিচারের পর জুরিবোর্ডের রায়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। পয়সার হাটের তিরমুনিতে শত্রুমিত্র দু'দলের সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, বন্দিদের ছুটিয়ে নেওয়ার পাক-পাঁয়তারাই তাদের হত্যার অন্যতম কারণ। নিহতদের সৎকারের পর পরই পয়সার হাট নদীপথে পাক-লঞ্চের আগমন ঘটে। অবস্থা আঁচ করে ত্বরিৎ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী নদী তীরের পুকুর পাড়ে অবস্থান নেয়। মুক্তিবাহিনীর কাছাকাছি আসতে না আসতেই লঞ্চ থেকে শত্রুরা মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে আক্রমণ শানাতে শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর পাল্টা গোলাগুলির তোড়ে শত্রু লঞ্চের উপর তালার ছাদ উড়ে যায়। সঠিক নিশানায় মুক্তির বেধড়ক বেরহম গোলাগুলিতে শত্রু-লঞ্চের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। শত্রু-পক্ষের আহতদের গোঙানিতে সেখানে তখন কেয়ামতের করুণ দশা। বাধ্য হয়ে শত্রু-লঞ্চ পশ্চাদ প্রদর্শন করে এবং দক্ষিণে পালিয়ে যায়। দুর্দান্ত মুক্তিবাহিনী শত্রুদেরকে আমবৌলা গ্রাম পর্যন্ত ধাওয়া করে পিছু পিছু যেতে থাকে।

আমবৌলাতে শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য নতুন করে মুক্তিবাহিনীর মর্চা খোদাই শুরু হয়। এবার স্থানীয় জনতা আবদার জানায় যেন মুক্তিরা সেখান থেকে ফিরে চলে যায়, নতুবা মুক্তিরা আক্রমণ শেষ করে চলে যাবার পরপরই পাক-বাহিনী সেখানে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। জনতা বলেঃ আপনারা আসেন আর যান। শত্রু জ্বালিয়ে দেয় অসহায় জনতার ভিটামাটি। গ্রামের জনতাকে বাঁচাতে মুক্তিবাহিনী আমবৌলা ত্যাগ করে। তারা ফিরে যায় রামশীল ক্যাম্পে।

পাটগেতি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ ঃ হরিণাহাটি লঞ্চ অপারেশন প্রকৃতই রাজাকারদের বাড়াবাড়ির ফল। মুক্তিবাহিনী এবার রাজাকারদের ধোলাই করার ব্যবস্থা করে। রামশীল ক্যাম্পাসের দুইশ পঞ্চাশ জন মুক্তিযোদ্ধা পাটগেতি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রাত দশটায়। পাটগেতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের আশ্রয়ে সেখানে রাজাকার-পুলিশ ক্যাম্প স্থাপিত হয়। মুক্তিবাহিনী নৌ-পথে গোলাগুলির শব্দ পেয়েই রাজাকার উপস্থিতির কথা আগাম বুঝতে পারে। যার ফলে, রাজাকারদের অবস্থানের ওপর অতি ত্বরিত গতিতে মুক্তি ব্যারিকেড দিয়ে ফেলে। ১৩ই জুলাই দিবাগত রাত ৪টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্তদু'দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলে। শত্রু পক্ষে নিহত উনষাট জন রাজাকার। মুক্তি পক্ষে শহিদ হন কমান্ডার সালাম।

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিজয়ী মুক্তিরা তখন নিঃসার অবস্থান নেয় পাটগেতিতে। তারা পরিপূর্ণ রণসাজে পজিশন নিয়ে থাকে। জেনে কি না জেনেই হোক, খুলনা থেকে রাজাকারদের জন্য সাহায্য আসে পাটগেতি। গানবোট সহযোগ আসে পাক-আর্মি। শত্রু মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে আসতেই বেনজির মুক্তি হামলা শুরু হয়। মুক্তির এলোপাথাড়ি ফায়ারে পাকিস্তানি গান বোট নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। শত্রুকে উপযুক্ত

শিক্ষার ক্ষয়ক্ষতি উপহার দিয়ে মুক্তিরা ফিরে আসে রামশীল ক্যাম্পে। সঙ্গে করে নিয়ে শহিদ সালামের লাশ। রামশীল ক্যাম্পের সন্নিকটেই উপযুক্ত বীরের মর্যাদায় শহিদ সালামের লাশ দাফন করা হয়।

রামশীলের ব্রহ্মশেল ঃ হেমায়েতবাহিনীর হিম্মত শেষ করতে উঠে পড়ে লাগে পাক আর্মি। হেমায়েত বাহিনীর যে-কোনো খতরনাককে ধরিয়ে দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে পাক-পক্ষ থেকে লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়। রামশীল ক্যাম্পে বসেই পাকিস্তানি পুরস্কার ঘোষণার পয়গাম পায় মুক্তি বাহিনী। পাক সেনা, রাজাকার, পুলিশ, দালালের প্রকাশ্য মিটিংয়ে রামশীল মুক্তি ক্যাম্প আক্রমণের সদম্ভ ঘোষণা দেয়। বিকাল ৪টায় আক্রমণ ক্ষণ জানানো হয়। সমূহ বিপদ এড়াতে মুক্তিদের ক্যাম্প ত্যাগ করতে হয়। তাদের নতুন ক্যাম্প বসে শৈলধর বাড়ি। ভোর ৪টায় সাতটি বাছারি নৌকায় সদম্ভ সশস্ত্র পাক সেনার আগমন ঘটে। গানবোটে আসে মূল পাকিস্তানি কলাম। আক্রমণের প্রথম ধাপেই বান্ধাবাড়ি বাজার সংলগ্ন ব্রিজ রাজাকার দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে পাক আর্মি। এবার মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার ও তাদের সহযোগীদের ঘরবাড়ি ভস্মিভূত করার পাক নির্দেশ জারি করা হয়। প্রথমে আগুনে নিশ্চিহ্ন করা হয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুজিবর রহমানের বাড়ি। একই পন্থায় প্রজ্জ্বলিত করা হয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবুল হাওলাদার ও গফুর পাইক বাড়ি। পাক সেনার হুকুম মাত্র সঙ্গের রাজাকার-পুলিশ তাৎক্ষণিক বহ্ন্যোৎসবের নির্দেশ পালন করে।

এবার মূল মুক্তি আস্তানার উদ্দেশ্যে পাক অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে তিরমুনি নদীপথে। উত্তর দিক থেকেও নৌপথে পাক সেনার আগমন দেখা যায়। সৌভাগ্যক্রমে মুক্তিরা নদীর দুপাশে অবস্থান নিয়েছিল। অদৃশ্য মুক্তির উদ্দেশ্যে নদীর দুই তীরে পাকিস্তানি গুলির বন্যা এবং হোলি খেলা চলে। গুলিতে গ্রামের সকল গাছপালা পত্র শূন্য হয়ে যায়। যে-সকল বাড়ি থেকে মুক্তিরা খানাপিনা পেতো, বিশেষ করে যে-সব হিন্দু বাড়ির খানাপিনা মুক্তিদের প্রাণে বাঁচাতো, শৈলধরার সেসব বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় পাক আর্মি। মুক্তিরা তখনো শৈলধরা ক্যাম্পে নিশ্চুপ অবস্থানে। মুক্তির পরবর্তী অপারেশন স্থল রেকির জন্য গোয়েন্দা যায় মাদারিপুর, পাটগেতি, মানিকদা। মুক্তি সদরে যোগাযোগ রক্ষার জন্য জনবল স্বল্প। হেমায়েত, মুজিবর ও অন্যান্য কজনের মাত্র সাতজন সদর আগলে আছেন। পাক সেনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে রামশীল জহরেরকান্দি নদীর পূর্বদিকে, গেট সদৃশ এক ছোট খালের ধারে হিন্দু বাড়িতে যান হেমায়েতরা। বাড়ির ঘরদরজা বলতে কিছু নেই। শুধু মাটির উঁচু ভিটা বাড়ির নিদর্শন জারি রাখছে। সে পরিত্যক্ত ভিটায় পশ্চিমে মুখ করে পূর্ব পাশে মুক্তিবাহিনী পজিশন নেয়। গোপন আস্তানার মুক্তি দেখছে ৩ জন করে হন্যে হয়ে পাক সেনা চলছে। এভাবেই চলছে রাজাকার-পুলিশের মুক্তি অনুসন্ধান। চিলতে খালে মিলিটারি বোঝাই বাছারি নৌকা ঢুকতেই মুক্তিরা পেয়ে যায় মহাসুযোগ। পাকিস্তানি সেনা ফুঁকে সিগার। রাজাকার বায় বৈঠা। নীরব প্রতীক্ষায় নিশ্চুপ মুক্তি। পরিপূর্ণ রেঞ্জের আওতায় আসতেই শুরু হয় মুক্তির গোলাগুলি। হেমায়েতের বামে মুজিবর কমান্ডার ও ডানে ইপিআর

মকবুল। মকবুল মাটিতে শোয়া নিজের অবস্থান থেকে মাথা উঁচিয়ে পাক সেনার অবস্থান ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে। সুপ্রশিক্ষণের দক্ষ পাক আর্মি মকবুলকে দেখা মাত্র গুলি চালায়। সঠিক নিশানায় পাকিস্তানি গুলি মকবুলের মাথা-বুক ছেদন করে। মুক্তি অবস্থান জাহির হতেই তাদের বিপদ ঘটে। মুক্তির প্রকাশ পাওয়া অবস্থানে পর পর তিনটি পাকিস্তানি শেল এসে পড়ে। সে ব্রহ্মশেলে হেমায়েত মারাত্মকভাবে আহত হন। সহমর্মিতায় আহত মকবুলকে রক্ষায় এগিয়ে এসে হেমায়েত মরণদশায়। পাক শেলের অংশ হেমায়েতের গালের বাম পাশে লেগে এগারটি দাঁত বিচূর্ণ করে ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আহত বাঘের রাগে হেমায়েত শত্রুর প্রতি গ্রেনেড চার্জ করতে চাইলেন। শ'পাঁচেক পাক-সেনার বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া আত্মঘাতী ভাবনায় হেমায়েতকে গ্রেনেড চার্জ থেকে বিরত করেন মুজিবর। কিন্তু গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধ এবং জীবন বাজি রেখে দেশের জন্য লড়ার কারণে এই যুদ্ধ বিজয় বার্তা বয়ে আনে দেশের জন্য। বিজয়ী বাহিনী কর্তৃক এবার কমান্ডার হেমায়েতকে জলকাদার মধ্যে দিয়ে ধানি জমির পথে কষ্ট করে হলেও, রামশীল ক্যাম্পে নিয়ে আসে। মকবুলের লাশ শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য কচুরিপানার বিলে সাময়িক লুকানো হয়। শত্রুর ধারণা মুক্তিরা এখানে আছে। তাই তারা আন্দাধান্দা ফায়ার চালায়। দূর থেকে শব্দ অনুভব করে দু'চারটি টুকটাক মুক্তি ফায়ারে ভীত হয় পাক সেনা। তাই অকুস্থলে নামতে পাকিস্তানিদের সাহসে কুলায় নি।

এদিকে, তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে আনা হায়দার ডাক্তারকে দিয়ে হেমায়েতর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। মরণাপন্ন হেমায়েতের নির্দেশে মুক্তিরা ছুটে যান রণস্থলে। মুজিবর কমান্ডারের নির্দেশ চলে যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৮৫ জন পাক -সেনা নিহত এবং অন্যান্যরা অস্ত্র ফেলে লজ্জা ও অপমানে পালিয়ে যায়। তাদের অস্ত্র-গোলাবারুদ মুক্তিদের যুদ্ধ সম্পদ বাড়ায়। বিজয় বার্তার সাথে অস্ত্র দখলের সংবাদ হেমায়েতকে দিতেই তাঁর মুখে আর কথা নেই। কারণ তাঁর জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত। তিনি হাতের ইশারায় মুক্তিদের ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী করণীয় ও তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে লিখিত নির্দেশ দেন। নেতৃত্বের এমন জ্বালাময়ী তুলনা মুক্তিযুদ্ধে বিরল। নিজের জীবন-মরণ তুচ্ছজ্ঞানে শত্রু হননের নির্দেশ দেন হেমায়েত। যুদ্ধে স্থির বা যুধিষ্ঠিরের তিনি জীবন্ত নিদর্শন।

সেদিনই সন্ধ্যা সাতটায় রামশীল যুদ্ধে মুক্তির বিজয় বার্তা ঘোষিত হয় জয় বাংলা বেতার থেকে। ১৮৫ জন পাক সেনা নিহত হবার তথ্য নিষ্ঠ খবরে গর্বিত মুক্তিবাহিনী। পাক ওয়্যারলেস বার্তায় আড়ি পেতে (ইন্টারসেপ্ট) করে তাদের নিহতের সংখ্যা সংগ্রহ করেন মুক্তি ও মিত্র বাহিনী।

কোটালিপাড়ায় মুক্তি কোটাল ঃ হেমায়েতের অসুস্থতায় মুক্তিবাহিনীর অপারেশন ঝিমিয়ে পড়ে। নামকাওয়াস্তে সুস্থ হওয়া মাত্র তিনি আবার প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পাক পক্ষ আবার কোটালিপাড়া নদীর পশ্চিম তীরের গোডাউনে আস্তানা পাতে। কোটালিপাড়া পাকিস্তানি গোডাউন ক্যাম্প উৎখাতে মুক্তিরা একটি

প্ল্যান করে। পাকিস্তানি সেনার গোডাউন ক্যাম্পের চারপাশ ঘিরে গোডাউনের মতো মুক্তি ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। তিন দিন দু'দলে যুদ্ধ হয়। কিন্তু পাকিস্তানিদের স্যারেন্ডারে লক্ষণ নাই। এবার মুক্তির ২ ইঞ্চি মর্টারের নয় গোলার শেলে গোডাউন বিল্ডিং ভাংতেই পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তারা নিশ্চিত মৃত্যু জেনে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বন্দিরা সবাই বাঙালি। মুক্তি হাতে পাকিস্তানি-বাঙাল সেনা বন্দিতে গৌরব নাই। পুরো বৃত্তান্তের পরও মুক্তির আস্থা পেলেন না বন্দি বেঙ্গল-সদস্যরা। তাদের অস্ত্র জমা নেওয়া হয়। তারা যুদ্ধ বন্দির মর্যাদা লাভ করেন।

বিহারি পাঁয়তারা প্রতিরোধ ঃ মুক্তিরা শত্রু নিশানার শৈলধর ক্যাম্প ছাড়েন। নতুন ক্যাম্প মাঝবাড়ি হাই স্কুল। নতুন ক্যাম্প হেমায়েত-এর নিজ গ্রাম টুপারিয়ার এক কিলোমিটার পূর্বে। এবার মুক্তিবাহিনীর লড়াই স্বদেশী বিভীষণ পাকিস্তানি-পেয়ারের উর্দু-ভাষী বিহারিদের সঙ্গে। ফরিদপুর রাজবাড়ি বিহারি কলোনিকে অস্ত্র সজ্জিত করছে পাকিস্তানি আর্মি। স্বদেশে স্থান দেয়া ভারতীয় মোহাজের বিহারির হাতে বাঙালিরা কচুকাটা হচ্ছে। ফরিদপুর ও রাজবাড়ি বিহারি কলোনির আশপাশে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। আগরতলা (পিন্ডি) ষড়যন্ত্র মামলা খ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন বাবুল ও হেমায়েত বাহিনী অধিনায়ক মিলে যৌথ অপারেশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়। হাজার পাঁচেক গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা রাজবাড়ি আর্মি ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। পাকবাহিনী-মুক্তিযোদ্ধা সাতদিনের উদয়াস্ত যুদ্ধ চলে। অবরুদ্ধ পাক-সেনার কাছে বাইরের সাহায্যের আশা শূন্যে মরীচিকার মতো। স্বাধীনতা যুদ্ধ তখন শেষ পর্যায়ে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সপ্তম নৌবহরের সাহায্য তাদের কাছে এক মহা মোহমুক্তি। অগত্যা তারা ফরিদপুর স্টেডিয়ামে সারেন্ডারের প্রস্তাব দেন ক্যাপ্টেন বাবুলকে। টালবাহানায় নাখান্দা বাঙালের পরিবর্তে এককালে পাকিস্তানের জানী দুশমন ভারত আর্মির হাতে স্যারেন্ডারের জন্য সময় ক্ষেপণ করা বেছে নেয় পাক-আর্মি। পাকিস্তানি-সেনার আশ্বাসে অস্ত্র জমা নিতে ফরিদপুর স্টেডিয়াম জনবল ও যানবাহন পাঠান ক্যাপ্টেন বাবুল। সাতটি ট্রাকের সাথে যায় উনপঞ্চাশ জন মুক্তি আর্মি ও গেরিলা। পাকিস্তানি সমর্পিত অস্ত্রে সাতটি ট্রাক ভর্তি। অস্ত্র ভর্তি ট্রাক আসে ফরিদপুর বাস টার্মিনালে। পাকিস্তানি আর্মিরা স্যারেন্ডারের খুঁটিনাটি ওজর আপত্তির নামে সময় পার করে। এবার তাদের আকাঙ্ক্ষিত ইন্ডিয়ান আর্মি আসা মাত্র সুড়সুড় বিনা আপত্তিতে তারা স্যারেন্ডার করে। পাঁচ হাজার বায়ান্ন জন পাকিস্তানি বন্দি সেনা ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর কব্জায় বন্দি হয়। সমর্পিত পাকিস্তানি সাত ট্রাক অস্ত্র ইন্ডিয়ানরা হাতিয়ে নেন। বিক্ষুব্ধ গেরিলা অস্ত্র হস্তান্তরে গররাজি। ক্যাপ্টেন বাবুলের নির্দেশে ট্রাকভর্তি অস্ত্র নিয়ে নেয় ইন্ডিয়ানরা। অধৈর্য গেরিলারা বাবুলকে জেঁকে ধরে। যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় আর্মির হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে চায় মুক্তি গেরিলা। বাংলাদেশে শত্রু পরিত্যক্ত অস্ত্র লুটা প্রতিরোধে ভারতীয় আর্মির উপর আক্রমণ চালাতে গেরিলারা অনুমতি চায় মুক্তি ক্যাপ্টেন বাবুলের। তাৎক্ষণিকভাবে মিত্র বাহিনীকে চটিয়ে বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রইলেন বাবুল। কৌশলগত কারণে, স্বাধীনতা সংহত করার

প্রয়োজনে দখলদার সৈন্যের শেষ সৈন্যটি ধরা না পড়া পর্যন্ত মুক্তি গেরিলাদের ধৈর্য ধরার উপদেশ দেন ক্যাপ্টেন বাবুল।

ভারতীয় আর্মির এসব সামান্য অস্ত্রপাতির লোভ অনাগত দিনের বংলাদেশ ও ভারতের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে চির ধরে। ভারতীয়রা বিগত হাজার বছরে মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পেরে গর্বিত। পাকিস্তানের আন্তঃপ্রাদেশীক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান চেয়ে পাকিস্তানি আর্মি বিপাকে পড়ে। পাকিস্তানি ভুলের প্রায়শ্চিত্তে বিজয়ী ভারত। দিগবিজয়ী ভারতীয় আর্মি পাকিস্তানি পরাজয়ের মধ্যে যতই গর্বিত ভাবুন, বাঙালির জন্য এটা তাঁদের স্বদেশ দখল। বাংলার অর্থে কেনা পাকিস্তানি পরিত্যক্ত সমুদয় অস্ত্র গোলাবারুদকে বাঙালি ভাবেন নিজস্ব সম্পদ। ইন্ডিয়ান আর্মি কর্তৃক পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত অস্ত্র লুটকে কোনোভাবেই বাঙালি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ইতিহাসের অবিস্মরণীয় বিজয়ী ও ত্রাতা আর্মি সামান্য ভুলে ইতিহাসের চিরাচরিত লুটেরা আর্মিতে পরিচিত হয়। দুদেশের অবিস্মরণীয় মৈত্রী বন্ধনে এভাবেই সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বৈরিতার বীজ ঢুকে। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ভুলে এশিয়ায় মহীয়সী নারী ইন্দিরার ভারত ও আবহমানের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবের বাংলার মৈত্রী বন্ধন শুরুতেই কালিমালিপ্ত হয়।

যাক সে-সব কথা, পাক-আর্মি বশে আসলেও রাজবাড়ির বিহারি চাল নারকীয়। ফরিদপুরে পাকিস্তানি আর্মি স্যারেন্ডারের দিন বিকাল চারটায় রাজবাড়িতে বিহারিদের হাতে বাঙালির নরমেধ যজ্ঞের ভয়াবহ দুঃসংবাদ পৌঁছে। ফলশ্রুতিতে, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের দ্রুত রাজবাড়ি যাত্রা করতে হয়। আমেরিকা ও চিনের সাহায্য আসন্ন ভেবে বিহারিদের উল্লাস তখন তুঙ্গে। নির্বিচারে তারা বাঙালি হত্যা চালায়। নারী-শিশু-বৃদ্ধ-গর্ভিতা নারীর কেউ তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না। প্রাণে মেরে সব লুটে নিলে ক্ষতির কিছু ছিলো না। প্রকাশ্যে প্রিয়জনের সামনে বাঙালি নারীর সম্ভ্রম লুটায় বাঙালির ধৈর্যের বাঁধ টুটে যায়।

সাত দিন এক নাগাড়ে বিহারি-বাঙালি দুর্ধর্ষ যুদ্ধ চলে। বিহারিরা ভাবে তাঁদের বাঁচার শেষ লড়াই। মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজি। 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালাকে বাদ' মাদকতায় জিহাদি জোশে তারা লড়ছে। 'উল্টা বুঝিলি রাম'। বাঙালির ঘরের শত্রু বিভীষণ বিহারি দমনের জন্য এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা সংহত করতে যে-কোনো কোরবানিতে বাঙালিরা আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

স্যারেন্ডারের পর পাকিস্তানি আর্মির প্রতি ফরিদপুরের মানবিক আচরণের উদাহরণে বিহারিদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। বিহারি আবদার, তারাও ইন্ডিয়ান আর্মির হাতে আত্মসমর্পণ করবে। বাস্তবে, বিহারি তো আর আর্মি নয় যে তাদেরও স্যারেন্ডার হবে ভারতীয় আর্মির হাতে, পরের বুদ্ধিতে চলার বিষময় ফল পেলো বাংলার বিহারি-রাজাকারগণ। পাকিস্তানি আর্মি আজ ভুলেও বিহারির নাম মুখে আনে না।

তাদের ক্ষোভ, ইয়ে না ফরমান নাখান্দা বেঈমান গলদ বাত বাতিয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গা হ্যায়।

মেরা কসুর কিয়া হায়! গুলি মার ও ফজুল বিহারি কাওম কা। বেঈমান হারামখোরকো মরণে দাও। ও-শালে লোককো পাকিস্তান মত নেনা। বাংলাদেশকা মাফিক ও পাকিস্তান ভি টুটায়গা। ইসলাম ও পাকিস্তানের আসলি গাদ্দার কোই হ্যায় তো ওনকা নাম বিহারি। ইয়ে পুরো কাওম হিন্দু জাদে ইন্ডিয়ান এজেন্ট। ওনকা বাত কভি বিসওয়াস করনা। উনকা মিঘটি বাত মানছ ত মরছ।

স্যারেন্ডারের নামে বিহারি তালবাহানা শুরু হয়। বাঙালি রক্ত ঝরছে ব্যাপক। বাঙালির ধৈর্য টুটলো। বিহারি মরণ ফাঁদ ঘনালো। কমান্ডার মুজিবর তিন ইঞ্চি মর্টার ফায়ারে বিহারি অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেন। এবার বিহারি স্যারেন্ডার শুরু হয়। অস্ত্র সমর্পণে বারবার প্রতারণা ধরা পড়ে। নির্দোষ সাফ সুতরা ধোয়া তুলসী পাতা বনার পরও তাদের বন্দিনিবাসে নির্যাতিতা বিবস্ত্রা বাঙালি নারীর সন্ধান মিলে। লুণ্ঠিত সোনাদানার অলংকার ও টাকায় বেগ ভর্তি। নির্যাতিত অত্যাচারিত জনতা প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ এসে বিহারির বিচার চায়। জয়বাংলার জয়গানে তারা নীরব। পাকিস্তান জিন্দাবাদের মহাআরবের সগর্জন গৌরবে তারা গর্বিত। বদমেজাজের অহংকারে বিহারিরা মুক্তি গেরিলার মুখে থুতু মারার দুঃসাহস দেখায়। ইসলামি বোলচালের তসল্লির তজল্লিতে আল্লা-রসুল পাকিস্তান ও ইসলামের নামে তাদের দশদিক মাতানো জিকির শুরু হয়। বিহারি দুর্গের মদ-মাংস-নারী-স্বর্ণ-টাকার ব্যাপারে তারা নির্বিকার নির্লোভ বক ধার্মিক। কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাদের আনাল হক মার্কা জিকির সার। বাঙালিদের ধৈর্যের সীমা আর থাকে না।

শ-পাঁচেক বিহারি রশির বন্ধনে খুশি না। হাত নাচাতে না পারলে বাঙালির বাপের শ্রাদ্ধে তাদের মুখে খৈ ফুটা নাচন। বাঙাল কুফরি স্থানে তারা থাকতে চায় না। তাদের পাকিস্তানের পাকিস্তানি ওয়াতনে (দেশে) পাঠানো হোক। ফরিদপুরের এক সুবৃহৎ গোডাউন ভরে বন্দি বিহারিতে। শেষ কলেমা পড়ার সুযোগেও তাদের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের কৃতকর্মের অনুশোচনায় আনা যায়নি। অস্ত্র হাতে বিক্ষুব্ধ জংগি জনতা বিহারি বিচারের জন্য মুক্তিদের ঘিরে ফেলে। লাখো জনতার দাবি খুনি বিহারি বিচার চাই। মুক্তিরা হয় বিচার করবা, নইলে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে আমরা বিচার করুম।

মারিচের মরণে মুক্তি গেরিলারা মুখোমুখি। বিহারি রক্ষার নামে নিজেদের মরতে হয়। প্রতিটি বন্দি বিহারির বিরুদ্ধে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। মুক্তি কমান্ডের গোপন বিচারেও তাদের প্রতি সবার রায় মৃত্যুদণ্ড। আত্মপক্ষ সমর্থনে বিহারিদের বিদ্রুপের হাসি। হয় বন্দি বিহারিদের মারতে হয়। নয়ত ক্ষেপা জংগি জনতার হাতে তুলাধুনায় মুক্তি গেরিলাদের মরতে হয়। অগত্যা তাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের নিষ্ঠুর রায় ঘোষিত। সোবেহ সাদেক নাগাদ একশজন করে বন্দিকে গুলিতে হত্যা করা হয়। বিহারি অত্যাচার দমন করে ক্যাপ্টেন বাবুল ও মুক্তিরা ফিরে আসেন মাঝবাড়ি ক্যাম্পে। এমনি বহুতর যুদ্ধবিগ্রহের রক্তঝরা

প্রবাহের ফসল বাংলার স্বাধীনতা। হেমায়েতের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত যোদ্ধারা তাঁরই হাতে অস্ত্র জমা দেন। যুদ্ধাহত বিজয়ী বীর হেমায়েত-এর দোয়া নিয়ে যার যার পূর্বতন পেশায় ফিরে যায়। জয়তু বাংলাদেশ।

স্বাধীন দেশে যোদ্ধা ঃ তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। পাকিস্তান ভাবতো তাদের চির বৈরী ভারত। কোন্ ভুলে যে কিছু সংখ্যক বাঙালিকে পাকিস্তান সামরিক ট্রেনিং দেয়, গুরু মারা বিদ্যার মতো পাকিস্তানি প্রশিক্ষণের বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তান ভাঙ্গার নেতৃত্ব দেয়। শত্রুমিত্র নির্ধারণের ভুলের খেসারতে ডুবে পাকিস্তান। পাকিস্তানি প্রশিক্ষণের দক্ষ সৈনিক মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে মুজিবর রহমান যোগ দেন বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স কোরে। ১৯৮২ সালে ইউনিফরম জীবনের অবসান ঘটে।

অবসর জীবনে দেশের বাড়িতে মন টিকেনা। ইউনিফরম ও যুদ্ধজীবনের উন্মাদনা নেই অবসর জীবনে! অবসর ভাতা ও তার সুযোগ সুবিধায় বাঁচা দায়। জীবন দুর্বিসহ। মুক্তিযোদ্ধার পুরস্কারের নামে মিলেছে সব সরকারের সরব সাজার বিনা পয়সার রাজনৈতিক ও দলীয় উপদেশ খয়রাত। বাংলার বৈধ-অবৈধ সকল সরকারই মুক্তিযোদ্ধাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চান। ক্ষমতার ভিত পাকাপোক্ত করতে চাই মুক্তিযোদ্ধার ছত্রছায়া। হায় স্বাধীন বাংলার সরকার! মুক্তিযোদ্ধারা পরস্পর হানাহানিতে মরে সাফ!!

১৯৯৬ সালে ঢাকার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে স্থান পান মুজিবর রহমান। এখানেই সপরিবারে মাথা গোঁজার আস্তানা। কতজনেই তো কতো বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতি টুকে নেন। ধন নয় মান নয় সামান্য মর্যাদার প্রত্যাশা। কে দিবে হতভাগ্য মুক্তিযোদ্ধাকে স্থান ইতিহাসের পাতায়!

মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ঃ হেমায়েত বাহিনীর হেমায়েতের পুরো পরিবারই মুক্তিযোদ্ধা। হেমায়েতের ভাবশিষ্য মুজিবর রহমানের পুরো পরিবারও মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর পিতা সিরাজ উদ্দিন মল্লিক ও মাতা চাঁন বড়ু বেগমের দুজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার পুত্রের বিজয় সাফল্যে তাঁরা গর্বিত। মজিবরের মুক্তিযোদ্ধা পিতা জান্নাতবাসী হন ১৯৮৩-তে। বৃদ্ধা-মুক্তিযোদ্ধা মাতা অতীত স্মৃতি সাক্ষ্য মন্থনে আজো জীবিত।

গর্বিত মুক্তিযোদ্ধার চার সন্তান। এক মেয়ে ও তিন ছেলে। মেয়ে বিবাহিতা। সন্তানরা চাকরি, প্রশিক্ষণ ও পড়াশোনায় রত। তাঁদের কল্যাণ হোক। প্রাচুর্য না থাকলেও পৃথিবীতে তাঁরা কারো করুণার পাত্র বা গলগ্রহ নন। হায় অন্য মুক্তিযোদ্ধার পুত্ররা যদি এমন হতেন!

বীর প্রশস্তি ঃ মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী স্বমহিমায় ধন্য। কি সমর নীতি, কি রাজনীতিতে কেউ নেতা হন না, যদি না তাঁদের মতাদর্শে দীক্ষিত সমর্থক থাকেন। বীর জীবনের অনুকরণীয় নিদর্শনে হেমায়েত এদেশের অনেক বীরযোদ্ধাকে তাঁর নেতৃত্বের মরণ যুদ্ধে টানতে পেরেছিলেন। হেমায়েত বাহিনীর বীরযোদ্ধাদের এমনি এক অমর

যোদ্ধা মোঃ মুজিবর রহমান মল্লিক। স্বাধীনতা যুদ্ধের মরণ খেলায় তাঁর বীরত্ব, সাহস, সহমর্মিতা, নেতার প্রতি আনুগত্যের অত্যুত্তম নিদর্শনে যুদ্ধ সাথীরা শ্রদ্ধাবনত বিমুগ্ধ। অর্ডন্যান্স কোরের সৈন্য পদাতিক বাহিনীর যুদ্ধে অভাবিত যুদ্ধ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর বিনয় ও সৌজন্য সবাইকে মুগ্ধ করে। স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে বিচরণে তাঁর চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই। মুক্তিযুদ্ধের শহিদ ও পংগু স্মরণে তিনি বেদনাহত রুদ্ধ বাক। শহিদ আত্মার মঙ্গল কামনায় করুণাময়ের দরবারে লুটিয়ে পড়েন। যুদ্ধসাথী শহিদ সমাধির সংরক্ষণের অভাব তাকে ব্যথিত করে। পঙ্গু মুক্তির আহাজারিতে হৃদয় ফাটে। কে রাখে স্বাধীন দেশে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যোদ্ধাদের খবর! কে দেয় তাদের যোগ্য সম্মান!! যুদ্ধ শেষে অস্ত্র জমা দিয়ে ঘরে ফেরা অগণিত যোদ্ধার ক'জনের খবর রাখে স্বাধীন দেশ!!! ১৯৭১ দেখিয়েছে এদেশ জন্ম দিয়েছে কতো প্রখ্যাত, অজ্ঞাত বীরযোদ্ধা। তাঁদের স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝে বেঁচে থাকার বেদনা 'কহন না যায়ে'।

মুজিবুর রহমানের শেষ পরিণতি ঃ অর্ডন্যান্সের সিপাই থাকাকালীন ইবিআর হাবিলদার হেমায়েতের সঙ্গে লাহোরে পরিচয় হয় মজিবুর রহমান মল্লিকের। মুক্তিযুদ্ধকালে হেমায়েতবাহিনী সুরক্ষায় তাঁকে হেড কোয়ার্টার কোম্পানির দায়িত্ব দেয়া হয়। স্বাধীন দেশে বাঁচার তাগিদে পরিবার পরিজন রক্ষায় তিনি মিরপুরের এক ঔষুধ কোম্পানির সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি নেন। উপার্জিত অর্থে কোনভাবেই জীবন না চললে, এক পর্যায়ে পায়খানার সেফটি ট্যাংকের উপর ঘর নির্মাণ করে বাস করেন। মিরপুরের শিয়ালবাড়ির রাস্তায় হাঁটার সময়ে আকস্মিকভাবে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাহিনীপ্রধান হেমায়েতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মুজিবুর রহমান মল্লিকের। হেমায়েত যুদ্ধকালীন সহকর্মিকে দেখতে তাঁর বাসায় যান এবং সবকিছু দেখে মর্মাহত হন। অবশেষে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে নিজের বাসায় বিনাভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা করে দেন মুজিবুরকে। পরবর্তীকালে বিশেষ বন্দোবস্তে বস্তা দিয়ে তাঁর পরিবারের জন্য একটি থাকার ঘর বানিয়ে দেন হেমায়েত। ২০০৩ সালের মে মাসে এখানেই বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবের জীবনাবসান ঘটে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, হার্টস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় এই মুক্তিযোদ্ধা মারা যান। একেই বলে মুক্তিযোদ্ধার ভাগ্য!

বিজয়ী বীর শৌর্যে

বিদ্রোহী

নিগ্রহীর লাঞ্ছনা, পিড়ির পিড়ি দান, উপমহাদেশের পথ প্রদর্শনী বাংলা। আজ বাংলা যা ভাবে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে তা ভাবে পরে। জাত বিদ্রোহীর দেশ বাংলাদেশ। চিরন্তন বাংলার বিদ্রোহী সূত্রের জীবন্ত প্রতীক 'মোহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম।' গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া থানা হেমায়েতের জন্ম। বাংলাদেশের

স্বাধীনতা যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি গেরিলা যুদ্ধ। গেরিলা যুদ্ধের এক অপার বিস্ময় হেমায়েত। তাঁর গেরিলা যুদ্ধের সংগঠন ও কার্যক্রম অনাগত ভবিষ্যতে জাতীয় স্বাধীনতার অতন্দ্র যোদ্ধাদের প্রেরণা জোগাবে। মুক্তিযুদ্ধের ও কালজয়ী সংশপ্তকের আর এক বিদ্রোহী সৈনিকের মিল আছে। তিনি বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম। দুজনই সৈনিক, দুজনই হাবিলদার মেজর হিসেবে যুদ্ধ শুরু করেন। দুজনের যুদ্ধ প্রশিক্ষণের সময় কেটেছে উপমহাদেশের পশ্চিমাংশে। মূল রণাঙ্গণের পূর্বেই দুজনের মধ্যে স্বদেশী চেতনা ও বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। দুজনই কবি ও গায়ক। নজরুল স্বভাব কবি। হেমায়েত প্রচেষ্টার কবি। নজরুল স্বভাব গায়ক। হেমায়েত আর্মি গানের স্কুলের ইনস্ট্রাক্টর। চাকরিতে দুজনেরই দ্রুত উন্নতি ও দ্রুত পতন। দুজনই যৌবনে দুরারোগ্যে রোগাক্রান্ত। দুজনের জীবন দুঃখে গড়া। দু'জনেই জেল খেটেছেন। দুজনেরই একাধিক পত্নী। শেষ পত্নী হিন্দু (ধর্মান্তরিত)।

বীর প্রশস্তি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ১৯৯২ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরদের জাতীয় সংবর্ধনার মাধ্যমে পদক দানে সম্মানিত করেন। হেমায়েত উদ্দিনও সেখানে পদকে ভূষিত হন। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে, "বাংলাদেশে গণমুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা পরিষদ তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেন। সে অনুষ্ঠান স্থল বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্‌ষ্টিটিউট মিলনায়তন, ঢাকা। সে বীর বন্দনার তারিখ পাঁচ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। আয়ুষ্কালে হয়ত তিনি আরো এমনি বহুতর সংবর্ধনা পাবেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চারণে এমন বিস্ময়কর গেরিলা যোদ্ধার সন্ধান পাই নি। বাইরের জৌলুসের আড়ালে এমন বেদনায় রোদন ভারাক্রান্ত সুপ্ত যোদ্ধার সন্ধানও বেশি পাই নি।

১৯৭১-এর প্রবাসী সরকার, ভিখারি আর্মি, ৮ নং সেক্টর, গেরিলা যোদ্ধা, স্বাধীনতা যোদ্ধা ও কৃতজ্ঞ দেশবাসীর পক্ষ থেকে অকুতোভয় যুদ্ধাহত পঙ্গু হেমায়েতকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। তাঁর প্রথমা পত্নী হাজেরা স্বামীকে আত্মাহুতির শৌর্যে যুদ্ধ উন্মাদনার প্রেরণা জোগানোর জন্য নারী জাতির পক্ষ থেকে বন্দনা করি। তাঁর বর্তমান স্ত্রী সোনেকা হাজেরা নারী মুক্তিযোদ্ধার বিমূর্ত বিস্ময়। বীর পূজারিণীর আসনে তাঁকে বরণ করি।

স্বগত

মহত্তীযোদ্ধা হেমায়েত স্বমহিমায় ধন্য। দুর্ভাগ্য এ-দেশ ও জাতির আয়ুষ্কালে তাঁকে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হলো। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধন্য সমর জগতের অমর যোদ্ধার স্মৃতি সংরক্ষণে নিজকে জড়াতে পেরে জাতির ঋণ শোধের তৃপ্তি পাচ্ছি। অগনিত শহিদ, যুদ্ধাহত ও স্বাধীনতা যোদ্ধার স্মরণে তাঁর পাদপদ্মে শতকোটি প্রণাম।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ শেখ

পরিচিতি : বাবা মরহুম কাশেম শেখ, মা-হলদা বিবি; জন্ম-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। গ্রাম-মনিরকান্দি, পোস্ট অফিস-গোহালা, থানা-মোকসেদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ। সঙ্গতিপন্ন কৃষক পরিবারের সন্তান। ২২ বছরের বিবাহিত যুবক। লেখা পড়ায় গোমূর্খ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে চোখের দেখা আশপাশের ধ্বংসযজ্ঞে হতবাক!

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কারণ : তাঁর গ্রাম মনির কান্দির চারপাশে নিরংকুশ সংখ্যাধিক্যের বর্ধিষ্ণু হিন্দু-অমুসলমানের বাস। আচার পাড়া, আড়ুয়াকান্দি, কাজিপাড়া, জিরাতলি, বনগ্রাম, জলিল পাড়, কলিগ্রাম, বাইনারচর, গোহালা, ননক্ষির, গোয়ানগ্রাম, বইষথৈল, সেন্ধা, পৈলতা, উল্লাবাড়ি, কদমবাড়ি'র মত একচেটিয়া ধনে-জনে পরিপূর্ণ অমুসলমানের বসতির গ্রাম। অমুসলমানের সুন্দরী নারী, অস্থাবর-স্থাবর সম্পদের প্রতি লোভের হাত বাড়ায় স্থানীয় রাজাকার। নিজের লোভের ও লাভের ভাণ্ডার পুরাতে তারা পাক হানাদার ও বিহারিদের সাহায্য নেয়।

গ্রামের পাশের বড় নদীর শাখা গোহালা খাল। স্থানীয় রাজাকরগণ পাক আর্মি ও বিহারি সাঙাতের অস্ত্র বলে নৌকায় গিয়ে গ্রামকে গ্রাম জ্বালাত, বাছাই করা গরু-ছাগল, মুরগি, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা, বহনযোগ্য ট্রাংক-সুটকেস, পিতল, তামা, কাঁসার কলস-থালা-ঘটি-বাটি, ধান-চাল লুটে আনতো। এ-সব লুটের মাল নিজেরা ভোগ করতো এবং নজরানা দিত পাক আর্মি ও বিহারিদের। লুটের মালে গনিমতের সিংহ ভাগ যেত পাক আর্মির ভাগে। তারা সুন্দরী মেয়ে সংগ্রহের লালসা পুরাতে অতি উৎসাহের সঙ্গে ধ্বংসযজ্ঞের তাণ্ডব চালাতো। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের প্রাকাশ্যে ধর্ষণ করতো পাক আর্মি ও বিহারি। পরে রস নিংড়ানো ঝুটা উপহার দিত দো-আঁশলা বাঙাল রাজাকারদের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষণ শেষে ধর্ষিতা মেয়েদের গুলি করে হত্যা করতো কুকুর-জানোয়ারের মতন।

মোশাররফ-এর নিজের গ্রামের পাশের গ্রাম বাওন ডাঙার প্রায় শ'খানেক রাজাকার ছিল। তাদের মধ্যে মার্কামারা চিহ্নিতের ক'জন, তপু, মেসের, ধলামিয়া। এদের দোর্দণ্ড কমান্ডার 'তপু'। পঞ্চাশ গজের মত দূরত্বে দাঁড়িয়ে শক্ত-গুলির আড়ালে লুকিয়ে ইতিহাসের নৃসংসতম-ধর্ষণ-হত্যা-লুণ্ঠনের দৃশ্য দেখেন মোশাররফ শেখ। বাঙালি দো-আঁশলা রাজাকার-বিহারি-পাক আর্মি অস্ত্র শূন্য নিরস্ত্র জনতার ওপর ফ্রি ওয়াকওভারের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে স্থান ত্যাগের পর পর লুকিয়ে থাকা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা জীবনমৃতদের সেবা এবং উদ্ধারে এগিয়ে আসতো। এমনি একদিনের জীবন্ত স্মৃতি স্মরণ করেন মোশাররফ শেখ।

আড়ুয়া কান্দির এক বাড়িতে সদ্য বিবাহিতা সুন্দরী বউ আসতেই পাক আর্মির খপ্পরে পড়ে। পুরো পরিবার পাক আর্মির হত্যা-লুন্ঠনে নিথর। সদ্য বিবাহিতা বধূর সাথে অপর এক অবিবাহিতা কন্যাকে লুটে ছিনিয়ে নেয় পাক আর্মি।

উপভোগের জন্য তাদের নিয়ে যায় বিলের মাঝে বস্তিশূন্য এক উঁচু ঢিবির

পরিত্যক্ত ভিটায়। ষোল জন পাক আর্মি প্রকাশ্যে দিবালোকে নারীদের ধর্ষণ করে। ছেঁড়া ছোবড়ার মত নারী নিংড়ানের শেয়ার পায় সাথের বাঙালি-বিহারি রাজাকার। ধর্ষিতাদের হত্যা না করে বেহুশ হালে ফেলে রেখে যায় পশ্চিমা পাক সেনা।

দূর থেকে লুকানো নিরস্ত্র জনতা এ-পৈচাশিক দৃশ্যে শিউরে উঠেন। মনির কান্দির মজু, জলিল, মোলামির মত পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে মোশাররফ পৌঁছেন অকুস্থলে। সৌভাগ্য যে নির্যাতিতা ধর্ষিতা মায়েরা তখনো মরেন নি। তাঁরা বেহুশ গোঙানির হালে। ধর্ষিতাদের বাপ-ভাই-স্বামী ছুটে এলেন। অতি দ্রুত তাঁদের স্থানান্তর করা হলো চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে। জলিল পাড়ের সুধীর ডাক্তার চিকিৎসা করেন তাঁদের। হায় ধর্ষিতাদের করুণ দশা। গোপন অঙ্গ ফেটে চৌচির, ব্লাউজ ছিঁড়ে টুটাফাটা। বাস্তবে পুরা পরিবার ভারত যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে তাঁরা পাক রোষের শিকার হন। পরদিনই পুরা পরিবার ভারত যাত্রা করেন। স্বাধীন দেশে তাঁরা ফিরে এলেও লোক লজ্জায় সমাজ-সংস্কারের ভয়ে ঘুণাক্ষরেও সে-দুর্দিনের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ তাঁরা উঠান না।

পাক আর্মি বাঙাল রাজাকারদের উপহার দিয়ে যেত ধর্ষিতা-লুণ্ঠিতাদের। নির্দেশ থাকতো নিজেরা তাদের নিয়ে আমোদ ফূর্তি করে মেরে ফেলবা। মোশাররফের মা-বাবা ছেলেকে বলতেন ধর্ষিতা-আধামরাদের সেবা যতন ছেড়ে ভাগ। পাক আর্মি রাজাকার দেখলে তোমাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবো। কে শোনে কার কথা?

পাক তাণ্ডবের অপর এক দৃশ্য আজো মোশাররফের চোখে জ্বলজ্বলে। পাক আর্মি রাজাকার সহযোগে গ্রাম ঘের দিয়ে আক্রমণ চালায় সেন্ধ ও পলতা গ্রামে। তখন জৈষ্ঠের শেষ। শত্রুহাত এড়াতে মেয়েরা লুকান গেণ্ডারি ক্ষেতে। রাজাকারের হাত এড়াতে এক বুড়ি তাঁর সুস্থ-সবল তাজা ছাগল নিয়ে ঢুকেন গেন্ডারি ক্ষেতে। পাক আর্মি খুঁজে পায়না আদমি আওর আওরত কাঁহা গায়েব হো গেয়ি। রাজাকারদের ওপর তাঁদের হামবি তামবি চলে। তোমলোক গাদ্দার হো। তোম জরুর জানতে আওরত (মহিলা) কাঁহা ছুপাতে হেঁ? তোম বেইমান আদমি আপনা মৌজ মিটানে কা লিয়ে ওনকো গায়েব কিয়া! অকস্মাৎ গেণ্ডারি ক্ষেত থেকে ছাগলের ভেঁ ভেঁ ডাকে ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায়। এবার গেণ্ডারি ক্ষেতের চারপাশ ঘিরে মেশিন গান, এল.এম.জি. ও রাইফেল থেকে বেধড়ক, বেরহম গুলি আর গুলি। গোটা পঞ্চাশ নিরীহ, নিষ্পাপ মাসুম শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-যুবক-যুবতী অকুস্থলে নিহত হন। আহতদের কথা কহনে না যায়। কোন কোন পরিবার সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপ নিঃশেষ। তিন-চার বাড়ির পরিবারের মা-বাপ-ভাই, ছেলে-মেয়ে নিঃশেষ। আহতদের দু'চারজন জীবিত পাওয়া গেলে স্থানীয়ভাবে তাদের চিকিৎসা করানো হয়। অন্যান্য পরিবারে লুকিয়ে-পালিয়ে বাঁচা, অকুস্থলে অনুপস্থিতির কারণে দৈব বাঁচারা তাৎক্ষণিক প্রাণে বাঁচতে ভারতে হিজরত করে।

মৃত্যু শীতল রোমাঞ্চকর অকুস্থলে পাক আর্মি যাবার পরবর্তী উদ্ধার পর্ব মোশাররফ সাথীদের কজন-

ক। বজলু খালাসি, গ্রাম- বর্চাকান্দি,

খ। রশিদ হাওলাদার, গ্রাম-মনির কান্দি,

গ। রহমান হাওলাদার, গ্রাম-মনিরকন্দি।

ঘাতকদের মাঝেও কিছু মুসলমান রহম দিল মানুষ ছিল। তাই তো একদল মুসলমানের হাতে নিগৃহীত অমুসলমানদের বাঁচাতে অপরদল মুসলমানই এগিয়ে আসেন। ইসলাম ও মুসলমানের ইমান ও ইনসাফের তখনো পুরোপুরি মৃত্যু ঘটে নি। পাক আর্মি পরিত্যক্ত হত্যা- ধ্বংসের রণাংগনের করুণ আহাজারি পৃথিবীর যে কোন পাষাণের অশ্রু ঝরাবে। অলৌকিক রক্ষা পাওয়া দুগ্ধ পোষা শিশু হামাগুড়িতে মৃতা মার দুধ চোষে। হায় মানবতা! নিহত, আহতদের আত্মীয় স্বজনের আহাজারির দৃশ্যে কারবালার করুণ দৃশ্যের, সূচনা।

আর করবিনি মালাউনি সেবা!

পাক আর্মি-রাজাকারদের মেরে-কেটে, ধর্ষণ করে, লুটে যে হালতে রেখে যায় তাতে তাঁদের বাঁচার বা রক্ষা পাবার কথা নয়। মারাত্মক আহতদের কল্লা কেটে কতলে ওয়াজেবের মাথা আলাদা করতোন না। তড়পিয়ে গুঙিয়ে ধীরে ধীরে ছাকরাতাল মওতের আজাব ভোগ করে মরবে কাফের। তাই তারা তাড়াহুড়োয় সবগুলির মৃত্যু নিশ্চিত করেন না। তাঁদের রহম দিলের কারণে মরণাপন্ন কাফের বাঁচে কেমনে? কুফরিস্থান হিন্দুস্থানে গিয়ে পাক হুকুমতের (শাসনের) গিবত গায়? গুলি-বেয়নেটের আঘাত দেখিয়ে দুনিয়ার করুণা ভিক্ষা চায়! কারা এ-সব আহত কাফেরদের বাঁচায়, ভারতে পাচার করে তার অনুসন্ধানে লাগে পাক আর্মি ও রাজাকার।

রাজাকারগণ একাধিকবার মোশাররফকে সতর্ক করেছে কাফের পেয়ারে না যেতে। নিজের মা-বাবার উপদেশের বাইরেও মোশাররফ আহত উদ্ধারে ধর্ষিতা মাদের রক্ষায়, শ্মশানদাহে যেতেন।

এবার রাজাকার সহায়তায় তিনি পাক শিকারের দরবারে। রাজাকারগণ তাঁকে মনের মত পিটিয়ে হাজির করেন খাস পাঞ্জাবের আর্য সেনা খুনে খানের দরবারে। খুনে খানের বিচারে কাফের পেয়ারের শেয়ারের পুরস্কারে পঞ্চাশ বুটের লাথির উপহার পায় মোশাররফ। বিচারের রায় কার্যকর করার ঠিক হয় স্থান জলিল পাড় নদী-তীর। রাজাকার তাঁর দুহাত ধরে রাখে। বিকাল চারটা নাগাদ খুনে খান গুনে গুনে দণ্ডিতকে সবুট পঞ্চাশ লাথি উপহার দেয়। মৃত প্রায় বেহুশ মানুষটি লাথির চোটের কারণে পড়ে রইলেন নির্জন জলহান নদী-তীরে। বেলা ছটার সন্ধ্যা লগনে পাশের গ্রামের গরুর খাবার ঘাস ও কচুরিপানা কেটে নেয়ার কজন নৌকার লোক তাঁকে বেহুশ মৃত্যুর হালে পান নদীর তীরে। তাঁরা মা-বাবার কাছে মোশাররফকে নিয়ে আসেন। যে-ভাবে যে-হালতে ছেলেকে পান তার বর্ণনা দেন দয়ার্দ্র গ্রামবাসী। সে-লাথির ফলশ্রুতিতে আজো মোশাররফের বুক দিয়ে অহরহ রক্ত ঝড়ে। তিনি কাজে অসমর্থ। ডাক্তার কবিরাজ তখন কমই মিলতো। জলিল পাড়ের নিরোদ ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করেন। তাঁর মা-বাবা

সাধ্যমত ছেলের চিকিৎসা করান। এ-লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে। মা-বাবার চিন্তা ছেলে বাঁচবে না। তাঁদের উপদেশ ভারতে যাও চিকিৎসা ও বাঁচার জন্য। বাঁচা-মরা যাই হোক ছেলের গোঁ ভারতে যাব না। প্রতিশোধ প্রতিকারে লড়ব।

আজ বাংলা ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। বিগত ক্ষত ভুলে সবাই দুদেশের মৈত্রী চান সদিচ্ছার মন নিয়ে। মনে পড়ে এমনি হয়েছিল আফগানিস্তানে বেদম মার খেয়ে রাশিয়ার পরাজয়ে। আফগান যুদ্ধে এক নিখোঁজ, নিহত সন্তানের খোঁজে এলেন এক রাশিয়ান মা। আফগান মোজাহেদরা তাঁর সামনে হাজির করেন কজন পুত্র হারা আফগান মাকে। আরো হাজির করেন যোদ্ধাহত বেশ কিছু পংগু-বিকলাংগ আফগান যোদ্ধাকে। রাশিয়ান শোকাতুরা মা ও আফগান ব্যথিতা মার কে কাকে সান্ত্বনা দিবেন? আফগান ও রাশিয়ান দুদেশের অগনিত সন্তান হারা মা ও আহত পংগুর আহাজারির আর্তনাদ। একই মানদণ্ডে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মৈত্রী গড়তে প্রধান বাধার শোকাশ্রু নেভাবেন কে? রেডিও টেলিভিশন পত্রিকার শিরোনামে যতই কীর্তনই গাওয়া হোক! মোশাররফদের রক্ত ঝরা বুকের চিকিৎসা করবেন কে? পাকিস্তান না বাংলাদেশ! ভিতরে ছাই চাপা আগুন রেখে সুপ্ত আগ্নেয়গিরিকে মৃত ভাবা নিতান্ত ভুল। মুক্তিমাতা শহিদ জননী জাহানারা ইমাম পুরনো ছাই চাপা আগুন উচকে দিয়ে প্রলয় নাকচ দেখিয়েছেন।

যোদ্ধা হওয়ার ইচ্ছাপূরণ

খুঁজে পেতে পেলেন দু বাঙালি নিয়মিত সৈনিককে। ময়মনসিংহের আবু ওয়ারেশ ও ফরিদপুরের আবু। কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্ট থেকে প্রচুর অস্ত্রসহ সটকে পড়া দুসৈনিক ফরিদপুর অঞ্চলে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন। একাধিক এলএমজি ও স্টেন জাতীয় অস্ত্রে তাঁরা সজ্জিত। সে-সৈনিক দরবারে মোশাররফ আর্জি পেশ করে মুক্তিযোদ্ধা হবার। ওয়ারেশ ও আবুর উপদেশ, "মুক্তিযোদ্ধা হতে প্রশিক্ষণ চাই"। রাইফেল চালনা-গ্রেনেড ছোঁড়ার মত ট্রেনিং নিতেই হবে। তাঁদের পরামর্শে ছুটলেন হেমায়ত বাহিনীর মুক্তি প্রশিক্ষণ সেন্টার কোটালি পাড়া, জহরেরকান্দি হাই স্কুল। অসুস্থ শরীরেও যৌবনের উন্মাদনায় তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিলেন। রাইফেল-স্টেন-গ্রেনেড খোলনা-জোড়না-ছোঁড়নার প্রশিক্ষণ নিলেন। দাঁতের কামড়ে গ্রেনেডের পিন খুলে ছোঁড়ার উদ্দীপনা তাঁকে আজো পুলকিত করে। ট্রেনিং শেষে যোগদান করেন হেমায়েত বাহিনীতে। হেমায়েত বাহিনীর মজির গ্রুপের অধীনে শ্রাবনের শুরুতে সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা মোশাররফ শেখের।

যোদ্ধার যুদ্ধ

মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ শেখের কটি স্মরণীয় যুদ্ধ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১। টেকের হাট ফেরিঘাট যুদ্ধ : যুদ্ধে মুক্তি পক্ষের দৃশ্যমান অকুস্থল গ্রুপ কমান্ডার মুজির। একাধিক গ্রুপের সমন্বয়ে মুক্তি আক্রমণ চলবে। যুদ্ধের সার্বিক কমান্ডে উপস্থিত থেকেও অদৃশ্য কমান্ডার হেমায়েত। কারণ রণাঙ্গনে কেউই হেমায়েতকে চিনতে পারেন নি। মোশাররফ আজ অবাক বিস্ময়ে ভাবেন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে উপস্থিত

থেকেও "কমান্ডারকে চিনলাম না!" মুজিবর গ্রুপের যোদ্ধা সংখ্যাও ত্রিশ। অস্ত্র এমজি, এলএমজি, রাইফেল, স্টেন ও গ্রেনেড।

শত্রু পাক পক্ষের সংখ্যা পঞ্চাশ। বিশ জন নিয়মিত পাক সেনা ও রাজাকার সংখ্যা ত্রিশ জন। শত্রু পক্ষের রিয়ার হেড কোয়ার্টার ফরিদপুরের সাথে টেলিফোন লাইন চালু ছিল। মুক্তিরা ইচ্ছে করেই যেন শত্রুর টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে নাই। আক্রান্ত শত্রু সাহায্য রি-ইনফোর্সমেন্ট আসতে যাতে পথে শিকার ধরা যায়।

একাধিক গ্রুপের সমন্বয়ে আক্রমণের ওয়াজেদ গ্রুপ যথাসময়ে গরহাজির। ইদ্রিশ মোল্লার গ্রুপ যথাময়ে এসেমবলি এরিয়ায় আসলে, তাঁর নেতৃত্বেই যুদ্ধ সূচনা হয়। ভোর চারটা নাগাদ মুক্তি আক্রমণ হয়। ঝাড়া এক ঘণ্টা দুদলে গুলি বিনিময়। তিন রাজাকার নিহত ও চার পাক সেনা আহত হতেই নিপক্ষের পৃষ্ঠ প্রদর্শন ঘটে। আক্রান্তদের চরম বিপদ সংকেতেও পশ্চাদ সদর (রিয়ার হেড কোয়ার্টার) ফরিদপুর থেকে কোনই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি মিললো না। সুশংখল পাক আর্মি নিহত ও আহতদের উঠিয়ে নেয়। দিনের আলো ফুটছে। তেঁদর মুক্তিদের জয় বাংলার সজর্গন ওয়ারক্রাইর সাথে দুরদূরান্তের অযুত জনতা সুর মিলায় 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে। বাঙালির ওয়ারক্রাইতে ফ্রাই বনার ভয়ে মুক্তির সংখ্যা নির্ণয়ে তাঁরা বিভ্রান্ত হন। অগ্যতা যো গতি পলায়তি।

মুক্তি আক্রমণের উদ্দেশ্য সাময়িক উপস্থিতির শক্তি প্রদর্শন। মুক্তিরা শত্রু পরিত্যক্ত টেকেরহাট ফেরিঘাট দখল করে নিজেদের আধিপত্য দেখায়। যুদ্ধ শেষে দু'দলই যার যার স্থানে। বিজয়ী মুক্তি ফিরে যায় কোটালিপাড়া। পরদিনই বর্ধিত অস্ত্র ও জনবলে পাক আর্মি পুনরায় টেকেরহাট ফেরিঘাট দখল করে নেয়।

২। মধুমতি যুদ্ধ ঃ টেকেরহাট যুদ্ধের এক সপ্তাহের ব্যবধানে মধুমতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তি সংখ্যা দুশ জন। অস্ত্র এলএমজি, থ্রিনটথ্রি রাইফেল, স্টেন, শর্টগান, গ্রেনেড। দশটি লম্বা নৌকায় তীর ঘেঁষে মুক্তি যাত্রা।

পাক আর্মির দুটি প্রহরায় লঞ্চে শ'খানেক নিয়মিত পাক সেনা ও মিলিশিয়ার বাঙালি বিহারি রাজাকার। প্রচুর খাদ্য সম্ভার বয়ে নেয়া একটি বার্জ-শিপকে প্রহরা দিয়ে খুলনা থেকে ঢাকা নিচ্ছে। লঞ্চ দুটিতে প্রহরার সৈনিকের সাথে অস্ত্র-গোলা-বারুদ ও অন্যান্য মালে ভর্তি। লঞ্চ ও বার্জশিপের চালকদের সবাই বাঙালি। বার্জ শিপে চালক ও সুকানির ২+২=৪ জন ছিলেন। পাক আর্মি মিডিয়াম ও লাইট মেশিন গান, ২ ইঞ্চি মর্টার, চিনা ও বৃটিশ রাইফেল সজ্জিত।

মুক্তি আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য খাদ্য বোঝাই বার্জশিপ দখল। নদী তীর ঘেঁষে এগুনো মুক্তি নৌকা শত্রু অবস্থান বার্জশিপের দেড়শ গজের ব্যবধানে পৌছে গুলি চালায়। তীর ঘেঁষা মুক্তিসেনার নৌকাগুলি পাকআর্মি পূর্বাহ্নে দেখেও শনাক্ত করতে পারেনি। তাদের ধারনা ছিল সেসব সাধারণ কামলা-মজুর, সাধারণ ছোট খাট ব্যবসায়ী নৌকা।

নৌকার সামনে বসা পজিশন থেকে মোশাররফ মাঝ নদীর শত্রু জলযানে গুলি

ছুঁড়ছিল। রজনীর শেষ প্রহরে মুক্তি আক্রমণ হয়। মাল বোঝাই বার্জশিপের গতি খুবই ধীর। মুক্তি আক্রমণের তীব্রতায় মালবোঝাই বার্জশিপের সারেং সুকানির লক্ষে উঠিয়ে দ্রুততর গতির লক্ষে দে চম্পট। পাক পক্ষের জনাদশেক হালাক হতেই মালেকউল-মওতের এয়াদে তাঁদের আহতদের বোধোদয় হয়। মুক্তি পক্ষের নিহত দুই, আহত দশ। আহতদের একজন মোশাররফ শেখ। শেল স্প্লিন্টার-মেশিনগান কি রাইফেল জাতীয় কিসের গুলিতে মোশাররফের বাম বাহুর ওপরের চামড়ার মাংস শুদ্ধ ছিঁড়ে নিয়ে যায়। ক্ষণিকের বেহুশ অবস্থার পর হুশ ফিরতে দেখেন হাত বেয়ে রক্ত পড়ছে। হাত থেকে পড়ে যাওয়া রাইফেল ঝটিতে উঠিয়ে শত্রু জলযানে পুনরায় গুলি করেন। যুদ্ধরত মুক্তিদের জীবন মৃত্যু জানে লড়ার এ সামান্য নমুনা মাত্র।

বাজভর্তি শিপের মালে গণিমত মুক্তিরা দখল করে। পাক পরিত্যক্ত মালামালের আনুমানিক কমচে কম পরিমাণ একশ টন চাল, পঞ্চাশ টন গম, পঞ্চাশ টন চিনি, চা পাতা, লবণ, ডাল, মশলাপাতি প্রচুর। বেশ কিছু গোলা বারুদ ও অস্ত্র মুক্তি দখলে আসে।

মুক্তি ক্যাম্পের জন্য কিছু পরিমাণ খাদ্য রেখে বাকিটা মুক্তিপালা গরিব জনতার মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। দুহাত তুলে জনতা মুক্তির কামিয়াবি কামনা করে।

৩। জলিরপাড় অ্যাম্বুশ ঃ জলিল পাড়ের আশাপাশের গ্রাম জ্বালান, লুটপাট, মা-বোনের ইজ্জত লুটা ধর্ষণের উদ্দেশ্যে পাক আর্মির যাত্রা। পাক আর্মির নেতৃত্বে আর্মি-মিলিশিয়ার চল্লিশ জন লুটেরার বহির্গমন। তাঁদের অস্ত্র এলএমজি-রাইফেল, স্টেন, ২ ইঞ্চি মর্টার।

লুটেরা বর্গির খবর পাওয়া মাত্র পঞ্চাশজনের তাৎক্ষণিক মুক্তি গ্রুপ প্রতিরোধে এগিয়ে যান। তাঁদের আর্মির মো: আব্দুল মান্নান শিকদার, কমান্ডার ইদ্রিশ মোল্লা। সাধারণ অস্ত্রের ব্রিটিশ থ্রিনট থ্রি রাইফেল স্ট্রেন মুক্তি অস্ত্র। খতরনাক মুক্তি আতা হায় শুনে পাকিরা পালিয়ে যায়। দুপক্ষের বিনা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির আনন্দের বিজয়।

৪। দিক নগর ফেরিঘাট যুদ্ধ ঃ পাক পক্ষের জনবল একশ জন। তার অর্ধেক পশ্চিমা পাক সেনা, বাকি অর্ধেক পূর্ব পাক মিলিশিয়ার বাঙালি ও বিহারি রাজাকার। তাদের কমান্ডার খাস পাক আর্মি অফিসার ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ খান ও মেজর গুড্ডু খান। মেজর গুড্ডু খান বেশির ভাগ সময় থাকেন রিয়ার সদর ফরিদপুর। দিগনগর ফেরিঘাটের ফোন পাওয়া মাত্র তিনি আসতেন। বাঙালি রাজাকারদের দোর্দণ্ড কমান্ডার ছিল 'তপু'। প্রচুর গোলা-বারুদ-অস্ত্র ছিল কমান্ডার তপুর হাওলায়। সে ভালো উর্দু বোলচাল ঝাড়তে পারতো। তাই কমান্ডার তপুর গর্বিত উক্তি, "আইউব-ইয়াহহিয়ার গুলি ফুরাবে তবুও আমার অস্ত্র না ফুরাবে"। এমনি বহুতর পোঁ ধরা বাঙালি পদচাটা বেয়াকুবের বাঙালি কমান্ডার পরিবৃত ছিল পাক প্রশাসন।

মুক্তির জনবল চল্লিশ। অস্ত্র এল এম জি, রাইফেল, স্টেন ও গ্রেনেড। মুক্তির প্রকাশ্য কমান্ডার মুজিবর। উপস্থিতি অদৃশ্য নেতৃত্বে হেমায়েত।

মুক্তি আক্রমণের উদ্দেশ্য অনুমান নির্ভর পাক আস্তানার ধর্ষিতা-বন্দিনী মা-বোন

উদ্ধার। রাত তিনটায় মুক্তি আক্রমণের সূচনা। দুদলে তুমুল লড়াই উষা লগনের পাঁচটা পর্যন্ত। আক্রান্তদের সাহায্যে রিয়ার হেড কোয়ার্টার থেকে মেজর গুড্ডু খানের মত সাহসী এলেন না। সেখান থেকে অন্য কোন সাহায্যকারী সেনা দলের সাহায্যেও এলোনা।

পরবর্তী রাজাকার মারফত পাওয়া খবরে পাক আর্মির নিখরচা দশ জন। মুক্তি পক্ষের আহত চার জনের তিনজন : ১। ছালাম, গ্রাম- বাইটামারি, ২। রাজা মিয়া মির্ধা, গ্রাম-ভাটরা, ৩। মোত্তালেব কাজি, গ্রাম-নয়াকান্দি।

মুক্তিসেনার উপস্থিতি বন্দিনীদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে। তাঁদের হৃদয় উদার বেদনার সরোদন চিৎকার মুক্তিভাইরা আমাদের বাঁচাও। বিপন্না মা-বোনের আর্ত চিতকারে মুক্তিরা শাহাদতের উলা দরজার পথে আত্মাহুতির যুদ্ধে নামে। এই যুদ্ধের বীর যোদ্ধাদের মধ্যে স্মরণীয়-বরণীয় আফজাল হোসেন ফকির (শহিদ), ওয়ারেশ বাশার ফকির, আমিনুল হক, জয়নাল আবেদিন, সম্রাট ফকির, আলি মিয়া হোসেন, মোশাররফ হোসেন শেখ। মোশাররফ ও আফজাল এক রাজাকারকে বন্দি করেন। পাঁচজন বিপন্না নারী উদ্ধার হন। পরবর্তী চিকিৎসা শুশ্রূষার পরে তাঁদের পছন্দমত স্থানে যেতে দেয়া হয়। এসব নির্যাতিতাদের অন্যতম কানন বালা বণিক। স্বজনদের মাঝে স্থান না পেয়ে তিনি আবার মুক্তি ক্যাম্পে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এমনি বহুতর যুদ্ধের জয়পরাজয়ের খ্যাতিমান মোশাররফ শেখ। দিকনগর ফেরিঘাট যুদ্ধ তাঁর জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দেয়। সে যুদ্ধের ধর্ষিতা বন্দিনী মুক্তি-হাতে উদ্ধার পাওয়া কানন বালা বণিক মোশাররফ জীবনের সাথে জড়িয়ে এক হৃদয় বিদারক অধ্যায়।

সমাজ লাঞ্ছিত মুক্তি দম্পত্তি

যুদ্ধে উদ্ধার পাওয়া হিন্দুনারী কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে বড় আশায় বুক বেঁধে গেলেন প্রিয়জন সান্নিধ্যে। আত্মীয় পরিজন কেউ তাঁকে গ্রহণ করলেন না। তখনো দেশ স্বাধীন হয় নি। অন্তরমন বিধ্বস্ত নারী ফিরে এলেন মুক্তি ক্যাম্পে। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিলেন। প্রত্যাক্ষ যুদ্ধে লড়ে খ্যাতিমান যোদ্ধা। মুক্তিদের তিনি আদরের বোন। স্বাধীন দেশে তিনি আবার ফিরে গেলেন নিজের আত্মীয় মা-বাবা-ভাই-বোনদের সান্নিধ্যে। অন্যে তো দূরে থাক তাঁর প্রিয় রক্তের আত্মীয়রাই তাঁকে দূর দূর করে ঘৃণায় তাড়িয়ে দিল। আবার তিনি ফিরে এলেন মুক্তিশৌর্যের প্রিয় যোদ্ধাদের মাঝে। যুদ্ধ ঋণ, স্বাধীনতা যোদ্ধার ঋণ, রক্ত ঋণের উর্ধ্বে স্থান পেল। মুসলমান মুক্তি ভাইরা হৃদয় ঔদার্যে তাঁকে গ্রহণ করলেন। একাধিক মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারে তিনি ধর্মবোন। সমাজ পরিত্যাক্তা বীরাঙ্গনাকে মোশাররফ বিয়ের প্রস্তাব দিলে কানন বালা বণিক রাজি হন। তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর নতুন নাম নাজমা বেগম।

তাঁর মুসলমান মুক্তিযোদ্ধা ধর্মভাইরা মহাধুমধামে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন করেন।

এখানেই মুসলমান মোশাররফ শেখের জীবনের দুর্গ্রহ শুরু। সঙ্গতিপন্ন ঘরের সন্তান মুসলমান মোশাররফ শেখ তাঁর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় কর্তৃক বিতাড়িত হন। তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়ানো হয়। নতুন দম্পত্তির জীবন সংগ্রাম শুরু সমাজচ্যুত স্রোতের শেওলা হিসেবে। বহুবার কানন আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন।

কেউ যদি ভাবেন সরকারের মোটা অংকের সাহায্য পেলেই বীরাঙ্গনা বা পংগু মুক্তিরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তাহলে ভুল করবেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত নরনারীর সামাজিক পুনর্বাসন আবশ্যক। যোদ্ধাহত বীরমুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ স্বাধীনতাযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সস্ত্রীক আপন ঘরবাড়ি, মা-বাবা-ভাই-বোন কর্তৃক বিতাড়িত। বীরাঙ্গনা বিবাহের গঞ্জনা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সামাজিক মানসিকতা না বদলালে যুদ্ধক্ষেত্রের নরনারীর দেশে ঠাঁই হওয়া দুরূহ।

মুক্তিযোদ্ধার হাতে মুক্তিযোদ্ধার নিগ্রহ

মুক্তিযোদ্ধা নারী কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধার নিগ্রহের দুটি জীবন্ত দৃশ্য। পবিত্র কাবা ঘর জিয়ারতে যাই ১৯৯৬ তে। সাথে আছেন সস্ত্রীক খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল। তাঁর স্ত্রী ১৯৭১ সালে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ইসপাহানি পাবলিক স্কুলে বন্দিনী ছিলেন। রাজকীয় মেহমান হিসাবে বাংলাদেশীদের জন্য আরাফাতের ময়দানে সাতটি সুসজ্জিত এয়ার কন্ডিশন টেন্ট ছিল। ইন্দোনেশিয়ার হজ ডেলিগেশনের কিছু বাংলাদেশীদের জন্য বরাদ্দ একটি টেন্টে ঢুকে পড়েন। ঝামেলা এড়াতে বাংলাদেশের অফিসারগণ দুটি টেন্টে আশ্রয় নেন। এতে মেজর জেনারেল দম্পতির টেন্টে দিন যাপনের জন্য অন্য এক বাংলাদেশী কর্নেল আশ্রয় নেন সস্ত্রীক। সেখানে কাজ তো শুধু আল্লা-বিল্লাহ আর হজের আনুষ্ঠানিকতা। মেজর জেনারেলের স্ত্রী স্বামীকে বলছেন, "তুমিতো জেনারেল, অন্যলোক তোমার টেন্টে কেন?" আক্কেল মানকা লিয়ে ইশারা কাফি। কর্নেল দম্পতি তাৎক্ষণিক সে রুম ছাড়লেন। খোদার ঘরে গিয়ে যদি মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, ১৯৭১-এর বন্দিনীর এই মানসিকতা! অন্যত্র কি হতে পারে বুঝহ লোক যে জান সন্ধান।

অপর এক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা কর্নেলের স্ত্রীর আচরণ দেখুন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন চরম বিপদে বাংলাদেশে ভিখারিনীর মত ঘুরেছেন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শত্রুশেলে তাঁর সদ্য প্রসূত কন্যা সন্তান নিহত হয়। তাঁর বাসায় যুদ্ধকালের গেরিলা ব্যাটম্যান এলেন। কর্নেল হৃদয় ঔদার্যে সে-যুদ্ধকালের ব্যাটম্যানের চিকিৎসা করান নিজের ব্যাটম্যান সার্টিফিকেটে। সিএমএইচ কর্নেলকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি সত্য কথা সব খুলে বলেন। সিএমএইচের বিস্ময়, প্রায় সোয়া শতাব্দীর ব্যবধানে একজন যোদ্ধা গেরিলা অফিসার তাঁর ব্যাটম্যানকে ভুলেন নি। সব জেনে সিএমএইচ অত্যন্ত সহৃদয়তার দরাজ দিলে সে-রোগীর মারাত্মক অপারেশন করেন। পেটকাটা রোগীর জন্য ডাক্তারের নির্দেশ মাস খানেক তাঁকে সাবধানে থাকবে হবে। উন্নত খাবার খেতে হবে। কর্নেল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া এই রোগীকে নিজের বাসায় স্থান দিলেন। মাছ-মাংসে ঝোলের কিছু বেশিটাই এই মেহমান-রোগীকে খেতে

দিলেন। অকস্মাৎ কর্নেল পত্নী তা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর উচ্চকণ্ঠের প্রতিবাদের ভাষা মেহমান রোগী শুনে পরদিনই ঝুলন্ত বাসে চট্টগ্রাম থেকে সাতক্ষীরার তালা থানার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। পেটকাটা রোগীর বাদুর ঝোলা বাসের ধকলে কয়েক মাসের ব্যবধানে তাঁর মৃত্যু হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ব্যাটম্যানই যুদ্ধকালের ক্যাপ্টেন ও পরবর্তী কর্ণেলকে বাঁচান। পাক আর্মি তাঁকে রণাঙ্গনে ধরে সীমাহীন নির্যাতন চালায়। তবু তিনি যোদ্ধা ক্যাপ্টেনের নাম প্রকাশ করেন নি। মুক্তিযুদ্ধই তাঁর অসুস্থতার কারণ। সে-সব গল্প তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন। জমিদার নন্দিনী সে স্ত্রী যোদ্ধা অসুস্থের সাথে সামান্য খাবার নিয়ে যে আচরণ করলেন তা অভাবিত। যোদ্ধা-কর্নেলের সংসারে অভাব-অনটন ছিল না তা নয়। তবে যুদ্ধকালের অবদান পরিশোধের বাসনায় কর্নেল সামান্য চাষা সৈনিককে বাসায় স্থান দিলে তাঁর স্ত্রী বিক্ষুব্ধ হন।

এই বাহ্য! পরবর্তীতে কর্নেলের বাসায় আসেন দুই মুক্তিযোদ্ধা। একজন যুদ্ধকালে তাঁর ইপিআর (পরবর্তী বিডিআর) ব্যাটম্যান। যুদ্ধে আহত ক্যাপ্টেনকে মৃত জেনেও তিনি পাহারা দেন। পরবর্তীতে তিনি পাক আর্মির হাতে ধরা পড়েন। সীমাহীন নির্যাতনের ফাঁকে পানি পানের নামে সন্ধ্যা লগ্নে দীঘিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা পান। দীর্ঘদিন হাসপাতালে যশোরের কলোরোয়া সীমান্তের বেলে ডাঙ্গার যুদ্ধে ক্যাপ্টেন ও তাঁর ব্যাটম্যান আহত হন। যুদ্ধ সাফল্যের স্বীকৃতিতে সে ব্যাটম্যান বীর বিক্রম। সে বীর বিক্রম বিডিআরের অবসর প্রাপ্ত নায়েব সুবেদার কর্নেলের বাসায় অতিথি। তাঁর সাথে অপর গেরিলা সৈনিকও অতিথি হন। যুদ্ধকালের স্মরণে কর্নেল তাঁদের বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর নিরাপদ-আরামদায়ক ঘরেই গেরিলা কাপতানকে স্থান দিতেন। সে গেরিলা কাপতানই আজ কর্নেল। কর্নেলের সুবৃহৎ বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী একা। তাদের একমাত্র সন্তান আর্মি অফিসার কর্মস্থলে। সময়ে-অসময়ে যে যুদ্ধকালের সাথী সৈনিকরা কর্নেলের বাসায় জ্বালাতন করত না তা নয়। মেহমান আধিক্যে যে বাসায় কিছুটা অসুবিধা হত না তাও নয়। কিন্তু যুদ্ধকালের অবদানের তুলনায় সে সব নস্যি।

অফিস থেকে রাতে বাসায় এসে দেখেন মুক্তিযোদ্ধা মেহমানের বিছানাপত্র ড্রইং রুমের ফ্লোরে। নিজের ঘর ভেঙে তো আর পরের উপকার করা যায় না। অভিমানে কর্নেল স্ত্রীর সাথে কথা বন্ধ করলেন। ভিতরে হীম শীতল নীরবতা। ভাগ্য বিরম্বিতা কর্নেল পত্নী একমাত্র আর্মি অফিসার পুত্রের স্মরণ নিলেন। এবার পুত্রের অভিমান আমিও তোমাদের কেউনা। মা আমি সৈনিকদের অফিসার। তাঁরা এসব শুনলে আমার যোদ্ধা বাবার অহংকার ধুলায় লুটাবে।

অফিসার যতই সৈনিক অন্ত:প্রাণ হোন, তাঁদের স্ত্রীরা যদি সম্পদে-বিপদে সৈনিকদের আপন আলয়ে ভালবাসতে না পারেন, তার পরিণতি ওপরের তিনটি খণ্ডিত চিত্র। অন্তরের অন্ত:স্থলে নীরব সাধনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সৈনিক কর্তৃক অফিসার হত্যার অন্তর্নিহিত সত্য অফিসার পত্নীগণ কর্তৃক সৈনিকদের সাথে দুর্ব্যবহার, সৈনিক সুলভ কাজের বাইরে সৈনিক ব্যাটম্যানদের দ্বারা কাজ করানো। সে সব কাজের অতিরঞ্জিত ফলাও প্রচার। অফিসারদের অজান্তে দিগ-দিগন্তে তার প্রচার।

সুযোগটা নেন-সৈনিক থেকে অফিসার বনা কিছু কিছু দুর্বল চিত্ত ভবিষ্যতের পদোন্নতি অন্ধকার ধরনের অফিসার। উর্ধ্বতনের সাথে মনোমালিন্যের কারণে বেশ কিছু তরুণ অফিসার সৈনিক পেয়ার পাওয়ার বাসনায় আর্মির নিয়ম-কানুন, উর্ধ্বতনের অবিচার সম্পর্কে প্রচার চালালেন। বুমারেং হয়ে ব্যাপারটি পরবর্তীতে প্রতিরক্ষার সকল বাহিনীর অফিসারের ওপর খাঁড়ার ঘা'র মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে হাজির হবে তা ভাবেন নি।

এই অবান্তর প্রসঙ্গ আসতো না যদি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হতে না হতো। মোশাররফ শেখ ও কানন বালা বণিক ওরফে নাজমা বেগম দম্পতির সমাজ পরিত্যক্ত অবস্থা স্বাধীন বাংলার বীর যোদ্ধা নর-নারীর বাস্তব চিত্রের নগ্ন রূপের দর্পণ মাত্র। সাহস করে সামাজিক ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কাননবালার মত দু'চারজন আত্মপ্রকাশের ফলেই সমাজ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের চিত্রের কিছুটা জানতে পারছে। বীরাঙ্গনা-বীরযোদ্ধা, বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে মুক্তিযোদ্ধাদের যত শ্রুতিমধুর বিশেষণে ভূষিত করা হোক, বাস্তব চিত্রের বহুতর ক্ষেত্র ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কার ধন্য পিতৃপরিচয় শূন্য ১৯৭১-এর শিশুদের মাতৃক্রোড় শূন্য যিশুর পুত্ররা হৃদয় ঔদার্য নিয়েছেন। ১৯৭১-এর ধর্ষিতা মায়েদের যুবতীদের অনেকে আজ ভারত ও পাকিস্তানের পতিতালয় থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের আশীর্বাদ তাঁদের দুর্দশার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। মহিলাদের কথা তো দূরের কথা পাকিস্তানিদের হাতে সীমাহীন লাঞ্ছনার কথায় অনেক উর্ধ্বতন বাঙালি প্রতিরক্ষা অফিসার পর্যন্ত মুখ খুলছেন না। কে কার দুর্দশার লজ্জার অবমাননার কথা বলতে চান? এই যদি পুরুষদের ব্যাপার! মেয়েদের কথা অনুমেয়! যুদ্ধ বিধ্বস্তা অনেক বাঙালি বিশেষ করে হিন্দু রমণী লজ্জা অপমান-সামাজিক গঞ্জনা এড়াতে ভারতের অন্তর্লীন হয়ে হারিয়ে মিশে গেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য ও সত্যনিষ্ঠ লাঞ্ছিতা পর্যুদস্ত নর-নারীর ইতিহাস রচনায় স্বদেশ-বিদেশের মা-বোনের বেদনায় আর্তির সংগ্রহ আবশ্যক। কেউ না কেউ সে পথে এগুলে একটা সুপ্ত ও লুপ্ত বেদনাবিধুর অধ্যায়ের সন্ধান পেত এ জাতি।

উপলব্ধি

নিজের দেখা-কানে শোনা, ব্যক্তিগত পারিবারিক উপলব্ধি থেকে বলছি, মুক্তিযোদ্ধার চরম ও পরম শত্রু মুক্তিযোদ্ধা। আজো তিনজন মুক্তিযোদ্ধা দেখলাম না, যাঁরা সম্মানের সাথে একে অপরের নাম উচ্চারণ করেন। কেউ উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পেলে, উপাধি পেলে, ধনে-জনে বাড়লে অন্যরা আর কিছু না পারুন তাঁর ব্যাপারে ঈর্ষা বা কুৎসা প্রায়শই রটনা করে থাকেন। আজো যত খুন-রাহাজানি-জেল-জরিমানা-ফাঁসি সবই মুক্তিযোদ্ধার। রাজাকার-আল-বদর -আল শামসদের শত্রুও অপবাদ দিতে পারবেন না মুক্তিযোদ্ধা মার্কা অপবাদের। তাঁরা যেন অমর। আজো কোন বিশেষ রাজাকার-আল বদর-আল শামসের মৃত্যু সংবাদ পত্রিকায় পড়েছি বলে বিশেষ মনে পড়ছেনা। মুক্তিযোদ্ধার পত্নীরাই হয়ত বাস্তব উপলব্ধির অভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক অনাদর ও হেনস্থার কারণ হবেন! ডালে-মূলে শেষ হবার আগে যদি মুক্তিযোদ্ধা-পত্নীদের অন্যের বৈধব্য দেখে শেখার উপলব্ধি হয়!

রেফারেন্স: একান্ত সাক্ষাৎকার -যুদ্ধাহত মুক্তি মোশাররফ শেখ।

হাজি শেখ আব্দুল খালেক

[জহরের কান্দি হাই স্কুল ট্রেনিং সেন্টারের প্রধান প্রশিক্ষক]

পরিচিতি

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাজি শেখ আব্দুল খালেকের পিতা মরহুম মুনশি শেখ মমিন উদ্দিন, গ্রাম+ডাকঘর-বান্দাবাড়ি, উপজেলা-কোটালিপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ। ১৯৫৭ সনে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে যোগদান করেন। ১৯৭০-এ যশোর সেনানিবাসে ৬ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ান থেকে স্বেচ্ছায় রিজার্ভে যান। ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খুলনার খালিশপুর ক্রিসেন্ট জুটমিলে মেকানিক্যাল ফিটার পদে যোগদান করেন।

প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রস্তুতি

৭ মার্চ, ১৯৭১-এ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (পরবর্তী সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) শেখের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। ১৬ মার্চের দিকে দৌলতপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুনশি সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন-এর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। খুলনার শ্রমিক ময়দানে শ্রমিক-ছাত্র সংঘবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ দান শুরু করেন। ২৯ মার্চ নাগাদ পিপলস্ জুট মিলস্-এর সামনে ব্যারিকেড দেবার সময় পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে বাম পায়ে গুলি লেগে মারাত্মকভাবে আহত হন এই সংগ্রামী যোদ্ধা। তাঁর সহযোদ্ধা বরিশালের আব্দুল মান্নান শাহাদত বরণ করেন। সে-রাতেই ক্রিসেন্ট মিলের ভিতর দিয়ে নদীর উত্তর পাড় বরইতলা ঘাটে পার হন নিরাপত্তা ও চিকিৎসার সন্ধানে; সাথী ছিলেন ক্রিসেন্ট জুট মিল ওয়ার্কশপের সুপারভাইজার আব্দুর রব ও অন্যান্য জনা আটেক শ্রমিক-মুক্তিযোদ্ধা। অস্ত্র বলতে দুটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ও গেঞ্জিতে প্যাঁচানো দেড়শত রাউন্ড গুলি। অস্ত্র সংগ্রহ করা হয় ক্রিসেন্ট জুট মিলের পুলিশ ক্যাম্প থেকে। বহুতর ঘাত প্রতিঘাত উতরে পৌঁছেন বরদিয়া লঞ্চঘাট। 'টুলু' নামের লঞ্চের মালিক মিঃ হাসান। সে লঞ্চে পৌঁছেন গোপালগঞ্জ লঞ্চঘাট।

চিকিৎসা

গোপালগঞ্জের তখনকার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম রইস আহতকে ডাক্তারের কাছে নেন। দলের অন্যান্যদের আহারের ব্যবস্থা করেন। দুটি রাইফেলের একটি পঞ্চাশ রাউন্ড গুলিসহ দেন রইস সাহেবকে। অপর রাইফেল ও একশ রাউন্ড গুলি সম্বলে আল্লাহ্ স্মরণে নিজ এলাকা কোটালিপাড়া যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে যুদ্ধসাথীরা বিদায় নিয়েছেন, কারণ তাঁদের সকলের বাড়ি মাদারিপুর। গোপালগঞ্জ থেকেই তাঁদের আপন এলাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা, আহত খালেক তখন একা।

দিন পাঁচেক নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন থেকে কিছু সুস্থ হয়ে কোটালিপাড়া

ডাকবাংলো পৌছেন। সেখানে পান নির্বাচিত এম.পি. বাবু সতীশ চন্দ্র হালদার, থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুল আজিজ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে। পায়ে আঘাতজনিত দুর্বলতা যোদ্ধা বুঝতে পারলেন। সাথের একমাত্র রাইফেল ও একশ রাউন্ড গুলি বাংলোয় এম.পি.-এর হাতে সমর্পণ করেন। স্থানীয় ভাল ডাক্তার না পেয়ে পয়সার হাটের পাওয়া চিকিৎসক বাবু রঞ্জিতের চিকিৎসা নেন। সপ্তাহ তিনেকের চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হন। ফিরে আসেন কোটালিপাড়া ডাক বাংলোয়।

যোদ্ধা ও যুদ্ধ প্রশিক্ষণ

যোদ্ধার যোগ্যতায় গুণ বিচারে নেতৃবৃন্দ তাঁকে কোটালিপাড়া ডাক বাংলোর সামনে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ছেলেদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব দেন। গোপালগঞ্জ আনসার ক্যাম্প থেকে আনা রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দুটি গ্রুপ খুলনা ও যশোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বেগতিক পরিস্থিতির কারণে নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ট্রেনিং সেন্টার স্থানান্তর করা হয় কলাবাড়ি ইউনিয়নের হিজলবাড়ি হাই স্কুল মাঠে। সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু তরুণীকান্ত অধিকারী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজের যাবতীয় দায়দায়িত্বের আনজামে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। এখানে প্রথম পর্যায়ে পঞ্চাশজন স্কুল ও কলেজ ছাত্রকে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তিন সপ্তাহের ব্যবধানে প্রশিক্ষণ ধন্য ত্রিশ জনের একটি চৌকশ দলকে অস্ত্রের জন্য ভারতে পাঠান হয়। মাসাধিক কাল একই স্থানে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু রেখে বিপদ বুঝলেন ভালোভাবেই। মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ভ্রাম্যমাণ ও সঞ্চরণশীল। বাস্তবে গেরিলা মুক্তি ও গেরিলাযোদ্ধার কোন স্থায়ী ঠিকানা নাই। বিপদ উত্তরণে প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থানান্তর নারিকেল বাড়ি মিশন ইস্কুল। তখন ওখানে মিশন প্রধান ফাদার রোজারিও। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি খ্রিস্টানদের আন্তরিক টানের পরও উপস্থিত বিপদ এড়াতে মাত্র দুদিনের ব্যবধানে ফাদার রোজারিওর আপত্তির মুখে ট্রেনিং ক্যাম্প সরাতে হয়।

জুন মাসের প্রথম দিক থেকে হেমায়েত বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত রামশীল ইউনিয়নের জহর কান্দি হাই স্কুল প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগন অবধি তিনি এখানে যুদ্ধ প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন।

জহরের কান্দি প্রশিক্ষণ সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন এয়ারফোর্স এডুকেশন কোরের ওয়ারেন্ট অফিসার মো: জবেদ আলী শেখ। শেখ আব্দুল খালেক ছিলেন প্রধান ওস্তাদ ও হাবিলদার মেজর। তাঁর সাথে আরো আটজন প্রশিক্ষক কাজ করেছেন।

দূর-দূরান্তের ছাত্র-যুবক প্রশিক্ষণ নিতে এখানে আসতেন। জুলাই মাসের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোল জন ছাত্র প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে যাচ্ছিলেন। খালেক নিজের উদ্যোগে তাঁদের তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেন। তাঁদের যুদ্ধের উপযোগী করে অস্ত্র দেয়া হয়। গেরিলা যুদ্ধের জন্য তাঁদের পাঠানো হয় ঢাকায়। সপ্তাহ তিনেকের ব্যবধানে জনা ত্রিশেকের গ্রুপকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ত্রের জন্য ভারতে পাঠান হতো। যুদ্ধ প্রশিক্ষণের যোদ্ধারা ভিতরের ও বাইরের অস্ত্র সজ্জিত হয়ে হেমায়েত

বাহিনীতে ফিরে আসত। এ-সব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সশস্ত্র যোদ্ধার সদর্প দর্পে যুদ্ধখ্যাত হেমায়েত বাহিনী।

প্রশিক্ষণ শিবিরে কোন কিছুরই অভাব ছিলো না। আকস্মাৎ ব্রিটিশ সাংবাদিক লরেন্স মুক্তি প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শনে আসেন। সাংবাদিক খালেকের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার নেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের কর্মকাণ্ডে তাঁর অবাক বিস্ময়ের প্রশ্ন, "মাত্র সাত/আট জন প্রশিক্ষক দিয়ে কেমন করে এত বড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়? এত লোকের খাবার কোথা থেকে আসে?" এমনিতর বহু প্রশ্ন সংবাদিক খালেককে করেছিলেন। বীর যোদ্ধার এক কথার জবাব, "আমাদের কোন কিছুরই অভাব নাই, কারণ স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্র, কৃষক-শ্রমিক, তাঁতি-জেলে, ডাক্তার-শিক্ষকসহ্ সর্বস্তরের মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ"। মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ় মনোবল ও সাহস দেখে ব্রিটিশ সাংবাদিক মনতব্য, "হ্যাঁ তোমরা পারবে, তোমাদের দেশ স্বাধীন হবে।" ইনশাআল্লাহ্ হয়েছেও তাই।

সর্বমোট সাড়ে তিন হাজার মুক্তিযোদ্ধা মুক্তি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেয়। দেশের স্বাধীনতা, মা-বোনের ইজ্জত রক্ষায় হেমায়েত বাহিনীর অনেকে শহিদ হয়েছেন। হেমায়েত বাহিনীর শহিদ যোদ্ধাহত গাজিদের সশ্রদ্ধার আনন্দাশ্রুতে অভিসিক্ত খালেক।

এ দেশের জাগ্রত জনতা, হেমায়েত বাহিনী, ২, ৮ ও ৯ নং সেক্টরের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষক, যোদ্ধাহত বীর গাজি শেখ আব্দুল খালেকের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যোদ্ধাহত যে ক্ষিপ্র নেত্রের তেজে তিনি লড়েছেন, তা অন্যদের জন্য অনুকরণীয়। অনাগত ভবিষ্যতের জাতীয় দুর্দিনে আব্দুল খালেকদের দৃষ্টান্তে জাতি উদ্দীপ্ত হবে। জয় সালাম শেখ আব্দুল খালেক।

[রেফারেন্স-লিখিত বিবরণ হাজি শেখ আব্দুল খালেক]।

ব্যতিক্রমি মুক্তিযোদ্ধা হান্নান

পরিচয় : মা হাজিরুন্নেসা এবং বাবার নাম সামসুদ্দিন ফকির। গ্রাম : পাইকদিয়া, ডাকঘর : আইকদিয়া, ইউনিয়ন : মোচনা, থানা : মুকসেদপুর, জেলা : গোপালগঞ্জ। মেধাবী ছাত্র, ধনীর দুলাল। ছাত্র জীবনে হাতের আট আঙুলে সোনার আংটি এবং গলায় থাকতো সোনার চেইন। সব সময় ব্যবহারের জন্য ন্যূনপক্ষে থাকতো আট জোড়া জুতা ও স্যান্ডেল। প্রাচুর্যের নমুনা হিসেবে এটা ক্ষুদ্র উদাহরণ মাত্র।

রাজনৈতিক প্রেরণা : অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে সাক্ষাতে যান শেখ মুজিবের বাড়িতে। সেটা ১৯৬০ সালের কথা। সে যুগে বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, কিংবা ছোট ছোট পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রেরণা সঞ্চারে অথবা নিজেদের আদর্শ প্রচারে থানা ও ইউনিয়নে পত্রিকা পাঠাতো। শেখ মুজিব একজন মেধাবী ছাত্রের প্রতি

স্নেহ প্রদর্শনে শেখ হান্নানের নামে সে-সময়ে বিভিন্ন রকম পত্রিকা প্রেরণের অনুরোধ রাখেন তাঁর পরিচিত বিভিন্ন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সিকে এবং নিজের কর্মিদের নির্দেশ দেন যেন বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়। সে-কালে ডাকে পত্রিকা প্রাপ্তি ছিল সম্মানের প্রতীক।

শেখ মুজিবের স্নেহের ছায়া : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এক নির্বাচনী প্রচারণায় শেখ এলেন দিগনল বাজার (মুকসেদপুর) নদী তীরে। বাছারি নৌকায় কয়েক শ' লোক নিয়ে জনসভায় যোগ দেন হান্নান। তাঁর পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যাই দাঁড়ায় সাত/আট হাজার। লাঠিয়াল পোষা পরিবার। ভোটযুদ্ধে এই নামকরা ফকির বংশের দাপটই আলাদা। সেই জনসভায় এক তেজোদীপ্ত ভাষণ দেন শেখ হান্নান। বঙ্গবন্ধুকে ভবিষ্যতের জাতির জনক এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষক হবেন বলে হান্নানই ঘোষণা করেন সে-জনসভায়। নিপীড়ন-নির্যাতন ত্রাণে যুগে যুগে অসুর নাশে দেবতার অবতার রূপে আবির্ভূত নেতার মতোই শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। সতেরো বছরের তরুণের কণ্ঠস্বরে বিমুগ্ধ শেখ। তিনি এমন তরুণের মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন। সব সময়ে অসৎ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর উদ্দীপনা দেন শেখ মুজিব। শেখ-স্নেহধন্য শেখ হান্নান জানান : "শেখ ছাড়া অন্য কাউকে আমি নেতা হিসেবে স্বীকার করি না।" শেখ মুজিবের স্নেহধন্য এই তরুণ শেখ-নিধনের পর থেকে আজো জুতা পরিধান করেন না।

স্বাধীনতা যুদ্ধ সমাগত দ্বারে

মুক্তিযুদ্ধকালে ভাঙ্গা কলেজের ছাত্র সুধীর তাঁর পরিবারের উনিশ জনসহ হান্নানদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সুধীর কোম্পানি সোনার ব্যবসায়ী। স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ততোদিনে পূর্বপাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ধন-প্রাণ লুটা শুরু হয়েছে। প্রাণে বাঁচতেই সুধীর-পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে।

ছাত্র জীবনে আনসার প্রশিক্ষণ ছিল হান্নানের। এটাই মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে সামরিক প্রশিক্ষণে তাঁর প্রাথমিক পুঁজি। নিজেদের পারিবারিক দেশী বন্দুকই তখন পর্যন্ত একমাত্র যুদ্ধাস্ত্র। মুক্তিযুদ্ধকালে জ্যৈষ্ঠমাসে সুধীর ও হান্নান উপস্থিত হন হেমায়েত দরবারে। তাঁরা যুদ্ধে যাবার আর্জি পেশ করেন হেমায়েতের কাছে। হেমায়েত বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জহরের কান্দি হাই স্কুলের প্রথম সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রুপের অন্যতম সদস্য হান্নান ও সুধীর। ইতোমধ্যে সুধীরকে কলেমা শিখিয়ে বিপদ উত্‌রানোর পথ বাতলান হান্নান। অকস্মাৎ পাক-আর্মির হাতে ধরা পড়লে গড়গড়িয়ে কলেমা পড়ে বেঁচে যাবেন, নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য এটা একমাত্র দাওয়াই।

উন্নত প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহে ভারতে মুক্তিযোদ্ধা পাঠাতে উদ্যোগ নেন হান্নান। নিজের গাঁটের পয়সায় গ্রুপকে গ্রুপ ভারতে পাঠান হান্নান। এ পর্যায়ে ১৫৫ জনের এক গ্রুপ নিয়ে নিজেও ভারতে যান। অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের জন্য মুক্তিদের ভারতে পৌঁছিয়ে দিয়ে হান্নান ফিরে আসবেন হেমায়েত সমীপে।

হান্নান গ্রুপের স্থান হয় ভারতের নীলগঞ্জ ক্যাম্পে। মুকসেদপুরের তদানীন্তন

এম.পি. কাজি আবদুর রশিদ হান্নানের নেতৃত্বের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাম্প-ইন-চার্জ বানান। হান্নান তাঁর সহকর্মীদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালে সাংসদ মহোদয় শীঘ্রই তাদের প্রশিক্ষণে পাঠনোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু হান্নানের তর সয় না। ভারতের বিহার প্রদেশের চাকুলিয়ায় তখন চলছে মুক্তি-প্রশিক্ষণ। সবাই চাকুলিয়া যাবার জন্য অস্থির। ইতোমধ্যে ফরিদপুর এলাকার আলি মিয়ার গ্রুপ গেরিলা প্রশিক্ষণ শেষে নীলগঞ্জ প্রশিক্ষণ সেন্টারে বিশ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের অপেক্ষারত। একই এলাকার বিধায় হান্নান গ্রুপ ভিড়লো আলি মিয়ার দলে। এই গ্রুপের জনা ষাটেক সদস্য সবাই এলএমজি, রাইফেল, গ্রেনেড, স্টেনগানসহ প্রচুর অ্যামুনিশনে সজ্জিত। অবস্থা বেগতিক দেখে এমপি মহোদয় হান্নান গ্রুপকেও দেশে প্রবেশের অনুমতি দেন। আলি মিয়ার দলের সঙ্গে মিশে হান্নান-গ্রুপও হেমায়েতের দলে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে দেশে প্রবেশ করে। তারা চৌগাছা সীমান্তের তাহেরপুর নদী তীরে মান্দারতলা হাকিমপুরে পৌঁছেন।

চলমান এই দলকে এক মহিলা সংকেত প্রদান করে জানায় স্থানীয় দফাদারই রাজাকার। তার বাড়িতে পাক আর্মি ও রাজাকার ক্যাম্প। রাজাকার সর্দার দফাদার চাঁদপুর থেকে আর্মি এনে মুক্তি ধ্বংসের ফন্দি আঁটছে। স্থানীয় থানা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি সাদেক ডাক্তার এবং স্থানীয় মুক্তি কমান্ডার আওলাদ ও আবেদিন মুক্তিদের প্রতি আবেদন জানান ঃ "আপনারা যাবেননা। আপনাদের ও আমাদের সম্মিলিত অস্ত্র ও জনবলে আগামীকাল এই রাজাকার গ্রুপের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। প্রতিদিন রাতে আর্মি আসে। আগামীকাল রাতে তাদের ঘেরাও করে ধ্বংস করে দেব। সঙ্গে জ্বালাবো রাজাকার বাড়ি।" মুক্তি গ্রুপের তেজোদীপ্ত যোদ্ধা বাদশা, আকবর ফকির, শাহিন, হান্নান ফকির, আমিন এবং বাদশার মতো সাহসীরা নেতাকে সাহস যোগান। তাঁদের শপথ, "রাজাকার খতম না করে যাবো না। আপনি সঙ্গে থেকে হুকুম দেবেন। প্রয়োজনে কালিয়া থানার 'বরদা' হেমায়েত ভাইয়ের কাছে যান।" হেমায়েত তখন সে-এলাকায়। হেমায়েত তাদের সকলকে সাহায্যের আশ্বাস দেন।

নৈশ আক্রমণের সকল আয়োজন সম্পন্ন করে মুক্তিযোদ্ধা-গ্রুপ। আক্রমণ স্থল : মান্দারতলা হাকিমপুর জাংগাল তাহেরপুর নদী তীরে শত্রু অবস্থান দফাদার বাড়ি ক্যাম্প। শত্রু সংখ্যা নিয়মিত আর্মি ও রাজাকার মিলে শতাধিক। মুক্তিপক্ষে রয়েছেন ট্রেইন্ড-আনট্রেইন্ড দুশতের অধিক। শত্রু হাতে অস্ত্র রাইফেল, এলএমজি, মেশিনগান। অপরদিকে, মুক্তি অস্ত্র থ্রি-নট-থ্রি ব্রিটিশ রাইফেল, স্টেনগান ও একটিমাত্র এলএমজি।

মুক্তিরা শত্রু অবস্থান ঘিরে বাংকার খুঁড়ে। শত্রুও সুদৃঢ় অবস্থানে স্বচ্ছন্দ অবস্থানের ফক্স হোল (শিয়ালের গর্ত) ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে। অক্টোবর মাসের দিকে সে-যুদ্ধ। রাতের শেষ দিকে দুদলের মধ্যে শুরু হয় তুমুল লড়াই। ভোরের আলো ফুটতেই শত্রু-অবস্থান সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। সুশৃংখল পাক-আর্মি অতি শৃংখলার সঙ্গে উইথড্রয়াল (প্রস্থান) করে। এই অসম শক্তির যুদ্ধে মুক্তিপক্ষে উনিশজন শহিদ হয় এবং

পাকপক্ষে ক্যাজুয়ালটি মাত্র দু'জন। মুক্তি শহিদের দু'জন স্থানীয় যোদ্ধা জয়নাল ও আবেদিনের বাড়ি যশোর।

এ-যুদ্ধে হান্নান-গ্রুপের ১৫৫ জনের মধ্যে ১৭ জন শাহাদত বরণ করে এবং ৯-জন আহত হয়। শহিদানের প্রধান প্রধান কয়েকজন হলেন ঃ বাদশা, আকবর ফকির ও হান্নান ফকির। মান্দারতলায় এঁদের কবর দেয়া হয়। শহিদদের সম্মানে কমান্ডার হান্নান অকুস্থলে সাতদিন অবস্থান করেন। এ-সময়টায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ডাক্তার সাদেক জনাব শেখ হান্নানকে একশত পঞ্চান্ন টাকা দেন। তখনো হান্নানের সঙ্গে গেঞ্জিতে প্যাঁচানো ছিল মা-বাবার দেয়া ছাব্বিশ শত টাকা। স্থানীয় মুক্তি কমান্ডার আওলাদ (ওলাদ) ও ডা. সাদেক এসব স্বজন হারানো ব্যথিত যোদ্ধাদের হেমায়েত-গ্রুপের নিকট সান্নিধ্যে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এবার চাকুলিয়া ট্রেইন্ড আলি মিয়া গ্রুপ ও হান্নান গ্রুপ আবার হেমায়েত কমান্ডে যোগ দেন।

বেদনাবিধুর অধ্যায়

বর্ডার-শূন্য ফরিদপুর-বরিশাল এলাকায় পাক-আর্মির অত্যাচার শুরু হয় বেশ বিলম্বে। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিককালটায় পাক-আর্মি বিদ্রোহী বাঙালদের শিয়াল-তাড়া করে বর্ডার পার করে দিত। পরে তারা ঢোকে ফরিদপুর-বরিশালে। এ-সময়টায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া অষ্টাশিজন তরুণ প্রশিক্ষণের জন্য ভারত যাত্রা করে।

সাতক্ষীরা সীমান্ত-সংলগ্ন ভারতের হাকিমপুরে অত্র যোদ্ধা-লেখক-ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে যায়। তাঁদেরকে ফল-ইন (লাইনে দাঁড়ানো) করানো হলে গুনে পাওয়া যায় মাত্র আশি জন। গ্রুপ নেতা বাকিদের খবর বলতে পারেনি। এরা নাকি মুক্তিযোদ্ধা (!) এ-ছাড়াও আরও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে তাঁদেরকে হাকিমপুর ক্যাম্প থেকে বিতাড়ণ করা হলো। অবশেষে তারা পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ফরিদপুরে ফেরত আসে। ফরিদপুরে ফেরতকালে যশোরের কালিগঞ্জ থানা ও সেনানিবাসের মধ্যবর্তী বারোবাজার-মোবারকগঞ্জ চিনিকল এলাকা দিয়ে মূল সড়ক অতিক্রম করতে যাচ্ছেন। তখন আখ গাছ বেশ বড় হয়েছে। আখ খেতের আড়াল দিয়ে এই আশি জনের উচ্ছৃঙ্খল দল এগুচ্ছে। এক মহিলা পানি দিতে এসে তরুণদের পাক-আর্মির অ্যাম্বুশের খবর দিয়ে যান।

এলাকার ষাঁড়-বলদের পিঠে করে ধোপারা কাপড় বইয়ে নেন। সেনানিবাসের এক নারী লোভীকে মুক্তিরা আচ্ছা লাড়কী উপহার দেবার প্রলোভন দেখিয়ে পাকড়াও করে। নারী লোভী সৈনিক সেনানিবাসের বাইরে মান্দারতলা-বারোবাজার এলাকায় আসতেই ধোপার কাপড়ের বস্তায় তিনি লোপাট। এ-মান্দারতলা-বারোবাজার এলাকার পাক-আর্মিকে ১৩ এপ্রিল, ১৯৭১ আশিজন নিয়মিত সৈনিকের গচ্চা দিতে হয়। ঝনঝনিয়া মাঠের পাশের খেজুর বনে ক্যাপ্টেন সফিকের পাতা নিশ্চুপ এমজি'র মুখে পাক-আর্মির শিক্ষা। এপ্রিলের সে-যুদ্ধের পরাজয় মেনে মুক্তিদের পালাতে হয়। পাক-আর্মি তাঁদের সাথী হারানোর বেদনা ভুলতে পারেনি। এবার তাদের গোনা সৈনিক বর্ডার এলাকার

বাইরে নিখোঁজ। এ-পথে শরণার্থীর ছদ্মবেশে মুক্তির আনাগোনা আঁচ করে অ্যাম্বুশ পাতে।

সামরিক শিক্ষাবিহীন ৮০ জন তরুণ কারও কোনো সাবধানতা মানেনি। তারা তখন পুরোপুরি পাক-আর্মির অ্যাম্বুশে। চরম জিঘাংসার প্রতিহিংসায় সবাইকে বিহারি কশাই দিয়ে গরু জবাইর মতো করে জবাই করা হয়। আজও পেছনে ফিরলে সে-সব তরুণদের হারানোর বেদনা বা তাদের করুণ পরিণতির জন্য নিজেকেই সর্বাংশে দায়ী মনে করা হয়।

দেশপ্রেম, রাজনৈতিক প্রেরণা, তারুণ্যের দীপ্তি ও প্রশিক্ষণ-কৌশল (ট্যাকটিকস) ভিন্ন জিনিস। অস্ত্রবিদ্যা ভয়ংকরী। হান্নান গ্রুপেরও চরম অগ্নিমূল্যের জিল্লতির শিক্ষা হলো।

হেমায়েত নেতৃত্বে যুদ্ধ

পরবর্তীতে হান্নান কালিয়া, টেকেরহাট, ভাটিয়াপাড়া, নড়াইল, দিগনগর, মুকসেদপুর, জলিরপাড়, বামনডাঙ্গা, উপরি'র মতো বহুতর যুদ্ধে হান্নান গ্রুপ সফলভাবে অংশগ্রহণ করেন। বামনডাঙ্গা যুদ্ধে সাহস ও শৌর্যের স্বাক্ষর রাখেন মুক্তি কোহিনুর ও হান্নান। সুবৃহৎ ছায়াময় বটগাছের নিচে লুকিয়ে তাঁরা পাক-পাঞ্জাবের বিরাট বপু আলিশান লম্বার আতাখানের খুলি ব্রাশ ফায়ারে উড়িয়ে দেন।

শেখ পেয়ারে রাজাকার

বামনডাঙ্গার হান্নান মুনশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিশেষ পেয়ারে। শেখ মুজিব পাক-আমলে হান্নান মুনশিকে পান রফতানির লাইসেন্স করিয়ে দেন। তার বাইরেও বহু ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক সুবিধাদি দিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করান। ১৯৭০ এর নির্বাচনে হান্নান মুনশি আওয়ামী টিকেট চেয়ে পাননি। নমিনেশন পান মুকসেদপুর থানার মনিরকান্দির আবদুর রশিদ। শেখ মুজিব প্রকাশ্য মিটিংয়ে নমিনেশন না-পাওয়া হান্নান মুনশিকে নিজের ডানহাত বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু হান্নান মুনশি মই মার্কা নিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করেন। কিন্তু মুকসেদপুরে একটি ভোটও পাননি। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে হান্নান মুনশি রাজাকারে যোগ দেন। একাত্তর সালে মুক্তিদেরকে ফরিদপুরের বাচ্চু রাজাকার (ওরফে মওলানা আবুল কালাম আজাদ) সহ এমন ধরনের বহু শক্তিমান রাজাকারদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। নিজ প্রতিভাগুণে মওলানা আবুল কালাম আজাদ পরবর্তীতে বিশ্ববরেণ্য আলেম হিসাবে টেলিভিশনে ইসলামি উন্মাদনার শিক্ষায় ধন্য।

যুদ্ধ সাথীর স্মরণে হান্নান

তাঁর যুদ্ধাহত সঙ্গীদের মধ্যে যাঁদের নাম স্মৃতিতে জ্বলজ্বলে, তাঁরা হলেন : আবু বকর মির্জা (ভাতাপ্রাপ্ত), ভাঙ্গা কলেজের ছাত্র ইব্রাহিম, সরোয়ার, মকবুল, জিন্নাল, শামসু, এমদাদ মুনশি, পুলিশের সালাম মুনশি (ভাতাপ্রাপ্ত), সিরাজ মুনশি, আমিন, ইয়ার আলী, সুলতান ফকির, সেকান্দার ফকির, তহুরুন্নেসা, ফজলুল হক মৃধা (ভাতাপ্রাপ্ত), মোতালেব সর্দার, ইয়ার আলি, বাদশা ফকির, ইকরাম মোল্লা, ইশারত

মোল্লা, আকবর ফকির, হান্নান ফকির। যশোরের হাকিমপুরের জাংগাল তাহেরপুর (মান্দারতলা) নদীতীরে সতেরোজন শহিদের কবর জিয়ারতে আজও যান হান্নান। মুক্তিযুদ্ধের শহিদ ও আহতরা সবাই সরকারি ভাতা না-পাওয়ায় হান্নানের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত। তারুণ্যদীপ্ত মহিলা তহুরুন্নেসা অসীম শৌর্যে লড়েছেন পাক-আর্মির বিরুদ্ধে। আজ এই বার্ধক্যেও তিনি বাঘিনীর মতো গর্জে ওঠেন ১৯৭১এর স্মরণে। শহিদ স্মরণে তিনি রুদ্ধবাক।

ব্যক্তি হান্নান

স্কুল-জীবনে মা-বাবার অমতে বৈভবের মোহে বিয়ে করেন ধনাঢ্য পরিবারে। শ্বশুরকুল বিলাত পাঠানোর মতো লোভ দেখান তাঁকে। কিন্তু সে-লোভ মোহই থেকে গেছে। পিতার আদলে পুত্রও বাপের অমতে শাদি করেন ধন-জন-যশের বংশে। তাই পিতা-পুত্রে অভিমান। বি.কম. পাস মানুষটি চাকরি খোঁজেননি জীবনে। সজ্জন এই মানুষটি জীবনব্যাপী পরোপকারী। তাঁর আদর্শের মানুষ শেখ মুজিব।

স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিরক্ষায়

স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে নিজের গাটের পয়সা খরচ করে হেমায়েত-অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্যোগ নেন হান্নান। রণাঙ্গন ঘুরে ঘুরে প্রায় হাজারের মতো যোদ্ধার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। ২২ নভেম্বর, ২০০৩ তারিখে সে-সব তথ্যাদিসহ পৌঁছেন ঢাকার ফার্মগেটে। তিনি তখন কিনছিলেন শীতের শাল। নিজের সুদৃশ্য ব্যাগটি রেখে শালের দাম দেবার সময়ে চোর ব্যাগটি নিয়ে যায়। সঙ্গে হারিয়ে যায় দীর্ঘদিনে সংগ্রহ করা মুক্তি-রাজাকারের তালিকাটি। দুর্ভাগ্য এ-জাতির, আবারও হারিয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবান ইতিহাসের দলিল।

রেফারেন্স ঃ একান্ত সাক্ষাৎকার হান্নান ফকির (২২ নভেম্বর, ২০০৩)।

মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ মিয়া

বিচিত্র ধরনের লোক নিয়ে গঠিত হয় মুক্তি ফৌজ। এমনি এক যোদ্ধা কাদেরিয়া বাহিনীর সুরুজ মিয়া। তিনি ময়মনসিংহের অধিবাসী। যুদ্ধকালের গান 'সোনার চেয়ে খাঁটি সোনা বাংলাদেশের মাটিরে।' তার চেয়েও খাঁটি সোনার প্রতিচ্ছবি মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ মিয়া। জয়বাংলার স্লোগানে মুখরিত বিজয়ী কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে স্বাধীনতার শেষ লগ্নে তাঁর মার্চ হয় ঢাকা। পাক বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পরেও মিরপুরের বিহারিরা মিরপুরকে পকেট পাকিস্তান করে রাখে। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মিরপুরকে বাংলাদেশ বানানোর তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়; বাঙালি ও বিহারির মরণপণ লড়াই। দু'পক্ষকেই প্রচুর জীবনের খেসারত দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত মিরপুর স্বাধীন হয় ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১। সুরুজমিয়া মিরপুর দখলের বীরযোদ্ধা। অভাবী দেশ প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা মিরপুরের এক

বিহারি বাসায় আসর বসান। স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা অস্বীকারে যুদ্ধ করা বিহারিদের নির্বোধ অহমিকায় হাসতেন সুরুজ। গড্ডলিকা প্রবাহের আসল মেষ বিহারি। তাদের মূল দেশ ভারত। ভারতের অত্যাচারিত মুসলিম মোহাজের বিহারি। পূর্ব পাকিস্তানে তারা স্থান পান বাঙালির হৃদয় ঔদার্যে। যেমন করে ভারত বিতাড়িত লিয়াকত আলী বাংলাদেশের জাতীয় সদস্যের শেয়ারে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য হন। পরে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের বারটা বাজানোর অনেক ফর্মুলা বাতলে ছিলেন। তাঁর লিয়াকত-নেহেরু চুক্তির ফসল পূর্ব পাকিস্তানের বিহারি কলোনি মিরপুর।

আজব ধরনের সুরুজ বিভাজনের মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা মানেই হিট আর হিট মানেই গরম। গরম বা হিট যাদের ছিল তারাই মুক্তিযুদ্ধের ১৯৭১ সালের সশস্ত্র যুদ্ধের সম্মুখ সমরে ছিল। রক্তমাংসে গড়া মানব দেহের মত যুদ্ধেও প্রাণ সঞ্চারী অনুপ্রেরণা থাকতে হয়। সুরুজ মিয়া স্বাধীন দেশের প্রেরণায় যুদ্ধ করে বিজয়ী গাজি।

মুক্তিযোদ্ধার খাস বয়ানে তিনি বলেন মুক্তিযোদ্ধারা হিট পার্সন। বাংলার হিট পার্সন খাঁটি বীরযোদ্ধা সবচেয়ে বেশি দুঃখী। সোনার বাংলার এই সোনার সন্তানদের কেউ খোঁজ খবর নেন না। ১৯৭১-এর কমান্ডার যাঁরা ছিলেন তাঁরাও সেই সব সাহসী বীরযোদ্ধাদের তেমন খোঁজ খবর নেন না। যুদ্ধের সময় এঁদের আত্মবিসর্জনের যুদ্ধেই কমান্ডারেরা সুনাম অর্জন করেন, খেতাব পান। দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদে কাদেরিয়া বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, হালিম বাহিনী, আকবর বাহিনী ধরনের বহুতর বাহিনী হয়েছে। আজ তাদের মত বাহিনীর যোদ্ধাদের খোঁজখবর না নেয়ার ফলেই বীর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার যোদ্ধারা লাইনচ্যুত। সেই সব সাহসী বীরেরা অর্থের অভাবে, ভাতের অভাবে ছুটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দুঃখ ভারাক্রান্ত আবেগে সুরুজ তাঁর যুদ্ধকালীন কমান্ডার কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। বীর উত্তম কাদের সিদ্দিকীর অধীনে যুদ্ধ করার গৌরবে তিনি ধন্য। কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে কাদের সিদ্দিকী তাঁর খোঁজ না নেয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেন কাদের সিদ্দিকী। পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তাঁর আশ্রয় হয় ভারতে। সুরুজ মিয়ার মত হিট যোদ্ধারাই কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কমিটিকে চাঙ্গা করে তোলে। কাদের ভারত থেকে ফিরলেন। এম.পি. হলেন। মন্ত্রী হবার খোয়াব দেখেন তিনি। তাই আমি হিট সুরুজ বলি ১৯৭১-এর বাঘা কাদের মরে গেছে।

এবার হিট হেমায়েত-সান্নিধ্যে ফিট হবার স্বপ্ন দেখেন সুরুজ মিয়া তাঁর জীর্ণ কুটিরে শীর্ষ চেম্বারের স্থান রয়েছে মুক্তিযোদ্ধার জন্য। আপদে বিপদে অনেক মুক্তিযোদ্ধাই হেমায়েত বাহিনী প্রধানের স্নেহমমতা পেয়ে থাকেন। সুরুজ মিয়াও হেমায়েত সান্নিধ্যকে একটা মহা মহিরুহের স্নেহ ছায়ায় আশ্রয়ের মত মনে করেন। সকল মুক্তিযোদ্ধাই পরম আশ্রয়ের ছত্রচ্ছায়ার নিশ্চয়তা চান। কিন্তু দিশেহারা মুক্তিরা

আজ আশ্রয়চ্যুত, নেতা শূন্য, নির্দেশনা শূন্য-ক্ষোভে দুঃখে রাগে তাঁর দুটি চোখের রক্তধারা যেন উষ্ণ পানির আবেগ অশ্রুতে গড়িয়ে পড়ে। অভিমানি যোদ্ধাকে সান্ত্বনা দেন হেমায়েত। এমনি ভাগ্য বঞ্চিত হিট মুক্তিদের জন্য হেমায়েত দরজা সর্বকালের জন্য সর্বক্ষণের জন্য উম্মুক্ত।

মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কার!

কালো হাতের কালো তালিকা ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ও তার পরবর্তীতে লুটেরা-দালাল-ফায়দাবাজ অনেকেই বিচার চেয়েছেন। ওপরে ওপরে সবাই চেয়েছেন ভাল থাকতে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে তার বিচার চেয়েছেন। কে লুটেরা দালাল তার হিসাব আর মুক্তিযোদ্ধারা রাখে না। তারা বাস্তবে লুটেরা-দালাল ডাকাত গুণ্ডা বদমাস চিনেও না। এসব অপরাধীদের তালিকাটা কেউ দিলেই হলো। মুক্তিরা অস্ত্রবলে তার বিচার করবেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক সংগঠক আওয়ামী লীগের বা তাদের সতীর্থ কেউ দৃশ্য বা অদৃশ্য হাতে তা করার কথা। বাস্তবে হয়েছেও তাই।

যত দোষ নন্দঘোষের মত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বাপর যত অঘটন ঘটেছে তার জন্য যেন দায়ী মুক্তিযোদ্ধারা। পাপ করবে একজন, তার প্রায়শ্চিত্ত যেন মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা লগ্নে অনেক প্রতাপশালী বড় মিয়াই হিন্দু বাড়ি লুটেছেন। সমাজে ভাল লোক যে একদম ছিলেন না তা নয়। কম সংখ্যার ভাল লোকও বাংলায় আছেন। তবে কমজোর কম সংখ্যার ভাল লোকেরা সবল সংখ্যাধিক্যের লুটেরাদের বাধা দিতে পারেন নি। এসব বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি লুটেরা ঘাতক-দালালের কালো তালিকা তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের মাধ্যমে তৈরি কোটালিপাড়া অঞ্চলের সে তালিকা আছে হেমায়েত বাহিনী প্রধানের কাছে। বিচারের জন্য লুটেরা দালালের মুণ্ডপাতে তৈরি সে তালিকা। কালো তালিকা প্রণেতারা তাদের তালিকার অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কামনা করছেন। এই কালো তালিকার শেষে স্বাক্ষর করেন কোটালিপাড়া থানার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি ও প্রধান থানা প্রশাসক শেখ আবদুল আজিজ। এই স্বাক্ষরের কাউন্টার স্বাক্ষর করেন থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু চিত্তরঞ্জন গাইন। কালো তালিকাভুক্ত দু'জন মাত্র হিন্দু। একজন বিষ্ণুপদ হলদার, অপর জন নগেন তালুকদার। বাকি দুশ আটানব্বই জনই মুসলমান। এলাকার বাইরে দীর্ঘদিন আছেন বাহিনী প্রধান। তিনি অনেককেই চিনেন না। ফলে তাঁকে দিয়ে ইচ্ছামাফিক ভবিষ্যতের সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করানো যাবে। কিন্তু বিনা নিরীক্ষণে কোন অ্যাকশন নিলেন না হেমায়েত; তিনি তালিকাটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এটি দেন তাঁর বড় ভাই শামসুল হককে। আপন এলাকার মানুষের আদ্যোপান্ত পরিচিত শামসুল হক

ব্যাপার দেখে ভিমরতির দশায় মাথা ঘুরে পড়ার মত। শামসুল হক বলেন: এ তালিকার দুচারজন ছাড়া সবাই ভাল মানুষ। এ দেশে লুট করেননি এমন মিঞা ক'জন আছে ? তাই বলে এ ধরনের ছুতানাতার বাহানায় তালিকার লোকদের গুলি করে মারলে কোটালিপাড়া শেষ। এমন সর্বনাশা কাজে হাত দিস না ভাই। তালিকা প্রণেতারা রাজনীতি করা মানুষ। তাঁদের ফাঁদে তোরা সৈনিক কেন পা দিবি ? দেশ স্বাধীন হলে দেশে কাজের লোক পাওয়া যাবে না। দেশবাসী ও সমাজের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের। শুধু কৈফিয়তে মাগফেরাত মিলবে না। দেশের মুসলমানরা বিনা অপরাধে মুসলমানের হাতে মুসলমান নিধন মেনে নেবেন না। ভাইদের পরামর্শে ঘুঘু মারা ফাঁদে পা দেয়া থেকে বিরত থাকলেন হেমায়েত। তিনি চুপচাপ তালিকাটি একপাশে রেখে দেন। আওয়ামী তালিকার গুলিতে কেউ মরছে না দেখে সেক্রেটারি আবদুল আজিজ নাখোশ। হেমায়েত হাঁ না কিছু কয় না। আওয়ামী লীগের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, আর আওয়ামী লীগের তৈরি ঘাতক তালিকা বাস্তবায়ন করছেন না মুক্তিবাহিনী। এবার আবদুল আজিজ হেমায়েতকে এড়িয়ে চলেন। কারণ হেমায়েত কালো পর্দার রাঙা চোখ দেখে তিনি যেন কিসের সর্বনাশা ইঙ্গিত পান। তা'হলে কি হেমায়েত আসল ব্যাপার বুঝে গেছে ? কোটালিপাড়া থানা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি আবদুল আজিজ সাহেবকে হেমায়েত খবর পাঠালে তিনি জানান যে সিক বেডে (রোগ শয্যায়) আছেন। হেমায়েত পরিদর্শনে যান মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশাসনিক হেড কোয়ার্টার নারিকেল বাড়িয়া। সেখানে আকস্মিক দেখা আজিজ সাহেবের সাথে। তিনি হেমায়েতকে দেখেই পড়েন কি মরেন দশা। সে কালো তালিকার কথা যাতে না আসে সে ব্যাপারে চালাকির অভিনয় করেন সেক্রেটারি। হেমায়েতকে দেখেই কেয়ামতের ভূমিকম্পের মত তার জ্বর ওঠে। একশ চার ডিগ্রি (১০৪°)।

কোটালিপাড়ার আচ্ছা কোটাল হেমায়েত-এর হাত এড়াতে আজিজ ফর্মুলা অসুস্থতার। কোটাল বেটা হেমায়েতও ব্যাপার বুঝে আর না ঘাটান পলিসি। পুরা লিবারেশন সময় গেল কালো তালিকা প্রণেতার নেপথ্য হোতা চিত্ত বাবুর আর খবর নাই। ঘরের শত্রু বিভীষণরূপী আবদুল আজিজ যান ভারতে. নজের চামড়া বাঁচাতে অন্যকে কামড়াতেই হয়। হেমায়েতের একটা হেস্তনেস্ত করতে না পারলে নিজেদের মুক্তাক্ষরের স্বাক্ষরে তৈরি কালো তালিকা না তাঁদের জীবনের ফাঁস হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁরা লাগেন হেমায়েতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়। কিন্তু ফলাফল বুমারেং। ফল হয় তার উলটো। ইতোমধ্যে হেমায়েত-এর বিরুদ্ধে তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছেন ক্যাপ্টেন বাবুল, ক্যাপটেন ওমর ও জেলা প্রশাসক ডা: এম এ মালেক। আজিজ সাহেবের বহুতর চেষ্টায় হেমায়েতের খেয়ানত ঘটানোর চেষ্টা বৃথাই গেল।

যুদ্ধকালে, যুদ্ধ পররবর্তী এমনকি আজো বাংলাদেশে পত্রিকার হেডলাইন মার্কা

চমকপ্রদ যেসব লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের খবর আসে তার উৎস সুদূরে। ১৯৭১-এর দুর্দিনের দুর্যোগে ছাফসুতরা রাজনীতিক ভাল মানুষেরা ভারতে বসে কার বুদ্ধিতে কি করেছিলেন তার খোঁজ নিলে থলির অনেক বিড়াল বেড়িয়ে আসবে।

এমন কালো তালিকা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমনি আরো জীবন্ত নজির আছে। বাংলাদেশ ম্যাপ আঁকা প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্যাডে এমন দালাল হত্যা তালিকা ৮ নং সেক্টর 'ই' কোম্পানির ক্যাপ্টেন পান। তালিকার নিচে পথে কোথাও যেন সে পত্র খোলার আলামতের মত কিছু সন্দেহ করেন ক্যাপ্টেন। ব্যাপারটি সেক্টর কনফারেন্সে উঠতেই অন্যান্য কোম্পানি কমান্ডারগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন। বেরসিক ঠোঁটকাটা ক্যাপ্টেন/প্রফেসর সফিক সরাসরি সেক্টর কমান্ডারকে প্রশ্ন করেন কে এই দালাল। মেজর মঞ্জুর ব্যাপার শুনে কাঁচুমাচু। সরাসরি সেক্টর কমান্ডারকে প্রশ্ন কে এই ঘাতক-দালাল নির্মূলের প্রণেতা ? কারুরই কোন সদুত্তর নেই। ১৯৭১-এর দুর্দিনের তথ্যনিষ্ঠ সত্য উদ্ধারে এ-সবের সত্য উদঘাটন আবশ্যক। অন্যথায় অনাগত ভবিষ্যতের জাতীয় দুর্দিনে জাতি আত্মহননে শেষ হবে। আসল শত্রু থাকবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

বাঙালি হত্যা তালিকা ঃ মুক্তিযুদ্ধ তখন প্রচণ্ডতার উত্তুঙ্গ শিখরে। ৮ নং সেক্টর 'ই' কোম্পানি সদর তখন হাকিমপুর। আজাদ পত্রিকাখ্যাত মওলানা আকরম খাঁ-র বাসস্থান হাকিমপুর। বেনাপোল-সাতক্ষীরার মাঝামাঝি ভাদিয়ালি-কাকডাঙ্গা আমার অপারেশন এলাকা। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার ঐতিহাসিক হাকিমপুরে বসে সিল গালা মারা খাম খুলে ডাক দেখছি। অকস্মাৎ একি দেখি! এ যে বাঙালি হত্যার তালিকা। প্রবাসী সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্র। প্যাডের কোনায় বাংলাদেশ ম্যাপের মনোগ্রাম। আমার কোম্পানি এলাকার আশি জনের হত্যাপর্ব তালিকা। অবাক করা ব্যাপার তালিকা শেষে কারুরই স্বাক্ষর নাই।

তালিকার দু'চারজনকে চিনি। বাংলাদেশের গভীর অভ্যন্তরে সশরীরে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করে কারু বিরুদ্ধেই বাংলাদেশ বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোন সুনির্দিষ্ট চার্জ পাওয়া যায় নি। ভিন্নতর রাজনৈতিক দলের হলেই দালাল হবেন, এমন কোন কথা নেই। পরে জেনেছি এমন তালিকা অনেকের কাছে গেছে। কিন্তু কে এর হোতা তার নিদর্শন মিলে নি। চামচা গ্রুপ আমার পাশে ঘুর ঘুর করেন সব সময়ে। দালাল হত্যায় তাদের হাত নিশপিশ করে। আমার সোজা জবাব, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের নামে বাঙালি হত্যা করা আমার কর্ম নয়। এবার চাই আমারে সশস্ত্র যুদ্ধে ক্যাপ্টেন পদে রাখ আর না রাখ। অপোগণ্ড, অপরিণামদর্শী চ্যাংড়া মুক্তি কমান্ডারের ভুলে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার জের আজো চলছে।

কোন মস্তিষ্কের অবদানে বাঙালি মরে! আর সব হত্যার দায়ভার সামলাতে হয় কমান্ডারদের। যুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক চোরাগোপ্তা হত্যার জন্য আজো মুক্তি কমান্ডারদের দায়ী করা হয়। সত্য একদিন আপন মহিমায় প্রকাশ পাবে। এভাবে গুপ্ত

হত্যায় বাঙালি নিধন চললে মাতস্যায়ন নীতির পরিণতিতে পাকিস্তানের আন্তঃদলের প্রতিহিংসার হত্যা পর্বের খেসারতের শিকার হন মুক্তিযোদ্ধা। এমনি অভাবিত ব্যাপার ঘটেছে পূর্বাপর স্বদেশ ভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়া অমিততেজা মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রমের বেলায়।

মুক্তি যুদ্ধের র‍্যাংক ঃ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন কমান্ডারদের র‍্যাংক যুদ্ধের পরে বজায় রেখেছিলেন তাদের জাতির পিতা শোয়েকার্নো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তা হয়নি। চলমান যুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রয়োজনে বিঘোষিত যুদ্ধকালীন কমান্ডারদের র‍্যাংক-কে স্বাধীনতার পর মেনে নেয়া হয়নি। যুদ্ধকালীন পদমর্যাদা মেনে নিয়ে বহুতর সম্মান, পারিতোষিক, আর্থিক অনুদান, পেনশনের মাধ্যমে বিদায় করেও কমান্ডারদের সম্মান রক্ষা করা যেত। বেনিয়া ব্রিটিশ কোম্পানির সেনাবাহিনীতে দেশীদের সর্বোচ্চ পদ ছিল সুবেদার মেজর। সাম্রাজ্যবাদ কলোনিয়াল আর্মির আদলে তৈরি বাংলাদেশ আর্মি। পুরো সেনা আইনের সংস্কার করা হয়েছে 'পাকিস্তান' স্থলে 'বাংলাদেশ' শব্দটি লিখে। ব্রিটিশ/পাকিস্তান আইন মেনে যখন বাংলাদেশ হয়নি। সে আইনেরই দাড়ি-কমার অক্ষর বিন্যাস চালু রেখে বাংলাদেশ শাসন চলছে! স্বদেশ প্রেমিক রাজনীতিবিদ এমনকি জাতির জনক পর্যন্ত আইনের ব্যাখ্যায় আমলার হাতে বন্দি।

ইন্দোনেশিয়ার বা-পাক (জাতির পিতা) বাংকার্নো বা সোয়েকার্নোকে বুঝানো হয় তাঁর দেশের দখলদার বিদেশী রাজা বা রানীর তুলনায় তিনি বহু বেশি (কয়েক কোটি) জনতার নেতা। দখলদার দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যদি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কমিশন দেন, তবে তিনি কেন এত ছোট র‍্যাংকের পদবির সেনা অফিসারকে কমিশন দেবেন? যে গণযোদ্ধা যত অধিক সংখ্যক বিদ্রোহী গণযোদ্ধার সমাবেশ ঘটাতে পারবে, ইন্দেনেশিয়ার স্বাধীনতাযুদ্ধে তিনি তত বড় র‍্যাংক পাবেন। যুদ্ধের পর প্রথাগত রেজিমেন্টেড প্রশিক্ষণের অভাবে ইন্দোনেশিার জন্য সে-আর্মি শুভ ফল দেয়নি। ইতিহাসের সাক্ষে তার জের আজও চলছে।

বাংলাদেশ আর্মিতেও বেসামরিক লোকদের কমিশন দেয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরও তা থেকেছে এমন নজির আছে ৮ নং সেক্টরে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনজন সিভিল অফিসারকে সরাসরি ক্যাপ্টেন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে সেনাপ্রধান ওসমানির স্বাক্ষরে তা করা হয়। সে তিন জন অফিসার তৎকালীন সিএসপি তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, এসডিও, মেহেরপুর; পিএসপি মাহবুবউদ্দিন আহমেদ, এসডিপিও, ঝিনেদা; সিনিয়র অধ্যাপক মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ, ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ।

বেসামরিক লোকজনকে র‍্যাংক দেয়ায় ঝামেলা ছিল না, তাঁরা সম্মান ও র‍্যাংক নিয়ে পূর্বতন কর্মস্থলে ফিরে গেছেন। যেমন ফিরে গেলেন তৌফিক ও মাহবুব। গোলমাল লাগলো নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের র‍্যাংক নিয়ে। কারণ, তাঁদের নিজস্ব বাহিনী আর্মি, নেভী, এয়ার ফোর্স, ইপিআর, পুলিশ রেজিমেন্টাল সিনিয়রিটির সঙ্গে সিনিয়র জুনিয়র

র‍্যাংক স্ট্রাকচারের আলোকে পদোন্নতি না দিলে বিপর্যয় আসন্ন। কেননা, যুদ্ধ শেষে সবাই তাঁর নিজস্ব ইউনিটে ফেরত গেলেই মূর্তিমান বিদ্রোহের মত তা প্রকাশ পাবেই। পাকিস্তানে আটকরা ফেরত আসলেও জুনিয়র-সিনিয়র প্রশ্ন আসবেই। স্বাধীনতা যোদ্ধাদের দু'বছরের এন্টিডেট জ্যেষ্ঠতা নিয়েও চাপা জ্বলন্ত ক্ষোভ এখনো আছে। প্রচলিত আর্মির এ আর আর অনুসারে সুনির্দিষ্ট সময়ে কেউ তাঁর ইউনিটে ফিরে না এলে তিনি প্রতিরক্ষার চাকরি হারান যত সঙ্গত কারণেই এবং যেখানেই তিনি আটকা পড়ে থাকুন না কেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আটক নিখোঁজ যে-সব সৈন্য পরে আমেরিকান প্রতিরক্ষায় ফিরে এসেছেন, তাঁদের কেউ নিয়মিত প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যেতে পারেনি। তাঁদের ভিন্নতর সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে। অথচ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানে আটকে পড়াদের সে নিয়মে চাকরি যেতে পারতো। অপরদিকে, বাংলাদেশে ঘাপটি মেরে বসে থাকা, অথবা বিভিন্ন ভাবে দখলদারদের সহযোগিতা করার কারণে এদেরও চাকরি যেতে পারতো। আহাম্মকি আর কারে কয়, দূরদৃষ্টিহীন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে চাকরিচ্যুত করা হয়নি তাদের।

মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিক নিয়ম বহির্ভূত র‍্যাংক দিয়েছে ৯নং সেক্টর। তার কারণ যুদ্ধ শুরুকালে উক্ত সেক্টরের নিজস্ব কোন রেজিমেন্ট ছিল না, যেমনটি ছিল ১ থেকে ৮ নম্বর সেক্টরের। মেজর জিয়া, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর ওসমান, সবাই নিজস্ব ব্যাটালিয়ন/উইং নিয়ে বিদ্রোহ করে যুদ্ধের মাধ্যমে সটকে পড়েছেন। তেমন কোন ট্রুপস ছিল না ৯ নম্বর সেক্টরের। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যোদ্ধা ও গণবাহিনীই ছিল তাদের সম্বল। সে-কারণে অনেক র‍্যাংক দিতে হয়েছে তাদের। তার সঙ্গে উদার হস্তে পদকও দিয়েছেন। যুদ্ধ পরবর্তী অশান্তি এড়াতে গিয়ে এসব আর ঠেকানো যায় নি। একই রকম ভুল করেছে হেমায়েত বাহিনী। তাদের কোম্পানি ছিল ৪২টি। তারা কোম্পানি কমান্ডার ও সহকারি কোম্পানি কমান্ডার মিলিয়ে ৬২ জনকে র‍্যাংক দিয়েছেন। হেমায়েত বাহিনী প্রদত্ত পদবি ছিল ক্যাপ্টেন, লেফটেন্যান্ট, সুবেদার, নায়েব সুবেদার, হাবিলদার, নায়েক ইত্যাদি। পুলিশের দারোগা ধরনের লোককেও সেখানে র‍্যাংক দেয়া হয়েছে। তবে সৌভাগ্য যে, গণবাহিনীতে এ-সব পদবি নিয়ে কোন গণ্ডগোল হয়নি। হেমায়েত বাহিনীর ৬২ জনের র‍্যাংক স্ট্রাকচারের ২২ জন ছিলেন কমান্ডার। অবশিষ্ট ৪০ জনের র‍্যাংক নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা ছিলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য।

মুক্তিযুদ্ধে যার যত বাহাদুরিই থাকুক না কেন, প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়া এ-ভাবে র‍্যাংক বিতরণ সম্পূর্ণত বাস্তবতা বিবর্জিত। উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সিলেকশন বোর্ড/কমিটির বাইরে এ-ভাবে র‍্যাংক বিতরণ একই দেশে স্বাধীনতার জন্য লড়া এক সেক্টরের একজন যোদ্ধা রাতারাতি নায়েক থেকে ক্যাপ্টেন হবেন এবং অন্য সেক্টরের নায়েক যোদ্ধা নায়েকই থেকে যাবেন, তা'হলে তো নিয়ম-কানুন আর কিছুই থাকলো না। যারা যেখানে লড়েছেন, নিশ্চয়ই কেউ ইচ্ছে করে যুদ্ধে বীরত্ব দেখানোয় কমতি করেন নি, সবাই যার যার সেরাটাই ঢেলে দিয়েছেন। যদি এটাই হয় সত্যিকারের চিত্র, তবে নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ঢালাও পদোন্নতি কেউ

মেনে নিতে পারেন না। সুতরাং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সময়োচিত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ-সব ক্ষেত্রে। যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখানো একান্তই যুদ্ধকালে শৌর্য ও বাহাদুরির ব্যাপার, অপরদিকে র‍্যাংক প্রদান বিষয়টি নির্দিষ্ট নীতিমালার অনুসরণে প্রশাসনের এখতিয়ার ও বিবেচনার বিষয়। নতুবা বীরশ্রেষ্ঠরা তো এমনি এমনিতেই জেনারেল হয়ে যেতেন।

র‍্যাংক দিলেই কেউ অফিসার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, অফিসার হওয়ার জন্য আবশ্যক নির্দিষ্ট মানের শিক্ষা ও.এল.কিউ. (অফিসার্স লাইক কোয়ালিটি)। এ-সব গুণ কিছুটা অর্জিত, কিছুটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রপ্ত করতে হয়। সুতরাং নিশ্চয়ই সবাই একমত হবেন যে, গণবাহিনী ও পেশাদার আর্মি দুটো ভিন্ন জগৎ।

মেজরের পদোন্নতি জেসিও ঃ হেমায়েত উদ্দিন যুদ্ধ শেষে তাঁর বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ করেন ঢাকায়, ২০ জানুয়ারি, ১৯৭২। তাঁর চিকিৎসা হয় ঢাকা ও ফ্রান্সে। পাক আমলের হাবিলদার যুদ্ধের প্রয়োজনে মেজর। যুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার ও বাংলাদেশ আর্মি তা মেনে নেয়। বিদেশী প্রচার মাধ্যমের মেজর পরিচিতির তদন্ত করে কিছুই পান নি। উল্টা ৯নং সেক্টরের সেনা অফিসাররা হেমায়েত-এর প্রাধান্য ও র‍্যাংক-কে স্বীকার করে নেন। তাঁর সাহায্য-সহযোগিতায় বাংলাদেশের হেমায়েত প্রভাবিত অঞ্চলে সংহত হবার সুযোগ পান।

ঈর্ষাপরায়ণ প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে ভিতরে গজিয়ে উঠা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গ্রুপের আত্মদান সম্পর্কে আঁচ করা দুরূহ। ঢাকা-মানিকগঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী, টাঙ্গাইলের আবদুল কাদের সিদ্দিকী, ময়মনসিংহের মেজর আফসারউদ্দিন, ফরিদপুরের হেমায়েতউদ্দিন, যশোরের আকবর চেয়ারম্যান প্রভৃতি প্রতিরোধ বাহিনীর অবদানে ধন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানি চোখের সন্ত্রাসী যোদ্ধা বাঙালি গ্রুপকে বর্ডার পার করে ভারতে ঠেলে দেন পাকিস্তানি আর্মি। সন্ত্রাস মুক্ত তখনকার বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গ্রুপ না গজালে স্বাধীনতাকে চরম মূল্য দিতে হতো। মুক্তিযুদ্ধে জয়পরাজয় নির্ধারণ করেছে গেরিলা যুদ্ধ। ভারতের চাকুলিয়া, আগরতলা, মেঘালয়, দেরাদুন ট্রেইন্ড গেরিলা গ্রুপের অবদান কেউ অস্বীকার করে না। তোলা দুধে পোলা বাঁচানোর মত স্বদেশের মাটির সাথে সম্পর্কবিহীন বিদেশীর হাতে প্রশিক্ষণ আর মাটির মানুষের জলকাদার প্রশিক্ষণে গগণচুম্বী পার্থক্য। ভিতরে গজানো প্রতিরোধ গ্রুপের আশ্রয় যশোর-মনিরামপুর ও সাতক্ষীরা-তালায় যুদ্ধ না করলে অত্র লেখকের এ-অহমিকা ভাঙ্গত না। মনিরামপুরে এয়ারফোর্স অফিসার ফজলুল হক, তালার এমপি আলাউদ্দিন, আশাশুনির ন্যাভাল কমান্ডো রহমতুল্লাহর যুদ্ধ সংগঠন, যুদ্ধকালে ভিতরে এসে না দেখলে তাঁদের সাথে সম্মিলিত যুদ্ধ না করলে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে যোদ্ধা-লেখক অজ্ঞই থেকে যেতেন। যতই বই পড়ে থিওরি আওড়ানো হোক, রেজিমেন্টেড নিয়মিত যোদ্ধাকে গেরিলা যুদ্ধ বুঝানো বৃথা। এসব বাহিনীর সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও আর্মির সুসম্পর্ক ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক খোদ ওসমানির সঙ্গে পর্যন্ত তাঁদের খিটমিট লেগে থাকতো। বিদেশে বসে অনেকের বিরুদ্ধে

কল্পিত চার্জ করা হয়েছে। স্বদেশে অস্বাভাবিক পরিবেশে অনেকের বেড়ে যাওয়া প্রভাব প্রতিপত্তিতে প্রবাসী যোদ্ধাদের গাত্রদাহ হয়েছে। হালিম চৌধুরীকে আগরতলা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে নিজের গোনাখাতা মাপ করাতে হয়েছে। যুদ্ধাহত কাদের সিদ্দিকীকে চিকিৎসার জন্য ভারতে যেতে হয়েছে। সর্বাবস্থায় এমনকি মৃত্যুর মুখে পর্যন্ত হেমায়েত ছিলেন বাংলাদেশ অন্ত প্রাণ।

যুদ্ধকালের মেজর যুদ্ধ শেষে হাবিলদার। ১৯৭৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স থেকে ফেরত এসে সেনাবাহিনীতে যোগদানের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন বিশ্রামে থাকেন। সেনা প্রধান সফিউল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন তিনি। পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য হেমায়েতকে গ্রামের বাড়িতে বিশ্রাম নেয়ার উপদেশ দেন স্বয়ং সেনা প্রধান। ব্যাপারটি নন-অফিসিয়েল। যুদ্ধাকালীন র‍্যাংকের ব্যাপারে সফিউল্লাহ অপারগ। ৯নং সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল লিখিত ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে হেমায়েত অবদানের স্বীকৃতি দেন। তিনি প্রথমে তাঁকে নায়েব সুবেদার ও পরে সুবেদার পদে পদোন্নতি দেন। রক্তের আখরে হেমায়েত তাঁর পদোন্নতির সার্থকতা প্রমাণ করেন। রেকর্ড পর্যন্ত তাঁর পদোন্নতি বহাল রাখে নায়েব সুবেদার পদে।

সব দোরে ফেল মেরে হেমায়েত আর্জি পেশ করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দরবারে। তাঁর নিবেদন, পাকিস্তানি আমলের হাবিলদার মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে মেজরের কাজ করেছে। যুদ্ধকালে তার প্রতিবাদ হয়নি। জনগণ, বাংলাদেশ আর্মি, প্রবাসী সরকার, স্বদেশ-বিদেশের বহুল প্রচারিত প্রশংসিত মেজরের আজ পদাবনতি কেন? নিয়মিত আর্মির ক্যাপ্টেন ও অধঃস্তনরা যাকে যুদ্ধকালে স্যালুট করল তার আজ এই জিল্লতি কেন? হেমায়েত কামনা করেন "আমাকে কমপক্ষে মেজর হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ করে দি , অথবা অবসর দিন মুক্তিযুদ্ধকালীন পদে।"

সে ১৯৭৩ সালের কথা। উপায় উদ্ভাবনে শেখ ডাকেন সেনা প্রধান কাজি সফিউল্লাহকে। 'সেনা আইনে এমন নিয়ম নাই'র যুক্তি দেন সেনা প্রধান। হেমায়েতকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য দুই হাজার টাকা দিয়ে শেখ মুজিব, "তোর যোগ্য মর্যাদা যখন সেনাবাহিনীতে সম্ভব নয়, তুই আর চাকরি করিস না। আমি তোর যোগ্য ‌ দা দিব। তোর বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করব।"

জাতির জনকের নিষেধের সাথে হেমায়েতের মনে শ্লাঘার অভিমান জন্ম নেয়। অনেক সেনা অফিসার আমার অধীনে কাজ করেছেন। আমাকে সশ্রদ্ধ সালামের স্যালুট দিয়েছেন। যুদ্ধ শেষ। কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরালে পাজি। এখন মুক্তিযোদ্ধা অপাংক্তেয়। এবার হাবিলদার পদে যোগ দিলে উল্টা রংয়ের স্যালুট! এককালের মেজর মারে ক্যাপ্টেনকে স্যালুট!! আজব ব্রিটিশের গড়া সেনা আইনের গজব। এমনি খেলা আরো অনেকের প্রতি হয়েছে। এমনি একজন ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ অধ্যাপক ক্যাপ্টেন সফিক। যুদ্ধ শেষে তার পুরস্কার অনারারি ক্যাপ্টেন বা জেসিও। অনেকে আত্ম সম্মান বিসর্জন দিয়ে কাজ করেছেন। হেমায়েত তা পারেন নাই। কারণ তাঁর অহংবোধ। "১৯৭১ সালের এরিয়া

কমান্ডার, জেনারেলের যোগ্যতা রাখলাম। স্বাধীন দেশের আইনে অযোগ্য। স্বাধীনতার বেদিমূলে দর্প আর বুকের রক্ত বৃথা গেল।" কর্মদক্ষতার অহংকারে ডুব দিয়ে সেনাবাহিনীর ইতিতে অবসর গ্রহণ করেন হেমায়েত। অন্ন সংস্থানের জন্য কোটালিপাড়ায় স্থাপন করেন একটি ঔষধের দোকান। আল্লায় চাইলে এতেই একটা বিহিত হয়ে যেতে পারে জীবনের জন্য।

হেমায়েত বাহিনীর কিশোর যোদ্ধা

"দারুণ উপপ্লবের দিনে
আমরা দানি শির
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর।"

কিশোর ছাত্র দলের উৎসর্গিত প্রাণ যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। অগণিত 'আয়রে সবুজ, আয়রে আমার কাঁচা, আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'র দুচারজনের স্মৃতি জ্বলজ্বলে। হেমায়েত বাহিনীর তের বছরের কিশোর যোদ্ধা শিশির কুমার মধু। ৭ম শ্রেণীর ফুটফুটে চেহারার সুদর্শন কিশোর। রণাঙ্গণে স্টেনগান কাঁধে নির্ভীক সাহসে ছুটে শত্রুকে ধাওয়ায় ব্যস্ত। বাহিনী প্রধানের নিকট-সংস্পর্শে ঘোরতর যুদ্ধে ছায়া সঙ্গীর মত থাকতো। আজো বেঁচে আছে মধু। তবে তার জীবনে মাধুর্য নাই। এম.এ.পাস করেও অভাব অনটনে ঢাকায় সে বেকার জীবনের দুর্বিষহ বোঝা টেনে বেঁচে আছে।

অনেক তারার মাঝে ধ্রুব তারার মত জ্বলে শহিদ গোলাম আলি। কোটালিপাড়া থানার শিকির বাজার যুদ্ধের অবিস্মরণীয় বীরত্বের কীর্তি গাথায় ধন্য কিশোর গোলাম আলি। পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংকারে যুদ্ধরত কিশোর। শত্রুর শেলিং ও গুলির ভয়াবহতায় টিকতে না পেরে পিছিয়ে আসে সকল মুক্তিসেনা। ৯ম শ্রেণীর ১৪ বছরের কিশোর অকুতোভয় সংশপ্তক পিছু হটলো না, ছাড়লো না জায়গা ও হাতিয়ার। সগর্জন চিৎকার ঃ "এক বিন্দু রক্ত থাকতে বাংকার ছাড়বো না।" অবিচল দৃঢ় পদে বাংকারে বসেই দেশ উদ্ধারে তার অহংকারের যুদ্ধ জারি রাখে। শত্রুর হাতে ধরা পড়েও তার মুখে আল্লাহ ও জয়বাংলার বন্দনা গীতি থামেনি। চপল কিশোরকে বেয়নেট মেরে মেরে চিরতরে ঠান্ডা করে দেয় পাকিস্তানি আর্মি। শহিদ গোলাম আলি বাংলার অনাগত কালের কিশোর সেনাদের আলোর দিশারি। যুগ যুগ জিয়ো গোলাম আলি।

শিকির বাজার যুদ্ধের উজ্জ্বল তারকা শহিদ গোলাম আলি খেতাব পাবার মত বীরত্বের স্বাক্ষর রেখে মুক্তিযুদ্ধে কিশোর অবদানকে ধন্য করেছেন। নিয়মিত বাহিনীর যোদ্ধাদের এসব রেকর্ড রাখার জন্য হয়তো রেকর্ড-কিপার থাকে, কিন্তু অনিয়মিত বাহিনীর গেরিলাদের ভাগ্য নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম ঘটেছে। কমান্ডারের

ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদের ভাগ্যেও ঘটেছে একই পরিণতি। মেজর জলিল শেষ পর্যায়ে বন্দি হলে, স্বাধীন দেশে হেমায়েত ফাঁসির আসামি হিসেবে কাঠগড়ায় গেলে হেমায়েত বাহিনীর অবদানের মূল্যায়নে কেউ এগিয়ে আসেন নি। নিজ বাহিনীর সৈনিকদের অবদানের গ্যালান্ট্রি কাগজ তৈরি করা তো দূরে থাকুক, হেমায়েত নিজেই তখন ফরিদপুর জেলে বসে নিজের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত। তিনি নিজের গ্যালিন্ট্রির খবর পান ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে জেলে বসে। ফরিদপুর জেল গেটে জেলারের সৌজন্যে গেজেট থেকে নিজের বীরত্বব্যঞ্জক পদকের সুখবরে নিশ্চিত হন। হায় বীরত্ব পদক! তার প্রাপক নিজেই জেলে!! তাঁর সাহসী যুদ্ধসঙ্গীদের ভাগ্য ভবিষ্যতের হাতে!!! পাঠকের মনে হয়তো প্রশ্ন উঠবে এ-ক্যামন দেশ, এ-ক্যামন ভাগ্য একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার!

নিঃশেষে যারা জীবন দান করে তারা অমর। বাংলার অবোধ দুগ্ধপোষ্য শিশু-কিশোররা ঝাঁকে ঝাঁকে মরেছে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারে। ঘর বাড়িতে লাগানো আগুনে বহু শিশু-কিশোর মরে পুড়ে কাবাব বনে ছাই হয়েছে। নালা, নর্দমা, ড্রেন, ডোবা, পুকুর খাল, নদীতে শিশু কিশোরের লাশ পড়ে থাকতো। শিশু-কিশোরের লাশ কোলে নিয়ে জনসমাবেশে জনতাকে প্রতিশোধ প্রতিকারে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে উদ্বুদ্ধ করতেন হেমায়েত।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় হেমায়েত-এর চোখে ভাসতো তাঁর সোয়া বছরের মা হারা এতিম শিশু পুত্র হাসিব উদ্দিন পান্না। শত্রুর চক্রান্তে নিহত হাসিবের মাতা হেমায়েতের প্রিয়তমা পত্নী হাজেরা বেগমের আত্মা যেন শিশু কিশোর রক্ষায় হেমায়েতকে প্রেরণা যোগাতো।

হেমায়েত বাহিনীর এলাকা ঃ দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী দ্বারা যে সকল এলাকা মুক্ত করা হতো তাদের বলা হতো 'মুক্ত-অঞ্চল'। বাস্তবে এ-গুলিকে মুক্তি প্রভাবিত এলাকা বলাই সঙ্গত। কারণ এ-সব এলাকার হাত বদল হতো। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী জিতলে মুক্তি অঞ্চল, আর পাকিস্তানি বাহিনী জিতলে দখলদার অঞ্চল। একাধিক যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের দাপটে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে পাকিস্তানি আর্মি ভাগলে দালালের ঔদ্ধত্য বন্ধ হলে জনতা মুক্তিবাহিনীর আনুগত্য স্বীকারের বিজয় গৌরবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিতো। মুক্তি-বিজয়ের প্রতীক উত্তোলিত স্বাধীন বাংলার পতাকা বাংলাদেশের বহু স্থানে শত চেষ্টায়ও পাকিস্তানি আর্মি নামাতে পারে নি। এ ব্যাপারে হেমায়েত অম্লান গৌরবের অধিকারী। বিজয় আধিপত্যের নিদর্শনে ১৫ মে, ১৯৭১ সালে বরিশালের গৌরনদী থানার বাড্ডা হাই স্কুলে স্বাধীনতার পতাকা উড়ে।

পতাকা ওড়ানোর পুরস্কার!

পতাকা ওড়ানোর আনন্দে এবং মুক্তাঞ্চলের নিরাপত্তার আশ্বাসে গৌরনদী থানা সদর এলাকা থেকে শত শত শরণার্থী এই এলাকায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানের সেরা সার্কাসম্যান বাবু লক্ষণদাসের পরিবারবর্গ এবং সার্কাসের নারী-

পুরুষ, শিল্পী, হাতি-ঘোড়া ও মালামাল পাশেই রাখা ছিল। বাবু লক্ষণদাস স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ানো কার্যে সহযোগিতা করায় পরের দিন ১৬ মে তারিখে পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করে। তাঁর পালিত হাতি প্রভু হত্যার প্রতিশোধে এগিয়ে আসলে তাৎক্ষণিকভাবে সেটাকেও অনবরত গুলি করে হত্যা করা হয়। মহারাষ্ট্রের বর্গিদের বিরুদ্ধে বাংলার নওয়াবের হাতি যুদ্ধ করেছে। নিজেদের অচেনা মাহুত তাদের শিকল খুলে পাকড়াতে চাইলে ২০/২৫ ফুটের পায়ের লোহার শিকল দিয়ে পিটিয়ে হানাদার বর্গিদের হত্যা করে বাংলার হাতি। বাংলার পশুর মত বাংলার সব মানুষ যদি তার মাটি ও নিমকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতো!

এর অতি অল্পক্ষণ পরেই মুক্তিরা আক্রমণ করে ওখানে। মুক্তি আক্রমণের তীব্রতায় পাক-আর্মি পলায়ন করে কিন্তু যে-ক্ষতিটা করার তা ইতোমধ্যেই করে ফেলেছে। পাক-মুক্তি পাল্টা-পাল্টি যুদ্ধের ফাঁকে কে বা কারা সার্কাসের সব মালামাল লুটে নিয়েছে। অবশ্য পরে মুক্তিদের পেষাগিতে সার্কাসের মালামাল উদ্ধার হয়েছিল।

সে-সময়ে বাতড়া হাই স্কুলে পতাকা ওড়াতে অগ্রগামী দলে সকল দলের সমর্থকগণ ছিলেন। পতাকা ওড়ানো দলে স্বনামধন্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হরনাথ বাইন এমপি, করিম নাইয়া, মন্টু দাস গুপ্ত, রাফায়েল বেপারি, ফখরুল ইসলাম, অধ্যাপক সুনিল কর, বাবু দ্বিজেন ঘট, সেন্টু মীর, নূর মোহাম্মদ মোস্তফা, বাবু সন্তোষ ঠাকুর, মোজাম্মেল হক মোজাম, জগদীশ তালুকদার প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ফ্লাগ দলের সার্বিক নেতৃত্ব দেন বাবু লক্ষীকান্ত বল ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র চিত্তরঞ্জন বল। শৌর্য-বীর্যের পরীক্ষিত নেতা হেমায়েত-এর পতাকা তলে সেদিন গৌরনদী, উজিরপুর ও অন্যান্য স্থানের মার খাওয়া যুবনেতাগণ যোগ দেন। অধ্যাপক সুনিল বাবু ও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে শশিকরে একটি অস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরির কারখানাও স্থাপিত হয়। সেখানে বোমা বানাতে গিয়ে একাধিকবার বিপর্যয় ঘটে। বোমা বানাতে গিয়ে অন্ধ হয়ে যায় ফারুক নামের একজন যুবক।বোমা ফেটে কয়েক মুক্তির হাত ও পা ওড়ে যায়। বহু প্রাণের গচ্ছায় হলেও সেখানে অস্ত্র-গোলাবারুদ কারখানা স্থাপিত হয়ে একটি অসাধ্য-সাধনের কাজ হলো।

সে-সময়ে নব গ্রামের পাক আর্মি মুক্তিবাহিনী ধ্বংসের জন্য এগিয়ে আসছে। নবগ্রামের খালের বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে আসতে হবে আর্মিকে। সাঁকো পেরোনোকালে অসীম সাহসী মুক্তি ঢাল- সড়কিসহ সাঁড়াশি আক্রমণের মাধ্যমে ছয়জন পাক-আর্মিকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করে। নিহত শত্রুদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্র জমা দেয়া হয় লক্ষীকান্ত বলের কাছে তাঁর পিয়ারবাগি গ্রামে। সে-সময়ে তাঁর বাড়িতেই মুক্তিদের জন্য একটি অগ্রগামী ঘাঁটি বসানো হয়। বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত লক্ষীকান্ত বলের (এম.পি.) পুরো পরিবার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ঢাল-সড়কির যুদ্ধস্থল নবগ্রামে তিনজন মুক্তির জীবনের বিনিময়ে বিজয় আসে। তাঁরা হলেন : অনিল চন্দ্র মল্লিক, বিরাট চন্দ্র বাইন এবং সুবাস চন্দ্র হালদার। গকুলের ভাই গৌরাঙ্গ চন্দ্র মন্ডল দারুণ সাহসের সঙ্গে লড়েন। সেসব শহিদ পরিবার আজ অনাহারে-জরাজীর্ণ দেহে ধুঁকে ধুঁকে কায়-ক্লেশে কোনরকমে মানবেতরভাবে জীবন টিকিয়ে রেখেছে।

হেমায়েত বাহিনীর বিস্তৃত কার্যক্রম

তিন জেলায় হেমায়েত বাহিনীর কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল :

ক। ফরিদপুর, খ। বরিশাল, এবং গ। যশোর।

এসবের মধ্যে বিশেষ প্রভাবাধীন এলাকাগুলো হচ্ছে :

ক। ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চল, খ। বরিশালের গৌরনদী, উজিরপুর, সরূপকাঠি, নাজিরপুর থানা, গ। খুলনার মোল্লার হাট থানা, ঘ। যশোরের কালিয়া থানা।

এসব এলাকায় দোর্দণ্ড প্রতাপে কাজ করতো হেমায়েত বাহিনী। পাকিস্তানি আর্মির চোখে সন্ত্রাস, জনতার দরবারে স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক হেমায়েত বাহিনী।

হেমায়েত বাহিনীর মূল তৎপরতার থানা এলাকা

ক্রমিক নম্বর	থানার নাম	জেলা
১.	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ
২.	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ
৩.	মোকসেদপুর	গোপালগঞ্জ
৪.	কাশিয়ানি	গোপালগঞ্জ
৫.	টুঙ্গি পাড়া	গোপালগঞ্জ
৬.	কালিয়া	নড়াইল
৭.	মোল্লার হাট	বাগেরহাট
৮.	সরূপকাঠি	বরিশাল
৯.	উজিরপুর	বরিশাল
১০.	বাবুগঞ্জ	বরিশাল
১১.	মুলাদি	বরিশাল
১২.	কালকিনি	মাদারিপুর
১৩.	মাদারিপুর	মাদারিপুর
১৪.	শিবচর	মাদারিপুর
১৫.	দামুড্যা-ভেদরগঞ্জ।	শরিয়তপুর
১৬.	গোসাইর হাট	শরিয়তপুর
১৭.	নাজিরপুর	বরিশাল
১৮.	গৌরনদী	বরিশাল
১৯.	আগৈলঝাড়া	বরিশাল

চতুর্থ অধ্যায়

বীরাঙ্গনা-ধন্য হেমায়েত বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে অনেকেই অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। বাঙালি নরনারীর সম্মিলিত অবদান ধন্য এই মুক্তিযুদ্ধ। নির্যাতন, ধর্ষণ-জাতীয় অকথিত অত্যাচারের সিংহভাগ সইতে হয়েছে বাংলার নারীকে। মুক্তিযুদ্ধে সুসংগঠিত ও সশস্ত্র নারী মুক্তি যোদ্ধার একত্র সমাবেশ সম্ভবত হেমায়েত বাহিনীতেই বেশি।

হেমায়েত বাহিনীর কোটালি পাড়ার নারিকেল বাড়ি চার্চ মিশনে সংক্ষিপ্ত নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তারই সান্নিধ্যে আহত-মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতাল। হেমায়েত বাহিনীর প্রশিক্ষণ সদর কোটালিপাড়া জহরের কান্দি হাই স্কুলে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মেয়েদের নিয়মিত অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। দক্ষ প্রশিক্ষণে তৈরি মহিলা যোদ্ধা সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। অপর বিশজন যোদ্ধা-সেবিকা নারী প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর যুদ্ধে নামার লগ্নে দেশ স্বাধীন হয়। নারী যোদ্ধাদের থেকেই তাঁদের বাছাই করা হয়। মুক্তি ছেলেদের প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠালেও মহিলা প্রশিক্ষণের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বাংলা মাটিতেই করা হয়। গ্রেনেড, রাইফেল, স্টেন, পিস্তল, ছোরা, চাকু মারার অস্ত্র প্রশিক্ষণ পেতেন মায়েরা। ঔষধ, পথ্য, ফার্স্ট এইড, ব্যান্ডেজ, যুদ্ধাহতের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, সার্বিক নার্সিং জাতীয় শিক্ষায় মেয়েদের প্রশিক্ষণ চলে। নিয়মিত এমবিবিএস ডাক্তারের অধীনে হতো তাঁদের প্রশিক্ষণ। যুদ্ধাঞ্চলে ও সর্বত্র ক্ষুদ্র অস্ত্র গ্রেনেড, চাকু ও আর্সেনিক তাঁদের নিত্য সঙ্গী। নারী বাহিনী মাত্রেই সুইসাইডেল স্কোয়াড। ধরা পড়লে মৃত্যু, ধর্ষণ-নির্যাতন হেমায়েত নারী বাহিনীতে নেই। ধরা পড়লে চরম মুহূর্তে বিষপানে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবার শপথ নিয়েছিলো দীপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের কজনের পরিচয়ঃ-

আশালতা বৈদ্য

পরিচয় ঃ হেমায়েত নারীযোদ্ধা কমান্ডের গৌরবদীপ্ত পদ অলংকৃত করেন আশালতা বৈদ্য। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী হরিপদ বৈদ্যের সুযোগ্যা কন্যা আশালতা বৈদ্য। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। পিতা হরিপদের জীবনের একটাই ঐকান্তিক কামনা, আধা ডজন সন্তানের মধ্যে অন্তত একজন দেশের মুখ উজ্জ্বল করা কাজে লাগুক। পিতার আশীর্বাদধন্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খ্যাত নারী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আশালতা বৈদ্য। তাঁর গ্রামের ঠিকানা ঃ গ্রাম-লাটেংগা, ডাকঘর-ভাঙ্গার হাট, থানা-কোটালিপাড়া, জেলা-গোপাল গঞ্জ।

সাংগঠনিক প্রতিভা ঃ বাংলাদেশের চর অঞ্চলের লোক-প্রকৃতির ভাঙ্গা-গড়ার কারণে সাহসী ও উদার প্রাণ। বৃহত্তর ফরিদপুরের পুরো অঞ্চলটাই নদীর ভাঙ্গনের খেলায় বাস্তবে চরাঞ্চল। সেই চরাঞ্চলের চৌকা, ঘাউরা, জিদি মেয়ে আশালতা। সপ্তম

শ্রেণীর ছাত্রী অবস্থায় নারী নির্যাতন বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলেন কোটালিপাড়ায়। এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীর সামনে বাস্তব যুদ্ধের বিভীষিকা নিয়ে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ সমুপস্থিত।

মা-মাতৃভূমির চোখের সামনে অবমাননা মুক্তিযুদ্ধের অগ্নি কন্যার শিরা-উপশিরার রক্ত সঞ্চালন দ্রুততর করে ছাড়ে। আত্ম-বলিদানের আত্মাহুতির মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। দেশের জন্য জীবন দানের উদগ্র চেতনায় জীবন বাজি রেখে মাতৃভূমি উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধারা এক পরিবার, একই মায়ের সন্তান। গোপালগঞ্জের মেয়ের সাংগঠনিক প্রতিভাধন্য মুক্তিযুদ্ধের নারী বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধে উত্তর-বরিশাল ও দক্ষিণ-ফরিদপুর তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতায় সংহত সংগ্রামী নারী যোদ্ধা। পঁয়তাল্লিশ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বীরাঙ্গনাধন্য যোদ্ধা নারী তাঁর কমান্ডে চলতেন।

প্রশিক্ষণ ঃ নারী যোদ্ধাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিলো গোয়েন্দা কাজে। গুপ্তচরের সংবাদ সংগ্রহে তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। সক্রিয় যুদ্ধে তাঁরা পুরুষ-সৈনিকদের তাক লাগিয়ে দেন। সশস্ত্র যোদ্ধার হাতই আহত যোদ্ধাদের সেবার মাতৃস্নেহ স্পর্শের কোমলতায় ভরে উঠতো। বিভিন্ন কৌশলে তাঁরা ঢাকা থেকে ঔষধ সংগ্রহ করতেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে সক্রিয় যুদ্ধ সাফল্যে তিনি নারীযোদ্ধা কমান্ডার। যুদ্ধ ও সাংগঠনিক সাফল্যের স্বীকৃতির কমান্ডার পদে তিনি ধন্য ও বরেণ্য।

নারীযোদ্ধাদের জীবনের অবিস্মরণীয় অধ্যায় তাঁদের যুদ্ধ প্রশিক্ষণ। হেমায়েত বাহিনী প্রধানের একান্ত তত্ত্বাবধানে চলে নারী প্রশিক্ষণ। রণ কৌশল ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ পরিচালনায় হেমায়েত তাঁর স্বাক্ষর রাখেন সকল ফাঁক ফোঁকড় মুক্ত প্রশিক্ষণ। যাতে বাংলার মেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠাতে না হয়।

চব্বিশ জন মহিলা যোদ্ধার এক ক্র্যাক প্লাটুন গঠন করেন হেমায়েত। মৃত্যুঞ্জয়ী যুদ্ধের সম্ভাবনাময় ময়দানে তাঁরা অগ্রসেনার কাজ করতেন। শত্রুর অবস্থান জানায় রেকিতে তাঁরা যেতেন। সশস্ত্র যুদ্ধে তাঁরা আত্মাহুতি বাহিনীর মতো কাজ করতেন। মরণ ছাড়া তাঁরা কিছু জানতেন না। ধরা পড়লে আত্মহত্যার ছায়ানাইড বিষ তাঁদের শেষ অস্ত্র।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ঃ আশালতা এদেশের অবলা নারীর জন্য সবলা আশার আলো। ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সাফল্যের সাথে লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। এরই মধ্যে বি এ (অনার্স) সহ এম এ ডিগ্রি নেন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে নিজের আশৈশবের লীলা নিকেতন কোটালিপাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মহিলা সংগঠন গড়ে তোলেন। প্রথমে প্রাইভেট কলেজে শিক্ষকতা। পরে আই আর ডি বি-তে সরকারি চাকরি গ্রহণ। মুক্তিযোদ্ধা মন মানসিকতার সাথে সব যে বেসুরো। সঠিক উন্নয়ন চেতনা ব্যাহত হতেই চাকরিতে ইস্তফা দেন। সমাজের অবহেলিত কৃষক, মহিলা-পুরুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষে একটানা সমাজ সেবায় নিবেদিতা হন। কর্মই ধর্ম মানলেন। দিন রাত কাজে ডুবে থাকলেন। গোপালগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের

সাথে বিলিয়ে দিলেন নিজেকে। দারিদ্র্যের কষাঘাত-মোচনে সূর্যমুখী সংস্থার প্রতিষ্ঠা। বহুতর স্বেচ্ছাসেবক আবেষ্টিত সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন পরিচালক। প্রতিনিয়ত তাঁর নিরলস শ্রম ও নিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছেন। ভিক্ষার হাতকে কর্মী হাতে না গড়লে যোদ্ধা-অযোদ্ধা কারুরই এদেশে অন্ন সংস্থান হবে না।

স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে স্বদেশে ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও স্বাস্থ্য-সেবায় উদয়াস্ত নিয়োজিত ছিলেন আশালতা বৈদ্য ও তাঁর সহকর্মী মহিলা যোদ্ধাগণ। তাঁর অনন্য স্বীকৃতির নিদর্শন সম্ভবতঃ তিনিই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র মহিলা কমান্ডার।

আশালতা বৈদ্যের কর্মসাফল্যের পর্যায়ক্রমিক সোপানঃ

১৯৮২ ঃ চেয়ারম্যান (নির্বাচিত একমাত্র মহিলা), কোটালিপাড়া থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি।

১৯৮৩ ঃ পরিচালক (নির্বাচিত একমাত্র মহিলা), বাংলাদেশ জাতীয় পল্লি উন্নয়ন (প ও উ), সমবায় ফেডারেশন।
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (স্বর্ণ পদক) লাভ।
সহ-সভাপতি (নির্বাচিত একমাত্র মহিলা), বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন ফেডারেশন।

১৯৯৬ ঃ সভাপতি (নির্বাচিত একমাত্র মহিলা), বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন ফেডারেশন।

১৯৯৭ ঃ ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক কৃষক ফেডারেশন-এর নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত।

১৯৯৯ ঃ আমেরিকাতে 'উইম্যান অব দা ইয়ার' পদক লাভ।

২০০০ ঃ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ লাভ–আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট।
'অনন্যা' শীর্ষক পুরস্কার লাভ।
উপদেষ্টা, অনুভব বহুমুখী সোসাইটি।
সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু ফেডারেশন।

তাঁর মহতী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাঃ-

প্রধান কার্যালয় আশালতা বৈদ্য, সূর্যমুখী সংস্থা, গ্রাম-জাঠিয়া, ডাকঘর-কুশলা, জিলা-গোপাল গঞ্জ।

ঢাকার কার্যালয় আশালতা বৈদ্য, পরিচালক, সূর্যমুখী সংস্থা, ২২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

একজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় দেশ গড়ার কাজে অন্য মুক্তিরা উদ্দীপিত হলে কতোইনা কাজের হতো।

মুক্তিযোদ্ধা তাহমিনা খানম

পরিচিতি : ১৯৫৫ সালে বৃহত্তর ফরিদপুরে কোটালি পাড়া থানার কুশালা গ্রামে তাহমিনার জন্ম। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে। বাবা কবি আব্দুস সামাদ শেখ, মা হুরুন্নেছা। আট ভাই বোনের মধ্যে তাহমিনা তৃতীয়। ১৯৬৯-এ মাঝবাড়ি হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ। ঢাকা আইডিয়াল কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাশ করেন। টঙ্গি টেলিফোন শিল্প সংস্থায় চাকরি করেন। ১৯৬৯-এর ১৫ সেপ্টেম্বরে পরিদর্শন বিভাগে পরিদর্শিকা কাজে যোগদান।

নয় মাসে পাক পৈচাশিকতা : পঁচিশে মার্চ কালো রাতে ঢাকায় মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড যাঁরা দেখেছেন, স্থির থাকার কথা নয়। পাক মালাকুরদের নির্মম রসিকতায় বাংগালি মারার দৃশ্যে তাদের প্রতি ঘৃণায় মন ভরে যায় বিদ্রোহীমনা এই নারীর। তাই চাকরি ফেলে দেশের বাড়ি রওয়ানা হন। যাত্রাপথে সদর ঘাটে এক আত্মীয় বাড়ি রাত কাটাতে হয়। কারণ, নিকট-সান্নিধ্যে জিনজিরা আগুনে পুড়িয়ে দেয় পাক আর্মি। পরদিন স্বামী-দেবরসহ শরণার্থীর বেশে পথে পথে ঘুরে আট (৮) দিনে যাত্রাপথের দুর্গতির অবসান ঘটিয়ে পৌছেন কুশলার নিজ বাড়ি।

শত্রুর অত্যাচার : ছায়াঘন নয়নাভিরাম শান্তির গ্রামেও আজ শান্তি নেই। পাক বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়েছে। তাহমিনাদের ২৯শ বান্দের দুটি সুবৃহৎ টিনের ঘর জ্বালিয়ে দেয় রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতায় পাক আর্মি। ধ্বংস করে তাদের কাচারি ঘর। গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগির সাথে ধান-পাট-চাল ধরনের বহন ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ লুটে নেয়। শেষ পর্যন্ত কেরোসিন দিয়ে ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। ছোট বোন রেহানা পায়খানায় গিয়েও বাঁচতে পারেনি। সে মারা যায় পাক আর্মির হাতে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রতিশোধ প্রস্তুতি তখন থেকেই শুরু হয়।

যুদ্ধ প্রশিক্ষণ : ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে স্থানীয় নারিকেল বাড়ি মিশন এলাকায় মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। মহিলা প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন শেখ জাবেদ আলি। এখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা সংখ্যা পঁয়ষট্টি। তার মধ্য পঁয়তাল্লিশ জন সশস্ত্র যুদ্ধ ও সেবিকা কার্যক্রমে অংশ নেন। অবশিষ্ট বিশ জন প্রশিক্ষণ সমাপ্তি লগনে দেশ স্বাধীন হয়। যুদ্ধ ও প্রশিক্ষণ সমানে চলেছে মুক্তিযুদ্ধে। যুদ্ধবিদ্যায় অদক্ষরা যুদ্ধ দক্ষতায় হাতপাকিয়ে তাঁদের অদক্ষতার ভুলভ্রান্তি শোধরাতে আসতেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। তাই পুরা পঁয়ষট্টি জনকেই যোদ্ধার সম্মান দিয়েছে হেমায়েত বাহিনী। নারিকেল বাড়ির মত জহরের কান্দি স্কুলেও আরো একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। তাহমিনা একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও সেবিকা। কারণ মহিলা মুক্তিযোদ্ধাকে সামরিক ও সেবিকা প্রশিক্ষণ দেয়া হত।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলা যোদ্ধা : মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গিয়ে আহত যোদ্ধাদের সেবাশুশ্রূষায় উদায়াস্ত কাজ করেছেন সেবিকা যোদ্ধারা। অনেকেই নিজ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সেবার সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন মহিলা যোদ্ধা। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে হাত পাকানো নারী

তাহমিনা। তাঁর গোটা পরিবার যোদ্ধার পরিবার। পোড়া বাড়িতে তাঁর বাবা কবি আব্দুস সামাদ শেখ এক মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প গড়ে তোলেন। সে ক্যাম্পের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাহমিনার বাবা নিজেই; তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে হেমায়েত-এর উদ্দীপনায় প্রকৃতপক্ষে তাঁর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। ছোট ছোট নৌকায় করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র গোলাবারুদ বোমা বয়ে নিতেন মহিলা যোদ্ধারা। পাক সেনা অবস্থানে বোমা রেখে আসতেন তাহমিনা। একদিন কুশলা বাজারে এলেন এক পাক সেনা। দখলদার দেশের তারাই তো মালিক মোক্তার। তাই পাক সেনার একাকি স্বাচ্ছন্দ বিহার। সবাই মিলে মহিলা যোদ্ধারা ছেঁকে ধরেন পাক যোদ্ধাকে। কাচি-কোদালে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয় এই পাক সেনাকে। আপন ছোট বোনের ও বাঙালি নারী নির্যাতনের প্রতিশোধ স্পৃহা যেন আর ছাড়েই না। তাঁরা পাক আর্মির মৃতদেহ কুশলা পুলের পাশে এক ছোট্ট নদীতে ফেলে দেয় সৎকারের মহতী উদ্দেশ্যে। পাক সেনা বোধ হয় রেকি ধ্বংসের কোনো কাজে এসেছিল। দিনটি ছিল ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। ঐ দিন হেমায়েত বাহিনীর আক্রমণ হয় কোটালি পাড়া থানায়। ভোর রাত থেকে দিনভর যুদ্ধ। থানার চারদিক ঘিরে ফেলে হেমায়েত বাহিনী। ব্যাপক গোলাগুলির বন্যার ফাঁকে থানার পূর্বপাশ দিয়ে কাঁক তালে ভেগে যায় পাকিরা। এই আক্রমণে শত্রু পক্ষকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে হয়। প্রচুর চাল আটা-ডাল-লবণ-চিনি-চাপাতাসহ ডালডা বনস্পতি ঘি, গোলাবারুদ ও অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হেমায়েত দখলে আসে। এই যুদ্ধে বহুতর পাক আর্মি ও তাদের দেশী দোসর রাজাকার হেমায়েত বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। মুক্তির পেঁধানি এমনই টাইট হয় যে দেশ স্বাধীন পর্যন্ত দখলদার বাহিনী আর কোটালি পাড়ায় হানা দিতে আসে নি। তেসরা ডিসেম্বর থেকে কোটালি পাড়া সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয়। ১০ ডিসেম্বর মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সমেত ৬৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার সুসজ্জিত বাহিনী রাজবাড়ি দখলের উদ্দেশ্যে ফরিদপুর শহর ত্যাগ করে। ইতোমধ্যে সংবাদ আসে দখলদার বাহিনী রাজবড়ি ছেড়ে গোয়ালন্দ ঘাট হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে। ফলে রাজবাড়ি ও গোয়ালন্দ ঘাট এলাকা শত্রু মুক্তির উল্লাসে আনন্দে মেতে ওঠে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের শেষ দিনগুলি ছিল ঝঞ্ঝাবাত্যা বিক্ষুব্ধ। বিজয় লগ্ন প্রসব বেদনায় শেষ মুহূর্তের মতই বেদনা ও আনন্দের। এই দুরূহ মুহূর্তে হেমায়েত তাঁর বাহিনী সংহত ও সংযত রেখে প্রতিশোধ-প্রতিকারের পরিবর্তে ক্ষমার ঔদার্য ও দেশ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োগ করেন।

অনেক রাজা-মহারাজা-শাহ-সুলতান-তেইশ বছরে গজিয়ে ওঠা নব্য পুঁজিপতির শক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উৎসের রহস্য ভেদ করে নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে লড়ে দু'শ ছিয়াত্তি দিনে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। চরম মূল্যের স্বাধীনতা। দু'লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত, ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত স্বাধীনতা। হাজার বছরের বাঙালির স্বপ্ন, বাঙালির শাশ্বত স্বপ্ন মদির, আলোয় রঙিন স্বাধীনতার এমনি দুর্মূল্য। আবহমান বাংলার সহস্রবর্ষের সাধনার ধন বা-পাক বেঙ্গল পিতা শেখ

মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে সোনার বাংলা গড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনে বাংলার সংশপ্তক অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবদীপ্ত বিজয় অনাগতকালের বাঙালি শ্রদ্ধা-গর্ব ও অহংকারে স্মরণ করবে। 'পাহাড় যারে আড়াল করে সাগর যার দোলায় পাটি'র নদী মেঘলা বাংলার মাটির খাঁটি সন্তান গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কোটালিপাড়ার মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত। গোপালগঞ্জ ও কোটালিপাড়ার এই দুই মহতী সন্তানের কীর্তিগাথার স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় তুলে ধরতে এই প্রকাশনার সাফল্য কামনা করি। হেমায়েত প্রভাবিত এলাকার মুক্তিযোদ্ধা, মা-বোন আম জনতা এই প্রকাশনায় আয়নার মত স্বচ্ছ বেদনার শোকাশ্রুর উচ্ছ্বাসের আনন্দে আপন সন্তানদের আত্মত্যাগ ও শৌর্যবীর্যের ঐশ্বর্যের গরিমায় অভিভূত হবেন।

"হে জাতি তোমার ইতিহাসের পাতা লিখি দিলাম আল্পনা
আমার ছবি বলবে কথা যখন আমি থাকবো না।"

এ মহতী মুক্তিযোদ্ধা নারীর কর্মোদ্যোগে অন্যরা উদ্দীপিত হোন। সোনার বাংলার সোনার সন্তানে ভরে উঠুক তাহমিনার মত মেয়েতে। এমন যোদ্ধা দম্পতি ও পরিবারের কল্যাণে ধন্য হেমায়েত বাহিনী। সোহরাব-রুস্তমের ঐতিহাসিক গাথায় এমনি এক তাহমিনার কাহিনী বিধৃত আছে। অনাগত ভবিষ্যতই কইবে এমন বীর নারীর বীরত্বের কথা।

[তাহমিনা পিরিচিতিঃ মিসেস তাহমিনা খানম, স্বামী: শেখ মোঃ আমীর আলী, গ্রাম ও ডাকঘর: কুশলা, থানা: কোটালিপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ। হেমায়েত বাহিনীনর মুক্তি নং ১৯১। বর্তমান ঠিকানা ঃ সেকশন-৭, লেন-৩, ব্লক-২, বাড়ি-৩১১/৩১২ পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬]।

মুক্তিযোদ্ধা মনা রানী ব্যানার্জি

ভূমিকা ঃ বহুতর বীরাঙ্গনার বীরত্বের শ্রম ধন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ। সশস্ত্র ও নিরস্ত্র সেবিকার স্পর্শে উজ্জীবিত নারীর কল্যাণ হাত। এমনি এক স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা বাঙালি নারী বরিশালের মনা রানী ব্যানার্জি।

পরিচয় ঃ মনা রানী ব্যানার্জি, স্বামী ঃ ডা: বি কে রঞ্জিত, সুজিত এন্ড ব্রাদার্স, গ্রাম ও পোস্টঃ পয়সার হাট, ইউনিয়নঃ বাকাল, থানা ঃ আগৈল ঝাড়া, জেলাঃ বরিশাল।

বয়স- চুয়ান্ন, ধর্ম- খ্রিস্টান, জন্মসূত্রে বাংলাদেশী। শিক্ষা ঃ দশম মান পর্যন্ত। পেশাঃ প্রাইভেট পল্লি চিকিৎসক, ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী।

প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা-মিশনারি হাসপাতালে সেবিকা প্রশিক্ষণ।

বাবার পাড় মিশনারি ক্লিনিকে কয়েক বছর কাজ করেন। পাক আমলে বাকাল ইউনিয়নে মহিলা সদস্যার কর্ম উদ্দীপনায় পরিবার পরিকল্পনায় মাঠ কর্মীর কাজে প্রশিক্ষণ রয়েছে। তাঁর গ্রাম থেকে তখনকার থানা সদর গৌরনদীর দূরত্ব চৌদ্দ মাইল।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চরণ যুগল ভরসায় থানা সদরে যাতায়াত করতে হতো। আজ যানবাহনের উন্নতি হয়েছে। ঘরের কাছে নতুন থানা আগৈল ঝাড়া। স্বাধীন বাংলার প্রশাসনিক ও উন্নত যোগাযোগের যুগে পাক পরাধীন আমলের কথায় অনেকের বিশ্বাস হতে চায় না। জীবনের কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফসল ধন্য মুক্তিযুদ্ধ।

যুদ্ধ সংগঠন ঃ নিজের বাড়ির আশপাশই তাঁর রণাংগন। হেমায়েত বাহিনীর পয়সার হাটের ডে কোয়ার্টারের হাসপাতাল তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সাধনার ফসল। হেমায়েত-এর হাতে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি নারী যোদ্ধা। একাধিক যুদ্ধে তাঁর সাহসী ভূমিকা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনই মুক্তিযোদ্ধা, ডাক্তার-সেবিকার দম্পতি যুগলের মিল মুক্তিযুদ্ধে কমই মিলবে। হেমায়েত বাহিনীতে যুদ্ধ, সেবা ও সাংগঠনিক কাজের সাফল্যে এই সাহসিনী মহিলার ভূমিকা অতুলনীয়। এ দেশে খ্রিস্টান মিশনারি মিশনের সেবা-শিক্ষার মহতী সাফল্যের এক উজ্জ্বল উপমা মনা রানী।

আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মনা রানী ব্যানার্জি পরিবার ঃ পাঁচ সন্তানের প্রতিষ্ঠিত পরিবার। বড় ছেলে শ্যামল ব্যানার্জি। বরিশাল এস.ডি.এ. মিশনে কর্মরত। তিন মেয়ে এক ছেলের সংসার। বড় মেয়ে কবিতা ব্যানার্জি ঢাকার মোহাম্মদপুর নূরজাহান রোড ইউ-২৪, নিজ বাড়িতে থাকেন। তাঁর দুই ছেলে এক মেয়ের সংসার। মেজো মেয়ে মমতা ব্যানার্জি স্টাফ নার্স মানিকগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে চাকরি। এক ছেলের জননী। ছোট মেয়ে অজানা ব্যানার্জি ওয়ার্লড ভিশন অব বাংলাদেশ বরিশাল-এ সেবা কাজে নিয়োজিত। দুই জনের পরিবারে ধন্য। ছোট ছেলে অজয় ব্যানার্জি ওয়ার্লড ভিশন বরিশাল সংস্থায় প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োজিত। এক ছেলে এক মেয়ের তাঁদের সুখী পরিবার।

বেতন কম, আর্থিক অনটনে মনা রানী ও তাঁর পরিবারের অনেক স্বপ্নই কেবল স্বপ্ন থেকে গেছে। আর্ত-মানবতার সেবায় পিছনে পড়ে থাকার বেদনা। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে হারিয়ে যাওয়া সম্পদের পূরণ হয়নি। পাষাণে বুক বেঁধে মা মনা রানী বড় ছেলে শ্যামল ব্যানার্জিকে ভারতে পাঠান ১৯৭১ এ। বাকি পুরো পরিবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। সকল দৈন্যের মাঝেও আজ সান্ত্বনা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক। মনে বড় দুঃখ স্বাধীন দেশে আজ কেন এতো অভাবের জ্বালা।

সমাজ সেবার সংগ্রামী জীবনঃ মুক্তিযুদ্ধ শেষে নিজেদের হাতে গড়া হাসপাতাল থেকে মনা রানীদের মুক্তি। চরকায় তেল দেয়া যাদের স্বভাব তেল তারা দিবেই। সে নিজের আর পরের, পয়সার আর বিনে পয়সার যারই হোক। বরিশাল জেলা প্রধান মহিলা বিষয়ক সংগঠনের কাজে লাগেন মনা রানী। আগৈল ঝাড়া থানার বাকাল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান প্রার্থীনী পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেল। পরবর্তী কাজ আগৈল ঝাড়া থানা মহিলা সদস্যার কাজ। আজ তিনি থানা পর্যায়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বোর্ডের সদস্যা। আর্ত মানবতার সেবায় তিনি জীবনে তৃপ্তি খুঁজে নিয়েছেন।

শিক্ষা বিস্তারে মুক্তি নারী : শিশু শিক্ষার অবৈতনিক বেসরকারি স্কুল চালু এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারি মাত্র বিশজন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে শিশু শিক্ষা সদন স্কুলের যাত্রা শুরু। পাঁচটি বছর নিজ সঞ্চয় ও পরিশ্রমে চলে স্কুল। কলেবর বৃদ্ধি ও আর্থিক অনটনে স্কুল চালাতে অসুবিধা হয়। ১৯৯০ সালে ওয়ার্লড ভিশন অব বাংলাদেশ নামের আন্তর্জাতিক সংস্থায় স্কুলের দায়িত্ব অর্পণ করেন তিনি। সে আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল কার্যক্রম স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। মুক্তি নারীর শিক্ষা বিস্তারেই আনন্দ। কারণ তার একদিনের অবৈতনিক শিক্ষা শিশু সদন আজ শাখা প্রশাখার ফল-ফুলে মঞ্জুরিত। স্কুল একটির স্থলে এখন তিনটি :

ক। শিশু শিক্ষা সদন - ১; খ। শিশু শিক্ষা সদন - ২; গ। শিশু শিক্ষা সদন - ৩।

স্কুলগুলির পরিচালনার সেবা কর্মে ম্যানেজারসহ চৌদ্দ জন স্টাফ। তিনটি স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা ১৯৯৩ সালে ছিলো চারশ পঞ্চাশ। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস অনুসারে স্কুলের শিক্ষা দান তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। পরবর্তীতে ছাত্রদের সরকারি স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ত্রাণ সংস্থার স্কুল পাস ছাত্রদের পরবর্তী শিক্ষার দায়দায়িত্ব ত্রাণ সংস্থার নিজেদের। বছরে এক প্রস্থ ড্রেস খাতাপত্র অবৈতনিক চিকিৎসা, স্কুল ফি জাতীয় সকল দায়ভার বহন করে ওয়ার্লড ভিশন অব বাংলাদেশ। এই প্রজেক্টের অধীনে গ্রাম সংখ্যা নয়টি। এককালে শিক্ষার লেশমাত্র বিবর্জিত ৯টি গ্রামে পরিবার সংখ্যা পাঁচ হাজার। অশিক্ষা-কুশিক্ষা-কুসংস্কার দারিদ্র্য পীড়িত অজ পল্লিতে আজ আলো ফুটছে। মাথা গোঁজার ঠাঁইশূন্য মানুষের বাসস্থানের সুযোগ হচ্ছে। ১৯৯২ সালে অত্যন্ত গরিব শিক্ষার্থী গার্জিয়ানের ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। বিশ হাজার টাকা মূল্যের অষ্টাশিটি টিনের ঘরের সুবন্দোবস্ত করে এরা। আজ শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত ফুটন্ত বিকশিত ছোট ছোট বাচ্চাদের মাঝে সোনার বাংলা গড়া স্বপ্ন দেখেন মুক্তি নারী। 'তাদের হাসিতে আমার মন আনন্দে ভরে উঠে।'

আর্তের সেবায় নিঃস্বার্থ প্রাণ : শহরে বিলাস বহুল সুখী জীবনে সারাটি জীবন কাটাতে পারতেন এই মুক্তি নারী। অজ পাড়াগাঁয়ে আর্ত মানবতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। মানব সেবায় তাঁর জীবন ধন্য। যেখানে দুঃখ-দুর্দশার ডাক পড়েছে সেখানেই দৌড়ে ছুটেছেন তিনি। দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী যোগ্যতার আর্ত মানবতার সেবা কর্মীর অভাবে নিজকে বড় অসহায় ও ক্লান্ত মনে হয়। মনে আশার আলো ভগ্ন ঢাকে জয় বাদ্য বাজিয়ে যাবো যথাসাধ্য। জীবনের অন্তিম লগনে এসে পিছন ফেরার ক্লান্তি নেই। সারাটি জীবন নিভৃত পল্লি মহিলাদের সংগঠন উজ্জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের কথা শুনেছেন সুখে-দুঃখে একাত্ম হয়েছেন। বিপর্যয়ের দুর্দিনে তাদের সান্ত্বনার আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন। আজো বয়স তাঁকে অবশ করতে পারেনি। মানব কুলের আশীর্বাদধন্য ভালোবাসার স্পৃহাই তাঁকে কর্ম চঞ্চল সচল রেখেছে। এতো কর্ম ক্লান্তির মাঝেও নিজেকে অকর্মার হাড়ি ভাবনায় দুঃখ হয়। মানব সেবার আশানুরূপ সাফল্যের অভাবে নিজের কাছে নিজের সন্তুষ্টি নেই। মানবতার সেবাই

বিশুর সেবা। কর্মই ধর্ম। চলার গতিই জীবন। স্থিতিতে নিশ্চিত মরণ। তাই আমৃত্যু মানব সেবার কর্মকেই ধর্ম করে নেন মুক্তি নারী।

মুক্তি যুদ্ধই মুক্তি নারীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সেবাধন্য মানুষের আশীর্বাদের মধ্যে তিনি খুঁজে নেন স্রষ্টার নৈকট্য। জাগ্রত ভগবানকে সামনে জেনে সুযোগ হাতে পেয়েও ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। ছোট বড় কোনো কাজকেই জীবনে অবহেলা করেন নেই। এ দেশের আর্ত মানুষের দুয়ারে মুক্তি নারীর হৃদয় আর্তির কামনা মানব সেবার সুখ শান্তির প্রশান্তিতে স্বাধীন বাংলায় শেষ শয্যা কামনা। যে মাটির স্পর্শ লাভে ধন্য লাখ মুক্তি বীর শহিদ। জয়তু মুক্তি নারী।

পয়সার হাট মুক্তি-হাসপাতাল

মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উপায়ে লুকিয়ে-ছুপিয়ে কিছু কিছু চিকিৎসা করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এ-ছাড়া রিস্কও খুব বেশি। ঔষধ, পথ্য, ডাক্তার এবং চিকিৎসার অভাবে অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবী মারা যায়। এমতাবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তি-দরদি স্বেচ্ছাসেবীদের সুচিকিৎসার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন হয় নিজস্ব হাসপাতালের।

হেমায়েত বাহিনী প্রধান হেমায়েতের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় পয়সারহাট মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতাল। যুদ্ধকালে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে যোগাযোগে বেশ অসুবিধা ও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ছিলো। বিশেষভাবে বর্ডারের সঙ্গে সংযোগবিহীন ফরিদপুর ও বরিশালের মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার খুবই অসুবিধা হচ্ছিলো। অন্যান্য সেক্টরের মতো এ-দুটি এলাকার আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ভারতে পাঠানো যাচ্ছিলো না। এমতাবস্থায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন হেমায়েত উদ্দিন।

হেমায়েতের অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হন মনা রানী ব্যানার্জি ও তাঁর স্বামী বি কে রঞ্জিত। আগস্ট ১৯৭১-এ পাক-চক্ষুর আড়ালে থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় পয়সারহাট মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতাল। সংশ্লিষ্টরা জীবন বাজি রেখে গোপনে প্রতিষ্ঠা করেন এই হাসপাতাল। আহতদের চিকিৎসায় যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের ক'জনের নাম নিম্নরূপঃ

১. ডাক্তার যোগেশ্বর বিশ্বাস, বাগধা, বর্তমানে মৃত।
২. ডাক্তার কেরামত আলি, ধানডোবা, পরবর্তীকালে পিজি হাসপাতালের ডাক্তার।
৩. ডাক্তার গফুর মিয়া, বাগধা।
৪. ডাক্তার শামসুদ্দিন বাহাদুর, পয়সারহাট, বর্তমানে মৃত।
৫. ফার্মাসিস্ট আবদুল খালেক শিকদার, পয়সারহাট।
৬. ফার্মাসিস্ট শামসুদ্দিন বিশ্বাস, মধুর নাগরা।

৭. সমাজকর্মী আবদুল খালেক খান, পয়সারহাট, বর্তমানে মৃত।
৮. সমাজকর্মী শহিদউল্লাহ তালুকদার, বাগধা, পরবর্তীতে ইউনিয়নবোর্ড চেয়ারম্যান।
৯. সমাজকর্মী আবদুল খালেক বেপারি, পয়সারহাট।
১০. সমাজকর্মী নবাব আলি চৌধুরী, আলবলিয়া, ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বাগধা।
১১. সমাজকর্মী আবুল কাসেম হাওলাদার।
১২. সমাজকর্মী মধু মীর, গৌরনদী নাঠেই।
১৩. সমাজকর্মী মোজাম মিয়া, চান্দবাড়ি।
১৪. ম্যাট্রন সুপ্রিয়া বিশ্বাস, রাহুতপাড়া, [বরিশাল সদর হাসপাতালের ম্যাট্রনরূপে আইভি সেলাইন ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ওষুধপত্র পাঠাতেন। [আগস্ট ১৯৯৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।]
১৫. সেবিকা মঞ্জু রানী রায়, রঘুনন্দনপুর, মনা রানীর বোন, ক্যাথলিক সিডি প্রজেক্ট ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থায় কর্মরত।
১৬. ডা. ফিলিপস্ (খুলনা)। মেয়েদের ফার্স্ট এইড শিক্ষাসহ যোদ্ধাদের সেবা প্রদানে তিনি যোদ্ধা জনতার আশীর্বাদ-ধন্য।
১৭. নার্স ভালরানী বাড়ৈ। মহিলাদের ফার্স্ট এইড প্রশিক্ষণ প্রদান। যোদ্ধাদের সেবা প্রদানে রোগীর আনন্দাশ্রুর ভালবাসায় তিনি অভিসিক্ত।

পয়সারহাট মুক্তি হাসপাতালে বিভিন্ন টিমে মুক্তিযোদ্ধারা কাজ করে যেতো। সর্বক্ষণ তারা হাসপাতাল পাহারা দিতো। মুক্তিযোদ্ধারা আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে পাঠাতো। মুক্তি টিমের ডাক্তারদের অধীনে মনা রানী ও তাঁর বোন মঞ্জু রানী মানব সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। যুদ্ধাহত ও গুলিবিদ্ধ জটিল রোগীদের এখানে চিকিৎসা চলতো। নিম্নে মুক্তি হাসপাতালের আওতায় কয়েকজন সাহসী টিম কমান্ডার-এর নাম উল্লিখিত হলোঃ

কমান্ডার হেমায়েত- হেমায়েত বাহিনী প্রধান
ক্যাপ্টেন ওমর আলি
ক্যাপ্টেন বাবুল
কমান্ডার আবদুল আজিজ
কমান্ডার আবদুল খালেক পাইক
মুজিববাহিনী প্রধান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ

সে-দিনের সাহসী দামাল ছেলেরা জীবন-মৃত্যুর পরোয়া না করে যেভাবে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের ভবিষ্যত, তাঁদের শৌর্যের স্মরণে আজো হতবাক না হয়ে উপায় নেই। তেমনি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কয়েকজন মৃত্যুঞ্জয়ী ও হতাহত বীরের নাম নিম্নরূপঃ

ল্যান্স নায়েক কাঞ্চন সিকদার
কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন, পরবর্তীকালে বীর বিক্রম

মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর হোসেন
মুক্তিযোদ্ধা হাশেম আলি
মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন তালুকদার
মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম
মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুল হক
মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সাত্তার শাহ
মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত শাহ
মুক্তিযোদ্ধা আলিউজ্জামান
মুক্তিযোদ্ধা তাহের আলি গোলদার
মুক্তিযোদ্ধা মুহিবুল হক হাওলাদার
মুক্তিযোদ্ধা সেন্টু মীর।

এমনি সব নাম জানা এবং না জানা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অক্ষয় স্মৃতির স্বাক্ষরবাহী এই মুক্তি হাসপাতাল। পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অসীম ধৈর্য-সহ্য-সাহস এবং বীরত্বের অতি উত্তম নিদর্শনের নজির স্থাপন করে কখনো সজ্ঞান অথবা কখনো অজ্ঞান অবস্থায় চিকিৎসার জন্য এসেছেন এই হাসপাতালে।তাঁদের দেখে ডাক্তার বিস্মিত হতেন। স্বাভাবিক অবস্থায় এমন রোগী বেঁচে থাকার কথা নয়। দেশপ্রেম আর যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার ঐকান্তিক মনোবল ছাড়া এমন মারাত্মক আহতরা বেঁচে থাকা অভাবিত। অসম্ভবকে সম্ভব করার আরেক নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। এসব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় মনা রানী ও তাঁর স্বামী বি কে রঞ্জিত, বোন মঞ্জু রানী নিজেদের উজাড় করে বিলিয়েছেন। তাঁরা নমস্য। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যাঁরা কোটালীপাড়ার, তাঁদের নাম মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে স্মরণীয় হয়ে আছে। এঁদের অনেকে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতায় কায়ক্লেশে বেঁচে আছেন। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিধন্য অনেকে তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত অবস্থায় এখনো জীবিত। কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের এই দুই-আড়াই যুগ পরেও হাসপাতালে এসে চিকিৎসক-কর্মী-সেবিকাদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতিভালোবাসা জানিয়ে যান।

সে দিনের শেল-গুলিবিদ্ধ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের করুণ আর্তনাদের দুঃখ-কষ্টের হৃদয় বিদারক দৃশ্য আজও উপস্থিত জনতা, ডাক্তার ও সেবিকাদের স্মৃতিতে অম্লান। চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে আর্ত-মানবতার নামে স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষার সুযোগ পেয়ে মুক্তি হাসপাতালের স্টাফরা ধন্য। একে একে নিভিছে দেউটির মতো, দুর্দিনে এই মুক্তি হাসপাতালে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন, সেই মানুষগুলি ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছেন। বরিশাল শেরে বাংলা হাসপাতালের মাট্রেন সুপ্রিয়া বিশ্বাস নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবন রক্ষাকারী মূল্যবান ঔষধ পাঠাতেন মুক্তি-হাসপাতালে। মনা রানী ব্যানার্জির মতো বহুতর মানুষের মাধ্যমে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বলে-কয়েই সুপ্রিয়াদের থেকে ঔষধ আনা হতো। অস্ত্র হাতে না নিয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন রক্ষায় কি করা যায় তারই বিশ্বস্ত ও উজ্জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সুপ্রিয়া। অবসর প্রাপ্ত বয়স্কা মাট্রেন

গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি হলেন গৈলা স্মৃতি শহিদ হাসপাতালে। আজীবন যিনি মানুষের সেবা করলেন, আজ তিনিই অন্যের সেবা নিতে হাসপাতালে ভর্তি। গৈলা স্মৃতি শহিদ হাসপাতালের ডাক্তার বন্ধুরা যথেষ্ট চেষ্টা করেন আজন্ম মানবসেবী ম্যাট্রনকে বাঁচাতে। কিন্তু জাগতিক নিয়মেই ১৯৯৩-এর আগস্টে তাঁর স্বামী অশ্রু কুমার বিশ্বাসকে অশ্রু সাগরে ভাসিয়ে নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। আহত মুক্তি সেবায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান এ-দেশ ও জাতি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করবে।

মুক্তি হাসপাতালের সেবিকাদের পাক আর্মির হাতে নির্যাতিত হওয়ার জীবন্ত প্রমাণ রয়েছে। মনা রানী ব্যানার্জি দু'দুবার পাক মিলিটারির হাতে পাকড়াও হন। প্রথম বার গৌরনদীতে ধরা পড়লে প্রাণে রক্ষা পান একজন রিক্সাচালকের সৌজন্যে। মুক্তি-সেবিকা আরোহিনীকে বাঁচাতে পাক মিলিটারি হাতে দুর্দান্ত মাইরে রক্ষক রিক্সাচালক রিক্সাশুদ্ধ ছাতুগুঁড়া। দ্বিতীয় বার পাক আর্মির হাতে তিনি ধৃত হন পয়সারহাটে। মরহুম ডাক্তার শামসুদ্দিন বাহাদুর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই মুক্তি-সেবিকার প্রাণ বাঁচান। কর্তব্যের খাতিরে মুক্তিযোদ্ধা নারী তখন সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতেন। দেশ স্বাধীনের একাগ্রতায় দায়িত্ববোধ সামনে নিয়ে ছুটতো মুক্তি পাগল যোদ্ধা নরনারী। তাঁদের আত্মচিন্তা, কিংবা পেছনে তাকাবার সময় ছিলো না। অগণিত মানুষের স্নেহ ভালোবাসা ধন্য এই মুক্তি-সেবিকার দুঃখের প্রতিদানে তাঁদের কি দিতে পেরেছি আমরা?

এমনি মুক্তি-হাসপাতাল ও নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু ছিলো কোটালিপাড়া থানার জহরের কান্দি হাই স্কুলে। ১৪ মে, ১৯৭১ এর উদ্বোধন করা হয়। ৫ জন নিয়মিত ডাক্তার সেখানে নার্সিং ও চিকিৎসা কার্যক্রমে নিয়োজিত ছিলেন।

স্বাধীন দেশে মুক্তি হাসপাতাল সমাচার

১৯ মার্চ, ১৯৭২ ঃ 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত খবরের অনুলিপি ঃ

পয়সার হাট মুক্তিবাহিনীর জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল। (সংবাদ দাতা প্রেরিত)।

গৌর নদীঃ বরিশালের একটি গ্রাম পয়সার হাট। ঐ গ্রামের মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সংগ্রামী প্রেরণা স্বাধীনতা আন্দোলনে জুগিয়েছিল দুর্বার শক্তি। অস্ত্র হাতে নয় মানবতার সেবায় তারা হাত বাড়িয়েছিল।

আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ১৯৭১ সনের আগস্ট মাসে পয়সার হাটে মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। ডাঃ বি. কে. রঞ্জিত, শ্রী মনা রানী ব্যানার্জি ও তাঁর বোন মঞ্জু রানী রায় সর্ব প্রথম অনেক ঝুঁকি নিয়ে এই হাসপাতালের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে এই হাসপাতালে ৪ ডাক্তার ৪ সেবিকা ও দুইজন কম্পাউন্ডার সেবা

কার্যে নিয়োজিত আছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাকে গড়ে তুলতে এই হাসপাতালও দেশবাসীর সেবা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করে জনসাধারণের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থার জন্য এই হাসপাতালে কর্মচারীদের বেতন দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বহু অসুস্থ রোগীও অসুবিধায় পড়ছে। স্থানীয় লোকের ধারণা, এই জাতীয় মহৎ কার্যে সরকার এগিয়ে এলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

স্বাধীন দেশে মুক্তিবাহিনীর হাসপাতালটি, পয়সারহাট ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে রূপ নিলে তার সকল দায়দায়িত্বের ভার সরকার বহন করেন। যুদ্ধক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধাদের এতে অপার আনন্দ। কিন্তু হায় দুর্ভাগা দেশ, প্রাক্তনদের কে রাখে স্মরণে। মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল নামের ছোঁয়া পর্যন্ত সেখান থেকে নিশ্চিহ্ন। জীবন ঝুঁকিতে যে-সব ডাক্তার, সেবিকা মুক্তিবাহিনী হাসপাতাল গড়েন তাঁদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। সে-সব অর্বাচীন ফালতুরা সরকারি কাজে নেই। প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ বি কে রঞ্জিত, তাঁর স্ত্রী ধাত্রী-সেবিকা মনা রানী ও শ্যালিকা মঞ্জু রানীর জন্য আধুনিক হাসপাতালে কাজের দ্বার রুদ্ধ। নতুন দিনে ডাক্তার, নার্স, ধাত্রী, আয়া সবই আছেন। নেই কেবল প্রতিষ্ঠাতা বোকা ছোট লোকেরা।

মোমেলা খাতুন

মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মেয়ে মোমেলা খাতুন। তাঁর ঠিকানা ঃ

মোমেলা খাতুন, স্বামী ঃ বাদশা মিয়া তালুকদার, গ্রাম ঃ সোনার গেতি, থানা ঃ কোটালি পাড়া, জেলা ঃ গোপালগঞ্জ (প্রাক্তন বৃহত্তর জেলা-ফরিদপুর)। তাঁর স্বামী ও পরিবারের প্রতিটি সদস্য মুক্তিযোদ্ধা। হেমায়েত বাহিনীর সূচনা থেকে যুদ্ধ ও সাংগঠনিক প্রতিভার বিরল গুণে গুণান্বিতা মোমেলা। তাঁর অস্ত্র চালনার সূক্ষ্ম নিপুণতা, সাহস ও বীরত্বে বহু মুক্তিসেনাই হার মেনেছেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি অন্যদের অনুকরণীয়। সশস্ত্র সম্মুখ রণে ভয়ভীতি কি তিনি জানতেন না। বিভিন্ন রণাঙ্গনে সক্রিয় যুদ্ধে অকুতোভয় মহিলা শত্রুর বুকে কাঁপন ধরাতেন। এককালের এই বীরাঙ্গনা সাহসিনী মহিলা আজ ছয় সন্তানের জননী। অভাবের সাথে স্বভাবতই লড়াইতে অতীত স্মৃতির চারণে আজ তাঁর দীর্ঘশ্বাস। হায় স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের মুক্তি মাতা!

পুষ্প রানী হালদার

১৯৭১ সালের এস এস সি'র ছাত্রী। পাক-বাহিনীর প্রতারণার শিকার হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যান। তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী রমেশ চন্দ্র বিশ্বাসও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। জাতিতে সিডিউল কাস্ট হিন্দু হলেও সাহসে তাঁর সাথে টেক্কায় অনেকেই খাবি খেয়েছেন। সেবিকা প্রশিক্ষণের সাথে স্থানীয় প্রশিক্ষণ সেন্টারে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন তিনি। বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর সাহস ও যুদ্ধকৌশলের স্বাক্ষর রাখেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিধন্যা নায়িকা আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। কোমলমতি বাঙালি শিশুদের শোনান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। চার সন্তানের জননী পুষ্পরানী পুষ্পের মতোই এদেশকে বিকশিত করুন। তাঁরই আলেখ্যে মুক্তিযুদ্ধের একটি গোপনীয় যাচাই ফরমের নমুনা দেয়া হলো ঃ

"গোপনীয়"

দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

মুক্তিযোদ্ধা বিবরণ

১.	নাম	ঃ পুষ্প রানী হালদার (বিশ্বাস)
২.	পিতার নাম	ঃ রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস
৩.	বর্তমান ঠিকানা	ঃ আগরকান্দা, পো: কোটালিপাড়া, উপজেলা: কোটালিপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ
৪.	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ - ঐ -
৫.	জন্ম তারিখ/ বয়স	ঃ ১০/১/১৯৫৮
৬.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ এস এস সি পাশ
৭.	সেক্টর ও সাব-সেক্টরের নাম ও কমান্ডারের নাম	ঃ ৯ / ৮ নম্বর সেক্টর, মেজর এম. এ. জলিল
৮.	কোথায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন (ভারত/বাংলাদেশ)	ঃ বাংলাদেশ
৯.	ট্রেনিং সেন্টারের নাম ও ট্রেনিং-এর মেয়াদ	ঃ কোটালিপাড়া জহরের কান্দি ট্রেনিং সেন্টারে মেডিক্যাল সেবিকা হিসাবে কাজ করিয়াছেন এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
১০.	এফ এফ নং	ঃ ২১৭৬
১১.	যুদ্ধকালীন যে কমান্ডারের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছেন তাহার নাম ও যেখানে যেখানে অংশগ্রহণ করিয়াছেন সেইসব স্থানের নাম ও তারিখ	ঃ কোটালিপাড়া হেমায়েত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হেমায়েতউদ্দিন বি বি, মেডিক্যাল সেবিকা

১২.	প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় কমিটির পূরণকৃত ফরম নং	ঃ - ৫ - ০১৬৫৬৩
১৩.	বর্তমানে কি করিতেছেন এবং কি করিতে ইচ্ছুক	ঃ ভালো চাকরি করতে ইচ্ছুক। বর্তমানে প্রাইমারি শিক্ষয়িত্রী
১৪.	পারিবারিক বা নিজস্ব ক্ষয়ক্ষতি	৮০,০০০.০০ টাকা।
১৫.	অন্য যে কোনো সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি	সেবিকার কাজের মধ্য দিয়া সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

অ

অঙ্গীকারপত্র

আমি পুষ্পরানী হালদার পিতা সং রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, অত্র ফরমের উপরে লিখিত বিবরণাদি যাহা আমা কর্তৃক লিখিত/বর্ণিত হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য। উপরে উল্লিখিত তথ্যাদি [যদি] ভূয়া বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

স্বাক্ষর নাম ও ঠিকানা পুষ্প রানী হালদার

১। ------------ ফেরধরা, কোয়াল পাড়া, গোপালগঞ্জ

২। ------------ ফেরধরা, কোয়াল পাড়া, গোপালগঞ্জ

আবেদনকারীর উপরে লিখিত বিবরণাদি সম্পূর্ণ সত্য এবং সে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। যদি উহা ভূয়া বা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে উহার জন্য আমি দায়ী থাকিবো। এমতাবস্থায় আমার বিরুদ্ধে সংসদের আইনানুগ যে-কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে।

আঃ হাকিম বিশ্বাস	ইউনিট কমান্ডারের নাম বা পদবি
উপজেলা কমান্ডারের নাম/ পদবি	সিলমোহর ও স্বাক্ষর
	গোপালগঞ্জ উপজেলা ইউনিট আহবায়ক/কমান্ডার
এবং সিলমোহরসহ স্বাক্ষর	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুরানী হালদার

পরিচয় ঃ জন্ম ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ। অতি শৈশবে পিতৃহীন। আগে পাছে যার কেউ নেই ভগবান তার সহায়। গরিব মায়ের অনেক কষ্টে-সৃষ্টে বুকে-পিঠে গড়া মেয়ে মঞ্জু। দোরে দোরে হাত পেতে মা তাঁর মেয়েকে মানুষ করেন। ম্যাট্রিক পাস করে নার্সিং প্রশিক্ষণ নেন মঞ্জু রানী। এই মহতী নারীযোদ্ধার ঠিকানা ঃ

নাম ঃ মঞ্জু রানী হালদার (শিক্ষয়িত্রী), প্রযত্নে - পিটার হালদার, গ্রাম ঃ রাজিহার, থানা ঃ গৌরনদী, জেলা ঃ বরিশাল

মুক্তিযোদ্ধার নার্সিং হোম ঃ বরিশাল জেলার তাশকোড় গ্রামে অবস্থিত এই মুক্তি হাসপাতাল। পরিত্যক্ত হিন্দু অধিকারী বাড়িতে হাসপাতালের অবস্থান। অত্যাচার ও প্রাণ ভয়ে বাড়ির সবাই পালিয়ে ভারতে শরণার্থী হয়। পরিত্যক্ত বাড়ি বিধায় সেটি শত্রুর শ্যেন দৃষ্টির বাইরে। মুক্তি হাসপাতালের আশপাশেই চলেছে দু'দলের প্রচণ্ড যুদ্ধ। পাক-মুক্তি ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার যুদ্ধ। তারই মাঝে মুক্তি হাসপাতালে সেবিকার কাজে নিয়োজিত মঞ্জু রানী।

অনেক বিখ্যাত-অখ্যাত যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিকের পদভারে ধন্য ছোট এই মুক্তি হাসপাতাল। দূরদূরান্তের ডাক্তারগণ সপ্তাহে বা ১০/১২ দিনে একবার আসতেন। জরুরি প্রয়োজনে যেন তাঁরা মাটি ফুঁড়ে তাৎক্ষণিক উদয় হতেন। রোগীর ঔষধ, পথ্য, চিকিৎসা, ব্যান্ডেজের যা যা করতে হবে সেবিকা মঞ্জুকে ডাক্তারগণ তার নির্দেশ দিয়ে যেতেন। রোগীর ড্রেসিং, ঔষধ সেবন, খাবার-দাবার পরিবেশনে উদয়াস্ত খাটতেন তিনি। নিষ্প্রদীপ প্রত্যন্ত অজ পাড়া গাঁয়ে রোগীর ঘর থেকে ঘর, বেড থেকে বেডে মোমবাতি/কুপি/হ্যারিকেন হাতে ছুটতেন মঞ্জু। ঔষধ-পথ্যের আহামরি তেমন বিশেষ প্রাচুর্য ছিলোনা। শত্রুর ভয়ে কুপি জ্বালানোও অনেক সময় বারণ ছিলো। অন্ধকারে আন্দাজে মায়াহরিণীর মতন ছুটতেন সেবিকা। পায়ের আওয়াজে রোগীর চাঞ্চল্য এই বুঝি এলো! বিছানার পরশে, মাথায় সেবিকা হাতের ছোঁয়ায় রোগী আশার আলো এবং বাঁচার তাগিদ পেতেন। সব না পাওয়ার মাঝে নিঃস্বার্থ সেবা ও প্রেম-ভালোবাসার ডালিতে হাসিমুখে রোগীর রোগ সজ্জায় হাজির সেবিকা। দুর্যোগের কাল রাতের দিনগুলিতে আহত মুক্তিদের চোখে মা মঞ্জু রানী বাঙালি 'লেডি ইন দ্য ল্যাম্প ফ্লোরিডা নাইটিংগেল'-এর মতোই মঙ্গল দাত্রীর পূজায় পূজিত ছিলেন।

আহত মুক্তিদের ক'জন ঃ অগণিত যুদ্ধাহত মুক্তির করুণ আর্তনাদে ভরপুর দূর পল্লির মুক্তি হাসপাতাল। বড় আশায় বুক বেঁধে অনেক অজ্ঞান, মুমূর্ষুকে হাসপাতালে এনেছেন তাঁদের যুদ্ধসঙ্গীরা। হতকে আহত জ্ঞানে আনেন হাসপাতালে। অনেকে আনার পথে, হাসপাতালে এসে আল্লাহ ও জয়বাংলার দীর্ঘশ্বাসে বাংলার মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁদের বড় আশা ছিলো ডাক্তার সেবিকার হাতে পড়লেই তাঁরা বেঁচে যাবেন। ভ্রমান্ধ মানব। দেশের তরে হারিয়ে গেলেন অনেক কৃতী সন্তান। সংজ্ঞাহীন সংজ্ঞা ফিরে পেতেই খোঁজ নেন যুদ্ধের সাথীদের, বাহিনী প্রধান

হেমায়েতের। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মুক্তি সহমর্মিতা। হতাহতের সঠিক হিসাব করবে অনাগত ইতিহাস। মাত্র তিন জনের স্মৃতি অনেকের মানস পর্দায় চিরঞ্জীব, ভাস্বর।

মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চনের পা উড়ে যায় যুদ্ধে। মুমূর্ষু রোগী এলেন হাসাপাতাল। সংজ্ঞা ফিরে পেতেই উঠে দাঁড়াতে চাইলেন। হুংকার ছেড়ে অস্ত্রের জন্যে হাত বাড়িয়ে পড়ে গেলেন। হায় মুক্তি! প্রাণের চেয়ে বড় তাঁদের দেশের সম্মান। সবার উপরে তাদের দেশপ্রেম। পরবর্তীতে বিদেশ থেকে নকল পা নিয়ে ফিরে আসেন। কিছুদিন তিনি ঢাকায় ছিলেন। এখনো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণের জন্য বেঁচে আছেন তিনি পংগু মুক্তিযোদ্ধা নামে।

উরুতে গুলিবিদ্ধ রকিব এলেন। ন্যায়ের ধ্বজাধারী ইসলামি ফৌজের অন্যায় সমরে তিনি আহত। পলায়নপর শত্রুকে সরে পড়ার সুযোগ দিতে তাঁর অস্ত্র সংবরণ। আর তারই সুযোগে তাঁর উরুতে বিদ্ধ হয় শত্রুর গুলি। ক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ আহত রকিবকে দেখলে উরু ভঙ্গ দুর্যোধনের স্মৃতিই মনে ভাসে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের যুদ্ধরীতি বহির্ভূত গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয়।

শত্রুর গুলিতে আহত হাসমত এলেন হাসপাতালে। সম্মুখ সমরে তিনি আহত। হামাগুড়িতে শত্রুকে ধাওয়া করেছেন। তাঁর সাহসের মুখে শত্রুকে পালাতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তিনি আসতে চাননি। চলৎ-শক্তিহীন মুক্তিকে জোর করে চ্যাংদোলায় করে আনা হয় মুক্তি হাসপাতালে।

এমনি কতোনা অখ্যাত-বিখ্যাত পুত্রদের চিকিৎসাধন্য মুক্তি হাসপাতাল। হাসপাতালের ঔষধ আসতো পয়সার হাট, গৌরনদী, আগৈল ঝাড়া, বরিশাল পেরে বাংলা হাসপাতালের ম্যাট্রন সুপ্রিয়া বিশ্বাস, ডাক্তার রঞ্জিত ব্যানার্জি ধরনের মহাত্মা ও বহুতর প্রতিষ্ঠান ও মানুষের সৌজন্যে। এসব দান ও চৌর্যকর্ম শত্রুর হাতে ধরা পড়লে মৃত্যু ছিলো অবধারিত। স্বাধীনতার নামে মানুষ হাসিমুখে সব বিপদ আপদ মেনে নিতো। হায় সে-সব মুক্তি হাসপাতালের ইতিহাস ও কর্ম-পদ্ধতি স্বাধীন দেশে গৃহীত হলে এদেশের মানুষের বিনা চিকিৎসায় মরতে হতো না।

পথের বন্ধু পথই মিলায় : গল্প সত্যি কথাকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষ গল্প করেও লেখে। কল্পনায় ছোঁয়াচের বিষাদ করুণ সত্যের নির্মম সত্য মঞ্জু রানীর সংসার।

মুক্তির আশ্রয়-বাড়ি সন্দেহে হিন্দু বাড়ি ঘেরাও করা হয়। রাজাকার-পাক আর্মির যৌথ অপারেশন। বাস্তবে পাক সান্ত্রাত রাজাকাররাই মুক্তি আস্তানার সন্ধান দিয়ে খানসেনাদের নিয়ে আসে। মুক্তি মুক্ত কাফের বাড়ি। বুত পরশতির (মূর্তি পূজার) মূর্তি দেখে তাঁরা নাখোশ। মুক্তি পাওয়া যায়নি তাতে কি? ইয়ে তো জরুর কাফের মোকান। কাফের খতমে পাপ নেই।

পুরুষদের ধরে এনে তাদের দ্বারা গাছ থেকে কচি ডাব নামিয়ে পাক খাসিরা তৃষ্ণা নিবারণ করে। গাছ থেকে পাড়ানো ঝুনা নারিকেল। বাড়ির মানুষদের মাধ্যমে নারিকেল -চিড়া-মুড়ি-গুড়-কলা-দুধে তাদের উদর পূর্তি হয় ফলারে। সবার সঙ্গে তাদের অবাক করা স্বভাবের ব্যবহার। পাকবাহিনী স্পিড বোটে করে আসে। বিদায়

লগ্নে তারা যেন আতিথ্যের বিদায় অভ্যর্থনার ছলে খাল পাড়ে রাখা স্পিড বোটের কাছে ডাকলো। সরল বিশ্বাসে রাজকীয় সশস্ত্র অতিথিদের বিদায়ে স্পিড বোট ঘাটের খাল পাড়ে দাঁড়ায় অনেক মানুষ। এদের নয়জনকে এক লাইনে দাঁড় করায় পাক আর্মি। তাদের সশস্ত্র মসকরায় নিহত হয় হতভাগ্য ৯ জন বাঙালি। তাদের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ-

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	বয়স	পরিণতি
১।	জয়নাল হালদার	হরিণাথ হালদার	৪০	গুলিতে তাৎক্ষণিক মৃত্যু
২।	সুমেল হালদার	হরিণাথ হালদার	৩৬	"
৩।	নরেন্দ্র নাথ হালদার	হরিণাথ হালদার	৩৫	"
৪।	টমাস হালদার	নরেন্দ্র নাথ হালদার	২৮	'
৫।	অগাসটিন হালদার	নরেন্দ্র নাথ হালদার	২৫	"
৬।	বিমল হালদার	ভোলা নাথ হালদার	৩৫	"
৭।	দানিয়েল হালদার	দেবেন্দ্র নাথ হালদার	২৭	"
৮।	সুকুমার হালদার	রাজেন্দ্র	৩৬	"
৯।	মুকুল হালদার	সুমেল	১৫	"

সবক'টার মরণের সওয়াবে ঝুলি ভরে পাক আর্মি বিদায় নেয়। হায়রে মানুষের প্রাণ। সহজে কি যায়! আহতদের মধ্যে দুই জীবন্মৃত মুমূর্ষুকে মিশনারিরা পরবর্তীতে বরিশাল হাসপাতালে নিয়ে যান। অলৌকিক ভাবেই আহত দু'জন রক্ষা পান। এমনি অগণিত আহতদের কুড়িয়ে নিয়ে মিশনারিরা চিকিৎসা করেন। মিশনারিদের কুড়িয়ে নেওয়া এমনি যমঘর উতরানো রক্ষা পাওয়া হতভাগ্যদের একজন মিস্টার পিটার হালদার। পিটারের বাবা, বড় দুভাই ও এক ছোট ভাই পাক হাতে নিখরচা হয়। স্বজন হারানো মহাশ্মশানে পিটার আশ্চর্য ধরনের পাগল প্রায় বদ্ধ উন্মাদ। অচল পিটারকে ফিট করতে যোগ্য ফিটার মিলে না। পিটারের করুণ কাহিনী জনশ্রুতির কল্প কথায় গল্পের মতন মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে।

মায়াময়ী মঞ্জু রানী পিটারের উদ্দেশ্যে সেবার হাত বাড়াতে চাইলেন। এক নিষ্প্রাণ তরুণ বাঙালি যুবকের করুণ কাহিনী নীরব অশ্রু ঝরায়। স্বত:স্ফূর্ত উদ্যোগে জীবন্মৃত আহতের সাথে যোগাযোগ সেবার করুণা প্রেমের যমুনায় ভেসে গেলো। মুক্তি সেবিকা পাক নির্যাতিতের পূজারিনীতে আবির্ভূত। পিটারের ভালো ফিটার হিসাবেই কাজে লাগলেন। সেবার করুণা প্রেম যমুনার পরিণতি প্রেমের পরিণয়ে। অর্থ বিত্তের উর্ধ্বে ভালোবাসার বিজয়। বিয়ের সময় পিটার নিতান্ত নিঃস্ব। তাঁর তখন বিষয় বৈভব কিছুই ছিলোনা। সেবিকার সেবার পরশ, মায়া মমতার মোহের স্মৃতি বিজড়িত বাসর ঘর। মঞ্জু রানীর মতো দরাজ দিলের হৃদয় উজাড় প্রেমিকার স্নেহ ভালোবাসা না পেলে পিটার হালদার বাঁচতেন কিনা সন্দেহ। দৈবক্রমে বেঁচে গেলেও বদ্ধ উন্মাদ মানুষটির সুস্থ হওয়া ছিলো বিতর্কিত। প্রেমপূজারিণীর বিজয়। স্বামী পিটার পেলেন নতুন জীবন।

পূর্বে উল্লিখিত নিহত-আহতদের নয়জনের সবাই মঞ্জু রানীর শ্বশুরের আপনজন। যমের হাত ফসকে রক্ষা পাওয়াদের দুঃখ স্বাধীনতার বেদিমূলে উৎসর্গকৃত শহিদদের ব্যাপারে কি ইতিহাস বিস্মৃত! তাঁরা কি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন!

মঞ্জু রানীর সংসার ঃ ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ সংস্থায় কাজ করে স্বল্প আয়ে চলে মঞ্জুরানীর সংসার। তাঁর মা-বাবা আজ পরলোকে। তাঁর ভাই বোনদের আলাদা সংসার হয়েছে। তিন ছেলে ও এক মেয়ের সংসারে দুঃখ-কষ্টের নিত্য সাথীর সত্যি জীবনে সুখ খোঁজেন মঞ্জুরানী। স্বাধীন দেশে সে সুখের হরিণ কবে আসবে কে জানে?

স্বগত স্বক্তি ঃ স্বাধীন দেশে মানুষের স্বার্থপরতা মনকে ব্যথিত করে, বেদনা দেয়। হতবাক হয়ে ভাবি মানুষ এমন স্বার্থপর হয় কি করে? এতো জলজ্যান্ত অতীতের দুঃখ-বেদনা-হাহাকার- জীবন-মৃত্যু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ ভূলুণ্ঠিত কেন? মুক্তিযুদ্ধকালে তো মানুষ এমন স্বার্থপর, মামলাবাজ, পরশ্রীকাতর, লুটেরা ছিলোনা। কোর্ট কাচারি বন্ধ ছিলো, দেশ কি চলেনি? স্বাধীনতার স্বপ্ন-রঙিন আলোয় মদির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুদিনের আশায় মানুষ সর্বস্ব দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। হায়! এতো শীঘ্র নিকট অতীতের দুর্দিন ধুয়ে মুছে ভুলে গিয়ে পাপে ডুবছে মানুষ। চোখের জলে আত্মধিক্কারের অভিশাপের ইচ্ছে জাগে, চোখে আসে জলভরে। যে সব মানুষের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জীবনের মায়া মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধারা মরণ প্রাণ পার করলো তাঁরা সামর্থ থাকতে একটা ঘষা আধলায় উপকারীর সাহায্য তো দূরের কথা মৌখিক ধন্যবাদের সৌজন্য-স্মরণেও কঞ্জুস! মুক্তির সাহায্যে কতো কিছু আশার গল্প শোনাই সার। মঞ্জু রানী ভাগ্যে কিছুই মঞ্জুর হয় না।

যে দিন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাহতদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ ছিলো না, সে দিন শূন্য হাতে সেবার মালা নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কি আছে মোর কি পেরেছি দিতে! হৃদয় উজাড় করা স্নেহ মমতা ভালবাসায় তাঁদের সেবা করেছি। সকল পাওয়া না পাওয়ার উর্ধ্বে মুক্তি-সেবিকার এটাই গৌরব। আর কিছু না পাই লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন দেশ তো পেয়েছি। স্বাধীন দেশে আমার সন্তানরা বাড়ছে। আর কিছু না পারি আজীবন আপন সন্তানদের শুনিয়ে যাব নিজের চোখে দেখা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের অমর কাহিনী। জয় তু বাংলা। জয় তু শহিদান।

মুক্তিযোদ্ধা কাননবালা বণিক

পরিচিতি ঃ আদরের নাম কানন। পারিবারিক ব্যবসা সূত্রে পরিবারের লোকদের উপাধি বণিক। কানন কুসুমের মতই সুন্দরীর নাম কাননবালা বণিক। ছোট বেলায় ভারতীয় সিনেমার নামকরা এক নায়িকার নাচ-গান-এক্টিংয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর নামও ছিল কানানবালা। সে লাস্যময়ী নায়িকার নামে অনেকে নিজেদের কন্যাদের নাম রাখতেন। জানিনা কি ভেবে বাবা জগবন্ধু ও মা চারুবালা মেয়ের নাম রাখেন

কাননবালা। তাঁর গ্রাম-ভাজনন্দি, পোস্ট অফিস-দিগনগর, থানা-মুকসুদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ। ১৯৭১-এ তিনি ষোড়শী লাস্যময়ী তরুণী। ছয় ভাই ও দুই বোনের মাঝে তিনি সবার বড়। কাননবালাকে নিয়ে স্বপ্ন লেখা পড়া শিখিয়ে ভাল ঘর ও বরে তাকে বিয়ে দেবেন। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ সব স্বপ্ন তচনচ করে দিল।

জয় রাজাকারের জয়। জয় ধর্মান্ধতার জয়।। মে মাসের দিকে কাননবালাদের পাশের গ্রামে পাক বাহিনী হানা দেয়। তাদের সাথের সহযোগী দো'আঁশলা রাজাকার। দখলদার বাহিনী রাজাকার সহযোগে বাড়ি-ঘর, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে ধ্বংসের তাণ্ডবে মাতে। এসব নর পিচাশদের হাত এড়াতে লোকজন তখন বিল বাওড়ের অজানার গহীনে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চাইতেন। আগস্ট মাসে পাশের গ্রামের রাজাকার মুজি এসে কানন বণিকের দাদিকে শাসিয়ে যান, "সব মালুগো ধইরা মুসলমান বানামু। আমাগো সোনার পাকিস্তানে কোন লোমো থাকবে না। থাকবে শুধু মুসলমান"। এখনে 'মালু' বলতে মালাউন-হিন্দু, লোমো বলতে নমঃশূদ্র বুঝান হয়েছে। সোজা কথায় অমুসলমান শূন্য সাচ্চাদিল মুসলমানে ভরা হবে পাকিস্তান। অশনি সংকেতের আতংকে পুরা কানন পরিবারে। ঠিক পরদিনই কালান্তক কাল আজরাইলের মত পাক সেনাদের নিয়ে কাননদের পরিবারে হানা দেয় মুজি। ভর সন্ধ্যায় অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে পাক আক্রমণ। ঘটনার প্রচণ্ডতার আকস্মিকতায় পরিবারের সবাই ভাষা হারিয়ে বোবা বনে যান। পাক হানাদার কাউকে ধরে নেবার প্রস্তুতির সময় দেয় নি।

গল্প শোনার দৈত্য দানোর ভয়ংকর অত্যাচারের চিত্র তাঁরা ঘরে বসে দেখছিলেন। পাক নমুদের অনেক লোমহর্ষক অত্যাচারের গল্প সবাই শুনছেন। কানন দেখেন মা-বাবা- খুড়ো-ঠাকুরমার বলিরেখায় চিন্তার ছাপ। চাপা স্বরে তাঁদের আলাপ দুশ্চিন্তায় গুরুজনের মুখ শুকনো। এতগুলো মানুষ কোথায় যাবে, কি করবে, কেউ ভেবে পান না। কিশোর-কিশোরীদের এসব ভাল না লাগারই কথা। হাসি-খুশি মেজাজে গল্প গুজব, হৈ হুল্লোড়ে মেতে থাকতে তারা ভালবাসে। ভাই-বোন সবাই মিলে সন্ধ্যা লগনে দাদিমার গলা জড়িয়ে আদুরে আব্দার গল্প শোনাও। যা তা গল্প নয়। রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানব-জ্বীন-পরী-ভূত-পেত্নী-মামদো ভূতের গল্প চাই। হাসির গল্প চাই। রাজপুত্রের রাজকন্যা উদ্ধারে পঙ্খিরাজে চড়ে পাতাল প্রবেশের গল্প চাই। অযাচিত চাওয়ার কেচ্ছা কাহিনীর গল্পকে ছাড়িয়ে সত্যিকারের নরপিচাশ পাক বাহিনী মরণ ছোবল নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীর গল্পের আসরে।

গুলির আওয়াজের সাথে সাথে রাজাকার সহায়তায় কাননদের বাড়ি ঘিরে ফেলে পাক আর্মি। তাৎক্ষণিক হায়েনাদের নারী মাংসের লোভে প্রবেশ করে জগবন্ধু বণিক (ঝড়ু) পরিবারের ঘরে। গোটা বিশেক দস্যু সেনার মধ্যে আছে রাজাকার, আলবদর-পাকসেনা। চেনামুখ বাঙালি হায়েনারা ছিল ঃ (১) তপু, (২) মেহের, (৩) ধলামিয়া (৪) মুজিবর, (৫) শামসুর ধরনের আরো অনেকে। চক্ষের পলকে হাতের কাছে যা পেল লুটে নিল। মেয়েদের গলার, হাতের, নাক-কানের সোনার অলংকার ছিনিয়ে নিলেন মাংসে সুদ্ধ ছিঁড়ে। ট্রাংক, সুটকেস-পোর্টমান-সিন্দুক-আলমারি রাইফেলের

কুঁদায়, বুটের লাথিতে ভেঙে বাঙাল-অবাঙাল দু'সেনাই লুটলো। নগদ নারায়ণ হাতাতে পাকসেনাদের তর সয় না। রাজাকার আলবদর হাত থেকে সোনা-রূপা-টাকার সবটা হাতিয়ে নিল তারা। গোলাগুলির আতংকে সবাইকে হতবিহ্বল করে লুটপাট করে তারা।

এবার মাংসাশী প্রাণীর মত তারা কাঁচা মাংসের নারীর প্রতি হাত বাড়ায়। কাননের মা-বাবাকে প্রচণ্ড মার-ধোর, দে মাগি হারামজাদী সোনা-দানা কৈ লুকাইছস। হারামজাদা কাফের মালাউন নমো ফ্যাল ফ্যালাইয়া চাস কি? বার কর টাকা পয়সা। ইসলামের শান্তির ধর্মে আইলি না। ইনডিয়ান ফরজন্দ। তোমহারা বেটিকা পেটসে লড়াকু আচ্ছা ইসলামি ইনসান পয়দা করুংগা। জগবন্ধু পরিবারে ধনসম্পদ কেড়ে নিল দেশী-বিদেশী সাম্রাজ্যের মিলিত শত্রু। এবার বাড়ির মহিলাদের ইজ্জতে হাত। ষোড়শী কন্যা কাননের প্রতি শত্রুর লোভাতুর চোখ। কাননকে টেনে হিঁচড়ে ঘরের বাইরে নিতে তার পিতা জগবন্ধু বিশ্বনন্ধুর স্মরণে বংগবন্ধুর দেশের কন্যাকে বাঁচানোর উদ্যোগ নেন। প্রতিবাদে সোচ্চার পিতা হাত জোড় করে কন্যার সম্ভ্রম ও প্রাণ ভিক্ষা চান। শত্রুকে বাধা দিতে এগিয়ে আসেন মা। নিজের নাড়ি ছেঁড়া সন্তান রক্ষায় শত্রুর ওপর আদি অকৃত্রিম হাত-পা-দাঁত-নখে কামড়ে-হিঁচড়ে সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে চাইলেন। দাদিমা নাতনীকে রক্ষায় বাধা দিয়েও শত্রুকে ঠেকাতে পারলেন না। এক পাক সেনার কাননের মুখের দিকে চেয়ে জিব চেটে সাধ গ্রহণের মত হাসি হাসে। কানন ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে সজোরে তাকে ছিনিয়ে নেয় পাক সেনা। ক্রুদ্ধ সাপিনীর ছোবলে পাক আর্মির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন দাদিমা। এবার জীবন বিদারি চিৎকারে পাড়া মাতিয়ে বলেন, "ছাইড়া দে শয়তান"। দাদি-বাবা দুজনেই কাননকে ছিনিয়ে নেবার জন্য শত্রুর প্রতি তেড়ে যেতেই আকস্মিক গুলিতে দুজনেই অচেতনা। ফাকা গুলির শব্দে চেতনা হারান। অলৌকিকভাবে গুলি ফসকে গিয়ে তাঁদের রক্ষা। গুলিবিদ্ধ রক্তঝড়া মানুষগুলি রক্তের টানে মেয়ের দিকে ছুটলেন। রাইফেলের বাটের কুঁদো ও বুটের লাথিতে তড়পানি রতরা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইলেন। মহিষ মর্দিনীর তেজে স্বামী-শ্বাশুড়ীর মরণ যন্ত্রণা উপেক্ষা করে শত্রুর প্রতি আপতিত হতেই কাননের মার ওপর পাক আর্মির প্রচণ্ড লাথিতে মা মাটিতে পড়ে যান। নিপীড়নের উল্লাসে তাকে শায়েস্তা করে মাটিতে ফেলে অত্যাচার নির্যাতনে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। নইলে এক গুলিতে খুলি উড়ানোর নতিজা স্মরণ করিয়ে দেয়। বুত পরসতির (মূর্তিপূজা) কাফেরনি তোর ভগবান আয় না তোরে বাঁচাতে। বাবা চিৎকারে মুমূর্ষু বাবাকে জড়িয়ে কন্যার বেদনার্ত হাহাকার! ষোড়শী জেনানার নারী মাংসের আস্বাদন তাদের এতদূর নরপিশাচী কাণ্ড! তাকে মারতে তো আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এবার পাক শিকারিরা কানন বালার চোখ-মুখ বেঁধে ফেলে। তিনি জ্ঞান হারালেন।

নৌকায় অজানার উদ্দেশ্যে কাননের যাত্রা। অজ্ঞানের উপরেই সজ্ঞান মানুষ নারী মাংসের আস্বাদন নেয়। এবার তারই অনুভূতিতে, "হুঁস ফিরতেই প্রচণ্ড ব্যথায় বুকডা ভাইংগা যাইতাছিল। গলায়-বুকে হাত দিয়া দেখি খালি কামড়ের দাগ। দাঁত বসাইয়া

দিয়া চামড়া ছুইলা রক্ত বাইর কইড়া দিছে। গায়ের ব্লাউজটা ছিড়া আর শাড়িডা আউলা-ঝাউলা অইয়া আশে পাশে পইড়া রইছে"। আর গাল-বায়ু (বাহু)-ঘাড়-রান শত্রুর বিষাক্ত দাঁতের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত। মানুষের গাল যে মানুষ এমন কামড়ে চুষতে পারে তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। কসাইর মাংস বানানির মতন আমার দেহটাকে বানিয়ে ছাড়ে নারী মাংসের লোভাতুর পাক আর্মি। সভয়ে দেখি আমারই মত অভাগিনী দেদার আছেন বেশ্যালয়ের মত মৌজখানায়। সে মৌজের আড্ডার, "ঘরে আমি সবার চেয়ে কম বয়েসি ছিলাম। ভয়ে চিক্কুর দিয়া মাফ চাইলাম। আমারে ছাইড়া দিতে কইলাম। ওগো দয়া হইল না। আমার রক্তাক্ত শরীরটা একজন আরেক জনের দিকে ছুইড়া মারতেছিল। এক সময় ওগো অত্যাচারের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পাইরা আবার অজ্ঞান অইয়া (হইয়া) গেলাম"। ক্লান্তি হরণ অজ্ঞান-নিদ্রা বন্দিনীদের পরম কাম্য ছিল। মোরগ ছানার মায়া কান্নায় ভুললে শিয়ালের আর পেট পুরবে না। হরিণ ছানার চোখের পানির কান্নায় টললে বাঘকে উপবাসে কাটাতে হবে। তাই নরপশু পাক সেনারা বাঙালি মেয়ে ভক্ষণকে বৈধ বলেই গ্রহণ করে। কারণ, বিজিত দেশে শৌর্য প্রদর্শনের একটাই পথ। ভাগ্যাহত অবলাদের ধর্ষণ ও বলাৎকার। "আপনাকে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পরে"র কানন সমব্যথিনী বন্দি আস্তানার অন্যান্যদের কথা ব্যথাতুর চিত্তে স্মরণ করেন। জ্ঞান ফিরলে দেখেন, "একটা ঘরের মধ্যে গরু ছাগলের মত গাদাগাদি কইরা রইছে আরো পনের /ষোলটা মেয়ে। সে পাক বন্দিনীর আস্তানা মাটির ওপরে কি নিচে ঠাওরাইতে পারলাম না।"

হায়রে ব্যথিনীর জীবন! ইজ্জত খোয়ানোর কথার কথা বাখানে কার কি লাভ? "যতদিন বন্দিনী ছিলাম ততদিনে গোসল করতে দেয় নাই তারা। যে কাপড়ডা পরনে ছিল সেই এক কাপড়েই দিন কাইটা গেছে। যখন হুশ ফিরত তখন ছেঁড়া ফাতা ফাতা পরনের কাপড়ডা টাইনা শরীরে দিতাম। অনেক সময় আমগ উলংগই থাকতে অইত। ময়লা ছেঁড়া দুর্গন্ধয়ালা ঐ শাড়িখানই ছিল লজ্জা ঢাকার শেষ ভরসা। খাবার বলতে শুকনো রুটি আর দু এক সময় এক মুঠ শুকনো ভাত দেয়া অইত। ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশের সাথে তাই খাইয়া বাইচা ছিলাম। মাঝে মাঝে গলায়, নিজের পরনের কাপড় পেচাইয়া কয়েকজন আত্মহত্যা করার পর ওরা রাজাকার-আলবদরগো পাহারায় রাখত।

সাথী বন্দি মেয়েদের ব্যাপারে কানন বলেন, "যে সব মাইয়াগো দেখছিলাম তারা সবাই আমার মত গ্রামের থেকে ধইরা আনা এবং অল্প শিক্ষিত ছিল। কেউ কারও সাথে কথা কইবার সুযোগ পাইতো না বা ইচ্ছাও করত না। কারণ, সবারই সমস্যা একই ছিল"।

বয়স কম, চেহারা-স্বাস্থ্য ভাল, কমনীয়তা কি অন্য যে গুণেই হোক, পাক বাহিনীর সদস্যরা প্রতিদিনই তাঁর ওপর অবর্ণনীয় "পাশবিক নির্যাতন চালাতো"। বাইরে থেকে ধরে আনা অন্য মেয়েদের নির্যাতনের বিভীষিকার দৃশ্য স্মরণে আজো তিনি শিউরে উঠেন। "খুটির সংগে হাত-পা বেঁধে একেকজন মেয়েকে একাধিকবার গণধর্ষণের পর হত্যা করার নির্মম ঘটনার" স্বাক্ষী হয়ে আছেন কানন। দুমাসের বন্দি জীবনে

স্বাধীনতাপ্রেমী বাঙালি তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় মনোবলে বিস্ময় মেনেছেন সবাই। হাজার কলা-কৌশলের নির্যাতনের পর বন্দি মুক্তির মুখ দিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলাতে ব্যর্থ পাক আর্মি। পাক নির্যাতনের তীব্রতায় বন্দি মুক্তির বুক ফাটা আর্তনাদের পানি পানি চিৎকারে পাষাণ গললেও পাক আর্মির হৃদয় গলত না। বরং তাদের নির্যাতনের মাত্রা সহর্ষ উল্লাসে বেড়ে যেত। মুক্তি বন্দির পিপাসা নিভাতে তারা উপহার দিতেন, "ডাবের খোসায় প্রস্রাব করে"।

বন্ধন মুক্তি ঃ বিদেশী আর্মির ভোগে জর্জরিতা কানন বণিক কেঁদে কেঁদে স্বদেশী পাক তাঁবেদার দো'আঁশলা রাজাকারদের হাতে পায়ে ধরে কাকুতি-মিনতিতেও উদ্ধার মিলেনি। বাঙালি রাজাকার-আলবদর-আল শামসরাও নারী মাংসের ভাগ পেত। কারণ পাক আর্মি তত বেরহম না। খাঁটি আনকোরা মালের প্রথম হকদার ও ভাগদার খাস পাক আর্মি। ঝুটার দ্বিতীয় শেয়ারে, পশ্চিমা মিলিশিয়া ও বিহারি। তোবরানো ছোবড়ার রস নিংড়ান খোসাটার তৃতীয় ভাগ পেত লুটে গণিমত বাঙালি প্যারামিলিশিয়া। প্রাণে বাঁচতে ভারতের শরণার্থীদের কানন বণিকের মা-বোনের টানে বড় মৃত্যুপুরীর দখলদার দেশে স্থানে স্থা: বোনকে খুঁজে হয়রান। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের হারানো বোনের সতর্ক সন্ধানে ছিলেন। গোপন সূত্রের অনুমান নির্ভরে পাক দুর্গে মুক্তি হানা।

স্থান থেকে স্থানান্তরে ভোগের সামগ্রীর নারীদের নেয়া হত। কারণ পাক সেনাদের আমোদ ফূর্তির উপকরণ যুদ্ধস্থল ক্যাম্পে না পৌঁছলে তারা লড়বে কোন জোশে? বিজিত দেশের নারী উপভোগে সৈনিক উদ্দীপনা সঞ্চারে ফতোয়া দেয়ার বুজদিল আন্ধা কাঠমোল্লারও অভাব হয় নি দখলদার বাংলায়।

একদিন রাতের আঁধারে নারী-পাচার ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে। কানন বণিকের সাথে জনা ছয় মেয়েকে অস্ত্রের মুখে হাঁটিয়ে আনে দিগনগর মিলিটারি ক্যাম্পে। পাশেই ছিল ব্রিজ। ব্রিজ প্রহরার মিলিটারি ক্যাম্পে ভোগের মেয়েদের রাখা হত। যুদ্ধের উন্মাদনায় ফিরে এসে মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মজা লুটত। নিকট দূরত্বেই যুদ্ধ হত। বন্দি ক্যাম্পের মেয়েরা গুলির শব্দ শুনতে পেত। বইছে বাতাস মন্দ! পাক হানাদরদের মুখে পরাজয়ের গন্ধ!!

"একদিন ওগো চোখে মুখে দেখলাম চিন্তার রেখা। বুঝলাম একটা কিছু ঘটতে যাইতাছে"। কাছেই ছিল মুক্তির 'বাইকামারী' ক্যাম্প। দুদলে প্রচণ্ড যুদ্ধ। বিপন্না বাঙালি নারী উদ্ধারের মরিয়া মরণ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: মোশাররফ শেখ। এই আত্মোৎসর্গের যুদ্ধের অন্যান্য সহযোগী বীর মুক্তিযোদ্ধারা আফজাল হোসেন ফকির (শহিদ), ওয়ারেশ বাশার ফকির, আমিনুল হক (পরবর্তী) সরকারী চাকরিরত বুদ্ধিজীবী, জয়নাল আবেদিন, সম্রাট ফকির, আলি মিয়া হোসেন। মোশাররফ ও আফজাল একজন রাজাকারকে বন্ধি করেন। ভোগের নারী, অস্ত্র-খাদ্য-বস্ত্র, লোটা-কম্বল ফেলে পাক পাঞ্জাবের খাস আর্যসেনা ভোঁ দৌড়ে পালিয়ে যায়। অত্যাচারে জর্জরিত বিপন্না নারীদের মুক্তিরা নিজেদের ক্যাম্পে এনে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। বন্দিনী নারীরা নিজেদের পছন্দমত স্থানে চলে যান।

অভাগী যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায় ঃ কানন বণিক তাঁর পরিবারের প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে বড় আশায় বুক বেঁধে ফিরে গেলেন। তাঁর বাড়ি ঘর সব পুড়ে ছাই। তখনো দেশ স্বাধীন হয় নি। রাজাকার ও দখলদারদের ভয়ে সবাই তটস্থ। সবার ওপর লোকলজ্জা সমাজ সংস্কারের ভয়। স্বজন বৈরীরা তাঁকে গ্রহণ করলেন না। হতভাগিনী ফিরে এলেন তাঁর উদ্ধার কর্তা মুক্তি ভাইদের ক্যাম্পে।

নারী মুক্তিযোদ্ধা কানন বণিক ঃ মৃত্যুর দুয়ারে সমর্পিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধারা হৃদয় ঔদার্যে বিপন্না নারীকে আশ্রয় দিলেন। উদয়াস্ত মুক্তিযুদ্ধের কাজে লাগলেন কানন। প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ছাফ-ছাফাইর কাজে লাগেন। অদম্য মনোবলে রাইফেল চালনা গ্রেনেড ছোঁড়া শিখলেন তিনি। শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে সবার প্রশংসা কুড়ালেন কানন। স্বাধীন দেশের মুক্ত বাতাসে তিনি পেলেন রুদ্ধশ্বাস বিরূপ সংবর্ধনা।

সমাজচ্যুত মুক্তিনারী ঃ যুদ্ধ স্বীকৃতির শৌর্যে বিজয়িনী এবার নিজের ভিটায়। মা-ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন কেউ তাঁকে গ্রহণ করলেন না। মুসলিম মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাকিম, আবু বকর মাতুব্বর, ওয়ারেশ ফকিরের মত যোদ্ধারা তাঁকে বোনের সম্মানে স্থান দেন। ইদ্রিস ফকির, হারুণ ফকিরের মত বহুতর যোদ্ধার তিনি ধর্ম-বোন। সবাই তাকে ধর্মের বোন আদরে ডাকেন। স্রোতের শেওলাসম হিন্দু মেয়ের মুসলিম পরিবারের আশ্রয় হয়। সবাই তাঁকে সমাজে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে নেন। তিনিও সমাজ সেবায় নিজকে উৎসর্গ করেন।

ধর্মান্তর বিয়ে ঃ কানন বালা বণিকের উদ্ধার কর্তা বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। দেশ স্বাধীনের এক মাসের মাথায় কাননের বিয়ে হয় ইসলাম ধর্মমতের শরিয়ত অনুসারে। ধর্মান্তরিত কাননবালা বণিকের নতুন নাম করণ নাজমা বেগম। মুসলমান ধর্মভাইরা নিজেদের বাড়িতে রেখে মহাধুমধামে তাঁর বিয়ে দেন।

দুকূল হারানোর অথৈ সায়রে মুক্তিদম্পতি ঃ সমাজ-সংস্কারের এ-দেশের হিন্দু-মুসলমান কেউ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান। কনেকে সমাজচ্যুত করে হিন্দু সমাজ। এবার জামাতাকে বাড়িঘরচ্যুত করেন তাঁর বাবা-মা-ভাই-বোনের পুরো পরিবার। ছেলের অপরাধ দাগনম্বরের বীরাংগনা বিবাহ। আপন আত্মজা মা মেয়েকে বহু বছর পর দেখতে আসেন। অন্তরমন মথিত বেদনায় সে মা-মেয়ের মিলন স্মৃতিতে নাজমা বেগম। ডুকরে কাঁদেন শোকার্ত বেদনায়, "মা সীতার বনবাসের মত তোরে বনবাসে দিয়া গেলাম। তোর ভাগ্যের উপর ছাইড়া দেয়া ছাড়া আমি তোর জন্য কিছুই করতি পারলাম না।"

স্বামী-সোহাগিনী ঃ জেনে শুনে বীরাংগনাকে বিয়ে করা স্বামী মুক্তিযোদ্ধা মোশাররফ শেখের বিরুদ্ধে তাঁর কোন রাগ নেই। বীরাংগনা বিয়ের পুরস্কারে সম্পত্তিপন্ন পরিবারের ছেলে আজ সংসারচ্যুত। এমনি হৃদয় উদার্যের স্বামী পাওয়া ক'জনের ভাগ্যে জোটে!

কেমন আছেন আজকের নাজমা ঃ সমাজচ্যুত মুক্তিদম্পত্তির আশ্রয় হয়

ঢাকার মিরপুরে। দেশান্তরি পরিবার ১৯৭২ সাল থেকে আশ্রয় নিয়েছেন মিরপুর-১০, ব্লক-ডি, নম্বর-৬, ওয়াপদা বিল্ডিং এলাকার বস্তিতে। হাতিও গর্তে পড়লে ব্যাং লাথি মারে। অভাগাদের দুর্ভাগ্য যে ২৪ জুলাই, ২০০০ আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে তাদের সবকিছু পুড়ে খাক হয়ে যায়। সমাজের দয়ারদানে ভিক্ষার দানে সংসার পেতেছেন এককালের বীরযোদ্ধা দম্পত্তি। সমাজের কোন উদার প্রাণ তাঁদের সাহায্য পাঠাতে চাইলে ঠিকানা- নাজমা বেগম, সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৩১৪৯, ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক, মিরপুর, ঢাকা। নাজমার স্বামী হকারের পেশায় বাঁচার চেষ্টা করছেন।

তিনটি ছেলে-মেয়েতে পূর্ণ নাজমার সংসার। মেয়ে ২০০৩ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য। এক ছেলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে স্কুলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ছোট ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। সম্প্রতি বস্তি উচ্ছেদে মুক্তি পরিবার আবার পথের পথিক। আবার ঘর তুলেছেন মিরপুর-১০ এর মিলক ভিটা বস্তিতে। বীরাংগনার চোখে স্বপ্ন ছিল সুন্দরের, সুখের, আনন্দের। সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে তিনি আজ বিপাকে। তিনি চান সমাজ ও দেশের কাজে মাথা গোঁজার ঠাঁই। রোগে শোকে অকর্মণ্য প্রায়। শয্যাশায়ী স্বামীকে নিয়ে নাজমা আজ বিপাকে।

সম্মাননার বিড়ম্বনা ঃ সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংস্থা বীরাংগনা নাজমা বেগমকে সাড়ম্বর সংবর্ধনা দেয়। গভীর মর্মবেদনায় তিনি বলেন, "আমি কোন সংবর্ধনা চাই না। আমার দরকার একটু আশ্রয়, আমার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ। আবেগরুদ্ধ মোশাররফ বলেন, "দেশ স্বাধীন কইরা আমাগো কি লাভ হইল? আমি তো নিজের ভিটামাটিও হারাইলাম। অহন চারটে পোলাপান লইয়া বাঁচতে চাই। একটু থাকার জায়গা চাই।"

নাজমার বেদনা, "সমাজে বীরাংগনা হওয়াটাই পাপ। সবার অবহেলা অবজ্ঞা ছাড়া জীবনে কিছুই পাই নাই। একবার সরকার থেইকা দশ হাজার টাকা পাইছিলাম। প্রধান মন্ত্রীর দেহা করতে চাইছিলাম। ভাবছিলাম দেহা অইলে একটা কথাই কইতাম আমার কি অপরাধ ছিল? আজ আমি কেন পথের ভিখারি। আমার মাইয়াও বিয়ার উপযুক্ত। ওরে একটা ভাল বিয়া দিব, একটা সুন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করুম।" স্বপ্ন আর বাস্তবের ফারাগটা রক্ত মাংসে টের পাচ্ছেন মুক্তি দম্পত্তি। স্বামী-সন্তান নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দু:সহ অবস্থায় মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা পরিবার"। দেশের জন্য নারী-জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের পরেও স্বীকৃতি পাই নি। এই কি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা!! পত্র পত্রিকায় সচিত্র বিবরণে মুক্তি দম্পত্তির কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের জীবনে স্বপ্ন তো আর পুরা হয় না। দেশের প্রাক্তন ও বর্তমান, জাতীয় পরিষদের পজিশন ও অপজিশনের দুইজনাই দুই মুক্তিযুদ্ধখ্যাত পরিবারের কন্যা। দেশের প্রধান মন্ত্রী ও লিডার অব দি অপজিশনের বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ওয়াজেদের দুজন আপন যোগ্যতায় খ্যাতিমান নারী। কই নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাংগনা নাজমাদের তো জীবনের গতি হয় না। হায় নারী প্রধানমন্ত্রীর দেশে নারীর দুর্গতি! হে মোর দুর্ভাগা দেশ!!!

মুক্তিযোদ্ধার শেষ সম্বর্ধনা রাজসিক ঃ সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু পরবর্তী দাফন-কাফনের শেষ কৃত্য হবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার গার্ড অব অনারে। সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে শেষকৃত্যের ব্যয় নির্বাহ হবে। হায় কি সুন্দর ব্যবস্থা। জীবনে যারে দাও নি মালা! শেষ বেলায় একি তার স্মৃতির বরমালা!!! সবই হবে যদি কেউ হন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১-এর যুদ্ধকালের কাননবালা বণিক ও পরবর্তী নাজমা বেগমের স্বামী মোশাররফ শেখের স্বাধীনতা যুদ্ধের পত্র নং ০১০৯০৫১১৭০। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার সুযোগ্য সন্তান সোনার বাংলার বীরযোদ্ধা অবশ্যই আপনারা রাষ্ট্রীয় সম্মাননার স্বীকৃতি পাবেন মৃত্যুর পরে। নিজের সম্মানের জানাজাটা নিজে দেখতে পেলেন না এটাই দু:খ। কারণ এটাই আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা!!

রেফারেন্স

ক। একান্ত সাক্ষাৎকার- মোশাররফ শেখ- মুক্তিযোদ্ধা বীরাংগনা নাজমা বেগমের স্বামী।

খ। দৈনিক ইত্তেফাক- ২০ জানুয়ারি ২০০৩।

গ। যুগান্তর-২৭ নভেম্বর ২০০২।

ঘ। দৈনিক জনকণ্ঠ-১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০০।

ঙ। হেমায়েত বাহিনী কমান্ড সার্টিফিকেট নং ৮৩।

চ। সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড, মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ৪ নভেম্বর ২০০২।

ছ। একান্ত সাক্ষাতকারে কানন বালা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি 'অঞ্জলি চৌধুরী'

পাক আর্মির প্রতিশোধ স্পৃহা ঃ পাক আর্মির আতংকের ত্রাস ফরিদপুরের হেমায়েত রাজার আসনে রাজত্ব করছেন 'রাজাপুর' গ্রামে। হেমায়েত বাহিনীর হেডকোয়ার্টার তখন 'রাজাপুর'। ১৪ জুন, ১৯৭১ পাক দুর্গ 'কোটালিপাড়া' থানা দখলে মুক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় সাফল্যে পাকআর্মির নাভিশ্বাস ওঠে। সে নৈশ অভিযানে চল্লিশ জন পাক শত্রু জীবন্ত ধৃত। প্রায় বিশজন বাঙালি রাজাকারও নিহত হয়। মুক্তি-রতনের শ্রেষ্ঠ বীরদের অন্যতম হেমায়েত বাহিনী প্রধানের বডিগার্ড, জয়দেবপুর থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত অকুতোভয় বীর যোদ্ধা 'কাপাসিয়া' থানার ইব্রাহিমের কালজয়ী শাহাদত।

১৫ জুন, ১৯৭১ 'রাজাপুর' গ্রামে সামরিক আদালতের বিচারে চল্লিশ জন যুদ্ধ কলংকের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়। 'রাজাপুর' গ্রামের অযত্ন অবহেলার নাম নিশানাবিহীন পাশাপাশি কবরে চির নিদ্রায় নিদ্রিত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ দুদলই।

রাজাপুরের রাজকীয় যুদ্ধ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় 'কোটালিপাড়া' থানার যুদ্ধে ঘৃণ্য পরাজয়ের প্রতিশোধে পাক আর্মি জিঘাংসার তৃতীয় রাউন্ডের যুদ্ধ সংঘটিত হয় 'হরিণাহাটি' গ্রামে ২১ জুন। মুক্তি সদর রাজপুরে পাক-আর্মি মরিয়া আক্রমণ রচনা

করে। জলাভূমির অথৈ সায়র দিয়ে তারা নৌ-পথে গাটবোট সহযোগে আক্রমণ করে। অতুলনীয় শৌর্যে অস্তিত্ব রক্ষায় মুক্তিবাহিনী মরণপণ লড়াইয়ে নামে। 'রাজাপুর' মুক্তিঘাঁটি রক্ষায় নিয়োজিত মুক্তিসেনা সুইসাইডেল স্কোয়াডে স্বেচ্ছা-মৃত্যুর আত্মঘাতী শৌর্যে আমৃত্যু লড়াইর দীপ্ত শপথে উদ্দীপিত। সারা অঞ্চলে যে-কোনো মূল্যে মুক্তি ঘাঁটি রক্ষায়, মানব তরঙ্গের শেষ চেষ্টায় মুক্তিবাহিনী রক্ষায় উৎসব মুখর খেলার রণ সজ্জা। বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমির মানুষের ইজ্জতের লড়াই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নরনারী নির্বিশেষে আমৃত্যু শপথে এসে দাঁড়ায় এক কাতারে। সে এক মর্মস্পর্শী জাতীয় চেতনার সঞ্চারী জনগণ চেতনার মুক্তিযোদ্ধার যার যা আছে তাই নিয়ে সবাই শত্রু হননে প্রস্তুত। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে মৃত্যুপণ দৃঢ়তায় অগ্রগামী মহিলাদের ক'জনের অন্যতম প্রমিলা হালদার, অনীলা বিশ্বাস, অঞ্জলি চৌধুরী। এই অঞ্জলি চৌধুরীর অন্য পরিচয়, তিনি ভারতে শরণার্থীদের সেবা প্রদানে হাত পাকিয়ে এসেছেন।

মুক্তি-জনতার মরণযজ্ঞের যুদ্ধের মুখে শত্রুকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে রণে ভংগ দিয়ে 'রাজাপুর' থেকে পালাতে হয়। রাজাপুর থেকে পশ্চিমা রাজারা গানবোট নিয়ে পালিয়েও রক্ষা পায়নি। তাদের প্রাণ বোট থামাতে মৃত্যুঞ্জয়ী লা-পরোয়া মুক্তির জীবন বাজিতে 'সাতলা' পর্যন্ত শত্রু গানবোটকে ধাওয়া করে শিয়াল তাড়া তাড়িয়ে নেয়।

মুক্তির আশ্রয়ে বঙ্গ মাতা ঃ সারাদিনের যুদ্ধে মুক্তিরা অভুক্ত। এলাকার মা-বোনেরা উদ্বিগ্ন। স্থানীয় সিডিউল কাস্ট শিক্ষিত চৌধুরী পরিবারের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী অঞ্জলি স্বত:স্ফূর্ত উদ্যোগে জনতা বিজয়ী মুক্তি অভ্যর্থনার আনন্দে মাতোয়ারা। মাইনরিটি এলাকার বেশ কিছু মেয়েকে সংঘবদ্ধ করেন অঞ্জলি। বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনার আনন্দে আত্মহারা মেয়েরা যার যার পুকুরে নিজেরাই জাল নিয়ে নামে মাছ ধরছে। মুক্তিসেনাদের খাবারের জোগাড়ে প্রচুর মাছ ধরা হয়। পরম মমতা ও যতনে অনেক রকমের খাবার বানায়। মুক্তি শিবিরে খাবার আনতে বিরূপ অভ্যর্থনা। ক্যাম্প হাবিলদার মেজর আব্দুস সাত্তার মৃধা যথানিয়মে সংবাদ পাঠায় ক্যাম্প কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিনের নিকট। বিগলিত শ্রদ্ধার সম্ভ্রমে খাবার প্রত্যাখ্যান করা হয়।

বুকভরা আশা নিয়ে আসা মেয়েদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারে সাতঘাটের বাধা ডিঙিয়ে আবেগাপ্লুত কৃতাঞ্জলিপুটে রোরুদ্ধমান অঞ্জলি হেমায়েতের সামনে। ছিঃ মুক্তি ভাই। বহু সম্মানে মুক্তি বোনের যৎসামান্য তুচ্ছ খাবারের এই প্রতিদান! স্বাধীনতা যোদ্ধার কাছে অন্যতম অস্পৃশ্য শ্রেণীর এই আদর! মুক্তি নেতার প্রশ্নের জবাবে তাঁর নির্ভীক কণ্ঠের অভিমানের উত্তর। বিজয়ী মুক্তি ভাইদের জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে খাবার এনেছি। মায়ের ভালোবাসার আদরের খাবারে অবমাননা করতে নেই মুক্তি ভাই। মায়েদের কথা কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশায় এই খাবার মুক্তি ক্যাম্পে আসেনি। বীর প্রসবিনী বাংলার মায়ের দান মাতোয়ারা এলাকাবাসী মাতৃস্নেহের জারক রসে মিশ্রিত খাবার গ্রহণে বাধ্য হলেন মুক্তি কমান্ডার। মেয়েটির সাহস সবাইকে মুগ্ধ করে।

নারী মুক্তিযোদ্ধা অঞ্জলি ঃ দজ্জাল মেয়েকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করেও যুদ্ধবিমুখ করা গেলো না। অঞ্জলি চৌধুরীর নেতৃত্বে পঞ্চাশটি মেয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার নামে

সেদিন মুক্তিযুদ্ধের ব্রতে আত্মাহুতির দীক্ষা মন্ত্রে শহিদের রক্তের নামে মাটি ছুঁয়ে অগ্নি শপথ নেয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি লহ অঞ্জলি ঃ এমনি কতোনা অঞ্জলি চৌধুরানিরা মুক্তিযুদ্ধের রক্তে মাংসে ছড়িয়ে আছেন। কতোনা অমিত তেজোময়ী নারী যোদ্ধা আমাদের থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন। অনেকের যৌবন গিয়ে বুড়িয়ে গেছেন। তাঁদের গৌরবের সৌরভ ধন্য আভায় এ-জাতি ধন্য। অনেক প্রখ্যাত নারী যোদ্ধা ভারতে প্রস্থান করেছেন। বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসের স্বার্থে, ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজনে, মাতৃকা স্মরণে তাঁদের অবিস্মরণীয় বিস্মরণের স্মৃতির সংরক্ষা আবশ্যক।

ইতিহাসের নির্মম সত্যের অকপট স্বীকারে লজ্জা নেই। হেমায়েত নারীবাহিনীতে অমুসলমান সংখ্যালঘু হিন্দু মেয়েদের সংখ্যা বেশি। স্বল্প সংখ্যক খ্রিস্টান মেয়েও মুক্তি বাহিনীকে গৌরবান্বিত করেছেন। মুক্তিবাহিনীতে হিন্দু ছেলেদের সংখ্যা ছিলো কম। স্বদেশ স্বদেশই। আর বিদেশ বিদেশই হিন্দু-মুসলমান যারই হোক।

অঞ্জলি চৌধুরীর মতো নারী মুক্তিদের এ-দেশ এ-জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। তাঁদের কোল আলো করা বীর সন্তানের স্বর্গ হোক সোনার বাংলা। অনাগত ভবিষ্যতের জাতীয় দুর্দিনে অবলা বাঙালি নারীরা হোন তার সবলা নিদর্শন।

অঞ্জলি পরিচয় ঃ অঞ্জলি চৌধুরী, পিতা ঃ অধর চন্দ্র চৌধুরী। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম-খাগবাড়ি, পোস্ট অফিস-রামশীল, থানা-কোটালিপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানাঃ প্রযত্নেঃ বড় ভাই উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী, বাংলা ভাষার সিনিয়র শিক্ষক, আরামবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, মতিঝিল-ঢাকা -১০০০।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বর্তমানে আমেরিকায় পি এইচ ডি করছেন। জাতীয়তা-জন্মসূত্রে বাংলাদেশী। জন্ম তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ। স্বাধীনতা যুদ্ধ সনদ ঃ এক ও দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে তিনি যুদ্ধ করেন। ২. দেশ রক্ষা বিভাগের স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র এম. এ. জি. ওসমানী স্বাক্ষরিত; ক্রমিক নং-১,৭৫,৭২৩।

গোকুলে বাড়িছে ঃ তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। বিচ্ছু কন্যা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরাঙ্গনা মধ্যমণির গৌরবের যশোগাথায় দশদিক আমোদিত হোক। অস্ত্র চালনায় যে শক্ত হাত ভাঙতে জানে তা শিখতে জানে পড়তে জানে। মেহেদি রাঙা হাত যে রণাঙ্গনে রক্ত-রঞ্জিতও হতে পারে তার প্রমাণ রাখলেন অঞ্জলি চৌধুরী। বীরাঙ্গনার শক্ত হাত দেশ গড়ার যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখবে। অবহেলিত লাঞ্ছিতা বীরাঙ্গনাদের মুখ তিনি উজ্জ্বল করলেন। তোমাদের বধিবে যে স্থলে তোমাদের রক্ষা করবে সে শাসিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। তাঁর জয় হোক। [০১/০৫/১৯৯৪]

পঞ্চম অধ্যায়

প্রচার মাধ্যম ও হেমায়েতের স্বীকৃতি

৯ মে, ১৯৭১ কোটালিপাড়া থানার দুর্ধর্ষ রেইড সাফল্যে হেমায়েত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুজিব নগর জয়বাংলা রেডিওর সাথে অন্যান্য রেডিও প্রচার মাধ্যম তাঁর কৃতিত্বের সবিশেষ প্রচার করে। রামশীল যুদ্ধের কৃতিত্বের সংবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অল ইন্ডিয়া রেডিও, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকায় তার ফলাও প্রচার হয়। কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় রামশীল যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে যুদ্ধ বার্তারূপে প্রকাশ পায়। হেমায়েতের ধৈর্য-শৌর্যের পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হয় রামশীল যুদ্ধে। এই যুদ্ধের স্বীকৃতি ও প্রচার মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত মূল্যায়নে সার্বিক অবদানের বন্দনা মাত্র।

ইতোমধ্যে হেমায়েতের উপরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নের বইগুলি অবশ্যই আলোচনার অবকাশ রাখেঃ

১. মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশ, কৃত অন্ধ লেখক সত্যেন সেন;

২. ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর দ্রুত পঠন 'এ নহে কাহিনী' প্রকাশনায় মঠবাড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষ, প্রকাশকাল ১৯৭৩-১৯৭৪;

৩. নয় মাসে ভারত থেকে প্রচারিত বিভিন্ন চরমপত্র;

৪. অগণিত লেখকের লেখায় হেমায়েতবাহিনী।

৪ঠা আগস্ট 'দি লওয়েল সান-The Lowell Sun পত্রিকায় প্রকাশিত সচিত্র অস্পষ্ট ফটো কপি থেকে তোলা ইংরেজি ও তার বাংলা অনুবাদ।

A PAKISTAN REBELS CLAIM

(The Lowell Sun, Wednesday, August 4, 1971)

By Barnots Zetlin Associated Press Writer KOTWALIPARA, East Pakistan (AP). At about in a 200 square mile paddy swamp, members of the Mukti Bahini, East Pakistan's rebel army claim they are getting shipmensts of arms and ammunition and fresh trained Bengali reinforcement from India to back their offensive against the Pakistan army.

"We are settled down and equipped with heavy arms and ammunition so we can fight face to face with the Pakistan army is the claim of Himayat Uddin, self claimed Mukti Bahini Major who commands the force in Faridpur district and has become somewhat

of a legend in this heavily Hindu rice growing area 80 miles south of Dhaka.

"We will not go back until freedom comes" said the slender major.

"We will keep fighting untill the flag is hoisted . Bengali people with freedom fighter Mukti Bahini at last have courage and strength.

Hiamayat spoke indistinctly in Bengali to an interpreter behind a handkerchief tied over his nose hiding a bullet wound through both cheeks suffered July 14 when he led an attack against the Pakistan army and volunteer razakars at a swamps settlement of Ramshill. That is now counted as one of the Mukti Bahini victories.

We spoke in a family settlement on a path of high ground in a swamp about eight miles east of Gopalganj, home town of Sheikh Mujibur Rahman jailed leader of the banned Awami League whose arrest in early 25 March by the army turned off fighting in East Pakistan.

The rebel move freely by country boat throughout the area. Himayet had a dozen body guards who carried bolt action rifles or stengun.

Hamayet's force clamimed the killing of more than eighty dalals or collaborators including four chairmen of local rulling union councils. They claimed the killing of 130 soldiers and civilian volunteers at Ramshil when Himayet and another rebel opened fire with a machine gun on several slow moving boats containing the force. One independent source said at least 20 bodies were carried out of the area by the army.

Himayet assented his rebels had trained 5,000 recruits in four months. But a source close to the rebels claimed that actual strength was close to 800 including 200 in Himayet camp who usually moved every two or three nights.

Monsoon rain have floods at the paddy areas. Water is expected continue rising until September providing a possible avenue for boats under coverage of darkeness carrying arms and men from India.

The groups agreed that Seikh Mujib is "the only leader" but that

they would not follow him if he participated in a compromise with including continued links with West Pakistan.

(Under photograph of Rebel Leader)

Himayet Uddin self declared major of Mukti Bahini, East Pakistan`s rebel army, sights machine gun at secret camp, near Dhaka, the handkerchief hides a bullet wound. Himayet commands the force in Faridpur district. "We are now settled down and equipped with heavy arms and ammunition so we can fight face to face with the Pakistan army", he says.

এক পাকিস্তানি বিদ্রোহীর দাবি

(দি লোয়েল সান, বুধবার, ৪ আগস্ট ১৯৭১)

বারনটস জেটলিন, এসোসিয়েট প্রেস রাইটার : কোটালিপাড়া, পূর্ব পাকিস্তান (এ পি) ধান উৎপাদক নিম্নাঞ্চলের প্রায় ২০০ বর্গমাইল পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহী আর্মির মুক্তিবাহিনীর প্রভাবিত এলাকা। তাঁরা ভারত থেকে জাহাজ ভর্তি অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাচ্ছেন। তারই সাথে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধিতে আসছে সদ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাঙালি।

মুক্তিবাহিনীর স্বঘোষিত মেজর হেমায়েত উদ্দিন গর্ব ভরে বলেন, "আমরা সুদৃঢ় অবস্থান গেঁড়ে বসেছি। ভারি অস্ত্র গোলাবারুদে আমরা সজ্জিত। ফলে আমরা মুখোমুখি পাকিস্তান আর্মির সাথে লড়তে পারি।" ফরিদপুর জেলায় তিনি তাঁর বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। সারা অঞ্চল জুড়ে তিনি যেন রূপকথার নন্দিত নায়ক। সংখ্যাধিক্যের হিন্দু অধ্যুসিত ধান জন্মানোর শষ্য ভান্ডার এলাকাটির অবস্থান ঢাকার (৮০) মাইল দক্ষিণে।"

পাতলা চিতলা মেজরের ঘোষণা, "স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত আমরা ফিরবো না।"

"বিজয় পতাকা না উড়া পর্যন্ত আমরা লড়ব। আর কিছু না থাক মুক্তিবাহিনীর সাথে বাঙালি জনতার শক্তি সাহস আছে।"

হেমায়েত দোভাষীর সাহায্যে বাংলায় অস্পষ্ট কথা বলছিলেন। রুমালে তাঁর নাক শুদ্ধ চোয়াল চিবুক বাঁধা। দুই চিবুকের মাঝে ফুলে উঠা স্থায়ী বুলেট ক্ষত লুকাচ্ছেন। ১৪ জুলাই রামশীল যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। রামশীলের জলাভূমিতে তিনি পাকিস্তান আর্মি ও তাঁদের সহযোগী স্বেচ্ছাসেবক রাজাকারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। সে যুদ্ধ বিজয় এখন মুক্তিবাহিনীর অন্যতম বিজয় নিদর্শনরূপে গণ্য।

জলাভূমি আকীর্ণ এক উঁচু টিলার মত স্থানে আমাদের উপস্থিতি। একটা পারিবারিক আবাসস্থলে আমাদের কথাবার্তা হয়। আমাদের সাক্ষাৎকার স্থান গোপালগঞ্জের প্রায় আট মাইল পূর্বে। শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির কাছের শহর

গোপালগঞ্জ। নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাকে ২৫ মার্চ রাতের শেষ প্রহরে পাকিস্তান আর্মি গ্রেফতার করে জেলে পুরে। তারই পরিণতিতে আজ পাকিস্তানে যুদ্ধ।

বিদ্রোহীরা স্বাধীনভাবে দেশী নৌকায় পুরা অঞ্চল চষে বেড়ায়। হেমায়েত এক ডজন বডিগার্ড পরিবৃত। তারা বল্টু টানা বৃটিশ রাইফেল বা স্টেন গান চালনায় দক্ষ।

হেমায়েত ফোর্স আশিজনের অধিক দালাল কোলাবোরেটর হত্যার কথা স্বীকার করেন। তাদের মধ্যে চারজন স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল প্রশাসক। শত্রু সেনার বেশ কিছু ধীরগতি নৌকার ওপর অপর এক বিদ্রোহীর সাথে রামশীলে আক্রমণ চালান হেমায়েত। স্বেচ্ছাসেবক বেসামরিক যোদ্ধা মিলে পাক সেনার ১৩০ জন নিহত হয় রামশীল যুদ্ধে। এক স্বাধীন খবরে প্রকাশ আর্মি সে এলাকা থেকে কমপক্ষে ২০ জনের মৃত দেহ তুলে নিয়ে গেছে।

চারমাসে তাঁর বিদ্রোহীদের হাতে ৫০০০ হাজার রিক্রুট প্রশিক্ষণের কথা বলেন হেমায়েত। কিন্তু বিদ্রোহীদের এক নিকট সান্নিধ্য সূত্রে প্রকাশ আসল শক্তি আটশতের কাছাকাছি। এরই মধ্যে দুশ চলে হেমায়েতের সঞ্চরমান ক্যাম্পের সাথে। যারা সচরাচর দু'থেকে তিনি রাত্রির ব্যবধানে স্থানান্তরে প্রস্থান করে।

মৌসুমী বৃষ্টিতে ধানি জমির নিম্নাঞ্চলে প্রবল বন্যা। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পানি বাড়ার সম্ভাবনা। বর্ধিত পানি রাতের আঁধারে মুক্তির নৌকা চলাচলের রাস্তার সুযোগ খুলে দেয়। এই সুযোগের আড়ালে ভারত থেকে অস্ত্র ও মানুষ আসে।

শেখ মুজিবকে "একমাত্র নেতা" বলে গ্রুপ স্বীকার করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে লেজুড় বৃত্তির যোগাযোগ সূত্রের সমঝোতায় তিনি রাজি হলে তারা তাঁকে মানবে না।

নতুন পুরাতন মিলিয়ে বাস্তবে শেষ পর্যন্ত হেমায়েত ফোর্স সংখ্যা ৫,৫৫৮ (পাঁচ হাজার পাঁচশত আটান্ন) জন। সত্যিকার অর্থে নিয়মিত ফোর্স সংখ্যা ৮০০ (আট শ)-এর মত।

বিদ্রোহী নেতার

(ফটোর নিচে লেখা)

পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহী আর্মির স্বঘোষিত মেজর হেমায়েত উদ্দিন। ঢাকার কাছে এক গোপন ক্যাম্পে মেশিন গানের সামনে তাঁর দর্শন। রুমাল দিয়ে লুকায় এক বুলেট আহত ক্ষত। হেমায়েত তাঁর বাহিনী কমান্ড করেন ফরিদপুর জিলায়। তাঁর কথা, "আমরা এখন সুদৃঢ় অবস্থানে এবং ভারি অস্ত্র গোলাবারুদ সজ্জিত। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা এখন পাকিস্তান আর্মির সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে পারি।"

ফটোকপি কাটিংয়ের উল্টা পিঠে হেমায়েত হাতের লেখা

৪ঠা আগস্ট, ১৯৭১ সালে দি নয়েল সান পত্রিকার (ব্রিটিশ) সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রদান করি। আমি তখন গুলিবিদ্ধ অবস্থায়। কথা বলতে অক্ষম ছিলাম। ইহা সম্পূর্ণ ফটোকপি হইতে ফটোকপি হেমায়েত উদ্দিন।[১৫/১০/১৯৯৩]

"ব্রিটিশ পত্রিকার দি লোয়েল সান-এর সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারে হেমায়েত বাহিনী প্রধান প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, আমি কোন বিদেশী সাহায্য ছাড়াই এই দলটিকে বিশ বছর চালাতে পারব এবং সে পরিমাণ গোলাবারুদ বিদ্যমান আছে। একটি মাটিগর্ভস্থ অস্ত্রগার দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে যায় এবং চমকে উঠে মন্তব্য করেছিলেন, যে বাংলাদেশ অবশ্যই স্বাধীন হবে।" (রেফারেন্স: 'জীবন্ত স্বাক্ষর' বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৯৩ হেমায়েত উদ্দিন থেকে হেমায়েত বাহিনী' পৃষ্ঠা ১৯)।

বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিকদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে হেমায়েত কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের সার সংক্ষেপ

নির্যাতিত বাঙালি জনতার আশীর্বাদপুষ্ট মুক্তিবাহিনী। মার্কিনি রক্ত চক্ষুকে ভয় পাই না। বিশ্ব বিবেক আমাদের পক্ষে। মা-বোনের ইজ্জত ও দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়ছি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের সামরিক সমাধান চাপিয়ে গণ রায়ের নির্বাচন বাতিল করে পাকিস্তান ভাংছে পাক সামরিক জান্তা। আমরা ন্যায় ও সত্যের জন্য যুদ্ধ করছি। অত্যাচারী শত্রুর বাড় বাড়ছে। নির্যাতিত অসহায় আর্তমানবতার ডাকে দুদিন আগে পরে সাড়া দেন স্বয়ং আল্লাহ। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আমি স্বাধীনতা না দেখে যেতে পারি কিন্তু মুক্তিকামী জনতা স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিবেই।

ভারতের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ চালাবার আশা আমি করি না। কিন্তু সবকিছুর পরও ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করি। দুঃস্থ মানবতার ডাকে সাড়া দিয়েছে ভারত। এ-দেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছে ভারত। ভয় ও অত্যাচারে বাস্তুচ্যুত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে নিরাপত্তা, আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার মত বিপুল ঝুঁকির দায়িত্ব নিয়েছে ভারত। তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আমার শেকড় দেশের মাটিতে প্রোথিত। আমার গ্রুপের জন্য বিদেশের কোন সাহায্যের প্রয়োজন মনে করি না।

৬ আগস্ট, ১৯৭১। স্থান গৌরনদী জোবার পাড় মিশন। নরওয়ের দুইজন সাংবাদিক হেমায়েত-এর সাক্ষাৎকার নেন। সাংবাদিকের প্রশ্নের মার প্যাঁচে হেমায়েত।

১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আজ নিজের চিকিৎসার জন্য ভারত যাত্রায় ঘৃণা ও করুণা বোধ করি। অগণিত দেশবাসী ও ভিতরে যুদ্ধরত আহত মুক্তিরা কি চিকিৎসার জন্য ভারতে যেতে পারছে? ভারত যাত্রার কাফেলার কুফায় শামিল হতে চাই না। আজকের হিজরতিরা একদিন তাদের গায়রত বুঝবেন। অসহায় নিরীহ জনতাকে চরম বিপদের মুখে ফেলে বিদেশ যাত্রা কেমন স্বদেশ প্রেম? শরণার্থী ফেউরা কি দেশে ফিরবেন না? এভাবে বিদেশমুখী দলে ভাঙ্গন লাগতে পারে। আহত অবস্থায় যদি মরে যাই বাংলার মাটিতে মরব। চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়ে মরতে চাই না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হাজারো মানুষের দোয়ার বরকতের আশীর্বাদে আমি বেঁচে উঠবই। মরণ বাঁচন আল্লাহর হাত। শ্বাস থাকতে ভারতের মাটিতে নিজকে ঋণী করতে রাজি নই।

পাকিস্তান আর্মির মত শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ে সাংবাদিকবৃন্দের দ্বারা সংশয় প্রকাশের কারণে আবেগাপ্লুত হন হেমায়েত। আমার হাতে যে শক্তি আছে তার দ্বারাই দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালাব। ছিনিয়ে আনা শত্রু-অস্ত্রে শক্তি সঞ্চয় করব। আমার আজকের যা শক্তি সবটাই পাকিস্তান আর্মিকে পরাভূত করে সংগ্রহ করা। শক্তি বাড়ছে। শক্তি বাড়াবো।

আহত বাঘের থাবা

শৌর্যের পরাকাষ্ঠা ঃ রামশীল যুদ্ধে শত্রুর ব্রহ্মশেল হজম করেন হেমায়েত। তাঁর শক্তি সাহস ও রণচাতুর্যের পরাকাষ্ঠা রামশীল। সহমর্মিতা-ধৈর্য্য-স্থৈর্য ও দলপতির অবর্তমানে যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখার সম্ভাব্য নিখুঁত পরিকল্পনায় অনন্য স্বাক্ষর ধন্য যোদ্ধা হেমায়েত। তাঁর হাতে অনেক পেন্তানি হজম করেছেন পাক আর্মি তারই নমুনা তাঁদের পরবর্তী কার্যক্রম।

আহত বাঘের জেদ ঃ বাংলাদেশ ধন্য সুন্দর বন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্য। আহত ক্ষিপ্র বঙ্গ শার্দুলকে ভয় পায় না এমন শিকারি কেউ নেই। ১৪ জুলাইর আহত বাঘ হেমায়েত ২১ জুলাই শত্রুর খোঁজে দাপটের সঙ্গে বেরুলেন। ক্ষেপা বাঘের থাবা আর চোয়ালের প্যাঁচে পড়তে পাক শত্রুর সাহস নেই। সাইবের হাট অবরোধকারী পাক কমান্ডার হেমায়েত-এর নাম শুনলেই পালিয়ে বাঁচেন। সত্যিকার যুদ্ধ পর্যালোচনার আলোকে ১৪ জুলাইর পর এলাকায় পাক আর্মির তেমন আক্রমণ ঘটে নি। তারা আশপাশ এলাকার রাজাকার ক্যাম্পগুলি পর্যন্ত তুলে নেন। ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল মূল স্থল সড়ক পথ চালু রাখেন মাত্র। পাক সৈন্য চলাচলে সড়ক উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। ফরিদপুর-বরিশাল সিএন্ডবি রোডের ব্রিজে রাজাকার প্রহরা জারি থাকে। বেঈমান বাঙাল রাজাকারে বিশ্বাস নেই। তাই মাঝে মাঝে ব্রিজে চলে নিয়মিত আর্মির প্রহরা। এবার মুক্তিবাহিনীর অপারেশন টার্গেট সিএন্ডবি রোড ব্রিজ। চারিদিকে মুক্তি-আক্রমণের প্রবল চাপে খাবি খান রাজাকার। ব্রিজ প্রটেকশন রাজাকার পার্টি দালাল ধরে গোপনে মুক্তি-সংযোগ ঘটায়। পাকিস্তান থাকবে কি যাবে সে চিন্তা পরে। রাজাকারের ভাবনা, "আগে তো মুক্তির হাত থেকে প্রাণটি বাঁচাই। দুদিন আগে পরে পাক আর্মি যাবে পাকিস্তান। আমরা যামু কই? পাক পেয়ারের নমুনা তো দেখছি। কেউ কি আর আমাদের মুসলমান তো দূরের কথা মানুষ বলে গণ্য করে! কথায় কথায় গালমন্দ, চড়, লাথি, রাইফেলের বাটের বাড়ি তো পান্তা ভাত। ইসলামি ফৌজের খাসলামি তো দেখলাম। পরের মা-বোন তাদের আইনা দেই মৌজের জন্য। আজ চশমখোরেরা আমগ নিজের মা-বোন-স্ত্রীদের ছাড়ে না। লুটের দায়ের যত বদনাম রাজাকারের। সোনাদানা-টাকা পয়সা কামায় পশ্চিমা খাসি। এমন পাকিস্তান থাকব না। আমরা এবার প্রাণে বাঁচি।" গোপনে মুক্তি হাতে রাজাকার আত্মসমর্পণ শুরু।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মাসির বাড়ি সমাচার

দোদুল্যমান সংশয়ে ঃ শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পান ২৬ মার্চ, ১৯৭১। চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট এলাকায় অবস্থিত ছিলিমপুর নৌবেতার কেন্দ্র মোর্স কোডের মাধ্যমে সে সংবাদ পৌঁছায় কলকাতা নৌ-বেতার কেন্দ্রে। কলকাতা সে সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে দেয় ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী। পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনী কুষ্টিয়া দখল করে। বিজিত কুষ্টিয়া দখলের দুর্লভ সংবাদ নিয়ে এপ্রিলের প্রথম দিকে তাজউদ্দিন আহমদ নয়া দিল্লী যান। আলোচনায় বাংলাদেশের বিপর্যস্থ মুক্তিবাহিনীর জন্য ইন্দিরা আশ্বাস প্রদান করে বলেন : 'তোমাদের দেশে যুদ্ধ কর। তিষ্ঠাতে না পারলে ভারত বর্ডারে আস।'

সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিসেনার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র যোদ্ধা গ্রুপ বর্ডার ক্রস করে ভারতে ঢোকে। মার্কা মারা স্বাধীনতার প্রবক্তা রাজনৈতিক নেতাদের বিদেশ পলায়ন সম্পন্ন হয় অতি গোপনে। ইতোমধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। রক্ষা যে, তড়িঘড়ি প্রবাসী সরকার শপথ নেয়। অন্যথায় ফিলিস্তিন নিয়ে মার্কিনি স্তোকবাক্যের শোক সাগরে ভাসতো বাংলাদেশ। ফিলিস্তিনিদের বাস্তবায়নে লেগেছে পঁয়তাল্লিশ বছর। কথায় আছে 'মার্কিনি লাছা ছাড়ে না পাছা।'

সত্যিকার অর্থে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পা দিয়ে সশস্ত্র প্রতিরক্ষা গ্রুপ, রাজনীতিবিদ ও শরণার্থীরা ভারতে পদার্পণ করেন। কি হবে না হবে কেউ জানতো না। ভারত সবাইকে গারদে পুরে কিনা তারও সন্দেহ ছিল। তাজউদ্দিন আহমদ-ইন্দিরা গান্ধী সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমঝোতার পর প্রবাসী সরকার, রাজনীতিবিদ, সশস্ত্র যোদ্ধা, শরণার্থীর ব্যাপারে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ভারতে অবস্থিত বাঙালি সংশয়ের দোলাচালের অবসান হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় বিএসএফ ঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) ভারতের পক্ষ থেকে বাঙ্গালাদেশকে সার্বিক সহযোগিতা দেয়। ইপিআর ও বিএসএফ-এরা দু'গ্রুপ দু'দেশের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। চোরাকারবার দমন করাই তাদের মূল দায়িত্ব। ক্রমান্বয়ে ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পাকিস্তানের নিয়মিত আর্মির সাথে যুদ্ধ করতে হলে মুক্তিবাহিনীর জন্য আরও প্রশিক্ষণ ও রণকৌশল চাতুর্য প্রয়োগের প্রয়োজন আছে, যে-বিষয়ে কেবল সাহায্য করতে পারে ভারতের নিয়মিত বাহিনী। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সিংহ ভাগই ইপিআর। দুই দেশের দুই স্মাগ. দমন ফোর্সের কাজ নয় নিয়মিত যুদ্ধ করা। সব কিছুর পরও বলতে হয়

বিএসএফ তাদের সীমিত সম্পদ ও কৌশলগত বুদ্ধিতে মুক্তিযুদ্ধের জন্য যথেষ্ট করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত আর্মি ঃ মুক্তিযুদ্ধের খাদ্য-অ্যামুনিশন-অস্ত্র সরবরাহ বিএসএফ-এর হাত থেকে ভারতের নিয়মিত আর্মির হাতে যাবার পর যুদ্ধে গতি সঞ্চারিত হয়। ভারতীয় আর্মি বাঙালি মুক্তিদের জন্য গেরিলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, তবে নিয়মিত আর্মির প্রশিক্ষণে তারা অনীহ। আগস্ট মাস থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত গেরিলারা বাংলাদেশে প্রবেশ আরম্ভ করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত গ্রুপগুলির সাথে সমন্বয়ের যুদ্ধে জাতিকে সুফল দিয়েছে।

দিল্লির লাড্ডু ঃ বাংলাদেশের জন্য নিয়মিত আর্মির ট্রেনিং প্রকৃতই সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। পাকিস্তান আর্মিরই অংশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের মাইরটা তারা ভুলেনি। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে সিপাহি বিপ্লবে অমঙ্গলের ঘণ্টা ধ্বনি বাজায় বাঙালি মঙ্গল পাণ্ডে। ভারতের পূর্বাংশে বাংলা ভাষাভাষী জনতার জয়বাংলা স্লোগানে অতি উৎসাহ নয়া দিল্লিকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

ঘোষলকে ঘোল খাওয়ানোর মত বাঙালি আবার এক হবার তালে নাই তো! বাংলার আওয়ামী লীগ যুগল জনক ভাসানি ও সোহরাওয়ার্দী কিন্তু ভারত বিভাগকালে বাংলা বিভাগ চাননি। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে রদ করা হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগে দিল্লির চাল আবার কাজ দেয়। বাংলা আজ যা ভাবে ভারত উপমহাদেশ তা ভাবে আগামী কাল। এবার দুই বাংলার ফালপারানি বন্ধ করা চাই। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতায় পশ্চিম বাংলার মানুষের এত উৎসাহ কেন? দুই বাংলায় স্লোগান, "তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ।" দিল্লির লাড্ডু খাওয়া বাংগাল কি নয়া দিল্লিরে কলা দেখাতে চায়। পশ্চিম বাংলার ভেড়া বাংগালের ঘাড় যে আজ খাড়া খাড়া। তারা কয়, 'দাদা ভুলের মাসুল দিতাছি। আজ নিজ ভূমে আমরা পরবাসী। বাঙাল গরুরে খায় হিন্দি ছাগল। আপনাদের একটা এসপার ওসপার হোক। দিল্লিরে একটা হিলা দিমু। শালারা পাইছে কি?'

মাসির হাসি ঃ মাসির চাল না বুঝেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। প্রত্যাশার দৌড়ে বর্ডারে গেলেন মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের অস্ত্র সাহায্য পাবার আশায়। প্রথমে তারা না করলেন না। কিছু ব্রিটিশ রাইফেলের গুলি, টর্স ব্যাটারি, চারমিনা সিগারেট, বিস্কুট, ঔষধপত্র দিলেন। বিরাট আকারের বড় কিছু দেবার রঙ্গিন স্বপ্নে মাতিয়ে রাখলেন রাজনীতি সচেতন বাঙালি ও বাঙাল যোদ্ধাদের। প্রথমে বরাভয় অভয় বর্ডারে আস। পরে নির্ভয়ে বর্ডার ক্রস কর। এবার যুদ্ধ কর। ইঁদুর গর্তে ঢুকাইছি। এবার দেখবা নিড়ালের খেল কারে কয়!

চানক্য চালের মোহনীয় হাসির মায়ার চালে না জড়ালে ভাল হতো। জনতা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন করে আওয়ামী লীগের সব বালা মুছিবত দূর করবে স্বপ্ন ছিল অশুভ ছায়া মাত্র। ইয়াহিয়া সুবিতে সব দিয়ে আওয়ামী ভাবনার কাওমী দুর্যোগ ডেকে আনে। কুষ্টিয়া বিজয়ী মেজর আবু ওসমান চৌধুরী যশোর সেনানিবাস অবরুদ্ধ করে বসে

আছেন চৌদ্দ দিন। ভারতের দিই দিচ্ছি আশ্বাসে সময় গেল। ভয়ে পালানো যশোর সেনানিবাসের পাক আর্মি আবার ফিরে এসে সংহত হলো। একটি মহা বিজয়-সুযোগ মুক্তিবাহিনীর হাত ছাড়া হয়ে গেল। মাসির হাহাকার বেদনার আহাজারিতে বাঙালি তুষ্ট। বাস্তবে তখনকার মত ভারতের অস্ত্র সাহায্যের মাধ্যমে যুদ্ধের এসপার কি ওসপার ফয়সালার সুযোগ হারাল মুক্তিফৌজ। এমনি আছে কতনা অকথিত সামরিক রাজনৈতিক কূটচাল।

চানক্য চালে ঃ ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে 'সব পেয়েছির' ধরনের এক গজবের দেশ। তার নিয়মিত সৈন্যের কি দরকার! ভারতই তো সব করে দেবে। পাক আর্মি তাড়াতে যা লাগে তার বাইরে আর কি দরকার। তারা নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ছন্দে মুক্তি গেরিলা ট্রেনিং শুরু করলেন। গেরিলারা প্রশিক্ষণ পায়। অস্ত্রে সজ্জিত হয়। বাংলাদেশের ভেতরে যায়। কিযে করে তার কোন খবর না জানে বাংলাদেশ আর্মি না জানে প্রবাসী সরকার। গেরিলা প্রশিক্ষণ, অস্ত্র বিতরণ, ইনডাকশন, অপারেশন, জবাবদিহিকরণ ইত্যাদি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে ইন্ডিয়ান আর্মি। চানক্য চাল, বাংলাদেশের কেউ কিছু জানে না।

বাঘের বাসায় ঘোগ। ইন্ডিয়ান আর্মির চেয়ে সেয়ানা ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা শাখা রিসার্স এন্ড এনালাইটিকেল উইংয় 'র'। তারা বাংলার সেরা চৌকশ ছেলেদের বেছে নেন বিশেষ কার্যক্রমের বাহিনীর নামে 'শেখ বাহিনী'। শেখ মুজিবের নামের যাদুটি তারা কাজে লাগান। আবার শেখ ফজলুল হক মণি নামে শেখ মুজিব ভাইগনাকে দিয়ে বিশেষ বাহিনী বিএলএফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স গড়ে তুলেন। মস্কো বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করে। তাই ভারত ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দল উপদলের আলাদা প্রশিক্ষণ হয়। একই স্বাধীনতার জন্য নানা জাতের গেরিলা প্রশিক্ষণ। প্রত্যেকের আদর্শই যেন ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধ ছেড়ে অনেকে লেগেছেন ইন্ডিয়ানদের ছুতার মার্কা পালিশে। শেখের নামে গোঁ ধরা চিত্তরঞ্জন ছুতার চান ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে ভারতের করদ রাজ্য বানাতে। মুক্তিফৌজের নামে অন্তর্দ্বন্দ্বেই যেন মুক্তিযোদ্ধারা মরে শেষ হবে।

৮নং সেক্টর মুজিব বাহিনীর ভিতরের রহস্য জানতে চায়। ক্যাপ্টেন/ প্রফেসর সফিককে নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে ইনফিলট্রেট করার জন্য। তাদের মাঝে ছদ্মবেশে গিয়েও প্রফেসর ধরা পড়েন। নির্দলীয় বিধায় প্রাণে বাঁচলেন তিনি; তবে আসার সময়ে প্রফেসর সুলভ কিছু নীতিবাক্য রেখে এলেন বন্ধুদের জন্যে। যশোর কেশবপুর থানার ধানদিয়া গ্রামের মুজিব বাহিনী নেতা রফিক। যুদ্ধে কপালে গুলি লাগে। কপালের গুলির দাগ তাঁর আজন্মের বিজয় তিলক। এই রফিকের হাতে যুদ্ধের শুরুতে গ্রেনেড তুলে দেন কাপ্তান সফিক। কপালে গুলি লেগে রক্ষা পেয়ে তাঁর গুরুবাক্য স্মরণ হয়। প্রফেসর/কাপ্তানের সান্নিধ্যে এলেন স্বেচ্ছায়। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে যুদ্ধাহত কাপ্তান সফিক অলৌকিক ভাবে বেঁচে উঠলেন। এবার দুই আহত একত্র হলেন। মৃত্যুর হাতে থেকে বাঁচা রফিক অধ্যাপকের নিকট সত্য লুকানোর জন্য ক্ষমা

চেয়ে নিলেন। ভারতীয় আর্মির হাতে মুজিব বাহিনীর নৃশংসতার প্রশিক্ষণের ব্যাপার জানান ক্যাপ্টানকে। তার প্রতি নির্দেশ ছিল, বাংলাদেশের ভিতরে গিয়ে আবালবৃদ্ধবণিতা খুন করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম কর। ব্রিজ/পাইলন উড়াও। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কর। যেখানে বাধা পাবে, মুজিব বিরোধী, আওয়ামী লীগ বিরোধী, মুজিব বাহিনী বিরোধী, ভারত বিরোধীকে নির্বিচারে খুন করবে। মুক্তিযুদ্ধের হাইকমান্ডের বাইরে বাংলাদেশের ভিতরে যারা যুদ্ধ করে তাদের হত্যা কর। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত প্যাডে দালাল হত্যার লিখিত তালিকা পূর্বেই পান ক্যাপ্টান সফিক। সে হত্যা তালিকার নিচে কারও স্বাক্ষর নেই। সিল গালার চিঠি খুলতে প্রফেসরের সন্দেহ। পথে কোথাও যেন কেউ সে চিঠি খুলেছে। সেক্টর কমান্ডার মঞ্জুরকে সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘাতক তালিকার ব্যাপারে বেফাঁস প্রশ্ন করেন ক্যাপ্টান। ভারত বা আওয়ামী লীগের শত্রু বিধায় বিনা বিচারে কোন বাঙালিকে হত্যা করতে প্রফেসর সরাসরি অস্বীকার করে বসেন। রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে অন্যায়ভাবে বাঙালি হত্যা-বিরোধী কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন/প্রফেসর-এর নীতি প্রকাশ্যে সমর্থন করেন সেক্টর কমান্ডার মঞ্জুর। অন্যদের ব্যাপারেও তিনি একই বিধিনিষেধ আরোপ করেন। বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি এমন বিহারিদের ওপর পর্যন্ত কোন প্রকারে হাত তোলা যাবে না এমন হুশিয়ারিও তিনি প্রদান করেন। কারণ আত্মরক্ষায় যে কারও অস্ত্র ধরার অধিকার আছে।

কার ওষুধে যে কি হয় কে জানে? একলক্ষ টাকা শুদ্ধ এক বাঙালি ঘাতক ধৃত হয়ে ক্যাপ্টেন হুদার বয়রা কোম্পানিতে আটক আছে। সুনির্দিষ্ট কজন উদীয়মান প্রতিভাবান বাঙালি সেনা অফিসার হত্যার লক্ষ্যে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। ঘাতক কাজ শুরুর প্রাথমিক পর্বেই ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ইন্টেলিজেন্সের হাতে ধরা পড়ে সে।

মেজর জলিল ৯ নং সেক্টর প্রতিষ্ঠার পর ৮নং সেক্টরের অস্ত্র, অ্যামুনিশন ও জল বাহনের বিরাট বহর নিয়ে অভিযানে চলেন বরিশালে। ৮নং সেক্টর কর্তৃক ৯নং সেক্টরকে সাহায্য করার আত্মতৃপ্তির কিছুই নেই। আজও সেনা-ঐতিহ্য এক ব্যাটালিয়ান গড়ে উঠতে (রেইজিংয়ে) পাশের প্রতিষ্ঠিত ব্যাটালিয়ান/ ব্রিগেড/ ডিভিশন প্রাথমিক সাহায্য দেয়। অতি প্রচারে তাঁর যাত্রাপথের গোপনীয়তার ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তিনি সুন্দরবনের মোহনায় "বুড়ি গোয়ালিনী" নামক স্থানে শত্রু অ্যাম্বুশে পড়েন। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মাঝে তাঁর এক ক্যাপ্টেন পাকিদের হাতে ধৃত ও বন্দি হন, সম্ভবতঃ তাঁর নাম নাসির। পাকি-আর্মি তাঁকে টেলিভিশনে বিশ্ব দরবারে হাজির করে ভারত বিরোধী প্রচারণা চালায়। সদ্য গঠিত মুক্তিবাহিনীর ৮০০ রাইফেল, যা ক্যাপ্টান সফিক নিজের উপস্থিতিতে রাতের আঁধারে তাঁর জন্য ট্রাকে উঠিয়েছিলেন, কয়েক লাখ নানা ধরনের অ্যামুনিশন ক্যাপ্টেন সফিকই রাতের আঁধারে মেজর জলিলের জন্য বনগাঁয় ট্রাকে উঠানোর ব্যবস্থা করেন। পিওএল, বস্ত্র, ওষুধ, যুদ্ধের নানা উপকরণসহ কিছু জনবল তাঁর লঞ্চে করে বরিশাল যাচ্ছিলো। এমনি ধরনের যুদ্ধসম্ভার ও জনবল হারানোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে 'বুড়ি গোয়ালিনী' বিপর্যয়ের পর কার্যতঃ ৯ নং সেক্টর

কমান্ডার জলিল কমান্ড হারান। এ-কারণে তিনি মুক্তিফৌজ কমান্ডার ইন চীফ ওসমানী কর্তৃক প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা পান।

৮ নং সেক্টরের ক্যাপ্টেন/প্রফেসর সফিককে হাত করে প্রবাসী বাংলাদেশ আর্মি ও তাজউদ্দিন সরকারের আনুগত্যের বাইরে যোদ্ধা গ্রুপ গঠন করতে চাইলেন মেজর জলিল। বাংলাদেশ সরকার ও আর্মির অথর্ব নেতৃত্বের জন্য ভারত বিক্ষুব্ধ। কাউন্টার ক্যুর ব্যাপারে ভারতীয় আর্মির সায় থাকার কথা তিনি ক্যাপ্টেন সফিককে জানান। তরুণ ছাত্র যুবকদের ওপর প্রফেসর-এর প্রভাবের কারণেই হয়তো জলিল তাঁকে বেছে নেন। উল্টা বিভীষণ চিনতে ভুল করলেন জলিল। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই খুলনায় মেজর জলিল গ্রেফতার হওয়ার মাধ্যমে সে নাটকের অবসান ঘটে।

যশোর মনিরামপুরে বাংলাদেশ বিমানের গেরিলা যোদ্ধা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ফজলুল হক হত্যার নির্দেশ পায় মুজিব বাহিনী। কে মুজিব বাহিনীকে এই নির্দেশ দিয়েছে জানতে চাইলে তরুণ মুজিব বাহিনী সদস্য জানান তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেয়েছেন। কোন অদৃশ্য হাত যে আওয়ামী লীগের তল্পিবাহক, ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী নয় এবং মুজিব বাহিনী বিরোধী–বাংলাদেশের ভেতরে যুদ্ধরত এমন যে-কোন কমান্ডার হত্যায় তারা যে উদ্যত তার স্পষ্ট নিদর্শন পেলাম। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ফজলুল হক বামপন্থী এটাই তাঁর অপরাধ। কি মুজিববাহিনী কি অন্যান্য তরুণ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম থেকে বিরত থেকেছে তাঁদের স্বদেশ প্রেমের কারণে। তাঁরা অকুস্থলে যুদ্ধরত কমান্ডারদের সাহস ও নেতৃত্বের গুণে বিমুগ্ধ ছিলেন বলে শত্রু-চক্রান্ত ফাঁস করে দেন।

ঢাকার অভ্যন্তরে যুদ্ধ করে অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম প্রবাসী সরকারের শত্রু তালিকাভুক্ত হন। ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম ইউওটিসি (পরবর্তীকালে বিএনসিসি)-তে কাপ্তান সফিকের ব্যাটালিয়ান কমান্ডার ও সামরিক প্রশিক্ষক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও একাধিকজনের প্ররোচণায় মুক্তিযুদ্ধের সময়কার প্রবাসী সরকার তাঁকে ভুল বুঝে। তিনি মূলত ছিলেন বামপন্থী। মস্কোর সাহায্য প্রাপ্তির আশার বাইরে আওয়ামীলীগ যতই বামপ্রীতি দেখাক, বাস্তবে তাঁদের সইতে ছিল নারাজি।

টাঙ্গাইলের বাঘা সিদ্দিকীর ওপরও ভারত ক্ষেপা। অভ্যন্তরীণ যোদ্ধাদের নাম বর্ডারে যুদ্ধরত কোম্পানি কমান্ডারগণ জানতেন না। কাদেরিয়া বাহিনী ও হেমায়েত বাহিনী সম্পর্কে অনেকেই শেষ পর্যায়ে জেনেছেন। কারণ তাঁরা সাংকেতিক নামে পরিচিত ছিলেন। একাধিক ভারতীয় উর্ধ্বতন সেনা অফিসার ও বাংলাদেশ আর্মি অফিসারকে কাদেরিয়া বাহিনীর ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। কারণ বাহিনী প্রধান মূলত ইবিআর-এর সৈনিক। অথচ বিপদের দিনে এই কাদের সিদ্দিকীর সাহায্য কাজে লাগায় ভারত-বাংলা ও যৌথ কমান্ড।

বেঙ্গলের সুবেদার চট্টগ্রাম বোয়ালিয়া থানার কসাই সিরাজের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ভারত ফেরতা যোদ্ধাদের। অত্র লেখকের প্রকাশিতব্য "মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম" শীর্ষক গ্রন্থে 'মুক্তিযুদ্ধে কসাই সিরাজ' নামের একটি লেখায় উক্ত মুক্তিযোদ্ধার এক সাক্ষাৎকার গ্রন্থিত হয়েছে। তাতে এতদসম্পর্কিত সংঘর্ষের বিশদ বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

রংপুর রৌমারিতে যুদ্ধরত সুবেদার আফতাবকে ধরতে আসে সশস্ত্র ভারতীয় আর্মি। যশোরের মুক্তিযোদ্ধা আকবর চেয়ারম্যানের প্রতি ভারত নাখোশ। 'রৌমারির রকমারি' নামক সুবেদার আফতাবের দেয়া সাক্ষাৎকার অন্যত্র গ্রন্থিত রয়েছে। মাগুরা বার্তায় প্রকাশিত আকবর চেয়ারম্যান লিখিত 'মুক্তিযুদ্ধে শ্রীপুর' কাহিনীতে তাঁর বিবরণ রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে ফরিদপুর-বরিশালের অভ্যন্তরীণ যোদ্ধা হেমায়েতের ব্যাপারে মেজর জলিলের কান ঝালাপালা হয়ে যায়। হেমায়েতের বিরুদ্ধে মেজর জলিলের নিকটে বহু অভিযোগ উঠায় তিনি তাঁকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। যে কর্মকর্তা তাঁকে গ্রেফতার করতে এলাকায় আসেন, বাস্তবে সবকিছু সত্য জেনে হেমায়েতকে গ্রেফতার করা থেকে বিরত থাকেন। এসব ঘটনা বাস্তব চিত্রের সামান্য নমুনা মাত্র। এমনি আছে কত অকথিত কাহিনী!! এই তো গেল নেতৃস্থানীয় ব্যাপার। বিভিন্ন গেরিলা দল-উপদলে অভ্যন্তরীণ অন্তর্বিরোধে মুক্তিরা নিজেরা যুদ্ধ করে মরে। একই এলাকায় যুদ্ধ করে কেউ কারও কমান্ড মানে না। ৮ নং সেক্টর কোম্পানি এলাকা দিয়ে মুজিব বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে। আগস্টে তাঁদের এক দল ক্যাপ্টেন সফিকের হাতে বাধা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে নিয়মিত যোগাযোগ ছাড়া এলে যেতে দেয়া হবে না বলে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়। মুজিব বাহিনীর নেতা তোফায়েল আহমদ ও আবদুর রবকে পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সফিক-এর ক্যাম্পে এসে সংঘাত এড়াবার সব বিষয় সুরাহা করতে হয়েছে। প্রফেসর/হেমায়েতকে তাঁরা পাননি। অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিধায় দূরদৃষ্টির প্রজ্ঞায় তাঁরা প্রফেসরের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ফিরে যান। মুক্তিবাহিনী নামের মুক্তবাহিনী কর্তৃক কেন্দ্রীয় কমান্ডের অভাবে কত অঘটন ঘটছে, কত যে মূল্যবান প্রাণ ঝরে গেছে, যুদ্ধের ডামাডোলে সব চাপা পড়েছে। রক্ষা যে ভারত বাংলাদেশ যুক্ত কমান্ড গঠনের মাধ্যমে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে সর্ব প্রকার বাঙালি যোদ্ধা গ্রুপ একই কমান্ডে আসে। নেতৃত্বহীন ভেড়া বাঙালকে সোজা করতে কতক্ষণ! বাংলাদেশের এত দুর্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিফৌজ অফিসারের অভাব। প্রথম থেকে তরুণ গেরিলা অফিসার বাংলাদেশ হাতে পেলে এবং তাঁরা প্রশিক্ষণ পেলে ব্যাপার ভিন্ন দাঁড়াতো। গেরিলা ইনডাকশন ও মটিভেশন শুরুতে বাংলাদেশ আর্মির হাতে থাকলে ব্যাপার এত খারাপে গড়াতো না। বাংলাদেশের ভিতরে পাঠানো গেরিলা দলের সঙ্গে অফিসার থাকলে গেরিলা টাউটের খপ্পরে পড়ে চানক্য মামার কূটচালে কাজ করতো না। মেজর হায়দার-এর হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দেশ ও জাতির গৌরব। তাঁর গেরিলারাই ঢাকায় পাক আর্মি ও পাক-সরকারের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দেন। ইতিহাসের কি নির্মম খেলা। পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌলার প্রতি অনুগত থেকে ইংরেজ চর সেনাপতি মীর জাফর আলি খানের বিরোধিতা করা যদি দেশপ্রেম হয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান শেখ মুজিবের প্রতি অনুগত থাকা কি মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের জন্য দেশপ্রেম নয়? বাংলার অনাগত ইতিহাস মোহনলাল, মীরমদন, ইয়ার লতিফের মতই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ

বীর উত্তম, কর্ণেল খোন্দকার নজমুল হুদা বীর বিক্রম ও মেজর হায়দার বীর উত্তমকে। আয়ুষ্কালে ক্লাইভের গাধা মীর জাফর আলি খানের গুণ কীর্তণের লোকের অভাব ছিল না। ইতিহাসের নির্মম বিচারে পরবর্তীকালে ইতিহাসে ধিকৃত হন মীর জাফর আলি খান।

গেরিলা সমাচার ঃ আগস্ট ১৯৭১ থেকে ভারতীয় আর্মির হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা গ্রুপের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ শুরু হয়। শেখ মুজিবের প্রতি দুর্বলতাজনিত কারণে সর্বাধিক গেরিলার ইনডাকশন হয় ফরিদপুরে। যুদ্ধকালে তাঁদের অনেকে হেমায়েত-এর সংস্পর্শে আসেন। ভাল-মন্দের দুটার বিচারেই তাঁরা হেমায়েত বাহিনী প্রভাবিত অঞ্চলে ছিলেন।

মাদারিপুরের তেমন তিনজন ভারত ফেরতা গেরিলা কমান্ডার হচ্ছেন :

ক। খলিল কমান্ডার।

খ। আলমগীর কমান্ডার।

গ। সিরাজ মিয়া কমান্ডার।

তাঁরা তিন গ্রুপই হেমায়েত বাহিনীর প্রধানের সাথে শশিকর কলেজে সমঝোতা সভায় বসে নীতি নির্ধারণ করে নেন। তাঁরা স্ব স্ব নির্ধারিত এলাকায় কাজকর্মে মুক্তিযুদ্ধ সহায়তা ও গণসমর্থনে ধন্য হন।

বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য গঠিত ১৪টি গেরিলা দলের প্রধান প্রধান কয়েকটি গ্রুপ নিম্নরূপ :

ক। মুকসেদপুর : সাহাবউদ্দিন কমান্ডার গ্রুপ হেমায়েত বাহিনীর সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হলে হেমায়েত বাহিনী কর্তৃক তার পুরো গ্রুপ ধৃত হয় এবং নিরস্ত্র করে সামরিক প্রক্রিয়ায় তাদের শাস্তি প্রদান করা হয়। স্বাধীন দেশে সাহাবউদ্দিন ম্যাজিস্ট্রেট পদে সম্মানিত হয়েছেন।

খ। বর্নি বিল গ্রুপ : নানা ছদ্মনামে কমান্ডার পরিচিতি লাভ করেন। সত্তর জনের গ্রুপের আশ্রয় হয় বর্নি বিলে। ক্যাম্প করে তারা আছেন। দেশে ঢোকার অল্পদিন পরেই প্রমাণিত হয় যে মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী কাজেই তারা বেশি লিপ্ত। স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি তাদের কাজে বিগড়ে যায়। হেমায়েত বাহিনীর সাথেও তারা যোগ দেন নি। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের ধান্দায় তারা আক্কাভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সংশোধনের জন্য হেমায়েত নিজে তাদের তাগিদ দেন বার বার। কিন্তু এ-সব নির্দেশ অমান্য করে হেমায়েত বাহিনীর বিজিত অঞ্চলে নির্বিকারে নির্বিচার উল্টা কাজে তারা লিপ্ত হয়ে পড়ে। লাঠৌষধ ছাড়া কাজ হবে না মনে হলে হেমায়েত বাহিনীর সশস্ত্র সৈনিকরা উক্ত গ্রুপের উপর শক্তি প্রয়োগ করবে মর্মে নির্দেশ প্রদান করলে অবশেষে পুরা গ্রুপ স্যারেন্ডার করে এবং তাদের নিরস্ত্র করা হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত গ্রুপকে এবাউট টার্ন করে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

গ। নাজিরপুর থানার লুটেরা গেরিলা দল ঘরে ঘরে মুক্তিযুদ্ধের নামে নজরানা আদায় করতো। বাহিনী প্রধানের নির্দেশে ক্লোজ করে এনে তাদের নিরস্ত্র করা হয়।

ঘ। মোল্লা হাট গেরিলা দলের কাজ ছিল সংগতিপন্ন লোকের বাড়িতে গিয়ে মোল্লা মার্কা জেয়াফত আদায় করা এবং সঙ্গে হাদিয়ার তোফা ছাড়া না নড়া। মুক্তিযুদ্ধের নামে চাঁদা না দিলে জনতার প্রাণ বাঁচে না মর্মে খবর পাওয়া গেলে হেমায়েত কর্তৃক তাদের আত্মসমর্পণ করিয়ে উপযুক্ত বিচার করা হয়।

ঙ। **ফুকুয়া স্কুল অবরুদ্ধ মুক্তি :** ভিতরের কোন বাহিনীর সাথে যোগাযোগ শূন্য অবস্থায় একদল মুক্তি গেরিলা ভারত থেকে যাত্রা করে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। তাদের আশ্রয় ছিল ফুকুয়া স্কুল। দালাল মারফত গোপন খবর পেয়ে পাক আর্মি মুক্তিদের ঘেরাও করে। এটি আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের ঘটনা। মধুমতি নদীর সাতপাড়ে পাক বাহিনী ও হেমায়েত বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষে পাকিস্তানিরা দারুণ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। মুক্তিরা লঞ্চের ছাদ উড়াতে গেলে তাদের বেশ কিছু হতাহত হয়। ঠিক এরই যুগপৎ লগ্নে ফুকুয়া গেরিলারা আক্রান্ত হয়। হোক না অপরিচিত গেরিলা, মুক্তিযোদ্ধাই তাদের পরিচয়। সহমর্মিতার মুক্তি রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। খবর পাওয়া মাত্র হেমায়েত বাহিনীর মুক্তিরা তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে যাত্রা করে। ক্রমাগত কভারিং ফায়ারে গেরিলাদের সটকে পড়ার সুযোগ হয়। চতুর্দিকে চক্রাকারে কভারিং ফায়ার চালানো হয়। এতে পাক আর্মি বিভ্রান্ত হয় এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তারা শক্ত বাঁধন কষণে মুক্তি ঘেরাওর আনন্দে ছিলেন। এবার জমিন ফুঁড়ে উদয় হওয়া মুক্তির ফায়ারে তারা দিশেহারা। মুক্তি টেকটিকসে পাক আর্মির বিভ্রান্তির সুযোগে ফুকুয়া স্কুলে আশ্রয় গ্রহণকারী মুক্তি গেরিলারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ পায়। স্কুলে অবরুদ্ধ গেরিলার বেশকিছুই হতাহত হয়। তবে এর জন্য পাক আর্মিকেও চরম মূল্যের খেসারত দিতে হয়।

এভাবে মুক্তি গেরিলা দলের ভারত বাংলাদেশে আসা-যাওয়ার পথে বিপদ উত্তরণে বিশেষ সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়েছে হেমায়েত বাহিনীর। বিভিন্ন সময় একাধিক স্থানে এভাবে মুক্তি দল বাঁচাতে এগুতে হয়েছে তাদের। ধাক্কা খেয়ে গেরিলারা অভ্যন্তরীণ যোদ্ধাদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিপদ এড়িয়ে চলেছেন।

সহি হেমায়েত নামা ঃ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার বাইরে অন্য কোন খায়েস হেমায়েত বাহিনীর ছিল না। হেমায়েত বাহিনী প্রভাবিত অঞ্চলে অন্য দলমতের যে বাহিনীই আসুক, একই কমান্ডে থাকতে হবে। নির্ধারিত এলাকায় কাজ করবে তারা, কেন্দ্রীয় কমান্ডের বাইরে কোন কাজ চলবে না। স্বাধীনতা বিরোধী স্বদেশী দালাল অস্ত্রধারী ও পাক আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া মুক্তি বাহিনীর অন্য কোন কাজ নেই। ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা মুক্তিরা জনগণের বন্ধুরূপে কাজ করবে। জনতার ওপর সর্ব প্রকার লুটতরাজ নিষিদ্ধ। কেউ নারীর সম্ভ্রম হানি করতে পারবে না। ব্যতিক্রম ঘটলে মুক্তি-বিচারে তার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মুক্তি-অমুক্তি সকলের জন্যই স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে নিরপেক্ষ বিচার। কেউ বিচারের উর্ধ্বে নয়। ভারতের সাহায্য হেমায়েত বাহিনীর জন্য হারাম, দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়বো। পাক আর্মির নিকট থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্রেই আমরা সজ্জিত। পাক মিলিশিয়া-রাজাকার-পুলিশদের অস্ত্র

দখল করাই আমাদের নীতি। আল্লাহর ঐশী ছত্রচ্ছায়া ও জনতার আশীর্বাদ আমাদের রক্ষা কবচ। নিজ সম্পদে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করবো। পরের ছেলে বামন সুন্দরের মত বিদেশী সাহায্য দানের করুণার স্বাধীনতা চাই না। রক্ত-আখরের অগ্নি মূল্যের আত্মাহুতির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবোই। বিদেশে বসে আমাদের বিজয় যারা খাটো করে দেখে তাদের বিচার করবে এ-দেশের জাগ্রত জনতা। বিদেশের মাটিতে বসে অভ্যন্তরীণ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। কুৎসা রটনা টিকবে না। সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই হবে। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে স্বাধীনতা আসবে।

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে বাংলার খ্রিস্টান

স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মীয় অনুভূতি : উপমহাদেশের লুপ্ত গৌরব স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে একদিন এ-দেশের মুসলিম আলেম সম্প্রদায় মাদ্রাসার মাধ্যমে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। বিলীয়মান মোঘল সাম্রাজ্য, ১৮৫৭'র স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যর্থতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন শাহ ওয়ালি উল্লাহ। শিক্ষা বিস্তারের অগ্রণী ভূমিকায় তাঁরা স্বাধীনতার সোপান তৈরি করেন। দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া, দেওবন্দ শিক্ষার তরিকা, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মোহমেডান লিটারারি সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা সমাজ-সংস্কারে তার পরিচয় বিধৃত। জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলি ব্রিটিশ সখ্যের আড়ালে ভ্রাম্যমাণ মাদ্রাসা চালিয়ে স্বাধীনতার দীক্ষা মন্ত্রে দীক্ষিত মোজাহিদ সংগ্রহ করতেন। আজাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আক্রাম খানের পিতা মওলানা আবদুল বারি গাজি সিত্তানার যুদ্ধে শরিক হন। তাঁর প্রপিতামহ বালাকোটের যুদ্ধের শহিদ। সে-যুদ্ধের একজন আহত সন্দ্বীপের মওলানা নিজামউদ্দিন। বাংলার অগণিত মোজাহিদ ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিজরত করেছেন। রায়বেরেলি ও বালাকোটের রণাঙ্গণ তাঁদের রক্তে রঞ্জিত। মওলানা আহমদুল্লাহ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে এ-দেশী দালালদের হাতে প্রাণ দেন। মুসলিম মোজাহিদ ও আলেম সম্প্রদায়ের রক্তক্ষরা সংগ্রামে রচিত হয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস।

যে স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলার মুসলমানের রক্ত ঝরেছে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, সেখান থেকেই ১৯৭১-এর বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধ নির্মূলে এলো নরঘাতক বাহিনী। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে উপমহাদেশের একমাত্র বাংলাই পাকিস্তানের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরে। ১৯৭১-এর নির্বাচনে বিজয়ের প্রতিফলে পাকিস্তান ভাঙ্গার অপবাদে অভিশপ্ত বাংলা।

মওলানা আতাহার আলি, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা ভাসানির মত আলেমের দৃপ্ত দম্ভে কেঁপেছে বাংলা। ব্রিটিশ-সৃষ্ট আলিয়া মাদ্রাসার এমনি সিলেবাস যার রেশ চলে পাকিস্তানে। সে মাদ্রাসার বিপুল সংখ্যক ছাত্র বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ভূমিকায় সক্রিয় অংশ নেয়। প্রকৃতার্থে যুগোপযোগী শিক্ষার অভাবে তাঁরা বিভ্রান্ত।

বিশ্বের দিকে দিকে আজ খ্রিস্টান ধর্ম যাজক পাদ্রিরা স্বাধীনতার মন্ত্র-আওড়ায়। ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা আগু-কাতারে। হায় মুসলিম জাহান! আত্ম হননে আপনাদের শক্তি শেষ। বিশ্বের সেরা সম্পদ আপনাদের হাতে থাকতেও আপনারা আজ ব্যর্থ। বসনিয়া-হারজিগোভিনায় মুসলিম দলন উপভোগ করছে সারা বিশ্ব। মার্কিন-ব্রিটিশ পাঁয়তারায় ইরাক দখলে প্রায় নীরব মুসলিম বিশ্ব।

এ-দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবদানে ধন্য। স্বাধীনতার যুদ্ধ বাঙালির জাতীয় যুদ্ধ। বাংলার সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এক উড্ডীয়মান লাল পতাকার তলে সমবেত করতে পেরেছে। ফরিদপুর-বরিশাল অঞ্চলের বাঙালি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবদানের আলোকে রচিত চলতি অধ্যায়।

মুক্তি ডাক্তার জেমস বকুল মজুমদার : কোটালিপাড়ার চৌরখুলি গ্রামের সন্তান ডা. জেমস বকুল মজুমদার। রামশীলের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত কমান্ডার হেমায়েতকে চিকিৎসার গৌরবে তিনি ধন্য। শিশু পুত্রকে মায়ের জিম্মায় রেখে সস্ত্রীক তাঁরা যুদ্ধে যান। তাঁরই অভিজ্ঞতার আলোকে হেমায়েত বাহিনীর যুদ্ধ সেবা ও মহত্ত্ব আলোচিত হলো।

ক্রুশের ছড়াছড়ি : পাকিস্তানের দুশমন বাঙালি হিন্দু-মুসলমান পাকিস্তানি আর্মির জিঘাংসার প্রথম টার্গেট। মুক্তি বিচ্ছুর সন্দেহে ধরা হিন্দু-মুসলমান পরিচয়ের কোনটারই রেহাই নেই, তবে খ্রিস্টান ঈসায়ী পরিচয়ে তাঁরা কিছুটা আশ্বস্ত। পাকিস্তানিরা তাঁদের শত্রু ভাবেন না। ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের বরিশালের খ্রিস্টান অধ্যাপক ডেভিড অশ্বিনী কুমার দেওয়ারি ফুলহরি গ্রামে ধরা পড়লেন পাকিস্তানি আর্মির হাতে। ঈসায়ী পরিচয়ে প্রাণে রক্ষা পান। হাওয়া বুঝে অনেকেরই খ্রিস্টান গৌরবে হিপ্ হিপ্ হুররে।

সারা বাংলায় দেশী খ্রিস্টানের সংখ্যা হাতে গোনা। ফরিদপুর আর বরিশালে আছেই বা কটা। হাতে গোনা মুষ্টিমেয় খ্রিস্টানের দেশে পথ চলতে গলায় ক্রুশ ঝুলানো গ্রুশ গ্রুশ চোখে পড়ে, এটাই মুক্তিযুদ্ধে ইসলাম বিপন্নের বাস্তব চিত্র। ইসলামের দেশে গায়রে ইসলামের প্রসার। এতকালের নিষ্ঠাবান হিন্দুর গলায় ঝুলে ক্রুশ! গ্রাম বাংলার বাড়ি না তো যেন কুঞ্জবন। গাছপালার আড়ালে আবডালে বাড়ি ঘর আছে কি নেই বুঝা ভার। দূর থেকে সবই যেন ছায়াময় মায়াবন। মুক্তিবিধ্বস্ত ইসলামি মশরেকি পাকিস্তানে হেলালী ঝাণ্ডার স্থলে বাড়ি ঘরে গাছপালার শীর্ষে শোভা পায় কাঠের ক্রুশ। ঘরের বেড়া-দেয়াল, দরজা-জানালায় দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বড় বড় ক্রুশ। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেকে ধর্মের মঙ্গল-চিহ্ন জ্ঞানে গলায় ঝুলায়। সুদিনে আর দুর্দিনে রক্ষা-কবচ জ্ঞানে তার প্রদর্শনী কতটুকু গ্রহণযোগ্য! জেলের সাজে খ্রিস্টান ডাক্তার বুকে ক্রুশ এঁটে ঔষুধ সংগ্রহের ধান্দায় শত্রুদুর্গে যেতেন। অন্তরের যিশুখ্রিস্টের নিদর্শন বাইরের ক্রুশে অনেকের শেষ রক্ষা হয় নি।

অতি ভক্ত খ্রিস্টানের শিক্ষা : চৌরখুলি গ্রামের তিন চৌকশ খ্রিস্টান : শচীন্দ্র বারিকদার, ক্ষিতিশচন্দ্র মণ্ডল, জলধর বৈরাগী। মাছ ধরার পেশায় তারা জেলে।

পাকিস্তানি সেনারা গোপালগঞ্জ থেকে গানবোটে কোটালিপাড়ার দিকে আসে। টহলের কারণে প্রায়শই তাদের এমন আনাগোনা। টহল বাহানায় এলাকা জরিপের রেকি করে তারা। মুক্তি-বিচ্ছুরাও সুযোগ পেলেই টাইট ফাইটের মহড়া দেয় তাদের আগমনের সময়ে।

মুক্তি ধরার ধান্দায় আসা পাকিস্তানি গানবোট মুক্তিবাহিনীর পাতা ফাঁদে পড়ে।

যাঝারি অস্ত্রের শক্রকে মান্ধাতার আমলের ক্ষুদ্র অস্ত্রে আক্রমণ করে বসে দুঃসাহসী মুক্তি। বাঙ্গাল মুক্তিদের আচরণে রুষ্ট পাকিস্তানিবাহিনী তড়িঘড়ি ঘুর পথে বিদায় হয়।

খ্রিস্টান ত্রয়ী জেলে বিলে মাছ ধরছে। পাকিস্তানি গানবোট দেখে তাদের প্রাণ বোটে হাওয়া দোলা দেয়। টহলদার গানবোট তো হরহামেশাই নৌপথে আসে যায়। তারা ভাবলো টহলদার বাহিনী বুঝি সবে এলো মাত্র। মাছ ধরার সাজগোজ ফেলে অতি উৎসাহের পোজ মেরে গেলেন তারা। ঈসায়ী ধর্মের খ্রিস্টান পেয়ারের পাকিস্তানি আর্মিকে আপন ভেবে আগ বাড়িয়ে নিশ্চিত মনে সাদর সম্ভাষণে এগুলো তারা, বুকে ক্রুশের মরণযন্ত্রের রক্ষা কবচ। মনে আর ভাবনা কি? পাকিস্তানি বাহিনী কিছুই করবে না। কিন্তু টহলের গানবোটের গতি সামান্য মন্থর করে গুলি ছোঁড়ে দেয় মৎস শিকারিদের দিকে। তিন খ্রিস্ট-ভক্তের তখন ইস্ট নামের শেষ যাত্রা। ক্রুশের বাড়াবাড়িতে অতি বড়াইর ক্রুশিফিকেশনে তারা ফিক্সড্। পাকিস্তানি সাপকে যিনি যত বন্ধুই ভাবুন, সময় মত পাকিস্তানি ছোবল তিনি দেবেনই।

মুক্তি ঔদার্যে খ্রিস্টান দালাল : বকুলের সেবা, যুদ্ধ ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলায় মুক্তি কমান্ডারগণ বেজায় খুশি। মেজর হেমায়েত ও ক্যাপ্টেন বাবুল তো বকুল বলতে আকুল। যুদ্ধ শেষে স্বাধীন দেশে জীবন-জীবিকার গৌরবধন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন হেমায়েত ও বাবুল। সংখ্যালঘু খ্রিস্টান মহান যিশুর কৃপায় ধন্য। পাকিস্তানি পশু আর্মি ও বাঙ্গাল দালাল-রাজাকার চিকিৎসা করেও তিনি ধন্য। লোভনীয় পুরস্কার যুদ্ধকালেই হাত করেন বকুল মজুমদার।

রামশীলের ঐতিহাসিক যুদ্ধের কয়েক মাস পরের ঘটনা। সময় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। ততোদিনে যুদ্ধের পাল্লা উল্টেছে। ভাগ্যলক্ষ্মী মুক্তির প্রতি প্রসন্ন। রণ-জন-অস্ত্র বলে মুক্তি-শক্তি সংহত। বাঙ্গাল রাজাকার সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানি দুর্গ গোপালগঞ্জ আক্রমণের সর্বাত্মক মুক্তি-প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন। আক্রমণ-পূর্ব পরিকল্পনার খুঁটিনাটি প্রস্তুত। হেমায়েত নির্দেশনায় কেয়ামত ব্যাটল ম্যাপে মুক্তি-নৌকা ভিড়ানোর স্থান ও ফার্স্ট এটাকিং পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ-সবই ঘটে বাঙালি খ্রিস্টান সমর আরিনদার বাড়ি ঘিরে। কে এই সমর আরিন্দা!!

রামশীলের যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মির লঞ্চে যে খ্রিস্টান ভদ্রলোক পাকিস্তানি দখলদার-আর্মিকে সঙ্গ দিয়েছিলেন তিনিই সমর আরিন্দা। সে রামশীলের যুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মির গুলিতে মারাত্মক আহত হন হেমায়েত। পাকিস্তানি আমলের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তিত্ব খ্রিস্টান শিরোমণি এককালের বাণিজ্য মন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামানের পেয়ারের দোস্ত এই সমর আরিন্দা। ম্যাপ ও যুদ্ধ পরিকল্পনার শেষ ফল অনিশ্চিত। তবে প্রথম ও প্রধান ফলাফল তাঁর বাড়িঘর দুদলের ক্রস ফায়ারে শেষ হবে। পাকিস্তানি দালাল সমর আরিন্দাকে ঘরের বারান্দায় শেষ করার এই কি আক্রোশ রোষের যুদ্ধ পরিকল্পনা!

বকুল মজুমদার পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ পেলেন। ম্যাপ দেখেই গ্যাপ বুঝলেন। জাত ভাইকে বাঁচাতে বিপাকে তিনি, না যায় সহন না যায় বলন। হেমায়েতকে চটানো আর কেয়ামত ডেকে আনায় কোনো তফাৎ নেই। যুদ্ধ পরিকল্পনা

পান্টানোর অনুরোধে বিপদ অনেক। তাঁকে কেউ চটাতে চান না। রীতিমত কনফারেন্স করে বহু জনের আগাম মতামত নিয়ে রচিত হয় হেমায়েতের যুদ্ধ প্লান। একবার গৃহীত হলে হেমায়েতের সিদ্ধান্ত হিমালয় টলানোর মতই দুঃসাধ্য। লাঠি না ভেঙ্গে সাপ মারার বুদ্ধির যুদ্ধ।

রামের রাজ্যাভিষেক ঠেকাতে মন্থরা মন্ত্রণার কৌশল্যা পরিকল্পনার মত এগুলেন বকুল। মুক্তি প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রার্থনা। হেমায়েত সমীপে ঠাণ্ডা মাথার নিবেদন, "আগামীকাল আমি আমার পুরস্কার চাই।" যুদ্ধবাজ পাকিস্তানি সন্ত্রাস ঝামেলাবাজ লোক ত্রাস হেমায়েত অন্য ধাতুতে গড়া। এত নিকষ-কষণের পাকিস্তানি বাঁধনে যে ধরা পড়লো না, সঠিক নিশানার পাকিস্তানি আর্মির গুলির মরণ আঘাতে যে মরলো না, সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী। দেশ স্বাধীনে তাঁর জ্বালাময়ী শপথ, "আমি যদি বিষও পান করি মরণ আমায় ছুঁতে পারবে না।" যুদ্ধাহত মুক্তি শহিদ তাঁর চোখে, "আমাদেরই যমজ ভাই।" যুদ্ধ ধান্দায় আক্কা স্বাধীনতার লগ্ন দ্বারে হেমায়েত ভাবনার অন্য জগতে তখন। তিনি ভাবলেন বকুল মজুমদার আর এমন কি মজা লুটবে! একজন চিকিৎসক চিকিৎসার বাইরে আর কি চাইবেন।

যুদ্ধাহত মুক্তি জনতা, শত্রু-মিত্রের চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য তাঁর হেফাজতে সস্তা দিনের মূল্যে পনর বিশ হাজার টাকার ঔষধ। দেশ তো স্বাধীনের পথে। সে সব ঔষধ পত্র চেয়ে নিয়ে হয়তো স্বাধীন বাংলার ফার্মেসি-টার্মেসি খুলে যিশুর সেবা ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করবে। হেমায়েতের আন্দাজ ফেল, বকুলের চাওয়া সে-পথে গেল না। মুক্তি কমান্ডারা গোলক ধাঁধায়।

"আগামীকাল আমি একজন লোককে আপনাদের কাছে আনব। তার বিচার অবশ্যই করতে হবে এবং আমার সামনেই!" হেমায়েত ও বকুল এমন আবদারের বিচার দেখে দেখে ঘাগু। তাঁদের ধারণা চিরাচরিত বাংলার পন্থায় ব্যক্তি আক্রোশের পথের কাঁটা সরানোর হত্যা-টত্যার আবদারের মত খবরদার মার্কা কিছু হবে!

এবার ধুরন্ধরের প্যাঁচ কষানো বুদ্ধির খেইল শুরু হলো। রাতেই লোকমারফত সমর আরিন্দাকে চিঠি দিলেন ডা. বকুল। পত্রপাঠ বাহক সাথে তাৎক্ষণিক আগমনের নির্দেশ দেয়া হয় চিঠিতে। দুই খ্রিস্টানের ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধনমানের ব্যক্তিটিকে মুক্তি বকুল চিনেন। কারণ বড় লোককে গরিবের চিনতেই হয়। ধন-মান-প্রাণ-জাতধর্ম-আত্মবিশ্বাস যার টানেই হোক রাতারাতি অকূলের কূল বকুলের বাড়ি এলেন সমর আরিন্দা। পাকিস্তানি ভাগ্যে বইছে তখন মন্দা বাতাস। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের ধুন্ধুমার যুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানি দালালদের তখন কলির সন্ধ্যা। বকুলের গ্রাম চৌরখুলিসহ সমগ্র কোটালিপাড়া তখন শত্রুমুক্ত। মিত্রের হাতে ধরা না দিয়ে শত্রুর রক্ষা নাই। পশ্চিমা মামারা ঘামছে। আপন প্রাণ সামলাতে তারা ব্যস্ত। দালালের হালাল কাম সস্তা বুলিতে আর তাদের আস্থা নেই। তাদের যত রোষ দালালের ওপর।

মুক্তি সদর, মুক্তি কমান্ডার, মুক্তি আদালতের সবই ভ্রাম্যমাণ সঞ্চরণশীল। প্রত্যূষে

অতি ত্রাসে হেমায়েত বকুলের বাড়ি আসেন। যুদ্ধসাথীর ডাকে ত্রস্তে সাড়া দেয়া মুক্তির সংবিধান। রে রে করে হেমায়েতের আগমন সংবাদ রটে গেল। অবিশ্বাস্য বিশ্বাসের বাখান উৎরানো বহুমুখী হেমায়েতের নাম শুনেছে জনতা। আদত মানুষটিকে আসল রূপে চর্ম চক্ষে ধরা ছোঁয়ার মাঝে দেখেনি তারা। মুক্তিযুদ্ধের নন্দিত নায়ক তাদের দুয়ারে! কেউ এমন দুর্লভ সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইলো না। দেখতে দেখতে বকুল ধামে ব্যাকুল আগ্রহে জমে যায় অকূল জনতা। বাড়িতে দাঁড়াবার মত 'তিল ঠাঁই আর নাহিরে।' অগত্যা তৎকালীন অক্সফোর্ড গির্জা' বাড়িতে জনগণ-মুক্তি নন্দিত নায়ক হেমায়েতকে স্থানান্তর করা হয়। সেখানকার স্কুল ঘরে জনতার হেমায়েত দর্শন ও বিচার অনুষ্ঠান। সে দিনের সে 'অক্সফোর্ড গির্জা' আজ 'চার্চ মিশন অব বাংলাদেশ'।

বকুল মজুমদার ও সুনিল মজুমদার দুই আপন ভাই। তাঁদের সবার পরিবারবর্গ মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে দুই ভাইয়ের অবদানই সমানে সমান। যোদ্ধাহত হেমায়েত দুই ভাইকে বিশ্বাস করে চাইনিজ স্টেনগান তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধের কাজে লাগান। আহত অবস্থায় এই দুই ভাইয়ের প্রহরায় চলতেন হেমায়েত। তাঁদের জ্ঞাতি ভাই সমর আরিন্দা একজন ক্রিস্টান মীর জাফর। তিনি সাবেক পাক বাণিজ্য মন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামানের পোষ্য ও পাক চর/। খ্রিস্টান সমর আরিন্দাকে বাঁচাতে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সকল খ্রিস্টান গির্জায় এসে প্রার্থনা রত। জাত ভাইকে বাঁচাতে মুক্তিযোদ্ধা বকুলও অভিনয় করেন। অবশেষে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সমর আরিন্দাকে প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হয়।

আসামি সমর আরিন্দা হেমায়েতের সামনে। দেখা মাত্র অশান্ত সিংহের প্রশান্ত চোখে ধূমায়িত ঘৃণার ক্রুদ্ধ আকুঞ্চন। 'ঝোপ বুঝে কোপ মেরে তাতা খোলায় খৈ ফুটানো'র মত মুক্তিযোদ্ধা জেমস বকুল মজুমদারের রিভলভার হেমায়েতের হাতে ধরিয়ে অনুরোধের ঢঙে প্রার্থনার মত বলেনঃ "গুলি করুন, এক্ষুণি গুলি করুন ওকে এবং এটাই আমার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার।" হায় অদৃষ্টের ফের খ্রিস্টানের হাতে খ্রিস্টান খুন। তাও সুস্থ বিবেক ডাক্তারের নির্দেশ!!

সমর আরিন্দার অমরলোক ধান্দা ঃ খ্রিস্ট ভক্ত আরিন্দা অদৃষ্টের ধিক্কারে মুক্তি-ঘাতক দরবারে উপস্থিত। তার মুখে রা নেই। অবয়বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অধীর চাঞ্চল্য! হায় মরণ মানুষের প্রাণের খেলায় তোমাদের এই স্ফূর্তি!! সমর জগতে বসে তাঁর অমর জগতের ধান্দা। হায় যিশু মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দালালি যা করছি সব তো লোভের ঠেলায় দায়ে পড়ে। যিশু আমারে বাঁচাও মুক্তি পশুর হাত থেকে। ভাবনার অতলে হেমায়েত।

খ্রিস্টান মুক্তি খেলা ঃ অকূলে কূল পেতে বকুল খেলা করেন। মহান যোদ্ধা হেমায়েত ভাই, নিজেকে শত্রু কবলে ভাবুন। প্রলোভন নিপীড়নের মাঝে দেশপ্রেমের নামে প্রাণ বিসর্জনের মত আত্মহননের পথ কজন বেছে নিতে পারে! সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তির পদচাটাদের স্বভাবই আলাদা। এমনি দুর্বলতার সুযোগ ধরে দখলদার অঞ্চলে পাকিস্তানি আর্মি অফিসার কাউকে যদি মুক্তিযোদ্ধার প্রতিরোধ এলাকা দেখিয়ে দিতে

প্রলোভিত করলে দায় এড়ানোর ঝামেলা অনেক। শত্রু অস্ত্রের জোরে অনেককে প্রভাবিত ও বাধ্য করতে পারে। স্বাধীনতা, মুক্তি সেনার প্রতি অন্তরে পূর্ণ সমর্থনের টান থাকতেও অনেককে উল্টা সুরে গাইতে হয়। শত্রুর প্রতি চরম ঘৃণার মাঝেও তাদের দর্প চূর্ণে ষাঁড়ের গোঁয়ার সাধনায় রুখে দাঁড়াবার দুঃসাহসের মরণ কবুল সৎসাহস অনেকের থাকে না। নামে সমর আরিন্দা হলেও তার মধ্যে মরার বীরের মত লড়ার সমর বীজ নেই। সত্যি বলতে কি সরকারের উচ্চ পদের পেয়ারধন্য বৃত্তের মানুষকে নানা বিপাকে পড়তে হয়। তায় এ আবার দেশী খ্রিস্টান। ক্রুশিফিকেশনের মালা পরেই আছেন তিনি। দুই নৌকায় পা দিতে গিয়ে তাদের প্রাণ যায় যায়। আমার বিচার আর্জি শেষ। মুক্তি কমান্ডারের বিচারের রায় অবধারিত। আপনার সুবিবেচনায় রায় দিন। গুলিতে প্রাণ দণ্ড দিতে চান দিন। আপনার চূড়ান্ত বিচারের ফলাফলেই মিলবে আমার চরম কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার।

মুক্তি ঔদার্যের ধৈর্য ঃ হেমায়েত লোডেড রিভলবার হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করেন। বীর হৃদয় ঔদার্য সংশয়ের দোলায় দুলছে। সামান্য ট্রিগার টিপলেই সব শেষ। উপস্থিতি জনতার অধীর চাঞ্চল্য।

"একটা ছোট মন ও বিরাট সাম্রাজ্যের প্রশাসন পরস্পর বিরোধী।" বীর হৃদয়ের ঔদার্যে হেমায়েত বকুলকে বলেন, "তোমার রিভলবার নাও।"

ঃ গুলি করবেন না?

ঃ না!

ঃ কেন?

ঃ আমায় ক্ষমা কর। যুদ্ধের ডামাডোলে মাথা এখন ঠিক নেই। বিষয়ের এত গভীরে তলাইনি। সমর আরিন্দাকে মুক্তি দিয়ে বাঙালির হৃদয় ঔদার্য, ক্ষমতার অবতার যিশুর মাহাত্ম্য, বাগে পেয়ে শত্রুকে ক্ষমা করার মুক্তি-শৌর্যের অক্ষয় কীর্তির প্রমাণ রাখ। বোকার স্বর্গ ছেড়ে মানুষের দুনিয়ার এলাম। জনগণ শোন, "সমর আরিন্দার ওপর আজ থেকে আমার কোন রাগ নেই। এখন থেকে ও আমার বন্ধুদের একজন হলো।"

সময়ের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে বাঙ্গালের আত্মহনন বন্ধ করতে, সদ্য অর্জিত স্বাধীনতা সংহত করতে, বিশ্ব বিবেক নাড়া দিতে, জাতির আত্মার আকুতিতে সাড়া দিতে, সচেতন মুক্তিদের সুপ্ত মনোবাসনার প্রতিফলন ঘটাতে বঙ্গবন্ধুকে করুণা সিন্ধুর পর্যায়ে শত্রুকে ক্ষমা করতে হয়। শকুনি মামার দাবা খেলা, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মূল শত্রুর তিরানব্বই হাজার অক্ষত দেশে ফিরে গেল। খাস পশ্চিমা খানদের বিচারের মুরোদ নেই। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধের মত স্বজন হত্যায় হাত কলংকিত করতে চাইলেন না শেখ মুজিব। আজ শত্রুকে ক্ষমা করার জন্য শেখ মুজিবের বিচারের আগে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের বিচার চাওয়া আবশ্যক। কারণ ফিল্ড কমান্ডাররূপে তাঁরাই তো প্রত্যক্ষদর্শীর বিচারে শত্রুকে ক্ষমা করার রাজতোরণের শুভ উদ্বোধন করেন। শেখ মুজিব তার পূর্ণতার সাংবিধানিক রূপ দেন মাত্র।

প্রতিদানের প্রত্যাশা-মুক্ত মুক্তিবাহিনী ঃ একজন বাঙালিরূপে, মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে, এক খ্রিস্টানকে রক্ষার মধ্যে মুক্তিবাহিনীর প্রশান্তি অনেক। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধদিনের ব্যবধানে সমর আরিন্দা আর কখনো মুক্তি বাহিনীর কারও মুখোমুখি হন নি। মুক্তি রক্ষাকর্তার প্রতি মানবিক সৌজন্যবোধের কৃতজ্ঞতা স্বীকারে সামান্য যোগাযোগের প্রচেষ্টা পর্যন্ত করেন নি তিনি। চালচুলাহীন সে দিনের মুক্তিদের আত্ম-বলিদান ও ক্ষমার ঔদার্যের কথা কেই-বা স্মরণ করে ! সমর আরিন্দা একটা নমুনা মাত্র। সারা দেশের সাধারণ চিত্রের বাইরে তাতে ভিন্নতার কিছু নেই। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মানদণ্ডে কাজ করা মুক্তিসেনার বৈশিষ্ট্য নয়। মানবতার উজ্জীবন নিঃস্বার্থ মুক্তিসেনার অবদানধন্য মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের অগণিত গেরিলা যেন ছিলেন দেশের মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো অকাল-কুষ্মাণ্ডের মতন। তাঁদের অনেকের মধ্যেই ছিল জন্মগত প্রতিভা, দুরন্ত সাহস ও কর্মপ্রতিভা এবং ছিল অফুরন্ত দেশপ্রেম। তাঁরা দেশপ্রেমে ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। এমনি দুই দামাল যোদ্ধা বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম এবং কোটালিপাড়ার একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতউদ্দিন। সে বন্ধ্যা সমাজ যে প্রেরণাদায়ক অনুকরণের মহত্তম কিছু জন্ম দিতে পারবে না। যুগ যুগ জিয়ো কালজয়ী মুক্তিসেনা। তোমাদের রক্তে সোনার বাংলায় সোনার মানুষ পয়দা হোক।

সামান্য অবহেলা

"জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা
যেন চলার পথে পা তোলা পা ফেলা।"

জন্ম-মৃত্যু পায়ের নৃত্যের খেলায় মুক্তিদের চলতে হতো। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা মুসলমান। সংখ্যা লঘুর দুচারজন মুক্তি গর্বে বুক ফুলিয়ে চলতো। তাদের পরিচয় সবাই আগ্রহে নিত। সকাল বেলা এক তরুণ মুক্তির আগমন ঘটে। মুক্তি-ডাক্তারের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখে মুখে তাঁর খুশির ঝিলিক। বুকে ঝুলানো ক্রুশ চিহ্নই খ্রিস্টান সন্তানের পরিচয়। খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধা অতি আগ্রহে খ্রিস্টান মুক্তি-ডাক্তারকে সগর্বে তার পরিচয় দিতে আসেন। অন্য ভাবনায় ব্যস্ত ডাক্তার সামান্য বক্তব্যে বলেন, 'এসো'; এই সম্বোধনে রাগান্বিত হয়ে মুক্তি বিদায় নেয়। গত রাতে ভারত ফেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তি সে। হেমায়েত দলের কেয়ামতে সদ্য যোগ দেয়া মুক্তি। রাতের বিশ্রাম শেষে তাঁর যুদ্ধ যাত্রা। সে যাওয়া তার শেষ যাওয়া হবে তাকি কেউ জানতো?

বিকালে ফিরল তার লাশ। মুক্তি মেডিক্যাল অফিসারকেই তার সুরত হাল করতে হলো। দারুণ অন্তর্বেদনায় ডাক্তার বিমর্ষ। এই তো সেই বাঙালি খ্রিস্টান মুক্তিসেনা। সকালের ক্ষণিক দেখা প্রিয় মুখটি বিকালে নেই। সে সকালে দুদণ্ড কথা বললে পরিজনের সাথে পরিচয় হতো। সামান্য অবহেলায় একটি অমূল্য তরুণের পরিচয় হারিয়ে গেল। কেউ জানলো না তার পরিচয়। শহিদ মুক্তি খ্রিস্টান মাত্র তার পরিচয়।

মৃত্যুর মাঝে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি ব্যয় করে গেল খ্রিস্টান মুক্তি। সব কাজের

শ্রেষ্ঠ সময়টি সবাইকে শিখিয়ে গেল। আলাপ পরিচিতি ও ভালবাসার আসর মোনোর ঊর্ধ্বে যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সময়টি বেছে নেয়। বন্ধু ডাক্তারের সাথে অন্যদের জন্য অনুতাপের শ্রেষ্ঠ সময়টি রেখে যায়।

মুক্তি চিকিৎসা ঃ ডাক্তারের হাতে যোদ্ধার অস্ত্র গর্জালেও মূলত তিনি চিকিৎসক। তাঁর হাতে শোভা পায় ইংজেকশনের সিরিঞ্জ, কাটা ছেঁড়ার চুরি-কাঁচি, ফার্স্ট এইড বক্স। ইতিহাসের অজানা অধ্যায় মুক্তি ডাক্তারদের হাতে শত্রু-মিত্র ও দুঃস্থ এলাকাবাসী সবাই সমান চিকিৎসা পেয়েছেন। আহতদের চিকিৎসায় প্রচুর ঔষধের প্রয়োজন হতো সে-সময়ে। যুদ্ধরত আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বন্দি আহত বিদেশী পাকিস্তানি আর্মি ও স্বদেশী রাজাকার ধরনের সকলের চিকিৎসা ছিল বাধ্যতামূলক।

যুদ্ধের বিভীষিকায় বাইরে রোগীদের মাঝে মুক্তি ডাক্তারের ভিন্ন চেহারা। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সেবা ছাড়া কিছুই মাথায় ঢুকতো না তাঁর। পরম মিত্র আর চরম শত্রুর আহতদের মাঝে চিকিৎসক ডাক্তার নির্বিকার। আপন পর ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে 'সেবা পরম ধর্ম'। মুমূর্ষু আহতের বাঁচার আকুতি ডাক্তারের কলজে ফালাফালা করতো। হায় মুক্তি-ডাক্তারের ভাবনা, "আমার মত ওদেরও তো ছেলে-সন্তান, ঘর সংসার, বুড়ি মা, প্রেয়সী বধূ আছে। সুদূর পশ্চিমে বিনিদ্র রজনী পথ চেয়ে বসে আছেন প্রিয়জন প্রত্যাশায়। চোখে তাঁদের উদ্বিগ্ন ভালবাসার অশ্রু বিন্দু।"

গুলি লাগা হতাশাগ্রস্ত মানুষের চোখ-মুখের ব্যাকুলতা ও বাঁচার আকুতিতে ডাক্তারের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিত। সত্যিকার অর্থে মানুষ একে অন্যের সাহায্য ছাড়া কত অসহায়! শিশুর মত মাতৃক্রোড়ে দুরন্ত অসহায় কেমন বালসুলভ তাঁদের আচরণ!! অসুস্থ কত যোদ্ধার নির্জীব অসাড়তায় চাঞ্চল্যের স্পন্দন নেই। শরীরের শৌর্য-বীর্যে টগবগিয়ে উঠা রক্ত ধারা আজ সুপ্ত। আজকের ম্রিয়মাণ ব্যক্তির মন মানসিকতার রক্তে মাথা চাড়া দেয় আত্মম্ভরিতা। পরস্পরের খুনের জিঘাংসার নেশায় তাদের অনেকের কাছে মানুষ আর মানুষ নামে গণ্য হয় না। ধরা পড়ে না মানুষের কাছে মানুষের মত রিপুর মহৎ গুণ। শান্তির সময়ে অনায়াসে শত্রুকেও ভাইয়ের আসনে তুলে আনার মানবীয় আবেগ আজ সবেগে পালিয়েছে সবাইকে ছেড়ে। তাই তো আজ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। মুক্তি হাসপতাল বেডে সজ্ঞান-অজ্ঞান শত্রু-মিত্র রোগী পরম নিশ্চিন্তে পাশাপাশি অবস্থান করছে। পরস্পরকে বেইমান জ্ঞানে যুদ্ধের ইমানে প্রাণ হারিয়ে পাশাপাশি কবরে শান্তির ঘুম দেন যোদ্ধারা। হায়রে আত্মঘাতী ভ্রাতৃহত্যার নামে স্বাধীনতার যুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের বড় ধরনের নৈতিক সাফল্য শত্রুর শ্রদ্ধা অর্জন। পাকিস্তানি-বাহিনীর সহযোগী স্বদেশী বাঙ্গাল জাত ভাই রাজাকারের বোধোদয়। মারাত্মক আহত রাজাকার এসে ভর্তি হয় মুক্তি হাসপাতালে। ডাক্তারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মুক্তি হেমায়েত বাহিনী প্রধানের নির্দেশ ছাড়া চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। বাহিনী প্রধান অন্যত্র ব্যস্ত। সহসা এমুখো হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ব্যাপার শুনে রাজাকারের চোখে রাজসিক কান্না।

রাজাকারের আকুল আকুতি, দলপতি হেমায়েতের দরবারে তাদের আর্জি পেশ

করা হোক। তাঁর বিচারের প্রাপ্য শাস্তি, এমন কি মৃত্যুদণ্ড হলেও তারা মাথা পেতে নেবে। মুক্তি ডাক্তারের পায়ে ধরে কান্না, "আমাদের বাঁচান। আমরা মুক্তির কেনা গোলাম হয়ে রইব।" নাকে খত, কান মলা, উঠ বৈঠকের স্বেচ্ছা ডনের কত খেসারতে তাদের পাপ স্খলনের প্রচেষ্টা। মুক্তিরা তো এমন নিষ্ঠুর না। আমরা যে তাদেরই পথ ভ্রান্ত ভাই। পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ চাই। একজনের সরোদন খেদ, "স্যার, চিকিৎসা না করেন তো গুলি করে মেরে ফেলুন। এজন্মের পাপ ঘুচুক। আমি মরে গেলে কি আর হবে! ছাওয়াল পাওয়ালগুলো না হয় রাস্তা ঘাটেই বড় হবে।" মুক্তি ডাক্তারের কোমল স্পর্শকাতর অনুভূতিতে ঘা লাগে। ছুরি কাঁচি হাতে আপন পর সকলের চিকিৎসা করেন তিনি।

সরকারি হাসপাতালে মুক্তি চিকিৎসা ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত মুক্তি সেনাদের দখলদার বাংলাদেশের ভিতরের হাসপাতালে নেয়া ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। হাসপাতালে নেবার সাহসও ছিল দুঃসাহস মাত্র। সেখানকার চিকিৎসায় প্রাণ রক্ষার চেয়ে মুক্তির প্রাণ সংশয় ছিল সর্বাধিক। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ত্রাহি মধুসূদন দশায় থাকতেন। পাক-বাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর বিশ্বাস নেই। মুক্তিবাহিনী নামের দুর্গন্ধ পেলেই গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেবে। এত কিছুর পরও মৃত্যুভয় তুচ্ছ-জ্ঞানে ডাক্তারগণ আলাদা গোপন রেজিস্টারে নাম উঠিয়ে মুক্তিসেনার চিকিৎসা করতেন। গরজ বালাইর নামে পাকিস্তান আর্মিও পশ্চিমা মিলিশিয়াদের পর্যন্ত সিভিল হাসপাতালে ভর্তি হতে হতো। তারা প্রায়শই সশস্ত্র থাকতো। কৌশলে পাশাপাশি বেডে শত্রু-মিত্র রোগীর চিকিৎসা করতেন ডাক্তার। চট্টগ্রামের ফৌজদার হাট যক্ষা, বক্ষব্যাধি ও উদরাময় হাসপাতালে এমনি পাকিস্তানি আর্মি ও মুক্তিসেনার যুগপৎ চিকিৎসা চলেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের চিকিৎসায় তৎকালীন আহত মুক্তিযোদ্ধা তালিকার সন্ধান আজো মিলে নি।

পাকিস্তানি আর্মির চোখে ক্লিনিক, হাসপতালের কোনই মূল্য ছিল না। বিচ্ছুর দেশে কিচ্ছুতে তাঁদের বিশ্বাস নেই। তামাম বাঙ্গাল মুলুগ তাদের চোখে কুফরিস্তান। সারা বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে তারা মুক্তিবাহিনী ভেবে প্লান বানাচ্ছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গাল মাত্রই কাঙ্গাল। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমানের কোন ফারাগ নাই। সকল ভয় ভীতির বিবেচনার পরও হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ মুক্তি চিকিৎসায় উদয়াস্ত কাজ করেছে। দুঃসময়ের হাসপাতাল সত্যিকার অর্থে যুদ্ধক্ষেত্রের 'এডভান্স ড্রেসিং সেন্টার' (এডিএস) হিসাবে কাজ করেছে। অনাগত ইতিহাসের বিচারে সে দিনের "যুদ্ধ ক্ষেত্র মানেই তো গোটা বাংলাদেশ।"

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালিকে মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। দলমতের ভেদাভেদ বিসর্জনে তারা সমবেত হয়েছে এক পতাকা তলে। মুষ্টিমেয় কটা পর পদলেহী দালাল বরঞ্চ বাঙালি ঐক্য সুদৃঢ় করেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর বুলেটের আঘাতে হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি খ্রিস্টান-বৌদ্ধও অকাতরে মরেছে।

বুলেটের আঘাতে নিমিষে ঘুমিয়ে পড়েছে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি। অবাক

বিস্ময়ে বাঙালি খ্রিস্টান ডাক্তার দেখেছেন বাঙালি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের অকাতর বলিদানের রক্তে জেগে উঠা স্বাধীনতার দীপ্ত তেজের শপথ। সকলের রক্তে মিলেমিশে তৈরি একটি মাত্র ধারা, বাংলার স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

একাত্তর সালে কোটালিপাড়া থানার বেশ কিছু নার্স ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ডসহ অন্যান্য হাসপাতালে চাকরিরত ছিলেন। হেমায়েত বাহিনীর ঔষধের প্রয়োজনে সে-সব মহান নার্সরা কৌশলে ঔষধপত্র বাঁচিয়ে হেমায়েতবাহিনীর ডাক্তারদের হাতে পৌঁছাতেন।

মুক্তি চিকিৎসা ঔষধ সংগ্রহ ঃ মুক্তি-অমুক্তি, শত্রু-মিত্র-জনতার চিকিৎসায় প্রচুর ঔষধের প্রয়োজন। ঔষধ জোগাড়ে বিরাট রিস্ক ও ঝামেলা। দুর্দিনে বড় বড় শহরেই ঔষধ সরবরাহে ঘাটতি। দূর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ দুরাশার বাহুল্য মাত্র। দখলদার দেশে অন্যান্য উৎপাদনের ন্যায় ঔষধ উৎপাদনও বন্ধ প্রায়। বাইরের জগত থেকে দেশে আসছে মারণাস্ত্রের সর্ব প্রকার উপকরণ। কিন্তু ঔষধ আমদানি প্রায় শূন্যের কোঠায়। গ্রামাঞ্চলে ঔষধের দোকান এমনিতেই কম। যুদ্ধের গোলযোগে তাদের অধিকাংশ বন্ধ। যে কটা দোকান খোলা সেখানে জীবন রক্ষাকারী ঔষধের দাম আকাশ ছোঁয়া, সাধারণ মানুষের কিনার সামর্থের নাগালের বাইরে। এত অর্থ সামর্থ মুক্তির নেই যার সাহায্যে চিকিৎসা চলে। টাকার অভাবে মুক্তিরা মাঝে মধ্যে না খেয়ে থাকছে। তবু যুদ্ধে ক্ষান্ত দিচ্ছে না। আমেরিকা ও ইউরোপের খ্রিস্টান সংখ্যাধিক্যের অধ্যুষিত দেশের অস্ত্র ও অর্থ বলে যুদ্ধ চালায় পাকিস্তানি আর্মি। তাই বাঙালি খ্রিস্টানদের প্রতি তাদের যৎকিঞ্চিত কৃপা দৃষ্টি। খ্রিস্টান বা মিশনারি ক্লিনিক অবস্থান খ্রিস্টান মুক্তি ডাক্তারের নখদর্পণে। মুক্তিরা বিশ্বাস করতো শত্রু চোখের পেয়ারে খ্রিস্টান দ্বারে পৌঁছুতে পারলে ঔষধ-পথ্য, অন্ন-বস্ত্রের কিছু না কিছু হিল্লা হবেই। চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহের কৌশলগত পদ্ধতির সূত্রে মুক্তি মতামতের প্রাধান্য দিয়ে বাঙালি খ্রিস্টান ডাক্তার জেমস বকুল মজুমদারকে নিযুক্ত করেন হেমায়েত। তাঁর ভাই ডা. সুনিল মজুমদারকেও একই কাজে লাগান তিনি।

'লাজ লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়'-তারই নাম মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালি গণমানুষের শ্রদ্ধা অর্জন ছিল মুক্তির নৈতিক শক্তির উৎস। জোর থাকতেও পারত পক্ষে তার প্রয়োগে সংযম থাকতো। উদ্বুদ্ধকরণ, মটিভেশন সলজ্জ লজ্জার হাত বার বার পাততে হতো। যাদের ঔদার্যের ভরসায় সাহায্য চাওয়া তাদের সবাই সকল ব্যাপার-স্যাপার সুনজরে দেখতেন না। তাই ঝুঁকি ও ফাঁকির লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে আকীর্ণ মুক্তি সেবার ঔষধ সংগ্রহের ক্ষেত্রে রয়েছে অম্ল মধুর তিক্ত অভিজ্ঞতা। মুমূর্ষু মুক্তির প্রাণ রক্ষায় জরুরি ঔষধ না হলেই নয়। তাই অনেকটা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত দুয়ারে আকাঙ্ক্ষার হাত বাড়াতে হতো। গরজ বড় বালাই। সত্যকে প্রকাশ ভাল। মুক্তি ঔষধ সংগ্রাহকদের সাথে ভয়ে স্বদেশ প্রেম কি চক্ষুলজ্জায় অনেকের ব্যবহার অভদ্রতার পর্যায়ে না পড়লেও ভব্যতার শোভনীয় পর্যায়ে পড়তো না। সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। সহ্যের সীমা ছাড়লে মুক্তির রুদ্ররূপ প্রকাশ পেত। হাওয়াই গজবের

দাওয়াইর মত অস্ত্রের মুখে ঔষধ ছিনিয়ে নেয়ার ছিনতাইকাজে ভদ্র মুক্তিকে নামতে হয়েছে। শান্তির ক্লিনিকের ঔষধের চেয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে আহত মুক্তি যোদ্ধা সৈনিকের ঔষধের প্রয়োজন তুলনামূলক বিচারে সর্বাধিক। আহতদের জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতাল নেয়ার সুযোগ সাহসের কোনটাই ছিল না। যে কোন মূল্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঔষধ সংগ্রহ করা ছাড়া মুক্তির কোনো বিকল্প ছিল না।

ফরিদপুর বরিশালের খ্রিস্টান মিশন ক্লিনিক-হাসপাতাল মুক্তির চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ সাহসী ভূমিকা রেখেছে। দুর্দিনে মুক্তির জরুরি চিকিৎসায় নারকেল বাড়ি ক্লিনিক, জলিল পাড় ক্যাথলিক মিশন ক্লিনিক, গোপালগঞ্জের আর এস ডি মিশন হাসপাতালের নেয়া ঔষধপত্র মুক্তিযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় উপকারে এসেছে। তাঁদের মানবিক সেবার ঔদার্যে অনেক মুক্তির প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। অন্যথায় অসংখ্য আহত মুক্তিযোদ্ধাকে রণাঙ্গণেই শেষ শয্যা নিতে হতো। বাংলার দুর্দিনে বাংলার মাটিতে খ্রিস্টান মিশনগুলির সেবাধর্মী কার্যক্রম অনাগতকালের বাঙালি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে।

মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েতবাহিনীর ডাক্তারদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	থানা	জেলা	মন্তব্য
১.	ড. শ্যামাচরণ বৈদ্য	মাদারিপুর	মাদারিপুর	বর্তমানে প্রয়াত
২.	ডা. সুরেন্দ্রনাথ সরকার	গৌরনদী	বরিশাল	-
৩.	ডা. হেমায়েত উদ্দিন	সরূপকাঠি	বরিশাল	-
৪.	ড. নওশের আলি	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	বর্তমানে প্রয়াত
৫.	ডা. নির্মল চন্দ্র	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	-
৬.	ডা. বকুল মজুমদার	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	-
৭.	ডা. সুশীল মজুমদার	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	-
৮.	ড. আবদুল গফুর	আগৈলঝাড়া	বরিশাল	বর্তমানে প্রয়াত
৯.	ইতালিয়ান ডা. ফাদার আন্তন	জলিরপাড় বানিয়ারচর ক্যাথলিক মিশন	গোপালগঞ্জ	-
১০.	ডা. রঞ্জিত কুমার ব্যানার্জি	আগৈলঝাড়া	বরিশাল	
১১.	ডা. দেলোয়ার হোসেন	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	
১২.	ডা. আসাদুজ্জামান	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	
১৩.	ডা. মোঃ সাহাবউদ্দিন	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	
১৪.	ডা. জগদীশ চন্দ্র অধিকারী	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	
১৫.	ডা. রাজেশ্বর জয়ধর	কালকিনি	মাদারিপুর	
১৬.	ডা. ফিলিপস্		খুলনা	

মুক্তি বেদনার বিশাল সমুদ্র ঃ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে নিজের নিঃসন্তান বালিকা বধূ ও পোষ্যদের ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। যশোর ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ ছেড়ে আমার স্ত্রী পারভীন বেগম এলেন ফরিদপুর বালিয়াকান্দি থানার ডোমাইন গ্রামে। হেমায়েত-বাহিনীর ঔদার্যে একাধিকবার তিনি রক্ষা পান। একজন স্বামী হিসাবে

আমি এতই আনাড়ি, তিনি যে তখন অন্তঃসত্ত্বা জানতাম না। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তিনি স্থান নেন কুমিল্লা সিভিল হাসপাতালে। ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। আমাদের জীবনের প্রথমা কন্যা সন্তান পৃথিবীতে আসে। ছয় ঘন্টা ব্যবধানে শত্রু শেলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে হারিয়ে গেছে সে নাম না জানা কন্যা। মনে বড় দুঃখ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে কার অবদান কত বেশি সে বিচারভার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষের বাইরে তৃতীয় পক্ষের নিরপেক্ষ হাতে। মুক্তিযুদ্ধে কার দুঃখ কত বেশি তার আছে অজস্র জ্বলন্ত জীবন্ত প্রমাণ।

তিন হাত মাটির গভীরে ঃ গোপালগঞ্জ কোটালিপাড়া থানার চৌরখুলি গ্রামের সন্তান জেমস বকুল মজুমদার। স্বামী-স্ত্রী দুজনই মৃত্যু সঙ্কুল যুদ্ধ সাগরে জীবন তরি উৎসর্গ করলেন। রণাঙ্গণে স্বামী-স্ত্রী গেরিলা দম্পতি বিচ্ছিন্ন। সম্মুখ রণাঙ্গণে মুক্তি ডাক্তারের জীবন মৃত্যুর সংশয়ের দোলায় দুলছে। পুরো যুদ্ধকালে ডাক্তারের জীবন বন্দুকের নল বরাবর অবারিত। বেগম বকুলের জীবন সদা আতংকে ম্রিয়মাণ। "আজ এ-গ্রামে দু'রাত তো কাল ঐ-গ্রামে একদিন এ-ভাবেই আমার এবং হেমায়েত ভাইয়ের উভয়ের পরিবার পালিয়ে বেড়াতেন। কারণ, তাদের অপরাধ তাঁরা মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী।" বকুলের আকুল চোখ প্রিয় মুখের দর্শন পেত না। মাঝে মধ্যে ছিটে ফোঁটা উড়ো খবর মিলতো তিনি আজ এ-গ্রামে আছেন কি কাল ও-গ্রামে। তিনি বেঁচে আছেন। ভাল আছেন।

বাংলার স্বাধীনতার প্রভাময়ী দীপ্তিমান সূর্য প্রবাসী অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের ব্যাপারে ঘটেছে তার চেয়েও মানবীয় আত্মনির্যাতন। জোহরা তাজউদ্দিন স্বামী সান্নিধ্যে পৌঁছলেন প্রবাসী সরকার-এর সদর দপ্তর কলকাতা থিয়েটার রোড ওরফে মুজিব নগর। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনপণ যুদ্ধ ও দুঃখ-কষ্টের স্মরণে দাম্পত্য জীবনের সুখ স্পর্শ এড়িয়ে চললেন বাংলার তাজ। বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ন্যায় তাজউদ্দিনের অভাবে অপূর্ণ থাকবে।

অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না। বকুল দম্পতির এক বছর বয়সের ছেলেটি রইল গ্রামের বাড়ি চৌরখুলি। বৃদ্ধা মা সযতনে আগলে রাখতেন পুত্রের রক্ষিত ধন নাতিকে। বকুলের মা গ্রামের বাড়িঘর পাহারা দিতেন। পুত্র ও পুত্র বধূকে বাংলার স্বাধীনতার নামে উৎসর্গ করলেন। বংশ প্রদীপ পুত্রের প্রথম সন্তানকে বুক আগলে লালন-পালন করেন তিনি। পুত্রকে মুক্তিযোদ্ধা স্বামী-স্ত্রী কারও কাছে রাখা নিরাপদ নয়। দুজনেরই ছন্ন ছাড়া গেরিলার অনিশ্চিয়তার পলাতক জীবন। থাকা খাওয়ার কারুরই নিশ্চয়তা নেই। আজ খাওয়া জুটে তো কাল অনিশ্চিত। এ যে "ভোজন যথাতথা শয়নং হট্ট মন্দিরে"র চেয়েও খারাপ দশা। ঝটিতি ছুটার কারণে দম্পতি যুগলের অনিশ্চিত জীবন। যে কোন সুন্দর সকালে যে কেউ অক্কা পেতে পারেন। অনিশ্চিত জীবনের যুদ্ধসাথীদের পক্ষে মাসুম বাচ্চা দেখা সম্ভব নয়। সার্বিক বিবেচনায় বরাভয় নিরাপদ আশ্রয় দাদির কাছেই সন্তান গচ্ছিত থাকে।

অকস্মাৎ বজ্রঘাতের মতই সকলকে অকূলে ভাসিয়ে, "একদিন খবর এলো সে

আর বেঁচে নেই। আমার প্রথম সন্তান, যৌবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, এতই অভিমান ছিল ওর মনে যে যুদ্ধের কটা দিন মা বাবাকে ছেড়ে থাকার কষ্ট সইতে পারল না। মরে গিয়ে ওর প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিল নির্মমভাবে। ছেলেটা এতই ধরিবাজ যে যখন আমি ওর বয়সী বাচ্চাদের কোলে তুলে নিতে যাই ও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। অন্তরে শাসায়। বলে আমাকে যখন আদর করিস নি, ওকেও করতে পারবি না। আমার স্নায়ু অবশ হয়ে আসে, হাতগুলো শিথিল, আমি বরফ হয়ে যাই। নিথর নিষ্প্রাণ প্রখর রোদে শুধু গলতে থাকি, গলতে থাকি, গলতে...।"

ছেলেকে শেষ দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় মুক্তি ডাক্তার। দেখবেন কি! আত্মজনের মৃত্যুর দুদিন পর সংবাদ পান মুক্তি পিতা। নিষক কষণ শত্রু বেড়াজালে নিজ গ্রামের বাড়িতে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধার বারণ। পুত্র শোকাতুর মুক্তিযোদ্ধাকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতে বসে আছে পাকিস্তানি আর্মি। চৌরখুলির চোরাই পথের একমাত্র খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধা বকুল। ধর্ম বদলালেও বাঙ্গালের স্বভাব বদলায় না। অন্তজ খ্রিস্টিয়ান গ্রামের স্বধর্মীয়দের চোখে সেটাই তার বড় অপরাধ।

সন্তান হারা মুক্তি মায়ের হাহাকারে পাষাণ গলে। রক্ত মাংসে গড়া মুক্তি ডাক্তার জীবনের ঝুঁকি নিলেন। প্রিয় পুত্রের কবর জিয়ারতে আত্মসান্ত্বনার মানবিক দুর্বলতা এড়াতে পারলেন না। রাতের আঁধারে চোরের মত গেলেন ছেলের কবরে। এ যেন মহাপাপীর পাপ স্খলন। হায়রে স্বাধীনতার স্বদেশ! ছেলের কবর দেখার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত তার পিতা।

"কুকুরের সাবধান বাণী আর শিয়ালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ওর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি! দেখছি, এই তো এখানে, আমার ছেলে, প্রিয় প্রথম সন্তান, ঘুমিয়ে আছে, তিন হাত মাটির গভীরে। এক গুচ্ছ ফুল ওর কবরের ওপর রেখে নীরবে চলে এসেছি, যেন আমি ওর কাছে কিছু ফুল ঋণী ছিলাম, এখন শোধবোধ, সারাজীবনের জন্য।"

এমনি কতনা বেদনা বিধুর আর্তি ধন্য মানবীয় শোক গাথায় আকীর্ণ মুক্তিযুদ্ধ।

রেফারেন্স : "তখন আমরা যুদ্ধে"–জেমস বকুল মজুমদার। 'নবযুগ'-খ্রিস্ট ধর্মীয় মাসিক পত্রিকা-৪৯৩ সংখ্যা।

অষ্টম অধ্যায়

স্বাধীন দেশে হেমায়েতবাহিনী

স্বাধীন বাংলার প্রথম জাতীয় নির্বাচন

১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলার প্রথম জাতীয় নির্বাচন হয় মার্চ মাসে। ফরিদপুরের কোটালিপাড়া থানা থেকে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামীলীগ, স্বতন্ত্র, অন্যান্য মিলে চৌদ্দ জন নমিনেশন পেপার জমা দেন। এঁদের মধ্যে চারজন উল্লেখযোগ্য :

ক) শ্রী সতীশ চন্দ্র হালদার-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

খ) শ্রী সন্তোষ বিশ্বাস-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

গ) জনাব কাজি হারুনুর রশিদ- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পার্টি (পরবর্তীকালের মন্ত্রী কাজি ফিরোজ রশিদের বড় ভাই)।

ঘ) শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ-ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি। (মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর একজন কোম্পানি কমান্ডার)।

শেখ মুজিবের নিজস্ব এলাকা গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া। বিপুল সংখ্যাধিক্যের হিন্দু এলাকা। জাতিসংঘ শুদ্ধ বিশ্ব ফোরামগুলিতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তি রাশিয়ার সমর্থন ও অস্ত্র সাহায্যে পুষ্ট মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। রাশিয়ার কমিউনিস্টদের সেই সুবাদে জামাই আদর। তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগ চান। তাঁদের কর্মীরাও মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। কোটালিপাড়ার নমিনেশনে শেখ-এর সংশয় বৃদ্ধি পায়।

শতাব্দীর ঘুম ভাঙানো বাংলার জাতীয় নেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানি কারাগারের জিঞ্জির ভেঙ্গে ফিরলেন বাংলার মাটিতে। জাগ্রত বাঙালির নয়নমণি দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব। নিজ জন্মভূমি গোপালগঞ্জে স্মরণকালের ঐতিহাসিক বিপুল জনারণ্যের জনসভা। লাখো জনতার জনসভায় ফরিদপুরের কালজয়ী মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতকে বুকে জড়িয়ে গর্ব-অহংকার-ভালবাসায় আবেগাপ্লুত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

হেমায়েতকে তিনি মূল সভামঞ্চে ডেকে নেন। দু'হাত ধরে জনতার সামনে মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ী যুদ্ধাহত পঙ্গু বীরকে খাড়া করে বলেন, "এই ছেলে আমার গৌরব, আমার অহংকার, গোপালগঞ্জ তথা বাংলার সম্পদ। ও যদি গোপালগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধ করতে না আসত তা হলে আমি আজ বাংলার মাটিতে বড় মুখ করে কথা বলতে পারতাম না।" পরবর্তীতে শেখ তাঁর পাশের চেয়ারে হেমায়েতকে বসিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদীপ্তিতে সম্মান প্রদর্শন করেন।

বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্র সমর্পণ

স্বাধীন দেশে যুদ্ধ পরবর্তী অরাজক অবস্থা বিদ্যমান। দেশে তখন বিদেশী সৈন্য। ঘরে ঘরে অস্ত্র। অনিয়মিত বাহিনী ও গেরিলাদের অস্ত্র জমা দেয়ার ক্ষেত্রে

রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। মস্কো ধারার কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী অফিসার পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেইন্ড সশস্ত্র গেরিলা ও নিয়মিত যোদ্ধাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চান। ১৯৭৪ সালে লেখকের সেনা-ব্যাটম্যান নওয়াব আলীকে জিজ্ঞেস করে এ-ব্যাপারে জানা যায়। তাঁর যুদ্ধকালীন অফিসার তখন বিএম'তে পোস্টিং। ১৪ ইবিআর-এর সে-সৈনিক নওয়াব আলীর কথার সত্যতা জানতে হয় তার অফিসারের নিকট থেকে। তিনি চাকরিতে লেখকের সিনিয়র হলেও অকপটে সত্যতা স্বীকার করেন। হায়রে ইজমের শিকার স্বাধীন বাংলার সেনাবাহিনী, তাইতো এত হানাহানির সংঘাত।

পাক আর্মি ও রাজাকারদের পরিত্যক্ত অস্ত্রে গড়ে ওঠা সিক্সটিন ডিভিশন বা ষোড়শ বাহিনীর অস্ত্র সংগ্রহে ঘাপলা অনেক। নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর ট্রুপস ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় পুরোপুরি অস্ত্রেই গড়ে ওঠে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। এমনি করে স্থল-জল-আকাশ বাহিনীর অস্ত্র পেতে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। মন্ত্রতন্ত্রের রাজনৈতিক ভাবধারায় গড়ে ওঠা অনিয়মিত বাহিনীর অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে মিলিশিয়া ক্যাম্প। সাধারণ গেরিলারা, দেশের স্বাধীনতার বাইরে যাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না তারা অস্ত্র জমা দিতে শুরু করলে রাজনৈতিক নেতাদের মাথা বিগড়ে যায়। তারা ভবিষ্যতের রাজনীতির অস্ত্রবাজি করার লক্ষ্যেই কিনা জানি না, বিভিন্ন কোম্পানি ক্যাম্প, মিলিশিয়া শিবিরে রাজনৈতিক ফুস মন্তর আওড়ানো শুরু করেন। "তোমরা এত বড় যুদ্ধ করে জয়ী হলে, উচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত চৌকশ যোদ্ধা, তোমাদের দিলটা কি সরকার? মুজিব নগর সরকারের টাকার হিসাব লও। তোমাদের বাপ-ভাই-সাথী মরল তার পেলেটা কি তোমরা? তোমাদের বীর যোদ্ধাদের খেতাব ও পদোন্নতির চাকরির কি হলো? অস্ত্রটা দিয়ে একবারে নিরস্ত্র হও তখন কেউ তোমাদের কথা শোনবে না, অস্ত্র হাতে থাকতে পাওনা-গণ্ডা সব বুঝে নাও।" অত্র লেখকের মত ছদ্মবেশী গেরিলার স্ব-কানে শোনা এসব ফুস মন্তর। যুদ্ধকালে মরণযোদ্ধা সাথী সৈনিক-গেরিলা আজ তাঁর যুদ্ধকালের অফিসার-এর কথায় উদাসীন। রাজনীতিবিদরা তাঁদের মন্ত্র-তন্ত্রের ইজমে একটা সুশৃংখল সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের অল্পদিনেই উচ্ছৃংখল করে ছাড়লেন। সৈনিকের যুদ্ধনীতি আর রাজনীতির পার্থক্য বুঝতে রাজনীতিবিদদের সময় লাগবে। তাই বিশেষ রাজনৈতিক দল ক্ষমতা পেয়ে দক্ষপেশাদার জনশক্তির অভাবে গদি রক্ষার তাল শামলাতে পারেন না। মানুষ ক্ষেপিয়ে গদি দখল করা যায়। আবার, ক্ষেপাদের দিয়েও গদি রক্ষা করা যায় না।

অভ্যন্তরীণ যোদ্ধাদের অস্ত্র জমায় ঘাপলা হয়। ১৯৭২-এর প্রথম দিকে পত্রিকার টপ লাইন হেডিং 'মিলিশিয়া ক্যাম্পে বিদ্রোহ'। ইজম যোদ্ধারা মিলিশিয়া ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিতে অনীহ। সেনা কমান্ডাররা বিব্রত। যশোর ব্রিগেড কমান্ডারকে লেখক জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, ব্যাপারটা কি?" তিনি কন, "বুঝই তো গেরিলা প্রফেসর/কাপ্তান। তোমার ছাত্ররা নি এহন তোমার কথা শোনে। পিটাপাটা দিয়া আর

কটারে বাগে আনবা। ছাত্ররা মাস্টারের হাতের মাইরে অভ্যস্ত। সেনা মাইরে ভীতশ্রদ্ধ। তুমি তো প্রফেসর/কাপ্তান দুটাই। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই। ওসমানি শুদ্ধ তদন্ত করে তোমার বিরুদ্ধে কিছু পান না। তোমার চড় থাপ্পরের মাইরটা দেখিয়ে বিচার চায়। ভাগোড়ারা কেবল তোমার সামনে মেনমেনা। তোমার বিচার তোমার সামনে উর্ধ্বতন করুক অভিযোক্তারা' তা চায় না। তাদের দাবি তোমার স্থানান্তর। কারণ, মার্কা মারা চোরডাকাত মুক্তিদের বিরুদ্ধে দাগ নম্বরে তুমি রেকর্ড কইরা রাখছ। সারা দেশে একই আগুন। তুমি ভোম ভোলানাথ দাড়িওয়ালা ছদ্মবেশী পীরানে পীর সালামতের গেরিলা। তোমার অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে বঙ্গবন্ধুর ভাইয়ের লঞ্চের রিলিফের লুটের চাল লুট করে গেরিলা। বাগেরহাটের চার ঝুনঝুনওয়ালা নিয়মিত ভারতীয় আর্মির ঝোলা গেল তোমার অদৃশ্যের ছদ্মবেশী উপস্থিতিতে। এত জ্বলন্ত প্রমাণের পর তোমারে বাঁচাই কেমনে। তোমার মারা চড়ের দাগ গেরিলা মোমেনের গালে দশদিনেও মোছে নি। গেরিলা মোমেন যে সাধু তা না। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে অযোদ্ধাদের মত কাজের অভাব নেই। প্রফেসর বুইলা পার পাইলা নইলে বুঝতা ঠেলা।" "এবার আমার কথা শুনুন বিগ্রেড কমান্ডার স্যার, যে হাতে অস্ত্র দিছি, সে হাতে অস্ত্র নিমু, নইলে কোনটারে কোন ইজম বাঁচাতে পারবে না।" ব্রিগেড কমান্ডার কন, "শেখ মুজিবর রহমান দেশে আইছেন। তিনি এ-অঞ্চল সফর করলে অবস্থার উন্নতি হবে।" জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধায় গেরিলা যোদ্ধারা বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ যোদ্ধারা শেখ সাহেবের হাতে অস্ত্র জমা দিয়ে গৌরবান্বিত হতে চায়। তেমনি গৌরবে ধন্য হতে চাইলেন হেমায়েত।

১৬ ডিসেম্বর অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবর্তে মিত্রবাহিনীর জেনারেল আরোরার হাতে আত্মসমর্পণ করেন পাকিস্তানের ইস্টার্ন আর্মির কমান্ডার জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি। মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাপারটা সহজভাবে গ্রহণ করেনি। নিয়াজির অসম্মানের আত্মসমর্পণ আর আরোরার সম্মানের দাসখত গ্রহণ মুক্তিরা সুনজরে দেখেনি। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত লড়াইর কথা স্মরণ করে সামান্য লজ্জা হলো না নিয়াজি-হৃদয়ে। এককালের পাকিস্তানিরা ছিল ভাই ভাই। পরাজিত ভাই বিজিত ভাইয়ের হাতে আত্মসমর্পণ করাটা কোন ব্যাপারই ছিল না। নিয়াজি লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে এককালের তাদের জানের দুশমন কাফের হিন্দু সেনাপতির হাতে অস্ত্র সমর্পণ করেন। পৃথিবী জানলো পাক বর্বরতার গভীরতা। কারণ যে হীন ঘৃণ্য জিঘাংসায় পাকিস্তানিরা বাঙালি মহিলাদের ধর্ষণ-গর্ভায়ন-বিকলাঙ্গ করেছে, যেভাবে যুবা-বৃদ্ধা-শিশু-কিশোর নির্বিচারে হত্যা-বিকলাঙ্গ করেছে তার ক্ষমা নেই। যেভাবে বাংলাদেশকে প্রতিভা শূন্য, বীর শূন্য, সম্পদ শূন্য করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। তাই বর্বরতার পুরস্কার পেতে জানে বাঁচতে মুসলমান হয়ে মুসলমানের পরিবর্তে অমুসলমান বিদেশী কাফের সেনাপতির হাতে ঘৃণ্য নতিজার নতজানুর পরাজয় স্বীকারের আত্মসমর্পণ। তেসরা ডিসেম্বর কোটালিপাড়া পাক হানাদার মুক্ত হয়। ৯ই ডিসেম্বর বিনা গুলিগোলায় গোপালগঞ্জ মুক্ত হয়। শত শত ছড়ানো-ছিটানো পরিত্যক্ত অস্ত্র যাতে

চোর-ডাকাত-লুটেরার হাতে না পড়ে সে ব্যাপারে হেমায়েত সতর্কতা অবলম্বন করেন। পূর্বেই গ্রুপ কমান্ডারদের এ-ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। সমুদয় অস্ত্র এসডিও অফিসের মালখানার চত্বরে জমা করার সিদ্ধান্ত হয়। ক্যাপ্টেন বাবুল ও হেমায়েত বাহিনী প্রধানের নেতৃত্বে-পরিত্যক্ত অস্ত্রের ১২,০০০ জমা পড়ে ৯ ডিসেম্বর মহকুমা মালখানায়। বিজয়ে উল্লসিত জনতার জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয় গোপালগঞ্জ। বিজয়ী গোপালগঞ্জ বাহিনী ফরিদপুর অভিমুখে যাত্রা করে ৯ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে। একাধিক মুক্তিফৌজের যৌথ কমান্ডার ফরিদপুর উদ্ধারে যাত্রা করে। এই যৌথ কমান্ডে হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধা রয়েছেন তিনশ পঞ্চাশ জন। সার্বিক নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন নুর মোহাম্মদ বাবুল। ফরিদপুরের যাত্রা পথে দিগনগর ব্রিজ, বাখুন্ডা ব্রিজ, তালমা ব্রিজের মত স্থানে স্থানে পকেট প্রতিরোধ উতরানো যুদ্ধে জিতে তবেই মুক্তিদের পৌঁছাতে হয় ফরিদপুর। কিন্তু পাক হানাদাররা আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণে নানারকম তালবাহানা শুরু করে। নানা বাহানার কালক্ষেপণে বাস্তবে পাক আর্মি অপেক্ষা করছিল তাদের এক কালের দুশমন বর্তমানের প্রাণ বাঁচানোর অভিভাবক ইন্ডিয়ান আর্মির আগমনের জন্য। শেষ পর্যন্ত তারা ফরিদপুরে ইন্ডিয়ান আর্মির হাতেই আত্মসমর্পণ করে ধন্য হয়।

১৯৭১-এর যুদ্ধের বিজয় ভারতীয় আর্মির জন্য সহস্র বছরের মহাবিজয়। অতীতে তারা মুসলমানদের হাতে তুলাধুনা হয়ে পরাজিত হয়েছে। বাংলাদেশীদের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে স্বদেশকে দখলদার মুক্ত করা। পৃথিবীর আর দশটা বিজয়ী বাহিনী যা করেছে কমবেশি ভারতীয় আর্মিও তাই করেছে। পাক আর্মির অস্ত্র বাংলাদেশের অর্থে সংগৃহীত। মুক্তিবাহিনী মনে করে পাক আর্মির অস্ত্র ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ আর্মির অস্ত্র। কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির কথা, এত অস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশীরা করবে কি? তাদের আর্মিরই বা দরকার কি ? তাদের তো শত্রু নেই। তারা ভারতের মত মিত্র পরিবেষ্টিত। পাক অস্ত্র দখল যেন তাদের বিজয়ের চিহ্ন। শুধু যে পাক আর্মির চিনা অস্ত্র তাই নয়, তারা মিলিশিয়া ক্যাম্পের বাছাই করা পিস্তল, সিভিল গান, ব্রিটিশ থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল পর্যন্ত লুটা আরম্ভ করে। বিজয় লগ্নে মেজর জলিল ৯নং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৯নং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্সের মেজর জয়নাল আবেদিন। অনাহুত যুদ্ধ মঞ্চের বিজয় লগ্নে কমান্ড হারা মেজর জলিলের পদচারণা। তিনি খুলনার মিল-ফ্যাক্টরির আনকোরা গাড়ির মত উপঢৌকন ইন্ডিয়ান জেনারেলদের দেয়া শুরু করলেন। তার বিশ্বস্ত বাহিনীর ছেলেরা অর্থবিত্তের বদলে মানুষের মাথায় কোরান রেখে শপথ করান "আমরা জলিলের লোক। যে টাকা নিলাম তার কথা কাউকে কইতে পারবা না।" যুদ্ধের পর পর খুলনার জন্য নিয়োজিত ডিসি কামাল সিদ্দিকী না আসা পর্যন্ত গেরিলা ক্যাপ্টেন/প্রফেসর সফিক খুলনার চার্জে ছিলেন। মাল লুটপাটের প্রত্যক্ষ ও ঢাক্কুস প্রমাণসহ জলিল বাহিনীর লুটপাটের চিত্র তিনি তুলে ধরেন যশোরের ব্রিগেড কমান্ডার লে: কর্নেল এম.এ.মঞ্জুর সমীপে। ইন্ডিয়ান আর্মির লুটের বহরের কিছু গাড়ির ডিভ-ব্রিগেডের এমন কি অফিসারের নাম পর্যন্ত দাগ নম্বরে টুকে যশোর ব্রিগেড কমান্ডারকে দেন গেরিলা কাপ্তান সফিক। অন্যান্যের

ব্যাপার যাই হোক যশোর ব্রিগেডের কাছে বাংলাদেশের লুটে নেয়া গাড়ি, চিনা অস্ত্রের অনেক কিছু ফিরিয়ে দিয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মি। প্রথমে ইন্ডিয়ানরা যশোর-খুলনা অঞ্চলের লুটের ব্যাপারে বলেন বিশাল ভারতের কোথায় সে সব আছে কে জানে! প্রকৃত তথ্যসহ দাগ-নম্বরে সে সবের নির্দেশনা প্রদানের কারণে যশোর ব্রিগেড কমান্ডারের স্থির সিদ্ধান্তে তা সম্ভব হয়। পাপ মোচনে জলিল রটান যে ইন্ডিয়ান আর্মির লুটে বাধা দিয়ে তিনি হিরো বনেছেন। তার 'বুড়ি গোয়ালিনী' বিপর্যয়ের ব্যর্থতার ঘাটতিও পুশিয়ে নিতে তিনি ক'জন প্রতিষ্ঠিত যোদ্ধা বাংলাদেশী আর্মি অফিসার ও রাজনীতিবিদ হত্যা পরিকল্পনা এঁটে ক্যাপ্টেন সফিকের হাতে ধরা পড়ে অত্র যোদ্ধা-লেখক দ্বারা বিপাকে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান আর্মির সাহায্যে মেজর জলিলকে এরেস্ট করলে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। জলিল-এর বিচার রাজনৈতিক ইস্যুতে গড়িয়ে ভিন্নরূপ নেয়। যুদ্ধ করা বীরযোদ্ধারা অনেকে বিরূপ হবেন জানি, তবুও নিরেট প্রকৃত সত্য একদিন স্বরূপে প্রকাশ পাবেই।

ফরিদপুরে পাক আর্মির অস্ত্র লুটে নেয় ইন্ডিয়ান আর্মি। মুক্তিযোদ্ধারা বাধা দিতে চাইলে ক্যাপ্টেন বাবুল দেশের বৃহত্তর কল্যাণে বিজয় সংহত করতে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাক আর্মি ও রাজাকারদের আত্মসমর্পণের মত জটিল পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ এড়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংযত হবার উপদেশ দেন।

হেমায়েত-অঞ্চলের বিজয় ইতোমধ্যে সংহত। এবার বাহিনী ক্লোজ (জমায়েত) করা হয় মাঝবাড়ি হাই স্কুল মাঠে। হেমায়েতের আশৈশব তারুণ্যের সেই স্মৃতিধন্য মাঝবাড়ি হাই স্কুল। স্মৃতির পর্দায় ভেসে আসে ছাত্র জীবনের দুষ্টুমিটা। হেমায়েত বাহিনী তাদের লুকানো অস্ত্র গোলা-বারুদের সিংহভাগ রেখেছিল ভাধার বিলের মাঝামাঝি কয়েকটি বাড়িতে। সে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরকারের মালখানায় জমা ছিল। ঘরে ঘরে অস্ত্র, ইন্ডিয়ান আর্মির অস্ত্র লুটা, মেজর জলিল কর্তৃক ইন্ডিয়ান আর্মি লুটেরাদের বাধা দেবার মুখরোচক গুঞ্জনের অনেক কিছু শুনেও আহত নেকড়ে হেমায়েত চুপ ছিলেন। তিনি যেন সিদ্ধান্তহীনতায় কমজোর। নিজ বাহিনীর ফোর্স সংগ্রহ এবং সংহত করতে করতে এলো ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি। "পাক জেলের তালা ভাংবো, শেখ মুজিবকে আনব" আন্দোলনের শেষ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরলেন। বাংলার মুকুটহীন সম্রাটকে পেয়ে জাতি আনন্দের হাসি শোকের কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। স্বজন হারানোর রোনাজারিতে আকাশ ভারি হয়ে ওঠে। সে-জন্যেই সহজে অস্ত্র সমর্পণ করা যাবে না সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে শেখ মুজিবকে ঘিরে পলিটিক্যাল টাউট-চামচাদের বিভিন্ন কায়দায় রিহার্সেল চলছে। নিজের ক্ষমতাটা কে কতদূর বাগিয়ে নেবেন তারই মহড়া। বঙ্গবন্ধু স্বদেশের মাটিতে আসতেই চামচাদের দিশেহারা অবস্থা। সারাদেশে হাহাকার। চাল নেই, ডাল নেই। লবণের দাম তুঙ্গে। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত অনাহুত পরিবেশে বঙ্গবন্ধু ভেঙ্গে পড়লেন না। বীরপুরুষের শৌর্যে দাঁড়িয়ে স্বাধীনদেশের কর্ণধারের মত বিশ্বের দরবারে সাহায্যের হাত পাতলেন। দেশ গঠনে, ভাঙ্গা দেশকে জোড়া দিতে বিশ্ববাসীর কাছে সহযোগিতা চাইলেন। সারা বিশ্ব

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগঠনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানী চামচাদের এবার পোয়াবারো। বিদেশী সাহায্যের যা আসে তাই চোর রাজনৈতিক টাউটরা লুটে খায়। তাই বড় দুঃখে প্রকাশ্যে জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন যে, 'মানুষ পায় নতুন দেশে সোনার খনি। আর আমি পেয়েছি সব চোরের খনি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য কম্বল আসল আট কোটি, কিন্তু আমার কম্বল খানা গেল কোথায়?' এতেই বোঝা যায় চামচাদের দ্বারা কেমন ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল মুজিব-প্রশাসন। চামচা রাজনৈতিকগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন না। কারণ অস্ত্রবাজ মুক্তিযোদ্ধারা না তাদের পথের কাঁটা ঘার মটকানি হয়ে দাঁড়ায়। হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্রসমেত আত্মসমর্পণের রাজনৈতিক চাপ আসে চারিদিক থেকে। বাংলাদেশের বড় বড় বাঘারা সব অস্ত্র জমা দিয়েছে। একমাত্র বাকি হেমায়েত ও তাঁর বাহিনী। সরকার নিয়োজিত জেলা প্রশাসক মারফত অস্ত্র জমা দেবার বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণ পত্র এসে পৌঁছে হেমায়েতের হাতে। এমনি একটা মাহেন্দ্রক্ষণের আহবানের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন হেমায়েত। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারলেন যে প্রকাশ্য স্বীকৃতির গৌরবে ধন্য হয়ে হেমায়েত অস্ত্র জমা দিতে চান। যথানিয়মে জেলা প্রশাসক মারফত হেমায়েত ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর হাতে আনুষ্ঠানিক অস্ত্র জমা দেবার কথা জানিয়ে দেন। এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এখনো বেশ কিছু পরিত্যক্ত অস্ত্র অবৈধভাবে পড়ে আছে। সে-সব অস্ত্র জমা করে ২২ জানুয়ারি ঢাকা যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তিনি ফরিদপুরের ডিসি মারফত। বঙ্গবন্ধুর হাতে অস্ত্র জমা দিয়ে হেমায়েত বাহিনী ধন্য হতে চায়। স্বেচ্ছা অস্ত্র জমার ব্যতিক্রম কিছু হলে মুক্তিযোদ্ধার হাতের অস্ত্র আবার গর্জে ওঠে অঘটন ঘটাতে পারে। ব্যতিক্রমের মুক্তি অস্ত্র কেড়ে নিতে চাইলে যে কোন অঘটনের মোকাবিলায় হেমায়েত-বাহিনী প্রস্তুত। জেলা প্রশাসক মারফত হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্র জমার আনুষ্ঠানিকতার বীর হৃদয় ঔদার্যের মহিমায় স্বাগত জানান শেখ মুজিব। এবার বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ হয় ঃ হেমায়েতকে বিরক্ত না করে যথাসময়ে ঢাকা আসতে দাও।

ঢাকা যাত্রায় হেমায়েত বাহিনীর এবার রাজসিক প্রস্তুতি। মুক্তি হাতে ধরা পড়া পাক দালালদের জেলখানায় নিরাপদে হস্তান্তর করেন বাহিনী প্রধান। দিকবিদিকে কড়াকড়ি চাপের মাধ্যমে পরিত্যক্ত অস্ত্র ক্লোজ করা হয়। ছড়ানো ছিটানো মুক্তিদের ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর হাতে অস্ত্র সমর্পণের আনুষ্ঠানিকতার জন্য একত্র করা হয়। মুক্তিবাহিনীর অপ্রয়োজনীয় সম্পদ মুক্তিদের মাঝে বিতরণ করে শেষ করে ইতোমধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। দু'হাজার ফৌজের ঢাকা যাবার প্রস্তুতি সম্পন্ন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, ইতোমধ্যে অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছাড়পত্র নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে গেছেন, যার কারণে দুর্ভাগ্যক্রমে দু'হাজারের কোটাও পুরা হলো না। শেষ প্রস্তুতিতে এক হাজার ছ'শত মুক্তিফৌজের তালিকা প্রস্তুত করা হলো। প্রত্যেক যোদ্ধার হাতে একটি করে চিনা রাইফেল। কোন গুলি ইস্যু হবে না সাধারণ যোদ্ধার জন্য। শুধু বাহিনী প্রধানকে রক্ষার গার্ড*ও অতিরিক্ত অস্ত্র-গোলাবারুদ রক্ষার প্লাটুনটির অস্ত্রে-

অস্ত্রে অ্যামুনিশন থাকবে। বাহিনী প্রধানের নির্দেশের ইশারায় সবাই কাজ করে। সশস্ত্র গার্ড প্লাটুনও তাঁরই ইঙ্গিতে কাজ করবে।

ঢাকায় যাবার ব্যবস্থাপনায় ৬টি লঞ্চ থাকবে। তিনটি লঞ্চ ছাড়বে মাদারিপুর এবং তিনটি কোটালিপাড়া থেকে। প্রত্যেকের পোশাকের মধ্যে থাকবে পরণে কালো হাফ প্যান্ট ও গায়ে সাবুজ হাফ সার্ট। মুক্তি ফান্ডে যে নগদ টাকা ছিল তা দিয়ে এ-সব ড্রেস ও যাতায়াত ভাড়ার ব্যয় মিটানো হয়। বাইশে জানুয়ারি কোটালিপাড়ার যোদ্ধাবাহী লঞ্চ বরিশাল আসে। বরিশালের মুক্তিযোদ্ধা ও জেলা প্রশাসন বরিশাল পুলিশ মাঠে হেমায়েত বাহিনীর বিজয়ী বীর যোদ্ধাদের জন্য এক 'গণ সংবর্ধনা'র আয়োজন করে তেইশে জানুয়ারি সকাল দশটায়। ভোরের নাস্তার আপ্যায়নের পর বেলা দু'টায় সবার দুপুরের খাবার এখানেই পরিবেশিত হয়। মাদারিপুরের মুক্তিযোদ্ধার লঞ্চ যাত্রা করে তেইশ জানুয়ারি বিকাল চারটায়। চব্বিশে জানুয়ারি ৬ টি লঞ্চের একত্র মিলন হয় বরিশাল লঞ্চ ঘাটে। সকাল সাতটায় মুক্তি লঞ্চ বাহিনীর যাত্রা ঢাকার সদর ঘাট লঞ্চ টার্মিনালের উদ্দেশ্যে। সব কিছুই নিখুঁত সেনা-নৈপুণ্যে সম্পন্ন কর হয়। ইউনিফর্মের সশস্ত্র যোদ্ধাদের দেখে ঢাকার সদরঘাট লঞ্চ-টার্মিনালে লঞ্চ না থামানোর জন্য সিগন্যাল আসে ইনডিয়ান আর্মির পক্ষ থেকে। গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর ও বরিশালের হেমায়েত বাহিনীর কমান্ডরগণ ইনডিয়ান আর্মি কমান্ডারদের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। বাহিনী প্রধানের কথাবার্তা তখনো অস্পষ্ট। কারণ তাঁর গুলিবিদ্ধ মুখের অবস্থার চিত্র তখন বড়ই দুঃখজনক ও কাহিল হালতের। ইন্ডিয়ানরা যোদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে দেখতে চাইলেন।

বঙ্গবন্ধুর কাছে ঢাকা সদরঘাটে তাঁর গোপালগঞ্জের মুক্তির অনাদর সংবাদ পৌঁছে যায়। গোপালগঞ্জ ধন্য তাঁর জন্মস্থানের গর্বিত সন্তান হেমায়েত বাহিনীকে বীরের মর্যাদায় ঢাকার রাজপথে পায়দল মার্চ পাস্টে জয়বাংলা ধ্বনির আনন্দ উল্লাসে বিচরণের অনুমতি দেন বঙ্গবন্ধু। কোটালিপাড়ার ঢাকাস্থ প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট কাজি হারুনার রশিদ-এর এক দৈত্যকায় বডিগার্ড হাজির হন হেমায়েত-এর হেফাজত কার্যক্রমের তদারকিতে। উচ্চতায় তিনি সাড়ে সাত ফুট, ওজনে সাড়ে তিন মন। চিকনাইওয়ালা এমন পুরুষ জীবনে অনেকে দেখেন নি। আল্লাহর কুদরতের এমন সৃষ্টির পরিচয় করিয়ে দেন হেমায়েতকে। বেজায় খুশিতে হেমায়েত অ্যামুনিশন-শূন্য মেশিন গান চাপিয়ে দেন তাঁর কাঁধে। ইন্ডিয়ান আর্মি এমন বিরাট বপুর মুক্তিয়াল কুদরতকে ভুল করে 'হেমায়েত' আন্দাজে জড়িয়ে ধরে আধো বোলের বাংলায় বলেন: 'ধন্য হেমায়েত ভাই, আপনার মত বীরের বাহিনীকে সগৌরবের মার্চে এগিয়ে যাবার পারমিশন দিয়েছেন আপনাদের গ্রেট লিডার।' হায় স্বাধীন বাংলার রাজধানীতে নামতে হয় বিদেশী আর্মির অনুমোদনে। সেদিনের নবাবপুর রোডে কদাচিত গাড়ির বহর চলত। তাই রাস্তার দুপাশে দুলাইনে মুক্তিদের মার্চপাস্টে শিহরণ দৃশ্য। ষোলশ ইউনিফরম পরা মুক্তির কাঁধে রাইফেল, জিপের সামনের সীটে বসা নরকংকালের চেহারায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ খিটখিটে মেজাজের হেমায়েত। তাঁর পরনে কালো রঙের ফুল

প্যান্ট আর গায়ে হাফ হাওয়াই সার্ট। খোলা জিপের ওপর দাঁড়ানো এক প্লাটুনের ক'জন ঝানু দেহরক্ষী সৈনিক। ড্রাইভারের সামনের বাম্পারে মেশিনগান কাঁধে বাহারি দরশনের কুদরত। হেমায়েত-এর মনের আপসোস, এমন বডির ফিগারের মত হলে মানাতো ভাল! রাস্তার দুপাশের মানুষ যত ফুলের সব ছিটিয়ে দিচ্ছেন কুদরতের গায়ে। যুদ্ধ না করে জয়বাংলার লোকে ভ্রমে ফুলের উপহারে ধন্য কুদরত। ধীর গতিতে এগুচ্ছে গাড়ি। শ্রান্ত-ক্লান্ত মুক্তিফৌজ সব প্রতিকূলতার মাঝেও জোর কদম এগিয়ে চলছে মহান নেতার কাছে আত্মসমর্পণের ঐকান্তিক বাসনায়। পিছনের প্রতিনিধিরাও হেঁটে আসছেন সদল বলে। হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্র সমপর্ণের মূল মঞ্চ ধানমন্ডি কলাবাগান মাঠে, যা পরবর্তী আবাহনী খেলার মাঠ।

বেলা এগারোটা নাগাদ হেমায়েত বাহিনী বিজয় মঞ্চে এসে পৌঁছোয়। তিন লাইনের শৃংখলায় হেমায়েত বাহিনী দণ্ডায়মান। ফরিদপুরের সাব-সেক্টর কমান্ডার নূর মোহাম্মদ বাবুল ও হেমায়েত উদ্দিন পাশাপাশি দাঁড়ানো। বাবুলের চেহারা কংকালের হলেও হেমায়েতের চেয়ে ভাল। যুদ্ধ ক্লান্ত প্রতিটি মুক্তির চেহারার প্রতিচ্ছবি তাঁদের অবয়বে। নিশ্চুপ স্থির এটেনশন পজিশনে মূর্তির মত স্থানু দাঁড়ানো পুরামুক্তি কমান্ড। হেমায়েত ভাঙ্গা চোয়ালের ব্যঘ্র কণ্ঠে কমান্ড দিতেছেন। এটেনশন, স্টেন্ড এট ইজ---। পরবর্তী গার্ড অব অনারের আনুষ্ঠানিকতায় তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন। অন্যান্য গাড়িতে রাখা অস্ত্র গোলাবারুদ, অন্যান্য মালামালের সবই বঙ্গবন্ধু পদতলে সমর্পিত হয়। বঙ্গবন্ধু নিজেও ইন্ডিয়ান আর্মি মার্কা ভুল করলেন হেমায়েতকে চিনতে। কুদরতকে হেমায়েত বুঝে ধন্য করেন। জনপ্রতিনিধিরা আসল হেমায়েতকে বঙ্গবন্ধুর সামনে হাজির করলে তাঁর আক্কেল গুড়ুম! হেমায়েতকে দেখে তিনি হতবাক হন। মহান নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। হেমায়েতের মুখের ক্ষতের পুঁজ ও রক্ত লাগে তাঁর কাপড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি প্রতিনিধিদের দেয়া তাঁর গলার সকল ফুলের মালা খুলে নিজ হাতে হেমায়েতের গলায় পরিয়ে দেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. আহম্মেদ আলির হাওলা করেন হেমায়েতকে সুচিকিৎসার জন্য। ৮নং নিউ কেবিনে ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে হেমায়েত ভর্তি হন।

গোপালগঞ্জ, কোটালিপাড়াসহ অন্যান্য এলাকার হোমেয়েত বাহিনীর মুক্তি প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আন্তরিকভাবে কথা বলেন। তাঁদের থাকার স্থান হয় নিউমার্কেট সংলগ্ন ঢাকা কলেজ ও টিচার্চ ট্রেনিং কলেজ মাঠে। বিজয় উৎসবে ঢাকার রাস্তায় নাচবে হেমায়েত বাহিনী বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ঢাকার প্রতিটি রাস্তায় তালে তালে বিজয় নৃত্যে তারা নাচবে, গাইবে প্রশিক্ষণের তালে কাঁপাবেদশদিক। অস্ত্র সমর্পণ পরবর্তী ষোলটি দিনই এই রাজকীয় হেমায়েত বাহিনী ঢাকার রাস্তা প্রকম্পিত করে রাখে তাদের বিজয় শৌর্যের তূর্যনাদে। এবার ধীরলয়ে তারা ঘরমুখো। হেমায়েত বাহিনীর বিজয় শৌর্যের তূর্য নিনাদ সাংবাদিক কলামিস্ট নির্মল সেনের নির্ভেজাল বলিষ্ঠ কলমে ফুটে ওঠে ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭২ সাল থেকে। পরবর্তী বেশ কিছু দিন পত্র পত্রিকার বড় বড় হেড লাইনে হেমায়েত বাহিনীর বিজয় গাথা নিয়ে অমর অধ্যায় রচনা

করেন নির্মল সেন। বড় হৃদয়গ্রাহী হেডিংয়ে হেমায়েত অধ্যায় প্রকাশ পায়, "বঙ্গবন্ধুর মালা-হেমায়েতের গলা"। হেমায়েত প্রভাবিত গোপালগঞ্জ-ফরিদপুর অঞ্চলে, "মুক্তি বাহিনী মানে হেমায়েত বাহিনী।" এমনি নির্মল আনন্দের নির্মল সেনের প্রচার কলামে বিশ্বব্যাপী সাড়া যোগান যুদ্ধ বার্তায় হেমায়েত বাহিনী। পাকিস্তানি আর্মি ত্রাস হেমায়েত বাহিনী, স্বঘোষিত মেজর ইস্ট পাকিস্তান রেবেল (বিদ্রোহী) হেমায়েত"- হেমায়েত বাহিনীর কর্ণধার হেমায়েত" এমনি ধরনের চমকপ্রদ আকর্ষণে পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। হেমায়েত বাহিনীর আনন্দবেদনার সে এক কালজয়ী বিরল অধ্যায়। ঢাকায় তাঁরা রাজকীয় অতিথি। পুরা ঢাকা তাদের পদভারে প্রকম্পিত। স্বদেশ ও বিদেশের প্রচার ও গণমাধ্যমের তাঁরা শীর্ষ কলামে। মানুষ সম্ভ্রমে সালাম ঠুকে হেমায়েত বাহিনীকে। তাঁর ছেলেগুলি যেন "চির উন্নত শিরে'র মত গর্বভরে চলেন। স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা যোদ্ধার স্বীকৃতি সকল পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে অপার আনন্দ।

আপন জন্মভূমিতে বিজয়ী বীর সংবর্ধনা

গোপালাগঞ্জের কোটালিপাড়ার ছেলে হেমায়েত। আপন জন্মস্থান কান্দি ইউনিয়নের টুপরিয়া গ্রাম। আবাল্যের স্মৃতি বিজড়িত মানুষের মাঝে বিজয়ী বীরের সংবর্ধনার বড় কোমল স্পর্শকাতর আবেগ ছিল হেমায়েত-এর মনে। সে সাধ পূর্ণ হতে যাচ্ছে।

দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু প্রথমবারের মত গোপালগঞ্জের মাটিতে এলেন। রাজনীতিক নেতারা আপন জন্মভূমিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে যথোচিত ঐতিহাসিক সংবর্ধনার তোড়জোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন নানাভাবে। বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে মাটির সন্তানদের আদরে সম্মান দেয়া যায় তার চিন্তায় সবাই তৎপর। এমনি মহৎ কাজের অন্তরালে রাজনীতির চামচাদের লোক দেখানো তৎপরতার অন্তর্নিহিত রহস্য ভিন্ন। বঙ্গবন্ধুকে ঠেলিয়ে কে কতটা নৈকট্যে যাবেন, আখের গুছানো ও সুবিধা অর্জনের ছোঁয়াটা পাবেন ? বঙ্গবন্ধু কলেজ মাঠে তাঁর জন্য বাহারের মঞ্চ সাজান রাজনৈতিক নেতারা। হেমায়েত খবর পেয়ে হাসপাতালের কেবিনে তালা মেরে তিন দিনের ছুটিতে গোপালগঞ্জ যান। হেমায়েত সেনাদের বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য ধন্যে গোপালগঞ্জ যাত্রার নির্দেশ দেন। হেমায়েত বাহিনী নিজস্ব ব্যানারে সেনা শৃংখলায় আট মাইল পথ পদ যাত্রায় পৌঁছেন সভাস্থল। জনসভার পূর্বপার্শ্বে মাটির ঘাসে তিন লাইনে সুশংখল সারিতে যোদ্ধারা আসন নেন। সভা শুরু হয়। প্রটৌকলের অভাব নেই। বীর্যবান সূর্যসদৃশ রাজনৈতিক নেতারা বঙ্গবন্ধুর চার পাশ আলো করে আছেন। সভামঞ্চে উঠেই সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করেন "হেমায়েত কোথায় ?" রাজনৈতিক নেতা ও প্রটৌকল প্রধানদের পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ির ব্যস্ততা শুরু হয়। আগে ভাগে দৌড় দেয় এসপি-ডিসি। মুক্তিবাহিনীর পিছন দাঁড়িয়ে হেমায়েত রাজনৈতিক চামচাদের প্রতিহিংসার তামাশা দেখছিলেন। ব্যস্ত সমস্ত এসপি-ডিসি হেমায়েতকে এক রকম কোলে তোলার মত করে নিয়ে সভামঞ্চে হাজির করেন। তাঁকে বঙ্গবন্ধুর কাছে দাঁড় করিয়ে যেন তাঁদের খোস্তাখি মাফের জন্য

কাঁচুমাচু করেন। বঙ্গবন্ধু বিরাট জনসভায় হেমায়েতকে দুপাশ থেকে জড়িয়ে ধরেন। নিজের সামনে তাঁকে বীর বন্দনার বজ্রকণ্ঠে বলেন, "হেমায়েত আমার গৌরব। হেমায়েত বাহিনী জাতির গৌরব। হেমায়েত বাহিনী গোপালগঞ্জে গঠন না হলে আমি বাংলাদেশে মুখ দেখাতে পারতাম না।" হাজার বছরের বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কালজয়ী যুদ্ধের বঙ্গ শার্দুলকে রাষ্ট্রনায়কোচিত সংবর্ধনার অভিনন্দনে অভিনন্দিত করলেন। গেরিলাযুদ্ধের বীর নায়ককে স্বীকৃতি দিলেন। বস্তুত, এখান থেকেই চামচাদের শুরু হলো হেমায়েত-বিদ্বেষ এবং হেমায়েতের পতন আসমান থেকে মাটিতে। কোথাকার নাম না জানা হাবিলদার পায় এমন সম্মান। আমরা এতদিনের আওয়ামী লীগার, শেখের কত কাছের মানুষ আমরা, যুদ্ধ করলাম, দেশ ছাড়লাম, স্বাধীন দেশের আমরাই তো হবার কথা সর্বেসর্বা। আমাদের সম্মানের ইজ্জতই হবে সবার আগে। আশা করলাম কি আর হচ্ছেটা কি ? আচ্ছা দেখেংগে। নির্বোধ ননপলিটিক্যাল হেমায়েত কিছুই বুঝতে পারলো না। এই তো হেমায়েতের ধ্বংসের যাত্রা শুরু। তিন দিনের ছুটি শেষে আবার হেমায়েত স্থান হয় তাঁর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পূর্বোক্ত সিটে।

হেমায়েতের ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগানোয় শেখ পরম ঔদার্য দেখান। বঙ্গবন্ধুর পিএস অলিউর রহমান হাসপাতাল বেডে হেমায়েতকে দেন বিশ হাজার টাকা। হেমায়েত চিকিৎসা ও ঘরবাড়ি মেরামতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আসে এই আর্থিক অনুদান। দীর্ঘ এগার মাসের বাংলাদেশের ডাক্তারের চিকিৎসায় হেমায়েত রোগমুক্ত হতে পারলেন না। উন্নততর চিকিৎসার জন্য তাঁর স্থানান্তর হয় ফ্রান্সের প্যারিশ নগরের সেল প্যাথেরিয়া হাসপাতালে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাঁর বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ হয়। মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতের চিকিৎসা, সুরক্ষা, সম্মানের বৃদ্ধিতে বঙ্গবন্ধুর বিরাট হৃদয় ঔদার্যের এ সামান্য নমুনা মাত্র। হায় .... বঙ্গবন্ধু তোমারি তুলনা তুমি, বাংলা ও বিশ্বের কোথাও এ তুলনা আর মিলে না। তোমারি সাড়াতে জাগে বাঙালি সন্তান। বাঙালি জাতীয়তাবাদের তুমি মূর্ত প্রতীক। স্বাধীনতার তুমি তূর্য বাদক, অমর সন্তান। তোমারি আদর্শের জয় হোক।

শেখ মুজিব মাঝে-মধ্যে 'পরশ্রীকতারতা' বসে বাংলা ভাষার একটি শব্দের ওপর বিশেষ জোর দিতেন। যে শব্দের পরিপূরক কিছু পৃথিবীর অন্য ভাষায় নেই। পরের শ্রী-সৌন্দর্য-ভাল দেখলে অন্যের খারাপ লাগা। যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। বাঙালি বৈশিষ্ট্যের এই দুরপনেয় দিকে তিনি স্পর্শকাতর ছিলেন। হেমায়েত অনেকের পরশ্রীকাতরতার শিকার হয়েছেন।

ঢাকায় শেখের হাতে আনুষ্ঠানিক অস্ত্র জমা দিয়ে হেমায়েতের পোয়াবারো। এবার গোপালগঞ্জে শেখ যেন হেমায়েত ছাড়া কাউকে চেনেনই-না। গোপালগঞ্জের কিছু আওয়ামী লীগ নেতাদের যেন গাত্রদাহ হয়। তারা অন্তরের চাপা জ্বালায় জ্বলে পুড়ে টং। হেমায়েত প্রতিপত্তি লয় বা ক্ষয় না হলে তাঁদের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে না। কারণ তাঁরা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মিত্র, অতি কাছের সুজন। এতদিনের পরীক্ষিত মিত্ররা থাকতে

সামান্য হেমায়েতকে নিয়ে শেখের এত বাড়াবাড়ি কেন। অরাজনৈতিক মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শেখের অতি পেয়ার উঠতি রাজনৈতিক ক্ষমতালোভীদের অসহ্য। স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিক্ষুব্ধ। শেখের স্পর্শধন্য হেমায়েত-কণ্ঠ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চকিত। কম্বল চোর ও রিলিফ সামগ্রী হাতানোদের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষিপ্ত। আসন্ন নির্বাচনে কোথায় শেখ দলীয় প্রার্থীর কাউকে বুকে জড়িয়ে জনসভায় কীর্তন গাইবেন তা না করে এক যুদ্ধাহত পঙ্গু হাবিলদারকে নিয়ে তাঁর বাড়াবাড়ি। সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ পরবর্তী টাকশাল হাতানো বাকশাল সেক্রেটারি ও তাঁর স্থানীয় সাঙ্গপাঙ্গরা। মুজিবকে বাদ দিয়েই তাঁদের মুজিববাদ। নানা তন্ত্রমন্ত্রে প্রভাবিত করে তাঁকে নির্জীব করতে চাইলেন। আর্মি ও এক্স-আর্মিরা রাজনীতির কি বুঝে? তারা বেতন ভুক সৈনিক মাত্র। আমরা আওয়ামী রাজনীতিকরা দেশ চালাবো। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কম্বল বিতরণ জাতীয় রিলিফের কাজে আমরা যা করি তাই আইন। অন্যে তাতে মাথা গলাবে কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলার কি আছে? আজন্ম প্রতিবাদী কণ্ঠ হেমায়েতের বিপর্যয় এখানেই।

নমিনেশনের ঝামেলায় শেখ ঃ জাতীয় নির্বাচনে দলীয় নমিনেশন দিতে বাংলার সোঁদামাটির গন্ধে বেড়ে উঠা আজন্মের ঝানু রাজনীতিক শেখ মুজিব বিপাকে পড়েন। সবাই তাঁর আপন। সবাই তাঁর আশৈশবের দলীয় কর্মী। সবাই নিবেদিত প্রাণ আওয়ামী লীগার। ছাত্র জীবনে তাঁরা ছাত্রলীগ কর্মী। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেকেরই কালজয়ী ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। স্বাধীনতার যজ্ঞে হারিয়ে গেছে অনেকের প্রিয়জন। জ্বালাও-পোড়াও; লুটে সহায় সম্পদ যে কে কত হারিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কাকে রেখে তিনি কাকে নমিনেশন দেন? তাও আবার সংখ্যা লঘু অধ্যুষিত হিন্দু এলাকা। কোটালিপাড়ার নমিনেশনে তিনি তাঁর একান্ত বিশ্বাস ও আস্থাভাজন অরাজনৈতিক নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতকে ডাকেন ঢাকায়। একান্ত আলাপে শেখ মুজিব জানতে চান হেমায়েতের মতামত। তাঁর প্রশ্ন, "কাকে নমিনেশন দেয়া যায়?" হেমায়েত কথা, "এসব বুঝি না।" শেখ মুজিবের সুস্পষ্ট কথা, "তোর মতে নমিনেশন প্রার্থীদের মধ্যে কে ভাল।" হেমায়েত রক্ষা পান "সন্তোষ বিশ্বাসের" নাম প্রস্তাব করে। সন্তোষ বিশ্বাস তো নমিনেশন পেলেন কিন্তু অপর তেরজন প্রার্থী রেগে আগুন।

শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞের ভোট যুদ্ধ ঃ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান শিক্ষক শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ ১৯৭১ সালে হেমায়েত বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কমলেশের সাহস ও দক্ষতার জন্য হেমায়েত তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা জল্লাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কারণ তাঁকে দিয়ে বিচারে চরম শাস্তি প্রাপ্ত বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর সৈন্যদের ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। হিন্দুর হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলমানের মরণ! হোকনা পশ্চিমা নরপিচাশ সৈনিক!! তারা মুসলমান তো!!! হিন্দু ব্রাহ্মণের গুলিতে মুসলমানের মরণে দারুণ ক্ষেপা এলাকার মুসলমান। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে ক্ষেপামির তপ্ত

কটাহে ঘৃতাহুতি আওয়ামী লীগ সেনাদের। নির্বাচনী দ্বন্দ্বের প্রচারণার লড়াইর মহার্ঘ দাওয়াই।

রামশীলের যুদ্ধে আহত হেমায়েত চিকিৎসায় লাগে চৌদ্দ দিন। তাঁর চিকিৎসা চলে ভ্রাম্যমাণ মুক্তি হাসপাতালে। আহত ও বেহুঁশ বাহিনী প্রধানের অনুপস্থিতিতে কমলেশ অঘটন ঘটান। তাঁর পাশের গ্রামের এক্কু নামের এক ধনী তেজস্বী মুসলমানকে তাঁর দুই ছেলে সহ কাঁচি দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। বাহিনী প্রধানের অসুস্থতার সুযোগে এমনি আরো দু চারজন মুসলমান হত্যায় হাত কলংকিত করেন কমলেশ। বাহিনী প্রধান সুস্থ হলে অনেক মুসলমান বিচার প্রার্থনা করেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে সে বিচারে শৈথিল্য প্রদর্শন কেউ সুনজরে দেখে নেই। আজো হেমায়েতকে তার জন্য সবাই দোষারোপ করেন। হেমায়েত নিজেও সে অপরাধ স্বীকার করে নেন।

ব্যাপারটি হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। মুসলমান মুক্তিযোদ্ধারা কমলেশকে পিছন থেকে গুলি করে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। ব্যাপার আঁচ করে বাহিনী প্রধান সতর্কতা অবলম্বন করেন। ১৯৭১-এর নভেম্বরে কমলেশকে স্থানান্তরে বাহিনীর বাইরে পাঠিয়ে রক্ষা পান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৪ নম্বর আসামি কর্পোরাল নূর মোহাম্মদ বাবুলের দলে ফরিদপুরে কমলেশকে পাচার করে বাঁচেন হেমায়েত। কারণ ফরিদপুর এলাকায় কমলেশ বেদজ্ঞের জীবনে দক্ষযজ্ঞ লাগবেই। কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। যুদ্ধের ডামাডোলে ব্যাপার চাপা পড়লো। মুসলমানের মনের ধূমায়িত ক্ষোভ ছাই চাপা আগুনের মত বাড়তে থাকে। স্বাধীন দেশে কমলেশ বেদজ্ঞের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। প্রাণে বাঁচতে তাঁর কোটালিপাড়া ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় গোপালগঞ্জ মহকুমা সদরে।

১৯৭৩-এর জাতীয় নির্বাচন ঃ ১৯৭৩-এর জাতীয় নির্বাচনে কমলেশ বাবু মুজাফফর ন্যাপের প্রার্থী হিসাবে নমিনেশন প্রাপ্ত হন। বামপন্থী সকল দল সম্মিলিতভাবে কমলেশকে সমর্থন করেন। তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় গোটা গোপালগঞ্জের বামফ্রন্টের আগমন ঘটে কোটালিপাড়ায়। চিকিৎসার প্রয়োজন সেরে হেমায়েত ফ্রান্স থেকে সবে মাত্র দেশে ফিরছেন। তখনো সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেননি। নিজকে সেনা সদস্যরূপে ভাবেন নির্দলীয়। প্রকাশ্যে কোন দল বা ব্যক্তির সমর্থনে যান না তিনি। নির্বাচনী প্রচারণা, জনসভা উপভোগ ইত্যাদিতেই সময় কাটে তাঁর। বামপন্থী কমলেশ ও ডানপন্থী সন্তোষ বিশ্বাসের মধ্যে বিস্তর বাক যুদ্ধ হয়। বাহ্যত দুজনই ক্ষমতাসীন দলের লোক। দু'জনই সংখ্যা লঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের। নির্বাচনে মনি সিং কমিউনিস্ট গ্রুপের কমরেড অলিউর রহমান ওরফে লেবু কমলেশ বাবুর গার্জিয়ানের ভূমিকায় নির্বাচনী মঞ্চে ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের দু'দলই ব্যাপারটাকে ইজ্জতের লড়াইর মত নির্বাচন যুদ্ধে নামেন। শেখ মুজিবের এলাকায় তাঁর প্রার্থীর পরাজয় আওয়ামী লীগের মান-ইজ্জতের প্রশ্ন। অপর পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক ও যুদ্ধ ফ্রন্টে বাংলাদেশকে সমর্থন করে, রাশিয়ার সমর্থন আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে কমিউনিস্টরা ক্ষমতার মসনদের ন্যায্য দাবিদার ভাবেন। স্বাধীনতার জন্য এত করে তারা প্রশাসনে স্থান পাবেন না, নির্বাচনে জিতবেন

না ভাবাই যায় না। সংখ্যাধিক্যের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার হিন্দু মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী দাঁড় করিয়ে এটাকে তাদের মরণ পণ নির্বাচন যুদ্ধ মনে করছেন।

আওয়ামী লীগ সমর্থকগণ নির্বাচনে প্রচারণার জন সমাগমের আড়ালে কমলেশ বেদজ্ঞকে হত্যার প্রচেষ্টা চালান। সারাদেশ জুড়ে এমন কাণ্ড বহুতর ঘটেছে। দুচার ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়ও হয়েছে। চার ছাত্র নেতারূপী চার খলিফার অন্যতম নূরে আলম সিদ্দিকীর বাড়ি ঝিনেদা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ে ভবিষ্যতের বঙ্গ কর্ণধার হবার স্বপ্নে বিভোর থাকলেও তাঁর বিপক্ষ দল জাসদের সর্ব প্রযত্নে নির্বাচনে নিবৃত্ত করাতে ব্যর্থ হন। জাসদ-এর কথা, নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও আমরা লড়ব। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের পরদিন ঝিনেদা থানার কয়েকশ গজের ব্যবধানে প্রকাশ্য দিবালোকে নিহত হলেন তিনজন মুক্তিযোদ্ধা জাসদ কর্মী। তাঁদের হত্যা করেন নূরে আলম সিদ্দিকীর দক্ষিণ হাত দীন নাথ মজুমদার। বঙ্গবন্ধুর অতি আদরের নূরে আলম সিদ্দিকী পুলিশ প্রশাসনকে বলেন, "কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল বুঝলাম না।" স্বাধীন দেশের প্রশাসন প্রকাশ্য দিবালোকে প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনে খুনের ব্যাপারে নীরব। ঘটনাস্থলের দেড় মাইলের মধ্যে নির্বাচনের সাহায্যে আসা একটি আর্মির কোম্পানি। পুলিশ-আর্মির সবাই চুপ। শেখ পেয়ারের সাত খুন মাপ। ১৯৫৪ সালে পল্টনে গেছি আওয়ামী লীগ জনসভায়। কজন আওয়ামী লীগ কর্মীর সাথে আলাপ। যুক্তিতে হেরে তাদের কথা, এ ময়দান আওয়ামী লীগের। এ-দেশের লোক আওয়ামী লীগের কথায় উঠবে বসবে। ও বাচ্চা পোলা ছাত্র বেশি কথা কস তো ময়দানের পিলারের সাথে বাইন্দা বাটনা বাটা পাটায় ডোরে খাটা বানামু। ১৯৬২-৬৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ লগ্নে শিক্ষা সফরে সদলে বাংলা ভ্রমণে। বরিশলের ছাত্রনেতা সগিরের সাথে খুলনা সুন্দরবন ভ্রমণে ইস্টিমারে দেখা। তর্কে হেরে গায়ে হাত তোলা মারামারি। স্বাধীন দেশে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য প্রাণ হারান। হাওয়া দেখে মিছে গান গাওয়া। যতই গণতন্ত্রের বুলি আওয়ামী লীগ মুখে আওড়াক, বাস্তবে তারা চরম স্বৈরতন্ত্রী। স্বাধীন দেশটাকে একদলীয় শাসনের নিগড়ে বাঁধার নামে লুটপাট তন্ত্রের নেশায় তাদের পেয়ে বসে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত স্বাধীনতা যুদ্ধ বিজয়ী রাজনৈতিক দল এত স্বল্প সময়ে জনপ্রিয়তার রসাতলে যেতে কেউ দেখেনি।

নির্বাচনী প্রতিশোধ : ৭ই মার্চ, ১৯৭৩-এর নির্বাচনে ন্যাপ+কমিউনিস্ট প্রার্থী হেমায়েত বাহিনীর রণক্লান্ত প্রাক্তন জল্লাদ শ্রীযুক্ত কমলেশ বেদজ্ঞ বাবু বিপুল ভোটে পরাজিত হন। আওয়ামী লীগের সন্তোষ বিশ্বাসের বিপুল ভোটের বিজয়ে থ মেরে যান কমলেশ। প্রাক্তন বাহিনী প্রধান হেমায়েত-এর সান্নিধ্যে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। তাঁর বোধোদয় হয়, "দাদা এখন আর বাঁচার উপায় নেই। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।" রাজনৈতিক সহনশীলতার অভাব ও প্রতিহিংসার অনলে পড়েন পাঁচজন। চারজন নিহত অকুস্থলে, পঞ্চম জনের মৃত্যু একদিন পর : ক। অলিউর রহমান সেন্টু মিয়া-(গ্রাম-আড়পাড়া, জিলা-গোপালগঞ্জ); খ। শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ; গ। বিষ্ণুপদ; ঘ। মানিক চক্রবর্তী এবং ঙ। শেখ লুৎফর রহমান (পিতা-শেখ জহুরুল হক, গ্রাম-দুর্গাপুর, থানা-গোপালগঞ্জ)।

নিহতদের সঙ্গে হেমায়েতের সম্পর্ক ঃ অলিউর রহমান লেবু মিয়ার বাড়ি হেমায়েত-এর বাড়ি থেকে প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে। শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞের বাড়ি হেমায়েত বাড়ির আট মাইল দূরত্বে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের পরিচয়। অন্যান্যরাও তাঁর স্থানীয় এলাকার লোক। কিন্তু কারও সঙ্গেই পরিচয় নেই।

গণপিটুনিতে নিহত সন্ত্রাসী ঃ ৭ই মার্চ নির্বাচনী পরাজয় মেনে ১০ই মার্চ সঙ্গী লোকজনসহ কমলেশ যাচ্ছেন কোটালিপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ। গোপালগঞ্জ থানার কাজুলিয়া বাজারের কাছাকাছি নির্বাচনে বিজয়ী বিজিত দল মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। মুজিববাদী ও কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে তখন চরম বাক-বিতণ্ডা। তর্কাতর্কির বহাসে জনতা পান প্রচুর মজা। বিজয়ী আওয়ামী লীগ কর্মীরা পরাজিত কমিউনিস্টদের বিপুল সংখ্যায় ঘিরে ফেলেন। তর্কের চরম পর্যায়ে বেদজ্ঞ বুঝলেন আইনের প্যাঁচ বৃথা। প্রাণ সংশয় আসন্ন। রগ চটা মুক্তি জল্লাদ কমলেশের সাথে তাঁর রাজনৈতিক সচিব গোপালগঞ্জের কৃতী সন্তান অলিউর রহমান লেবু মিয়াও একই ভুল করলেন। প্রাক্তন মুক্তি কোম্পানি কমান্ডার কমলেশ বেদজ্ঞের দেখাদেখি তিনিও প্রতিপক্ষ আওয়ামী জনতাকে ভয় দেখাতে একই অজ্ঞতায় আশ্রয় নিলেন। সংগোপন রক্ষিত পিস্তল বের করতেই জনতার ঘেরে তাঁরা বন্দি হন। তাঁদের কৌশলে কেটে পড়ার সকল পথ আগলে ধরে জনতা। চতুর্দিকে শোরগোলের ধরপাকড়ের আওয়াজ। সশস্ত্র নকশাল ডাকাত ধরা পড়েছে। হাটুরে মাইরে মজা দেখতে হাত সুখ করতে সশস্ত্র নিরস্ত্র জনতা চতুর্দিক থেকে দৌড়ে আসছে। ঘটনাস্থল থেকে হেমায়েত-এর বাড়ি মাইল দেড় দূরে। হেমায়েত উদ্দিনও জনতার অনুসরণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। নিজের প্রভাব খাটিয়ে তিনি জনতার ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢোকেন। তখন নির্বাচনে পরাজিত কমলেশসহ পাঁচজনই আহত। "আমি অন্যদের কাউকে চিনি না। কিন্তু আমার মুক্তিযোদ্ধা কমলেশকে দেখেই আমি চিল্লাইয়া উঠি। যারা অপজিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদেরকে বাঁধ ছেড়ে দিতে বলি।" জনতার মধ্যে থেকে ফারুক নামের এক ছেলে দুটি পিস্তল হেমায়েত হাতে দিয়ে বলেঃ "শালারা ডাকাত, নকশাল। এদের কাছ অবৈধ অস্ত্র পাওয়া গেছে।" ঝানু যোদ্ধা বিক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভের ব্যাপার বুঝলেন। জনতাকে সাবাসের সান্ত্বনায় আশ্বাস দিয়ে বললেনঃ "যা হবার হয়েছে। এখন আর কেউ আইন হাতে তুলে নিবেন না। অবৈধ অস্ত্রধারীদের বিচারের জন্য থানায় সোপর্দ করা হবে।" জনতা হেমায়েত প্রস্তাবে আশ্বস্ত হয়। কমলেশও নিজের ভুল বুঝে কাবু বনে যান।

দুই মাঝির এক খোলা নৌকায় আহত পাঁচজনের সাথে হেমায়েত যাত্রা করেন থানার দিকে। ঘটনাস্থলে থেকে থানার দূরত্ব মাইল চারেক। নৌকা যতই এগোয় নদী সদৃশ খালের দু'তীরে জনতার ভিড় বাড়ছে তো বাড়ছেই। মুক্তি তেঁদররা না আবার '৭১-এর স্টাইলে হাতেনাতে ধরা সশস্ত্র ডাকাত ছিনিয়ে কেটে পড়ে। মাইলখানেক এগুতেই সামনের বাঁকে নৌকা থামাতে জনতা বাধা দেয়। শ্লোগানে মুখর জনতা তেড়ে আসে। তারা বলে, "হেমায়েত ভাই কমলেশ জল্লাদের দালালি চলবে না। ওকে দিয়ে বাকি ৪ জনকে লইয়া যান। নইলে আপনার উপায় নাই।" জনতার স্লোগান ও বাধা

অতিক্রম করেন হেমায়েত। কিন্তু জনতার সিদ্ধান্ত ছিল অন্যরকম। খালের দুই তীরের ক্ষেপা জনতা তাৎক্ষণিকভাবে জলে ঝাঁপ দিয়ে পলকের মধ্যে নৌকা ডুবিয়ে দেয়। নিজের কিছু বিশ্বস্ত ছেলের সহায়তায় এই মরণযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান হেমায়েত। অসহায় অবস্থায় গণপিটুনির চুবানিতে মারা যায় লেবু, কমলেশ, বিষ্ণু ও মানিক। দুষ্কৃতকারীদের সাথী গজ্জর আলি নামের এক ছেলে গণ অনুকম্পায় রক্ষা পায়। অপরদিকে, পানির নিচে ডুবে পানি গিলতে গিলতে ঢোলা পেটে তীরে উঠেন হেমায়েত। বাস্তবে ডাঙ্গার জনতা পূর্বেই ইট পাটকেল নিক্ষেপে নৌকা ক্ষতবিক্ষত করে। আহত লুৎফর রহমান তখনো বেঁচে আছেন। পরবর্তীতে লোকজন কমলে নিজে থানার ওসিকে লিখিত ইনফরমেশন দিয়ে হেমায়েত চিঠি প্রদান করেন।

পূর্বাপর ঘটনা ঘটে সকাল সাতটা থেকে দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে। বিকাল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে কোটালিপাড়া থানার দারোগা পুলিশ আসে। তারা হেমায়েতের জবান বন্দি গ্রহণ করে। হাল সুরত লিখে আলামত সংগ্রহ করে সিজার লিস্ট তৈরি করে। সে সবের এক নম্বর সাক্ষী হেমায়েত। মৃত-আহত নিয়ে পুলিশ বিদায় হয়। শ্রান্ত ক্লান্ত হেমায়েত বাড়ি প্রত্যাবর্তন করেন।

খুনের আসামি হেমায়েত ঃ চারজন মৃত ও একজন মৃত্যুর পথের খুনখারাবির সুযোগে আওয়ামী লীগ, ব্যর্থ নমিনেশন প্রার্থী, স্থানীয় কুচক্রী মহল, একাত্তরে মারখাওয়া পুলিশ ও নাখোশ মহল রাতারাতি কেইস সাজান হেমায়েতের বিরুদ্ধে। হেমায়েতের দুই সহোদর, আত্মীয়স্বজন, বারজন ঘনিষ্ঠ কৃতী মুক্তিযোদ্ধা মিলিয়ে চব্বিশজনকে আসামি করে খুনের মামলা হয় বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ১৪৮/৩০২/৩৬৪/৩২৫/১০৯ এবং এস ও অর্ডার/৭২ "মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত ও বেআইন জনতাবদ্ধ হইয়া খুন মারপিট ও খুন করিবার উদ্দেশ্যে অপরাধ ও তাহার সাহায্যে" দেখিয়া মামলা। গোপালগঞ্জ থানার দারোগা সৈয়দ সামসুদ্দোহা মামলার তদন্ত করেন। বাদির ১৬৪ কার্য বিধির ধারা মতে হাকিমের কাছে দেয়া জবানবন্দি গোপালগঞ্জ এস ডি ও মারফত পেয়ে মামলা রুজু করা হয়।

১০ মার্চ, ১৯৭৩ দিনের বেলায় এ-ঘটনা ঘটে। সাজানো লোকের পাতানো খেলার কিছুই হেমায়েত-এর জানা নেই। পুলিশ কেইসের মারপ্যাঁচ সম্পর্কে যোদ্ধার অজ্ঞতা থাকাই স্বাভাবিক। খুনের মালামাল পুলিশকে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে বাড়িতে ঘুমাচ্ছেন। "ভোরে বাড়িতে ১ জন পুলিশ এসে খবর দেন থানায় ডাকছে। বিনা প্রশ্নে সৎসাহস নিয়ে থানায় যাই।" হেমায়েত থানায় যেতেই আল্লাহর দেয়া সুযোগের ফানার মত কুচক্রিমহল নেতাদের পূর্ব পাতানো খেলার সাজানো লোকজন দিয়ে হেমায়েতের বিরুদ্ধে স্লোগানে স্লোগানে মুখর কোটালিপাড়া থানা এলাকা। এক গুলিতে দুই শিকার। প্রথম টার্গেট আওয়ামী লীগ বিরোধী কমিউনিস্ট শেখ। দ্বিতীয় টার্গেট শেখ মুজিবের অতি পেয়ারের মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রম নামের যে তেড়া ঘোড়া তাদের কম্বল চোর বলে তাড়া করত তার প্রভাব-প্রতিপত্তি-সুনামের চিরতরে কবর। প্রতিপক্ষ জনবিক্ষোভের নামে সাজানো জনতার পাতানো স্লোগানের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণে "হেমায়েতের ফাঁসি চাই..." জয়ধ্বনি উঠে। ক্ষোভে-দুঃখে

ও ডিসি-এস পি'র সামনে হেমায়েত বলেন, "মিলিটারিম্যান তাই ষড়যন্ত্র বুঝতে পারিনি। তবে আমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকি, খোদা তোমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনবেন। ফাঁসির মালা ফুলের মালা হবে। আর যদি অপরাধ করে থাকি, তা হলে যেন মহান আল্লাহই এই মুখ আর জনতার কাছে ফিরাইয়া না আনে।" বিধির বিধানে ফাঁসির আসামি হেমায়েত এখনো বেঁচে আছেন। কুচক্রীমহল জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংসে হয়েছেন। হেমায়েত-এর পবিত্র রক্ত জনতার কাছে কথা বলছে। কুচক্রীমহলের চক্রান্ত দু'দশকের ব্যবধানে জনতার কাছে ধীরে সুস্থে পরিষ্কার হচ্ছে। তবে এতদিনের মিথ্যা গণধিক্কার মনকে বিষিয়ে তোলে মাঝে মাঝে।

ছোট বেলার জমিদার বাড়ির চুরির ঘটনা মনে পড়ে। বারবার পুকুরের মাছ, গাছের কাঁঠাল-নারিকেল, ঘরের জিনিস চুরি হয়। দাদা ও জেঠা, প্রজা, পাহারাদার ও কামলাদের বকাবকি করে মারধোর লাগান। পুকুরের মাছ চোর ধরা পড়ল চৈত্র মাসে। প্রজা রাবির বাপ জমিদারের পুকুর পাড়ে বাস করেন। অন্ধকার রাতে পুকুরে শব্দ শুনে বর্শা হাতে পাড়ে এলেন। জলদ গম্ভীর নির্দেশ, "যেই হও উঠে এসে কথা কও, নইলে দিলাম অব্যর্থ নিশানার বর্শা ছেড়ে।" পুকুরের মাছ চোরের খাস কান্না। কাউরে কইস না। জল চুরি বিদায় ফেল মেরে এখন স্থল চুরিতে বিরামহীন গতি।

ছোট বেলার দেখা গ্রাম্য মারামারির দৃশ্য এখনও মনে পড়ে। যুদ্ধংদেহীদের ছুটাতে এলেন ভালমানুষরূপী গ্রাম্য জবরদস্ত মাতবর। মার খাওয়া লোকটাকে হাত-পা-মাজা ধরে এমন ভাবে আগলে রাখলেন যে মার খাওয়া লোকটা আরও মার খেয়ে তুলাধুনা হয়। হায় মাতবর বিচার।

স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের জয়জয়কার অনেকের চক্ষুশুল। স্বদেশ পালানো খাসিরা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর খাপ্পা। প্রবাসী সরকার ও আর্মি আওতার বাইরে ভিতরে গড়ে উঠা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ-গেরিলা গ্রুপকে আর্মি পর্যন্ত সুনজরে দেখত না। রাজনৈতিক প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে আওয়ামী লীগাররা মুক্তিযোদ্ধার কালজয়ী সম্মানে ক্ষুণ্ণ। এরা সবাই পাকিস্তানি আর্মির মত মুক্তি আতংকের জ্বলাতংকে ভুগতো। ফরিদপুরের ইতিহাস সৃষ্টিকারী কালজয়ী যোদ্ধা হেমায়েত আতংকে ভুগতো সবাই। যত দোষ নন্দ ঘোষের মত স্বাধীন দেশে যত খুন-রাহাজানি-লুটপাটের সব যেন করছে মুক্তিযোদ্ধারা। নকশাল নামের মত মুক্তি নামের নামাবলি হাওয়ায় ছাড়লেই সব জায়েজ। কাকতালীয়ভাবে ব্যাপারে ঘটনাস্থলে এসে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হেমায়েত বেআইনি সন্ত্রাসের আসামি বনে যান।

আহতের শেষ জবানবন্দি ঃ গণ ধোলাইতে চার জন অকুস্থল মৃত্যু বরণ করেন। মুমূর্ষু লুৎফর রহমান গজ্জ মৃত্যুকালীন বিবৃতিতে ঘটনার জট পাকিয়ে গেলেন। ৭ মার্চ দিনে দশটার দিকে ঘটা ব্যাপারে লুৎফর বিবৃতি দেন দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায়। কোটালিপাড়া থানার সামনে ঘাঘর বাজারে নৌকায় জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়।

লুৎফর রহমান গঞ্জর-এর জবানবন্দি

প্রশ্ন ১। আপনার নাম কি?

উঃ আমার নাম শেখ লুৎফর রহমান।

প্রশ্ন ২। আপনি যাহা বলিবেন সত্য হইবে।

উঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ৩। আপনার কি কখন কিভাবে হইয়াছে বলুন।

উঃ উনশিয়া হইতে অদ্য আমি, লেবু ওরফে অলিয়ার, কমলেশ, বিষ্ণুপদ মানিক পায়ে হাটিয়া রওনা করি। তখন বেলা ৭টা কাজুলিয়া হাট খোলার খালের দক্ষিণ পাশে পৌছিলে কমান্ডার বেয়াই মোজাম সরদারের ছেলে ফারুকুজ্জামান সাং কাজুলিয়া থানা গোপালগঞ্জ আমাদের পাশ দিয়া তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া কাজুলিয়া হাটখোলা গেল। কিছুক্ষণ পরে ফারুকুজ্জামান, হেমায়েত আরো বহু লোক ছিল। তাহারা আমার কাছে দাঁড়াইয়া লেবুকে ধরিয়া জড়াজড়ি করিতে লাগিল। হেমায়েতের আদেশে ফারুক লেবুকে ধরছে এবং হেমায়েত সহ অন্য কয়েকজন কমলেশকে ধরিয়াছিল। অন্য লোকেরা আমাকে, মানিক বিষ্ণুপদকে। অন্য সকলে লাঠি, কোঁচাশ, বাঁশ কোঠা দিয়া মারিতে লাগিল। লেবুও কমলেশকেও বেদম মারিতে লাগিল। লেবু ও কমলেশকেও কোদাল, টেঙ্গারি, বাঁশ ও লাঠি দিয়া মারছে। এইভাবে কিছুক্ষণ মারিয়া কমান্ডার হেমায়েত প্রস্তাব দেয় যে তাদের থানায় নিয়া যাব। উক্ত ঘটনা ঘটে ১০-৩০ মিনিট এর সময়। থানায় নেওয়ার প্রস্তাব করিলে আমরা বলি চল। তখন নৌকায় করিয়া আমরা ৫ জন হেমায়েত ও তাহার বেয়াই এবং আরো ২ জন ঘাঘরের দিকে আসিতে থাকি এবং অন্য লোকজন খালের দুই পাশ দিয়া হাঁটিতে থাকে। নৌকার উঠার সময় দুই পাশ হইতে অনেক ইট দিয়া ঘা দিয়েছে। নৌকায় উঠার সময় কয়েকটা লোকে প্রস্তাব দিয়াছিল যে কমলেশ বাবুকে এখানে রাখিয়া যান এবং ৪ জনকে নিয়া ঘাঘর যান। কিন্তু আমরা তাহাতে মত দেই নাই এবং রাজী হই নাই। তারপর নৌকা যখন বাঁধের নিকটে আসিল তখন হেমায়েত, ফারুক এবং দুইজন নৌকা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল এবং আমরা ৫ জনে নৌকায় ছিলাম। তখন ফারুকুজ্জামান কথায় বা ইঙ্গিতে খালের দুই ধারের লোক আসিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। লেবু ভাই উঠছিল কিন্তু পানির ভিতরই তাহাকে মারপিট শুরু করে এবং মারের চোটে দৌড় দিয়াছিল কিন্তু পিছনে সমস্ত লোক ভিড়িয়া তাহাকে শেষ মার দিয়া তার মৃত্যু ঘটায়। তার সাথে সাথে বিষ্ণুপদ ও মানিকও ছিল। তাহাদিগকেও সাংঘাতিক মাইর দেয়। কমলেশ বাবুকে খালের উত্তর পাড়ে ধরিয়া নিয়া মারিয়া ফেলে। আমিও মাইরের ঠেলায় অজ্ঞান অবস্থায় পরিয়া থাকি। কোন লোকই ঠেকাইতে আসে নাই। তাহাদের সংখ্যা খুব ন্যুনতম ছিল। সেইজন্য তাহারা সাহস পায় নাই। সমস্ত আসামিদের নাম জানিনা দেখিলে চিনিব।

স্বাক্ষর আঃ কাদের
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, গোপালগঞ্জ
দিবাগত রাত্রী ঘাঘর কোটালি পাড়া।
১০-০৩-১৯৭৩

মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কার!

হে ঈশ্বর !

আমার গ্রামের এক ঠাকুরের স্বেচ্ছা লিখিত দলিলে স্বাক্ষরের কথা মনে পড়ে। সঙ্গতিপন্ন জমিদার নাগ পরিবার ঠাকুর পরিবারকে দেন দেবোত্তর সম্পত্তি। নাগপুত্রের অন্নপ্রাশনে ঠাকুর এলেন। দেবোত্তর জমি কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র রেডি। সন্ধ্যার আলো আঁধারে নাগ বৈঠক ঘরে অন্নপ্রাশন ব্রতের পূজা অনুষ্ঠানে ঠাকুর ঢুকতেই মুগুর ভাজা শুরু হয়। ঠাকুরকে বানিয়ে আধমরা করতেই মূল নাগ এলেন। সুবিচার প্রত্যাশায় বড় ব্যাপার জানিয়ে তাঁর কান্না: আহা হা করস কি? সপ্ত পুরুষের কুলগুরু! আপ্ত বাক্য অসমাপ্ত করে নাটের গুরু বড় কর্তা বিদায় নেন। এবার ঠাকুরকে খাসলত বদলাতে আসলি ধোলাই দেয়া হয়। ঠাকুর বলেন: আর কাউরে কিছু কমুনা। যা কন তাই করমু। এবার নাগিনীর সুন্দর বিষাক্ত ফণার খোশ হালতে দেবোত্তর দলিল হস্তান্তরের কাগজ হাতে নাগ কর্তার প্রত্যাবর্তন। তাঁর গুরুবন্দনা ঠাকুর আশীর্বাদ আমার পুত্রের জীবনের পুণ্য। দেখুন ঠাকুর মশায়, এসব চ্যাংড়াদের কথায় মনে দুঃখ পাবেন না। ঝামেলায় না গিয়ে তারা যা কয় শোনেন। দলিলের এইখানটিতে স্বাক্ষর দিন। কম্পিত কলেবরে নিজের সহায় সম্পত্তির দেবোত্তর জোতজমি হারানের দলিলে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর দিলেন ঠাকুর মশায়। এমনি মর্তবার গুরুদক্ষিণার পুরস্কার! অন্নপ্রাশনের পূজাঘর ছেড়ে পালাতে ঠাকুরের গগনভেদী হাহাকারে প্রার্থনা: হে ঈশ্বর। একদিন তুমি সুবিচার করবা। আশ্চর্য ঠাকুরের অভিশাপ। জবরদস্ত সে নাগ ভিটায় আজ ঘু ঘু চরে। বড় বেখেয়ালে নাগ মশাই তাঁর শঠে শাঠ্যং মুসলমান বন্ধু মকবুল ইসলামকে বহু বছর বিনা খাজনায় জমি জোগদখলের বয়ান করেন। কৈলাইন গ্রামের হিন্দু নাগের মুসলমান বন্ধু তহসিল অফিস থেকে সম্পত্তির দলিল সাফ করে দেন। মানুষের গোস্তরূপী সম্পত্তিখোর নাগ ও তাঁর বন্ধুর বড় সকরুণ মৃত্যু ঘটে। ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে।

হেমায়েত কেইস সুরাহা করতে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদের অনেকে ব্যর্থ হন। কারণ বিচারকের সামনে বাদির ডাইং জবান বন্দি রয়েছে। বাদি লুৎফর রহমানকে কেমন বানানির ধোলাই চোলাইর পর যে বিচারকের সামনে হাজির করা হয়েছে। তার সুপ্ত রহস্য উদঘাটিত হলে মূল কেইসের জট খুলত। সত্য একদিন প্রকাশিত হবে। সেদিন হেমায়েত বেঁচে থাকলে হয়!!

শেখ মুজিবের বিস্ময়! আইন তার নিজস্ব গতিতে চলল। সুদীর্ঘ চৌদ্দ মাস অমিততেজা মুক্তিযোদ্ধা কারারুদ্ধ। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে হাইকোর্টের মাধ্যমে হেমায়েতের জামিনের ব্যবস্থা করেন।। অ্যাডামেন্ট যোদ্ধা চিত্ত বিক্ষোভ দমন করেন। জনতার ভালবাসার শ্রদ্ধাঞ্জলি ফুলের মালা গলায় পরেন। পূর্ণাঙ্গ ব্যাপার শেখ জানতে পারেন। ঘৃণ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে অরাজনৈতিক নির্দলীয় হেমায়েত জড়িত নেই। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আই-ও এসপি রাসেদ সিআইডি প্রধানকে ঘটনা তদন্তে সরাসরি নির্দেশ দেন শেখ মুজিব। অল্প দিনের ব্যবধানে বাংলার

জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের একান্ত ভালবাসার শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। ১৯৭৫-এর মার্শাল ল'র হাতে হেমায়েত আবার কারাবন্দি। ১৯৮২ র মার্শাল ল' র হেমায়েতকে কারারুদ্ধ রাখে সুদীর্ঘ আঠার মাস। ১৯৮৭'র পর কারা মুক্ত হলেও মামলা মুক্ত হন নি, জামিনে আছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বপ্ন দ্রষ্টা দার্শনিক ইকবাল-এর বাণী, "উপমহাদেশে মীরজাফর মরলেও তার আত্মা মরেনি।" তাই স্বাধীন বাংলায় মীরজাফরদের খেলা। সিরাজ ভক্ত মোহনলাল, মীরমদন, ইয়ার লতিফরা যদি কালের ব্যবধানে বাংলার ইতিহাসে স্বাধীনতা প্রিয় বাঙালির পূজনীয় হতে পারেন। শেখ মুজিব ভক্ত ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম, কর্ণেল খোন্দকার নজমুল হুদা বীর বিক্রম, মেজর হায়দার বীর উত্তম, কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রম জাতীয় যোদ্ধারা অনাগত ইতিহাসে নন্দিত নায়কের আসনে পূজিত হবেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতি অনুগত থাকা যদি কালের বিচারে বিশ্বাসঘাতকতা না হয় তবে স্বাধীনতা যুদ্ধের জ্বলন্ত প্রেরণা বাংলার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য দোষের হবে কেন? শেখ অনুগত যোদ্ধা সেনাপতিদের হত্যা করেও স্বস্তি নাই মীরজাফর গোষ্ঠির। বেঁচে থাকা শেখ অনুগতদের তিলে তিলে শেষ করা চাই। মীরজাফর দলে শামিল না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ নীরব নির্যাতন চলবে। কার বিরুদ্ধে কেইস সাজাতে কষ্ট করতে হয় না। স্থানীয় দলীয় কোন্দলের সাথে ক্ষমতাসীনদের মদদের আর্মি-পুলিশ ত আছেনই। আর্মির মদদে সিল মারা ভোটার শূন্য ভোটে নির্বাচিত দুই দেশের প্রেসিডেন্টের প্রতি আনুগত্যের খেসারত সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধারা। পাকিস্তান যেমন ভাংছে ভিতরের কোন্দলে। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত পক্ষ, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সুপ্ত ক্ষমতালিপ্সুদের হাত করে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে শেষ করে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পায়। এককালের ফেরেস্তা প্রধান মকরম শয়তানের মতই মীরজাফররা মুক্তিযোদ্ধাদের একান্ত সুহৃদ দরদির ভূমিকায় বিগলিত কুম্ভিরাশ্রুতে আবির্ভূত হয়। "জন্মকালে ক্ষয় নাই, মরণকালে গতি নাই"রে দশার সুযোগ সন্ধানী ক্ষমতালিপ্সু দল। "কাজের বেলা কাজি কাজ ফুরালে পাজি"র মত পদচাটা মুক্তিযোদ্ধাদের বিদায়। যেমন দশা হয়েছিল লর্ড ক্লাইভের পা-চাটা কুকুর মীর জাফরের। মুক্তিযোদ্ধাদের জেহাদি জোশে এসেছে বাংলাদেশ। রাজনৈতিক ক্ষমতার নামে তাদের ঐক্য ভাঙ্গন বিপক্ষের গোপন ইঙ্গিত লক্ষ্য। অনৈক্যের দেশে ভাগ্যলক্ষ্মী শয়তানের পাশে ভিড়বেই। ছলে বলে কৌশলে মুক্তিযোদ্ধা গোষ্ঠীর সর্বনাশা না করে তারা ছাড়বে না। "ভাইয়ের শত্রু ভাই মাছের শত্রু ঘাই"য়ের মত মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে মুক্তি যোদ্ধা হত্যা। সকল সংশয়, দ্বন্দ্ব, প্রলোভন, নির্যাতনের ঊর্ধ্বে যে-কজন বেঁচে থাকা মুক্তিযোদ্ধা মুক্তি ঐক্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামীদের অন্যতম কাদের সিদ্দিকী ও হেমায়েত।

জ্বলজ্যান্ত খুনির খেতাব এ-দেশে 'শহিদ'। পর্দার অন্তরালে শেখ মুজিব হত্যার কলকাঠি নাড়েন বাংলার হিয়া কাঁপানো সেনাপতি। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিবেশ মুক্তিতে সকলকে ক্ষমার ঔদার্য প্রদর্শন করেন। বিপক্ষ পক্ষ ও চাটুকার মোহে ভুলে

দেশে একমাত্র দল থাকার বাকশাল গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ী আর্মি-গেরিলাদের নাংগাপ্রায় করে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকার পূর্বরাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন চ্যান্সেলরের পদ গ্রহণের ভুলের মাশুলে প্রাণ দেন জাতির জনক। ঠাণ্ডা মাথায় মুজিবকে হত্যা করিয়ে ঘাতক বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেন তদানীন্তন প্রশাসন। ঘাতক প্রধান মেজর শরীফুল হক ওরফে ডালিম ও লেঃ কর্ণেল ফারুক টেলিভিশন-রেডিওতে স্বনামে সগর্ব বিজয়ে হত্যার ঘোষণা দেন। ঘাতক গ্রুপ উচ্চকণ্ঠে জিয়ার আশীর্বাদ পুষ্টিতে কার্য উদ্ধার পরিকল্পনা প্রচার করেন। আয়ুষ্কালে আশ্চর্য নীরবতায় শেখ মুজিব হত্যা প্ররোচনায় জড়িত থাকার বিষয়ে প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকেন জিয়া। চরম বিপদে তাঁকে রক্ষাকারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের বীর উত্তমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নিষ্কণ্টক হতে চান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সর্বময় ব্যক্তিটি। তিনি তাঁর আয়ুষ্কালে স্বাধীনতা ঘোষণার চট্টগ্রাম বেতার প্রচারণার ধৃষ্ঠতা সম্পর্কে চুপচাপ ছিলেন। চোরে কামারে অদৃশ্য সম্পর্কে সিঁদকাঠি বানানোর মত স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষে জোড়াতালি দিয়ে শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ শেখ মুজিব, মুশতাক, জিয়া, সাত্তার, এরশাদ। পাকিস্তান সৃষ্টি পরবর্তী পুরনো খেলা। মুসলিমলীগ ভেঙ্গে আওয়ামী লীগ। স্বাধীন বাংলায় আওয়ামী লীগ ভাঙ্গিয়ে অন্যান্য পার্টি গড়ার পাঁয়তারা। ক্ষমতায় বসে আর্মি দিয়ে সবার গর্মি ছুটিয়ে কর্ম উদ্ধার। জিয়ার বাসনা স্বাধীনতার সংগ্রামী রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ভেঙ্গে বিচূর্ণ করে ছাড়বেন। অস্ত্র, অর্থ, প্রলোভন, জেল, ফাঁসি, সিলমারা চোরাই ভোট, রাজনৈতিক দল গঠন জাতীয় বহুতর ছলা-কলার কূটকৌশলে এদেশের রাজনীতিকে দুরূহ করে ছাড়ার সমারোহের প্রতিজ্ঞা নেন ক্ষমতাসীন চক্র। তিনি তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করেন জেনারেল এরশাদকে। মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃখ শুধু মীরজাফর নয় ক্ষমতাসীন মীরজাফর পন্থীদেরও তাদের অনুকম্পা চাইতে হয়।

ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে এরশাদ-এর "প্রতিজ্ঞা যতই কর আস্ফালন, ভোটের চোট যাই দেখাও শেখ মুজিব নিশানার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দিবই না।" সামরিক, আধাসামরিক, অসামরিক সকল প্রশাসনকে কাবু করে জনতাকে কদলি প্রদর্শন করে আজীবন ক্ষমতাসীন থাকার সকল প্রচেষ্টার প্রাণান্ত করে ব্যর্থ শেখ মুজিব, জিয়া, এরশাদ। সত্যের জয়, জাগ্রত জনতার জয়ের মতই সকল মীরজাফরের চক্রান্ত ব্যর্থ। সকলের সকল সাধের কাঁটা অবশিষ্ট কটা মুক্তিযোদ্ধা। একই সন্তানের দাবিতে দুই মহিলার ঝগড়ার বিচারের রায়ের পৌরাণিক কাহিনী স্মরণে আসে। সন্তানকে দুভাগ করে দেয়ার বিচারের রায় সাজানো মা মানতে পারলেও আসল মা মানতে পারলেন না। নাহক দাবির মাকেই সন্তানের অধিকার ছেড়ে দিলেন আসল মা। কোন মা কর্তিত সন্তানের অর্ধেক পেতে চান? যাক না আস্ত সন্তান পরের হাতে বেঁচে তো থাকবে। ইহুদির সাথে ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম ভাগাভাগিতে ইয়াসির আরাফাত এমনি বিপাকে। উড়ে এসে জুড়ে বসা ইহুদিদের হাতে ফিলিস্তিনের ব্যবচ্ছেদ আপত্তি নাই। ফিলিস্তিনের মূল সন্তান আরবরা তা মানে কেমনে? ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা আরাফাত আজ বিজয়ের পথে।

আপন শোনিতে গড়া বাংলাদেশকে ভালবেসে অনেক অবিচার সাময়িক মেনে নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। তাঁদের এই কৌশলগত ধিকৃত সাময়িক স্বীকৃতিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিকৃতি ভেবে আনন্দে বাগবাগ স্বৈরাচারী ক্ষমতাসীন দল। ইতিহাসের শিক্ষা মানুষের ইতিহাস বিস্মৃতি। মানুষের হাতে মানুষের বিচার না হলেও প্রকৃতির হাতে, আল্লাহর হাতে বিচার অবধারিত। সিরাজ-মাতাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ নেয়ার ছলনায় নৌকায় উঠান মীরজাফর পুত্র মিরণ। ঢাকা-নারায়নগঞ্জ মেঘনা-শীতলক্ষ্যার মিলন স্থলে নামাজরত সিরাজমাতাকে ডুবিয়ে মারেন মিরণ। ডুবন্ত নৌকায় আকাশকে সাক্ষী রেখে বিচার চেয়ে যান সিরাজ মাতা। বিনা মেঘের বজ্রপাতে মুর্শিদাবাদে নিহত হন মিরণ।

বাংলার মাটিতে মুক্তিযোদ্ধা ঘাতক, জাতির জনক হত্যার বিচার একদিন হবেই। প্রেসিডেন্ট হত্যার যে দেশে বিচার নাই, তা সভ্য দেশ হতে পারে না। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার কিছু ঘাউরা বাঙ্গাল মুক্তিযোদ্ধার একজন হেমায়েত।

শহিদ সিরাজের অতৃপ্ত আত্মার শান্তি মিলেছে বাংলার আসলস্বাধীনতা প্রাপ্তিতে দুইশ তের বছর পর। শেখ মুজিবের বিদেহী আত্মা প্রশান্ত হবে ঘাতক-দালাল মুক্ত নিষ্কন্টক স্বাধীনতায়। মুজিব হত্যাকারীদের বিচার মানুষ না-করতে পারলেও আল্লাহর বিচারে তা একদিন হবে এই বাংলার বুকে।

মুজিব অনুসারীদের নির্মূল-নির্জীব করতে উদায়ন্ত কাজ করছেন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ পক্ষ। বিরাট হৃদয় ঔদার্যে খাঁটি-মেকি, আপন পর চিনতে ভুল করেছিলেন মুজিব। তাঁর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের রক্তের সাগরের কর্ণধার তাজউদ্দিনকে বিসর্জন তারই প্রমাণ। নিহত শেখের রক্তের ঋণ পরিশোধে চার নেতা-তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান, মনসুর আলিদের প্রাণ দিতে হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। তাঁর অতি পেয়ারের মুস্তাক আহমদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, তাহের উদ্দিন ঠাকুররা রক্তের দাগ মুছার পূর্বেই ক্ষমতার মসনদের পিছনে দৌড়। হতাবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা আপন জনকে বুঝে নও সময়ের কষ্টি পাথরে। অন্যথায় চাটুকারের পদ চাটা পদাঘাতে সব শেষ হবা।

মুক্তি হেমায়েতের অনুশোচনা ঃ নিখাদ সোনায়ও কিছু খাদ থাকে। নইলে তা বহনযোগ্য স্থানান্তর যোগ্য নয়। চৌদ্দ পার্সেন্ট খাঁটি সোনার সাথে দুপার্সেন্ট খাদ হলেই গিনি বা খাঁটি সোনা। বেঁচে থাকা দু চারজন মুক্তি কমান্ডারকে নিকষ পাথরে পরীক্ষিত খাঁটি সোনায় পরিণত করাই কি আল্লাহর ইচ্ছা! নইলে নিরপরাধ মুক্তি হেমায়েতের ওপর এত জেল জুলুমের অপবাদ কেন? ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজো তিনি খুনের মামলার আসামি। সে মামলা আজো চলছে অনিশ্চিত প্রতীক্ষায়।

জয়দেবপুরে প্রতিহিংসা ঃ স্বাধীনতার সূচনা পর্বে হেমায়েত জয়দেবপুর। সসৈন্যে সফিউল্লাহর কাট মারা পলায়ন ময়মনসিংহে। শত্রুর ক্রি ওয়াক ওভারে বাদ সাধেন হেমায়েত। হেমায়েত স্বতন্ত্র কমান্ড সৃষ্টির মনোভাবে নিজস্ব প্লাটুনসহ অদূরে অবস্থান নেন। সব ডিম এক ঝুড়িতে রাখার বিপর্যয় এড়ানোর ফন্দি। ডালে মূলে না

সব এক কাতারে কলাগাছের মত শেষ হয়। গেরিলা স্বাভাবিক যুদ্ধের রীতি মেনে চলে না।

২৮ মার্চ জয়দেবপুরে বেঁচে থাকা পাঞ্জাবি, বিহারি ও পাকিস্তানি সমর্থকদের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ হয়। বেলা ১১ টা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আক্রমণের পর আক্রমণ। তিন ২য় বেঙ্গল সৈনিকের শাহাদত হয় এই যুদ্ধে। মুক্তি হামলায় নিহত বত্রিশ পাকিস্তানি সেনা ও পাকিস্তানি দোসরের কবর জয়দেবপুর পূর্ব পাশে স্কুলের উত্তরের আম বাগানে। পাশাপাশি কবরেই সমাধি তিন সিপাই। শত্রু মিত্র সকলকে শরিয়ত সম্মত মর্যাদায় দাফন করা হয়। মূল ব্যাটালিয়ানের অবর্তমানে হেমায়েতকে যুদ্ধ অভিনয় জারি রাখতে হয় জয়দেবপুরে। কমপক্ষে দেড়শ পশ্চিমা ও বিহারি হত্যায় মুক্তি হাত কলংকিত। প্রতিহিংসার অনলের নারকীয় নাটকের শত্রুর শিশু সন্তানও রক্ষা পান নি। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহু মুসলমান হেমায়েত বাহিনীর হাতে নিহত হয়। নিরপেক্ষ বিচারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ দুদলই জঘন্য খুনের পাপে পাপী। সে বিচারে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাই খুনি। স্বাধীনতার প্রয়োজনে খুনকা বদলা খুনের রাজত্ব কায়েমে এসেছে বাংলাদেশ। যুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে যেমন দেদার স্বদেশী-বিদেশী খুন হয়েছে। তেমনি যুদ্ধকালে এবং স্বাধীনতার বিজয়লগ্নে নজিরবিহীন ক্ষমার হৃদয় ঔদার্যে শত্রুকে ক্ষমা করেছেন স্থানীয় মুক্তি কমান্ডাররা। আইনবলে সকলকে ক্ষমা করে শেখ মুজিব তৎকালীন সকল মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করে শেখ মুজিব অন্যায় করলে তার বিচার হওয়া উচিত। সে বিচারের আগে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের বিচার কাম্য। শত্রুকে ক্ষমা করে প্রাণে মরলেন শেখ মুজিব। হেমায়েত বাহিনী কমান্ডার তাঁর হৃদয় ঔদার্যের কারণে আজ ফাঁসির কাঠগড়ায়। খুনি হেমায়েত-এর অনুশোচনা, অতীত খুনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি আল্লাহ করিয়ে নিচ্ছেন! খুনি মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত ঋণের স্বাধীনতায় রাজত্ব কায়েম করেছেন ঘৃণ্য কুচক্রী স্বার্থান্বেষী মহল। তাঁরা তাঁদের ফরজ কাজ মুক্তি হননে ব্যস্ত। আল্লাহই শেষ বিচারের মালিক। সত্য একদিন প্রকাশিত হবে। মুক্তিযোদ্ধারা পরস্পর হানাহানির কুৎসা রটনা ছেড়ে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পাবে। সেদিন হয়ত হেমায়েত বেঁচে থাকবে না, কিন্তু বেঁচে থাকবে এই স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশের ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে পাকিস্তানি দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী হেমায়েত বাহিনী ও হেমায়েতের নাম।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চিরন্তন চিত্র ঃ স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ার পরিণতি শুভ হয় নাই। শেখ মুজিব চান বা না চান, জানুন বা না জানুন, তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকুক বা না থাকুক তাঁরই জন্মভূমির নির্বাচনী এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ায় সবাই তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণ করেন। নির্বাচনে তাঁর দলের প্রতিপক্ষ নিহত। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে ঝিনেদা। আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকীর পোষ্য দীননাথ মজুমদারের হাতে প্রতিপক্ষ হত্যা। তাঁর রাজনৈতিক দলকে

সংযত রাখতে কোন বিচারই করতে পারলেন না শেখ মুজিব। দোষ করল আওয়ামী লীগ, কাফফারা দেয় মুক্তি হেমায়েত। তাই লেবুর মা জাহানারা বেগম পুত্র শোকে হত্যার জন্য দায়ী করেন মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত বাহিনী, হেমায়েত উদ্দিন, মোল্লা জালাল উদ্দিন ও শেখ মুজিবকে। লেবু সবার প্রিয় ছিলেন। ফরিদপুরের গ্রামে গঞ্জের মানুষ দুযুগ পরেও লেবুকে স্মরণ করেন। লেবু হত্যায় ব্যথিত লাখ মানুষের ঢল নেমেছিল সেদিন গোপালগঞ্জে। লেবুর জনপ্রিয়তায় সবাই শংকিত। গোপালগঞ্জের ন্যাপের জনপ্রিয়তা লেবু জিতলে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তায় ফাটল ধরবে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মূলে লেবু হত্যা। লেবুর মা দুর্ঘটনার জন্য শেখ মুজিবকে সরাসরি দায়ী করেন। শেখ মুজিবের বিশ্বাসভাজন মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতকে দিয়ে পর্দার অন্তরালে কাজ করানোর অভিযোগ রাখেন শোকাতুরা মা। দলীয় স্বার্থে, ভবিষ্যতের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মূলে বিচার না হলে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে। প্রচারণার রটনা শাখা পল্লব মেলে। সত্য চাপা পড়ে। মিথ্যা মুখরোচক প্রচারণায় আসর সরগরম। পরিণতিতে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি মোল্লা জালালউদ্দিন ঘাতক হাতে পঙ্গু। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণে মরলেন। শেখ মুজিব সবংশে নিহত হন। তাঁর ঘাতকদের আজো চলছে জয় জয়কার। খুনি কর্ণেল ফারুক এরশাদের সৌজন্যে প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হয়ে নির্বাচন লড়েন। রাজনৈতিক দল ফ্রিডম পার্টির নামে তিনি শেখ মুজিব ভক্ত কমভক্তদের নির্মূলের পাঁয়তারা করেছেন। খুনের বিচার না করার ফল পরবর্তীতে খুন। বিচারহীন নির্বিচার খুন।

অরাজনৈতিক হেমায়েত লেবুর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে কেন হত্যাকাণ্ড ঘটাবেন? লেবুর মার তাই ক্ষোভ লেবু হত্যার জন্য দায়ী শেখ মুজিব। বিচার না হওয়ার না করার এই পরিণতি! রক্তের বন্যায় ভাসলেন শেখ। মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতিত্বকে ম্লান করে তিনি বিদায় নিলেন। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে?

সন্ত্রাস নির্মূলের দাওয়াই ঃ সন্ত্রাসী হেমায়েত জেলে থাকলে সবার স্বস্তি। তাঁর ফাঁসি হলে লেঠা চুকে। মুক্ত বাংলার ফরিদপুর অঞ্চলে হেমায়েত-এর বিচরণ অনেকের অসহ্যের কারণ। তাই কোটালিপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান কাজি মাহমুদ হোসেন ওরফে কাজি মন্টুর অপসারণ জাতীয় কর্মকাণ্ডে পত্রিকার চাঞ্চল্যকর হেডিং, "লেবু হত্যা মামলার জামিনপ্রাপ্ত আসামি হেমায়েত কোটালিপাড়ায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে।" ১৯৭১-এর মুক্তিদাপটের চোটপাটের কথা যেন অনেকে ভুলতে পারছেন না। হেমায়েত বেঁচে থাকতে, স্বাধীনভাবে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ালে কোন সময় কোটালিপাড়ার কোটালটা প্রাণ কেড়ে নেয়। তাই শেষ কাম হেমায়েত! সবটার শেষ না পারত তার প্রতিপত্তির সুনাম হানি কর।

ইতিহাস কইছে কথা নীরবে ঃ হেমায়েত-এর প্রতিপত্তি হননের অব্যাহত প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি ১০ মার্চ, ১৯৭৩ ইংরেজি কোটালিপাড়ার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড! লেবু, কমলেশ, বিষ্ণু, মানিক হত্যায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা আগ বাড়ানো উদ্যোগে হেমায়েতকে জড়িয়ে দেন। নির্দোষ হেমায়েতকে হত্যা ষড়যন্ত্রে জড়ানোর

শেষে যার যার পেশা, বাড়ি ঘরে ফিরে গেছেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী অবৈতনিক অনিয়মিত বিজয়ী যোদ্ধারা স্বভূমির স্থানীয় এলাকাতেই আছেন। বিজিত শত্রুদের মাঝে তাঁদের সার্বক্ষণিক বিচরণ ও বসবাস। স্বাধীনতার প্রয়োজনে ভ্রাতৃহত্যার গণযুদ্ধের বাস্তব চিত্র পেশাদার সৈনিক বা ভিন্ন এলাকার স্বাধীনতা যোদ্ধাদের বুঝা দুরূহ। ঘাতক ও নিহতের আত্মীয়, বিজিত-বিজেতা একই বাড়ি, একই গ্রাম, একই অঞ্চলে বসবাসের প্রতিক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সাদা চোখে দূর থেকে অনুধাবন দুর্ঘটনাই বটে। দুদলই আত্মশুদ্ধি, শক্তি বৃদ্ধি, প্রতিঘাত শক্তি অর্জনে জনশক্তি বৃদ্ধির সহজ পথটা বেছে নিয়েছেন। অর্থ বৃদ্ধির চেষ্টা সবাই করছেন। তবে অর্থলোভীর বরভাগ্য সবার সহজ হয় না। তবে 'বৎসরে শুধু একখানি করে খোকা' পয়দাটা সহজ। এদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের এ বিশ্রী দিকটা সবাই ভেবে দেখলে ভাল করবেন।

হেমায়েত যখন জেলে

পূর্বরাগ

স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্তের গন্ধ না শুকাতেই পাক সমর্থক সাত রাজাকার-এর সঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত একই বন্দিশালায় আটক। বাহ্ কী চমৎকার স্বাধীনতা! বাঘ আর ছাগল যেন এক ঘাটের পানি চাটে। গোপালগঞ্জের লেবু হত্যা মামলার আসামি হেমায়েত। মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েতের সহযোদ্ধা কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ ছিলেন ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রার্থী। কোটালিপাড়ায় আওয়ামী লীগের বিপক্ষে নির্বাচনে লড়া মানে মৃত্যুবাণ ডেকে আনা। নির্বাচনে কমলেশের প্রচার সচিব গোপালগঞ্জের কৃতী সন্তান অলিউর রহমান লেবু মিয়া ওরফে লেবু। নির্বাচন হয় ৭ মার্চ, ১৯৭৩। কমলেশের পরাজয় ঘটে উক্ত নির্বাচনে। ১০ মার্চ কোটালিপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ যাবার পথে জনতার হাতে অস্ত্রসহ ধরা পড়েন বেদজ্ঞসহ পাঁচ জন। গণ পিটুনিতে পাঁচজনের চারজনই নিহত হন। অকুস্থলে উপস্থিত হওয়ার কারণে হেমায়েত হন খুনের আসামি। কারণ হেমায়েতের গ্রাম টুপারিয়াতেই ডাকাত-নকশাল পরিচয়ে বেদজ্ঞ গ্রুপ জনতার ক্রোধে পড়ে।

অনুরাগ

হেমায়েত তখনো চাকরিতে এবং নিয়মিত [সেনা] বাহিনীর হাবিলদার। যোদ্ধাহত সৈনিক চিকিৎসা শেষে সদ্য ফ্রান্স থেকে দেশে ফিরেছেন। তিনিই সেদিন নিহত-আহতদের খবরাখবর থানায় পাঠান। শেষ পর্যন্ত তিনিই হন হীন ষড়যন্ত্রের শিকার। ফলশ্রুতিতে, শ্রীঘরে তিনি। পুলিশ প্রথমে তাঁকে নেয় গোপালগঞ্জ জেলে, পরে স্থানান্তর করা হয় ফরিদপুর।

ভারতের উত্তর প্রদেশের সন্তান সফিউল্লাহ তখন ফরিদপুরের কারা-প্রধান। হেমায়েত জেলে প্রবেশমাত্র দেবতাতুল্য জেলার তাঁকে নিয়ে বসেন জেলার-এর অফিস

কক্ষে। টলটলায়মান অশ্রু জেলার-এর চোখে। জেল জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ হেমায়েতকে তিনি জেল কোড (আইন) সম্পর্কিত জ্ঞান দান করেন। কারণ, হেমায়েত জেল সম্পর্কে কিছুই জানেন না। জেল যে এক ভিন্ন জীবন ও জগৎ, হেমায়েত প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি। প্রায় আধ ঘণ্টার মতো জেলার তাঁর নিকটে আইনের ব্যাখ্যা করেন। জেলের ভেতরে আইনের প্রয়োগ ও তার ভয়াবহতার কথা শুনে হেমায়েত শিউরে ওঠেন। জেলার-এর উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর হাজতির মর্যাদার প্রাধিকার পেলেন হেমায়েত।

পাক অভ্যর্থনা

পাক ঘেঁষা জেল বন্দি রাজাকার, শান্তি-কমিটি, আল-বদর, আল শামস চক্র মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতকে রাম ধোলাই দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। হেমায়েত জেলে ঢোকা মাত্রই ফাটকে আটক নাটকের শুভ উদ্বোধন হবে। ব্যাপার পূর্বাহ্ণে আঁচ করেন জেলার। সঠিক খবর তাঁর কাছে যেতেই উপযুক্ত সতর্কতা গ্রহণ করেন তিনি। তাই হেমায়েত সরাসরি জেলারের অফিসে। জেলার, জেলা প্রশাসকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ডিভিশন মঞ্জুর করান। প্রকাশ্য যুদ্ধে পরাজয়বরণকারী একাত্তরের ঘাতকচক্র জেলে বসে এক মুক্তিযোদ্ধার গায়ে আঘাত হানার ষড়যন্ত্র করে। জেলা প্রশাসকের দূরদৃষ্টির চাতুর্যে পাক-দালালদের দ্বারা জেলের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের একজন বরেণ্য নায়ককে মারার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জেলের শান্তি-শৃংখলার প্রয়োজনে যথার্থ উদ্যোগ নিয়ে সবার ধন্যবাদের পাত্র হলেন জেলার।

সে-রাতেই জেলার ঢাকা থেকে টেলিফোন পান। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন। ক্রিং ক্রিং ক্রিং .... জেলার হ্যালো বলতেই অপরদিক থেকে ভেসে আসে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর। "... ঐ ছেলেটা জেল খানায় নিরাপদে আছে তো ?" জবাব দেন জেলার সাহেব, "জ্বি স্যার"। "ও খুব সহজ-সরল একজন দেশপ্রেমিক দুঃসাহসী যোদ্ধা। স্থানীয় নেতাদের পলিটিকস্ ও বোঝে নাই। ছেলেটি কুচক্রীদের জালে ফেঁসে গেছে। ব্যাপারটি আমি পরে দেখবো। ওকে ডিভিশন দিয়ে রাখেন। আমি ডিসিকে বলে দিচ্ছি।"

জেলার থ' বনে গিয়ে জবাবে বলেন: "স্যার, আমি ওটা বুঝতে পেরেই হেমায়েত সাহেবকে আমার অফিসে বসিয়ে রেখে সব ব্যবস্থা করেছি। আমি ভেতরে থাকা পাক-পন্থীদের ষড়যন্ত্রের খবর পেয়েই সব ব্যবস্থা করেছি। স্যার, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না স্যার। হেমায়েত সাহেবের সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। স্যার, স্যার ...।" অপরদিক থেকে সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

হেমায়েতের সামনেই পুরো নাটকের পাঠ চুকে। জেলার হেমায়েতের দিকে চেয়ে রহস্যের দৃষ্টিতে বলেন, "আমি জানতাম এমন একটি টেলিফোন হয়তো আসবে।"

"খোদার লাখ কোটি শোকর। আমাকে নিয়ে জেলার সাহেব ছয় ডাণ্ডা পুলিশসহ গেট খুলতেই দেখেন, অ্যাডভোকেট বাকাউল, অ্যাডভোকেট আদিলউদ্দিন, অ্যাডভোকেট সরোয়ারজানসহ আরও প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো দালাল গেটের ভেতরে দাঁড়ানো। সকলের চোখেমুখে যেন আগুন জ্বলছে। মিঠা হাসিতে তারা জেলারকে প্রশ্ন

করে, "কি জেলার সাহেব, নতুন অতিথি নিয়ে শ্বশুর বাড়ি ঢুকলেন নাকি !" আরো কতো রকম প্রশ্ন!

জেলারও উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, এ শ্বশুর বাড়ি না আসলে নেতা হওয়া যায় না।" দালালদের আবারও প্রশ্নঃ "তবে উনার পরিচয় জানতে পারি ?" প্রতি-উত্তরে হেমায়েত নিজেই জলদি করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন, "আমিই আপনাদের ত্রাস, সেই রক্ত-দূষণ হেমায়েত। ভাগ্য আমাকে এখানে টেনে আনলো আপনাদের সঙ্গে থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। গ্রহণ করা না করা আপনাদের ইচ্ছা।"

বাস্তবে জেল খানার ডিভিশন পাওয়া দালালরা হেমায়েত-এর ব্যাপারে জানলেও সাধারণ হাজতিদের ছিল উল্টো সুর। অনেকে বলে, 'আরে জানো না, তারে আসামির বেশে জেলে পাঠিয়েছে আমাদের অবস্থা জানবার জন্য। আমরা বেশি লাফালাফি করলে শেখ আমাদের ক্ষমা করবে না।"

আত্মরক্তে শেখ মুজিব

শেখ মুজিব-হেমায়েত এ নাটকের চেয়েও জীবন্ত প্রামাণ্য নাটক হয়েছে খোদ রাজধানী ঢাকায়। স্বাধীনতা পরবর্তী ঢাকার হরতাল-আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নেয় মুজিব সরকার। পুলিশের সাথে আলোচনায় সরকারি পার্টির সিদ্ধান্ত হয়, অতি প্রত্যুষে তারা রাজপথে নামবে হরতাল ঠেকাতে। সমঝোতা জাতীয় কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্বেই অতি উৎসাহে সরকারি দলের কিছু কর্মি মাঠে নামে। জিপে তাদের সঙ্গে আরও ছিলেন মুজিব তনয় শেখ কামাল। জিপ এগুচ্ছে পুলিশের ওয়ার্নিং-সতর্কতা উপেক্ষা করে। জিপের ভেতর থেকে বলা হয় ঃ "আমি কামাল"। কতো কামালই তো আছে! সন্দেহ দোষে দুষ্ট জিপ থামাতে পুলিশ চালায় গুলি। মারাত্মকভাবে আহত হন শেখ কামাল। জীবন-মরণ সংশয়ে তখন তিনি হাসপাতালে।

ঘটার যা ততোক্ষণে সবই তো ঘটে গেল। কিন্তু বিপাকে পড়েন ঢাকার তখনকার সিটি এসপি মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবউদ্দিন আহমদ। জনগণের নিকট তখন তিনি এসপি মাহবুব নামেই সমধিক খ্যাত। একাত্তরে সাতক্ষীরার সন্নিকটবর্তী রণাঙ্গন বালিয়াডাঙ্গার যুদ্ধে অত্র লেখক শত্রুর পাউডার শেলে মারাত্মকভাবে আহত হলে এ-মাহবুবই তাঁকে উদ্ধার করার জন্য মৃত্যু-গুহার রণাঙ্গনে প্রবেশ করেন। সে যুদ্ধে তিনিও শত্রুর গুলিতে আহত হন। পরে তাঁদের দু'জনেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় ব্যারাকপুর সামরিক হাসপাতালে।

ঘটার যা তা ঘটলো কিন্তু রটলো অনেক বেশি। এবার ভয়াবহ এই দুঃসংবাদ নিয়ে কে যাবে শেখের বাসায় ? কে পৌঁছাবে খবর ! প্রশাসনের উর্ধ্বতন মহল এসপি মাহবুবকেই বেছে নিলেন সংবাদ বাহক হিসেবে। শেখ-পত্নীর প্রচ্ছন্ন স্নেহাশীস ছিল মাহবুবের প্রতি। এ-ছাড়া আরও অনেক খবর তখন বাতাসে ভেসে বেড়াতো।

একাত্তরের শৌর্যে-বীর্যে নন্দিত-বন্দিত মুক্তিযোদ্ধা এসপি মাহবুব ইউনিফর্মে সরাসরি শেখ-ভবনে উপস্থিত। সামরিক কায়দায় স্যালুট করে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন শেখ মুজিবের সামনে। বঙ্গবন্ধু তখন দেশের প্রশাসন-প্রধান। মাহবুব তাঁকেই সরাসরি

জানান এই দুঃসংবাদ। সিংহ গর্জনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন শেখ মুজিব : 'কে করেছে গুলি?' নির্ভীক জবাব এসপি মাহবুবের কণ্ঠে ঃ "আমি"। এবার আনত মস্তকে নিজের বেল্ট ও লোডেড পিস্তল খুলে রাখলেন মাহবুব শেখের পদতলে : "যা করার আমাকে করুন। কোনো রক্ষী নিয়ে আসিনি। কেউ জানবে না এ-খবর। লোডেড পিস্তল আপনার সামনেই রয়েছে।" পিন পতন নীরবতায় সময় যায়। রোরুদ্যমান শেখ মুজিব এতোক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নেন। শেখের কণ্ঠে এবার কিঞ্চিত ভিন্ন সুর : "তোরা আমারে ভুল বুঝলি। আমিও বাপ, স্নেহময় পিতা। আমি আমার আহত সন্তানকে দেখতে চাই। ভিন্ন পোশাকে যাব, কেউ চিনবে না আমাকে। এ-কথা শুধু জানবি তুই এসপি মাহবুব। আর কেউ না।"

দাগ নম্বরে চিহ্নিত ছিলেন শেখ কামালকে গুলি করা পুলিশ। সেদিনের পুরো প্রশাসন এ-ব্যাপারে কোনো উচ্চ-বাচ্য করেনি। এমনি কোমলে-মধুরে ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন শেখ মুজিব। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেন পুল বলেন: "দি ডেথ অব হযরত ওমর ইজ অ্যা রিয়েল ক্যালামিটি টু ইসলাম-হযরত ওমরের মৃত্যু ইসলামের জন্য একটা বাস্তব দুঃসহ ঘটনা"। তারই সুরে যেন বলা যায়, "দি ডেথ অব শেখ মুজিব ইজ অ্যা রিয়েল ক্যালামিটি টু বাংলাদেশ"। শেখ মুজিব হত্যা-পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাস তাই বলে-বাইরে যতো ভাল-মন্দ প্রচারই হোক ব্যক্তি শেখের ব্যাপারে।

বাংলাদেশ বিরোধীদের সঙ্গে হেমায়েত-এর সখ্য

দালালদের ক্ষমা করার বিষয়টির বাতাস বইছে মাত্র। ব্যাপারটি মুক্তি-হাজতি হেমায়েতের জন্য সুফল বয়ে আনে। শেষ পর্যন্ত রাজাকারদের অনেকেই হেমায়েতের বশ্যতা মেনে নেয়। তিনি যাতে কারও বিরুদ্ধে রিপোর্ট না দেন, তেমন তদবির নিয়মিতই চলতে থাকে। ইতোমধ্যে জেলের ভেতরে সখ্য গড়ে ওঠে জনা পনের ডিভিশন পাওয়া রাজাকারের সঙ্গে। এতদবিষয়ে হেমায়েত জানান ঃ "তারা জেল খানায় থেকেই আমার জন্য তদবির-তালাফি করেছে। সাবেক আইজিপি'র বাবা (তখন ডিআইজি) অ্যাডভোকেট বাকাউল সাহেবের বাসা থেকে বেশ উঁচু মানের খাবার আসতো। আরও আসতো অ্যাডভোকেট সরোয়ার জান, অ্যাডভোকেট আদিলউদ্দিন প্রমুখের বাসা থেকে। আমার পক্ষ থেকে কোন খাবার আসা তো দূরের কথা, নিয়মিত কেউ দেখতেও আসতো না। বাধ্য হয়েই উনাদের দামি দামি খাবার খেয়ে মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই মোটা হয়ে গেলাম।

অন্যান্যদের সঙ্গে খোরশেদ, লায়েকসহ জনা ত্রিশেক রাজাকার ছিল জেলখানায় যারা কোটালিপাড়ার মানুষ। তারা যেন আমাকে পিরের মতোন সম্মান করতো। সুযোগ পেলেই তারা চলে আসতো আমার কাছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন পাক-পন্থী হাজতিরাও আমাকেই জেলে তাদের নেতা মনে করা শুরু করলো। জেলার সফিক সাহেবকে আসামিদের দুএকটা আবদারের কথা জানালে তিনি বিমুখ করেননি আমাকে।"

জেলে রাজাকার চক্রান্ত

"গোপালগঞ্জের কুখ্যাত খুনি রাজাকার জয়নাল আবেদিন ছিল দুরন্ত চরিত্রের, বদের এক শেষ। পাকিস্তানি কিষাণ পত্রিকার সাংবাদিক। এই লোকটি আমাকে নিয়ে তেল-বেগুনে জ্বলতে থাকে। আসলে তার জ্বলার পেছনে কারণ ছিল লেবু মিয়া। নিহত লেবু মিয়া নাকি তার ভাগ্নে হয়। সে লেবু হত্যার খুনের আসামি হয়ে জেলে আসায় জয়নালের পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। কখনও সে ব্যঙ্গ করতো : 'ক'টা মালাউন খুন হয়েছে তো কি হয়েছে ? ভালোই তো হলো! কিন্তু আমার ভাগ্নে ছিল কমিউনিস্ট নেতা-কমরেড। তাকে খুন করা ঠিক হয়নি।' অবশ্য জেলের বাসিন্দারা এই খুনের জন্য অনেকে খুশিই হয়েছে। কারণ, কমলেশ বেদজ্ঞ বেশ কিছু মুসলমানের গলা কাচি-ব্লেড দিয়ে কেটেছে তাদের কষ্ট দিয়ে দিয়ে। কমলেশ ছিল রাজাকারদের যমদূত। "জয়নাল আমাকে জেলখানায় ট্র্যাপে ফেলার জন্য সব সময়ে মরিয়া হয়ে থাকতো। আমি নিজেকে এ-পরিস্থিতি সামাল দিতে পারায় জেলখানাতে হয় আমার জয়জয়কার।

ডিভিশনে-ডিভিশনে মনোমালিন্য

ডিভিশনধারী কয়েদি-হাজতিদের মান-মর্যাদার একটা প্রশ্ন আছে না! উচ্চ শিক্ষিত ও সামাজিক মান-মর্যাদার অনেকেই হেমায়েতের কাছে এসে তাঁকে ধরে জানতে চান, জেনিভা কনভেনশন অনুযায়ী তাঁরা কীভাবে ডিভিশনের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। হেমায়েত বয়ানে অনেকেই সে-সুবিধা পেয়ে যান।

হেমায়েত ফরিদপুরের জেলে আসছেন এ-খবর আগেই পৌঁছে যায় সেখানে। জেলে বন্দি দালালগণ তাঁকে আচ্ছা একটা ধোলাই দেবার জন্য রিহার্সেলসহ প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। জেলারের দূরদৃষ্টির কারণে তা হয়নি। "উন্নত শিরে"র দর্পে হেমায়েত প্রবেশ করেন। ডিভিশনধারী কয়েকজন ধুরন্ধর রাজাকার তথাপি হাল ছাড়েনি। বন্দিশালায় পাশাপাশি রুমে থাকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ। প্রকাশ্য দিনের বেলায় না হলেও রাতে তাকে ছাড়া হবে না এমন ধারণা পোষণ করতে থাকে রাজাকারগণ।

ডিসেম্বরের শীতেও বিটকেল হেমায়েত মাথা-কান-মুখ খোলা রেখে ঘুমায়। গলা পর্যন্ত কম্বল জড়িয়ে ঘুমের ভাণ করে থাকে। পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদের মিউজিক স্কুলের অফিসার শের আফজালের প্রশিক্ষণ হেমায়েতকে প্রেরণা যোগায়। আপাদমস্তক কম্বলে মুড়িয়ে শোয়া/ঘুমন্ত সৈনিককে তিনি বুটাঘাতে জাগাতেন। সৈনিকের চোখ বন্ধ থাকলেও যেন কান খোলা থাকে এই প্রশিক্ষণ সেখান থেকেই পাওয়া। সৈনিক কান খোলা রেখে চোখে ঘোমায়। হেমায়েত সে-প্র্যাকটিসই জারি রাখেন ফরিদপুর জেলে। অবশেষে কি ভেবে-চিন্তে যেন দালালেরা হেমায়েতকে ধোলাই দেয়ার পরিকল্পনা বাদ দেয়।

বীর বিক্রম খেতাব

১৯৭৩ সালে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বব্যঞ্জক খেতাবপ্রাপ্তদের গেজেট প্রকাশিত হয়। ফরিদপুরের জেলার মারফত নিজের বীর বিক্রম খেতাবের গেজেট দেখেন হেমায়েত। স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের হৃদয় ঔদার্যে নিজের থেকে মিষ্টি কিনে সবাইকে বিলিয়ে

হেমায়েত শৌর্যের বন্দনা করেন জেলার। তাঁর কথা ঃ 'ব্যক্তি হেমায়েত-এর ফাঁসি হয়ে যায় তো কি হলো, বীর বিক্রম তো জিন্দা থেকে যাবে"। জেলারের মধ্যে অনেকে অত্যাচারী বিহারি বিহারি গন্ধ খুঁজতো। কিন্তু নিজ কর্মগুণে, উচ্চ বংশের আভিজাত্যের শিক্ষার ধারায় তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

বন্ধন মুক্তি

আঠারো মাস হেমায়েত শ্রীঘরের শ্রী বৃদ্ধি করেন। "ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও ব্যারিস্টার জয়নুল আবেদীন (পরবর্তীকালে বিচারপতি) বিনা পারিশ্রমিকে আমাকে জামিনে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসেন।" সঙ্গে ছিলেন অবদান ধন্য মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও কোটালিপাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব একাত্তরের পীস কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শরাফত হোসেন চৌধুরী। এভাবে শত্রু হলো মিত্র। একদলের নির্যাতিত কর্মিকে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠায় হাত করেন অন্যদল। নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধা, আওয়ামী লীগের শেখ-অন্তঃপ্রাণ মিথ্যা মামলা ও চক্রান্তের শিকার হয়ে জেলে যান। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীগ্রুপের সঙ্গে হাত মিলান একাত্তরের পরাজিত শত্রুপক্ষ। আওয়ামী লীগের সমর্থক একজন মুক্তিযোদ্ধাকে জেলে পাঠিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের হুররে হুররে অবস্থা। দুর্ভাগ্য শেখ মুজিবের! আপন দলের পরশ্রীকাতর কুচক্রীদের আদত চেহারা যথাসময়ে তিনি আঁচ করতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধটা যেন ছিল কিছু সংখ্যক স্বার্থপর আওয়ামী লীগারের আখের নির্মাণের বিনিয়োগ। স্বাধীন দেশে তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা ও নিজের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী নিপাতেই ব্যস্ত ছিলেন, দেশপ্রেম যেন পরের ব্যাপার।

পাকিস্তান সৃষ্টিতে যে মুসলিম লীগের একক অবদান, জনগণ যে দলকে পাকিস্তান-গড়া দল বলে জানে, ইতিহাসও ছিল যে-দলের পক্ষে, সেই দলটিই ভেঙেছে সবার আগে। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের লড়াকু দল আওয়ামী লীগের ভাগ্যেও ঘটলো একইরকম পরিণতি। দেশপ্রেমের নামাবলি গায়ে দিয়েও শেষরক্ষা করতে পারলো না দলের, এরই নাম নিয়তি। এতোবড় রাজনৈতিক দলের ভরাডুবি! তাও মাত্র চারবছরের মাথায়!! পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এমন গণসমর্থন ধন্য জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের এত দ্রুত পতন অভাবিত!!! বিশাল হৃদয় ঔদার্যের শেখ মুজিব কাউকে সামলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গঠন করলেন বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ)?। তাদের দৃষ্টিটা ছিল বাংলাদেশের টাকশালের প্রতি। তাই শেষ রক্ষা হলো না। শেখ যেন "মজাইলে আওয়ামী লীগ মজিলে আপনি।" নিজ দলের সুহৃদরা ঘা খেয়ে দল ছাড়তেই বিপক্ষ দলের পোয়া বারো। আওয়ামী লীগের মতো মাটির জারক রসে বেড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলের গোটাকয় অবিমৃশ্যকারীর স্বার্থপরতার (কিংবা ভুলের!) গচ্ছা দিতে হলো পুরো দলকে। তারই সুযোগে স্বাধীন দেশে সামরিক ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে ওঠে একাধিক রাজনৈতিক দল। যতোদিন ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে 'দেশ বড়' ভাববার মতো চিন্তাধারার রাজনৈতিক দলের উন্মেষ না ঘটবে, ততোদিন স্বাধীন বাংলায় কিছু মহৎ ও বৃহৎ ভাবা শোভা পায় না।

জেল জীবন

এ-পর্যন্ত তিনবার জেলে গিয়েছেন হেমায়েত। মাত্র একবারের স্মৃতির আংশিক বর্ণিত হলো। জেলে সময় কাটাতে হেমায়েত কবিতা লিখতেন। তাঁর তেমন কবিতাসমূহ 'আমি এক দুর্বার মুক্তি সেনা', 'বন্দি সেনা', 'স্মৃতি', 'শপথ', পরিশিষ্ট-১ অংশে গ্রন্থিত হলো।

রেফারেন্স ঃ

১. লিখিত বিবরণ - হেমায়েতউদ্দিন, বীর বিক্রম।

২. একান্ত সাক্ষাৎকার - হেমায়েতউদ্দিন, বীর বিক্রম।

৩. একান্ত সাক্ষাৎকার - মাহবুবউদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম।

নবম অধ্যায়

হেমায়েত পরিবার ও মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযোদ্ধা পরিবার

বীর বাঙ্গালির যুদ্ধ ঐতিহ্যের স্বাক্ষর ও বীরত্ব ধন্য পরিবার আছে এই সোনার বাংলায়। মুক্তিযুদ্ধের ১১ নং সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল আবু তাহের, বীর উত্তম পরিবার তার অন্যতম। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে এক পা হারিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সেনাবাহিনী পুনর্বিন্যাসে প্রাণ মন সমর্পণ করেন। সরকারের সাথে নীতিনির্ধারণী মতদ্বৈততায় তিনি সেনাবাহিনী ত্যাগ করেন। তাঁর পুরো পরিবার যুদ্ধ ঐতিহ্য ও সংগ্রামের এক অপার বিস্ময়ের রূপকথার মত। এমনি আর এক অমিততেজা-যোদ্ধা পরিবারের সন্তান হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম।

রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি উপন্যাস ও তার নাট্যরূপ 'বিসর্জন' আত্মৎসর্গের জন্য প্রয়োজন পড়ে রাজ রক্তের। মুক্তিযুদ্ধে বিপক্ষের ব্যাপক সমর আয়োজনের বিরুদ্ধে যেন রাজযোদ্ধার রক্তের প্রয়োজন ছিল। হেমায়েত রক্তে ছিল মোগল রাজ রক্ত।

মোঘল রাজ পরিবার ধ্বংস হয়েছে আত্মকলহে। মোঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল পরবর্তী সম্রাট সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক নির্দেশনার অভাব। তখতে সমাসীন সম্রাটের পর কে সম্রাট হবেন তার ব্যাপারে দিল্লির মোঘল সাম্রাজ্য নীরব। ল অব সাকসেশান বা উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জটিলতায় রক্তারক্তিতে শেষ হল মোঘল সাম্রাজ্য। সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্র দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। সম্রাট শাহজাহানের বার্ধক্যে অসুস্থতা দেখা দিলে তাঁর সন্তানদের মধ্যে হানাহানি শুরু। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব মসনদ দখল করে পিতাকে বন্দি করেন। অন্যান্য ভাইদের তিনি একে একে কতল করেন। ঋণের শেষ, ব্যাধির শেষ, উত্তরাধিকার দাবিদার শত্রুর শেষ রাখতে নাই। তাই আওরঙ্গজেব ছলেবলে কৌশলে ভাইদের রক্তপাত দিয়ে সিংহাসন পাকাপোক্ত করেন। মোঘল পরিবারের আওরঙ্গজেব ভাইদের রক্ত সম্পর্কীরা প্রাণে বাঁচতে দূরদূরান্তের দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নেন।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারারই স্বাভাবিক নিয়মে পরবর্তী সম্রাট হবার কথা ছিল। সম্রাট শাহজাহানও বড় ছেলের প্রতি স্নেহকাতর দুর্বল ছিলেন। দারা পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরেই তাঁর থাকার কথা। কিন্তু অধিকাংশ সময় পিতার নিকট থাকার কারণে অন্যান্য ভাইদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। শাহজাহানের পীড়ার সংবাদ গোপন রাখার কারণে সাম্রাজ্যব্যাপী অন্তোষ দেখা দেয়। দারা শুধু শাহজাহানের বড় ছেলে হিসাবেই নয় জ্ঞান গরিমায়, দর্শন শাস্ত্রে, অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবে তিনি প্রজাদের মন জয় করেছিলেন। সাম্রাজ্যের তুঙ্গ অমুসলমান রাজপুত্রদেরও তিনি প্রিয় ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তাই তাঁর কাল হলো।

সামরিক শক্তিবলে সাম্রাজ্যের শাহানশাহের পদ দখল করেন আওরঙ্গজেব। পিতা বন্দি, বড় ভাই দারা হত্যায় তিনি প্রাথমিক নিষ্কণ্টক। পরবর্তীতে তিনি হত্যা করেন ছোট ভাই মুরাদকে। বাংলার সুবেদার দ্বিতীয় ভাই সুজা প্রাণভয়ে পালান আরাকান। সেখানে তিনি সপরিবারে নিহত।

দারার রক্তসম্পর্কের লোকজন প্রাণে বাঁচতে সুদূর বাংলার দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল গোপালগঞ্জে আশ্রয় নেন। মোঘল সম্রাট শাহজাহান পুত্র দারার বংশধর হেমায়েত। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার টুপারিয়া গ্রামে সে মোঘল রাজ বংশের তেজোদীপ্ত রক্ত রেশের পরিবারে হেমায়েত জন্ম। টুপারিয়া গ্রামে কোটালিপাড়ার ৬নং কুশলা ইউনিয়নের অন্তর্গত। দারার বংশের ওয়ারিশান দারাই নামে কয়েক শতাব্দীর নামকরণে চলে। ১৯৭১ সনে এই রাজ বংশ ধারার পরিবার শেখ ঘরানা বংশে পরিচিত। পরিবারের পিতামহ হেলাল উদ্দিনন পুত্র আবদুল করিম মুনশির পুত্র হেমায়েত শৌর্যে গড়ে ওঠে হেমায়েত বাহিনী। পুরো পরিবারের নারী-পুরুষের সবাই যোদ্ধা। যোদ্ধা পরিবারের প্রধান যোদ্ধারা :

ক। পিতা শেখ আবদুল করিম মুনশি ঃ হেলালউদ্দিন পুত্রের জন্মের পূর্বেই পরলোক গমন করেন। পিতার একমাত্র পুত্র আবদুল করিম শৈশবে লেখা পড়ার তেমন সুযোগ পান নি। তিনি পুরোপুরি খোদাভীরু, পাঁচ ওয়াক্তের পাক্কা নামাজি। জ্ঞানী গুণী আলেমদের তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। শর্ষিণার মরহুম পীর নেসারউদ্দিন সাহেবের তিনি প্রিয় মুরিদ।

মোটামুটি সচ্ছল সম্মানিত পরিবারের সন্তান আশৈশব রাজনীতি সচেতন। কোটালিপাড়া থানা এলাকার প্রভাবশালী কৃষক। জীবনের উষা লগ্নের তারুণ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক। পাকিস্তান অর্জনের রাজনৈতিক দল ও মুসলিম স্বার্থের কর্ণধার রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের তিনি সক্রিয় সংগ্রামী সদস্য। যার জন্য চুরি সেই কয় চোর। যে পাকিস্তান বানায় বাঙালি। বাংলার ঢাকায় যে অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের জন্ম। পাকিস্তান আন্দোলনের ভোট যুদ্ধে উপমহাদেশের একমাত্র বাংলায় মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বাংলার মুসলিম লীগের যে ভোটে পাকিস্তান সৃষ্টি। প্রথমে নিশ্চিহ্ন সে রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ। পরের ভোট যুদ্ধে ভাঙ্গে পাকিস্তান। তারুণ্যের রক্তে গড়া পাকিস্তান ভাংতে বার্ধক্যে আবদুল করিমকে অস্ত্র হাতে নিতে হয়।

অমিত বিক্রমে ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধে লড়েন। বাড়িঘর, ভিটেমাটি হারিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মাঠে ময়দানে দিন গুজরান করেছেন। শত হতাশার দৈন্যেও অস্ত্র হাতে যুদ্ধ চালান। পুরো পরিবারকে যুদ্ধের প্রেরণা যোগান।

স্বাধীন দেশে বীর পুত্র গর্বে গর্বিত পিতা লাঞ্ছনার শিকার। স্থানীয় রাজনৈতিক কোন্দলের হয়রানিতে তাঁর দুই পুত্র। দ্বিতীয় পুত্র শামসুল হক জেল থানা পুলিশ মুক্ত হলেও তৃতীয় পুত্র হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রমের বিরুদ্ধে আজো ঝুলছে খুনের কেইস। পুত্ররা শ্রীঘরে। পিতা বুক আগলে রক্ষা করেন পুত্রদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের।

স্বাধীন দেশে স্থানীয় শত্রুতায় মুক্তিযুদ্ধের অত্যুত্তম সূর্য পুত্র হেমায়েতের ঘরদোর ধ্বংস। স্থানীয় ক্রোধান্ধ দানবের হাত থেকে পিতা পুত্রের পরিবার পরিজন বাঁচান। শত প্রতিকূলতার মাঝে পিতা হেমায়েত পুত্রের পরিজন বুক আগলে রক্ষা করেন। সর্বংসহা মোজাহেদের বিমূর্ত রূপ হেমায়েত-পিতা আবদুল করিম।

বৃদ্ধের বড় পাওনা দুটি স্বাধীন দেশের সাধ। ১৯৪৭-এর পাকিস্তান আর ১৯৭১-এর স্বাধীন বাংলা। স্বাধীন বাংলার আলো হাওয়ায় নয়ন মুদে তিনি ধন্য। ১৯৯৩ ইংরেজি, ১৪১৩ হিজরী তেইশ (২৩) রমজানের পুণ্য তিথিতে তিনি জান্নাতবাসী হন। মৃত্যুকালে তার বয়স একশত ছয় (১০৬)।

খ। মা সখিনা বেগম ঃ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। হেমায়েত পরিবারের মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণার উৎস সখিনা বেগম। হেমায়েত পত্নী হাজেরা আত্মোৎসর্গের পথে সবার জন্য নির্দেশনা দেন। প্রিয় পুত্রবধুকে হারিয়ে সিংহিনীর তেজে গর্জে উঠেন সখিনা। তাঁর সংগ্রাম দুস্তর বাধার পথে পরিজনের সাথে পথে প্রান্তরে যুদ্ধ কারবালার সখিনার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। হেমায়েতের প্রথমা পত্নী হাজেরার পুত্র সোয়া বছরের দুধের শিশু হাসিবকে পাষাণভার বুকে চেপে পুত্র হেমায়েতকে তিনি যুদ্ধে পাঠান। স্রোতের শেওলাসম স্বামী-পুত্রবধূ-পুত্রের দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের নিয়ে অনিশ্চিতের পথে তাঁর যাত্রা। তবু অস্ত্র হাতে সর্বত্র তাঁর যুদ্ধ। যুদ্ধ প্রস্তুতিতে, যোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা, সেবা, শুশ্রূষা, আহার-পথ্য-বাসস্থান সংগ্রহে তাঁর সময়ের মূল্যবান অংশ গেছে। সর্বদা আঁচলে ছিল লোডেড অস্ত্র আর হাতে ধারালো বটি দা। যুদ্ধ প্রেরণা-দাত্রী মংগলময়ী মাতৃমূর্তির তিনি জীবন্ত প্রতিমূর্তি। নয়টি বছর বুকের দুধে পালা দুরন্ত হেমায়েত তাঁর জীবনের গর্ব-বিস্ময়-অহংকার। মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত ইতিহাস খ্যাত। বীর বিক্রম মুক্তিযোদ্ধার মা হতে পারার মধ্যে তিনি ধন্য ও বরেণ্য। পুরো হেমায়েত বাহিনী তাঁকে মায়ের আসনে সশ্রদ্ধ সালামে শ্রদ্ধা নিবেদন করতো। সত্যিকার অর্থেই তিনি মুক্তিমাতার গর্ব। তিনি আদর্শ ও পূজনীয় মুক্তি জননী।

স্বাধীন দেশে গর্বিতা মা দেখেন নিষ্পাপ যুদ্ধাহত পুত্র খুনের আসামি। স্বাধীন দেশের ফাটকে আটক পুত্রের ঘর ভাঙ্গে একাত্তরের বিজিত শত্রু। সকল দুর্যোগে তিনি পুত্রের সংসার আগলান। হেমায়েতের ধর্মান্তরিত দ্বিতীয় বধূ সোনেকা রাণী রায় ওরফে সোনেকা হাজেরাকে বুকে তুলে নেন সখিনা বেগম। স্বামীর অবর্তমানে সোনেকা হাজেরা শাশুড়ি সখিনা বেগমের আশ্রয়ে সন্তান সন্ততি নিয়ে রক্ষা পান। দুর্যোগে বরাভয় দাত্রীর মত তিনি মুক্তিযোদ্ধা পুত্র হেমায়েত সংসার আগলে রাখেন।'

আজ বয়সভারে সখিনা বেগম ন্যুব্জ। তিনি শতাব্দীর মহীরুহ। শতায়ু উত্তরে তিনি বেঁচে আছেন। দু একপা করে হাঁটতে পারেন। মাথার যন্ত্রণায় তিনি কাতর। এ পোড়ার দেশে কে লইবে তাঁদের চিকিৎসার ভার! বরিশাল, খুলনা, ঢাকার ডাক্তাররা দেখেও তাঁকে নিরাময় করতে পারেন নি। এদেশ, এ জাতি ও মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি প্রাণ ভরে দোয়া করেন। দেশ স্বাধীন দেখে যেতে পারার বাইরে তাঁর বাড়া আনন্দ নাই।

কৃতজ্ঞ মুক্তিবাহিনী, এদেশ ও এ জাতির পক্ষ থেকে মুক্তি জননী সখিনা পাদপদ্মে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আল্লাহ তাঁকে নিরাময়, সুস্থ ও সালামতে রাখুন। জয়তু, মুক্তি মাতা সখিনা বেগম। তুমি বিপদে অবলা বঙ্গ ললনার সবলা নিদর্শন।

গ। **আমেনা খাতুন ঃ** হেমায়েতের বড় বোন আমেনা খাতুন। তাঁর স্বামী জিন্নাত আলি বিশ্বাস। মোদাচ্ছের হোসেন বিশ্বাসের পুত্র জিন্নাত, নিবাস : গ্রাম-বর্ষা পাড়া, থানা-কোটালিপাড়া, জিলা-গোপালগঞ্জ। ১৯৭১ সালে জিন্নাত আলি আর্মির হাবিলদার ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে স্বামী-স্ত্রী বন্দি পাকিস্তানের মুলতান।

ঘ। **মোমেলা খাতুন ঃ** হেমায়েতের ছোট বোনের নাম মোমেলা খাতুন। তাঁর স্বামী মোঃ বাদশা মিয়া তালুকদার। বেলায়েত হোসেন তালুকদার-এর পুত্র বাদশা মিয়ার নিবাস : গ্রাম-সেনারগাতি, থানা-কোটালিপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ। স্বামী-স্ত্রী দুজনই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। ঘর সংসার ছেড়ে রণাঙ্গণকেই বাসর অঙ্গন করে নেন দম্পতি। যুদ্ধ বিরতির ফাঁকে তিনি মুক্তিদের রান্না-বান্না, আহার বাসস্থানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। রোগে-শোকে মুক্তিরা তাঁর মত মায়ের হাতের সেবা-শুশ্রূষার, যতন আদরের পরশে চাঙ্গা হতো। যুগল দম্পত্তির মরণ পণ যুদ্ধ মুক্তি যোদ্ধাদের প্রাণে প্রেরণার উৎসাহ যোগাত। স্বামী প্রেমের সাথে দেশপ্রেমকে তিনি একাত্ম করে নেন। পরাধীন দেশে গোলাম সন্তান জন্ম দেয়ার মধ্যে তিনি নারীত্বের মাধুর্যের মহিমা খুঁজে পান নি। তাই অস্ত্র হাতে তাঁদের সশস্ত্র যুদ্ধ। দম্পতির স্বপ্ন সফল হয়েছে। 'ধন নয় মান নয় একটুকু আশা'র ভালবাসার বাংলাদেশই তাদের চরম ও পরম পাওয়া। এমন স্বাধীনতা অন্তপ্রাণ দম্পতি যে দেশে জন্মাবে সে দেশ অজেয়। অনাগত ভবিষ্যতের জাতীয় দুর্দিনে মোমেলা খাতুনরা এদেশের নারী জাতিকে, প্রেমিক পুরুষকে প্রেরণা জোগাবেন। তাঁদের মঙ্গল হোক।

ঙ। **বড় ভাবি মরিয়ম বেগম ঃ** তাঁর দায়িত্ব সময় অসময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাক করা। দেবর হেমায়েতের জন্য দ্বিতীয় স্ত্রী তন্বী হাজেরা বাগাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। হিন্দু মেয়ে হাজেরাকে মুসলমান ও ইসলামি কায়দা রপ্ত করাতে তাঁর ভূমিকা অনন্য। প্রথমা স্ত্রী হাজেরা বিহনে শূন্য ঘর হেমায়েতের দ্বিতীয়া স্ত্রী জুটাতে তার ঘটকালি কাজ দিয়েছে। তাঁর অন্য রিচয় তিনি একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা।

চ। **মেঝ ভাবি মজিদা বেগম ঃ** সময়-অসময়ের শ্রান্ত-ক্লান্ত অতিথি মুক্তিযোদ্ধাদের মান অভিমান ভাঙ্গিয়ে খাওয়ানো ছিল মজিদা বেগমের কাজ। মুক্তিযুদ্ধের দূতের কাজ, সংবাদ বাহন, মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তার প্রহরায় তিনি বিনিদ্র রজনী কাটাতেন। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর হাতের স্পর্শে তাদের হারিয়ে যাওয়া পিছনে ফেলে আসা মায়ের স্নেহ চোখের জল ফেলে তাঁকে সালাম করে আখেরি দোয়া নিয়ে যুদ্ধে যেত। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে তিনি ধন্য।

ছ। **স্ত্রী সোনেকা রাণী রায় ওরফে হাজেরা খাতুন ঃ** প্রথমা স্ত্রী হাজেরা খাতুন মুক্তিযুদ্ধের প্রথমে গুলিতে আত্মাহুতি দেন। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত মেয়ে সোনেকা রাণী রায়ের স্থান হেমায়েত পিতা-মাতার আশ্রয়ে। স্টেন,

পিস্তল, রাইফেল, লাইট মেশিন গান জাতীয় অস্ত্রপাতি নাড়াচাড়া, খোলনা জোড়নার খেলাচ্ছলে জিদের বশে দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সকলের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ। বহুতর সম্মুখ যুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ হন। একাধিক যুদ্ধে হেমায়েতের সঙ্গে ফ্রন্টাল যুদ্ধে রাইফেল রেঞ্জের আওতায় যুদ্ধ করেন। শত্রুর দেখার দূরত্বে ভূশয্যা, ক্রলিং, রানিং পজিশনে মরণ পণ যুদ্ধ খেলায় মেতেছিলেন।

আহত বীর মুক্তি হেমায়েত সেবায় তনুমন উজাড় করে দেন। মানুষ যে মানুষকে এমন উদয়াস্ত বিনিদ্র সেবা করতে পারে সোনেকাকে না দেখলে তা বুঝা যেত না। মানুষ মানুষকে কেমন ভালবাসার সেবা দিতে পারে তার বেনজির নজির সোনেকা। নিজের অজান্তে বীর পূজারিণী হেমায়েত প্রেমে বন্দিনী সোনেকা। হেমায়েতের এতিম পুত্র দুগ্ধপোষ্য হাসিবকে মাতৃস্নেহে বুকে তুলে নেন সোনেকা।

আপন পিতা-মাতার সকল অনুরোধ উপদেশ উতরে তিনি অনিশ্চিত মৃত্যু পথ যাত্রী মুক্তিযোদ্ধা শিবির ছাড়লেন না। পাকিস্তানি হায়েনার লোভাতুর আক্রমণ থেকে উদ্ধার কর্তা মুক্তিদের ছেড়ে তিনি গেলেন না। প্রেম বিজয়িনী শেষ পর্যন্ত হেমায়েত-ঘরণী। তাঁদের যুদ্ধ, প্রেম, পরিণয় যেন মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত নাটক। স্বাধীনতা উত্তর শত ঝড়ঝঞ্ঝায় সোনেকা হেমায়েতের ভালবাসার সংসার টিকে আছে। তাঁর প্রেম বিজয়িনী সংসার অক্ষয় হোক। তাঁর নিখাদ সোনার মত ভালবাসার সংসার মুক্তিযুদ্ধের ভালবাসার আদর্শ চিত্র। যুগে যুগে তিনি বীর পূজারিণী বঙ্গ রমণীর আদর্শ। তাঁদের ভালবাসা অমর হোক, পুণ্যের হোক, ধন্যের হোক।

ঞ। চাচাত/মামাত/খালাত ভাই বোন : তাঁদের সকলেই অস্ত্র চালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সকলেই তাঁদের শ্রম, সেবা, সশস্ত্র যুদ্ধে নিয়োগ করেন। তাঁরা এজাতির নমস্য। গাই তাঁদের জয়গান।

ঝ। বড় ভাই মোঃ নজির হোসেন : সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। হেমায়েত বাহিনীর আর্মারার। অস্ত্রপাতি মেরামত ছিল তাঁর প্রধান কাজ। ছোটখাট অস্ত্রাদি তৈরিতে তিনি সুদক্ষ। মুক্তি সুবেদার আলি আহমদের সঙ্গে অস্ত্রাগার বা ম্যাগাজিনের দায়িত্বে ছিলেন। মুক্তি যোদ্ধার পরিচিতিতে সুবেদার আলি আহমেদ ও নজির সাহেবের মত গেরিলাদের বলা হতো আর্মারার কোম্পানির লোক। আশ্চর্য হলেও সত্য হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্রাগার ছিল চলমান ভাসমান। নৌকায় নৌকায় থাকতো অস্ত্র গোলা বারুদ। চলমান নৌযানে বসেই আর্মারার অস্ত্র মেরামত করতেন। মুক্তি অস্ত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :

ক। পিস্তল; খ। রিভলবার; গ। এয়ার গান; ঘ। পয়েন্ট (২২) বোর রাইফেল; ঙ। সিঙ্গিল বন্দুক; চ। স্টেনগান; ছ। মার্ক থ্রি (৩) রাইফেল; জ। মার্ক ফোর (৪) রাইফেল; ঝ। ব্রিটিশ-স্টেন গান; ঞ। চায়নিজ স্টেন গান; ট। চায়নিজ এল এম জি; ঠ। ব্রিটিশ এল এম জি; ড। এইচ এম জি; ঢ। ২" ইঞ্চি মর্টার; ণ। ৩" ইঞ্চি মর্টার; ত। ব্রাডার সাইড এবং থ্রি নট থ্রি ব্রিটিশ রাইফেল।

মুক্তি অস্ত্রের সংখ্যা ছিল বেশুমার। পাইপগান, পাইপ পিস্তল, হাতবোমা ইত্যাদি

নিজের হাতে বানাতেন নজির হোসেন। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার বিদ্যা ষাটোর্ধ্ব নজির হোসেন আজো ভুলেন নাই। দুর্ভাগ্য এদেশ ও জাতির মুক্তিযোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা স্বাধীন দেশে কাজে লাগান হলো না। নজির হোসেনের মত আর্মারারদের কাজে লাগালে সরকার ও দেশের উপকার হতো।

ব্যথিত যোদ্ধা ঃ সোনার বাংলার সোনার স্বপ্নে বিভোর যোদ্ধা আজ ব্যথিত বেদনাহত। দেশের বিপর্যস্ত অবস্থা যোদ্ধাকে লাঞ্ছনার ধিক্কার দেয়। মুক্তিযোদ্ধার শূন্য হাত আবার গর্জে উঠতে চায় স্বাধীনতা যুদ্ধের অস্ত্রের জন্য। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল সুখের আশায়। দুমুঠো ভাত, রাতের ঘুম, মা-বোনের ইজ্জত, বস্ত্র ও শিক্ষার জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ। চাওয়া আর পাওয়ায় আকাশ পাতাল তফাত। "স্বাধীনতা স্বপ্ন মদির" জাতির আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে অস্ত্র হাতে নেয়ার সৌভাগ্য কজনের হয়! আমরা ইতিহাস সৃষ্টির গৌরবে ধন্য।"

স্বাধীনতা যোদ্ধার আশাহত বেদনার জ্বালা অন্যে বুঝবে না। আজ ফালতু মাতবরে দেশ ছেয়ে গেছে। জনগণ কল্যাণ আজ ব্যক্তি কল্যাণে পর্যবসিত। জাতির চেয়ে দল বড়। স্বাধীন দেশে সবাই ধনে জনে বড় হবেন। যোগ্যতার মানদণ্ডে মানুষের বিচার হবে। স্বাধীনতা যোদ্ধার যোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত হবেন। হবার ছিল কি আর হলো কি? স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে চাইলাম কি আর পেলাম কি? স্বাধীনতা যোদ্ধাদের হাতেই দেশ পরিচালনার ভার থাকার কথা। মা ছাড়া যেমন সন্তান প্রসবের বেদনা অন্যে বুঝে না। তেমনি সত্যিকার সশস্ত্র, সম্মুখ কাতারের আত্মোৎসর্গী গাজি-যোদ্ধাহত ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের বেদনা 'ষোড়শ ডিভিশন' মাসির বাড়ির খাসি শরণার্থী নামের আলতু ফালতু ভুয়া যোদ্ধা বুঝবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে ধনী ব্রিফকেস ব্যবসায়ী বাংলাদেশে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে। রণাঙ্গণ থেকে বহু দূরে পাকিস্তানের পবিত্র ভূমিতে বহাল তবিয়ত যুদ্ধকালে কাটিয়েছেন বহু বাঙ্গালি সেনা-অফিসার। অনেকে অনেক অবিচার করেছেন। ছুটিতে অনেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছেন। প্রিয়জনকে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মেম্বার বানিয়ে বাঙালি হত্যায় হাত কলংকিত করেছেন। ছুটি শেষে তাঁরা তাঁদের পবিত্র ধাম পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেছেন। এসব কুলাঙ্গারদের আংশিক পরিচয় আছে "মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান" মেজর (অবঃ) এএসএম সামছুল আরেফিন লিখিত বইতে। এ-সব পাকিস্তানি ভক্ত বাহ্যত বেশ সুশৃঙ্খল। দখলদার আমলে নিজেদের কার্যকলাপে তাঁরা নীরব। সংস্কার অতি দরদের মত বাংলাদেশ প্রেম তাঁদের এককালে উপচে পড়ত। প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতির বুটে চুমা দেয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তেও তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগত। ভাই হয়ে ভাইকে ক্ষমা করার মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট হৃদয় ঔদার্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে ছদ্মবেশী মীরজাফর। তাঁরা জিরো থেকে হিরো, মেজর থেকে জেনারেল। এককালে তাঁরা লোক দেখানো কুম্ভিরাশ্রু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ফেলতেন। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তাঁদের মায়ের মার, পুত্রশোক! তাঁরা ভুলেও কি ফিরে তাকান মন্দভাগ্যের মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে! যুদ্ধাহতের বেদনা কি তাঁরা বুঝেন! ! হায় দুর্ভাগ্য স্বাধীন

দেশের!!! ক্ষমতার মোহে সুচতুর কৌশলের চাতুর্যে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের নামে প্রহসনে ফাঁসিতে লটকায়। মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তর্কলহের কোন্দলের সুযোগ নেয় সুযোগ সন্ধানী।

যুদ্ধে কার চেয়ে তো নজিরের মত দুর্ভাগাদের বাহাদুরি কম ছিল না। যুদ্ধের কল্যাণে ভাগ্যবানদের কেউ কি পিছন ফিরে তাকান বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে! হেমায়েতের মত স্মরণীয় যোদ্ধা রাজনৈতিক কোন্দলে খুনের আসামি। এই ত স্বাধীনতা যোদ্ধার পুরুস্কার!!

নজির হোসেনের স্ত্রী মরিয়ম বেগম ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের কোয়াটার মাস্টারের মতো। তাঁর সবচে বড় দায়িত্ব ছিল সময় অসময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না-বান্না করা। মায়ের আদরের স্নেহে তাদের খাওয়ানো। প্রিয়জন হতোদ্যমে কিশোর যোদ্ধাদের মা-বোনের আদর-যতন, ক্লান্ত, আহতদের সেবা শুশ্রূষায় চাঙ্গা করা।

জনবলের বাইরে বল নাই। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ বলেই বাঙ্গালি স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষ আইনের শাসন বঞ্চিত বিধায় জনবলকেই অস্তিত্বের হাতিয়ার ধরে নেয়। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই অন্তর্নিহিত সত্যকে না বুঝলে তা রোধ করা যাবে না। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে কাগজে, বাস্তবে নয়। তাই ত গাড়িতে, বাড়িতে, রাস্তায়, বাজারে, শহরে মানুষের এত ভিড়। ষাট বছরের মুক্তিযোদ্ধা নজির আট মেয়ে ও চার ছেলের জনকে ধন্য। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোনদের একই দশা। কেউ কারে নাহি হারে সমানে সমান। সন্তান প্রডাকশনে সবাই উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁদের তিন ভাই ও দুই বোনের সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত।

সৌখিন দলিলকার খোঁজে ইতিহাসের খাস দলিল। প্রত্যক্ষ সশস্ত্র যোদ্ধাদের রক্ত আখরের অভিজ্ঞতার জবানিতে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যত ইতিহাসের মূল দলিল। বড় বড় নামি-দামি, রাজা-বাদশা, উজির-নাজির, শিল্পপতি,স্থপতি, রাজনৈতিক, সেনাপতিদের নিয়েই তো ইতিহাস। প্রচুর ধন-দৌলত, বাড়ি-গাড়ির মালিকদেরই মানায় ইতিহাস। সাধারণ জনতা, সর্বহারা গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা আবার ইতিহাস কি? ইতিহাস মানেই তো বড়লোকের কথা। ছোট লোকের আবার ইতিহাস কি? সাধারণ গরিব যোদ্ধার ইতিহাস ছোট বড় কথার খৈফুটানির অরণ্যে রোদন মাত্র।

লাখো শহিদের বেদনার সমাধিতে বেঁচে আছি। মুক্তি যোদ্ধারা যুগ যুগ লালিত বাঙালির স্বপ্ন সাধ স্বাধীনতার রূপকার। স্বাধীন দেশের আলো বাতাসে বেঁচে থাকার মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সত্যিকার ইতিহাস আজ হোক, কাল হোক, ভবিষ্যতে একদিন না একদিন সত্যি কথা কইবে নীরবে। ইতিহাসের তুচ্ছাতিতুচ্ছ মালমশলা রেখে গেলাম। জয়তু স্বাধীনতা, জয়তু মুক্তিযোদ্ধা।

ঞ। **মেঝ ভাই শামসুল হক ঃ** হেমায়েতের মেজো ভাই সশস্ত্র ব্যবস্থাপনা ও কর্মজীবনে সাফল্যের স্বাক্ষর ধন্য। তিনি নিজেই যেন একটি জীবন্ত ইতিহাস।

শৈশব ও শিক্ষা ঃ আশৈশব মাতা-পিতার একান্ত ভক্ত শামসুল হক। পিতার মৃত্যুকালেও আশীর্বাদ ধন্য পুত্র। দাদির সবচেয়ে আদর পেয়ারে মানুষ। ছোট বেলায়

শান্ত শিষ্ট, কম জ্বালাতনের দুষ্ট প্রকৃতির না হওয়ায় দাদির নেওটা। তিনি তাঁর নাতিকে ছোট বেলায় স্কুলে আনা নেয়া করতেন। সুদূর অতীতের পূর্ব পুরুষ মোঘল সম্রাট শাহজাহান তনয় দারা মার্কা ফাঁড়ার মত ছোট ছোট কি যে চিন্তায় থাকে নিজেও বুঝে না, কাউকে বুঝতেও পারে না। সহপাঠী ও প্রতিবেশীরা খেলাধুলায় ডাকে। আমোদ ফূর্তির খেলায় তার মন বসে না, ভাল লাগে না। মোল্লা মার্কা চিন্তার ছেলেকে আল্লাহর হাওয়ায় পিতা ভর্তি করিয়ে দেন স্থানীয় কুশলা নেছারিয়া মাদ্রাসায়। দু বছর সেখানে পবিত্র কোরান শিক্ষা করেন। সেখানে বাংলা ও ইংরেজি পড়াশোনার মাধ্যমে ধীর লয়ে মনমানসিকতায় ঔদার্য আসে। ফিরে আসেন প্রাইমারি স্কুলে। পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা দেন। প্রাইমারি শেষে মাঝবাড়ি হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি। সে স্কুলে থেকে ১৯৬১ সনে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক এবং গোপালগঞ্জ কায়দে আজম কলেজ মানবিক শাখায় নিয়মিত পরীক্ষায় ১৯৬৩ সালে আই এ পাস করেন তিনি।

নেতৃত্ব ও শখ : স্কুল জীবন থেকে রাজনীতির প্রতি ঝোঁক। নবম শ্রেণী থেকে ক্লাস ক্যাপ্টেন। পাঠশালাকে ভাবেন নাট্যশালা। তাই স্কুল জীবন থেকে শৌখিন নাট্যকার। অধ্যয়নের ফাঁকে নাটক-যাত্রার মেতে থাকতেন। সে যুগে আজকের মত টেলিভিশন ভিসিআর ছিল না। তাই জনতা নাটক থিয়েটার যাত্রার নাট্যাভিনয়ে মেতে উঠতো। স্থানীয় জনতা সে সবের বেশ কদর করতো। এলাকার যাত্রা জগতে সফল অভিনেতা শামসুল হক। প্রায় দুশ নাটকের মঞ্চ অভিনয়ের দক্ষতা ধন্যে এলাকায় পরিচিতির জনপ্রিয়তা। বেছে বেছে সামাজিক নাটকের বিদ্রোহী নায়কের পাঠে অভিনয়। নাটকের জগৎ বৃহত্তর কর্ম জীবনের সন্ধান দিয়েছে। মঞ্চ জগৎ বাস্তব জগতের শিক্ষার সাথে পরিচয় করিয়েছে। কে জানতো এই নাটকের বিদ্রোহী বিদ্রোহী খেলা এলাকার মুক্তি বিক্ষুদের প্রেরণায় অংকুরের কাজ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিদ্রোহী ধূমকেতু হেমায়েত এসব নাটকে ভবিষ্যতের প্রেরণা পেতেন। ফরিদপুর-গোপালগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধের বিদ্রোহী চেতনায় মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিকতায় ঘা মেরে প্রস্তুতি পর্বে তাদের সংহত করতে সামাজিক চেতনার বিদ্রোহী নাটকগুলি বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। কিছুটা নাটকের বাউণ্ডেলিপনার সাথে আর্থিক অসচ্ছলতার দোহাইতে লেখা পড়ার ইতি। এবার কর্ম সংস্থান সন্ধান।

সন্ন্যাসী জীবন : মা-বাবার কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে কর্ম ও অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে সোজা রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন। সাথের সম্বল একুশ টাকা। প্রাদেশিক সচিবালয়ে চাকরির খালাত ভাই আবদুল মালেক হাতে বিশ টাকা সঞ্চিত রেখে অবশিষ্ট এক টাকা হাতে ঢাকার মুক্ত আকাশের রাজপথে বেরিয়ে পড়েন। সাথের সম্পদ এক বিছানার চাদরের সাথে এক বালিশ। অভিমানী বিদ্রোহী ঢাকায় কোন আত্মীয়ের আশ্রিত গলগ্রহ হলেন না। ফুটপাতে রাত কাটে। দিনে অচেনা জায়গায় শ্রমিকের কাজ। কঠিন জীবন সংঘাতে সাড়ে তিন মাস ঢাকায়। অবশেষে ফুটপাতের এক দোকানদারের সাথে আকস্মিক পরিচয় তাঁর, কাছাকাছিই তাঁর বাড়ি। পাক সরকার তাঁর জায়গা একোয়ার করে নিয়েছে। দোকানদারিতে তাঁর সংসার চলে।

ব্যবসার হাতে খড়ি ঃ দোকান মালিকের সাথে চুক্তিতে কারবার শুরু করেন তিনি, মাসিক দেড়শ টাকার বিনিময়ে সমান দোকান ভাড়া। দোকানের চলতি পুঁজি পাঁচ শ' টাকা মাত্র। রাতে দোকান বুঝে নিয়ে সকালে দোকানদারি শুরু। দোকানের অবস্থান গুলশান কনস্ট্রাকশন সাইটে। প্রথম দিন ক্ষুদ্র দোকানের বিক্রি হয় নব্বই টাকা। দৈনিক দিন মজুরই দোকানের খরিদ্দার। তিন মাসে আয় ব্যয়ের খতিয়ান হয়। মালিকের দেড় শ টাকা, নিজের খরচার বাইরে বাড়িতে ১২০০ টাকা পাঠাতে পেরে তিনি আনন্দিত হন। স্বচ্ছল দোকান চলছে ভাল। আয় উন্নতি বাড়ছে। ব্যবসার প্রসারের সহযোগিতায় বড় ভাই মোঃ নজির হোসেনকে দেশ থেকে আনান তিনি। দারা রাজ রক্তের বড় ভাই সবকিছু দেখেশুনে ক্ষেপে ওঠেন। লেখা পড়া তো চাকরির জন্য। ব্যবসার চেয়ে চাকরি বেশি সম্মানের। অকস্মাৎ হুলিয়া জারিতে তাঁর দোকান ত্যাগ। যদি তুমি কোন দিন চাকরি কর সে দিন বাড়ি এস। নচেত তোমার সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নাই। তোমাকে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম কি দোকানদারির জন্য, না চাকরির জন্য? শুনতে হাসি পেলেও রাজরক্তের নেশা ও পেশাই আলাদা। সেদিনের শিক্ষিত বাঙালি মানসিকতা ছিল চাকরির কাঙ্গাল। স্বাধীন পেশার খাটনির ব্যবসা বাণিজ্যিকে তারা অসম্মানের ভাবতো। বাঙালি মানসিকতার সে শূন্য মানসিকতা পূরণ করেছে বহিরাগত অবাঙালি বিহারি। তাই নিজ দেশে বাঙালি পরবাসী।

বড় ভাই ব্যবসা ছেড়ে যেতেই ছোট ভাইয়ের মাথায় হাত। এবার পরিবারচ্যুত-সমাজচ্যুত হবার ভয়। হায়রে ব্যবসা-বনাম চাকরি। যায় দিন...।

চাকরির সন্ধান ঃ ঢাকা মোহাম্মদপুর রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলে কাজ করেন দোকানের এক খদ্দের। তাঁর সাথে ব্যবসার লেনদেন হত ইংরেজিতে। তাঁকে শিক্ষাগত যোগ্যতার বায়োডাটা দিয়ে চাকরির সন্ধান চেয়েছিলেন। অফিসের পথে অকস্মাৎ তিনি রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের স্টেশনারি স্টোরের চাকরির সন্ধান দিতেই লুফে নেন। দোকান বন্ধ করে তাৎক্ষণিক ইন্টারভিউর জন্য যাত্রা করেন। ভিজিটর রুমে বসে প্রিন্সিপালের সাক্ষাৎকার পর্ব। স্বল্প সময়ে সাক্ষাৎকার। অধ্যক্ষের নাম মেজর মোহাম্মদ মঞ্জুরুর রহমান। সংক্ষেপে এম এম রহমান। পাকিস্তানি আর্মি এডুকেশন কোর থেকে ডেপুটেশনে তিনি মডেল স্কুলে।

সালাম দিয়ে দাঁড়াতে উষ্ণ করমর্দন। সামনের চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে আগমনের অভিপ্রায় জানেন। ইংরেজিতে সাক্ষাৎকার পর্ব। জীবনের প্রথম ইন্টারভিউর নির্ভুল উত্তরে অধ্যক্ষ তুষ্ট। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতার গুণাগুণে উতরালেন। রাগত দর্শন কর্কশ রুক্ষ মেজাজের বিহারি মার্কা চেহারার অধ্যক্ষের অকস্মাৎ সোজা প্রশ্ন, "চাকরি দিলে চাকরি করবেন তো? সে অধ্যক্ষের মুখের দিকে চাইতে স্টাফ মাত্র ভয়ে জড়সড়। সে বাঘের খাঁচায় তাঁর চাকরি।

১৫ নভেম্বর ১৯৬৩ চাকরিতে যোগদানের নির্দেশ। বেতন মাসে পঁচাশি টাকা। ফুডিং এলাউন্স অতিরিক্ত ষাট (৬০) টাকা। অবিবাহিতের বাসস্থান ফ্রি। ১৩ নভেম্বরের ইন্টারভিউতে স্বপ্নের পাকা চাকরি হয়ে যায়।

ব্যবসার ইতি : দোকানের মালিককে ডেকে চাকরির কথা বলতেও আনন্দের আমেজ এল না। দোকান বুঝে নেবার উত্তরে তাঁর আবদার। আপনার সহায়তায় তুষ্ট হয়ে মহাখালিতে এক লক্ষ টাকার পুঁজিতে দোকান ঠিক করেছিলাম। চাকরির আরাম পেয়ে থাকবেন না জানি। তবু একবার ভেবে দেখার অনুরোধ করি। গত পরশু আপনার ভরসায় নতুন দোকান নেয়া। এবার সে দোকান চালাতে বিকল্প কাউকে খুঁজতে হবে। দোকান বুঝিয়ে দেয়ার শেষ ফলে ত্রিশ টাকা মালিককে দেনা। সে পাওনা তিনি নিলেন না। বন্ধুর উপদেশে বলেন চাকুরিতে যোগ দিলে সাথে সাথেই বেতন মিলে না। বর্তমান সম্বলের বিছানা পত্রে মডেল স্কুল পরিবেশে চলবে না। কোথায় কিভাবে থাকবেন দেখে পৌঁছে দিতে চাইলেন। চোখের জলে নিবেদন, "হক সাহেব ভুল করলেন। আপনার মত উত্তম মানুষের জন্য দোয়া রইল। আপনি বড় হবেন। সুখে থাকবেন।" ব্যবসার পার্টনারকে যোগ্য মুরব্বির ভূমিকায় নিয়ে যান কাওরান বাজার। প্যান্ট, সার্ট, জুতা-মোজা, লেপ-তোষক-চাদর কিনলেন নিজের পয়সায়।

মডেল স্কুলের কর্মস্থলে দুজনই এলেন। হক চাকরিতে যোগ দিলেন। জীবনের একান্ত বিশ্বস্ত ব্যবসা পার্টনার সবকিছু ঘুরে ফিরে দেখে তুষ্ট হন। বিদায় লগ্নে বন্ধুর আন্তরিকতায় পঞ্চাশ টাকার নগদ সাহায্য। কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিতে মনের দুয়ার খুলে দোয়া। বন্ধুত্বের দাওয়াতে, "আপনার সততার বিশ্বস্ততায় বিমুগ্ধ। মাঝে মধ্যে বেড়াতে এলে প্রীত হবো। টাকার প্রয়োজনে চাইলে না দাবিতে পাবেন।" আপন সুহৃদের বিদায়।

আবাসিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির গোমর : চাকরির জীবন শুরু। থাকার স্থান ডি-টাইপ কোয়াটার। এক কক্ষের পাশে বাথ রুম। আসবাবপত্রের মধ্যে খাট, টেবিল, চেয়ার স্বাভাবিক নিয়মে পাওয়া গেল। প্রাথমিক অভ্যর্থনা রাজকীয়। অফিসের গাড়িতে পিয়ন আনেন আবাসিক কোয়াটারে। আশাতীত কোয়াটার পেয়ে খুশি। এলটি আসার পূর্বেই ধুয়ে মুছে রুম খাট সব ঠিকঠাক তকতকে ঝকঝকে করে রাখা হয়। খাটের সাথে মশারি খাটিয়ে থাকার উপযোগী করে রাখে। প্রথম কর্মদিবস যোগদান পত্র জমাতে সীমাবদ্ধ থাকে। আবাসস্থলে পৌঁছে দিয়ে অফিস পিয়ন বিদায়। বাইরে যতই জঘণ্য চিত্রেই হোক দক্ষ প্রশাসক অধ্যক্ষ মেজর এম এম রহমানের প্রশাসনিক কর্মতৎপরতার এ সামান্য নমুনা মাত্র।

নতুন পরিবেশে চতুর্দিকে তাকিয়ে মনে আনন্দ আসে। এত সুখ সইলে হয়। সুখের ঘুম আসে না। দুটা বাজার পাঁচ মিনিটেই কোয়াটার এলাকার কর্মসাথী আট জনের মত এলেন। খাবার টেবিলে সবার সাথে আলাপ পরিচয়। কলিগ মোহাম্মদ আলির বাড়ি গোপাল গঞ্জের কাশিয়ানি থানার ফুকরা। দেশী মানুষ পেয়ে মনটা চাঙ্গা হয়। পাকিস্তানি টাকায় মেসের খাবার চার্জ পড়ত মাসে ষাট টাকা। দেশীয় মাধ্যমে স্কুল বার্তা। এক পেশে বার্তা। আবাসিক প্রতিষ্ঠান রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল, ক্যাডেট কলেজের মত প্রতিষ্ঠানে বার্তা একটাই অধ্যক্ষের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার। অধ্যক্ষ এম এম

রহমান অত্যন্ত কড়া মেজাজের নিষ্ঠুর মানুষ। যে কোন সময় যে কোন স্টাফকে অপমান করতে দ্বিধা করে না। অধ্যক্ষের এ হলো বাহ্যিক প্রচারণা। কে যে কি চুরি বিচ্যুতির অপকর্মে ধরা পড়ে ঘায়েল হন তার কোন উল্লেখ কেউ করে না। উপরতলার বিপদ নিচের তলার প্রচারণায় মূলোচ্ছেদ করার ব্যবস্থা নাই।

পুরো স্কুল স্টাফ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। চতুর্থ, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের সাথে অফিসার, শিক্ষক, শিক্ষিকা সবাই অধ্যক্ষের বিপক্ষে। অধস্তন কর্মচারীদের উচকিয়ে দেয়ার নেতৃত্বে মানিকগঞ্জের স্টোরকিপার কাম ম্যাচ ম্যানেজার মোঃ নূর হোসেন। আবাসিক প্রতিষ্ঠানের স্টোর ও ম্যাচের কিনাকাটায় চুরির সর্বাধিক সুযোগ। চোরের মার বড় গলার মত তারাই তলে তলে নিজেদের পাপ ঢাকতে পুরো প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিষিয়ে তোলে। মেজর রহমানের মতই নূর হোসেন লাপরোয়া সবাইকে দাবিয়ে যাচ্ছিলেন।

দিন গিয়ে রাত আসতে মডেল স্কুলের খাস মডেল দর্শন। স্কুলের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের পিলার সদৃশ্যরা আসেন নতুন কর্মচারীকে হেদায়েতের সুপথে আনতে :

ক। অফিস সুপার মিঃ সুকুর।

খ। স্টোর কিপার নূর হোসেন।

গ। ইউ ডি এসিসটেন্ট মিঃ মুজিবুর রহমান।

ঙ। মিঃ রুস্তম আলি।

চ। আইনুল ইসলাম।

এমন ধরনের মহারথি সমাগমে 'হক মোকাম' ধন্য। সালাম বিনিময়ে বসে নূর হোসেনকে দেন আসলি ওসওয়াসার ছবক এবং বিস্তারিত পরিস্থিতি জানিয়ে চলার পথ নির্দেশনা।

পরদিন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে স্ট্রাইক – তেতাল্লিশ জন তৃতীয় শ্রেণী, শতাধিক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মিলে অফিস বর্জন করে। মূল ইন্ধনের সহযোগিতায় মান্যবর ধুরন্ধর ছদ্মবেশের শিরোমণি শিক্ষকবৃন্দ।

স্কুলে চারটি হাউজ :

ক। আইউব হাউজ।

খ। কবি নজরুল হাউজ।

গ। শেরে বাংলা হাউজ।

ঘ। জিন্না হাউজ।

প্রতি হাউজে ৮০-৯০ জন ছাত্রের আবাস। আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের খাবার বন্ধ করে অধ্যক্ষকে বেকায়দায় ফেলার চক্রান্ত করা হয়। স্ট্রাইকের খবর নিতে অধ্যক্ষ প্রথমে যান আইউব হাউজে। প্রতি হাউজের খবর নিয়ে জানেন কোন হাউজেই ছাত্রদের সকালের নাস্তার ব্যবস্থা হয় নি। আইউব হাউজের বাবুর্চি মোহাম্মদ আলিকে খানা না-পাকানোর কারণ জানতে চার্জ করে সদুত্তরের অভাবে পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিতেই পূর্ব প্রস্তুতির ইঙ্গিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা অধ্যক্ষকে ঘিরে দাঁড়ায়।

বাবুর্চি খানা পাকায়নি তো কি হয়েছে! তাকে চার্জ করা কেন? কর্কশ ভাষা প্রয়োগ কেন? বেশি বাড়াবাড়ি করলে অধ্যক্ষকে অপমানের বেইজ্জতির হুমকি প্রদান করা হয়। আরও জানানো হয় যে চব্বিশ ঘণ্টায় দাবি দাওয়া না মানলে স্ট্রাইক চলবে।

অধ্যক্ষ ব্যাপার বুঝলেন। তিনি নীরবে অফিসে চলে এলেন। নাটের হোতা অফিস সুপারকে ডাকেন অধ্যক্ষ। সবকিছু সমাধানের আশ্বাস মিলে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়া হলো। অফিস বিধি মোতাবেক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পে স্কেল সূচনা হলো অত্র প্রতিষ্ঠানে। এতদিন প্রতিষ্ঠান না কেন্দ্রীয় না প্রাদেশিক, না সরকারি না বেসরকারি ছিল। পরিস্থিতির শিকার অধ্যক্ষ। সরকারি কর্মচারীর মর্যাদায় সবাই তুষ্ট। দুর্ভাগ্য, গভীর জলের মাছের সন্ধান শিক্ষকদের অদৃশ্য ইঙ্গিতের ব্যাপার আঁচ করতে পারলেন না অধ্যক্ষ।

১৯৬৪ সালে যশোরে ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ হলে এই ধানমন্ডি রেসিডেন্সিয়েল স্কুলের প্রবীন শিক্ষক এ. এন. এম আবদুল করিম সে-কলেজে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালে ধানমন্ডি রেসিডেন্সিয়েল স্কুলের অধ্যক্ষ রহমানের নাজুক অবস্থা সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগানোর নিমিত্ত তিনি অন্যতম নায়ক। দুর্ভাগ্য উদার দিলের অধ্যক্ষ রহমান তা বুঝতে পারেন নি। ১৯৭১ সালের দুর্দিনে ১৯৬৩ সালের মডেল স্কুলের অধ্যক্ষই ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ। বড় বিলম্বে দুধকলা দিয়ে পোষা কাল সাপ চিনলেন অধ্যক্ষ রহমান। এ. এন. এম. করিমকে হাউস মাস্টার বানান তিনি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু কলেজ প্রশাসনে কর্মদক্ষতা আনতে অনিয়ম দূর করতে অনেকের স্বার্থে ঘা লাগে। ১৯৬৩ সালের ধানমন্ডি রেসিডেন্সিয়েল স্কুলের চাইতে জঘন্য হিংস্র পদ্ধতিতে অধ্যক্ষ হত্যার নির্দেশ দেন এককালের ধানমন্ডি স্কুলের শিক্ষক ও পরবর্তী ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ অধ্যাপক এ. এন. এম. করিম। কলেজ অধ্যক্ষের ড্রাইভার আমির হোসেনকে দিয়ে তা করাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেও দমলেন না। পুরা ব্যাপার জেনেও সময়ের দুর্দিনে অধ্যক্ষ রহমান খামুস। আপন হাত যখন গালে চড় মারে, শিউলি বা খাজুর গাছ ছোলার গাছির কোমরের দড়ি যখন সাপ হয়ে তাকে ছোবল মারতে আসে তখন রক্ষার উপায় থাকে না। ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের লোকই যখন তার অধ্যক্ষকে মারতে চান, তখন তিনি আর কারও প্রতিই আস্থা রাখতে পারলেন না। চরম সংকটে ঝিনেদার সংগ্রামী যোদ্ধা এস ডি পি ও মাহবুব ও ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজ অধ্যাপক/ক্যাপ্টেন সফিক চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর যুদ্ধরত। ১৮ এপ্রিল লেঃ কর্ণেল মোহাম্মদ মঞ্জুরুর রহমান, এ ই সি, তঘমাই জং, পি এস সি পাক আর্মির হাতে নির্মমভাবে কলেজ ক্যাম্পাসে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে নিহত হন। অধ্যক্ষের অবর্তমানে তাঁর বাসা থেকে অলংকার লুটে নেয় এ. এন. করিম-পত্নী। আর এ. এন. এম করিম হন দখলদার আমলের অধ্যক্ষ। আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কেমন নৃশংসে জঘন্য কাজ সময়ের বৈগুন্যে হতে পারে তারই কিছু নমুনা দেয়া হলো। এসব প্রতিষ্ঠানের সেরা ছেলেরা এই বিষবাষ্পের ছোঁয়ায় মানুষ। হায় দুর্ভাগ্য দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের।

কর্মদক্ষতার পুরস্কার : ধানমন্ডি রেসিডেন্সিয়েল স্কুলের কাজে যায় দিন। সকলের পদোন্নতির সাথে শামসুল হকেরও পদোন্নতি হয়। স্টোর কিপার থেকে তিনি স্টোর কিপার কাম ম্যাচ ম্যানেজার।

শেখ মুজিবের সাহচর্য : বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিব ও শামসুল হকের বাড়ি গোপালগঞ্জে, দূরত্বের ব্যবধান মাত্র মাইল দশ। মুজিবের দুই তনয় শেখ জামাল ও শেখ কামালের পড়াশোনা শুরু ধানমন্ডি রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলে। গোপালগঞ্জ বাড়ির সুবাদে দু ছেলের দেখাশোনার ভার অনেকটা শামসুল হকের ওপর চাপিয়ে দেন শেখ মুজিব। ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ভাষণে রেসকোর্স ময়দানে শামসুল হক উপস্থিত থেকে উদ্দীপনা পান। ভাষণ শেষে তিনি গাড়িতে তাঁর ধানমন্ডি বাসভবনে আসেন।

শামসুল হক তাঁর দুই সহকর্মী মুজিবুর রহমান ও মোঃ আলিসহ দৌড়ে যান শেখ মুজিবের বাড়ির দিকে। বাড়ির নিচ তলায় দেখেন কে একজন শেখ মুজিবের ভাষণের টেপ রেকর্ড শুনছেন। অকস্মাৎ লুঙ্গি পাঞ্জাবি ও পাইপের মাথায় সিগারেট বসিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিচে এলেন শেখ মুজিব। তিনি উদ্বিগ্ন। তাঁর চেহারা বিবর্ণ। টেপ রেকর্ডের কাছে এসে স্বগত উক্তি, "পারহেপস দিস ইজ মাই লাস্ট স্পিস-সম্ভবত ইহাই আমার শেষ বক্তৃতা।" উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে চেয়ে তিনি দোতালায় ফিরে যান।

শেখ মুজিবুর রহমান-এর বাসভবন ছেড়ে আসতে শামসুল হকদের আলোচনা হয় বঙ্গবন্ধু কি দেশের কোন অজানা জ্বলন্ত ভবিষ্যতের গণ্ডগোলের আশংকায় শংকিত ? অজানা ভয়ভীতির সম্ভাবনায় তিনি যেন জীবন-মরণের সংকটে রয়েছেন।

অশনি সংকেত : ১৯৭১ সালের মার্চের দ্বিতীয় সপ্তার দিকে ছোট ভাই হেমায়েত সস্ত্রীক পাকিস্তান থেকে ফিরে আসে। সৈনিক হেমায়েতকে যেন গলা ধাক্কা দিয়ে পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। স্ত্রী হাজেরাকে রেসিডেন্সিয়েল স্কুলে রেখে হেমায়েত যোগ দেয় ২ ই বি আর জয়দেবপুর। ২২ মার্চ জয়দেবপুরে শামসুল হকের সাথে আলাপে হেমায়েত জানান, "আমি পালাতে পারবো না। দেশে যুদ্ধ হবে। আপনারা সপরিবারে পালান।" শেষ পর্যন্ত হেমায়েতের বাণীই সত্য হলো। শুরু হলো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা

ক। বিহারি অত্যাচার : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রেরণা ও হেমায়েতের সতর্কতায় স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন শামসুল হক। ২৫ মার্চের দিকে পাক-ক্র্যাক ডাউনের পর ঢাকার বুকে বিহারিদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। ধানমন্ডি রেসিডেন্সিয়েল স্কুলের চার পাশে বিহারি আখড়া। দুর্যোগের রাতে শামসুল হক সপরিবারে রেসিডেন্সিয়েল স্কুলেই ছিলেন। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে বিহারিদের মধ্যে বসবাসরত কিছু বাঙালি আহত অবস্থায় স্কুলে ঢুকে। বহুতর ঘটনার মধ্যে বাঙালি মহিলা সুফিয়া বেগমের জীবনের করুণ আকুতি বড়ই মর্মন্তুদ।

পঁচিশ বছর বয়স্ক স্তন কাটা মহিলা সুফিয়া বেগমকে স্কুল চিকিৎসা কেন্দ্রে দেখতে পান শামসুল হক। স্কুল চিকিৎসা কেন্দ্র বা এম আই রুমে ছোট খাট চিকিৎসা চলতো। মহিলার শামসুল হককে জড়িয়ে প্রাণস্পর্শী কান্না, "আমার ছেলে, আমার ছেলেকে বিহারিরা কেটে ফেলেছে।"

অকস্মাৎ ঘরে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষের প্রবেশ। তাদের হাতে গরু জবাইর ছুরি। রুদ্রমূর্তির কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা, "তোর স্বামী কোথায়? " অবস্থা গুরুচরণ আঁচ করে দু'তিন ঘণ্টা পূর্বেই স্বামী ঘর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচেন। বেচইন মহিলার জবাব, "স্বামী ঘরে নাই।" নর পশুরা ছয় মাসের বাচ্চাকে মহিলার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইলে মা শিশুকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরেন। শিশু মুখে স্তন পুরে শেষ রক্ষার চেষ্টা করেন তিনি। পশুত্বের চরম নীচতার জিঘাংসায় কালবিলম্ব না করে নর পশুরা হাতের ছোরার পোঁচ বসিয়ে দিল মহিলার স্তনে। শিশু মুখের সাথে স্তন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে মারে বিহারি নরপশুরা। নিচে ধারালো ছোরার চোখা মাথা উঁচিয়ে রাখল কতক্ষণ। শিশু বুকে বিদ্ধ ছোরায় তার বুক পিঠ এফোঁড় ওফোঁড়। পাষাণ প্রতিমা স্তন বিচ্যুত মায়ের চোখের সামনে তাঁর নয়নের নিধি চিরতরে শব্দ করা বন্ধ করলো। মূর্ছিতা মহিলাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায় হৃদয়হীন বিহারি ঘাতক। জ্ঞান ফিরতেই রেসিডেন্সিয়েল স্কুলে বাঙালির হাতে প্রাণে বাঁচা যাবে ধারণায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন এই মহিলা।

ব্যাপার দেখে শামসুল হকের শাহি রক্তে নাচনের জোয়ার নামে। বাংলার মা-বোনের ওপর এই বর্বরোচিত হত্যার প্রতিকার চাই। এক বাঙালির ওপর অত্যাচারে অপর বাঙালি মায়ের সন্তান নিশ্চুপ থাকতে পারে না। পাক সরকারের মদদে বিহারি বাঙালি দুধের শিশুর প্রাণ সংহার করে। বাঙালি মায়ের স্তন কেটে তাদের উল্লাস। পাকিস্তানের ওপর এই হত্যা ধ্বংসের প্রতিশোধ প্রতিকার চাই। বঙ্গবন্ধুও হেমায়েত বার্তা স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য উৎসুক হয় মন। আবাসিক কোয়ার্টারে এক মেয়ে ও দুই ছেলে নিয়ে তিনি বিপাকে আছেন। কেবল সময় সুযোগের প্রতীক্ষায়।

পাক আর্মির তাণ্ডব ঃ মৃত্যু ফাঁদের বিহারি বেড়জাল উতরে রেসিডেন্সিয়েল স্কুল থেকে ২৬ মার্চ সকালে পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সর্ব প্রকার যানবাহন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পাক আর্মির ঘেরে রেসিডেন্সিয়েল স্কুল। ভোর চারটার দিকে ক্যাম্পাসের ডি টাইপ কোয়ার্টারে আছে মাত্র পাঁচটি পরিবার। স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রশাসনিক অফিসার সৌভাগ্যক্রমে ক্যাম্পাসে ছিলেন। পাক হাতের মৃত্যু এড়াতে সারা রাতের বিনিদ্র প্রহরা তাঁদের। বাঙালিরা ইতোমধ্যে জোগাড় করে রক্ষা কবচ হাতিয়ার লোহার রড ও হাত বোমা। বাঙালি নিজেদের শক্তির আস্থায় বিশ্বাসী। পাক আর্মির সাহায্য ছাড়া বিহারি ঢুকতে চাইলে প্রতিহত করা যাবে। সিঁড়ির গোড়ায় পুরুষরা প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। আকস্মিক ক্যাম্পাসে পাক আর্মি প্রবেশ। মনুষ্য বসতির দালানের চতুর্দিকে স্বয়ংক্রিয় চায়নিজ অস্ত্রের এস. এম. জি ও এল. জি ফিট করে ঘেরাও।

দারোয়ান, পিয়ন, তাদের সন্তানাদি মিলে বত্রিশ জন (৩২) পুরুষ পাক ফটকে

আটক। অকস্মাৎ পাক আর্মি দালানের অন্যান্য ফ্লোরে রুম সার্চ করে শিশু বৃদ্ধ যুবক যাকে পায় ধরে এনে দোতালার বারান্দায় লাইন করে দাঁড় করায়। বলির পাঁঠার প্রায় বাঙালির লাইনের সামনে পিছনে ব্রাশ ফায়ারের জন্য লোডেড এল. এম. জি কক করে রেডি। দেখার মধ্যে স্বামী-পুত্র গুলির মুখে। রুমে রুমে মহিলাদের বুক চাপড়ে কান্নার রোল। ইন্নাল্লিাহি পড়ে সবাই নীরব বোবা দৃষ্টিতে ঘাতক বুলেটের অপেক্ষায়।

জীবন-মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞানে বাঙালি ভাইস প্রিন্সিপাল তাঁর স্টাফদের বাঁচাতে এগিয়ে এলেন। পাক লেঃ কর্নেলকে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলাতে ব্যাপার কিছুটা নমনীয় হয়। সবাই মুক্তি পেলেও স্বস্থানে অনড় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।

সবাইকে পুরাপুরি চেক করতে গিয়ে বাঙালির তৈরি হাত বোমা ধরা পড়ে পাক সেনার হাতে। এবার বাঙালির প্রাণ ভিক্ষার আবেদনের নরমের ব্যাপার গরমের চরমে। বোমা ফাটানোর চেষ্টায় সে সব ফাটেনি। নিয়মের ব্যতিক্রমের কারণেই সে হাতবোমা ফাটেনি। পাক সেনা হাতবোমা ফাটানোর কৌশল না জানায় বাঙালির অলৌকিক রক্ষা। বোমা না ফাটায় ভেতো কাপুরুষ যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞানশূন্য বাঙালির প্রতি পাক আর্মির করুণার হাসাহাসি। ফাঁড়া কাটতে পাক আর্মি বিদায়।

একা রামে রক্ষা নাই তাহে সুগ্রীব দোসর। বিহারি সাথে বাঙালি নির্মূলে লেগেছে পাক আর্মি। তিন মাস জীবন-মৃত্যুর খেলায় কাটে রেসিডেন্সিয়েল স্কুলে। এবার পালিয়ে এলেন গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া থানার টুপারিয়া। মণিকাঞ্চন সংযোগের মত সরাসরি হেমায়েত বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন শামসুল হক।

মুক্তিযুদ্ধে শামসুল হক ঃ হেমায়েত জয়দেবপুর থেকে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে সটকে পড়ার সময়ে বেশ কিছু এল. এম. জি, এস. এম. জি, গ্রেনেডসহ প্রচুর এমুনিশন সঙ্গে নেন। কয়েকজন নিয়মিত সেনাকেও তিনি সাথে আনেন। জয়দেবপুর থেকে কোটালিপাড়া পৌঁছতে পথে পথে প্রচুর খণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে হেমায়েতকে এগুতে হয়। হেমায়েতের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাঁদের পুরা পরিবার। এবার হেমায়েতের সাথে মিলে শুরু হয় যৌথ অভিযান।

দেশের অভ্যন্তরে এখন সবেমাত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ দানা বেঁধে উঠেছে। ইতোমধ্যে এই যোদ্ধা পরিবার বিশেষ করে হেমায়েত-এর পৌরুষে ঘা দিতে হেমায়েত-পত্নী হাজেরা আত্মাহুতির পথ বেছে নেন। তাঁর আত্মাহুতি যেন সবার যুদ্ধ চেতনায় বিশেষ স্ফুরণ ঘটায়।

সরকারের পেটিয়া খয়ের খাঁ গোষ্ঠী ও রাজাকারদল হাজেরার আত্মাহুতির ব্যাপার ভিন্নখাতে বইয়ে বিভ্রাট বাঁধাতে চায়। বিপক্ষের নেতৃত্বে রাজাকার চান মিয়া। হেমায়েত বাহিনীর তখনকার ক্ষুদ্র দলের সাথে চান মিয়া গ্রুপের খণ্ড যুদ্ধ হয়। হেমায়েতের বাড়ির পাশেই সে যুদ্ধ। সে-যুদ্ধে হেমায়েতের পাশে দাঁড়িয়ে মানব ঢালের মত তাকে রক্ষা করেন। থানা পুলিশের হ্যারাসমেন্ট করে হেমায়েতদের বসতবাটি দখল করা ছাড়া চান মিয়াদের তৃপ্তি নাই। তার পরেও হেমায়েতকে প্রাণে মারতে খণ্ড

যুদ্ধ বাধে। সুদক্ষ সৈনিক হেমায়েতের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারলো না রাজাকার চান মিয়া। মুক্তির গুলিতে চান মিয়া নিহত হলে বিপক্ষের বিষদাঁত গুঁড়িয়ে যায়। নিজেদের ঘর-বাড়ি জ্বালানোর প্রতিশোধে মুক্তিরাও চান মিয়া কোং জাতীয়দের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরা পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধে।

যুদ্ধে রক্তের টান বড় টান। ছোট ভাইকে মরণ পণ যুদ্ধে ঠেলে দিয়ে অপর ভাইরা ঘরে থাকতে পারলেন না। হেমায়েতের প্রায় প্রতিটি মারাত্মক যুদ্ধেই তাঁর দুই ভাই শামসুল হক ও নজির হোসেন সাথে ছিলেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যুদ্ধের ভয়াবহতায় তাঁরা ছিলেন হেমায়েতের সার্বক্ষণিক সাথী। হেমায়েতের শৌর্যের কাছে তাঁরা ম্লান বলেই চুপ। ভাইয়ের সাথে যুদ্ধসাথী ভাই বলে তাঁরা প্রচার বিমুখ।

এককালের সংগ্রামী নাট্যকার স্টেজের যুদ্ধকে বাস্তব যুদ্ধে নিয়ে এলেন। তাঁর অতীত পরিচিতি যোদ্ধা সংগ্রহে বিশেষ কাজ দিয়েছে। সরাসরি যুদ্ধের চেয়ে যুদ্ধ জারি রাখতে বড় প্রয়োজন সংগঠন। যুদ্ধ আয়োজনে প্রশাসনিক সংগঠনে শামসুল হকের অবদান রূপকথার মত। পর্দার অন্তরালে নীরব সাধকের মত কতকগুলি নিবেদিত প্রাণ সংগঠক কাজ না করলে হেমায়েত বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি রাখতে পারতো না।

হেমায়েতের শৌর্যের অগ্নি পরীক্ষা হয় রামশীল যুদ্ধে। শত্রুর রকেট লাঞ্চার হেমায়েতের এগারটা দাঁতের সাথে জিহ্বার উপরের অংশ কেটে বিখণ্ড করে ফেলে। একশ আটান্নজন (১৫৮) হারিয়ে পাক সেনার হায় মাতম।

আহত হেমায়েত সংজ্ঞাহীন। বাঁচে না মরে ঠিক নেই। চিকিৎসার পরও তিনি শয্যাশায়ী। চতুর্দিকে হতাশার শোক ছায়া। এমনি নাজুক অবস্থায় হীন মনোবলের মুক্তিদের যুদ্ধচেতনায় উদ্দীপ্ত করতে নাট্যকার প্রতিভার বিশেষ কাজে লাগে। দুর্যোগের দুর্বিপাকে যুধিষ্ঠির-এর মত স্থির প্রজ্ঞায় সবদিক সামলান শামসুল হক।

রামশীল যুদ্ধের আহত নেতা এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবার যুদ্ধ ময়দানের সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ-সবই সম্ভব হয়েছে সাংগঠনিক বিন্যাসে। আশ্চর্য সতর্কতায় ভাইদের লোভনীয় কোন পদ মর্যাদা দেন নি হেমায়েত। কাউকে কোম্পানি কমান্ডার বানান নি। লোক চক্ষুর আড়ালে সাধারণ সৈনিকের মত কাজ করেছে হেমায়েত পরিবার।

শত্রুকে যুদ্ধে রাধাচক্কর দেখানোয় হেমায়েতের জুড়ি মেলা ভার। ভাইদের একান্ত নিষ্ঠার সততার কর্মনৈপুণ্যে শত্রু দিশেহারা হয়েছে।

পাকসেনা রাজাকার সম্মিলিত বাহিনীর সাথে সরাসরি বহু যুদ্ধে জড়িত ছিলেন শামসুল হক। কোটালিপাড়া থানা তাঁরা চারবার দখল করে সমুদয় অস্ত্র গোলা বারুদ ছিনিয়ে নেন। হেমায়েত-এর কীর্তি গাথায় মিশে গেছে তাঁর ভাইদের শৌর্য বীর্যের অবদান। সে জন্য তাঁদের অনুশোচনার আক্ষেপ নেই, বীর মুক্তি ভাই হেমায়েত-এর গর্বে তাঁরা গর্বিত। মুক্তিযোদ্ধার বাইরে তাঁরা কোন পরিচিতি চান না।

স্বাধীন দেশের সংগঠনে শামসুল হক ঃ স্বাধীন দেশে শামসুল হক রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান হন। তাঁর দায়িত্বকালে কোন রিলিফ চুরি হতে দেন নি তিনি। সঠিকভাবে জনগণের দোরে রিলিফ পৌঁছে দেয়ায় জনতা খুশি। একবার এক রিলিফ বাহক নৌ-মাঝি রিলিফের মাল চুরি করে। হাজার লোকের সামনে তাকে চোরের মত প্রহার করা হয়। জনতা রিলিফ বণ্টনের সততায় তাঁর প্রতি তুষ্ট। জনতা তুষ্ট হলেই হয় না। স্থানীয় স্বার্থান্বেষীরা বখরা না পেয়ে চটে আছেন।

বখরা না পাওয়ার টকরা ঃ কোটালিপাড়া থানা বাকশাল সেক্রেটারি শামসুল হক-কে পরামর্শ দেন, জনগণের এত রিলিফের দরকার নেই। বঙ্গবন্ধুর এলাকায় বহু রিলিফ আসছে ও আসবে। রিলিফের মাল পুরাটা বেচে জনগণকে কলাটা দেখিয়ে মাল আত্মসাত ও অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের এই গোপন তথ্য জনগণের দরবারে ফাঁস করেন রিলিফ চেয়ারম্যান শামসুল হক। এর পর থেকে টাকশাল হাতানো বাকশাল সেক্রেটারি অতি সততার পরাকাষ্ঠা শামসুল হকের রিলিফ বণ্টনের চুলচেরা হিসাবে নিকাশ নেয়ার অপেক্ষায় থাকেন।

১৯৭৩-এর নির্বাচনী প্রতিশোধ ঃ ১৯৭১-এর বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়ার সাহায্যের কারণে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির পোয়াবারো। তারা স্বাধীন দেশে ক্ষমতার ভাগ চান। ১৯৭৩-এর নির্বাচন নিয়ে নিজ এলাকা কোটালিপাড়ার প্রার্থী নির্বাচনে শেখ মুজিব বিপাকে পড়েন। বিপদ উত্তরণে শেখ মুজিব হেমায়েত-এর পরামর্শে আওয়ামী লীগের সন্তোষ বিশ্বাসকে নমিনেশন দেন। নির্বাচনে ন্যাপ+কমিউনিস্ট প্রার্থী হেমায়েত-এর কোম্পানি কমান্ডার শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ প্রার্থী। আওয়ামী লীগ অন্যান্য দল, স্বতন্ত্র প্রার্থীর অনেকেই নির্বাচনে শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত আশীর্বাদের আশায় ছিলেন। বেরসিক নির্দলীয় যোদ্ধা সৈনিক হেমায়েত সবাইকে নিরাশ করলেন। শেখ মুজিবকে দেয়া হেমায়েত-এর পরামর্শের কথা জেনে পক্ষ-বিপক্ষ সবাই তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন।

নির্বাচনে হেমায়েত মনোনীত আওয়ামী লীগ প্রার্থী সন্তোষ বিশ্বাস বিপুল ভোটে জিতেন। অমুসলমান হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার এলাকার কারণেই সন্তোষ বিশ্বাসের নাম প্রস্তাব করেন হেমায়েত। তাঁর মনোনীত প্রার্থীর জয়ে পরাজিত ও নমিনেশন না পাওয়ারা হেমায়েতের প্রতি খুবই চটা। তাঁর যুদ্ধ সাথী কমলেশ কান্না, "দাদা এখন আর বাঁচার উপায় নাই। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। "যুদ্ধকালীন গলায় গলায় প্রেম আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে হোক। যুদ্ধ শেষে ক্ষমতার ভাগ দিতে অনীহা।"

নির্বাচনী প্রতিশোধ প্রতিহিংসায় হত্যা

৭ মার্চের নির্বাচনে পরাজয় মেনে ১০ মার্চ সকালে কমলেশ কোটালিপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ যাচ্ছেন। মাঝ পথে কান্দিলা বাজারের কাছে বিজয়ী-বিজিত দুদল মুখোমুখি হয়। আওয়ামী লীগ মুজিববাদী ও কমিউনিস্ট কর্মীদের মাঝে কথা কাটাকাটির চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পেশিয়ে তোলা খোঁচা মারা মার্কা বহাসে মজা

পেয়ে দুদলকে ঘিরে তখন বিপুল জনতা জড় হয়। মুজিববাদীদের ঘেরে পড়েন কমিউনিস্টবাদ।

অসহিষ্ণুতার মেজাজে দুদলই উত্তেজিত। পরাজিত কমলেশের সঙ্গে আছেন তাঁর রাজনৈতিক সচিব গোপালগঞ্জের কৃতী সন্তান জনপ্রিয় অলিউর রহমান লেবু। প্রাণ সংশয় বুঝে বেয়াকুফের মত দুজনই সংগোপনে রক্ষিত পিস্তল বের করতেই তাঁরা জনতার হাতে বন্দি হন। চতুর্দিকে ডাকাত/নকশাল/হাইজাকার ধরা পড়ার শোরগোল উঠে। গণপিটুনি শুরু হয়। হেমায়েতের বাড়ি থেকে মাইল দেড়েকের মধ্যে এই ঘটনা। ব্যাপার জানার কৌতূহলে হেমায়েত অকুস্থলে পৌঁছেন। নির্বাচনে পরাজিত পক্ষের বন্দিরা ছিলেন:

ক। অলিউর রহমান লেবু মিয়া-গ্রাম-আড়পাড়া, জিলা- গোপালগঞ্জ।

খ। শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ-(প্রাক্তন কোম্পানি কমান্ডার হেমায়েত বাহিনী)।

গ। বিষ্ণুপদ।

ঘ। মানিক চক্রবর্তী।

ঙ। শেখ লুৎফর রহমান (পিতা-শেখ জহুরুল হক, গ্রাম-দুর্গাপুর, থানা-গোপালগঞ্জ। গণপিটুনিতে হাত বাঁধা নিজ কোম্পানি কমান্ডারকে দেখে হেমায়েত দুঃখ পান। তিনি জনতার হাত থেকে তাঁদের ছাড়িয়ে নিয়ে থানায় দেয়ার প্রস্তাব রাখেন জনতার কাছে।

ঘটনার স্থান থেকে গোপালগঞ্জ থানার দূরত্ব আট মাইলের মত। অবশেষে এক খোলা নৌকায় আহত পাঁচ জনকে নিয়ে থানায় যাবার সময়ে নৌকা ডুবিয়ে আহতদের ছিনিয়ে নেয় জনতা। পাঁচ জনের সর্বশেষ জন লুৎফর রহমান বেঁচে যান। নৌকা ডুবানিতে পেটে পানি ঢুকে হেমায়েত নিজেও আহত হন। বিক্ষুব্ধ জনতার ক্রোধ কমলে থানায় খবর পাঠিয়ে মৃতদেহের সাথে অন্যান্য আলামত হস্তান্তর করেন হেমায়েত। এই হত্যাকাণ্ড স্থল থেকে কোটালিপাড়া থানার দূরত্ব মাইল চারেক। তাই দ্রুত খবর পৌঁছানো হয় থানায়।

মুক্তিযুদ্ধের পুরস্কার খুনের কাফফারা ঃ থানা বাকশাল সেক্রেটারি এই অঘটন পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেন। একাত্তরের মার খাওয়া পুলিশ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত, হেমায়েত পরিবার, হেমায়েতের আত্মীয়, বারজন কৃতী মুক্তিযোদ্ধাকে জড়িয়ে খুনের মামলার কেইস সাজানো হয়। মোট চব্বিশ জনকে (২৪) মিলিয়ে বাংলাদেশ বিধির ১৪৮/৩০২/৩৬৪/১০৯ এবং এস ও অর্ডার ৭২ অনুসারে খুনের মামলা করা হয় হেমায়েতের বিরুদ্ধে।

নজির হোসেন, শামসুল হক, হেমায়েতকে মিলিয়ে তিন ভাই ২৪ জনের মধ্যে আসামি। হেমায়েতের মামলা আজো ঝুলছে। ১৯৭৪-এর স্থানীয় নির্বাচনের সময় শামসুল হক ফরিদপুর জেলে আটক। জেল থেকে জনতার সহায়তায় নমিনেশন দাখিল করা হয়। জেলে আটক প্রার্থীকে নির্বাচিত করে জনতা তাঁর জনসেবার ঋণের প্রতিদান দেয়। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কুশলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হন।

চেয়ারম্যান হয়ে তার প্রথম ও প্রধান কাজ হয় চুরি, ডাকাতি, জাল দলিল, নারী নির্যাতন জাতীয় অসামাজিক গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার করে তোলা। চেয়ারম্যান প্রভাবিত এলাকায় অন্যায়, অবৈধ, গর্হিত কাজ প্রায় বন্ধ। কৃতজ্ঞ এলাকাবাসী তাঁকে পর পর চারবার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বানায়।

চেয়ারম্যানের ন্যায়নিষ্ঠ কাজ-কর্মে এলাকার রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, স্লুইস গেইট, পাইপ, খাল খনন জাতীয় কাজে তিনি সত্যিকার অর্থেই এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেন। পোড়ার দেশের মুক্তিযোদ্ধা চেয়ারম্যানকে নিয়ে এলাকাবাসীর গর্বের শেষ নেই। আশপাশের এলাকার উন্নয়নের সাথে তুলনা করে জনতা মহা খুশি। শতবর্ষে যেন তাঁরা এমন চেয়ারম্যান পান নি।

পারিবারিক জীবনে শামসুল হক : ১৯৬৫ সালে মজিদা বেগমের সাথে তাঁর শুভ পরিণয় হয়। এই কৃতী মুক্তিযোদ্ধার সন্তানেরা নিম্নরূপ :

ক। সামিউল হক-এইচ এস সি-কলা বিভাগের ছাত্র।

খ। লিনা খানম-এইচ এস সি-কলা বিভাগের ছাত্রী।

গ। রাবেয়া পারভীন-এস এস সি পাশ বিবাহিতা। স্বামী-ডি আই বি দারোগা।

ঘ। এমদাদুল হক কামাল-৯ম শ্রেণী-চাকরি-সেনা সাপলাই বিভাগ।

ঙ। নাজমা খানম (নাজমা আকতার সাথী) এইচ এস সি-কলা বিভাগের ছাত্রী।

চ। লুৎফর রহমান-৯ম শ্রেণী-ছাত্রী।

ছ। তাজিয়া পারভীন-৯ম শ্রেণী-ছাত্রী।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তানেরা শিক্ষা ও জ্ঞানগরিমায় বড় হোক। তাদের জীবনের সাফল্যের গৌরবের সৌরভে সবাই গর্বিত ও আমোদিত হোন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ধন্য পরিবার তাঁদের কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন।

স্বামী-স্ত্রীর দুজনই তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা। হেমায়েত বাহিনীর যুদ্ধ ইতিহাসের সাথে তাঁদের অবদান অভিন্ন। মুক্তিযোদ্ধাদের মাতৃহৃদয়ের স্নেহ দিয়ে যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করে ধন্য শামসুল হক পত্নী মজিদা বেগম।

শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ যোদ্ধা : শত ঝড়ঝঞ্ঝা ও প্রতিকূলতায় বেড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের তিনি গর্ব। বিধ্বস্ত হেমায়েত ও হেমায়েত পরিবার পুনর্বিন্যাসে তিনি ও তাঁর স্ত্রীর অবদান স্মরণীয়। মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতের সাফল্যের নেপথ্যে নিয়ামক শক্তি রূপে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধেয় ও নমস্য। কৃতজ্ঞ হেমায়েত বাহিনী ও কোটালি পাড়ার জনতা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলির উপহারে বার বার চেয়ারম্যান বানিয়েছে। এদেশ ও জাতির পক্ষ থেকে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত এই মহান যোদ্ধার জন্য রইল শ্রদ্ধার্ঘ্য।

উপসংহার : পুরা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মধ্যমণির শিরোপা নিয়ে ধন্য হেমায়েত। বাংলার ঘরে ঘরে এমন লড়াকু পরিবার জন্ম দিক। দুর্দিনে তাঁরা জাতির নেতৃত্ব দিন। তাঁদের যশোগাথার শৌর্য-বীর্যের-ঐশ্বর্যে আমোদিত হোক দশদিক।

দশম অধ্যায়

হেমায়েত বাহিনী ও মুক্তি-প্রশাসন

হেমায়েত বাহিনীর বিন্যাস

যুদ্ধ ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে হেমায়েত অঞ্চলের ১২ (বার) টি থানার প্রতিনিধি সমন্বয়ে হেমায়েত বাহিনীর বিন্যাস। তাঁর সমন্বয়ে কমিটির অধীনে পরিচালিত প্রধান প্রধান কটি অঞ্চল :

১। সদর দপ্তর।
২। পরিচালনা কমিটি।
৩। সামরিক সংগঠন।
৪। প্রশিক্ষণ।
৫। মহিলা ক্যাডার।
৬। গোয়েন্দা বিভাগ।
৭। সরবরাহ বিভাগ-অতিরিক্ত খাদ্য ভাণ্ডার।
৮। অস্ত্র গোলাবারুদ ভাণ্ডার।
৯। একাউন্টস ব্রাঞ্চ (অর্থ বিভাগ)
১০। বিচার বিভাগ।
১১। চিকিৎসা বিভাগ।
১২। শরণার্থী সামাল।
১৩। কমিউনিকেশন বোর্ড বা যোগাযোগ বিভাগ। যার অধীন লক্ষ বিভাগ।
১৪। কুরিয়ার কোম্পানি বা সংবাদ সংগ্রহকারী ও প্রেরণকারী টিম।

সদর দপ্তর

মজবুত সাংগঠনিক কাঠামোর নিয়ামক শক্তি সদর দপ্তর। হেমায়েত বাহিনীর প্রধানদের সাফল্যের গুণে পুরা যুদ্ধ ও প্রশাসনে সাফল্য এসেছে। হেমায়েত বাহিনীর হেডকোয়ার্টার বা সদর দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	বিভাগীয় প্রধান	পরিচিতি	মন্তব্য
১	হেমায়েত বাহিনী	হেমায়েত উদ্দিন	ই বি আর	২ ই বি আর
২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
৪	গোয়েন্দা	[illegible]		[illegible]
৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৬	[illegible]	হেমায়েত উদ্দিন	২ ই বি আর	বাহিনী প্রধান নিজে

৭	খাদ্য রসদ সরবরাহ	গোলাম মোস্তফা হাবিবুর রহমান	নায়েক হেডক্লার্ক ই বি আর	শিক্ষায় বি কম
৮	বিচার	৯ সদস্য বিভাগের ৩ জন ক। শেখ আবদুল আজিজ খ। আবদুল গফুর পাইক গ। লালমোহন বিশ্বাস	আওয়ামী লীগ	ডা. লালমোহন বিশ্বাসসহ পনের সদস্য বিশিষ্ট কমিটি
৯	বিচার বিভাগ ও আইন উপদেষ্টা	হেমায়েত উদ্দিন	এডভোকেট	বাড়ি বরিশালের উজিরপুর
১০	শরণার্থী	আব্দুস সাত্তার মৃধা	এম ও ডি সি (মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনট্রাকুলারি)	শহিদ [এম ও ডি সি'র মত পুরা এক কোম্পানি ফিল্ড তৎপরতায় কাজ করেছে।]
১১	সদর দপ্তরের দায়িত্বে	আবদুর রশিদ	ই বি আর হেড ক্লার্ক সুবেদার	প্রথম জনের শাহাদাতের পর চার্জ নেন সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এনামুল হক এবং সুপারভাইজার আসাদুজ্জামান হাবিব।
১২	অর্থ বিভাগ	হাবিবুর রহমান	বি কম	
১৩	যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন	আব্দুর রশিদ	ই বি আর ক্লার্ক	
১৪	কুরিয়ার কোম্পানি	এনামুল হক	ব্যাংক কর্মচারী	কালকিনি থানায় বাড়ি
১৫	মহিলা বিভাগ	শ্রীমতী আশালতা বৈদ্য		

পরিচালনা কমিটি

সুদক্ষ পরিচালনা কমিটি নেপথ্য শক্তিরূপে যোদ্ধাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের যোগান ও প্রয়োজন মিটিয়েছে। যোদ্ধাদের সাথে গণসংযোগ রচনা করেছে পরিচালনা কমিটি।

হেমায়েত বাহিনীর পরিচালনা কমিটি বা প্রশাসনিক টিম ও বিচার বিভাগ, উপদেষ্টামণ্ডলী সমন্বয়ে গঠিত হেমায়েত বাহিনী :

ক্রমিক নং	নাম	রাজনৈতিক/সামাজিক পরিচিতি	থানা	মন্তব্য
১	আসমত আলি খান	আওয়ামী লীগ	মাদারিপুর	এম পি এ
২	ডা. শ্যামাপদ বৈদ্য	আওয়ামী লীগ	মাদারিপুর	হেমায়েত বাহিনীর প্রধান চিকিৎসক
৩	বাবু হরনাথ বাইন	আওয়ামী লীগ	উজিরপুর	এম পি এ
৪	হেমায়েত উদ্দিন	আওয়ামী লীগ	উজিরপুর	এডভোকেট

৫	আবদুল গফুর	আওয়ামী লীগ	উজিরপুর	ডাক্তার। থানা আওয়ামী লীগ সদস্য
৬	আবদুল জব্বার হাওলাদার	আওয়ামী লীগ	উজিরপুর	
৭	সরদার রহমত জান	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
৮	আবদুল ওহাব খান	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
৯	মোঃ মোজাম সরদার	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
১০	ইউনুস সরদার	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
১১	বাদশা মোল্লা	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
১২	শেখ আকরাম হোসেন	আওয়ামী লীগ	টুঙ্গিপাড়া	বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজন
১৩	শেখ মানিক মিয়া	আওয়ামী লীগ	টুঙ্গিপাড়া	
১৪	বাদশা তালুকদার	আওয়ামী লীগ	টুঙ্গিপাড়া	
১৫	হেমায়েত উদ্দিন	আওয়ামী লীগ	বটিয়াঘাটা (বরিশাল)	ডাক্তার
১৬	আবদুল আজিজ	আওয়ামী লীগ	উত্তর পাড়া	
১৭	গনেশ বাবু	ভাসানি ন্যাপ	কালকিনি	অধ্যক্ষ, শশিধর কলেজ ও হাই স্কুল
১৮	বাবু সুনীল সরকার	কমিউনিষ্ট পার্টি	কালকিনি	
১৯	বাবু মন্টু দাস গুপ্ত	ন্যাপ কমিউনিষ্ট পার্টি	গৌরনদী	
২০	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন মোজাম	ন্যাপ কমিউনিষ্ট পার্টি	গৌরনদী	
২১	বাবু দ্বিজেন ঘট	ভাসানি ন্যাপ	গৌরনদী	
২২	কাজি শাহ আলম	আওয়ামী লীগ	গৌরনদী	
২৩	জেমস মাইকেল রাফেল	আওয়ামী লীগ	গৌরনদী	
২৪	আবদুল গফুর	আওয়ামী লীগ	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৫	ফকরুল ইসলাম	কমিউনিস্ট পার্টি	বরিশাল (সাতলা)	ইউনিয়ন চেয়ারম্যান
২৬	বাবু লক্ষী কান্ত বল	আওয়ামী লীগ	কোটালি পাড়া	প্রাক্তন এম পি
২৭	বাবু চিত্তরঞ্জন গাইন	আওয়ামী লীগ	কোটালি পাড়া	কোটালিপাড়া থানা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি।
২৮	আবদুল গফুর পাইক	আওয়ামী লীগ	কোটালি পাড়া	থানা আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক
২৯	আবদুল আজিজ শেখ	আওয়ামী লীগ	কোটালি পাড়া	সাধারণ সম্পাদক, থানা আওয়ামী লীগ, কোটালিপাড়া
৩০	মুনশি আবুয়াল কাশেম	আওয়ামী লীগ	কোটালি পাড়া	
৩১	কাজি আশরাফ উদ্দিন	আওয়ামী লীগ	কোটালি পাড়া	
৩২	সন্তোষ ঠাকুর	কমিউনিস্ট পার্টি	কোটালি পাড়া	গৌরনদী, বরিশাল
৩৩	আবদুল হালিম	প্রফেসর বাংলা		রামদিয়া কলেজ, রামদিয়া

কোটালিপাড়া থানা মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসনিক কমিটি

টিম সদস্যদের সংখ্যা কিছুটা বড় হবার সঙ্গত কারণ কেউ আহত/নিহত/অনুপস্থিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে অন্যে তাঁর স্থানাপন্ন হতেন।

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	মন্তব্য
১.	শেখ আবদুল আজিজ	সেক্রেটারি, থানা আওয়ামী লীগ	
২.	আবদুল গফুর পাইক	সাংগঠনিক সম্পাদক থানা আওয়ামী লীগ	
৩.	ছোট আজিজ	থানা আওয়ামী লীগ	
৪.	মোহাম্মদ শামসুল হক	কোটালিপাড়া থানা	হেমায়েতের বড় ভাই
৫.	মোহাম্মদ আবুল হোসেন	থানা আওয়ামী লীগ	
৬.	নোমান খন্দকার	থানা আওয়ামী লীগ	
৭.	শ্রীমতী আশালতা বৈদ্য	মহিলা সদস্য	মুক্তিযোদ্ধা
৮.	ডা. লালমোহন বিশ্বাস	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
৯.	বাবু ঠাকুর দাস বিশ্বাস	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
১০.	বাবু পঞ্চানন ওঝা	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
১১.	কবি আবদুস সামাদ	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
১২.	মুনশি আবুয়াল কাশেম	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
১৩.	মোদাচ্ছের হোসেন ঠাকুর	সদস্য, থানা আওয়ামী লীগ	
১৪.	শ্রীধাম ওঝা	সদস্য, থানা আওয়ামী লীগ	
১৫.	মোজাম সরদার	সদস্য, থানা আওয়ামী লীগ	

সামরিক সংগঠন

১.	সর্বমোট সক্রিয় সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা	-৫,৫৫৮
২.	নিয়মিত বাহিনী-বিভিন্ন আর্মি/সার্ভিস	-৩৬৫
৩.	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরাসরি হেমায়েতের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	-৩,২০০
৪.	কোম্পানি সংখ্যা	-৪৩ (হেড কোয়ার্টার আত্মঘাতী কোম্পানি ১+নিয়মিত কোম্পানি ৪২)।
৫.	প্রতি নিয়মিত কোম্পানির প্লাটুন সংখ্যা	-৪
৬.	প্রতি নিয়মিত কোম্পানি প্লাটুন জনবল সংখ্যা	-৩০
৭.	প্রতি নিয়মিত কোম্পানি সেকশন সংখ্যা	-৩
৮.	প্রতি নিয়মিত কোম্পানি প্লাটুন সেকশন জনবল সংখ্যা	-১০
৯.	হেডকোয়ার্টার আত্মঘাতী কোম্পানি জনবল	-৩৫০
১০.	প্রতি কোম্পানিতে কোম্পানি কমান্ডার	-১X৪৩=৪৩
১১.	প্রতি কোম্পানিতে সহকারী কোম্পানি কমান্ডার	-১X৪৩=৪৩
১২.	নিয়মিত কোম্পানির সহকারী প্লাটুন কমান্ডার	=৪২X৪=১৬৮
হেডকোয়ার্টার কোম্পানির কার্যধারার সাথে মিল রেখে তার গঠন প্রণালী ও শৃঙ্খলা বিশেষভাবে আলাদা।		

হেড কোয়াটার কোম্পানি

সূচনা

হেডকোয়াটার কোম্পানি হেমায়েত বাহিনীর প্রাণ শক্তি। এটা মূলত সুইসাইডেল বা আত্মঘাতী কোম্পানি। স্বয়ং বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিন তার কমান্ডার। শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ বাবু তার সেকেন্ড ইন কমান্ড। সবচেয়ে দ্রুত ভ্রাম্যমাণ সঞ্চরণশীল হেডকোয়াটার কোম্পানি। হেমায়েত বাহিনীর তৎপরতার এলাকায় ৩৫০ জনের বহর নিয়ে ঝড়ো গতি ঘুরে বেড়াতেন হেমায়েত।

কর্মধারা

বড় রকমের ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধ সম্ভাবনার স্থলে ত্বরিৎ উপস্থিতি মানেই হেডকোয়াটার কোম্পানি। যুদ্ধস্থলে উপস্থিত নিয়মিত কোম্পানির সাথে মিশে শত্রুর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ চালাত হেডকোয়াটার কোম্পানি। বাহিনী প্রধান নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিটি অন্যান্য কোম্পানিতে যুদ্ধের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিত। পারত পক্ষে রেকি ছাড়া কোন আক্রমণ পরিচালিত হতো না। হেমায়েত বাহিনীর যুদ্ধের ঢং বা ফেইজ মূলত দু প্রকার :

ক। রেইড, এবং খ। এ্যাম্বুশ।

মাঝে মধ্যে পাক আর্মির বড় বড় ঘাঁটিতে প্রথাগত রণকৌশলে আক্রমণ চলতো। আক্রান্ত শত্রুর সাহায্যে যাতে বাইরের সাহায্য আসতে না পারে পূর্বাহ্নে তার অবরোধ ঘটতো।

হেমায়েত বাহিনী কোম্পানি কমান্ডার

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	আর্মি/সার্ভিস	ঠিকানা/থানা	বিশেষ মন্তব্য
১.	মন্মথ শিকদার	এফ এফ	ফ্রিডম ফাইটার	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
২.	আবদুল হাকিম বিশ্বাস	এফ এফ	ফ্রিডম ফাইটার	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৩.	মোহাম্মদ হাছান সেরনিয়াবাত	সুবেদার	আর্মির কোর	কোটালিপাড়া	সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৪.	ইউসুফ আলি শিকদার	নায়েক	ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	কোটালিপাড়া	সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৫.	নজিবর রহমান	এফ এফ	ছাত্র	কোটালিপাড়া	স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৬.	গোকুল চন্দ্র	এফ এফ	যুব শক্তি	কালকিনি	স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৭.	রোকন উদ্দিন খান	এফ এফ	ফ্রিডম ফাইটার	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত

৮.	কাজি আশরাফ উদ্দিন টুকু	বি এল এফ	বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
৯.	মকবুল দাড়িয়া	নায়েক	আর্টিলারি	কোটালিপাড়া	মুক্তিযুদ্ধে পাক আর্মি কর্তৃক ধৃত ও জেলে বন্দি। সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
	আশ্রাফ আলি	এম এফ	ই বি আর	গ্রাম হিরন	মকবুল দাড়িয়ার অনুপস্থিতিতে কোম্পানি কমান্ডার সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১০.	লুৎফের রহমান	সুবেদার	ই পি আর	কোটালিপাড়া	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১১.	শামসুল হক	এফ এফ	ছাত্র	কোটালিপাড়া	স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১২.	চিত্তরঞ্জন বল	এফ এফ	ছাত্র	কোটালিপাড়া	স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৩.	হোসেন আলি	এফ এফ	আনসার	কোটালিপাড়া	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৪.	আবদুল বারি সরদার	হাবিলদার	ই বি আর	গোপালগঞ্জ	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৫.	মোহন সর্দার	এফ এফ	ছাত্র	গোপালগঞ্জ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৬.	আহমদ আলি	এফ এফ	ই পি আর	গোপালগঞ্জ	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৭.	সাহেব আলি	নায়েক	আর্মি	গোপালগঞ্জ	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গুরুতর অপরাধ জনিত কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিচারে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।
১৮.	শেখ সোলায়মান (নায়েক)	এফ এফ	ইবিআর	গোপালগঞ্জ	
	আবুবকার		যুব শক্তি	গোপালগঞ্জ	স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিপর্যয়ে স্থানাপন্ন
১৯.	আবদুল হালিম	এফ এফ	ই পি আর	গোপালগঞ্জ	
২০.	আবদুস সালাম	এফ এফ	ই পি আর	কালকিনি	শহিদ
২১.	কবির আহমদ	সিপাই	আর্মি	কালকিনি	
২২.	মকবুল হোসেন	ল্যান্স নায়েক	ই পি আর	কালকিনি	শহিদ
২৩.	আবদুল জব্বার	সিপাই	এ এস সি	কালকিনি	
২৪.	হাবিবুর রহমান হাওলাদার	সিপাই	ই পি আর	কালকিনি	

২৫.	আবদুল মুকিত	এফ এফ	গেরিলা	টুঙ্গিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
২৬.	বাহার তালুকদার	বিএল এফ	ছাত্র	টুঙ্গিপাড়া	-
২৭.	বেলায়েত হোসেন	এফ এফ	ছাত্র	টুঙ্গিপাড়া	শহিদ
২৮.	আবুল বাশার খান	এফ এফ	ছাত্র	মুকসেদপুর	শহিদ
২৯.	আবদুল ওয়াজেদ মোল্লা	নায়েক	ই বি আর	মুকসেদপুর	শহিদ
৩০.	আবদুর রকিব সেরনিয়াবাত (তিনি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ভাতিজা। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি লাভ করেন। কিন্তু সেখানে যোগদান না করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেন।)	এফএফ ফ্রিডম ফাইটার	ফ্রিডম ফাইটার	গৌরনদী	ছাত্রনেতা। প্রথমে হেমায়েত বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড স্বাধীনতার পর আততায়ীর গুলিতে নিহত
৩১.	সেকান্দার আলি	এফ এফ	আনসার	গৌরনদী	-
৩২.	নুর মোহাম্মদ গোমস্তা	এফ এফ	আনসার	গৌরনদী	-
৩৩.	ইউসুফ আলি	এফ এফ	ফ্রিডম ফাইটার	গৌরনদী	গুরুতর অপরাধজনিত কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিচারে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত
৩৪.	আবদুল খালেক পাইক	এফ এফ (মুক্তি ফৌজ)	এ এস সি	গৌরনদী	সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৩৫.	শামসুল হক	এফ এফ	এ এম সি	গৌরনদী	-
৩৬.	আলমগীর হোসেন আলম	এম এফ	ই বি আর	স্বরূপকাঠি	সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নায়েক; জয়দেবপুর থেকে হেমায়েতের যুদ্ধসাথী
৩৭.	ইদ্রিস আলি	এফ এফ	ই পি আর	উজিরপুর	-
৩৮.	মোহাম্মদ ওসমান শেখ	এফ এফ	আনসার	নলছিটি	শহিদ
৩৯.	ইব্রাহিম খান	এফ এফ	মুজাহিদ	কাপাসিয়া	শহিদ
৪০.	মোশারফ আলি	এম এফ	ই বি আর	গ্রাম : হিরন থানা?	-
৪১.	হাবিলদার আবুল হাশেম	এস এস সি	এ এস সি	?	পরবর্তীকালে সুবেদার পদে অবসরগ্রহণ

হেমায়েত বাহিনীর ক্যাম্প/ব্যাজ-গ্রুপ কমান্ডার

• কোম্পানি কমান্ডারদের বাইরে হেমায়েত বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্প/ব্যাজ-গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে অনেক কাজ করেছেন। একই ব্যক্তি ক্যাম্প কমান্ডারের সাথে কোম্পানি কমান্ডারদের কাজও করেছেন। একাধিক স্থানে তাঁদের নামের উপস্থিতির কারণ দ্বৈত দায়িত্ব।

ক্রমিক নং	নাম	পেশা	থানা	মন্তব্য
১.	আহসান হাবিব	আর্মি	উজিরপুর	মরহুম। আর্মি এডুকেশন কোরে লেফটেন্যান্ট।
২.	আবদুর রকিব সেরনিয়াবাত	ছাত্র	গৌরনদী	স্বাধীনের পর শত্রুর গুলিতে নিহত। শহিদ। পাকিস্তান আর্মিতে লেফটেন্যান্ট পদে ভর্তি। পরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান।
৩.	আবদুস সাত্তার মৃধা	আর্মি	গৌরনদী	টরকি নগর হাটের যুদ্ধে শহিদ।
৪.	আবুল হাশেম মীর	আর্মি হাবিলদার	গৌরনদী	এ এস সি দায়িত্ব ছেড়ে পলায়ন।
৫.	নূর মোহাম্মদ গোমস্তা	আনসার কমান্ডার	গৌরনদী	যুদ্ধ কৌশলী
৬.	শাহ সেকান্দার	আনসার কমান্ডার	গৌরনদী	যুদ্ধ কৌশলী
৭.	ইব্রাহিম খাঁন	মুজাহিদ	কাপাসিয়া	শহিদ ঢাকা জয়দেবপুর থেকে হেমায়েত সাথী
৮.	আবদুল জব্বার	আর্মি	কালকিনি	এ এস সি
৯.	মকবুল হোসেন	ল্যান্স নায়েক ই পি আর	কালকিনি	রামশীল যুদ্ধে সম্মুখ সমরে শহিদ।
১০.	আবদুস সালাম	ই পি আর	কালকিনি	টুঙ্গিপাড়া, পাটগাতি নুরু মিয়ার বাড়ির রাজাকার ক্যাম্প অপারেশনে শহিদ।
১১.	শ্রী গোকুল চন্দ্র	যুবক	কালকিনি	
১২.	আবদুল খালেক পাইক	আর্মি	আগৈলঝাড়া	
১৩.	বেলায়েত হোসেন	ছাত্র	টুঙ্গিপাড়া	শহিদ
১৪.	আবদুল হালিম	এয়ার ফোর্স	গোপালগঞ্জ	
১৫.	গোলাম মোস্তফা	আর্মি / ইপিআর	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	ডাক নাম-মর্তুজা অস্ত্রাগার কমান্ডার (প্রথমে নায়েক; পরবর্তীকালে হাবিলদার মেজর)
১৬.	আবদুল বারি	আর্মি / ইপিআর	গোপালগঞ্জ	পরবর্তীকালে হাবিলদার মেজর
১৭.	আহমদ আলি	ই পি আর	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	অবসরপ্রাপ্ত নায়েব সুবেদার

১[illegible]	আবদুল হাকিম বিশ্বাস	ছাত্র	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
১৯.	লুৎফর রহমান	ই পি আর	কোটালিপাড়া	পরবর্তীকালে নায়েব সুবেদার
২০.	হাসান সেরনিয়াবাত	আর্মি	কোটালিপাড়া	পরবর্তীকালে নায়েব সুবেদার
২১.	ইউসুফ শিকদার	আর্মি / ইবিআর	কোটালিপাড়া	নায়েক
২২.	আতিয়ার মোল্লা	ছাত্র	কোটালিপাড়া	ডাক্তার। প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে প্রেরিত হন।
২৩.	মন্মথন শিকদার	ছাত্র	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
২৪.	মকবুল হোসেন দাড়িয়া	আর্মি	কোটালিপাড়া	সিপাই
২৫.	সেকান্দার আলি	আর্মি	কোটালিপাড়া	নায়েক থেকে হাবিলদার। জিয়া ক্যু-তে চাকরিচ্যুত।
২৬.	নুরু মিঞা	আনসার	কোটালিপাড়া	
২৭.	মনিন্দ্র	ছাত্র	কোটালিপাড়া	
২৮.	শামসু মিঞা	যুবক	কোটালিপাড়া	
২৯.	শেখ জাবেদ আলি	ওয়ারেন্ট অফিসার (এয়ারফোর্স)	কোটালিপাড়া	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেন্টার অধিনায়ক
৩০.	আবদুল খালেক শেখ	ইঞ্জিনিয়ার কোর	কোটালিপাড়া	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। সেন্টারে প্রধান প্রশিক্ষক
৩১.	সুবেদার কলিম উল্যা	ইপিআর	কোটালিপাড়া	যুদ্ধ কৌশলী
৩২.	শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ	শিক্ষক	কোটালিপাড়া	স্বাধীনতার পর নির্বাচন কোন্দলে নিহত
৩৩.	আবদুল মালেক সরদার	আর্মি /ইবিআর	কোটালিপাড়া	যুদ্ধ কৌশলী
৩৪.	কমান্ডার আলম	আর্মি /ইবিআর	স্বরূপকাঠি	পরবর্তীতে অবসরপ্রাপ্ত নায়েক
৩৫.	কমান্ডার জহুরুল হক	আনসার কমান্ডার	কোটালিপাড়া, গ্রাম: টুপারিয়া	বাংলাদেশ ও ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; অপঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।
৩৬.	কমান্ডার মো: ইসহাক চৌধুরী	পুলিশ	কোটালিপাড়া, গ্রাম: কুশলা	যুদ্ধ কৌশলী
৩৭.	কমান্ডার কাজি আবদুল হামিদ	পুলিশ	কোটালিপাড়া, গ্রাম:কুরপালা	প্রশিক্ষণ কমান্ডার
৩৮.	হাতেম আলি	সেপাই-পুলিশ	উজিরপুর, বরিশাল	
৩৯.	হিংগুল হাজরা	এ.এস.আই., পুলিশ	দক্ষিণপাড়, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪০.	মনিরুজ্জামান বিশ্বাস	নায়েব সুবেদার, আর্মি	বর্ষাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪১.	আলি আহমেদ	সুবেদার, আর্মি	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	

৪২.	মোঃ সাহেব আলি	পুলিশ সিপাই	আলিঠাপাড়া, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যুদ্ধ কৌশলী: মুক্তিযুদ্ধকালে বিশেষ অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।
৪৩.	শেখ আসাদুজ্জামান হাবিব	করণিক	সোনাটিয়া, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪৪.	এ কে এম সারোয়ার জান বিশ্বাস	পুলিশ	গোপালগঞ্জ	
৪৫.	আবদুল বারি সরদার	হাবিলদার ইবিআর	কাঠি, গোপালগঞ্জ	
৪৬.	আবদুল হাকিম বিশ্বাস	কমান্ডার ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	

নোট : কেউ শহিদ হলে, শাস্তি পেলে, স্থানান্তরে পোস্টিং হলে কমান্ডারদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এমতাবস্থায় ৪২টি কোম্পানির জন্য কোম্পানি কমান্ডার-এর সংখ্যা ৬২-পর্যন্ত গড়িয়েছে।

সামরিক সংগঠন হেমায়েত কোম্পানি কমান্ডার -স্থানাপন্ন সহকারী

স্থানাপন্ন সহকারী

ভ্রাম্যমাণ সদর দপ্তর, পরিচালনা কমিটি, কোম্পানি কমান্ডার জাতীয় সকলের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক প্রশাসনিক স্থানাপন্ন সহকারীর ব্যবস্থা ছিল। মূল প্রধানের অবর্তমানে বা তাঁর যুদ্ধাহত ধরনের অপরাগতায় অ্যাসিস্ট্যান্টগণ কমান্ড পরিচালনা করতেন। ৪২টি কোম্পানি কমান্ডার ও বাহিনী প্রধানের বেলায় কঠোর কড়াকড়িতে বিশেষভাবে এই নিয়ম পালিত হতো। ফলে অভাবিত আকস্মিক যত বিপদাপদই আসুক হেমায়েত বাহিনীতে কখনো নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দেয় নি।

কমান্ড শৃঙ্খলা

হেমায়েত বাহিনীর হেডকোয়ার্টারের সাথে একই কমান্ডে জড়িত ৪২টি কোম্পানি। অস্ত্র সজ্জিত সশস্ত্র যোদ্ধার সর্বমোট সংখ্যা ৫,৫৫৮ জন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা ৩,২০০ জন। পুরা হেমায়েত বাহিনীতে রেগুলার আর্মির সৈনিক ছিলেন ৩৬৫ জন। ভারতের অস্ত্র ও ভারতে ফ্রিডম ফাইটার হেমায়েত বাহিনীতে খুবই কম ছিল।

যৌথ কমান্ডে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে হেমায়েত গ্রুপ। বিভিন্ন সময় মাদারিপুরের

খলিল ও ফরিদপুরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুলের সহযোগিতায় পাক আর্মির বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য এসেছে। আর্থিক ও গোলাবারুদ দিয়ে হেমায়েত বাহিনীকে সাহায্য করেছেন নিম্নের সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা ও বরেণ্য ব্যক্তিগণ:

ক। স্বরূপকাঠির জাহাঙ্গীর বাহাদুর।
খ। মুলাদির কুদ্দুস মোল্লা।
গ। মোল্লার হাটের সিরাজ।
ঘ। গৌরনদীর নিজাম।
ঙ। মুকসেদপুরের কহিনুর।
চ। গোপালগঞ্জের সেহাবউদ্দিন
ছ। বরিশাল সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর।

হেমায়েত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধার ধরন ছিল পাঁচ (৫) প্রকার :

ক। পাক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর বিভিন্ন আর্ম/সার্ভিসের সৈনিক, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর-পরবর্তীতে বিডিআর), পুলিশ। তিন বাহিনী, ইপিআর পুলিশের অবসর প্রাপ্ত সৈনিক। ছুটিতে আসা সকল বাহিনীর সৈনিক।
খ। প্যারা মিলিশিয়া আনসার, মোজাহিদ, ইউনিভার্সিটি অফিসার ট্রেনিং কোর (ইউওটিসি), জুনিয়ার ক্যাডেট কোর (জেসিসি) জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব শক্তি।
গ। ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলা।
ঘ। স্থানীয় প্রশিক্ষণে তৈরি মুক্তিযোদ্ধা।
ঙ। স্বতন্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা।

হেমায়েত বাহিনীর মূল শক্তি স্বাধীনতাকামী জাগ্রত জনতা। তাঁর ব্যবস্থাপনার স্বেচ্ছাসেবী দল (ভলান্টিয়ার) বাহিনীর সদস্য সংগ্রহ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নারী-পুরুষ সমন্বয়ে অনন্য পঁয়ষট্টি জন বীরাঙ্গনার যুদ্ধ গোয়েন্দাগিরি সেবাশুশ্রূষার বিশেষ কার্যক্রম ধন্য হেমায়েত বাহিনী। সর্ব প্রকার যোদ্ধার জন্য বাহিনীর কড়া শৃংখলা মানা ছিল বাধ্যতামূলক।

শৃংখলা ভঙ্গের জন্য আদালতে অপরাধীদের যথারীতি বিচার হত। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের একাধিক সুযোগ ছিল। গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত গড়াত। আদালতে প্রাণদণ্ড প্রাপ্তদের প্রাণ ভিক্ষা মঞ্জুরের বিশেষ অধিকার বাহিনী প্রধান সংরক্ষণ করতেন।

চৌদ্দজন কুখ্যাত দালাল মুক্তি-হাতে নিহত হয়। প্রমাণিত চোর ডাকাতের ছাব্বিশ জনের চোখ উৎপাটন করা হয়। নারী ধর্ষণের অপরাধে অবলা নারীর গায়ে যে হাত দিয়েছে তার কব্জি পর্যন্ত কর্তন করা হতো। নারী কেলেংকারিতে জড়িয়ে হেমায়েত

বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার ইউসুফ ও ফজলুলকে ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ দিতে হয়। সশস্ত্র গ্রুপের সাথে আত্মগোপন ও সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ভোগ করেন কোম্পানি কমান্ডার সাহেবালি। এভাবে অমার্জনীয় গুরুতর অপরাধে হেমায়েত বাহিনীর সর্বমোট চারজন কোম্পানি কমান্ডারকে ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ হারাতে হয়।

লক্ষ টাকার প্রলোভনে বাহিনী প্রধান হত্যায় নিয়োজিত বাঙালি ষোড়শী হিন্দু ধৃত কমলাবতী রাণীর প্রাণদণ্ড মওকুফ করে হৃদয় ঔদার্যের পরিচয় দেন হেমায়েত। নারী মমতার দুর্বলতার বীর হৃদয়ের কোমলে মধুর চরিত্র মাধুর্যের এক অপার বিস্ময় হেমায়েত।

হেমায়েত ঔদার্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর মিলে ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১। সে-দিবাগত রাতে ছয়শত পাক ব্যাটালিয়ানের ওপর কোটালিপাড়া থানায় মুক্তি আক্রমণ পরিচালিত হয়। বাহিনী প্রধান হেমায়েত এবং ক্যাপ্টেন বাবুলের যৌথ কমান্ডে একনাগাড়ে দশ ঘন্টা প্রলয়ংকরী যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আলিউজ্জামান মারাত্মকভাবে আহত হন। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই বিশজন শত্রু নিহত হয়। অবাঙালি পাক সৈন্য পালিয়ে রক্ষা পায়। নিয়মিত বাহিনীর বায়াত্তর জন বাঙালিসহ রাজাকার, আলবদর, আল শামস জাতীয় প্যারামিলিশিয়ার তিনশতের আত্মসমর্পণের মধ্যে জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়। যোদ্ধার প্রতি যোদ্ধার সম্মানে এঁদের কাউকে প্রাণে মারা হয় নি।

১৫ ডিসেম্বর ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কোটালিপাড়া ও আশপাশের দুশত পঞ্চাশ জন পাক-সদস্য পলাতক দালাল হেমায়েত বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। মুক্তি সদর মাঝবাড়ি হাই স্কুল থেকে তাদের পরবর্তী সরকারি আদালতে বিচারের জন্য গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

শেষ পর্যন্ত হেমায়েতের সুবিচার পাকিস্তানি আর্মিকে পর্যন্ত মুগ্ধ করে। এক যুদ্ধে ছয়জন পাক-আর্মি হেমায়েত বাহিনীর হাতে ধৃত হয়। বীর হৃদয় ঔদার্যে তাঁদের সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দেন হেমায়েত। তাঁরা সুস্থ শরীরে পাক আর্মিতে ফিরে গেলে সবাই বিস্মিত হয়! এয়সি মুক্তি হেমায়েত কা ইনছাফ!! পাক আর্মির বহু কথিত কোশেশ ইন্ডিয়ান আর্মির হাতে আত্মসমর্পণের স্লোগান অসত্য প্রমাণিত হয়েছে হেমায়েতের কৃপার কাছে। তাদের কথা ছিল : আমরা হেমায়েতের হাতে আত্মসমর্পণ করবো। গৌরনদী ও কালিয়া থানার সর্বশেষ পাক আর্মি কন্টিনজেন্ট হেমায়েতের নাম শোনা মাত্র আত্মসমর্পণ করে। শত্রু বাঙালি হেমায়েতের ওপর পাক আর্মির আস্থার কারণ নিয়মিত আর্মির শৃংখলায় তাঁর বাহিনীর পরিচালনা। তাঁর বাহিনীতে বিভিন্ন আর্ম-সার্ভিসের তিনশত পঁয়ষট্টি জন নিয়মিত সৈন্যের উপস্থিতি ছিল। প্রায় এক ব্যাটালিয়নের অর্ধেক নিয়মিত আর্মির উপস্থিতির সুযোগেই তিনি কড়াকড়ি সেনা শৃঙ্খলায় তাঁর বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছিলেন। রেগুলার আর্মির দ্বারাই তিনি হেমায়েত বাহিনীতে আর্মি রেগুলেশন চালু করেন। আত্মসমর্পণকারী পাক আর্মির বিশ্বাস ছিল হেমায়েতের হাতে তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না। শৃংখলা এতই কড়া ছিল যে, শৃংখলা ভাঙ্গার মানুষটি যত বড় পদমর্যাদারই হোন, পান আনতে চুন খসলে আর রক্ষা ছিল না।

নিয়মিত আর্মির শৃংখলায় চালিত বলেই হেমায়েত বাহিনীর বিচারে সুনাম অক্ষুণ্ন

ছিল। প্রমাণিত অন্যায়ে নিজের প্রথিত যশা কোম্পানি কমান্ডারকে যুদ্ধের মধ্যেই ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করেন হেমায়েত। তাঁর বিচার যে কেমন নির্মম; তিনি যে কেমন ধাতুর মানুষ তা শত্রু মিত্র সবাই জেনেছিলেন। শত্রুর আস্থা অর্জনের মত বিরল গুণ হেমায়েতের মত যোদ্ধাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

দারুণ কড়া প্রশাসনিক শৃংখলায় সুবিন্যস্ত হেমায়েত প্রভাবিত এলাকা। স্ব স্ব এলাকার সর্বময় সার্বিক দায়িত্ব গ্রুপ কমান্ডারদের ওপর ন্যস্ত ছিল। বাহিনী প্রধান তিনশত পঞ্চাশজনের একটি সুইসাইডেল বা আত্মঘাতী কমান্ডো বহর নিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ো গতিতে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। বড় ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সম্ভাব্য যুদ্ধ এলাকায় সুইসাইডেল গ্রুপ পূর্বাহ্নে মোতায়েন করা হতো। তখন তাঁরা সে এলাকার কোম্পানির সাথে মিশে একই কমান্ডে যুদ্ধ করতো। বাহিনী প্রধান স্বয়ং সে সব ভয়ঙ্কর যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন।

প্রশিক্ষণ প্রশাসন সমন্বয়

যোদ্ধারা অর্থাভাবে যাতে চুরি ও লুটতরাজে না যায় তার জন্য তাদের মাসোহারা ব্যবস্থা ছিল। নবীন মুক্তিযোদ্ধাদের মাস্টার রলে পকেট এলাউন্স দেয়া হতো। যানবাহন হিসাবে হেমায়েত বাহিনী ছোট বড় তিনশত পঁচিশখানা নৌযান ব্যবহার করতো। নৌযানের মাঝি মাল্লাদের মাসিক বেতন নির্ধারিত ছিল। তাঁরা নিয়মিত খোরাকি পেতেন। হেমায়েত বাহিনী স্থাপিত কয়েকটি শরণার্থী ক্যাম্পে নিয়মিত রেশন সাপলাই চলতো।

ধোপা, নাপিত, ঝাড়ুদার, কসাই, মাঝি, ক্লার্ক জাতীয় স্টাফ, অস্ত্র-গোলাবারুদ (ম্যাগজিন বা কোত) রক্ষণ পার্টি, গোয়েন্দা, সাংবাদিক, কুরিয়ার, মিকানিকস সমন্বিত প্রশাসনে হেমায়েত বাহিনী সত্যিকার অর্থেই একটি নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতই ছিল সুবিন্যস্ত ও সুসংহত।

হেমায়েত বাহিনীর ৩০ জন শহিদ

ক্রমিক নং	নাম	গ্রাম	থানা	জিলা	যুদ্ধ ক্ষেত্রের নাম
১.	মোহাম্মদ গোলাম আলি	পূর্ণবর্ত	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
২.	মোহাম্মদ মোক্তার হোসেন	গোপালপুর	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
৩.	আবুল বাসার হাওলাদার	গোপালপুর	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
৪.	আবুল খায়ের খান	গোপালপুর	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
৫.	মোতাহার খান	গোপালপুর	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
৬.	গোলাম আলি (ছাত্র)	গোপালপুর	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	শিকির বাজার
৭.	আকবর গাজী	গোপালপুর	কোটালি পাড়া	ফরিদপুর	
৮.	মোক্তার হোসেন লাড্ডিয়া	আওতিয়া	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
৯.	আবু তালেব কাজি	নিতাইকুণ্ড	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
১০.	বেলায়েত শেখ	মান্দ্রবাড়ি	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
১১.	শ্রী রতন কুমার	উনিশয়া	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	চৌধুরীর হাট

১২.	কদভানু বিবি		কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	মিয়ার হাট
১৩.	জহিরুল হক ফকির (পিতা-মকবুল ফকির)	দিঘলিয়া	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
১৪.	বেলায়েত হোসেন	শ্রীরাম কান্দি	গোপালগঞ্জ	ফরিদপুর	টিহটি
১৫.	মকবুল হোসেন	গোপালপুর	কালকিনি	ফরিদপুর	রামশীল
১৬.	আবদুস সালাম (সিপাই)	ভাসার	কালকিনি	ফরিদপুর	টুঙ্গিপাড়া শেখ সাহেব বাড়ি
১৭.	আবুল বাশার খান	ছাগলছিড়া	মুকসেদপুর	ফরিদপুর	জলিল পাড়া
১৮.	ওসমান শেখ	বৈচমতি	নলছিটি	বরিশাল	রামুখা ব্রিজ
১৯.	আবদুস সাত্তার মৃধা	নলচিড়া	গৌরনদী	বরিশাল	টরকি বন্দর
২০.	নুরু বেপারি	বাসাইল	গৌরনদী	বরিশাল	গৌরনদী রাস্তার যুদ্ধ
২১.	সেকান্দর আলি	বাসাইল	গৌরনদী	বরিশাল	গৌরনদী রাস্তার যুদ্ধ
২২.	পরিমল শীল	চাঁদশী	গৌরনদী	বরিশাল	গৌরনদী রাস্তার যুদ্ধ
২৩.	মোহাম্মদ ইব্রাহিম	চুনুরথি	কাপাসিয়া	ঢাকা	হরিনা হাটি
২৪.	বেলায়েত (ছাত্র)		টুঙ্গিপাড়া	ফরিদপুর	কুরপালা
২৫.	তৈয়ব আলি বখতিয়ার		আগৈলঝাড়া	বরিশাল	চৌধুরীর হাট
২৬.	মোঃ মিলু চৌধুরী (পিতা-বজলু চৌধুরী)	কুশলা	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	নিজ গ্রামে মাগরিবের নামাজ শেষে বের হতেই পাক আর্মির গুলিতে শহিদ
২৭.	মোঃ আক্রামুজ্জামান	মানিহার	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	নিজ গ্রামে মাগরিবের নামাজ শেষে বের হতেই পাক আর্মির গুলিতে শহিদ
২৮.	মোঃ বজলু মোল্লা	মানিহার	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	"
২৯.	মনসুর আলি শেখ	মানিহার	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	"
৩০.	রাজা মোল্লা	মানিহার	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	"

*হেমায়েত বাহিনীতে সশস্ত্র যুদ্ধে সর্বমোট শহিদ হয়েছেন ১৫ জন।

হেমায়েত বাহিনীর আহত ২০ জন

ক্রমিক নং	নাম	গ্রাম	থানা	জিলা	যুদ্ধ ক্ষেত্রের নাম
১.	হেমায়েত উদ্দিন (বাহিনী প্রধান; সঙ্গে আরও দুইজন সহকর্মী)	টুপারিয়া	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	রামশীল
২.	আলাউদ্দিন তালুকদার	পিঞ্জুরি	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	কোটালিপাড়া
৩.	সিরাজুল ইসলাম খান	কেরধরা	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	কোটালিপাড়া
৪.	আলিউজ্জামান	ধোড়ার	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	কোটালিপাড়া ৩য় যুদ্ধ
৫.	আবদুস ছাত্তার শাহ	মদন পাড়া	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	কোটালিপাড়া
৬.	লিয়াকত শাহ	মদন পাড়া	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	,,
৭.	মুজিবুর রহমান	ডহর পাড়া	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	কোটালিপাড়া ২য় যুদ্ধ
৮.	সিদ্দিক তালুকদার	সোনার গেতি	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
৯.	আবদুল খালেক	সিতাই কুন্ড	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	গোপীনাথপুর, গোপালগঞ্জ দখলে যাবার পথে
১০.	আজিম উদ্দিন	বর্ষা পাড়া	কোটালিপাড়া	ফরিদপুর	
১১.	সৈয়দ মনিরুল ইসলাম	নাঠৈ	গৌরনদী	বরিশাল	
১২.	ইদ্রিস আলি	নরসিংহল	গৌরনদী	বরিশাল	কট গাছ তলা
১৩.	কাঞ্চন শিকদার	আশোকাঠি	গৌরনদী	বরিশাল	উজির পুর
১৪.	আলাউদ্দিন দাড়িয়া	গৈলা	গৌরনদী	বরিশাল	
১৫.	শামসুল হক	পয়সারহাট	গৌরনদী	বরিশাল	পয়সার হাট
১৬.	কওছার মোল্লা	মানিহার	গৌরনদী	বরিশাল	নিজ গ্রাম মানিহার পাক আর্মির গুলিতে আহত
১৭.	আবদুস সাত্তার মৃধা		গৌরনদী	বরিশাল	
১৮.	আবদুল আজিজ (আজিম)		কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	সশস্ত্র যুদ্ধে আহত
১৯.	কে,এম, জাকির হোসেন				
২০.	এ কে এম সারোয়ার জান বিশ্বাস		গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	কমান্ডার

পুনশ্চ : [এদের মধ্যে রণাঙ্গনে সশস্ত্র যুদ্ধে আহত হন মোট ৯ জন]

প্রশিক্ষণ

সূচনা : জয়দেবপুর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হেমায়েত প্রশিক্ষণ চালু করেন। ২৮ মার্চ জয়দেবপুরের পূর্বে মাত্রা হাই স্কুলে প্রশিক্ষণ যাত্রা শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নে এমন প্রথাগত দ্রুত প্রশিক্ষণ অন্য কোথাও চালু হয়েছে কিনা সন্দেহ। তারপর থেকে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ শুরু। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সঞ্চরণশীল ভ্রাম্যমাণ। পুরুষ-নারী, আত্মঘাতী গ্রুপ জাতীয় সব ধরনের প্রশিক্ষণ চলেছে।

চার পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

ক। প্রাথমিক পর্যায়-রিফ্রেসার্স কোর্স

প্রথম পর্যায় : কিছুটা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, দীর্ঘদিন অস্ত্রের ব্যবহার থেকে দূরে এমন সৈনিক, পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ, এমওডিসি, ইউওটিসি ধরনের প্যারা মিলিশিয়াদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ বা রিফ্রেসার্স কোর্স।

খ। দ্বিতীয় পর্যায়- নতুন রিক্রুট ট্রেনিং

দ্বিতীয় পর্যায় : নতুন রিক্রুটদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সেন্টারে প্রশিক্ষণ। এ পর্যায়ে মহিলা মুক্তির আলাদা প্রশিক্ষণ।

গ। তৃতীয় পর্যায়-ভারতে প্রশিক্ষণ

তৃতীয় পর্যায় : অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সেন্টারের চাপ কমানো। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অস্ত্র গোলাবারুদের স্বল্পতায় সক্রিয় যুদ্ধে লাগানোর অসুবিধা। দ্রুত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নতুন রকমের মুক্তি সৈনিকের চাহিদা জাতীয় বহুতর কারণে প্রশিক্ষণযোগ্য যুব শক্তির তালিকা তৈরি হতো। তাদের নিম্নরূপ সার্টিফিকেট দিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠান হতো ঃ

F.F. CERTIFICATE
OF LOCAL TRAINING CENTRE
(UNDER HEMAYET BAHINI)
Kotwalipara, Faridpur.

Certified that F.F No..................Name..
..................F/Name...
Vill...P.O..
P.S..Dist...
He worked under my command as a Freedom Fighter from..........................to......................1971.
I wish him every success in life.

....
Comd
HEMAYET BAHANI
(Under 9 & 8 Sector)
Kotawalipara, Faridpur.

এফ. এফ. সার্টিফিকেট
স্থানীয় প্রশিক্ষণ সেন্টার
(হেমায়েত বাহিনীর অধীনে)
কোটালি পাড়া, ফরিদপুর

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে এফ. এফ. নং. ....নাম................................
পিতার নাম..গ্রাম.....................
................ডাকঘর...জিলা..........................
তিনি আমার কমান্ডে ফাইটার হিসেবে কাজ করেছেন। তারিখ ....
হইতে...................... পর্যন্ত ১৯৭১। আমি তাঁর জীবনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

....
কমান্ড
হেমায়েত বাহিনী
(৯ ও ৮ নং সেক্টরের অধীনে)
কোটালি পাড়া, ফরিদপুর

ঘ। চতুর্থ পর্যায় : পাক আর্মি প্রশিক্ষণ

চতুর্থ পর্যায়ে পাক আর্মির হাতে মুক্তি প্রশিক্ষণ। এটাও একটি ভাল পদ্ধতি ছিল মুক্তিবাহিনীর জন্য। রাজাকারে লোক ভর্তি (সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) করিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে স্থানীয় কমান্ডারদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে নিজস্ব কিছু লোক রাজাকারে ভর্তি করানো হতো। স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনের ওপর প্রবল চাপ আসতো রাজাকারে লোক ভর্তির জন্য। রাজাকারে লোক ভর্তি হলে এলাকা পাক অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকতো। এ-সব মুক্তি রাজাকারগণ ছিলেন পাক দুর্গে মুক্তি চর বা ইনফরমার। সশস্ত্র পাক আক্রমণের আগাম সংবাদ মুক্তি রাজাকার মুক্তি ফৌজকে পাচার করতো। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা/ব্রিজ/ফেরিতে প্রহরারত এসব রাজাকার মুক্তিদের সহজ চলাচল নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক করতো। তারা গোপনে মুক্তিদের অস্ত্র/এমুনিশন জাতীয় উপকরণাদি দিয়ে সাহায্য করতো। সময় সুযোগে তারা অস্ত্র গোলাবারুদসহ কেটে পড়ে মুক্তিবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করত।

ঙ। পাক আর্মি প্রশিক্ষণ স্থানীয় মুক্তি প্রশিক্ষণ

বিদেশের মাটিতে নিয়মিত সুশৃংখল প্রশিক্ষণ চালুর বহু পূর্বেই শত্রু কবলিত বাংলাদেশের গভীর অভ্যন্তরে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ চালু করেন দূর-দৃষ্টির হেমায়েত। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতে পারে। প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের শূন্য স্থান পূরণে নতুন রক্ত চাই। স্বাধীনতাকামী যুব শক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রশিক্ষণ আবশ্যক। নিয়মিত পাক সেনার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপযোগী শক্ত হাতের পাকা ট্রেনিং আবশ্যক। বেঙ্গল হাবিলদার হেমায়েতের হাতে সে প্রশিক্ষণ চালু করা হয় :

প্রশিক্ষণ সেন্টার-মাত্রা হাই স্কুল : ২৮ মার্চ জয়দেবপুরে পূর্বে মাত্রা হাই স্কুলে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। জয়দেবপুর অস্ত্র ভাণ্ডার থেকে লুটা অস্ত্রে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। জয়দেবপুর ও ইপিআইডিসি দখলে সহায়তাকারী স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গি শ্রমিক, ছাত্র-জনতার যুব শক্তির জন্য ছিল এই অস্ত্র প্রশিক্ষণ। তাদের সাথে প্যারামিলিশিয়া, আনসার, মোজাহিদ, পুলিশ এরাও ছিলেন। সর্বত্র আর্মি ও ইপিআরদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধরা হত। এটা ছিল চারদিনের সংক্ষিপ্ত বেসিক প্রশিক্ষণ। স্থানীয় আনসার কমান্ডার আব্বাস আলি ও শিক্ষক সিরাজ শিকদারের উৎসাহে হেমায়েতের নেতৃত্বে এই প্রশিক্ষণ শিবির চালু করা হয়েছিল।

ফরিদপুর শহর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু :

ক। প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শহরের পূর্ব এলাকা কমলাপুর।

খ; দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শহরের দক্ষিণ এলাকা চর কমলাপুর।

ফরিদপুরে প্রথম সুসংগঠিত অস্ত্র প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় হেমায়েত উদ্দিনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। ইতোপূর্বে ফরিদপুর স্টেডিয়াম এবং রাজেন্দ্রপুর কলেজ ইউওটিসি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণের সূচনা হয়। মুক্তিযুদ্ধে কারও প্রচেষ্টা খাট করা উদ্দেশ্য নয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সার্ভিং বেঙ্গল হাবিলদার ঘা খাওয়া হেমায়েত-এর হাতে দক্ষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুদক্ষ সৈনিক পয়দা করা হয়, যারা মুক্তিযুদ্ধে সুযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হন।

জহরের কান্দি প্রশিক্ষণ সেন্টার ঃ কোটালিপাড়া থানার জহরের কান্দি হাই স্কুলে দীর্ঘ মেয়াদে মুক্তি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। কোটালিপাড়া থানার দখল করা একশত চুয়ান্নটি অস্ত্রে এখানে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালানো হয়। প্রাক্তন সামরিক ও আধাসামরিক লোকজনের ১০০ জনকে তিন দিনের সংক্ষিপ্ত রিফ্রেসার্স কোর্স প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এখানে। এতদিন পর্যন্ত হেমায়েত-এর পতাকাতলে সমবেত সকল যুব শক্তিকে বলা হত ভলান্টিয়ার কোর। তারাই এবার হার্ড কোর মুক্তিবাহিনীতে আত্মস্থ হন। পুরাদলের নাম হয় 'হেমায়েত বাহিনী'।

১৫ মে গৌরনদী থানার বাত্তা হাই স্কুলে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। দলে দলে দামাল যুব শক্তি হেমায়েত বাহিনীতে যোগদান করে। তারা প্রশিক্ষণের জন্য ছুটে আসে জহরের কান্দি। প্রথমবার কোটালিপাড়া লুটের এক সপ্তাহর মধ্যে হেমায়েত-এর ফোর্সের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশত বায়ান্ন। প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে প্রশিক্ষণ পান ষোলশত মুক্তিপাগল যুবক। তিন মাসের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণে এখানে প্রায় চার হাজার মুক্তি সেনার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

প্রশিক্ষণ সেন্টার উপলক্ষে হাই স্কুলে স্বাধীনতার পতাকা উড়ানো হয়। বাত্তা হাই স্কুলের স্বাধীনতার পতাকা শত চেষ্টায়ও শত্রু স্থানচ্যুত করতে পারে নি। দখলদার

দেশে আরো দুটি স্থানে পূর্বাপর সগৌরবে উড়েছে স্বাধীনতার পতাকা। যশোর বেনাপোল সীমান্ত চৌকির জয়বাংলা পতাকার ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি পাক আর্মি। রংপুর রৌমারি থানার পাক আর্মিকে দিনে দুপুরে আচমকা চমকে বন্দি করে ৩ ইস্ট বেঙ্গলের সুবেদার আফতাব। রৌমারি থানার স্বাধীনতা পতাকার গৌরবদীপ্ত উড্ডয়ণ অক্ষুণ্ন ছিল।

প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক ঃ জহরের কান্দি সুবৃহৎ প্রশিক্ষণ সেন্টারের চালিকা শক্তি হেমায়েত বাহিনীর প্রশাসনিক কমিটি। প্রশিক্ষণ কমান্ডার বিমান বাহিনীর ফ্লাইট সার্জেন্ট শেখ জবেদ আলি। চীফ ইন্‌স্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ার কোরের শেখ আবদুল খালেক। আর্মির ১৮ জন রিক্রুট ইনস্ট্রাক্টরসহ নিয়মিত বাহিনীর প্রশিক্ষক ইনষ্ট্রাক্টরের সংখ্যা ১৫। এসবের বাইরে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন শাখার ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ দেবার মত ওস্তাদ ছিল। ফিল্ড ট্রেনিং ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের দুটাই এখানে নিয়মিত চলতো।

কোটালিপাড়া থানার জহরের কান্দি হাইস্কুলে হেমায়েত বাহিনী স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	থানা	জেলা	মন্তব্য
১.	ওয়ারেন্ট অফিসার মো: জবেদ আলি	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	কমান্ডিং অফিসার
২.	আবদুল খালেক শেখ (প্রয়াত)	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	চীফ ইন্সট্রাক্টর
৩.	হাঃ লেঃ কাজি আবদুল হামিদ	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	ইন্সট্রাক্টর
৪.	হেকমত আলি ফকির	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	ইন্সট্রাক্টর
৫.	মোঃ আশরাফ আলি	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	ইন্সট্রাক্টর
৬.	মোঃ হাতেম আলি	উজিরপুর	বরিশাল	ইন্সট্রাক্টর
৭.	এমদাদুল হক	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	ইন্সট্রাক্টর
৮.	মোঃ আব্বাসউদ্দিন	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	ইন্সট্রাক্টর
৯.	নরেশচন্দ্র বিশ্বাস	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	সহযোগী ইন্সট্রাক্টর
১০.	সার্জেন্ট কাঞ্চন শিকদার	গৌরনদী	বরিশাল	ইন্সট্রাক্টর
১১.	নিয়ামত আলি শেখ	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	ইন্সট্রাক্টর
১২.	মহানন্দ বিশ্বাস	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	ক্যাম্প পরিচালক
১৩.	সুবেদার হাসান সর্দাবাত (সেয়নিয়াবাত)	কোটালিপাড়া	গোপালগঞ্জ	ইন্সট্রাক্টর

নারিকেল বাড়িয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কোটালিপাড়ার পাশে নারিকেল বাড়িয়ায় স্থাপিত হয় হেমায়েত বাহিনীর প্রশাসনিক সদর। এখানে মহিলা প্রশিক্ষণ ক্যাডার চালু করা হয়। আশালতা বৈদ্যের নেতৃত্বে মহিলা ক্যাডার প্রশিক্ষণ লাভ করেন। পঁয়ষট্টি জনের সুদক্ষ মহিলা ক্যাডার প্রশিক্ষণ হয়। অস্ত্র প্রশিক্ষণের সাথে তাঁদের নার্সিং প্রশিক্ষণও চলে। তাঁদের প্রশিক্ষণ ছিল আত্মঘাতী বা সুইসাইডেল ধরনের। তাঁদের অস্ত্রের মধ্যে ছুরি ও এসিড/আর্সেনিক বিষ প্রধান। হয় শত্রু মেরে মর না হয় ধরা পড়লে আত্মঘাতিনী হও। গুপ্তচর কাজের জন্য তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এখানকার ফিল্ড হাসপাতালের মাধ্যমে তাঁরা সেবিকার প্রশিক্ষণ নিতেন।

পয়সার হাট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বরিশাল জেলার গৌরনদীর পয়সার হাটে মুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানকার মুক্তি প্রশিক্ষণ ও নার্সিং সেন্টারকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত মুক্তির ফিল্ড হাসপাতাল চালু হয়। স্বাধীন দেশে তা 'পয়সার হাট ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার' হিসেবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এখনও চলছে।

আত্মঘাতী প্রশিক্ষণ

সুইসাইড বা আত্মঘাতী দলের ভিন্নতর প্রশিক্ষণ। বুদ্ধি, আস্থা, সাহস, ক্ষিপ্রগতির কর্মচাঞ্চল্য দেশ প্রেমের কষ্টি পাথরে আত্মঘাতীদের বেছে নেয়া হতো। সক্রিয় যুদ্ধে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের পরই তাঁরা নির্বাচিত হতেন। নারী-পুরুষ দুদল থেকেই তাঁদের বাছাই করা হতো। "সুইসাইড গ্যাং-এর জোয়ানদের পিস্তল, রিভলবার, গ্রেনেডে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। এদের প্রধান অস্ত্র ছিল ছুরি ও এসিড। শর্ত ছিল, "নিজে মরিবার পূর্বে পাক আর্মি ধ্বংস করিতে হইবে।"

হেমায়েত বাহিনীর ৪২টি কোম্পানির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী প্রশিক্ষণে গড়া হয় হেডকোয়াটার কোম্পানি। বস্তুত এই হেডকোয়াটার কোম্পানির পুরাটাই ছিল আত্মঘাতী বাহিনী। সবচেয়ে দুরূহ সংকটজনক অপারেশনে নামতো সুইসাইডেল হেডকোয়াটার কোম্পানি। আত্মঘাতী বাহিনীর পরিচালক স্বয়ং বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিন।

প্রশিক্ষণ জোয়ার

জুন/জুলাই ১৯৭১: মুক্তিযুদ্ধ তখন চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে ধাবিত। চতুর্থবার ফরিদপুরে পাক শক্তির অন্যতম কেন্দ্র কোটালিপাড়া থানা মুক্তি দখলে আসলে জনতার মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার প্লাবন বয়ে যায়। গোপালগঞ্জ থেকে বার বার নির্লজ্জ বেহায়ার মত এসে পাক আর্মি আস্তানা পাতে কোটালিপাড়ায়। জুলাই মাসে কাঁটা তারের বেড়ায় গোপালগঞ্জের পাক দুর্গ মুক্তি হেরাসমেন্ট ফায়ারে ছেঁড়াভেড়া হয়ে যায়। একের পর এক মুক্তি সাফল্যে জনতার আস্থা বাড়ে,তারা চুম্বক আকর্ষণের মত ছুটে আসে প্রশিক্ষণের জন্য।

মহিলা ক্যাডার

স্বদেশ ও বিদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে সম্ভবত হেমায়েত বাহিনীই স্বতন্ত্র মহিলা যোদ্ধা ক্যাডারে সমৃদ্ধ। পঁয়ষট্টি জন সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বীরাঙ্গনাধন্য এই হেমায়েত বাহিনী। শ্রীমতী আশালতা বৈদ্য মহিলাযোদ্ধা কমান্ডার। মহিলা যোদ্ধারা যুদ্ধ প্রশিক্ষণের সাথে সেবিকা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তাই তাঁদের দ্বৈতরূপ। তাঁরা সেবিকা ও যোদ্ধা। তাঁরা জনতার সাথে মিশে মূল্যবান গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতেন। নারীর শ্রেষ্ঠ রত্ন সম্ভ্রমের বিনিময়ে তাঁরা শত্রু ক্যাম্পের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য সংগ্রহ করতেন। এমনি এক মৃত্যুঞ্জয়ী মহিলা কমলাবতী রাণী। অনেক বীরাঙ্গনা সম্মুখ সমরে শাহাদতের বীর শয্যা বেছে নিয়েছেন। তাঁদের অন্যতম শহিদ কদবানু বিবি। জয় বা মৃত্যুর মাঝামাঝি তাঁদের দ্বিতীয় কোন সুযোগ ছিল না। ধরা পড়া মাত্র সায়ানাইড জাতীয় বিষপানে আত্মহত্যার অমোঘ বিধান তাঁরা মেনে নেন। আর্সেনিক ও সায়ানাইড জাতীয় বিষের পুরিন্দা ছিল তাঁদের নিত্য সঙ্গী। তাঁদের আত্মত্যাগ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টার দা সূর্যসেনের মৃত্যুঞ্জয়ী ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যোদ্ধাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনতার বেদিমূলে হারিয়ে যাওয়া আত্মাহুতির অজ্ঞাতনামা বঙ্গ মাতাদের সবার নাম আজো সংগৃহীত হয় নি। হেমায়েত বাহিনীর মহিলা যোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আজও তৈরি হয়নি।

হেমায়েত বাহিনীর ক'জন অগ্রণী মহিলা যোদ্ধা

ক্রমিক নং	নাম	পদ	ঠিকানা
১.	শ্রীমতী আশালতা বৈদ্য	কমান্ডার	বর্তমান ঠিকানা-পরিচালক সূর্যমুখী সংস্থা, ২২ দিলকুশা বা/এ ঢাকা-১০০০।
২.	মনারাণী ব্যাণার্জি স্বামী ডাঃ বি কে রক্ষিত	যোদ্ধা, সেবিকা	স্থায়ী ঠিকানা-সুজিত এন্ড ব্রাদার্স, গ্রাম-পয়সার হাট, পোঃ-পয়সার হাট, থানা- আগৈলঝাড়া, বরিশাল।
৩.	পুষ্প রাণী হালদার স্বামী ; রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস	যোদ্ধা, সেবিকা	গ্রাম-আগর কান্দা, পোঃ-কোটালিপাড়া, থানা-কোটালি পাড়া, গোপালগঞ্জ
৪.	মঞ্জু রাণী হালদার	যোদ্ধা, সেবিকা	বর্তমান ঠিকানা পেশা : শিক্ষয়িত্রী স্বামী : পিটার হালদার, গ্রাম+পোঃ- রাজিহার, থানা-গৌরনদী, বরিশাল
৫.	অঞ্জলি চৌধুরী পিতা-অধর চন্দ্র চৌধুরী	যোদ্ধা/সংগঠক	গ্রাম-বাগবাড়ি, পোঃ-রামশীল থানা-কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ। বর্তমানে আমেরিকায় অধ্যয়নরত

৬.	জবানু বিবি	সশস্ত্র যোদ্ধা	মিয়ার হাট যুদ্ধে শহিদ থানা-কোটালি পাড়া জিলা-প্রাক্তন বৃহত্তর ফরিদপুর
৭.	সোনেকা রাণী রায়, পরবর্তী মিসেস হাজেরা হেমায়েত, পিতা- সুরেন্দ্রনাথ রায়	সশস্ত্র যোদ্ধা, সেবিকা	
৮.	মোমেনা বেগম	স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	বাহিনী প্রধান হেমায়েতের ছোট বোন
৯.	বিমলা রানী	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	গোপালগঞ্জ
১০.	তাহমিনা বেগম	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
১১.	ফাতেমা রহমান (প্রমিলা হালদার)	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	জহরের কান্দি, বর্তমানে উপ পরিচালক, রেডিও বাংলাদেশ
১২.	জোবায়দা খাতুন	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	খেপু পাড়া, বরিশাল। আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান।
১৩.	রেখারানী গুণ পিতা রমেশচন্দ্র গুণ	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	দশড়া, মানিকগঞ্জ
১৪.	সাজেদা বেগম	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	কালিহাতি, টাঙ্গাইল। হেমায়েতের যাত্রা পথের সাথী।
১৫.	মজিদা বেগম স্বামী : শামসুল হক	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
১৬.	মরিয়ম বেগম স্বামী : নজির হোসেন	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
১৭.	লুৎফুন্নেসা পিতা : নজির হোসেন	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
১৮.	নাজমা বেগম (কানন বণিক) পিতা : জগবন্ধু	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ
১৯.	বিভারানী তালুকদার	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
২০.	পুষ্পলতা বাড়ৈ পিতা: আব্দুর রউফ বিশ্বাস	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	কান্দি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
২১.	সাহিদা বেগম পিতা: আবদুর রউফ বিশ্বাস	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	কান্দি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
২২.	সেলিনা আক্তার, স্বামী : সৈয়দ মোতাহারউদ্দিন	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	নলচিড়া, কান্তপাশা, গৌরনদী, বরিশাল
২৩.	জাহেদা বেগম পিতা: আলী আহমদ ভূঁইয়া	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	সৈলা, গৌরনদী, বরিশাল
২৪.	ফরিদা বেগম পিতা : গনি বেপারি	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	রাংতা, রাজিহার, গৌরনদী, বরিশাল
২৫.	মেরি এস. হাজরা পিতা: সন্তোষ হাজরা	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	নারায়ণখোলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ

২৬.	স্বর্ণলতা কালিয়া পিতা: নিশিকান্ত কালিয়া	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	গোসাইবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
২৭.	সাহেদা লস্কর	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	রাজৈর, মাদারিপুর
২৮.	কহিনুর বেগম	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	কাসিমনগর, রাজৈর, মাদারিপুর
২৯.	নূরজাহান বেগম	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	রতনদি, গলাচিপা, পটুয়াখালি
৩০.	আলো রানী পিতা : সূর্যকান্ত	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৩১.	কমলা রানী	গোয়েন্দা, নর্তকী	পয়সারহাট, গৌরনদী, বরিশাল
৩২.	সখিনা বেগম স্বামী: আবদুল করিম	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	টুপিরিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৩৩.	হাজেরা বেগম স্বামী : মোকাম্মেল	সশস্ত্র যোদ্ধা/সেবিকা	টুপিরিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৩৪.	কান্তিলতা বৈদ্য পিতা: শ্রীহরিপদ বৈদ্য মা: শ্রীমতী সরলাময়ী বৈদ্য	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: লাটেংগা, পো: ভাঙ্গারহাট, থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৩৫.	উষা রাণী বৈদ্য পিতা: শ্রীহরিপদ বৈদ্য মা: শ্রীমতী সরলাময়ী বৈদ্য	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: লাটেংগা, পো: ভাঙ্গারহাট, থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৩৬.	সুরমা রানী বাড়ৈ মা: হেমলতা বাড়ৈ পিতা: পুনর্দান বাড়ৈ	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: বেতকাছিয়া, পো: নারিকেল বাড়ি, থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৩৭.	মনোরমা বাড়ৈ মা: হেমলতা বাড়ৈ পিতা: পুনর্দান বাড়ৈ	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: বেতকাছিয়া, পো: নারিকেল বাড়ি, থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৩৮.	উষারাণী মধু পিতা: সিদ্ধেশ্বর মধু	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: বেতকাছিয়া, পো: নারিকেল বাড়ি, থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৩৯.	মঞ্জুরাণী বাড়ৈ	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: বেতকাছিয়া, পো: নারিকেল বাড়ি, থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৪০.	বিনতিরাণী বিশ্বাস	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম:+পো: লখির ঝাড়, থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৪১.	ঊর্মিলারাণী জয়ধর পিতা: সতীশচন্দ্র জয়ধর	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: লাটেংগা, পো: ভাঙ্গারহাট, থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৪২.	সুষমারাণী জয়ধর পিতা: বিপিন জয়ধর	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: ভুতরিয়া, পো: নারিকেলবাড়ি থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৪৩.	বঙ্গলক্ষী ঢালি পিতা: নরেন্দ্রনাথ ঢালি	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: জয়েরকান্দি, পো: রামশীল, থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৪৪.	হেমপ্রভা হালদার পিতা: পরিদাশ হালদার	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: জয়েরকান্দি, পো: রামশীল, থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ

৪৫.	স্বর্ণলতা রায় পিতা: জিতেন্দ্রনাথ রায়	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম:+পো: নারিকেলবাড়ি থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৪৬.	কণিকা রায় পিতা: জিতেন্দ্রনাথ রায়	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম:+পো: নারিকেলবাড়ি থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৪৭.	সরলাসুন্দরী বৈদ্য পিতা: হরিপদ বৈদ্য	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: লাটেংগা, পো: ভাঙ্গারহাট থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৪৮.	বীনারাণী বিশ্বাস পিতা: ঠাকুরনাথ বিশ্বাস	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: পাইনকারবাড়ি, পো: ভাঙ্গারহাট, থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৪৯.	ইতারাণী ওঝা পিতা: শ্রীধাম ওঝা	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: পাইনকারবাড়ি, পো: ভাঙ্গারহাট, থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫০.	রেখারাণী বৈদ্য	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: পাইনকারবাড়ি, পো: ভাঙ্গারহাট, থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫১.	কুসুমরাণী জয়ধর পিতা: বিপিন জয়ধর	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: তুতরিয়া, পো: নারিকেলবাড়ি থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫২.	শেফালি (শিবু) বসু পিতা: হেমেন্দ্রপ্রসাদ বসু	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: বটবাড়ি, পো: নারিকেলবাড়ি থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫৩.	রাধারাণী মজুমদার পিতা: নকুলেশ্বর মজুমদার	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: জাঠিয়া, পো: কুশলা বাজার থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫৪.	তপিরাণী বাড়ৈ	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: বড়বাড়ি, পো: নারিকেলবাড়ি থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫৫.	মায়ারাণী হালদার পিতা: সতীশচন্দ্র হালদার	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: নারায়নখানা, পো: শুকগ্রাম হাট, থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫৬.	নয়ারাণী হালদার	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: নারায়নখানা, পো: শুকগ্রামহাট, থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫৭.	ডা. ফিলিপস	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: নারায়নখানা, পো: শুকগ্রামহাট, থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫৮.	সুজাতা মল্লিক পিতা: বাদব মল্লিক	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: লাটেংগা, পো: ভাঙ্গারহাট থানা+জিলা: গোপালগঞ্জ
৫৯.	স্মৃতিরাণী বাড়ৈ পিতা: সিদ্ধেশ্বর বাড়ৈ	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	-
৬০.	সত্যপ্রাণী বাড়ৈ	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	-
৬১.	শিব মধু পিতা: বিপিন মধু	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম:+পো: নারিকেলবাড়ি থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ

৬২.	রেখারাণী মধু	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	-
৬৩.	অনিলা বিশ্বাস পিতা: সহরাজ বিশ্বাস	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম: সিফটিবাড়ি, পো: রাধাগঞ্জ থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৬৪.	সুষমারাণী হালদার	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম+ পো: উজিরপুর, বরিশাল
৬৫.	স্বর্ণলতা পিতা: জিতেন্দ্র নাথ রায়	মুক্তিযোদ্ধা/সেবিকা	গ্রাম:+পো: নারিকেলবাড়ি থানা: কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ

*ক্রমিক নং ৩৪ থেকে ৬৫ পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি (আই.ইউ.বি.এ.টি.) এর এমবিএ'র ছাত্রী আশালতা বৈদ্য-এর সৌজন্যে সংগ্রহীত। লেখক কন্যাসম মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্যের নিকট ঋণী।

গোয়েন্দা বিভাগ

জনগণ সংযোগ শূন্য বাংলাদেশে পাক আর্মি পদচাটা দালাল উৎসের সূত্রে নির্ভর করতো। শত্রু দুর্গেও সচল সক্রিয় নিষ্ক্রিয় মুক্তি গোয়েন্দা থাকতো। গোয়েন্দা যোগাযোগের সূত্রে পাক আর্মি চলাচলের আগাম সংবাদ পেত মুক্তিবাহিনী। মুক্তি সাফল্যের অন্যতম কারণ সঠিক গোয়েন্দা তথ্য।

হেমায়েতবাহিনীর অন্যান্য বিভাগের মত গোয়েন্দা বিভাগও বিশেষ সাফল্যের দাবি রাখে। বহুতর বিজয়ের সাফল্য ও গৌরবে তারা গৌরবান্বিত। মূলতঃ তাদের তথ্যের যোগান ও গোয়েন্দাগিরিতেই হেমায়েতবাহিনীর বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ৪২টি কোম্পানিতে বিভক্ত ছিল হেমায়েত বাহিনী। এদের প্রত্যেকটির জন্য গোয়েন্দা প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিল। এঁরা একদিকে পাকবাহিনী, পাক-বাহিনীর দালাল, রাজাকার-আল বদরসহ সকল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের খবর যেমন সংগ্রহ করেছেন, তেমনি হেমায়েত বাহিনীর কোন সদস্য অন্যায়ভাবে কারও কিছু নষ্ট করেছে কিনা সে-সবও লক্ষ্য রেখেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, মুক্তিযুদ্ধকালে এই গোয়েন্দারা জীবন বাজি রেখে অদ্ভুতসব সত্যিকারের তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সময়মত বাহিনী প্রধানকে সে-সব অবহিত করেছেন এবং আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নতুন তথ্যের সন্ধানে। বস্তুত, এ-কারণেই হেমায়েতবাহিনীর সাফল্য সংহত করা সহজতর হয়েছে।

বাহিনী প্রধানের নিজস্ব কিছু বিশ্বাসী গোয়েন্দা ছিল। এঁরা ছিলেন একান্তই আলাদা। বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা জানতেন না এঁদের সম্বন্ধে। সম্পূর্ণ গোপনে এবং কেবলমাত্র বাহিনী প্রধানের নির্দেশে এঁরা কাজ করতেন।

গোয়েন্দা বিভাগে নারী-পুরুষ সবাই ছিলেন। প্রয়োজনানুযায়ী যেখানে যাকে দরকার সেভাবেই তাঁদের কাজে লাগানো হতো। তবে গোয়েন্দা রিপোর্ট যেমনই হোক, পৃথক তদন্ত না করে কোন প্রকার অ্যাকশন নেয়া হতো না কারও বিরুদ্ধেই। এটাই ছিল হেমায়েত বাহিনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

হেমায়েত বাহিনী গোয়েন্দা যোগাযোগের সমন্বয়কারী

ক্রমিক নং	নাম	থানা	মন্তব্য
১.	রাফেল ব্যাপারি	গৌরনদী	ধর্মে খ্রিস্টান
২.	সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী	গৌরনদী	ব্রাহ্মণ
৩.	মন্টু দাস গুপ্ত	গৌরনদী	
৪.	কাজি শাহ আলম	গৌরনদী	
৫.	মনিরুল হক সেন্টু	গৌরনদী	
৬.	আবদুর রাজ্জাক সেরনিয়াবাত	গৌরনদী	
৭.	মুনশি আবুল কাশেম	কোটালিপাড়া	
৮.	শামসুল হক মিঞা	কোটালিপাড়া	হেমায়েত বাহিনী প্রধান হেমায়েতের বড় ভাই
৯.	শ্রীধাম ওঝা	কোটালিপাড়া	
১০.	ডাক্তার লাল মোহন বাবু	কোটালিপাড়া	
১১.	বকুল মজুমদার	কোটালিপাড়া	
১২.	ডা. সুশীল মজুমদার	কোটালিপাড়া	
১৩.	বাবু লক্ষী কান্ত বল	কোটালিপাড়া	
১৪.	আবদুর রব বিশ্বাস	কোটালিপাড়া	
১৫.	মুজাফফর আহম্মদ	আগৈলঝাড়া	ডাক নাম-মুজাম
১৬.	সরদার রহমত জান	গোপালগঞ্জ	
১৭.	আবদুল ওহাব খান	গোপালগঞ্জ	
১৮.	সোহরাব হোসেন তালুকদার	গোপালগঞ্জ	
১৯.	আসমত আলি	টুঙ্গি পাড়া	
২০.	শেখ আকরাম হোসেন	টুঙ্গিপাড়া	
২১.	ডাক্তার রণজিৎ ব্যানার্জি	পয়সার হাট	
২২.	সুনীল সরকার	কালকিনি	
২৩.	মোঃ ফকরুল ইসলাম	গৌরনদী, বরিশাল	
২৪.	মোতালেব মোল্লা	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৫.	মাস্টার আনোয়ার হোসেন	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৬.	মোঃ নজির আহমদ	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৭.	কে. এম. চাঁদ মিয়া	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৮.	এস. এম. খলিলুর রহমান	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৯.	ডা. সাহাবুদ্দিন	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩০.	খোন্দকার মোঃ ইসমাইল	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩১.	ডা. চাঁদ মিয়া	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩২.	আতিয়ার রহমান ঘরামি	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৩.	বাবু চিত্তরঞ্জন বল	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৪.	কুটি মিয়া সরদার	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৫.	বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায়	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	

৩৬.	সিদ্দিক তালুকদার	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৭.	মোঃ নিজামউদ্দিন খান	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৮.	জোনাস ঢাকি	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৯.	নিকোলাস সরকার	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪০.	ফ্রান্সিস ঢাকি	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪১.	কুদ্দুস হাওলাদার	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪২.	চিত্তরঞ্জন বাড়ৈ	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪৩.	মোঃ শহিদুল্লাহ	আগৈলঝড়া, বরিশাল	

* একশতের বেশি গোয়েন্দা কাজ করতো সবার অগোচরে। তাঁরা অন্যান্য কাজের মাঝে নিজেদের ছুপিয়ে রাখতেন।

এসবের বাইরে বিশেষ প্রয়োজনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রেকি ও প্যাট্রল পার্টি ছিল। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিশে থেকে টিমওয়ারি কাজ করতেন।

বিশেষ প্রয়োজনে মহিলা গোয়েন্দা সৃষ্টি। তাঁরা জনতার মাঝে মিশে খবর সংগ্রহ করতেন। গ্রেনেড, পিস্তল, ছুরি, এসিড, আর্সেনিক বিষ জাতীয় অস্ত্রে তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল। তাঁরা সেবিকা প্রশিক্ষণ ও নার্সিং কাজে দক্ষ ছিলেন। ফলে যুদ্ধ অঞ্চলে তাঁরা বহুবিধ কাজে লাগতেন। প্রয়োজনে সম্মুখ সমরে সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাথে তাঁরা লড়তেন। শত্রু নিয়োজিত হেমায়েত ঘাতিনী চর ষোড়শী কমলাবতী রাণী ধরা পড়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাহিনী প্রধানের ঔদার্যে রক্ষা পেয়ে তিনি নারী মুক্তি গোয়েন্দায় যোগদেন। ক্রীড়া, নাচ, গান, কামকলার সাফল্যে তিনি পাক অফিসারের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন। এমনি বিচিত্র চিত্রের হেমায়েত নারী গোয়েন্দা।

সরবরাহ বিভাগ-অতিরিক্ত খাদ্য ভাণ্ডার

সরবরাহ ৪ প্রকার :

ক। জনবল, খ। অস্ত্র-গোলাবারুদ, গ। চিকিৎসার ঔষধ এবং ঘ। খাদ্য-বস্ত্র-অর্থ।

ক। পাক প্রতিরক্ষা বাহিনী ও প্যারা মিলিশিয়ার দলত্যাগী নিয়মিত অনিয়মিত সৈন্য। সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর দলত্যাগী সৈন্যদের মধ্যে আর্মির সদস্যদের ভূমিকা প্রধান। দ্বিতীয় শক্তি দলত্যাগী ইপিআর (পরবর্তীতে বিডিআর) পর্যায়ক্রমে আসে পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ, এমওডিসি, ইউওটিসি, ছাত্র-জনতা।

খ। পাক আর্মির নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রে গড়ে উঠে হেমায়েত বাহিনী। পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ অস্ত্রে সাজে মুক্তি। বিভিন্ন সংগঠন-ব্যাংক, কারখানা, রাইফেল, ক্লাব, ইউওটিসি, সিভিল গান জাতীয় অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তি। মোটা দাগে দখল অস্ত্রের কিছু নমুনা :

১.২৮ মার্চ জয়দেবপুর ২ ইবিআর অস্ত্রগার লুট।

২. ঢাকা-টাঙ্গাইলের পথে তিন ট্রাক পাক আর্মির অস্ত্র লুট।

৩. কোটালি পাড়া থানা ১ম ও ২য় আক্রমণে অস্ত্র লুট।

৪. মাটি ভাঙ্গা যুদ্ধে পাক অস্ত্র দখল।

৫. পাঠগেতি নুরু চেয়ারম্যান ও ....শেখ মুজিব বাড়ির পাক শত্রু প্রতিহত করে অস্ত্র দখল।

৬. রামশীল যুদ্ধে তিনশত অস্ত্রের সাথে তিন হাজার রাউন্ড গুলি দখল।

গ। চিকিৎসার ঔষধ

স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার ঔষধ সংগ্রহ হত। স্থানীয় ডাক্তার, ঔষধের দোকান, ঢাকা প্রবাসীদের সাহায্যের ঔষধ।

ঘ। খাদ্য-বস্ত্র-অর্থ

জনগণের খাদ্যে মুক্তির প্রতিপালন সম্ভব হয়। জনতার মাঝে মিশে থেকেছে মুক্তি। প্রশিক্ষণ সেন্টার ও ক্যাম্পে মুক্তির সন্নিবেশন হলে জনতার স্বেচ্ছাদানের খাদ্যে মুক্তি খেয়েছে। সরকারি খাদ্য গুদাম থেকেও মুক্তি খাদ্য সংগ্রহ করতো। কোটালিপাড়া থানা দখলে অস্ত্রের সাথে খাদ্য ভাণ্ডার লুটেছে মুক্তি। বাঁশবাড়িয়ায় দখল করা কার্গো থেকে প্রচুর চট ও ভোজ্য তৈল দখল করে মুক্তি। গোপালগঞ্জের খাদ্য গুদাম থেকে লুটে নেয় ষোল হাজার মন খাদ্য। মুক্তিবাহিনীর বিশেষ কোন ইউনিফরম না থাকায় বস্ত্রের অভাব হয় নি। গ্রামের সাধারণ জনতার লুঙ্গি-গামছাই মুক্তির পোশাক। পাক আর্মি, পুলিশের থানা, রাজাকার ক্যাম্প লুটা প্রচুর লোটা-কম্বল বিছানা মুক্তির দখলে আসে। পাশাপাশি পাবলিক ডোনেশন মুক্তির মূল অর্থের উৎস। যুদ্ধে লুটা মালামাল মুক্তির প্রশাসনিক দপ্তরে জমা হতো। প্রতিটি আক্রমণের বিজয়ে মুক্তির কিছু না কিছু অর্থ আয় হতো। স্থানীয় ব্যাংক, ট্রেজারি থেকে অর্থ আদায়। ঢাকা প্রবাসীরা অর্থ সাহায্য পাঠাতেন। অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে হেমায়েত বাহিনী সহযোগী অন্যান্য মুক্তিদেরও সাহায্য করতো। অর্থের অভাব হলে প্রশাসনিক টিমের মাধ্যমে রিকুইজিশন করে অর্থ আনা হতো। হেমায়েত বাহিনীর জন্য প্রশাসনিকভাবে গঠিত একটি সেন্সর কমিটি ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে যারা দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, উক্ত সেন্সর কমিটির জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের জমির ফসল কেটে এনে মুক্তিবাহিনীর কাজে কাজে লাগানো হতো।

সেন্সর কমিটির নিজস্ব ভলান্টিয়ার ফোর্স ছিল। মুক্তি ও ভলান্টিয়ারগণ মিলে শরণার্থীদের ফেলে যাওয়া জমির ফসল ও অন্যান্য ফলমূল (ডাব, নারিকেল, কলা) ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে বিক্রয় করেও বাহিনীর খরচ মেটানোর জন্য অর্থের যোগান দেয়া হত। যে-সব গরিব লোক মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তাদের ঘরের খরচের জন্য এখান থেকে অর্থ যোগান দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। হেমায়েত বাহিনীর সৈন্যদের চলাচলের জন্য ৩৬০টি নৌকা ভাড়া করা ছিল। অনেকে এমনিতেও নৌকা দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের জন্য। কিন্তু মাঝির পেট তো চালাতেই হত। শরণার্থীদের ফেলে যাওয়া জমির ফসল বিক্রির অর্থে এসব নৌকার মাঝিদের খরচ মেটানো হতো।

সাতক্ষীরা ও আশাশুনি থানায় দেখেছি, একটা স্বেচ্ছা-স্বরাজের মত-মানুষ পরিত্যক্ত জমির ধান মুক্তি-ক্যাম্পে পৌঁছে দিত। দেশ স্বাধীনের পর এসবের একটি হিসাব নিয়ে দেখা গেছে তখনও এই কমিটির হাতে জমা ছিল অঢেল অর্থ ও ফসল। থানা প্রশাসক শেখ আবদুল আজিজ ও আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি বাবু চিত্তরঞ্জন গাইনের হাতে থেকে যায় আট হাজার মণ ধান, হিন্দু বাড়ি থেকে লুটে আনা দু'হাজারেরও বেশি ভাঙা আসবাবপত্র।

হেমায়েত বাহিনী প্রধান দখলদার দেশে আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে বিশেষ নির্দেশ জারি করেছিলেন ঃ যারা ভুল করে, লোভের বশবর্তী হয়ে, অবস্থার শিকার হয়ে, বা বিভিন্ন কারণে হিন্দু বাড়ির জিনিসপত্র নিয়েছে, স্বেচ্ছায় মুক্তি-ক্যাম্পে জমা দিলে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। যদি কারও বাড়িঘর সন্ধান করে লুটের মালামাল পাওয়া যায়, তবে সে-বাড়ির মালিকের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এমন চরম পত্রের ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল জমা পড়ে বাহিনী-ক্যাম্পে। এই হুকুম নাজিলের পর এমনকি পিতল-কাঁসা-থালা-ঘটি-বাটিসহ সোনারূপা পর্যন্ত জমা পড়ে ক্যাম্পে। সে-সব মালামাল মুক্তি প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টারে দায়িত্বশীল কর্মকর্তার তত্ত্বধানে জমা করা হতো। এর জন্য একটি ইনভেন্টরি তালিকা ছিল, কে কি মালামাল কবে কার কাছে জমা দিল সে-সব লিপিবদ্ধ হত অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে। সে হিসাব মতে স্বাধীনতার পরে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ লাখ টাকার মালামাল থেকে যায় থানা প্রশাসক লীগ সেক্রেটারির হাতে।

যুদ্ধের পর হেমায়েত বাহিনী প্রধান চিকিৎসার জন্য বিদেশে, মুক্তিরা যার যার নিজ নিজ পেশায় ও স্থানে, পাবলিকের মালামাল থেকে যায় লীগ সেক্রেটারির তত্ত্বধানে। মূলতঃ এসব নিয়েই হেমায়েতের সঙ্গে শেখ আবদুল আজিজ ও লীগ সেক্রেটারির গণ্ডগোলের সূচনা।

অস্ত্র গোলাবারুদ ভাণ্ডার

হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎস শত্রুর নিকট থেকে ছিনিয়ে আনার গৌরব। প্রধান কটি উৎস :

ক। পাক আর্মিকে যুদ্ধের মাধ্যমে হারিয়ে দখল লুট।

খ। পুলিশ/সরকারি অস্ত্রাগার দখল/লুট।

গ। পুলিশের থানা/ঘাঁটি/ফাঁড়ির আত্মসমর্পণ, বিজয়, দখল/লুট।

ঘ। সশস্ত্র যুদ্ধে পরাজিতত/আত্মসমর্পণ/ভাগোড়া রাজাকার/অস্ত্র গোলাবারুদ।

ঙ। প্রতিরক্ষা বিভাগের আর্মি, নেভি, বিমান বাহিনীর সশস্ত্র পাক পক্ষ-ত্যাগীর অস্ত্র। পাক পক্ষত্যাগী পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ অস্ত্র।

চ। ইউ ও টি সি (ইউনিভার্সিটি অফিসার ট্রেনিং কোর যা পরবর্তী বি এন সি সি) জাতীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অস্ত্র গোলাবারুদ।

ছ। পাকদলে কাজ করা পুলিশ রাজাকারদের গোপনে অস্ত্র, এমুনিশন, বিস্ফোরক সরবরাহ। রাজাকার আত্মীয়দের ওপর চাপ প্রয়োগে এমুনিশন অস্ত্র সংগ্রহ। একবার এক বাঙালি রাজাকার মুক্তিবাহিনীকে এমুনিশন সরবরাহ করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পাক আর্মির গুলিতে তাঁর তাৎক্ষণিক মৃত্যু।

জ। মুক্তি রাজাকার অস্ত্র। মুক্তি কমান্ডারদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে মুক্তিরা রাজাকার ভর্তি হতো। প্রশিক্ষণ শেষে সময় সুযোগ মত তারা অস্ত্র গোলাবারুদসহ পালিয়ে এসে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তির জনবলের সাথে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভাণ্ডার বাড়াত।

ঝ। পাতানো খেলার অস্ত্র। বাঙালি পুলিশ রাজাকার পাতানো খেলার মত গুলি বিনিময় করে বা বিনা গোলাগুলিতে প্রচুর অস্ত্র গোলাবারুদ ফেলে যেত। অনেক ক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধে সশস্ত্র পাক আর্মি, বাঙালি পুলিশ, রাজাকার আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুক্তির অস্ত্রগার সমৃদ্ধ করত।

ঞ। বেসামরিক জনতার ফায়ার আর্ম। বেসামরিক জনতার লাইসেন্সকৃত ও লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র। ডাকাতের অস্ত্র। রাইফেল ক্লাবের অস্ত্র। বেসামরিক ফায়ার আর্ম বেচা কেনার দোকানের অস্ত্র। ব্যাংক-বীমা প্রহরীর অস্ত্র। অফিস, গুদাম, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা কেন্দ্র প্রহরার অস্ত্র। বেসামরিক ও অবাঙালি ও বিহারিদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র। এমনিভাবে সংগ্রহের বহুতর পিস্তল, রিভলবার, স্টেনগান, কাটা রাইফেল, গাদা বন্দুক, শিকারের বন্দুক, পয়েন্ট টু টু (.২২) বোর রাইফেল, ব্রিটিশ থ্রি নট থ্রি রাইফেল জাতীয় অস্ত্র।

ট। হেমায়েত বাহিনী কখনো ভারত বা অন্য কোন দেশের অস্ত্র গোলাবারুদের সাহায্য নেয় নি। ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছোট ছোট গেরিলা গ্রুপ হেমায়েত এলাকায় তাঁর নির্দেশিত পথে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কাজ করতো। সে সব গ্রুপপকে নিজস্ব অস্ত্র ভাণ্ডারের অস্ত্র গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করতেন হেমায়েত। বিদেশী সাংবাদিকদের তাঁর ভূগর্ভস্থ মজুদ অস্ত্র ভাণ্ডার দেখে বিস্ময় মন্তব্য বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।

হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্রগার ও গোলাবারুদের দায়িত্ব প্রাপ্তরা :

ক্রমিক নং	নাম	থানা	মন্তব্য
১.	সুলেমান আলি আহম্মদ	কোটালিপাড়া	অর্ডন্যান্স কোর
২.	নজির হোসেন মিয়া	কোটালিপাড়া	হেমায়েত বাহিনী প্রধানের বড় ভাই
৩.	গোলাম মোস্তফা	গোপালগঞ্জ	হাবিলদার (সেনাবাহিনী)
৪.	মোঃ ছিদ্দিক তালুকদার	কোটালিপাড়া	সিভিলিয়ান
৫.	শেখ আসাদুজ্জামান (হাবিব)	কোটালিপাড়া	সিভিল ক্লার্ক
৬.	মোঃ এনায়েতুল হক	কালকিনি	ব্যাংক কর্মচারী

৭.	সুবেদার আঃ রশিদ	কালকিনি	ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
৮.	হাবিলদার আবদুস সাত্তার (শহিদ)	গৌরনদী	এম.ও.ডি.সি.
৯.	মুনশি আবদুল করিম	কোটালিপাড়া	সিভিলিয়ান
১০.	মোঃ সামছুল হক (উত্তর পাড়)	কোটালিপাড়া	সিভিলিয়ান
১১.	মুজিবর রহমান	কোটালিপাড়া	অর্ডন্যান্স কোর
১২.	শেখ মোঃ শাহজাহান	কোটালিপাড়া	সিভিলিয়ান

উপরের বর্ণিতদের সাথে আরো ছয়জন অস্ত্র-গোলাবারুদ সংরক্ষণে ছিলেন।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ-সম্পদের প্রধান উৎস জনগণের চাঁদা ও এককালীন সাহায্য। এ-ছাড়া, পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অথবা আকস্মিক হামলা থেকেও মাঝে মধ্যে মোটা অংক মিলত। পাক বাহিনীর নিকট থেকে দখল করা সম্পদ ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করে এবং দখলকৃত এলাকার ব্যাংক থেকে মাঝে মাঝেই টাকার যোগান মিলতো। অপারেশন থেকে কিছু কিছু অর্থ সম্পদ আয় হতো। ফরিদপুর অঞ্চলের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মিশনগুলি অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতো।

জনগণের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থ সহ যাবতীয় আয় একটি প্রশাসনিক কমিটির কাছে জমা থাকতো। মুক্তিযোদ্ধাদের দখলকৃত সম্পদ বাহিনী কোষে (অস্ত্রাগারে) জমা হতো। সে-সব অর্থে মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থ যোগান সম্ভব না হলে প্রশাসন উক্ত কমিটি/ টিমের নিকট রিকুইজিশন দিয়ে অর্থ গ্রহণ করতো।

ভূমি প্রশাসন বিভাগ অর্থ বিভাগের অধীন ছিল। তহসিল অফিসের মাধ্যমে রীতিমত রশিদের মাধ্যমে খাজনা আদায় হত। সুষ্ঠু স্বরাজের নিদর্শনে স্বাধীনতা সংগ্রাম ন'মাস বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারি মুক্তিবাহিনীর হামলা মুক্ত ছিল। তবে মুক্তিযুদ্ধের কারণে সত্যিকার অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন কোর্ট-কাচারির উকিল-মোক্তারগণ।

হেমায়েত বাহিনীর কখনো অর্থাভাব ছিল না। নবীন মুক্তিদের মাস্টার রোলে ভাতা দেয়া হতো। হেমায়েত বাহিনীর ছোট বড় তিনশত পঁচিশ খানা নৌ বহরের মাঝিমাল্লাদের মাসিক হারে খোরাকি ও ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা জারি ছিল।

হেমায়েত বাহিনী নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে অর্থ ও গোলাবারুদ দিয়ে অন্যদেরও যুদ্ধের প্রয়োজনে সাহায্য দিয়েছে। তাঁর বাহিনীর এমনি সাহায্য প্রাপ্তদের ক'জন :

ক। জাহাঙ্গীর বাহাদুর, স্বরূপকাঠি।

খ। কুদ্দুস মোল্লা, মুলাদি।

গ। সিরাজ, মোল্লার হাট।

ঘ। নিজাম, গৌরনদী।

ঙ। কহিনুর, মোকসেদপুর।

চ। সেহাবউদ্দিন, গোপালগঞ্জ।

ছ। ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর, সাব সেক্টর কমান্ডার, বরিশাল। ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরকে ৫০ মণ চাল ও ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

হেমায়েত বাহিনীর কোষ সংরক্ষণ ও হিসাব রক্ষক দল

আর্থিক লেনদেনের হিসাব অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে রাখা হত। বাহিনী প্রধানের রক্ত চক্ষুর প্রশাসনের সাথে মুক্তিযোদ্ধারা অর্থ সম্পদ-গোলাবারুদ মিস ইউজ বা অপব্যবহারের সাহস পেতনা। অর্থ আত্মসাৎ ও নারী সমভ্রম হানির অপরাধে চারজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের যুদ্ধকালীন বিচার হয়। বিচারের রায়ে তাঁদের ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে প্রাণ দিতে হয়। আর্থিক অনাচারের শাস্তি দেখে অন্যদের সতর্কতা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ হেমায়েত কোষাগারের হিসাবরক্ষক ছিলেন :

ক্রমিক নং	নাম	থানা	মন্তব্য
১	হাবিবুর রহমান (হাবিব)	-	প্রধান হিসাবরক্ষক
২	এনামুল হক	কালকিনি	-
৩	আবদুর রশিদ	কালকিনি	আর্মি ক্লার্ক
৪	সাজাহান তালুকদার	কোটালি পাড়া	-

উপরোক্তদের সাথে আরো চারজন সহকারী হিসাবরক্ষক ছিলেন।

হেমায়েত বাহিনীর প্রভাব বলয়ে সকল কার্যক্রমের সাফল্যের মূলে থানা পর্যায়ের সংগঠন ও প্রশাসনিক কমিটি। থানা কমিটির সে-সব সদস্যদের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	নাম	থানা ও জেলা	মন্তব্য
১.	বাবু লক্ষীকান্ত বল	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২.	শেখ আবদুল আজিজ	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩.	মুনশি আবুল কাশেম	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪.	এ্যাডভোকেট হেমায়েতউদ্দিন	স্বরূপকাঠি, বরিশাল	
৫.	সরদার রহমতজান	গোপালগঞ্জ	
৬.	শেখ আকরাম হোসেন	গোপালগঞ্জ	
৭.	মোঃ মানিক মিয়া	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৮.	মোঃ শামসুল হক মিয়া	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৯.	প্রফেসর আবদুল হালিম	গোপালগঞ্জ	
১০.	সোহরাব হোসেন তালুকদার	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	শহিদ
১১.	ডা. আবদুল গফুর	গৌরনদী, বরিশাল	
১২.	আবদুল জব্বার	উজিরপুর, বরিশাল	শহিদ
১৩.	কাজি শাহে আলম	গৌরনদী, বরিশাল	
১৪.	বাবু ঠাকুরলাল বিশ্বাস	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
১৫.	বাবু দ্বিজেন ঘটা	গৌরনদী, বরিশাল	
১৬.	শেখ সেকান্দর আলি	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
১৭.	বাবু রাফায়েল বেপারি	গৌরনদী, বরিশাল	
১৮.	প্রফেসর সুশীলকুমার বল	গৌরনদী, বরিশাল	

১৯.	মন্টুদাশ গুপ্ত	গৌরনদী, বরিশাল	
২০.	আবদুল করিম নাইয়া	গৌরনদী, বরিশাল	
২১.	মোঃ মোজাম সরদার	গোপালগঞ্জ	
২২.	সরদার ইউনুস আলি	গোপালগঞ্জ	
২৩.	ডা. নওশের আলি	গোপালগঞ্জ	
২৪.	মোঃ আবদুল আজিজ (ছোট)	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৫.	মোঃ আবুল হোসেন	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৬.	টি. জি. মোস্তফা	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৭.	কবি আবদুস সামাদ	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
২৮.	গনেশচন্দ্র হালদার	কালকিনি, মাদারিপুর	
২৯.	মোঃ নোমান খন্দকার	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩০.	পঞ্চানন ওঝা	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩১.	ডা. লালমোহন বৈদ্য	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩২.	শ্রীধাম ওঝা	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৩.	হেমন্তকুমার অধিকারী	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৪.	অনন্তকুমার অধিকারী	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৫.	আবদুল ওয়াহাব খান	গোপালগঞ্জ	
৩৬.	আবদুল গফুর পাইক	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৭.	মোঃ বাবন শরিফ	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক
৩৮.	ভীস্মদেব রায়	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৩৯.	আশালতা বৈদ্য	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা
৪০.	প্রমিলা হালদার	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	

*এই তালিকায় কারও নাম বাদ পড়া বিচিত্র নয়। পরে জানালে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

"কোথায় পেল টাকা কড়ি, কেমনে দিল বেতন বিড়ি"

মুক্তিযুদ্ধের উষা লগ্নের প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রের অনিশ্চিত ভয়াবহ পরিণতির উর্ধ্বে যাঁরা বিদ্রোহ পতাকা উত্তোলন করেন তাঁদের সাথে অন্য কারও তুলনা করলে বিরাট ভুল করা হবে। হেমায়েত-এর দৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধা বিভাজন ছয় পর্যায়ে-

১ম - বাংলার স্বাধীনতার নামে দেশ প্রেমে নিয়োজিত পাগল পারারা প্রথম মাঠে নামেন। অনিশ্চিত মরণ যমুনায় ঝাঁপের মত তাদের জীবন। এমনি পাগল পারাদের কজন:-

ক। ২৫ মার্চের কাল রাতে চট্টগ্রামের ষোল শহরে ৮ ইবিআর সৈনিকদের অস্ত্র সমর্পণ না করে বিদ্রোহ উদ্দীপ্ত করেন বেগম খালেদা জিয়া;

খ। ২৬ মার্চ অপরাহ্নে চুয়াডাঙ্গায় বিদ্রোহ পতাকা ওড়ান মেজর আবু ওসমান চৌধুরী;

গ। ২৭ মার্চের রাতের আঁধারে ২ ইবিআর বিদ্রোহের নেতৃত্বে দেন ব্যাটালিয়ান সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর কে এম সফিউল্লাহ;

ঘ। সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে বিদ্রোহ পতাকা ওড়ান মেজর খালেদ মোশাররফ। ৪ ইবিআর নেতৃত্বে তাঁর বিদ্রোহ;

ঙ। সৈয়দপুরে ৩ ইবিআর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন ইয়ং ক্যাপ্টেন-কোয়ার্টার মাস্টার আনোয়ার হোসেন;

চ। টাংগাইলে অভ্যন্তরীণ মুক্তি গেরিলার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন প্রাক্তন সৈনিক কাদের সিদ্দিকী;

ছ। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দেন ২ ইবিআর হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন।

এমনি আছে আরোবহুতর জানা-অজানা আত্মত্যাগী বাহিনী। কোন সেন্ট্রাল কমান্ডের নির্দেশনায় বাইরে অনিশ্চিত বিভীষিকার মরণ যজ্ঞে ঝাঁপের মত দুরন্ত সাহসে তাঁদের বিদ্রোহ। ১৯৭১-এর বিদ্রোহ চেতনা অংকুরেই বিনষ্ট হলে এসব বিদ্রোহীদের দশাটা কি হত আল্লাই মালুম। ফিলিস্তিনিদের মত আস্তিন গুছিয়ে তাঁরা পরবাসের শরণার্থীর ভিক্ষায় বাঁচতেন। অথবা যুদ্ধ করে বেঘোরে মরতেন। নতুবা ধরা পড়ে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইতেন। তাই এই মুক্তি দামালদের সামাল দিতে ভিন্নতর দৃষ্টি আবশ্যক। তাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ কাতারের অগ্রণী সৈনিক। তাঁদের মর্যাদাই আলাদা।

২য়- ঠেলার নামের চোটপাটের বাবাজিরা। যার মানে দখলদার দেশে যুবক ছেলেদের ঘরে থাকা দায়। একদিকে পাকিস্তান তাঁবেদার রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ নেতারা চেষ্টা করেন যুবকদের রাজাকারে নিতে। তারা রাজাকারে গেছে তো মুক্তি হাতে প্রপাত ধরণী পাত গোষ্ঠীশুদ্ধ ছাফ। আর মুক্তিযুদ্ধে গেলে কিছুটা রক্ষা। ছেলে কোথায় গেছে কে জানে? বাছাধনদের প্রাণ ধন বাঁচাতে বাধ্যতামূলকভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। বাংলার যুব সমাজের বুকে ত্রাশ সৃষ্টি করে পাকিস্তান আর্মি স্বাধীনতার সপক্ষে বিরাট উপকার করেছেন। দেশে সুখে থাকতে পারলে ভূতে কিলানো মরণ যুদ্ধে অনেকে স্বেচ্ছায় যেতেন কিনা সন্দেহ। তাই এরা দু'নম্বরি যোদ্ধা।

৩য় - গরিব ও অসহায় যোদ্ধা। নগদ পাওনা যেখানে যা পাওয়া যায় তাই লুফে নেয়া ভাল। তাই মুক্তিরাও বেতন ঘোষণা করে। কারণ রাজাকারে লোক নিতে পাক এলান (ঘোষণা) "জো লোক আপনা ওয়াতনকো (জন্মভূমি) লিয়ে লড়াই করেংগে - উনকো তাংহোতো মিলেংগে -আওর মর জায়েংগে তো শহিদ কি উলা দরজা মিলেংগে"। গরিবের গরিবানার ঘোড়ারোগের অভাব যায় না। বেহালের হাল আগে থামাও পেটের টান, তারপর দেশ প্রেমের যুদ্ধ। নিতান্ত দীন মজুর কিছু লোকজন ফুসুর ফাসুর শুরু করে গোপনে ধর্না দেন লীগার দরবারে। গোয়েন্দা রিপোর্টে নাজেহাল

মানুষের মত দোটানার আর্থিক বিপর্যয়ের কথা জনাতে পারেন হেমায়েত বাহিনী প্রধান। চিন্তা ভাবনার গভীরে নিয়ে সমাধানে গরিব ও অসহায় মুক্তির জন্য যোগ্যতা অনুসারে আশি (৮০) টাকা থেকে একশ বিশ (১২০) টাকা পর্যন্ত বেতনের পকেট মানি ঘোষণা করা হয়। শহিদ পরিবারবর্গকে মুক্তিযোদ্ধারা দেখে শুনে রাখবেন বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এসব গরিব ও অসহায় মুক্তিদের প্রায় সবাই গণ্ডমূর্খ ও ক্ষেত মজুর। তাই এ ধরনের লোক তিন নম্বরি মুক্তিযোদ্ধা। এই পকেট এলাউন্স বাস্তবে ভারতে দেয়া প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের এলাউন্সের বেশি। ৮নং সেক্টরে প্রথমে দেয়া হয় পঞ্চাশ টাকা, পরবর্তীতে তা বর্ধিত হয় পঁচাত্তর টাকায়। সকল গেরিলার পকেট মানি ছিল একই সমান। অফিসারদের মাঝে জেনারেল ওসমানির মতরা পেতেন পাঁচশ টাকা, অন্যান্যরা চারশ টাকা। এই পকেট মানি বিতরণ বর্ডারের ওপারের চেয়ে হেমায়েত বাহিনীতে সুসংহত ও নিয়মিত ছিল।

৪র্থ - সুযোগ সন্ধানী মুক্তিযোদ্ধা। এই সুযোগ সন্ধানীদের বেশির ভাগ গেছেন ভারতে। কারণ প্রথম পর্যায়ে তারা নিজেদের এলাকায় লুটপাট কায়েমের পাকিস্তান জিন্দাবাদে মেতে ওঠেন। মুক্তি ঠেলার বাবাজির গুঁতোয় দেশে তিষ্ঠাতে না পেরে দে দৌড় বর্ডার পার মাসির বাড়ি। বাংলাদেশের লুটেরা ভারতে গিয়ে সাপের ছোলমের লেবাস বদলাতে পারে নি। ভারতে শরণার্থীরা সে লুটেরা পাপীদের দাগ নম্বরে ধরে ফেলে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এমন লুটেরার মাঝে হিন্দু ও মুসলমান দুধর্মের লোকই ছিলেন। মুসলমান লুটেরা বেশি আর হিন্দু লুটেরা কম এই যা তফাৎ। হিন্দুরা তাঁদের জাত ভাই প্রভাবশালী হিন্দুর বাড়িতে সহায় সম্পদ তামা-কাঁসা-পিতল স্বর্ণালংকার-আসবাবপত্র, সাইকেল, রিকশা, ট্রাংক-সুটকেস, গরু-ছাগল ধরনের বহু কিছু রেখে আসেন। দশ দোরে দক্ষিণার নামে মুসলিম লীগার-রাজাকার-পাক আর্মি লুটে নিছে, নজরানা দিছি নামের বাহানায় সবকিছু বেচে আখের গুছিয়ে ভারতে আসে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ সকল দুর্যোগের দায়ভার মাথায় নিয়ে মুক্তি শরণার্থীদের সিংহ ভাগের ধকল সয়েছেন। ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের পরে বা তার পূর্ব থেকে পূর্ববঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে, আসাম-ত্রিপুরায় বসতি স্থাপন করেছেন এমন হিন্দু মুসলমান দুদলেই আছেন। বর্ডারের দুপারের হিন্দু-মুসলমানই সম্পত্তি বিনিময়, বেচাকেনা, সাম্প্রদায়িক কোন্দল ধরনের বহুবিধ কারণে স্বেচ্ছায়-ইচ্ছায় দেশ ত্যাগ করেছেন। এদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময়ের সুযোগে যে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেষ্টা করেন নি তা নয়। ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সদিচ্ছার কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সে সবের কিছুই হয় নি। বশিরহাট, নদীয়া, চব্বিশ পরগনার মত জেলায় বর্ডার সংলগ্ন অঞ্চলে যুদ্ধের প্রয়োজনের দিনে রাতে আমাকে সসৈন্য ও একা ছদ্মবেশে পায়ে হেঁটে ও গাড়িতে চলতে হয়েছে। ভারতের বন্ধ, স্ট্রাইক, অবরোধ, প্রচেশন, রাস্তার ওপর জনসভা পথ অবরোধ, যানজট জাতীয় সকল প্রতিকূলতায় পশ্চিমবঙ্গের যুবজনতা পরিচয় পাওয়া মাত্র মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের অফিসারে জন্য পথ করে দিয়েছেন। তাঁদের রোগীকে বেড থেকে ফ্লোরে নামিয়ে জয়বাংলার মুক্তিযোদ্ধা

আহতদের হাসপাতাল বেডে স্থান দিয়েছেন। দুর্যোগ দিনের সে সব সহানুভূতির সহৃদয় সৌজন্য ভুলে গেলে দুদেশের সৌহার্দে চিড় ধরবে। চব্বিশ পরগনার রাস্তায় শরণার্থী শিবির ডিঙ্গিয়ে সন্ধ্যার পর গাড়িতে যাচ্ছি। এবার জয়বাংলার মুক্তি অফিসারের গাড়ি ঘিরে ধরলেন। যশোরের কেশবপুর ও মনিরামপুর থানার হিন্দু লুটেরাকে শরণার্থীরা ধরে বেঁধে ফেলেছে। অকুস্থলে মুক্তি অফিসারকে পেয়ে শরণার্থীরা বিচার প্রার্থী। কিছু শরণার্থী হিন্দু গেরিলার মারফত কি অন্য কোন ভাবে শরণার্থীরা জানেন এই মুক্তি অফিসার কেশবপুর-মনিরামপুরের কাপ্তান। মুক্তিযুদ্ধে জয়বাংলা বাহিনীর সিকিউরিটির বালাই ছিল না। তাদের কেশবপুর-মনিরাপুরের কাপ্তান পাকড়াওতে মিথ্যার কিছু ছিল না। অকুস্থল তদন্তে লুটেরাকে শাস্তি দেবার আশ্বাসে বিক্ষুব্ধ শরণার্থীরা আমাকে রেহাই দেন। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ, বি.এস.এফ ও স্বেচ্ছাসেবকরা আমাকে মুক্ত করেন। বাংলাদেশের লুটেরা হিন্দু ভদ্রলোককে জনতার রাহুগ্রাস মুক্তিতে প্রাণে বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের হাতে দিতেই সবাই শান্ত। বাংলাদেশের ভিতরে এসে তদন্ত করে দেখি জনতার অভিযোগ সত্য। নিজেদের আমানতের খেয়ানতকারী লুটেরাকে বাগে পেয়ে বেঁধে পিটিয়ে হেনস্তার উর্ধ্বে গুলিতে হত্যা পর্যন্ত করেছে। কারণ জনতা যা হারিয়েছেন তার বেদনার প্রতিকারে বাটনা-বাটার সাথে দুচারটা খুন সঙ্গতই বলা চলে। অগত্যা লুটেরা গ্রুপের বাঁচার ধান্ধা ভারত-বাংলার দুচার নেতা ধরে গা বাঁচান। অনেকে মুক্তিযোদ্ধার গেরিলা ট্রেনিং, মুজিব বাহিনী ট্রেনিং, বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স), গণমুক্তি বাহিনী ট্রেনিং, এফ এফ (ফ্রিডম ফাইটার), মস্কো পন্থী গেরিলা ট্রেনিং বহুতর বাহিনীর আড়ালে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। অথবা ভারতে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার, ইন্ডিয়ার আর্মি, বি.এস.এফ. (ইন্ডিয়ার বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের) গোয়েন্দাদের নামে চামচাগিরি করেন। এমনি সুযোগ সন্ধানী লোভীরা চৌথা নম্বরের মুক্তিযোদ্ধা।

৫ম--আমোদ ফুর্তির মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা থোঁতা মারা কথার তুবড়ি ফোটাতে ওস্তাদ। আমোদ ফুর্তিতে সময় কাটানোর জন্য ভোঁ দৌড় চোঁ মেরে ভারতে। তাদের অনেকে লেখাপড়া জানা ধনীর দুলাল। প্রচুর অর্থ গাড়ি নিয়ে ইন্ডিয়া পাড়ি জমান। ত্রিপুরা, আসাম, কলকাতা, দিল্লি-বোম্বে ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণার নামে নামে ফুর্তি করে বেড়ান। তারা না ট্রেনিং নিয়েছেন না যুদ্ধে এসেছেন। তারা মুজিব বাহিনীতে যাবার নামে গোয়েন্দা-পলিটিকেল মটিভেটর নিউক্লিয়াস লিবারেশন গ্রুপ ধরনের কিছু হতে অনেক নেতাদের পেছনো ঘুর ঘুর করেছেন। যুদ্ধ করার তাদের না ছিল কোন স্বদিচ্ছা বা উদ্যোগ। যুদ্ধ না করে স্বাধীনতার বুলি আওড়ানোতেই তাদের ইচ্ছা। তারা পাঁচ নম্বরদার যোদ্ধা।

৬ষ্ঠ- ছাফ কথায় এদের বলা যায় সিক্সটিন (ষোড়শ) ডিভিশন যোদ্ধা। ষোলই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীনের অরাজকতার সুযোগে তারা ধড়িবাজ চাকলাদার যোদ্ধা। শেষ মুহূর্তে দেশ স্বাধীন হবে ভেবে তাদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। চারিদিকে পাকিদের পরাজয়ের গন্ধে তারা সরফরাজ যোদ্ধা। পরিত্যক্ত অস্ত্র হাতে জয়বাংলা ধ্বনিতে গলা

ফাটিয়ে তারা আগ কাতারের বীর যোদ্ধা। এরা দাগনম্বরের ষোড়শ ডিভিশনের ৬ (ছয়) নম্বরে মুক্তিযোদ্ধা। দেশ স্বাধীন হওয়া মাত্রই সে সব সিক্সটিন ডিভিশনের মার্কামারা মুক্তির দাপটে আসল মুক্তিযোদ্ধা পেছনের কাতারে চলে গেছেন। কারণ, তাঁরা অভিমানী। যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার কাজ করাটা তাঁদের বড় অহংকার। ঠিক এমনি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সিক্সটিন ডিভিশন মার্কারা আগ কাতারে এসে নিজেদের আসন জাঁকিয়ে বসেন। এই মার্কা মারা ডিভিশন ধারীরা পোশাকে, চালচলনে, শিক্ষায়ও চটপটে। তাই তারা ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন। আর মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে যারা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলেন তাঁরা অভিমান নিয়েই অভিশপ্ত জীবন যাপন করছেন এই স্বাধীন বাংলার মাটিতে।

১৯৭১-এর ডিসেম্বরের শেষ পর্যায়ে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট মিলিশিয়া ক্যাম্প চালানোর ভার পড়ে আমার ওপর। সাতক্ষীরা মিলিশিয়া ক্যাম্পের আমি ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট। সন্ধ্যা লগনে ক্যাম্পে গিয়ে দেখি সাত অস্ত্রে সত্তর জন মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নিতে এসেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র, গোলা বারুদ, অ্যামুনিশন, গ্রেনেড, মাইন জাতীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম মিলিশিয়া ক্যাম্পে জমা দিবেন। তাঁরা এলাউন্স পাবেন, যোগ্যতা অনুসারে সার্টিফিকেট পাবেন। কিন্তু ক্যাম্পে প্রথম দর্শনের সত্তর জনের তেষট্টি জনকে বেগার অস্ত্রের মুক্তি বলে বিদায় করলাম সাতক্ষীরা তৎকালীন এসডিও শাহাজাহান সাহেবের কাছে। কারণ মুক্তি অফিসার আসার পূর্বে তিনিই তাদের ক্যাম্পে স্থান দিয়েছেন। প্রথম দর্শনে দেখি এক চটপটে তরুণ হিন্দু ছেলে মিলিশিয়া ক্যাম্পের প্রথম সারি আলো করে আছেন। তাকে জিজ্ঞেস করি আপনি সব দেখতে পান। তার জবাব পাই। আমার প্রশ্ন আপনার চোখ দেখতে পান? তার জবাব আয়নায় দেখতে পারি। এবার তারে সরাসরি প্রশ্ন আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা? থতমত খেয়ে তিনি বলেন মুক্তির পিছনে দৌড়েছি, তাদের ভাত খাইয়েছি। বাস্তবে তিনি বর্ডার সংলগ্ন ভারতের বাসিন্দা। বাংলাদেশে এপার বাংলায় তার মামার বাড়ি আছে। মামার বাড়ি বেড়াতে এসে ফাঁকতালে তিনি মুক্তি মিলিশিয়া ক্যাম্প সাতক্ষীরায়। তারে সহজে কই যাবা না সাবাড় করুম। ইন্ডিয়ান নকশাল বাংলাদেশে অস্ত্র সংগ্রহে আইছ। সাতক্ষীরা ক্যাম্পের জঞ্জাল এভাবে ছাপ করতে গিয়ে আমি সবার বিরাগভাজন হই। তিন হাজার মিলিশিয়ার ক্যাম্প। অস্ত্র ও জমা পড়েছে অনুরূপ। বেগার অস্ত্রে নো এন্ট্রি মিলিশিয়া ক্যাম্পে। এবার সার্টিফিকেট ও চাকরি চান দশ থেকে ত্রিশ হাজার। তাদের কথাঃ "আমরা ভারতে গেছি, শরণার্থী ক্যাম্পে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট ও চাকরি দিতে হবে।" তাদের অন্যায় আবদারে রাজি না হওয়ায় ঘেরাওর মুসিবতে পড়ি। ষোড়শ ডিভিশন সৃষ্টির নমুনার এ-কয়টি অপ্রিয় প্রসঙ্গ মাত্র।

হেমায়েত বাহিনীর প্রধান হেমায়েতও অভিমানী যোদ্ধার এক নম্বরি মাল। তাই তাঁকে হেনস্তার নাস্তানাবুদে উঠে পড়ে লাগেন সিক্সটিন ডিভিশন। মার্কা মারা বিভীষণরূপী এই ডিভিশনরাই মুক্তির নামে জায়গা দখল করেন। মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র

সংগ্রহ, কৌশলে লাইসেন্স বাগান, পারমিট শিকারের ব্রিফকেস সর্বস্ব বিজনেসম্যান হিসাবে একদম পাকা মুক্তিযোদ্ধা বনে যান। দেশ প্রেমে সাড়া দিয়ে আত্মবিসর্জনের মুক্তিযুদ্ধ যাঁরা করলেন তাঁদের কপালের অনেকের ভাগ্যে দুমুঠো ভাতও জোটেনি স্বাধীনতার পর। তাঁদের অবস্থা যথৈ নথৈ। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে যাদের কিছু ছিল না পরেও তাদের কিছুই নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা সর্বস্ব হারালেন তাঁরাও রিক্তই রইলেন। রিক্ত যারা সর্বহারা মরণজয়ী বিশ্বে তারা। স্বাধীন দেশের দুর্গ্রহের ভার সব হারানোর মুক্তিরা আজো দারিদ্রের কষাঘাতের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে বেঁচে আছেন। অপ্রিয় সত্য কথায় অনেকের কপাল ভাংতে পারে। অপ্রিয় সত্য প্রকাশে না হুলিয়ার পুস্তক বাজেয়াপ্তি ঘটাও দুষ্কর নয়। আপাত মধুর চোখে ওরাই বঙ্গ জননীর দ্রুত বিলীয়মান অভিশপ্ত জীবনের শৃগাল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁরা যেন অভিশপ্ত। আসল আদত যোদ্ধার অভিশাপে আজ সারাদেশ অশান্ত। অভিশাপ নেমে এসেছে সোনার বাংলায়। শহিদ পরিবারের বিশেষ খোঁজ নাই। খোঁজ যোদ্ধাহতদের। যুদ্ধের কারণে হুইল চেয়ারে চলা মুক্তিকেও আজ প্রমাণ করতে হয় তিনি কি সত্যিই মুক্তিযুদ্ধ করে আহত হয়েছেন! তেমনি এক যোদ্ধাহত পংগু মুক্তি সাতক্ষীরার চিলতে বাড়িয়া বেড়ে গ্রামে শামসুর আলী মণ্ডল। যুদ্ধকালে ইন্ডিয়ান হাসপাতালের ডাক্তার তাঁর নাম লিখেছেন শামসুর রহমান মণ্ডল। নাম বিভ্রাটের কারণে তাঁর পংগু ভাতা অর্ধেকে নেমে এসেছে। পংগু মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সুবিচারের এই নমুনা! হায়রে যোদ্ধাহত হতভাগ্য পংগু মুক্তিযোদ্ধা!! গরিব ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের আহাজারিতে কি বাংলার মাটিতে গজব নাজিল হবে না! অসহায়ের সহায় আল্লাহ। স্বাধীনতার বেদিমূলে সর্বস্ব খোয়ানোদের বেদনার্ত কাঁদনে আল্লার আরশ কি কাঁপবে না!

পাক প্রশাসনের মতে 'মিসকিন মুক্তি ডাল-রুটিটা নিয়ে ইন্ডিয়া ভাগকে রিলিফ নেতা হয়।' সে মুক্তিরা গরিব অসহায় মুক্তিযোদ্ধাকে বেতন (পকেটমানি) দেবার ঘোষণা দেয়ায় হানাদার পাক আর্মি হতবাক। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার-এর পক্ষ থেকে এই সামান্য ঘোষণাটুকু দেবার পর থেকে যৎসামান্য আর্থিক সাহায্যের লোভ দেখিয়ে রাজাকারে লোক ঢুকানোর ব্যাপারে পাক পক্ষের আর বিশেষ সাফল্য দেখা যায়নি। এখন মূল প্রশ্নঃ মুক্তিদের বেতন দেয়ার টাকা আসবে কোথা থেকে? বাহিনী প্রধান সবাইকে সান্ত্বনা দেন, "কোনই চিন্তা নেই। নিয়ত যার সৎ আল্লাহ তার সহায়।" এর মধ্যে প্রশাসনিক দপ্তরে আকস্মিক বাহিনী প্রধানের উপস্থিতি ঘটে। কি কি সম্পদ জমা আছে দেখতে চান তিনি। পরীক্ষা করে দেখা গেল, সোনা-রূপা-কাঁসা-পিতল জাতীয় যা জমা আছে সে সব অকশনে দিলেই তিন লক্ষ টাকার উপর সংগৃহীত হবে। একাত্তরে জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই সস্তা। দশ থেকে বিশ টাকা ধানের মন। গরুর দাম একশ থেকে একশ বিশ টাকা। ফরিদপুর অঞ্চলের বাইরে তার চেয়েও ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। নভেম্বর ১৯৭১-এর শেষ নাগাদ গেরিলা হিসেবে আমার উপস্থিতি ঘটে আশাশুনি থানা; এলাকাটির অবস্থান সুন্দর বনের পাশ ঘেঁষে। বন্যা প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে লোনা পানি ঢুকেছে মাঠে। সে মাঠে সামান্য ঘাস খেয়ে চরছে অনেক গরু।

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ঃ মাত্র দু (২) টাকায় গরু বেচাকেনা হচ্ছে। তারপরও গরু কেনার লোক পাওয়া যায়নি। সে-কারণে বেগার-মালিক গরু মাঠে চরে বেড়ায়। সুন্দর বনের বাঘ প্রয়োজনে দুচারটা সাবাড় করে। সুবৃহৎ গলদা চিংড়ি পঞ্চাশ পয়সা কেজিতেও বেচা গেছে। তারপরও ক্রেতার অভাবে চিংড়ি ধরা বন্ধ। ঢাকার মোঘল নবাব শায়েস্তা খানকে ডিফিট দেয়া সস্তা বাজার ব্যবস্থাপনার সোনার বাংলা ১৯৭১-এর খদ্দের দখলদার দেশ। সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখে খদ্দের জুটিয়ে সোনা-রূপা-তামা-কাঁসা যা আছে অকশনে তোলা হয়। প্রতিযোগিতার ডাকের দামে সর্বোচ্চ ডাক আসে প্রায় গড়ে তিন লাখ টাকা। সে টাকা জমা করা হয় অফিস সুপারের ক্যাশ বাক্সে। এ-টাকা বেতন ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যয় করা যাবেনা বলে নির্দেশ দেন বাহিনী প্রধান। এই হিসাবের বাইরে মুক্তি হেড কোয়ার্টারেও বেশ কিছু টাকার সংগ্রহ ছিল। সে মুক্তি সদরের টাকার পরিমাণও এক লাখ টাকার উর্ধ্বে। সর্বসাকুল্যে জমা করা টাকার পুরাটাই জমা করা হয় রিজার্ভ ফান্ডে। দিন আনে দিন খায় এমন ক্ষুধাতুর বুভুক্ষ গরিব অসহায় মুক্তিযোদ্ধাকে মাস্টার রলে বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এমনিভাবে যুদ্ধকালে বেশ কিছু দুঃস্থ অভাবী মুক্তিযোদ্ধাকে বেতন দিয়ে পালতে হয়েছে। অফিস সুপারের হিসাবে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত সাড়ে তিন লাখ টাকা বেতন দেয়া হয়েছে।

অভাবী দুঃস্থ যারা বর্ডার ক্রস করে ভারতে গেছে, তারা হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ-পূর্ব যুব শিবির বা শরণার্থী শিবিরে স্থান পেয়েছে। ফলে তাদের জন্য এমন পকেট মানি ধরনের বেতনের ব্যবস্থা করতে হয়নি। লাইন ধরে তাদের রেশন দেয়া হতো। সে রেশনের লাইনে সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে হাঁটুর ওপর লেপটে ওঠা কাদায় রেশন সংগ্রহের জিল্লতি ছিল অনেক। ভারতবর্ষের লোক সবচেয়ে সম্মান দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। মুক্তিযোদ্ধাদের বৈধ সিলমারা ডকুমেন্ট দেখাতে পারলে বাস-ট্রেন সব ফ্রি। অন্যদের আগে তারা স্থান পান যানবাহনে। রিফিউজি ক্যাম্প থেকে তাগড়া জোয়ানদের ধরে আনা হতো মুক্তিযুদ্ধে রিক্রুটের জন্য। যুব শিবিরে অপেক্ষমানদেরই যুদ্ধ প্রশিক্ষণের জন্য গেরিলা ট্রেনিং যাবার অগ্রাধিকার। বিহারের চাকুলিয়া গেরিলা ট্রেনিং ধরনের রিক্রুটমেন্ট চলত প্রকাশ্যে। আর মুজিব বাহিনীর রিক্রুট হতো গোপন চোরাই পথে। কি মুক্তির নিয়মিত কোম্পানি ও যুব শিবির থেকে চৌকশ প্রতিভাবান বুদ্ধিমান ছাত্র-আর্মি-ইপিআর সংগ্রহ হতো চোরাই পথে। অকর্মী মুজিব বাহিনীতে লোক সংগ্রহের প্রতিনিধি আসতেন। কেউ তাদের খবর জানতো না। মুজিব বাহিনীর প্রতিনিধিরা সাথে করে নীরবে কাউকে সাথে করে নিয়ে আসতো। অথবা তারা চলে যাবার পর যুব শিবির বা মুক্তি কোম্পানি থেকে দুচারজন গায়েব হয়ে যেতো। আকস্মিক এমন পলাতক দুচারটিকে ধরে দিলাম বাপের নাম ভুলানো চাটনি বানানো পিটনি। এবার ভিতরের মুজিব বাহিনী রিক্রুট ও মসকো বাহিনীর কমিউনিস্ট রিক্রুটের গোপন রহস্য বেরিয়ে আসে। তারা কাজ করেন ট্রেইন্ড যোদ্ধা হিসাবে ৮ নং সেক্টরের 'ই' কোম্পানিতে। আর তাদের আনুগত্য মসকোপন্থী আর দিল্লী পন্থীর

হাত। সাতক্ষীরা শহরে পাশাপাশি পাকদুর্গে রাতের আঁধারে হামলা করবো। হু.াপিটিয়ার যোদ্ধা গ্রুপকে বেলা দুটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বুঝিয়ে দেয়া হয়। যোদ্ধা গ্রুপের বিশ্রাম। রাত ৯টায় যুদ্ধস্থল যাত্রা। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বিপরীত দিক থেকে ক্যাম্পে আসতেই রাতের অপারেশন অর্ডার শোনানো গ্রুপের কজনকে দেখি বর্ডারের হাকিমপুর মুক্তিক্যাম্প থেকে যাচ্ছেন বিথারি বাজার। সেখানে আছে কমিউনিস্ট গুরু কলারোয়ার আমানুল্লাহ মাস্টার। রাতের যুদ্ধ এলাকার অতি সন্নিকটে তাদের বাড়ি। অপারেশন অর্ডারের যোদ্ধারা যাচ্ছেন রাতের আক্রমণের পুরা প্ল্যান প্রোগ্রাম জানিয়ে কমিউনিস্ট গুরুর আশীর্বাদ নিতে। পলাতক বা অতি গুরু প্রিয়ে যোদ্ধাদের ক্যাম্পে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। থার্ড মেথড মানে গুর্টনা টাইট পিটনি দিতেই প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসে। এবার কমিউনিস্ট রাজনৈতিক নেতা আমানউল্লাহ মাস্টারকে ত্বরায় জিপে করে ক্যাম্পে এনে ব্যাপার জিজ্ঞেস করার ব্যবস্থা করা হয়। যোদ্ধারা যুদ্ধ ফেলে আপনার কাছে যায় কেন? তাঁর আমতা আমতার জবাব, "আমি কি জানি?" যোদ্ধাদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জানান, "আমরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বিধায় গুরুকে সব জানাতে হয়।" রাজনৈতিক দীক্ষা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ যোদ্ধাদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু প্রত্যক্ষ যুদ্ধ আর রাজনীতি যে ভিন্ন তা আমি কারে বুঝাই? রাজনীতি কর্ণধার আমানুল্লাহ মাস্টারের গায়ে হাত তোলা হলো না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের গোলক ধাঁধার নির্মম সত্য উপলব্ধি করে একেবারে নিশ্চুপ। তাকে সোজাসাপটা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলাম, 'এমনটা আবার হলে প্রাণটা যাবে।' কি বিদঘুটে অবস্থায় যুদ্ধ করতে হয়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের খোরাছা নগ্ন চিত্রের দৃশ্য পেশ করলাম মাত্র। বহুতর মুক্তি অপারেশনের ব্যর্থতার কারণ এইরকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।

শরণার্থী শিবিরের জোয়ানদের যুদ্ধের জন্য রিক্রুট করা হলো। দুচারদিন লেফট-রাইট করিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সিল মারার কাগজ তাঁরা পেলেন। এবার তাঁদের পারিবারিক রেশন লাইনের বাইরে অতিশীঘ্র মিলে। তেমনি সুখের পায়রার অনেকে সেই যে মুক্তি সিলের কাগজ নিয়ে গেলেন আর এলেন না। পরবর্তীতে এমন আয়েশিদের রিক্রুট বন্ধ করা হয়। অদৃশ্য খৈয়ের গোবিন্দায় নমো'র মত চল্লিশ লক্ষ বিলিয়ন ডলারে কলকাতায় না দিল্লিতে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থার প্রস্তাব আসে শরণার্থীদের দুঃখ দৈণ্যে কুম্ভিরাশ্রুর মার্কিনিদের নিকট থেকে। যুদ্ধ কতদিন চলে। বাংলার ছেলেরা এভাবে উচ্ছন্নে গেলে কি চলে? এমন প্রস্তাব আসে খোদ আওয়ামী লীগের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছ থেকে। মার্কিন তাঁবেদার মুক্তিদের পাক কলা দেখান সুকৌশলে। যা হবার হয়েছে, মরার যারা মরেছে, আর কত রক্তপাত হবে? বাঙাল মাইরটাতো আর পাক আর্মি কম খায় নি। বিহারিরা তো আর কম মরে নি। কি আর ক্ষতি পাকিস্তান নামটা থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে? এমনি প্রস্তাব পাই চার মহান ছাত্রনেতার অন্যতম নূরে আলম সিদ্দিকীর নিকট থেকে। গেরিলা ক্যাম্পের মুক্তি যুব শিবির বনগাঁয়ের জন্য দিলাম একটি পিক আপ। যাতে অসুস্থরা হাসপাতালে আসা-যাওয়া করতে পারে। সে পিক আপ নিয়ে নূরে আলম সিদ্দিকী কলকাতা হাওয়া।

কয়েকমাস পর সেটা অচল হলে সচল করতে আবার আসে আমার হাতে। বনগাঁর যুব শিবিরের ছাত্রদের প্রকাশ্যেই বললাম, 'জেনে-চিনে লও বন্ধুরা দুর্দিনে আপনজনারে। নারী মাংসের সুবাদে তাঁকে ভিন্নতর স্থানে পেয়ে ইন্ডিয়ান শুভানুধ্যায়ীরা বলেন, আপনাদের মেয়ে লাগলে আমাদের বলবেন। মধ্যপ অবস্থায় আজায়গায় কেন? এসব নির্মম সত্যের কোন জবাব দিতে পারতাম না। কারণ ছাত্রনেতার কমান্ডের বৃহত্তর ছাত্র-যোদ্ধা রিক্রুট গ্রুপ। এমনকি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ঝিনেদার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি নূরে আলম সিদ্দিকী স্যারকে বললাম, "আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমার কোম্পানি পাকিস্তানি পতাকা ও ইয়াহিয়া খানকে বাংলার মাটিতে গার্ড অব অনার দিবে এক শর্তে। বাংলার মাটিতে কোন বিদেশী ও পাকিস্তানি সৈন্য থাকবেনা।" আলম সাহেবের মলম, "তাইলে যে ভেকুয়াম (শূন্যতা)।" আমারও ছাফ জবাব, "তা হলে তো কথা না কইয়াম।" পাকিস্তানিদের স্থান তো মুক্তিযোদ্ধা ও বেংগল রেজিমেন্টগুলি পূরণ করেই আছে, তবে বাধাটা কোথায়? পাকিস্তান রক্ষায় খোদ আওয়ামী লীগের হার্ডকোর (অন্তরাত্মার) নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কিভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। লুপ্ত ইতিহাসের সুপ্ত অধ্যায়ের মত তা উন্মোচন করা হলো। গোপন মুজিব বাহিনীর মতে স্বাধীন দেশে রক্ষী বাহিনী হয়েছিল। কারুরই শেষ রক্ষা হয়নি। পলাশির যুদ্ধে যেমন নিজ সেনাপতি মীর জাফর আলীর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রহসনের যুদ্ধে তাঁর পতন হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ময়দানেও ছদ্মবেশী মীর জাফররা উপস্থিত ছিলেন। আপামর বাঙালির স্বাধীনতার জাতীয় চেতনায় ১৯৭১-এ তাঁরা দম মেরে ছিলেন। স্বাধীন বাংলায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব নিহত হলে লুপ্ত নখর দন্তের মীরজাফরের আদত চেহারা দেখেছে বাঙালি ও বিশ্ববাসী। মুক্তিযুদ্ধের যৎকিঞ্চিত ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহে সর্বের ভূত কাওমী নেতা আওয়ামীদের ১৯৭১ ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুপ্ত ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠবে।

আজ হেমায়েতের মত বিরাট হৃদয় ঐশ্বর্যের কালজয়ী গেরিলা যোদ্ধার পরিণতি থেকে অন্যরা বুঝতে পারবেন স্বাধীন বাংলার দুর্গতির উৎস কোথায়। মহান রাজনীতিকে যাঁরা ব্যবসা মনে করেন তাদের হাতে এ-দেশ নিরাপদ নয়। শেরে বাংলার মত যশস্বী আইনজীবী মারা গেলে আইউব খান তাঁর পরিবারকে দেখতে যান ঢাকার কলতা বাজারের বাসায়। বিস্ময়ের সাথে ফিল্ড মার্শাল প্রেসিডেন্ট আইউব জানলেন, শেরে বাংলার পরিবারের চুলা জ্বালানোর মত সম্পদ নেই। তিনি শেরে বাংলা পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকার তাৎক্ষণিক সাহায্য দেন। বিদেশে আওয়ামী লীগ প্রধান হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী মারা গেলে শেখ মুজিব চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ীর সৌজন্যে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করে তাঁর লাশ প্লেনে করে ঢাকা আনেন। অথচ সোহরাওয়ার্দীর মত আয়ের আইনজীবী উপমহাদেশে কমই ছিলেন। শেখ মুজিব তো অনেক অর্থ গুম করেছেন বলে প্রচারণা চালানো হয়েছিল। তাঁকে হত্যা করার পর সৈনিকরা বাসভবন চেক করে কেঁদেছে। কোথায় গেল লুটেরা শেখের অর্থ বৈভব। রাজনৈতিক ভাসানীর পুত্র ঢাকায় পরের বাসায় লজিং থেকে পড়তেন ঢাকা কলেজে।

প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়ার সুটকেসে মিলে সামান্যই। এই যদি হয় বাংলার রাজনৈতিক পিতা প্রপিতার পশ্চাদভূমি, তাঁদের ভাবশিষ্যরা গুরুমারা বিদ্যাটা নিজেদের আখের যথাশীঘ্র গুছাতে গিয়ে বাংলার অর্থনীতি লেজেগোবরের করে ফেলেছেন। যতদিন আত্মসেবার উর্ধ্বে দেশ সেবা, দলের উর্ধ্বে দেশ স্থান না পাবে ততোদিন দেশের দুর্গতি উত্তরাধিকারের পাওনা হিসাবে দেশবাসিকে শোধরাতেই হবে। এ-সবের প্রতিবাদে যত হেমায়েত গ্রুপই কেয়ামত করুক সর্বজয়ী লুটেরার সাময়িক বিজয় চলতেই থাকবে। এমন অসহ অবস্থার প্রতিকার দুদিন আগে পরে কু-কাউন্টার কুর প্রতিবিপ্লব গণবিপ্লব আসন্ন। কারণ, 'মাতসায়ন'-ছোটমাছে বড় মাছ খাওয়ার মত শক্তিমানের অন্যায় হাতের লুটেরা সব চেটেপুটে খাবে আর শান্তিপ্রিয় আইনানুগ ভুখা নাংগো মানুষ এসব মেনে নেবেন। পৃথিবীর দেশে দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরস্কার ধন্য মানুষ তা মানে নি। বাংলার বিপ্লবী জনতা তা মানে নি মানবে না।

"আবার তোর বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ কর,
একাত্তরের রক্ত ধারার, আবার তোরা অস্ত্র ধর"

বলে হেমায়েত কষ্ট কল্পনার কবিতা লেখে নজরুল স্টাইলে বিপ্লব করতে চান। বিদ্রোহী কবি নজরুল শেষ শয্যা নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের আঙ্গিনায়। তাঁর কবিতার আযানের সুর তিনি শুনতে পান কবর থেকে। সেদিন দূরে নেই যেদিন হেমায়েত বাংলার মাটিতেই শেষ শয্যা নেবেন। মৃত্যুতে শেষ নয় জীবনের পরিচয়। নজরুলের সংগীতের তালে তালে আজো মার্চ করে বেংগল সৈনিকেরা। হেমায়েতের মত কালজয়ী উদ্ভাবনের গেরিলাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হবেন অনাগত ভবিষ্যতের বাংলার দুর্দিনের স্বাধীনতা রক্ষার সৈনিক।

রেজিমেন্টেড সৈনিক ও গেরিলা সৈনিকের গুণ ও মানগত তফাৎ আছে। প্রথাগত নিয়মে রেজিমেন্টের সৈনিক সব পেতে চান। গণযুদ্ধের গেরিলা সৈনিককে কেউ কিছু দেন না। গণ চেতনায় জনসাহায্যের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়। অভ্যন্তরীণ গেরিলা যোদ্ধার অর্থ যোগানের দু'একটা সরল পথের মত বহুতর পথে পাওয়া অর্থ-খাদ্য-বস্ত্র-ঔষধ-অস্ত্রে বাংলার মাটিতে তিষ্ঠানোর যুদ্ধ করেছে অভ্যন্তরীণ যোদ্ধা। যশোরের যুদ্ধাঞ্চলের গ্রামে গম-চাউল-সরষে ভাঙানের কলে গিয়ে দেখি সবাই মণ প্রতি এক সের আটা-চাল, সরষে তেল রেখে যাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে। এমনি জনগণচেতনার সৌরভের গৌরবে ধন্য হেমায়েত গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ গেরিলা যুদ্ধ।

বিচার বিভাগ

সূচনা

হেমায়েত বাহিনীতে যথাযথ বিচার ব্যবস্থা ছিল। বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে পুনর্বিচারের আবেদনের একাধিক সুযোগ মিলতো। সুপ্রিম ফিল্ড কমান্ডাররূপে বিচার আদালতের যে কোন রায় নাকচ করার অধিকার সংরক্ষণ করতেন বাহিনী প্রধান হেমায়েত।

স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ

হেমায়েত বাহিনীর ছয় বিচার বিভাগীয় প্রধান :

ক। রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের শেখ আবদুল আজিজ,

খ। আবদুল গফুর পাইক,

গ। লালমোহন বিশ্বাস,

ঘ। আশালতা বৈদ্য,

ঙ। নোমান খন্দকার,

চ। এডভোকেট হেমায়েতউদ্দিন, আইন উপদেষ্টা।

হেমায়েত বাহিনীর বিচার বিভাগীয় আইন উপদেষ্টা বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার অ্যাডভোকেট হেমায়েত উদ্দিন।

শত্রু মিত্র দু'দলের বিচারেই বিচার বিভাগ ন্যায়নিষ্ঠ। স্বদেশী বাঙালি দালাল বিচার দিয়ে হেমায়েত বাহিনীর বিচার শুরু। শত্রু কি করে মুক্তি অবস্থান, কার্যকলাপ টের পায়? তার কারণ নির্ণয়ে বেরোয় দালাল সমাচার। তারা মুক্তি সংবাদ শত্রুদের দিয়ে নিবৃত্ত থাকলে দোষের কিছু ছিল না। শত্রু ক্যাম্পে নারী পাচার, নিজেদের নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, রাহাজানি ছিনতাই, শরণার্থীর সর্বস্ব কেড়ে নেবার মত বর্বরতার আশ্রয় নেয় দালাল। মুক্তি বিচারে যে হাত অবলা নারীর গায়ে হাত দিয়েছে, চুরি ডাকাতির অন্যায় লোভে হাত পাকিয়েছে এমন ২৬ জনের চক্ষু উৎপাটন।

পাক আর্মি ক্যাম্পে নারী পাচার করতো লোকমান। মুক্তি-হাতে ধরা পড়েন নারী দালাল লোকমান। মুক্তি বাহিনীর বিচারে তাঁর দুটি চোখই উৎপাটিত হয়। যে পাষণ্ডের হাত নারী ধর্ষণে কলংকিত তার হাতের কব্জি পর্যন্ত কর্তিত হতো।

নারী সম্ভ্রম হানি প্রমাণে কোম্পানি কমান্ডার ইউসুফ ও ফজলুকে ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ দিতে হয়। মুক্তি অস্ত্র হাতিয়ে আত্মগোপনে ডাকাত বনে যান কোম্পানি কমান্ডার সাহেব আলি। মুক্তি বিচারে তাঁকে প্রাণদণ্ডে কফেক্ষারা দিতে হয়।

মুক্তি বিচারে কোমলে মধুরের সমন্বয় হেমায়েত। মুক্তি হাতের প্রাণদণ্ড উতরে অলৌকিক রক্ষা পান শত্রু বাঙ্গাল ডাকাত আজিজ। ক্ষমার ঔদার্যে রক্ষা করে

আজিজকে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন হেমায়েত। নারী লোভাতুর অত্যাচারী পাক আর্মি ধৃত। কিছুদিন মুক্তি ক্যাম্পে রেখে শত্রুদের মুসলমান মুক্তিফৌজের আদত খাঁটি রূপ দেখান হয়। গলতি স্বীকারে পাক আর্মির প্রাণ ভিক্ষা। ক্ষমার উদারতায় তাঁদের গোপালগঞ্জ পাক আর্মি ক্যাম্পে প্রেরণ।

মুকসেদপুর থানার ভারত ট্রেইন্ড গেরিলা কমান্ডার সোহ্রাব উদ্দিন হেমায়েত-এর শুভেচ্ছা নিয়ে বিলে আশ্রয় নেন। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কাজে জড়িয়ে পুরা গ্রুপ হেমায়েত-এর সৈনিকদের হাতে ধৃত হয়। মুক্তি বিচারে তাদের ডিজআর্ম করা হয়। সমুদয় অস্ত্র ছিনিয়ে সামরিক দণ্ডে প্রাণে রক্ষা দেয়া হয় শেষবারের মত।

বর্নী বিলে ভারত ফেরত ৭০ জনের মুক্তি গ্রুপের আশ্রয় হয়। বার বার তারা হেমায়েতের সতর্কবাণীকে উপক্ষো করেন। অবশেষে হেমায়েত বাহিনীর হাতে তারা পাকড়াও হন। কড়াকড়ি আইনে তাদের সরাসরি বিচার করা হয়। সমুদয় অস্ত্র ছিনিয়ে প্রকাশ্য দৃষ্টান্তমূলক শারীরিক শাস্তি দেয়া হয় তাদের।

ভারতীয় জেনারেল ওভানের প্লান মাফিক ভারতীয় গোয়েন্দা পরিদপ্তরের মুক্তি ট্রেনিং সর্বত্র শুভ ফল দেয় নি। শত্রু কবলিত বাংলাদেশে অশান্তির অস্বাভাবিকতা সৃষ্টিতেই যেন তাদের ভিতরে প্রবেশ। দেশে যে বাঙালির পরম মিত্র স্বাধীনতা প্রিয় মুক্তি আশ্রয় সাশ্রয়ের জনতা আছেন তারা তা বিস্মৃত ছিলেন। মাসির বাড়ির খাসি সমাচারের মোস্তফাপুরের হাকিম কমান্ডার ও কলাবাড়িয়ার মনিন্দ্র কমান্ডার জাতীয় ১২/১৪ টি গ্রুপকে গণস্বার্থে অন্যায়ের প্রতিকারে ধরা হয়। অস্ত্র ছিনিয়ে তাঁদের কঠোর সাজা প্রদানপূর্বক মাসির বাড়ির খাসিদের পুনরায় মাসির আঁচলে প্রেরণ করা হয়। মাসির বোনপোদের প্রতি উপদেশ খুন খারাবির খায়েসের আয়েস না মিটলে দেশে ফিরবে না। শকুনি মামার চাঁন, চানক্যের আচানক চণ্ড নীতি এদেশে চলবে না। লুটতরাজ কায়েম, শ্রেণীশত্রু খতম, বাঙালি প্রতিভা ধ্বংসের নামে নিজেদের ভবিষ্যত প্রতিদ্বন্দ্বী খুন করতে বাংলাদেশে আসবা না। ফের বাংলাদেশে পেলে বাঙালি হত্যায় লিপ্ত হলে কল্লা ফেলে দেয়া হবে।

বিচারের নামে স্বাধীনতা যোদ্ধার বিরুদ্ধে উল্টা বিচার করা হয়। তার জের আজো চলছে। স্থানীয় জনতা ও অভ্যন্তরীণ স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে গঠিত মুক্তিদের হাতে গণধোলাই খাওয়া গ্রুপপের দলে দলে ভারত যাত্রা। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ আর্মি হেমায়েত বিরুদ্ধে তদন্ত করে কিছুই পেলো না। ক্যাপ্টেন বাবুল ও শাহজাহান ওমর তদন্ত করে উল্টা ভাল রিপোর্ট দেন। বাঙালিরা স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে গেলেও জাত স্বভাবের ঝগড়াটা সাথে নিয়ে যান। তারই ফলশ্রুতিতে বিদেশের মাটিতে বসে স্বদেশীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত।

শত্রু নিয়োজিত হেমায়েত ঘাতিনী ষোড়শী কমলাবতী রাণী বমাল ধৃত। বিচার সভার বিচার পুনঃবিচারের রায় মৃত্যুদণ্ড। নায়কের হৃদয় ঔদার্যে আপন নারী ঘাতিনীকে ক্ষমা করেন হেমায়েত। লক্ষ টাকার বিনিময়ে নিয়োজিত ঘাতিনী নারীর সর্বস্ব লুটা সম্ভ্রমের বিনিময়ে মুক্তি ঋণ শোক করেন। গোপালগঞ্জের পাক আর্মি অফিসারকে নাচ

গানের ছলাকলায় ভুলিয়ে তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হন। মুক্তি গোয়েন্দার কাজে শত্রু দুর্গের সঠিক সংবাদ এনে মুক্তি বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেন।

বিজয়লগ্নে স্বদেশী বিদেশীদের প্রতি বিচার ও ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কোটালিপাড়া জাতীয় আশপাশ এলাকার ২৫০ জন পলাতক দালাল আত্মসমর্পণ করেন। তাঁদের মাঝবাড়ি হাই স্কুল মুক্তি সদরে জড় করা হয়। সরকারি পর্যায়ে বিচারের জন্য তারা গোপালগঞ্জে কারাগারে প্রেরিত হয়।

পাক বাহিনী ব্যাপার বুঝে ফরিদপুর ছেড়ে রাজবাড়ি পালায়। তারা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেও রাজবাড়ির বিহারিরা যুদ্ধ চালু রাখে। সপ্তম নৌবহর ও চিনা সাহায্যের জোয়ারের বিষয়ে সবাই আশাবাদী। হেমায়েত-এর বিচারের প্রতি আস্থা রেখে রাজবাড়ি, গৌরনদী, মোল্লার হাট, কালিয়া অঞ্চলের পাক আর্মি মুক্তিবাহিনীর হেমায়েত গ্রুপের নিকট আত্মসর্পণ করেন। জেনেভা কনভেনশন অনুসারে সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। পাক সাঙাত রাজবাড়ির বিহারিরাও শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে রক্ষা পান। আল্লাহর শোকরিয়ার বিজয় ঔদার্যে পরাজিত সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মুক্তি বিচার।

বিচারের সততা ও নিরপেক্ষতায় পূর্ব থেকেই স্বদেশী ও বিদেশী পরাজিত সকল পক্ষই হেমায়েত বিচারে আস্থাশীল ছিলেন।

হেমায়েতবাহিনীর উপদেষ্টা ও বিচারক মণ্ডলীর সদস্যদের নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	থানা ও জেলা	মন্তব্য
১.	অ্যাডভোকেট আসমত আলি খান	কালকিনি, মাদারিপুর	নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি
২.	বাবু হরনাথ বাইন	বরিশাল	নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি
৩.	অ্যাডভোকেট হেমায়েতউদ্দিন	বরিশাল	
৪.	শেখ আবদুল আজিজ	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৫.	সরদার রহমতজান	গোপালগঞ্জ	
৬.	ডা. পিটার বাড়ৈ	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	নারিকেলবাড়ি মিশন প্রধান
৭.	ডা. লালমোহন বিশ্বাস	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৮.	চিত্তরঞ্জন বাইন	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৯.	নোমান খন্দকার	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
১০.	আশালতা বৈদ্য	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	মহিলা আত্মঘাতী যোদ্ধা গ্রুপ লিডার

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আইন-শৃংখলা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিপর্যয় দেখা দেয় দেশের সর্বত্র। চরম অরাজগ অবস্থার বিভীষিকায় সবাই সন্ত্রস্ত। লুটপাট, নারী ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন মুক্তিযুদ্ধটাই এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসবের প্রতিকারে হেমায়েতবাহিনী গড়ে তোলে প্রশাসনিক বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থা। হেমায়েত তাঁর নিয়ন্ত্রিত এলাকায় স্বতন্ত্র বিচার আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধপ্রস্তুতিতে ট্রেনিং সেন্টার, মহিলা ক্যাডারসহ ঘরে ঘরে অস্ত্র প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের স্থির লক্ষ্যে এগোয় মুক্তিবাহিনী। প্রাথমিক পর্যায়ে সে-ঝড়ো হাওয়ার বিপর্যয়ে চোর-ডাকাত দমন কমিটি গঠন করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-লুটেরা-বাটপার ধরে ধরে বিচার আদালতে তাদের বিচার কার্য সম্পন্ন করা হয়। সে-দুষ্ট দমন কমিটির প্রধান ছিলেন কবি ল্যাগ্যা ছোমেদ। তিনি বঙ্গবন্ধুর মঞ্চে দেশমাতৃকার মুক্তির গান গেয়ে বেড়াতেন। পাক আর্মি চরম বর্বরতায় তাঁর বাড়িঘর জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। অগত্যা সপরিবারে তিনি মুক্তি ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁকে প্রধান করে পুলিশের দালাল, চোরের থোউকদার (আশ্রয়দাতা), গফুর মাতব্বর, মান্নান হাজরা, ...কয়েকজনকে নিয়ে চোর-ডাকাত দমন কমিটি গঠন করা হয়। বাহিনী প্রধানের কাছে নিয়ে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। দালাল গংদের উদ্দেশ্যে বাহিনী প্রধানের চরম হুশিয়ারি ছিল ঃ দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত যে-কোন রকম অরাজকতার জন্য তাদের ধরে এনে শাস্তি প্রদান এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতে পারে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রিপোর্টে সর্বমোট ১০২ জনের বিচার কার্যকর করা হয়। এসবের মধ্যে চোখ-উৎপাটন, হাতের কব্জি কর্তন এবং মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি শাস্তি ছিল। পরবর্তীতে এলাকায় একমাত্র পাক বাহিনীর ছাড়া অন্য কোন বাহিনী বা কারও ভয় ছিল না। সে-সময়ে শুধুমাত্র মহাশাস্তির ভয়ে জাঁদরেল চোরও এসে আত্মসমর্পণ করতো বাহিনী প্রধানের কাছে। যাদের অনেকে পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যে-সব কাহিনী অত্র গ্রন্থের অন্য অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

চিকিৎসা বিভাগ

সূচনা

হেমায়েত বাহিনীর প্রশিক্ষণ সেন্টারকে কেন্দ্র করে ফিল্ড হাসপাতাল ও নার্সিং সেন্টার গড়ে ওঠে। এখানে মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ জনতা ও শরণার্থীদের চিকিৎসা করা হতো। শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষই এখানে চিকিৎসা পেতেন। ধরা পড়া ও আহত শত্রু পক্ষকেও এখানে সযত্নে চিকিৎসা দেয়া হয়। পাক আর্মির হাতে নিগৃহীত জনতার চিকিৎসা এখানে নিশ্চিত ছিল।

মুক্তি চিকিৎসার পর্যায় বিভাগ

ক। স্থানীয় হাসপাতাল/হেলথ সেন্টার : স্থানীয় হাসপাতাল ও হেলথ সেন্টারগুলি গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতো। স্থানীয় হাসপাতাল জেনে শুনে মুক্তিরোগী ও মুক্তি হাসপাতালের জন্য দেদার ঔষধ/ব্যান্ডেজ/ফার্স্ট এইড সরঞ্জাম সরবরাহ করতো। প্রচুর ঝুঁকির মধ্যে ডাক্তার/ নার্সদের কাজ করতে হতো সে-সময়। পাশাপাশি বেডের সিভিল হাসপাতালে শত্রু-মিত্র রোগী অবস্থান নিত। হাসপাতালে পর্যন্ত পাক আর্মি/বিহারি রোগীরা সশস্ত্র থাকতেন।

খ। স্থানীয় ডাক্তার : মুক্তিযুদ্ধের শুভানুধ্যায়ী ডাক্তারগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিদের চিকিৎসা করতেন। তাঁদের মাধ্যমেই মুক্তি হাসপাতাল বাইরে থেকে ঔষধ পত্র সংগ্রহ করতো। ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মীদের সর্বত্র অবাধ গতির কারণে তাঁরা মুক্তির দূতিয়ালি ও গোয়েন্দার কাজও ভালভাবেই করতেন। পল্লি চিকিৎকদের সেবার কারণে বহু আহত মুক্তি তাৎক্ষণিক চিকিৎসা পেয়ে প্রাণে বেঁচে গেছে।

গ। খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল : স্থানীয় খ্রিস্টান মিশনগুলি উদার হস্তে মুক্তির চিকিৎসা করতো। রাজনৈতিক কারণে খ্রিস্টানদের ওপর পাক আর্মি তেমন খড়্গ হস্ত ছিল না। গলায় ক্রুশ চিহ্ন ঝুলিয়ে খ্রিস্টান ডাক্তার শহরে যাতায়াতের সুযোগ পেতেন। মিশন হাসপাতালের বিদেশী ডাক্তারগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দুর্বলতা ও উদার মানবতাবোধে মুক্তিদের চিকিৎসা করতেন। খ্রিস্টান মিশন ও খ্রিস্টান ডাক্তারের দোরগোড়ায় পৌঁছলে মুক্তিরা কোন না কোন প্রকারে চিকিৎসার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতেন। খ্রিস্টান মিশনের মাধ্যমে ঢাকা ও বাইরের জগৎ থেকে ঔষধ সংগৃহীত হতো। মিশনের মাধ্যমে একাধিকবার বহির্বিশ্বের সাংবাদিকগণ বাহিনী প্রধান হেমায়েত-এর সাক্ষাৎকার নেন।

ঘ। মুক্তির ফিল্ড হাসপাতাল/নার্সিং সেন্টার : মুক্তি ট্রেনিং সেন্টারকে কেন্দ্র করে একাধিক ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে ওঠে। ভারতের সাথে সাধারণ বর্ডার শূন্য ফরিদপুর-বরিশালের মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠান যেত না। দেশের ভিতরে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মুক্তি হাসপাতালকেই করতে হতো।

ঙ. জহরের কান্দি-নারিকেল বাড়িয়া ফিল্ড হাসপাতাল : এখানকার হাসপাতালে চিকিৎসার সাথে নার্সিং ট্রেনিং চালু। মহিলারা এখানে সেবিকা ট্রেনিং নিতেন। এই ফিল্ড হাসপাতালের ক'জন নিবেদিতপ্রাণ ডাক্তার :

ক। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন সরকার, এম বি বি এস;
খ। ডাক্তার শ্যামাপদ বৈদ্য, এম বি বি এস;
গ। ডাক্তার নির্মল চন্দ্র, এম বি বি এস;
ঘ। ডাক্তার সুনীল মজুমদার, এম বি বি এস;
ঙ। ডাক্তার বকুল মজুমদার, এম বি বি এস।

চ. পয়সার হাট মুক্তি হাসপাতাল : বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার পয়সার হাটে

অবস্থিত এই মুক্তি হাসপাতাল। এখানকার হাসপাতাল টিমের প্রেরণায় ছিলেন হেমায়েতের সাথে পাঁচজন মুক্তি কমান্ডার। আহতদের চিকিৎসায় ঔষধ পথ্য যোগাড়ে পনর জন পুরুষ ডাক্তার ও মহিলা নার্স মিলে এখানে একটি আদর্শ সেবা কার্যক্রম গড়ে তোলেন। এখানে বহু আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা করা হয়েছে। এই হাসপাতালের নাড়ির স্পন্দনের মত সেবিকা মনা রাণী ব্যাণার্জি ও তাঁর স্বামী ডাক্তার বি. কে. রঞ্জিত ব্যানার্জি। স্বাধীন দেশে সে হাসপাতালটি, "পয়সার হাট ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার" নামে সরকারি চিকিৎসালয়ের রূপ নিয়েছে।

তাশকোর মুক্তি নার্সিং সেন্টার : নারী মুক্তিযোদ্ধা-সেবিকা মঞ্জুরাণী হালদারের উদ্যোগে তাশকোর মুক্তি নার্সিং সেন্টার পরিচালিত হতো। বরিশাল জেলার অজ পাড়াগাঁয়ের পরিত্যক্ত হিন্দু অধিকারী বাড়িতে অবস্থিত ছিল এই হাসপাতাল। এখানে চিকিৎসক আসতে বিলম্ব হতো। ডাক্তার আগমনের অপেক্ষায় বিশেষ করে নার্সিং চলতো।

উপরে নমুনা হিসেবে কয়েকটি মুক্তি হাসপাতালের কথা উল্লেখ করা হলো। হেমায়েত এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমনি বহু ফিল্ড হাসপাতাল/নার্সিং হোম নিবেদিত প্রাণ স্থানীয় ডাক্তার ও সেবিকাদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। দুর্ভাগ্য এ-দেশের, স্বাধীন দেশে পল্লি চিকিৎসার রূপরেখায় মুক্তির ফিল্ড হাসপাতালের চিকিৎসা পদ্ধতিটি একমাত্র ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছাড়া কেউ অনুসরণ করেন নি।

হেমায়েত বাহিনীর ক'জন দক্ষ নিবেদিত প্রাণ স্বাধীনতার নামে উৎসর্গিত হাসপাতালের ডাক্তার

ক্রমিক নং	নাম	শিক্ষা	থানা
১.	ডাক্তার সুরেন সরকার	এম বি বি এস	গৌরনদী
২.	ডাক্তার শ্যামাপদ বৈদ্য	এম বি বি এস	মাদারিপুর
৩.	ডাক্তার নির্মল চন্দ্র	এম বি বি এস	
৪.	ডাক্তার সুশীল মজুমদার	এম বি বি এস	কোটালি পাড়া
৫.	ডাক্তার বকুল মজুমদার	এম বি বি এস	কোটালি পাড়া
৬.	ডাক্তার রঞ্জিত কুমার বৈরাগী		কোটালি পাড়া
৭.	ডাক্তার হেমায়েত উদ্দিন		বটিয়াঘাটা (বরিশাল)
৮.	নার্স মহিলা ও পুরুষ নার্স মিলে ৮ (আট) জন		

হেমায়েত বাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের গৌরবজনক সাফল্যের বহু নজির আছে। সম্মুখ সমরে মারাত্মক আহত বাহিনী প্রধানের দুঃসাহসিক সফল চিকিৎসায় তাঁরা ধন্য। ১৪ জুলাই, ১৯৭১ ইংরেজি যুদ্ধাহত হেমায়েত-এর অবস্থা সংকটাপন্ন। তাঁর প্রথম চিকিৎসা করেন ডাঃ সুরেন সরকার ও জলিল পাড় খ্রিস্টান মিশনের ডা. ইতালিয়ান নামের এক ফাদার। সে চিকিৎসক দল তাৎক্ষণিক দুটি বুলেট বের করেন। বাম মাড়ির

এগারটি বিচূর্ণ দাঁত সরান। দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা রক্ষা করেন। চৌদ্দ (১৪) জন ডাক্তারের সমন্বয়ে গঠিত তাঁর নিজের গড়া হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। হেমায়েতকে চিকিৎসার অবদানে ধন্য বাবু শ্যামাপদ বৈদ্য ১৯৯৩ সালে পরলোক গমন করেন।

ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ অনুরাগী প্রবাসীরা ঔষধ সরবরাহ করতেন। ঔষধ সরবরাহ ও সেবাযত্নে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মহিলা নার্সদের বলিষ্ঠ অবদান অবিস্মরণীয়।

কখনো কখনো অযাচিত, অনাহুত, অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানেও মুক্তিরা ঔষধ-চিকিৎসার সাহায্য চাইত। যুদ্ধের কারণে অন্যান্য উৎপাদনের মত দেশে ঔষধ উৎপাদনও সীমিত অথবা বন্ধ ছিল। বহির্বাণিজ্য বন্ধের কারণে বিদেশী ঔষধ আসতে পারত না। কোন কোন ঔষধ পাওয়া ছিল খুবই দুর্লভ, তবে যা পাওয়া যেত তার দাম চড়া। বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে দখলদার দেশে মানুষের চিকিৎসা চলেছে। এতসব প্রতিকূলতার সত্ত্বেও মুক্তি চিকিৎসায় দেশের নিবেদিত প্রাণ ডাক্তার নার্সদের অবদান অবিস্মরণীয়।

শরণার্থী সামাল

ফরিদপুর ও বরিশালের মত মাত্র দুটি জেলার সঙ্গে ভারতের সাধারণ বর্ডার নেই। বাঙালি বিদ্রোহ দমনে পাক আর্মি অভ্যন্তরীণ অশান্তিকে শান্ত করার দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ডার সিলড্ করা আরম্ভ করে। বর্ডার সংলগ্ন জেলাগুলিতে তারা প্রথমে দৃষ্টি দেয় তাই অন্যান্য জেলায় আসতে কিংবা মুক্তি দমনে বেশ কিছুটা সময় লাগে। এতে বরিশালে বিদ্রোহী মেজর জলিল ও ফরিদপুরে হেমায়েত উদ্দিন তাঁদের নেতৃত্বাধীন গণবাহিনীকে সংহত করার সুযোগ পান। এবার সর্বত্র পাক থাবার মত ফরিদপুরেও পাক আর্মি আঘাত হানে। ফরিদপুরে শুরু হয় শরণার্থীদের বিরামহীন আগমন। ফরিদপুরের পথে যারা ভারতে যান তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বও মুক্তিদের নিতে হয়।

বিভিন্ন এলাকার মানুষের জন্য শরণার্থী ক্যাম্প স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি দরাজদিলে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। দলমতের উর্ধ্বে ছাত্র-যুবক মুক্তির নেতৃত্বে শরণার্থী ব্যবস্থার দায়িত্ব চলে। শরণার্থী মানুষকে বাঁচাতে ভারতে শরণার্থী যাতায়াতের রুট খোলা হয় : প্রথমটি-ফরিদপুর বালিয়া কান্দির পথে; এবং দ্বিতীয়টি-ফরিদপুর ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ির পথে।

লুটেরার সময়-অসময় ও মানবতা বলে কিছু থাকে না। বিদেশ যাত্রী ছিন্নমূল শরণার্থীদের বাঙালি লুটেরারা সময়-সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্থান বিশেষ যে নির্মম অত্যাচার করেছে ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এ-ব্যাপারে সবার অগ্রণী নকশাল। পরে সৃষ্টি হয় জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের তল্পিবাহক রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী। কোন প্রকার ধর্মাধর্মের বাইরেও লুটেরার অভাব ছিল না। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে নকশালদের অত্যাচারে মানুষ পথের মাঝে সর্বস্ব হারিয়েছে। এসব দুর্বৃত্ত মেয়েদের ইজ্জত পর্যন্ত লুটেছে। যুবতী কন্যা লুণ্ঠনে তারা এ-দেশের ইতিহাস কলংকিত করেছে। সর্বস্ব লুণ্ঠিত মানুষ, ইজ্জত হারানো মা-বোন হেমায়েত সদরে

নিরাপত্তা পেতেন। তাঁদের অকথিত বেদনাদায়ক অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধের ডায়রিতে লেখা হতো।

ঘরের ইঁদুরে বেড়া কাটার মত স্বদেশী লুটেরাদের হাতে বাংলার মানুষের জিন্নতির দুর্গতি হয়েছে সর্বাধিক। যুদ্ধের হানাহানির অরাজকতায় আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে যা হয়। দেশের পশ্চিম অঞ্চলে হক+তোহা গ্রুপের নামের লুটেরা বাহিনী অত্যাচারে তাণ্ডব চালায়। ফরিদপুরের পাংশা ও মাদারিপুর অঞ্চলে সিরাজ শিকদারের (এস এস ডি) পার্টির প্রবল চাপ সামলে মুক্তিযোদ্ধাদের পাক আর্মিকে ধাওয়া করতে হয়েছে। পাক পক্ষের দালালরা ইসলাম ধর্ম ও পাক-বিরোধী মুক্তি কাফের-ভারতের অনুচর হিন্দুজাদাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র জোরেশোরে ওয়াজ নসিয়ত শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বে ঘরে বাইরের শত্রু পরিবৃত মুক্তিদের তিষ্ঠে থাকা ছিল বিভীষিকার মত মহা আতংক। জাতীয় অস্তিত্বের সে মরণ পণ সংগ্রামে স্বদেশ প্রেমের বজ্র শপথ, ন্যায় ও সত্যের পথ চলার অনমনীয় দৃঢ়তায় শত সহস্র সমস্যা পদদলিত করে সাফল্য পেয়েছে মুক্তি।

দুর্গত মানুষের শরণার্থী দলকে প্রথম পর্যায়ে স্কট করে নিত ভলান্টিয়ার পার্টি। তাতেও মাঝে মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিত। মুক্তিবাহিনী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংহত ও অস্ত্রে সজ্জিত হলে বিপন্ন শরণার্থীর স্কটের দায়িত্ব নেয় তারা। দেশের অভ্যন্তর থেকে ভারতের বর্ডার পর্যন্ত নির্দিষ্ট সীমা অন্তর অন্তর স্কটদের দায়িত্ব বদলাত। একদল শরণার্থীকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে পৌঁছে দিলে সেখান থেকে অন্য স্থানীয় স্কটরা শরণার্থী দলের ভার নিতেন। এভাবে সুশৃঙ্খল চেইনের মত শরণার্থী পারাপার চলত। প্রাথমিক বিশৃঙ্খলার পর শরণার্থী পারাপারে নিরাপত্তার শৃঙ্খলা না এলে এক কোটি শরণার্থীর অর্ধেক স্বদেশী-বিদেশী শত্রুর হাতে বেঘোরে পথেই মারা পড়ত। সত্য লুকিয়ে লাভ নেই। এত কিছুর পরও অনেক ক্ষেত্রে শরণার্থী বিশৃঙ্খলা, মুক্তি দুর্বলতা, পাক আর্মির ধূর্ততা ও স্বদেশী দালালের খপ্পরে বহু বিপর্যয় ঘটেছে। সে সব মুক্তিবাহিনীর ব্যর্থতা ও গ্লানির ইতিহাস। এ-সবের বিশেষ কারণ ছোট খাট চোর, ছেঁচড়া, লুটেরা, দালাল, স্থানীয় মাস্তান, পথে বেড়িকেড লাগান চাঁদাবাজদের হাত থেকে শরণার্থীদের বাঁচানো ছিল স্কটের মূল কাজ। যাত্রা পথে স্থানীয় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত দানে গড়ে ওঠা ত্রাণ শিবির ও লঙ্গরে সবাই বিনামূল্যে খাবার পানীয় পেতেন। স্থানীয় জনতার দ্বার ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দুর্গতের জন্য অবারিত। সশস্ত্র পাক আর্মির গমনাগমন পথ ও উপস্থিতির আগাম সংবাদে স্কটরা শরণার্থীদের সতর্ক করে ছুপিয়ে সামাল দিত। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ পাক আক্রমণ থেকে শরণার্থীদের রক্ষা করা ছিল কষ্টকর। স্কটরা অনেক ক্ষেত্রে পাক আক্রমণের হত্যা, ধর্ষণ, লুট থেকে হিজরতিদের বাঁচাতে পারে নি। সে সব মুক্তিযুদ্ধের ব্যর্থতা, গ্লানি ও পরাজয়ের করুণ স্মৃতি।

সব কিছুর পরও বলা চলে স্কটরা উর্দয়াস্ত কাজ করে অসাধ্য সাধন করেছে।

তাদের মূল কাজ নকশাল জাতীয় দেশী পাক সাঙাত লুটেরা ও পাক আর্মির হাত থেকে শরণার্থীর জানমাল রক্ষা করে ভারতের বর্ডারে পৌঁছে দেয়া। রুট সাফল্যের বিচারের ভার জাগ্রত জনতার।

যোগাযোগ বিভাগ

এই যোগাযোগ বিভাগের অধীনেই মুক্তিবাহিনীর নৌ বিভাগ। ফরিদপুর ও বরিশালের মত জলাভূমি অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য জলযান অত্যাবশ্যক। সদা প্রস্তুত দ্রুতগামী তিনশ পঁচিশটি নৌকার একটি নৌবহর হেমায়েত বাহিনী খাড়া করেছিল। প্রতিটি নৌকার আলাদা স্বেচ্ছাসৈনিক মাঝি। প্রতিটি নৌমাঝি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র নৌযোদ্ধা। প্রতিটি নৌকায় থাকতো লুকান অস্ত্র ও গোলাবারুদ। নদ-নদীর দেশে নৌমাঝি জীবন যাত্রার প্রধান বাহন। তাঁদের সন্দেহ করার কিছু থাকতো না। মাঝিদের খাদ্য ও রেশন দেয়া হতো। তাদের মাস্টার রলে প্রতি মাসে পচানব্বই টাকা হারে মাসোহারা দেয়া হতো। সৈনিকদের পারাপার, রসদ যোগান, পাক করা জাতীয় কাজের সাথে মুহূর্তের ব্যবধানে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হতো। তারা গোয়েন্দার কাজ ভালই করতেন। পাক অবস্থান আক্রমণের পূর্বে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা ছিল মুক্তির প্রধান কাজ। কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ আক্রমণে পাক আর্মির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি বেছে নেয় মুক্তি। পাক অবস্থান রেকির নিশ্চয়তায় স্বয়ং অংশ নিতেন বাহিনী প্রধান। জেলের ছদ্মবেশে পাক অবস্থানে গোপালগঞ্জ রেকি করেন হেমায়েত। রানার ও গোয়েন্দার মাধ্যমে শত্রুর সন্ধান রাখা হতো।

বহুতর নৌমাঝি নৌসেনার মাঝে একজন মাত্র নৌসেনা মাঝির বিবরণ দেয়া হল :

নৌকার মাঝি :

অগনিত মুক্তি নৌসেনা বা মাঝির মধ্যে একজনের বিবরণ। হেমায়েত নৌমাঝির একজনের সক্রিয় পরিচয় :

নাম : আবদুল মজিদ মৃধা, পিতা : আবদুল গফুর মৃধা, গ্রাম : টুপারিয়া (১৯৭১ সালে), ফেরধরা (১৯৯৪); পোঃ : কাজুলিয়া (১৯৭১ সালে), এবং ১৯৯৪ সালে 'কোটালিপাড়া'; থানা : কোটালিপাড়া, জিলা : গোপালগঞ্জ।

পাক অত্যাচার প্রত্যক্ষকরণ

সর্ব প্রথম হেমায়েতের নিজ গ্রাম টুপারিয়া জ্বালিয়ে দেয় পাক-বাহিনী। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দেখেছি হেমায়েত ও তাঁর বংশধরদের বসতবাটি ঘরদরজার প্রজ্জ্বলন। পাক বাহিনীর লোক হেমায়েত-এর বাস্তুনিশানা জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। প্রথমে গ্রামবাসী ভাবেন পাক-বাহিনী হেমায়েতকে শত্রু ভেবে তাঁর আবাস পোড়ানোর তাণ্ডব লীলা চালাচেছ। সাধারণ গ্রাম জনতার মনে প্রশ্নঃ কি দোষ করেছে হেমায়েত বংশধর। কি দোষ করেছে গ্রামবাসী। সব যে জ্বলছে বেধড়ক। সংগঠন শক্তির অভাবে জ্বালাও-পোড়াও দেখেও বাধা দিতে না পারার ক্ষোভ হেমায়েতেরও ছিল।

আর্মির গুলিতে নিহত মোল্লা

হেমায়েত-এর গ্রাম-নিশানা পোড়ানোর কিছু দিনের মধ্যে পাক আর্মির গুলিতে নিহত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি কাঠি গ্রামের বাদশা মোল্লা। তাঁর দাফন বহনকারীদের জন্য পাঁচেক নিষ্পাপ মানুষ পর্যন্ত পাক আর্মির গুলির শিকার।

রাধাগঞ্জ বাজার ধ্বংসযজ্ঞ

আমি নৌ-মাঝি। নৌকার কেরায়ায় দিন চলে। নৌপথে সর্বত্র আমার অবারিত গতি। বাদশা মোল্লাহ হত্যার কিছুদিন পর গেলাম স্থানীয় রাধাগঞ্জ বাজার। সকাল দশটার দিকে তিনখানা মিলিটারি লঞ্চ আগমন। হুড়মুড় করে বীরদর্পে তাঁরা নামেন রাধাগঞ্জ বাজারের রাস্তায়। কাউকে কিছু বলা নাই, কওয়া নাই, কোনই সতর্কতার রেশ নাই বাজারের দোকানপাটে একধারচে লাগায় আগুন। পাক গুলিতে কয়েকজন দোকানদারের খুলি উড়ে যায়। আগুন নিভানো চেষ্টার অপরাধে মরে অনেকে। দোকানের মাল মসলা লুটেপুটে নেয় পাক আর্মি। টুপি মাথায় আমার অলৌকিক রক্ষা। মুক্তি হেমায়েত ক্যাম্প পাকি অত্যাচারস্থল থেকে ছয় মাইল দূরে। মুক্তি ক্যাম্প লখণ্ডা গ্রামের তালুকদার বাড়ি।

পাক অত্যাচারের খবর পাওয়া মাত্র অকুস্থলে দুই কোম্পানি মুক্তি দ্রুত যাত্রা করে নৌকা যোগে। পাক আর্মি তাদের লুটপাটের মালে গণিমত নিয়ে কেটে পড়ার পথে মুক্তি বিচ্ছু সেখানে গিয়ে উপস্থিত। ভুক্তভোগী ক্ষতিগ্রস্ত অত্যাচারে জর্জরিত জনতার দুঃখ-দৈন্য, জ্বালা-পোড়া, লুটপাট ও মৃত্যুর জীবন্ত প্রমাণ মুক্তির সামনে। মুক্তির উপস্থিতি টের পেয়ে পাক লঞ্চ পলায়ন করে। জনতা মুক্তি কমান্ডারকে কাছে পেয়ে উদ্দীপিত হয়। জনতার উদ্দেশ্যে জ্বালাময়ী আবেগে মা ও মাতৃভূমির নামে কোরবানির আমানত কামনা করে মুক্তি পাগল ছাত্র জনতার যুব শক্তি মুক্তি মন্ত্রের মৃত্যুযজ্ঞে স্বাক্ষর করেন হেমায়েত।

আবদুল মজিদের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা

অত্যাচারের কষ্টি পাথরে যাচাইকৃত নেতৃত্বের আকর্ষণে মজিদ আকৃষ্ট হন। স্বগ্রামের ছেলে বেঙ্গলের হেমায়েত যোদ্ধা দলে প্রাণ মন সঁপে ভিড়লেন মজিদ। রাধাগঞ্জ বাজারের পাক আর্মির রাধা চক্কর দেখলেন। হেমায়েত উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ জনতার সাথে সাথে তিনিও হেমায়েত বাহিনীতে যোগ দেন।

নৌমাঝি যোদ্ধার প্রশিক্ষণ

আমার জানা নৌমাঝির সংখ্যা ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ)। প্রত্যেকে পয়েন্ট থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল চালনায় সুদক্ষ। হেমায়েত নৌমাঝিতে যোগদান মাত্র প্রতিটি মাঝিকে বাধ্যতামূলকভাবে রাইফেল চালনা শিখান হতো। প্রতিটি নৌকায় গুলি ভর্তি ও অতিরিক্ত রাউন্ড সহ একটি করে রাইফেল অবশ্যই লুকানো থাকতো। সময় ও প্রয়োজনে তার ব্যবহার হতো।

নৌমাঝি যোদ্ধার কাজ

মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধের সরঞ্জাম একস্থান থেকে অন্য স্থানে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়া নৌমাঝির প্রধান কাজ। প্রতি মাঝির মত আমিও পঁচানব্বই টাকা করে নিয়মিত সম্মানী পেতাম। নৌমাঝির আহার হত মুক্তিদের সাথে। অনেক সময় দূর দূরান্তের যাত্রায় আমি নিজেই মুক্তিসেনার পাক করতাম। মাঝিদের মধ্যে কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রীর অভাব হলে মুক্তি সদর খাদ্য ভাণ্ডার থেকে তার যোগান হতো। প্রতিকূল সর্বাবস্থায় মুক্তি বহন ছিল আমার কাজ। ১৯৭১-এর জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত নৌকা ছাড়া চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে।

প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নৌমাঝি

কুশলা ইউনিয়ন সংলগ্ন চৌধুরীর হাট যুদ্ধের রণাঙ্গনে মুক্তি মাঝির রক্তে রঞ্জিত শাহাদতের গৌরব ধন্য। বার খানা নৌকা যোগে পাক আর্মিকে আক্রমণের জন্য যায় মুক্তিসেনা। তুমুল যুদ্ধ বেধে যায় দু'দলে। যুদ্ধের উন্মাদনায় আমার মত নৌমাঝি মুক্তিসেনাও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। নৌকা রেখে আমরা সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার সহযোদ্ধা নৌমাঝি তৈয়ব আলী বখতিয়ার ও রতন কুমার অতুলনীয় শৌর্যের সঙ্গে লড়ে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ভুলের মাসুলে তাদের পরাজয় ঘটে। চৌধুরীর হাট যুদ্ধের অকুস্থলে নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ ও কমান্ডার লুৎফর রহমান ।

চৌধুরীর হাট যুদ্ধ পরাজয়ের শোকাবহ সংবাদে ত্বরিৎ গতি ছুটে আসেন বাহিনী প্রধান হেমায়েত। মৃত্যু শপথের দীপ্ত অঙ্গীকারে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে শত শত মুক্তিযোদ্ধার সাথে রণাঙ্গনে তাঁর উপস্থিতি। পাক আর্মির সামনে যেন হেমায়েত নামের কেয়ামত। বিনা যুদ্ধে পাক আর্মি পলায়ন করে। শত্রু চোখে হেমায়েত ছিলেন এমনি এক বিভীষিকা।

মুক্তি মাঝির প্রেরণা দায়িনী

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে আবদুল মজিদ মৃধার মূল প্রেরণা দায়িনী ছিলেন স্ত্রী ছালেহা খাতুন। তিনি তাঁকে চারটি সন্তান উপহার দেন : ১. মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান মৃধা (পুত্র), ২. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান মৃধা (পুত্র), ৩. মোহাম্মদ কবির মৃধা (পুত্র), এবং ৪. মিস রুমা খানম (কন্যা)।

জীবন যুদ্ধের প্রেরণা দায়িনী ১৯৮৫ সালে অকালে জান্নাতবাসী। জীবনের প্রেরণা, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা দায়িনী প্রিয়তমার স্মৃতির মাঝে সন্তানদের মাঝে জীবনমৃত বেঁচে আছি। ১৯৭১ পরবর্তী জীবনে আমার ভাগ্যের পরিবর্তন আসে নি। আজো দুর্বল হাতে নিজ নৌকা বেয়ে রোজগারে নামি। নৌকা চালিয়ে যা পাই তা দিয়েই সন্তানদের মুখে অন্ন দেই। জীবন যুদ্ধে জয়ের স্বপ্নের খোয়াব দেখি। তাই শত দৈন্যের মাঝেও সন্তানদের পড়াশোনা চালু রেখেছি। বাণিজ্য শ্রেণীতে ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্র আশরাফুজ্জামান লজিং থেকে ক্ষেত মাঝির কাজ করে পড়াশোনা চালাচেছ। অন্য

সন্তানদের অবস্থাও তথৈবচ। মাতৃহীন সন্তানদের দুবেলা অন্ন জুটাতে না পেরে, পড়াশোনার বেতন, বই, পোশাক ঠিকমত ও সময় মত দিতে না পেরে হতাশায় আল্লাহর দরবারে হাত উঠাই। হে মোর স্বাধীন দেশ আমারে কিছু না দাও এ-দেশের ভবিষ্যতের সন্তানদের কিছু দাও। স্বাধীন দেশের আলো বাতাসে বেঁচে আছি এটাই আমার বড় পাওনা। দেশের কাছে আর তো কিছু চাওয়া পাওয়ার নেই। ১৯৭১-এ যেমন হারাবার কিছু ছিল না। ১৯৯৫-এও পাবার কিছু নেই। যার কিছু নেই সে পাবেই বা কি আর হারাবেই বা কি?

কুরিয়ার কোম্পানি সংবাদ অংশগ্রহণকারী টিম

মুক্তিবাহিনীর সংবাদ আদান প্রদানের মূল সূত্র জনতা। পাক আর্মির যাত্রা পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জনতা খবর রাখতো। পাক আর্মি তাদের নির্ধারিত গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পূর্বেই ওয়্যারলেসের দ্রুতগতির ন্যায় জনতার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী খবর পেয়ে যেত। অভ্যন্তরীণ মুক্তিদের সাথে ওয়্যারলেস সেট না থাকলেও ভারত প্রত্যাগত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তি দলের অফিসারদের সঙ্গে শক্তিশালী ওয়্যারলেস সেট থাকতো। অনুরূপ ওয়্যারলেস সেট মুজিব বাহিনীর বড় বড় দলের সাথেও থাকতো। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৮ নং সেক্টরের চারজন অফিসার গেরিলা দল নিয়ে ভিতরে আসেন যশোর ও ফরিদপুরে। তাঁরা ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব, ই এম ই মাগুরা-ফরিদপুর। ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী সি এস পি আলমডাঙ্গা। ক্যাপ্টেন কমল সিদ্দিকী, ইঞ্জিনিয়ার নড়াইল। ক্যাপ্টেন সফিক, অধ্যাপক কেশবপুর-মনিরামপুর। এঁদের প্রত্যেকের সাথে শক্তিশালী বেতার যন্ত্র ছিল। হেমায়েত বাহিনীর সংবাদ অতিদ্রুত বহির্বিশ্বে বিশেষ করে ভারতে পৌঁছার গোপন রহস্য এখানে। ক্যাপ্টেন ওহাবের গ্রুপের সাথে হেমায়েত গ্রুপের সংযোগ ও সুশৃঙ্খল যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

হেমায়েত বাহিনীর সংবাদ প্রেরণের নিজস্ব যোগাযোগ পদ্ধতি :

ক। রানার, খ। কোরিয়ার, গ। পুরুষ/মহিলা গোয়েন্দা, এবং ঘ। রেকি।

মুক্তি রেকি গ্রুপ তাদের নিজেদের থেকে রুটিন মত রেকি প্যাট্রলে গিয়ে শত্রুর অবস্থান ও যোগাযোগ দেখে আসতো। মহিলা গোয়েন্দারা জনতার মাঝে থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে আনতেন। মুক্তি ক্ষমার ঔদার্যে রক্ষা পাওয়া ষোড়শী কমলাবতী রাণী গোপালগঞ্জ সেনানিবাসে পাক অফিসারকে নারীর সর্বস্ব দিয়ে বশীভূত করে মুক্তি বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করে আনেন। পাক বংশবদ রাজাকারও সময়ে সময়ে মুক্তিকে মূল্যবান তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করতো।

একাদশ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ : একটি অসম্পূর্ণ তালিকা

'ক' শাখা ঃ হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধা ও সহযোগীদের নামের তালিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর ডায়েরিভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা হেমায়েত বাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত সব ধরনের যোদ্ধার অত্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হেমায়েত বাহিনীর ১৯৭১ সালের ডায়েরি থেকে যোদ্ধা নম্বরসহ তালিকাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হেমায়েত বাহিনীর সক্রিয় যোদ্ধা, গোয়েন্দা, অভ্যন্তরীণ চর, মাঝি-মাল্লা, বাবুর্চি, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক লোকবল, লিয়াঁজো সৈনিক, আরমোরার, অফিসিয়াল ইত্যাদি সহ একটি যুদ্ধবাজ সৈনিকদল, একাত্তরের হেমায়েত বাহিনী পরিচালনায় যাঁদের প্রয়োজন ছিল। মূল যোদ্ধা নম্বর ঠিক রেখে তালিকাটি জেলাভিত্তিক সাজিয়ে অত্র গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই তালিকাটি আংশিক। যেহেতু একাত্তরের ডায়েরিতে শুধুমাত্র যোদ্ধার নাম, গ্রাম, থানা ও জেলা উল্লেখ করা আছে এবং পরে যোগাযোগের ঠিকানাসহ এসবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তাই ঠিকানা সংশোধনসহ পূর্ণ তালিকা উপস্থাপন করতে আরও সময়ের প্রয়োজন হবে। তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় লোকবল দিয়ে সাহায্য করলে তালিকাটি সময়োপযোগী করে দেওয়া সম্ভব হবে। এখানে আরও উল্লেখ থাকে যে, নিম্নবর্ণিত তালিকায় মন্তব্য কলামে যাদের নামের পার্শ্বে যোদ্ধা কিংবা অন্য কিছু লেখা নেই তারাও যোদ্ধা, তবে তারা যোদ্ধা নাকি যোদ্ধা-মাঝি, নাকি প্রশাসনিক কাজে যুক্ত ছিলেন সে-কথাটি লেখা নেই।

১১/১০/২০০৩

হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম
মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী প্রধান

হেমায়েত বাহিনীর ডায়েরিভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা

(জেলাভিত্তিক)

জেলা ঃ গোপালগঞ্জ

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
০১	হেমায়েতউদ্দিন, বীর বিক্রম	আবদুল করিম শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	হেমায়েতবাহিনী প্রধান; যুদ্ধাহত
০২	আবদুল করিম শেখ [বর্তমানে মৃত]	মৃত হেলালউদ্দিন শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	ক্যাম্প পরিচালক
০৪	এ কে এম ছারোয়ার জান বিশ্বাস	আবদুল আজিজ বিশ্বাস	সুকতাইল, গোপালগঞ্জ	যুদ্ধাহত
০৫	হাজি মোঃ শাহাবুদ্দিন ফকির	মৃত আবদুল আজিজ ফকির	সুকতাইল, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
০৮	মোঃ জোনাব আলি শেখ	নিছারউদ্দিন শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
০৯	মোঃ আবদুস সাত্তার	দুহিরউদ্দিন সরদার	বাইনেরি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
১০	মোঃ সামসুল হক	পিতা: আবদুল করিম শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
১১	ছিদ্দিক তালুকদার	রাজা আলি তালুকদার	সেনারগাতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যুদ্ধাহত
১২	ঠাকুরদাস বিশ্বাস	ভগিরথ বিশ্বাস	পাইকেরবাড়ি, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
১৪	মোঃ শাজাহান শেখ	মৃত লোকমান হোসেন	সেনারগাতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৬	মোঃ আমীর আলি শেখ	মনসুর আলি শেখ	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৭	তাহমিনা খানম	আবদুস সামাদ শেখ	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা, ইনফরমার
১৮	এস.এম. খলিলুর রহমান	শেখ নেছারউদ্দিন	গোপালপুর, কেভি গোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৯	ডা. মোঃ বেলায়েত হোসেন	মৃত হাজি মোস্তাজউদ্দিন	পাকুরতিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	ডাক্তার, যোদ্ধা
২০	হাচেনউদ্দিন শেখ [বর্তমানে মৃত]	আবদুল গনি শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৫	মোঃ নূর মোহাম্মদ শেখ	নোয়াবালি শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩০	মোঃ নজির হোসেন শেখ	মৃত আবদুল করিম শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	আরমোরার, যোদ্ধা
৩১	সখিনা বেগম [বর্তমানে মরহুমা]	স্বামী আবদুল করিম শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	ক্যাম্প পরিচালিকা, যোদ্ধা
৩২	সোনেকা রানী রায়	স্বামী হেমায়েতউদ্দিন, বিবি	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা
৩৩	মোমেলা বেগম	আবদুল করিম শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা
৩৪	মজিদা বেগম	স্বামীঃ সামসুল হক	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা
৩৫	মোশাররফ হোসেন শিকদার	আবদুল গনি শিকদার	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৬	মরিয়ম বেগম	স্বামী নজির হোসেন শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা
৩৭	বাদশা মিয়া তালুকদার	বেলায়েত হোসেন তালুকদার	সেনারগাতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৮	মোঃ হোলায়মান শেখ	আব্দু শেখ	ধোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪০	গোলাম মোস্তফা	মৃত মৌলভী কফিলউদ্দিন	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা
৪১	মোঃ আবদুল কুদ্দুস শেখ	আবদুল মজিদ শেখ	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা, তথ্যসরবরাহকারী
৪২	মজিবর রহমান	সোনামিয়া দাড়িয়া	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৩	জীবনকৃষ্ণ শীল	সতীশ শীল	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৪	শেখ আবদুস সবুর	শেখ আবদুল মান্নান	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৪৫	সিদ্দিক শেখ	আদিলউদ্দিন শেখ	দত্তডাঙ্গা, ভোজেরগেতি, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা
৪৬	আবদুস সালাম মোল্লা	করিম মোল্লা	বাজুনিয়া, ভোজেরগেতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৭	আলতাফ চৌধুরি	মোঃ পিরু চৌধুরি	বাজুনিয়া, ভোজেরগেতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৮	মোঃ আজিম চৌধুরি	মোঃ লেহালউদ্দিন চৌধুরি	বাজুনিয়া, ভোজেরগেতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৯	রমজান আলি মোল্লা	আছিরউদ্দিন মোল্লা	দত্তডাঙ্গা, ভোজেরগেতি, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা
৫০	আবদুল হাই দাড়িয়া	মোঃ কালু দাড়িয়া	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫১	মোঃ রুস্তম আলি শেখ	মোঃ মোখলেসুর রহমান শেখ	বাজুনিয়া, ভোজেরগেতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২	মোঃ রুস্তম আলি সরদার	মোঃ শহর আলী সরদার	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৩	প্রদীপ কুমার বিশ্বাস	কেশবলাল বিশ্বাস	শেওড়াবাড়ি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৪	মোঃ ছবর আলি হাওলাদার	মোঃ ইসমাইল হাওলাদার	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫	মোঃ সাহাবুদ্দিন সরদার	মোঃ নেছারউদ্দিন সরদার	বাজুনিয়া, ভোজেরগেতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৬	মোঃ কুতুবুদ্দিন	আবদুল গফুর সরদার	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, গোয়েন্দা
৫৭	মোঃ জহুরুল হক শেখ	মোঃ আদিলউদ্দিন শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার
৫৮	মোঃ হালিম মোল্লা	রজ্জব আলি মোল্লা	ছোট দক্ষিণপাড়, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬২	ডেভিড মুখার্টি (সুশান্ত)	আর সি মুখার্টি	ভয়গ্রাম, কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৫	মোজাহারুল হক (বাহার)	আবদুল আলি তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৫	নাজমা বেগম	জগবন্ধু বণিক	ভাজনদি, দিগনগর, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	বীরাঙ্গনা, যোদ্ধা
৮৬	মোঃ মোশাররফ শেখ	কাশেম শেখ	মনিরকান্দি, গোহালা, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, যুদ্ধাহত
৮৭	এ এস এম সেলিম	মোঃ সাইদুর রহমান	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৯১	মোঃ আতিকুর রহমান	মৃত মোঃ মতিউর রহমান	আগুতিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৩	মফিজউদ্দিন শিকদার	মোঃ রহম শিকদার	দখলদিয়া, বাঁশবাড়িয়া, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৪	রমেশচন্দ্র বাকচী	ললিতমোহন বাকচী	পূর্বপাড়া, গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫	অপূর্বলাল বাড়ৈ	রূপচাঁদ বাড়ৈ	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৬	মোঃ আবদুস সালাম মিয়া	মোসলেমউদ্দিন মিয়া	নোয়াধা, হরিনাহাটি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৮	ললিতচন্দ্র চৌধুরি	লালমোহন চৌধুরি	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৯	ক্ষীরোদ সমাদ্দার	উমেশ সমাদ্দার	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১০	শিবানন্দ বালা	সতীশ বালা	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১১	নিরাঞ্জন তালুকদার	নিশিকান্ত তালুকদার	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১২	তিনকড়ি হালদার	যোগেশ হালদার	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৩	শচীন্দ্রনাথ অধিকারী	রামতনু অধিকারী	রাজাপুর, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৪	সুরেন্দ্রনাথ বাড়ৈ	কৈলাশ বাড়ৈ	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৫	অনিল বাড়ৈ	মনোহর বাড়ৈ	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৭	নিহাররঞ্জন বাড়ৈ	সদানন্দ বাড়ৈ	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৮	ডা. জগদীশ চন্দ্র অধিকারী	ডা. এককাড়ি অধিকারী	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২০	সতীন্দ্রনাথ বাড়ৈ	রাধাকৃষ্ণ বাড়ৈ	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১	অনিলচন্দ্র হাওলাদার	অশ্বিনী হাওলাদার	নৈয়ারবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৩	শ্রীশদেব রায়	ভূদেবচন্দ্র রায়	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৪	চিত্তরঞ্জন বাড়ৈ	দেবেন্দ্রনাথ বাড়ৈ	ধোড়ার (আমবাড়ি), কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১২৬	কবি শেখ আবদুস সামাদ	শেখ আঃ সানাউল্লাহ	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
১২৭	জেমস খ্রিস্টদাস শিকদার	ডা. এম.এন. শিকদার	কলিগ্রাম, জলিলপাড়, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
১২৮	মোঃ রুস্তম আলি দাড়িয়া [বর্তমানে মৃত]	আবুল কাশেম দাড়িয়া	ধোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
১৩০	মোঃ নিজামউদ্দিন খান	মৃত গফ্ফার আলি খান	চৌরখুলি, রাধাগঞ্জ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা
১৪০	জয়নাল তালুকদার	মৃত সৈয়দ আলি তালুকদার	ডুমুরিয়া, বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৯৪	মৃণাল কান্তি হালদার	মতিলাল হালদার	জহরের কান্দি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৯৫	এ কে এম শামসুদ্দিন	এম এ করিম	বান্ধা বাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৯৬	কাশিশ্বর তালুকদার	শ্যামলাল তালুকদার	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২০০	রমেশচন্দ্র সাহা	বংদেশ্বর সাহা	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২০১	মোঃ হানিফ সরদার	ফাগু সরদার	রামদিয়া, কলেজ রামদিয়া, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২০২	আতিয়ার রহমান তালুকদার	হাসমত আলি তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২০৬	শান্তিরঞ্জন সরকার	কার্তিক সরকার	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
২০৭	মনিন্দ্রনাথ বৈষ্ণব	আদারিনাথ বৈষ্ণব	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২০৮	রতিকান্ত হালদার	মৃত মহারাজ হালদার	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২১১	শেখ মোঃ আলি	শেখ আবদুল হাই	পাইককান্দি, গোপালগঞ্জ	যুদ্ধাহত, গেরিলা
২১২	মোঃ আতিকুর রহমান	মৃত মোঃ মতিয়ার রহমান	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২১৩	মোঃ আশ্রাব আলি শেখ	ফখর উদ্দিন শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
২১৪	মোঃ আবদুল জব্বার পাইক	মেছের আলি পাইক	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা

হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধা ও সহযোগীদের নামের তালিকা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
২১৫	বিমল চন্দ্র শীল	মনোহর শীল	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	নাপিত, যোদ্ধা
২১৬	তফিজউদ্দিন কাজি	আইজউদ্দিন কাজি	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২১৭	শান্তিরঞ্জন মধু	মৃত মনীন্দ্রভূষণ মধু	কাফুলাবাড়ি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২১৮	মোঃ লিয়াকত আলি শেখ	মৃত আফসারউদ্দিন শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২১৯	মোঃ মোসলেম উদ্দিন মোল্লা	কফিলউদ্দিন মোল্লা	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২২০	মোঃ আলি হোসেন মোল্লা	কফিলউদ্দিন মোল্লা	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২২১	বিদ্যাধর বিশ্বাস	ভাগ্যধর বিশ্বাস	পূর্বপাড়া, গচাপড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২২২	মোঃ আজাহার উদ্দিন বিশ্বাস	মৃত মোঃ বলু বিশ্বাস	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২২৩	ডা. আবদুর রহমান	মৃত গয়জউদ্দিন শেখ	সোনাটিয়া, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
২২৪	মিসেস বিমলারানী হালদার	মৃত যদুনাথ হালদার	দিঘলিয়া, রাধাগঞ্জ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা
২২৫	এস এম হুমায়ুন কবির	মৃত সোনামুদ্দিন শেখ	গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২২৬	নরেশচন্দ্র বিশ্বাস	নবকৃষ্ণ বিশ্বাস	জহরের কান্দি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২২৭	মোঃ লালমিয়া পাইক	দলিল উদ্দিন পাইক	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২২৮	মোঃ আলি আজগর ঘরামি	মোঃ আজাহার আলি	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২২৯	ডা. মোঃ চাঁদ মিয়া	মৃত 'আঃ গফুর মুনশি	পূর্বপাড়া, সিতাইকুণ্ড, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, ডাক্তার, যোদ্ধা
২৩০	মোঃ জয়নুল আবেদিন ফকির	ছলেমুদ্দিন ফকির	দিঘলিয়া, রাধাগঞ্জ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৩১	মোঃ জহর আলি শেখ	আবদুল্লাহ শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৩২	আবদুল করিম কাজি	মোঃ মফিজুদ্দিন কাজি	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
২৩৩	বিশ্বেশ্বর রায়	দেবেন্দ্র নাথ রায়	হাজরাবাড়ি, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৩৪	আবদুস ছত্তার মিয়া	মৃত হারেছ মিয়া	টুপারিয়া, কান্দুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৩৫	মোঃ ইউসুফ আলি পাইক	আনোয়ার হোসেন পাইক	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৩৬	আডিতোশ ওঝা	অনন্তকুমার ওঝা	কোনেরভিটা, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৩৭	সর্বাঙ্গসুন্দর রায়	বড়দাকান্ত রায়	রাজাপুর, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৩৮	মোঃ হাবিবুর রহমান শেখ	জহরুল হক শেখ	টিহাটি, কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৩৯	মোঃ রোকন মোল্লা	মোঃ বশিরউদ্দিন মোল্লা	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৪০	কাজি আবদুল হান্নান	কাজি রোকনউদ্দিন	কুরপালা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৪৩	মোঃ বিশাই মোল্লা	আছিরউদ্দিন মোল্লা	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৪৪	কৃষ্ণকান্ত বাড়ৈ	কুটিশ্বর বাড়ৈ	জহরের কান্দি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৪৫	জোনাবালি হাওলাদার	আহম্মদ হাওলাদার	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৪৬	চিত্তরঞ্জন সাহা	শ্রী রঙ্গেশ্বর সাহা	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৪৭	অশ্বিনি জয়ধর	শ্রী দুর্গাচরণ জয়ধর	ভূতবিয়া, নারিকেলবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৪৮	হাজি শেখ আবদুল খালেক	মৃত শেখ মোঃ মবিনউদ্দিন	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	প্রধান প্রশিক্ষক, ট্রেনিং সেন্টার
২৪৯	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	আবদুল মালেক দাড়িয়া	মাঝবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
২৫০	আলহাজ্ব শেখ লুৎফর রহমান	মৃত ইসমাইল শেখ	ডহরপাড়া, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার
২৫১	মোঃ মুনিরুজ্জামান বিশ্বাস	মৃত মোদাচ্ছের বিশ্বাস	বর্ষাপাড়া, হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার
২৫২	আবুল বাশার শেখ	সোনামুদ্দিন শেখ	ডহরপাড়া, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৩০৬	হারুন অর রশিদ চৌধুরি	মৃত সাহাব উদ্দিন চৌধুরি	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩১০	মোঃ আবদুল আজিজ বিশ্বাস (আজিম)	কুটিমিয়া বিশ্বাস	বর্ষাপাড়া, হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যুদ্ধাহত
৩১১	সুরেন্দ্রনাথ রায়	অধরচন্দ্র রায়	শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৩১২	লিয়াকত আলি শাহ	আবদুল গফুর শাহ	দক্ষিণপাড়া, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধাহত
৩১৬	মোঃ মহরউদ্দিন গোলদার	আজিমুদ্দিন গোলদার	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৩১৭	মোঃ ছিদ্দিক খাঁ	মোঃ করম আলি খাঁ	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩১৮	জহুরুল হক গাজি [বর্তমানে মৃত]	জেনারউদ্দিন গাজি	কয়খা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৩১৯	চান মিয়া মোল্লা	মোঃ তৈয়বুর রহমান মোল্লা	পূর্ববর্তি, পিঞ্জরি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩২৩	ডা. জগদিশচন্দ্র অধিকারী	একবড়ি অধিকারী	খাগবাড়ি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩২৪	মোঃ হানিফ শেখ	মৃত হামেদ শেখ	কান্দি আমবাড়ি, কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩২৫	রুহিদাস মৃধা	মৃত অনন্তকুমার মৃধা	লাটেঙ্গা, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩২৬	মোঃ ফায়েকুজ্জামান ফকির	মৃত হাসেম ফকির	কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩২৭	মোঃ জাফর আলি ফকির	আবদুল মজিদ ফকির	চিতশি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩২৮	মোঃ মোশাররফ হোসেন	মৃত সিরাজউদ্দিন	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩২৯	আইউব আলি শেখ [বর্তমানে মৃত]	মৃত মফেল শেখ	তারাশি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৩০	মোঃ আলতাফ হোসেন মোল্লা	মোঃ আবদুর রহমান মোল্লা	আগুতিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সহঃ কমান্ডার

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৩৩১	ডা. লালমোহন বিশ্বাস [বর্তমানে মৃত]	মৃত বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস	ভূত্তেরবাড়ি, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	ডাক্তার, যোদ্ধা , সংগঠক
৩৩২	শেখ হাবিবুর রহমান	মৃত শেখ জয়েনউদ্দিন	সোনাটিয়া, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, সংগঠক
৩৩৩	আবদুল হক শেখ [বর্তমানে মৃত]	মৃত আবদুল জব্বার শেখ	ধোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৩৩৪	মোঃ সাহেব আলি শেখ	মৃত মদন শেখ	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, সৈনিক
৩৩৫	শ্রী গোপালকৃষ্ণ বিশ্বাস	মৃত জাদবচন্দ্র বিশ্বাস	নোয়াধা, গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৩৬	মোঃ খবিরউদ্দিন শেখ	মৃত আক্কাছ আলি শেখ	কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৩৭	মোঃ আলি আকবর ফকির	মোঃ জহিরউদ্দিন ফকির	কাঠিগ্রাম,কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৩৮	শ্রী ভক্তকুমার বৈদ্য	ভেদুনাথ বৈদ্য	বৈকন্ঠপুর, কলাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৩৯	মোঃ রুস্তম আলি শেখ	মৃত ভেলু শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৪০	রুহিদাশ কীর্তুনিয়া	মৃত উপক্ষ কীর্তুনিয়া	ধোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৪১	আব্বাস আলি	মোঃ বাহাদুর আলি শেখ	চিতশি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার
৩৪২	এস এম আইয়ুব হোসেন	আনোয়ার হোসেন শিকদার	বান্দল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সহঃ কমান্ডার
৩৪৩	মোঃ ফেলু শেখ	মৃত আদু শেখ	কাশাতলি, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৪৪	মোঃ চান মিয়া খান	মোঃ আশরাফ উদ্দিন খান	গোপালপুর, কেডিগোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৪৫	মোতাহের খান	জোনাব আলি খান	গোপালপুর, কেডিগোপালপুর,কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	শহিদ
৩৪৬	ডা. মোঃ রুস্তম আলি মিয়া	মৃত আফসার উদ্দিন মিয়া	আমতলি, শিকিরবাজার, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	ডাক্তার, যোদ্ধা
৩৪৭	ডা. আতিয়ার রহমান মোল্লা	মৃত হাসেম মোল্লা	আগুতিয়া, কাজুলিয়া,কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৩৪৮	দেবেন্দ্রনাথ মৃধা	রাইচরণমৃধা	লাঠেঙ্গা, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৫০	মোঃ হারুন আর রশিদ মোল্লা	মোঃ ইসলাম মোল্লা	শশিরকান্দি, গোহালা, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৫১	মোঃ গোলাম সরোয়ার	আবদুল গণি মিয়া	দাশেরকান্দি, রাঘদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৫২	মোঃ ইলিয়াস আহমদ	মৃত মোসলেম শেখ	ওপারকান্দি, দিগনগর, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৫৩	মোঃ মোতালেব মোল্লা	নওয়াব আলি মোল্লা	ডোমরাকান্দি, রাঘদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৫৪	আতাহার কাজি	মৃত আমিনউদ্দিন কাজি	সুন্দরদি, রাঘদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৫৫	গজের আলি শেখ	আইনউদ্দিন শেখ	দাশেরকান্দি, রাঘদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৫৬	আবুল হাশেম শেখ	মৃত মোঃ হামেত আলি শেখ	চরপ্রসন্নদি, রাঘদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, সিপাহি
৩৫৭	আবদুল জব্বার বেপারী	গেদু বেপারী	চরপ্রসন্নদি, রাঘদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৫৮	শেখ সরোয়ার হোসেন	শেখ আবদুর রহমান	চরপ্রসন্নদী, রাঘদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৫৯	মোঃ মিজানুর রহমান	মৃত গোলাম সরোয়ার মিয়া	দাশেরকান্দি, রাঘদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৬১	কাজি আলমগীর	মৃত কাজি আনোয়ার হোসেন	টুঙ্গিপাড়া, পাটগাতি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, ইনফরমার
৩৬২	মোঃ মাহবুবুর রহমান	এ কে আহসান আলি	বহলতলি, কেড়িগোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৬৩	মোঃ মাহমুদুল হক	আবদুল লতিফ শিকদার	বহলতলি, কেড়িগোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৬৪	মোঃ সামছুল হক খান	রহিমউদ্দিন খান	চৌরখুলি, রাধাগঞ্জ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, সিপাহি
৩৬৫	শ্রী বিশ্বনাথ রায়	মৃত শীতলচন্দ্র রায়	রাজাপুর, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৬৬	মোঃ শহিদুল ইসলাম পাইক	বলু পাইক	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৬৭	আঃ ছাত্তার খান	মোঃ নওয়াব আলি খান	তালারবাড়ি, শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৬৮	মোঃ নুরুদ্দিন শেখ	আবুবকর শেখ	ঋন্দি, কান্দুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	বাবুর্চি, যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৩৬৯	মোঃ মমিনউদ্দিন শেখ	মোঃ বেরাজউদ্দিন শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা
৩৭০	মোঃ শফিজউদ্দিন শেখ	মোঃ বেরাজউদ্দিন শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
৩৭১*	মোঃ হারুন আর রশিদ শেখ	আমিনউদ্দিন শেখ	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৭২	মহাদেবচন্দ্র জয়ধর	মৃত যোগেন্দ্রনাথ জয়ধর	থাগবাড়ি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৭৩	শ্রী নারায়নচন্দ্র তালুকদার	শ্রী হরিচরণ তালুকদার	রাজাপুর, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৭৪	মোঃ জমির আলি বিশ্বাস	মোঃ দেলোয়ার হোসেন বিশ্বাস	বর্ষাপাড়া, হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৭৫	এস এম শাহজাহান	মৃত আবদুল মালেক শিকদার	কাকডাঙ্গা, কেডিগোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৭৬	মোঃ বাদশা হাওলাদার	মৃত লেহাজউদ্দিন হাওলাদার	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৭৭	শ্রী বিবেকানন্দ বিশ্বাস	মৃত সাধন বিশ্বাস	জহরেরকান্দি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৭৮	শ্রী রূপচাঁদ ঢালি	শশিভূষণ ঢালি	জহরেরকান্দি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৭৯	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত মেনাজউদ্দিন	আমতলি, শিকিরবাজার, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৮৫	মোঃ হামিদ খান [বর্তমানে মৃত]	মৃত রহিমউদ্দিন খাঁন	চৌরখুলি, রাধাগঞ্জ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৮৮	মোঃ কামরুজ্জামান ঠাণ্ডা	খেয়ালউদ্দিন তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৮৯	আবদুল জব্বার শেখ	ভোলাই শেখ	গয়লাকান্দি, খালিয়া, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৯০	ডা. এস এম আসাদুজ্জামান	মৃত সোনামুদ্দিন শেখ	পারঝনঝনিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	ডাক্তার, যোদ্ধা
৩৯১	শেখ আসাদুজ্জামান [বর্তমানে মৃত]	মৃত শেখ আবদুর রহমান	পারঝনঝনিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৯৭	আবদুল বারি সরদার	মোঃ ইয়াকুব আলি সরদার	ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৩৯৮	মোঃ নাসিরউদ্দিন শেখ	মৃত আবদুস ছালাম শেখ	মহম্মদপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৩৯৯	মোঃ মোমরেজ আলি	মৃত হাচানউদ্দিন খান	বলাকৈড়, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪০০	মৌলানা দেলোয়ার হোসেন	মৃত মৌলভী সাহাবউদ্দিন	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৪০৩	মোঃ ফেরদৌস আলম	মোঃ শাহজাহান হাওলাদার	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪০৪	কাজি ওমর আলি	কাজি সোনাউল্লাহ	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪১৪	খলামিয়া দলিলউদ্দিন	হাতেম শেখ	ছোটদক্ষিণপাড়, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪১৫	ডা. দুলালচন্দ্র বিশ্বাস	ডা. লালমোহন বিশ্বাস	ভুতেরবাড়ি, নারিকেলবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪১৬	দীননাথ তালুকদার	দেবেন্দ্রনাথ তালুকদার	সাতুরিয়া, পিঞ্জুরি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪১৭	শ্রী ক্ষীরোদ রায়	সুখলাল রায়	পোলশাইর, গোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪১৮	মোঃ ফারুক আহমদ মিয়া	জৈনুদ্দিন	চিত্রাপাড়, গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪১৯	মতিয়ার রহমান মোল্লা	সুরাৎ আলি মোল্লা	পাকুরতিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, গোয়েন্দা
৪২০	শাহজাহান হাওলাদার	সেরাজউদ্দিন হাওলাদার	আমতলি, শিকিরবাজার, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪২১	মোঃ উলু শেখ	ছাবদুল্লাহ শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪২২	মোঃ মোকসেদ মোল্লা	ওয়াজেদ আলি মোল্লা	বড়দক্ষিণপাড়, উনশিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪২৪	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মোঃ বিসাই শেখ	সেনারগেতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
৪২৫	আবুল কালাম শেখ	দলিল উদ্দিন শেখ	বড়দক্ষিণপাড়, উনশিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪২৬	মোঃ হানিফ শেখ	আবদুল গনি শেখ	উনশিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪২৭	মোঃ হান্নান শেখ	মোঃ আসাদুজ্জামান শেখ	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪২৮	আবদুর রব ফকির	আবুল হাশেম ফকির	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৪২৯	ফারুক আহম্মদ সরদার	হাজি মোজামল সরদার	কাজুলিয়া,, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৩০	কৃষ্ণদেব সরকার	রামলাল সরকার	শেওড়াবাড়ি, কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৩১	মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান সরদার	মোঃ আবদুল মজিদ সরদার	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৩৩	মোঃ মোজাম সরদার	হাজি আবদুল গফুর সরদার	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৪৩৪	সাহাবুদ্দিন সরদার	মোজাম সরদার	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	সহঃ কমান্ডার
৪৩৫	মোঃ এনায়েত হোসেন শেখ	আবদুল কাদের শেখ	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৩৬	লিয়াকত আলি হাওলাদার	মোসলেম আলি হাওলাদার	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৩৭	নিখিল বিশ্বাস	সুরেন বিশ্বাস	শেওড়াবাড়ি, কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৩৮	শেখ সোহরাব হোসেন	ছহিরউদ্দিন	দিঘলিয়া, রাধাগঞ্জ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, অফিসিয়াল
৪৩৯	সরদার হাবিবুর রহমান	কুতুবুদ্দিন সরদার	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৪০	আবদুল খালেক হাওলাদার [বর্তমানে মৃত]		গোপালপুর, কেডিগোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৪১	সুশীল কুমার দত্ত সুনীল দত্ত	শ্যামাচরণ দত্ত	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৪২	রাজ্জা মিয়া শেখ	দলিলউদ্দিন শেখ	জামুলা, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
৪৪৭	অমলেন্দু রায়	অনন্ত কুমার রায়	রাজাপুর, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৪৮	সুধাংশু কুমার রায়	সিদ্ধিশ্বর রায়	রাজাপুর, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৫০	অনন্ত কুমার অধিকারী	রামতনু অধিকারী	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৪৫১	দানিয়েল সরকার	নিশিকান্ত সরকার	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৬০	মোঃ নজরুল ইসলাম খান	মোস্তাজউদ্দিন খান	গোপালপুর, কেডিগোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৪৬১	আলতাফ হোসেন শেখ	মোঃ কাশেম আলি শেখ	বড়দক্ষিণপাড়, উনশিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৬২	মনিন্দ্রনাথ অধিকারী	কৃষ্ণকান্ত অধিকারী	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৬৩	শ্রী জগদীশ চন্দ্র বাগচী	যতীন্দ্রনাথ বাগচী	রাজাপুর, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৬৪	আমির হোসেন পাইক	মোঃ জোনাব আলি পাইক	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৪৬৫	নেতাজি শেখ সেকান্দার আলি	শেখ মফিজউদ্দিন	উত্তরপাড়, সিতাইকুণ্ডু, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৪৬৬	মোঃ ইয়াসিন মোল্লা	ওয়াসিমউদ্দিন মোল্লা	তারাশি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৪৬৮	মোঃ আসাদুজ্জামান	আবদুস ছাত্তার মোল্লা	পাকুড়তিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৬৯	মোঃ এনামুল হক	গোলাম সরোয়ার	পাকুড়তিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৭০	সিরাজুল ইসলাম তালুকদার	আবদুল জব্বার তালুকদার	উত্তরপাড়, গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৪৭১	আবুল হোসেন শেখ	মৃত ইসমাইল শেখ	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
৪৭২	আলি আকবর মোল্লা	আশেক আলি মোল্লা	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৭৩	সুরাত আলি শরীফ	জবেদ আলি শরীফ	সেনারগেতি, কান্দুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৭৪	মোঃ কালু মিয়া	মোঃ ফটিক মিয়া	রতাল, শিকিরবাজার, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৭৫	শ্রী সুন্দরাম হাজরা	রেবতী হাজরা	মান্দ্রা, রাধাগঞ্জ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৭৬	অনিল রায়	কুটিশ্বর রায়	নৈয়ারবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৭৭	পরিমল চন্দ্র বিশ্বাস	প্রিয় লাল বিশ্বাস	ভূতেরবাড়ি, নারিকেলবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৭৮	অনিন্দ্র বাড়ৈ	মৃত দধিরাম বাড়ৈ	কোনেরভিটা, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৭৯	লক্ষণচন্দ্র বাড়ৈ	মৃত নগরবাসী বাড়ৈ	পলোটালা ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৮০	নিত্যানন্দ বিশ্বাস	মৃত জলধর বিশ্বাস	তুলসীবাড়ি, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৪৮১	ইকবাল হোসেন মোল্লা	মোঃ মমিনউদ্দিন মোল্লা	সোনাটিয়া, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, ছাত্র সংগঠক
৪৮২	আজিজুল হক তালুকদার	আবদুল জব্বার তালুকদার	তারাশি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৮৩	মোঃ ফরমান আলি শেখ	আশেকালি শেখ	কান্দি, কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সহঃ কমান্ডার
৪৮৪	মোঃ এমদাদুল হক	মৃত মোঃ তোফায়েল শেখ	কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৮৫	ইউসুফ আলি সিদকার	মৃত আলেক শিকদার	বহলতলি, কেডিগোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গ্রুপ কমান্ডার
৪৮৬	সুরেন চন্দ্র রায়	মৃত রাধাকান্ত রায়	বাগান উত্তরপাড়, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৮৭	সেকেন্দার আলি ফকির	মৃত আবু তালেব শিকদার	কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গ্রুপ কমান্ডার (আর্মি)
৪৮৮	মোঃ বাদশা মিয়া	মৃত দুক্ষি মাবুত শেখ	পূর্ণবতি, পিঞ্জুরি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৮৯	হিঙ্গুল আলি হাজরা	মৃত মোতাহার হাজরা	ছোটদক্ষিণপাড়, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গ্রুপ কমান্ডার
৪৯০	মোঃ আলতাফ হোসেন	মৃত নিহাজুদ্দিন শেখ	বর্ষাপাড়া, হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	বাবুর্চি, যোদ্ধা
৪৯১	মোঃ ইব্রাহিম শেখ	আবদুল হামিদ শেখ	চিত্রাপাড়া, গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৯২	মোঃ ইউনুস আলি	মোঃ ফরমান আলি	গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৯৩	আক্কাছ আলি দাড়িয়া	মৃত আবদুস সামাদ দাড়িয়া	মাঝবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৯৪	আবদুল আলি শেখ	হাচেন উদ্দিন শেখ	কানিয়ারি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৪৯৫	আলি আকবর শেখ	বেলায়েত শেখ	কুরপালা, কেডিগোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫০০	প্রহলাদ চন্দ্র রায়	নগুরাম রায়	রাজাপুর, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫০১	বিভারানী তালুকদার	স্বামীঃ জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৫০২	সুবোধ চন্দ্র মল্লিক	যোগেন্দ নাথ মল্লিক	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫০৩	সুধীর চন্দ্র রায়	যোগেন্দ্র নাথ রায়	রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫০৪	মনীন্দ্র নাথ বালা	মহারাজ বালা	খাগবাড়ি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫১১	মোঃ শাহাজাহান সরদার	আবদুল বারিক সরদার	ভোজেরগাতি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
৫১৬	অনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস	মৃত গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস	লেবুতলা, ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫১৭	ধীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল	উপেন্দ্র নাথ মণ্ডল	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫১৮	ভরত চন্দ্র রায়	বৃহস্পতি রায়	লেবুতলা, ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫১৯	হরবিলাশ গাইন	দেবেন্দ্র নাথ গাইন	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২০	সুবোধ চন্দ্র বিশ্বাস	শরবিন্দু বিশ্বাস	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২১	মনি মোহন বাইন	মহেন্দ্র নাথ বাইন	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২২	বিশ্বদেব বাইন	ফটিক চন্দ্র বাইন	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২৩	প্রফুল্ল মণ্ডল	মহেন্দ্র নাথ মণ্ডল	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২৪	সন্তোষ কুমার বসু	দেবনাথ বসু	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২৫	আবুল কালাম মোল্লা	আবদুর রশিদ মোল্লা	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২৬	শহিদ আবুল বাশার তালুকদার	মেনাজুদ্দিন তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২৭	গৌরাঙ্গ গাইন	মনোহর গাইন	লেবুতলা, ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫২৮	আবদুল ওহাব শেখ	আবু বকর শেখ	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৩০	মোঃ আলি আকবর শিকদার	আবদুস সালাম শিকদার	[illegible], নিলফা বয়রা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৩৪	মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম চৌধুরি	মোতাহার হোসেন চৌধুরি	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৫৩৫	এমদাদুল ইসলাম চৌধুরি	মোতাহার হোসেন চৌধুরি	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৩৭	অমৃত লাল বিশ্বাস	ক্ষীরোদ বিশ্বাস	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৩৮	জনার্দন রায়	সুমত চন্দ্র রায়	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৩৯	ব্রোজেন মন্ডল	নিবারণ মন্ডল	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, শহিদ
৫৪০	শুকদেব আকর্ষণ	কেতু আকর্ষণ	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, শহিদ
৫৪১	চিন্ময় কান্তি মন্ডল	চৌধুরী নাথ মন্ডল	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, শহিদ
৫৪২	প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস	মৃত নিরঞ্জন বিশ্বাস	ডুমুরিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, শহিদ
৫৪৩	হেমায়েত আলি বিশ্বাস	সেকেন্দুদ্দিন বিশ্বাস	পারঝন ঝনিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৪৫	এস এম নুরুল ইসলাম	সরোয়ার শিকদার	পুইশুর, হাতিয়াড়া, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৪৬	মীর আবদুল মন্নান	মীর আবদুল জব্বার	মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৪৭	আবদুল মাজেদ মিনা	দলিল উদ্দিন মিনা	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৪৮	মোঃ এনায়েত মোল্লা	মৃত মোঃ আজিত মোল্লা	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৪৯	মোঃ রফিক উদ্দিন খান	মোঃ মোজাদের হোসেন খান	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫০	মোঃ আতিয়ার রহমান	আমিন উদ্দিন	সবুজবাগ, চাদমারি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫১	মোঃ হায়দার আলি মোল্লা	আবদুল মজিদ মোল্লা	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫২	মোঃ দাউদুর রহমান	আবদুল বারেক মিনা	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫৩	এ কে এম ওমর আলি	মৃত আব্দুল লতিফ মিঞা	গাচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫৪	আবুল ফজল কাজি	মোহাম্মদ আলি কাজি	লোহারংকি, মাঝবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫৫	মোঃ লাল মিয়া তালুকদার	মৃত মোঃ আলেক তালুকদার	পিঞ্জুরি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৫৫৬	মোঃ আমজেদ আলি হাওলাদার	সফিজ উদ্দিন হাওলাদার	টুটাপাড়া, কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫৭	মোঃ মনছুর আলি	মোঃ মাসুম আলি হাওলাদার	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫৮	এস এম শহিদুল ইসলাম	মোঃ রুস্তম আলি শিকদার	গোপালপুর, কেজি গোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৫৯	আতিয়ার রহমান (আতিক)	মৃত মোঃ আদিল উদ্দিন	বান্ধল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৬৩	এম ই এ কামাল	মৃত মোঃ রজব আলি	নওহাটা, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার
৫৬৫	কানাই লাল সরকার	ভগীরাত সরকার	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৭১	বাহার আলি শিকদার	মৃত গজর আলি শিকদার	গোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, শিল্পী
৫৮৯	শফিজ উদ্দিন শিকদার [বর্তমানে মৃত]	মৃত রহম আলি শিকদার	দখলদিয়া, বাঁশবাড়িয়া, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৯০	অমূল্য কুমার বিশ্বাস	সখীচরণ বিশ্বাস	তারাইল, সালুখা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৯১	প্রফুল্ল কুমার গাইন	চন্দ্র কান্ত গাইন	তারাইল, সালুখা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৫৯৩	মোঃ মোমেন বিশ্বাস	মোঃ এজাহার বিশ্বাস	মনির কান্দি, গোহালা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যুদ্ধাহত; ভাতাপ্রাপ্ত
৬০২	লিয়াকত আলি মোল্লা	মমিন উদ্দিন মোল্লা	সোনাটিয়া, বালিয়াভাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬০৩	মোঃ কাওসার আলি মোল্লা	মমিন উদ্দিন মোল্লা	সোনাটিয়া, বালিয়াভাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬১৩	মোঃ বাসেক শেখ	মোঃ আলাউদ্দিন শেখ	ঘড়ইগাতি, মাঝিগাতি হাইস্কুল, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬১৪	শেখ আব্দুল হাকিম [বর্তমানে মৃত]	শেখ আবদুল জলিল	ঘড়ইগাতি, মাঝিগাতি হাইস্কুল, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬১৫	মোঃ সাইফেদুর রহমান	মোঃ ইব্রাহিম তালুকদার	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬১৮	মোঃ নুরুল ইসলাম সরদার	আবদুল মকিম সরদার	ধানাপাড়া, গোপালগঞ্জ	সোর্স, যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৬২০	আসাদুজ্জামান মোল্লা	সায়েদ মোল্লা	খলারপাড়, কাঠিবাজার, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬২৭	খন্দকার মোঃ ইসমাইল	খন্দকার মোঃ তমিজউদ্দিন	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সশস্ত্র গোয়েন্দা, যোদ্ধা
৬২৮	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	মৃত তাছেন উদ্দিন শেখ	পাঁচকাওনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬২৯	শেখ ছাদেকুর রহমান	মৃত শেখ ইমানুদ্দীন	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৩০	আবদুল আজিজ মিয়া	আবদুস ছাত্তার মিয়া	নিজড়া, উলপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৩২	মোঃ নুরুল হক শেখ	আবদুল জলিল শেখ	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৩৩	সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম	সৈয়দ গোলাম কাদের	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৩৪	মোঃ রেজাউল করিম	হাচেন আলি ফকির	পারঝনঝনিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৩৬	মোঃ নিজামুল হক	আব্দুল আলি	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৩৯	মোঃ ভোতা মিয়া (মাঝি)	মৃত হাতেম আলি	সোনারগাতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
৬৪০	মোঃ সাহিদ কাজি	সুলতান কাজি	ডাইলনা, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৪১	মোঃ বদর উদ্দিন শেখ	আলাউদ্দিন শেখ	ঘড়ইগাতি, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৪২	মহর আলি মিয়া	হাচেন উদ্দিন	তারাশি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সহঃ কমান্ডার
৬৪৩	আজিজুল হক খান	আবদুল গফুর খান	গোপালপুর, কেঁড়ি গোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা
৬৪৬	মোঃ মোজাফর মুনশি	মোঃ রজ্জব আলি	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৪৭	সাখাওয়াত হোসেন [বর্তমানে মৃত]	মৃত মোজাফফর মুনশি	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৫০	শেখ গোলাম মোস্তফা	আবদুল হামিদ শেখ	খৈলনা, ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৬৫৫	মোঃ নোয়াব আলি তালুকদার	মোঃ ছবেদ আলি তালুকদার	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সহঃ কমান্ডার
৬৫৬	মোঃ হারুন-অর-রশিদ চৌধুরি	সাহাবুদ্দীন চৌধুরি	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৭১	হুমায়ন কবির (মিন্টু)	আবদুল মালেক ভূঁইঞা	চন্দ্র দিঘলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৭২	আবদুর রহমান শরীফ	মোঃ জবেদ আলি শরীফ	সেনারগাতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৭৫	জাহাঙ্গীর হোসেন তালুকদার	খবির উদ্দিন তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, বাঁশবাড়িয়া বন্দর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৭৬	মোঃ ফজলুল হক	মৃত আবদুল আলি	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৭৭	ওমর আলি তালুকদার	ফজলুর রহমান	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৭৮	মোঃ কেরামত আলি শেখ	শেখ আব্দুল জলিল	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৭৯	শেখ আব্দুস সামাদ	মোঃ নোয়াব আলি শেখ	গেমাডাংগা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮০	শেখ মোঃ শহিদুল ইসলাম	শেখ আব্দুস সামাদ	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮১	এস এম শহিদুল ইসলাম	আবদুল হাকিম সরদার	পশ্চিম নিজড়া, উলপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮২	শেখ আলি আহম্মদ	ডাঃ আবদুল ওয়াদুদ শেখ	পাঁচ কাওনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮৩	জহুরুল হক তালুকদার	আবুল কাশেম তালুকদার	পাকুরতিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮৪	রাম জয় বাইন	রাজ কুমার বাইন	পাথরঘাটা, জোয়ারিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮৫	সুশীল পাটোয়ারি	অনিল পাটোয়ারি	গুয়াদানা, ছিলনা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮৬	বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস	দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	গোপালপুর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮৭	বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	ঘটক চন্দ্র বিশ্বাস	বরাইহাটি গোপালপুর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮৮	নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস	নিশি কান্ত বিশ্বাস	জোয়ারিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৮৯	চিত্তরঞ্জন বেপারী	দুঃখীরাম বেপারী	গোপালপুর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৬৯০	বিমল চন্দ্র বেপারী	রসিক লাল বেপারী	গোপালপুর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৯১	রনদা বিশ্বাস	মধুসূদন বিশ্বাস	বরইহাটি, গোপালপুর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৯২	নিখিল রঞ্জন জলা	প্রমানন্দ জলা	গোপালপুর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৯৩	কুলাদা নন্দ	কুঞ্জ বিহারি	বন্যাবাড়ি, জোয়ারিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৯৪	মোঃ খানজাহান	মোঃ এছহাক শেখ	গিমাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৯৫	আঃ আলি শেখ	রোকনুদ্দীন শেখ	গিমাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৯৬	মোঃ রেজাউল করিম	হাচেন আলি ফকির	পারঝন ঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৯৭	আকবার আলি মোল্লা	আবদুস ছামাদ মোল্লা	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৯৮	মোঃ সৈয়দ আলি শেখ	মোবারক আলি শেখ	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৯৯	সাখাওয়াৎ শেখ	রোকন শেখ	বর্ণি, বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭০০	কাওসার আলি শেখ	আবদুল আজিজ শেখ	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭০১	মোঃ এনামুল হক তালুকদার	আমজাদ হোসেন তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭০২	মোজাহারুল হক তালুকদার (বাহার)	আবদুল আলি তালুকদার	বাঁশাবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭০৩	মিয়া আবদুস ছালাম	আবদুল মজিদ মিয়া	দাসের কান্দি, রাজদি, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭০৪	সিরাজুল হক ফকির	আবদুল জলিল ফকির	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭০৬	গাজি মোঃ সালাউদ্দিন	মৃত আবদুল লতিফ গাজি	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭০৭	মোঃ জিয়া উদ্দিন	মোঃ নূরুদ্দিন	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭০৮	মোঃ মোতালেব শেখ	মোঃ মকিত শেখ	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৭০৯	মোঃ সোনা মিয়া খাঁন	আবদুল হালিম খাঁন	ছাগলছিড়া, রাগদি, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যুদ্ধাহত
৭১০	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মোঃ মোমেন উদ্দিন মোল্লা	গিমাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭১১	মোঃ গাজি মোস্তফা	আজিজুল হক গাজি	গিমাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭১২	মোঃ হানিফ শেখ	আবদুর রাজ্জাক শেখ	গিমাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭১৩	আবদুল হান্নান শেখ	আবদুল মালেক শেখ	গিমাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭১৪	ডাঃ সলিমুল্লাহ শেখ	হারুন আর রশিদ শেখ	গিমাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	ডাক্তার, যোদ্ধা
৭১৫	মোহাম্মদ আলি ফকির	সোনামিয়া ফকির	গিমাডাঙ্গা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭১৮	মোঃ সাদেক আলি মিয়া	মৌঃ আইনুদ্দিন মিয়া	পাকুড়তিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭১৯	মোঃ আবু বকর শেখ	মৃত ইসমাইল শেখ	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭২০	বসির উদ্দিন মুনশি	এনাম উদ্দিন মুনশি	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭২১	আবুল হাশেম ফকির	পাঁচকড়ি ফকির	কুশলি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭২২	মোঃ সোহরাব হোসেন	সোলায়মান বিশ্বাস	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭২৩	মোঃ নবির হোসেন	ইউসুফ শেখ	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭২৭	মোঃ ফেলু শেখ	আদু শেখ	কাশাতলি, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭৩০	আবদুল ওহাব শিকদার	আনোয়ার হোসেন শিকদার	বান্দল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭৩১	মোঃ মোতালেব শেখ	মোঃ কালু শেখ	চরপ্রসন্দি, রাগদি, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭৩২	কৃষিবিদ এস এম আক্তারুজ্জামান	মৃত এস এম আব্দুল হামিদ	পাকুড়তিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৭৯২	কারবাজ খাঁ	জয়েনুদ্দিন খান	গোপালপুর, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮০০	মোঃ মজিবুর রহমান মল্লিক	মৌঃ মোঃ সিরাজ উদ্দিন	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৮০১	হেকমত আলি ফকির	মোঃ খেয়ালউদ্দিন ফকির	কুবপালা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার
৮০২	মোঃ আকবর গাজি (কুব্বাত)	মোঃ তাহের উদ্দিন গাজি	আট্টাবাড়ি, মাঝবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮০৩	মোঃ মোসলেম মোল্লা	মৃত ইমান উদ্দিন মোল্লা	উত্তর পাড়া, গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮০৪	কবি গজার আলি [বর্তমানে মৃত]	মোঃ কেনাই মোল্লা	দত্তডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮০৫	মোঃ আবদুল মান্নান মুনশি	সারমত আলি মুনশি	ভাটিয়া, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮০৬	মোঃ সামছুল আলম	আহম্মদ শেখ	বাতইল, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮০৭	অমল কৃষ্ণ সাহা	জগবন্ধু সাহা	ভাটিয়াপাড়া, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮০৮	প্রমোদ বারিক্দার	শিমন বারিক্দার	ধারাইবাশাইল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮০৯	শেখ ফরিদ	মোঃ মোখলেছুর রহমান	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮১০	পুষ্প লতা বাড়ৈ	সতিশ চন্দ্র বাড়ৈ	কান্দি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা
৮১১	মোঃ শাহজাহান খলিফা	মোঃ রবিউল খলিফা	পশ্চিমপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮১২	সিপাহি আবদুল মালেক সরদার	মৃত মোঃ ওয়াছেল সরদার	ডহর পাড়া, বালিয়াভাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮১৩	প্রাণ কৃষ্ণ ঘোষ	বিনোদ বিহারি ঘোষ	উনশিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮১৪	মোঃ বাহার শিকদার বয়াতী	সিরাজ শিকদার বয়াতী	লোনী গোপালপুর, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮১৫	রজ্জব আলি গাজি [বর্তমানে মৃত]	আশোক আলি গাজি	আটরা বাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮১৬	যাকোব বৈরাগী	স্যামুয়েল বৈরাগী	বরুয়াবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮১৭	নির্মল হাজরা	কানাইলাল হাজরা	নারায়ন খানা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৮১৮	শ্রী পরিমল চন্দ্র দে	মৃত হরিপদ দে	বালুহার, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮১৯	শান্তি রঞ্জন বৈরাগী	মনোহর বৈরাগী	পূর্ব নাওয়াগ্রাম, গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮২০	আরব আলি	আহম্মদ আলি	বলাকৈড়, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮২১	এম এ সেলিম	মৃত মোতাহার আলি শেখ	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮২২	মোঃ আনিসুজ্জামান মৃধা	আবদুল ওয়াহেদ মৃধা	বুলুগ্রাম, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮২৩	মেরী এস হাজরা	সন্তোষ হাজরা	নারানখালা, শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮২৪	মোঃ নূর হোসেন শেখ	আহম্মেদ আলি শেখ	হরিশচর, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮২৫	হেমো প্রসাদ ঠাকুর	মৃত মাধব ঠাকুর	চৌরখুলি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮২৬	কাজি ফারুক আহম্মেদ	কাজি শামছুল হক	কুরপালা, বালিয়াভাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮২৭	মতিলাল মজুমদার	নিবারণ মজুমদার	পিড়ার বাড়ি, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮২৮	আবুল বাসার খান	মৃত আবদুল হালিম খান	ছাগলছিড়া, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	শহিদ
৮২৯	হোসাইন মোঃ সাদেক	মোঃ হোসাইন উদ্দিন	দিঘলিয়া, রাধাগঞ্জ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা (অবঃ ব্রিগেডিয়ার)
৮৩০	নলিনী রঞ্জন বালা	সিদ্ধেশ্বর বালা	খাগবাড়ি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৩১	ফাতেমা রহমান (প্রমিলা হালদার)	স্বামী: মতিউর রহমান	জহরের কান্দি, রামশীল, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা
৮৩২	রতিকান্ত মজুমদার	নিবারণ মজুমদার	পিড়ার বাড়ি, নারিকেল বাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৩৩	সাহিদা বেগম	স্বামীঃ আবদুর রউফ বিশ্বাস	নারিকেল বাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা
৮৩৪	পিটার বাইন	সুধীরঞ্জন বাইন	শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৮৩৫	আবেদ বৈদ্য	অতুল বৈদ্য	শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৩৬	আজহার উদ্দিন মোল্লা	আবদুর রউফ মোল্লা	কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৩৭	আবদুর রব শেখ	আবদুল মজিদ শেখ	নিজড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৩৮	রমজান আলি মোল্লা	আসিরুদ্দিন মোল্লা	দত্তডাঙ্গা, বাজুনিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৩৯	আবদুর রউফ বিশ্বাস	হাসান আলি বিশ্বাস	নারিকেল বাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৪০	কমলেশ বেদজ্ঞ	কার্তিক চন্দ্র বেদজ্ঞ	উনশিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার
৮৪১	শ্রী বিশ্বনাথ বাড়ৈ	পরিক্ষিত বাড়ৈ	নারায়ন খানা, শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৪২	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	নাসির উদ্দিন	তেলিগাতি, কাঠিবাজার, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৪৩	জহুরুল হক গাজি	সদর আলি	আটবাড়ি, মাঝবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৪৪	তৈয়বুর রহমান শিকদার	আনসার উদ্দিন	উত্তরপাড়, গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৪৫	যোগেশ চন্দ্র মজুমদার	জিতেন্দ্র নাথ মজুমদার	চান্দিতাবাড়ি, তুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৪৬	মোঃ সিদ্দিক মিয়া	করম আলি	বান্ধাবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৪৭	আবদুল জলিল খন্দকার	জসিম উদ্দিন খন্দকার	নারিকেল বাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৪৮	ইয়ার আলি শেখ	মালেক শেখ	খান্দারপাড়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৪৯	আলি মিনা	আফজাল মিনা	উলপুর, নিজড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৫০	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	আবদুল হামিদ মোল্লা	ঝনঝনিয়া, বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৫১	আবুল বাসার মোল্লা	আবদুল ওয়াজেদ মোল্লা	আগুতিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৫২	শহিদুল হক মিয়া	ফকর উদ্দিন ফকির	চিত্রাপাড়া, গচাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৮৫৩	আশালতা বৈদ্য	হরিপদ বৈদ্য	লাটেঙ্গা, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা মহিলা কমান্ডার
৮৫৪	মোঃ মোশাররফ হোসেন	মোঃ কাশেম শেখ	গোহালা, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৫৫	আলিউজ্জামান শেখ	আবুল কাশেম শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৫৭	মোঃ নিজাম উদ্দিন খান	গজ্জর আলি খান	চৌরখুলি, কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	গোয়েন্দা, যোদ্ধা
৮৫৮	শেখ আকরাম হোসেন	শেখ মাহফুজুল হক	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৫৯	গিলবার্ট নির্মল বাইন	যোগেন্দ্র বাইন	হিরণ, শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৬০	কালামিয়া খাঁ	লোকমান খাঁ	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৬১	শেখ মোহাম্মদ সোলাইমান	মোঃ আব্দুল শেখ	বোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৮৬২	জবেদ আলি খান	আব্দুল খান	বোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
৯০১	হেকমত আলি ফকির	মোঃ খেয়াল উদ্দিন ফকির	কুরপালা, পিঞ্জুরি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার
১০৪০	আলো রানি	মৃত সূর্যকান্ত	চৌরখুলি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সেবিকা, যোদ্ধা
১০৪১	আবদুস ছামাদ শিকদার	লেহাজ উদ্দিন শিকদার	বান্ধাল, ঘাগর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৪২	আবুল কালাম খাঁন	মোঃ মোস্তাজুদ্দিন খান	কালারবাড়ি, শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৪৩	চৌধুরি মোঃ বাবুল হাসান	চৌধুরি মোঃ লোকমান হাসান	গোবরা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, (জেলা প্রশাসক)
১০৪৪	শচীন্দ্র নাথ বাড়ৈ	তরুণী কান্তা বাড়ৈ	নৈয়ারবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৪৫	বাসুদেব সরকার	বিশ্বেশ্বর সরকার	নৈয়ারবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৪৬	বিজিতেন্দ্র নাথ সরকার	বিশ্বেশ্বর সরকার	নৈয়ারবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১০৪৭	খালন চন্দ্র মজুমদার	ধনঞ্জয় মজুমদার	আড়ুয়াকান্দি, গোহালা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৪৮	মোঃ বদিউজ্জামান	মোতালেব শিকদার	কাকডাঙ্গা, কেড়ি গোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৪৯	লক্ষীকান্ত বিশ্বাস	বনমালী বিশ্বাস	পিড়ার বাড়ি, নৈয়ারবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫০	বাহার আলি শিকদার	গজর আলি শিকদার	গোপালপুর, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫১	আতিয়ার রহমান তালুকদার	হাসমত আলি তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫২	গুরুদাস বাড়ৈ	ভরনী কান্ত বাড়ৈ	নৈয়ার বাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫৩	মোঃ মকবুল হোসেন দাড়িয়া	ইয়াকুব আলি দাড়িয়া	মাঝবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	কমান্ডার
১০৫৪	মোশাররফ হোসেন শিকদার	আব্দুল গনি শিকদার	বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫৫	গজর আলি শেখ	মোঃ কুটিমিয়া শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫৬	মোঃ আতাহার শেখ	আমিন উদ্দিন শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫৭	মোঃ ওসমান মৃধা	মমিনউদ্দিন মৃধা	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫৮	মোঃ ছলেমান শেখ	আজাহার শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৫৯	মোঃ তোতা মিয়া	কালামিয়া	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৬০	নোয়াব আলি তালুকদার	ছবেদ আলি তালুকদার	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সহ কমান্ডার
১০৬১	মোঃ আকবর আলি শেখ	আবু বকর শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৬২	মোঃ নিজাম শেখ	মোঃ ছদন শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৬৩	মোঃ হোসেন শেখ	মোঃ আদম শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৬৪	মোঃ রমজান শেখ	রজব আলি শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৬৫	মোঃ সিরাজ শেখ	রজব আলি শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১০৬৬	আব্দুর রশিদ শেখ	ছহির উদ্দিন শেখ	সেনারগাতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৬৭	আব্দুস সালাম মোল্লা	ঈমানউদ্দিন মোল্লা	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৬৮	মোঃ শের জাহান তালুকদার	আনিছ তালুকদার	সেনারগাতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৬৯	মোঃ ছারেজান শেখ	মোকাম্মেল শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
১০৭০	মোঃ মোকাম্মেল শেখ	মেহের শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, মাঝি
১০৭১	মোঃ সলেমান শেখ	জবেদ আলি শেখ	সেনারগাতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৭২	মোঃ ফুরু মিয়া	ছাবদুল্লা শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৭৩	শেখ মোঃ নুরুল হক	শেখ খলিলুর রহমান	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৭৪	মোঃ শেখ আশ্রাব আলি	মোঃ তেজাল হোসেন	পাঁচ কাউনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৭৫	মোঃ আকবর আলি শেখ	মোসলেম উদ্দিন শেখ	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৭৬	মোঃ সানাউল্লাহ মোল্লা	সামসুদ্দিন মোল্লা	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৭৭	মোঃ সামছুল হক	আব্দুল ফকির	দাসেরকান্দি, রাগদি, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৭৮	মোঃ লোকমান হোসেন খান	জিনার উদ্দিন খান	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৭৯	মোঃ গোলাম রসুল শিকদার	মহিউদ্দিন শিকদার	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৮০	মোঃ সৈয়দ আলি মীর	আবদুল করিম মীর	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৮১	মোঃ ইয়ান আলি মীর	দলা মিয়া মির	বাবুর গাতি, কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৮২	কাজি ওমর আলি	কাজি মোঃ দলিল উদ্দিন	গোপিনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৮৩	সুরেন্দ্র নাথ রায়	হরিকৃষ্ণ নাথ রায়	রঘুনাথপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৮৪	কাজি আলমগীর হোসেন	সুলতান কাজি	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১০৮৫	মোঃ কাসেম সরদার	মোঃ সফদার সরদার	বাবুর গাতি, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৮৭	মোঃ মান্নান হাওলাদার	মোঃ জনাব আলি হাওলাদার	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৯০	শহিদ উল্যাহ	মৌলভী নজরুল ইসলাম	হারিদাসপুর, জেড়ারহাট, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৯১	নিখিল চন্দ্র বিশ্বাস	সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস	বন্যাবাড়ি, জোয়ারিয়া, গোপালপুর	যোদ্ধা
১০৯২	মোঃ বাদশা মোল্লা	মকসুদ মোল্লা	গিমাডাংগা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৯৩	মোঃ আত্তাহার আলি শেখ	রোকন উদ্দিন শেখ	গিমাডাংগা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৯৪	আলি আকবর ফকির	অদুৎ ফকির	গিমাডাংগা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৯৫	মোঃ সৈয়দ মুনশি	মোঃ খাদেম আলি মুনশি	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১০৯৬	মোঃ সামচুল হক শেখ	মোঃ আবু বকর শেখ	পাঁচাকোহালিয়া, গিমাডাংগা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১২১	মোঃ ছাইদুর রহমান	মোঃ মফিজ উদ্দিন শেখ	টুপরিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৪৯	নজরুল ইসলাম খান	আঃ জব্বার খান	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি হাই স্কুল, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৫০	মোঃ ইস্কান্দার আলি সরদার	মোঃ আতিয়ার আলি সরদার	ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৬৭	স্বর্ণলতা ফালিয়া	নিশিকান্ত ফালিয়া	সোনাইলবাড়ি, নারিকেলবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৭৩	মোঃ সাহাবুদ্দিন মোল্লা	ইমামউদ্দিন মোল্লা	মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৭৪	আহমদ আলি মোল্লা	আবদুর রহমান মোল্লা	করপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, কমান্ডার
১১৭৬	মোঃ সামচুল ফকির	আবদুল ফকির	আড়ুয়াকান্দি, গোহালা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৯১	সৈয়দ আহম্মদ	আবদুল হামিদ বেপারী	চরপ্রসন্নদি, বাগদি, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৯৬	মোঃ আকবর হোসেন	আফজাল হোসেন শেখ	ভবানিপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১১৯৭	আবুয়াল হোসেন হাওলাদার	আদিলউদ্দিন হাওলাদার	পূর্ণবতি, পিঞ্জরি, কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, গোয়েন্দা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১১৯৯	মোঃ সরোয়ার হোসেন	সোনামউদ্দিন মুনশি	মোল্লাদি, গোহালা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২০০	আবদুল জব্বার মোল্লা	মোঃ মোহন মোল্লা	চরপ্রসন্নদি, বাগদি, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২০৩	নুরন্নবী মোল্লা	এমদাদুল হক মোল্লা	পাকুড়তিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২০৪	মোঃ আলি আহম্মদ শেখ	আবদুর রশিদ শেখ	পাকুড়তিয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২০৫	আবুল কালাম খান	মোঃ আসমত আলি খান	মাঝিগাতি, মাঝিগাতি হাইস্কুল, গোপালপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২০৬	আজিজুল হক শিকদার	শফিউদ্দিন শিকদার	মানিকহার, জোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২০৮	আবদুল হাই মোল্লা	আবদুল গফুর মোল্লা	কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২০৯	এক্কেল খান	মানিক খান	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি হাইস্কুল, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১০	মোঃ রাজ্জাক মোল্লা	মোঃ মদন মোল্লা	কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১১	কাজি মাহবুব আলম	কাজি সরোয়ার জান	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১২	আবদুল হাই খান	হাতেম আহমদ খান	মানিকখান, কাঠিহার, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১৩	আজহার সরদার	শবন সরদার	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১৪	সরদার মিলন	মোজাম সরদার	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১৬	মিন্টু হালদার	রমেশ হালদার	বুয়াবাড়ি, রাধাগঞ্জ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১৭	আবদুল হান্নান ফকির	সামসুদ্দিন ফকির	পাইকদা, আইকদা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১৮	হাসমত আলি শেখ	লাল মিয়া শেখ	আইকদা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২১৯	নেছার ফকির	লেহাজউদ্দিন (লবু)	পাইকদা, আইকদা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২২১	মোঃ আবুল কাশেম মিনা	গজ্জর আলি শেখ	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২২২	জামাল হোসেন মিনা	আবুল হোসেন মিনা	গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১২২৪	মোঃ হাবিবুর রহমান	আবদুল গনি শেখ	তেলিগেতি, কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২২৫	শাহাদত হোসেন শেখ	মোঃ ফলতু শেখ	মানিকহার, ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২২৮	মোঃ বদিউজ্জামান	মুনশি জালালউদ্দিন আহমেদ	পূর্ণবতি, পিঞ্জরি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৩২	এস এ হালিম	মৃত শেখ আবুল হাসেম	ধোড়ার, কান্দুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৩৩	মোঃ মফিজুল ইসলাম	মৃত মোঃ আবদুল হামিদ	ঘানারপাড়, কাঠিবাজার, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৩৪	জিল্লাত আলি ভূঁইয়া	মোঃ কালু ভূঁইয়া	বিজয়পাশা, পাইককান্দি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৩৫	কাজি সোহরাব	গুনজাহার কাজি	মানিকহার, ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৩৬	আতাউর রহমান কাজি	মোঃ আলেম কাজি	মানিকহার, ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৩৭	আলি আকবর দাড়িয়া	আবদুল খালেক দাড়িয়া	কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৩৯	মহিউদ্দিন কাজি	গঞ্জেহার কাজি	মানিকহার, ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৪০	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মোঃ বাবন খান	বিজয়পাশা, পাইককান্দি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৪১	আবুবকর সরদার	কানছু সরদার	বিজয়পাশা, পাইককান্দি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৪২	মজিবর রহমান মোল্লা	আবদুল মালেক মোল্লা	বিজয়পাশা, পাইককান্দি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৪৩	কাজি সরোয়ার		গোপীনাথপুর, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৪৪	আবদুল হান্নান মোল্লা	আমির হোসেন মোল্লা	ডাইলনা, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৪৫	মোশাররফ হোসেন	আবদুল মজিদ মোল্লা	ডাইলনা, মাঝিগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৪৮	মোঃ খোকন শেখ	মোঃ আবদুল গনি শেখ	কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৪৯	আবদুল কাদের শিকদার	আবদুল গফুর শিকদার	মানিকহার, কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১২৫০	হাবিলদার মোঃ লুৎফর রহমান মোল্লা	মোসলেমউদ্দিন মোল্লা	বুড়াশি, দিঘারকুল, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৫৩	মোঃ জালালউদ্দিন মোল্লা	মোঃ তোফেল মোল্লা	সুলতানশাহী, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৫৬	মোঃ হাবিবুর রহমান	হামিদ শেখ	আইকন্দা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৫৭	আকবর ফকির	শেতু ফকির	শাইকন্দা, আইকন্দা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৫৮	ইউনুচ ফকির	রহম ফকির	শাইকন্দা, আইকন্দা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৬১	ছারোয়ার কাজি	গোলাম রসুল কাজি	মানিকহার, ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৬২	মোরাত শিকদার	মোঃ মালেক শিকদার	মানিকহার, ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৬৩	ফরিদ শেখ	জহর শেখ	মানিকহার, ভোজেরগাতি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৬৫	মোঃ এনামুল হক	মোকতাদের মোল্লা	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৬৯	মোঃ কেরামত আলি খান	মোঃ মকফারউদ্দিন	পারকুশলা, বর্ণি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৭০	লেবু মিয়া	বুদু মিয়া	বামনডাঙ্গা, গোহালা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৭৩	হেমায়েতউদ্দিন মিনা	জেনারউদ্দিন মিনা	তেলিগাতি, কাঠি, গোপালগঞ্জ	পোস্টমাস্টার, যোদ্ধা, গোয়েন্দা
১২৭৪	মোঃ আজিজুল হক দাড়িয়া	ওয়াজেদ আলি দাড়িয়া	ধোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৭৫	চাঁদ মিয়া শেখ	এজারদ্দিন শেখ	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৭৬	মোঃ মৈয়ার আলি শেখ	মুনশি আরজ আলি শেখ	কান্দি আমবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৭৭	আবদুল হাকিম সরদার	মোঃ মোসলেমউদ্দিন সরদার	কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, নৌমাঝি
১২৭৮	মোঃ সেকেন্দউদ্দিন	মোঃ ছবেদ আলি শেখ	কাজুলিয়া, কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, নৌমাঝি

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১২৭৯	মোঃ হেরাজউদ্দিন শেখ	মোঃ আশেকালি শেখ	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, নৌমাঝি
১২৮০	মোঃ লায়েক আলি দাড়িয়া (শেখ)	মোঃ রুস্তম আলি দাড়িয়া	ধোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৮১	পিতর বাইন	দানেশ বাইন	শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৮২	গিলবার্ট নির্মল বাইন	যোগেন্দ্রনাথ বাইন	শুয়াগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৮৩	মোঃ শামসুল হক মিয়া	মৃত মোঃ আবদু শেখ	ধোড়ার, কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৮৪	মোঃ তৈয়াবুর রহমান	মুনশি দলিলউদ্দিন	কান্দি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৮৬	মোঃ আবদুল হান্নান	মৃত মোঃ আলাউদ্দিন মোল্লা	খানারপাড়, কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৮৭	মোঃ মোতালেব মোল্লা	মৃত পনব মোল্লা	আওতিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৮৮	মোঃ ছাকায়েত হোসেন শেখ	মোঃ কালামিয়া শেখ	দত্তডাঙ্গা, ভোজেরগাতি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৮৯	মোঃ অদুত শেখ	আবদুল মজিদ শেখ	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৯০	জুলফিকার সরদার	দলিলউদ্দিন সরদার	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৯১	আবদুল হক ফকির	আবদুল হাশেম ফকির	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৯২	এস এম লায়েকউজ্জামান	মোঃ মোশাহেদ হোসেন শেখ	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৯৩	আবুল হাশেম শেখ	আবদুল্লা	টিহটি, কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৯৪	মোঃ সদর আলি শেখ	জব্বাবর শেখ	কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৯৫	আবদুল মান্নান শেখ	মোঃ হাবিবুর রহমান	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৯৬	মোঃ মনির আহমদ মোল্লা	নজির আহমেদ মোল্লা	কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৯৭	অঞ্জন কীর্তনিয়া	গঙ্গাধর কীর্তনিয়া	কাজুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১২৯৮	মোঃ হারুন ফকির	মোঃ কাশেম আলি ফকির	কান্জুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১২৯৯	জিন্নাত আলি শেখ	আবদুল করিম শেখ	কান্জুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০০	কলিম উল্লা মোড়ল [সুবেদার অবসরপ্রাপ্ত]	মোঃ আমিনউদ্দিন মোড়ল	টুটাপাড়া, কুশলা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০১	হাবিবুর রহমান শেখ	জয়নাল আবেদিন শেখ	কান্দি আমবাড়ি, কান্জুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০২	আবদুস সাত্তার শেখ	আবদুল করিম শেখ	কান্জুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০৩	আবু হানিফা সরদার	মোকাম সরদার	কান্জুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০৪	মো: আজহার সরদার	মো: পবন সরদার	কান্জুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০৫	মো: সুলতান শেখ	মো: কালু শেখ	টুপারিয়া, কান্জুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০৬	মো: ইব্রাহিম শেখ	মো: মোশাহেদ হোসেন শেখ	কান্জুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০৭	মো: ইদিয়াস হোসেন শেখ	মো: সাহেব আলি শেখ	টুপারিয়া, কান্জুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০৮	আহমদ আলি দাড়িয়া	সৈয়দ আলি দাড়িয়া	পশ্চিমপাড়, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩০৯	সোনামিয়া দাড়িয়া	মোঃ রজব আলি দাড়িয়া	মঠবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩১০	এস.এম.গোলাম মোস্তফা	এস.এম. রংগু	তেলিগাতি, কাঠিবাজার, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩১১	সুবেদার আমজাদ হোসেন সরদার	দলিলউদ্দিন সরদার	কান্জুলিয়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩১২	লিয়াকত আলি শেখ (পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন (অব.)	গজর আলি শেখ	কান্দি, কান্জুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩১৩	নায়েক মোবারক হোসেন দাড়িয়া	এয়াকুব আলি দাড়িয়া	মাঝবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৩১৪	ডা. নওশের আলি খান	ফহমউদ্দিন খান	বলাকৈড়, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, ডাক্তার, সংগঠক
১৩২০	জানি মিয়া	মোঃ রউফ মিয়া	আইকদা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩২১	আবদুল কাদের শিকদার	কালু শিকদার	পাইকদা, আইকদা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩২২	আপ্তাব আলি মিয়া	আবদুল আলি মাতব্বর	মধ্যবনগ্রাম, বনগ্রাম, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩২৩	সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার	নানু তালুকদার	আইকদা, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩২৪	মুনশি আবুল কাশেম [বর্তমানে মৃত]	আবদুল কাদের	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩২৫	মুনশি সিরাজুল ইসলাম	মুনশি আবুল কাশেম	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩২৬	মুনশি শহিদুল ইসলাম	মুনশি আবুল কাশেম	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩২৭	মুনশি শরাফত হোসেন	মুনশি আবুল কাশেম	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩২৮	মুনশি মোতাহার হোসেন	মুনশি আবুল হাশেম	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩২৯	মোঃ আবুল কালাম	আবদুল জলিল	চৌগাছা, আইকদিয়া, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৩০	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ আবদুস সামাদ মৃধা	বনগ্রাম, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৩৮	আদিত্যকুমার সরকার	কার্তিক চন্দ্র সরকার	নৈয়ারবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৩৯	নিত্যানন্দ বিশ্বাস	জলধার বিশ্বাস	তুলসিবাড়ি, ভাঙ্গারহাট, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৪০	মোঃ আবু তালেব মুনশি	মোঃ আবদুল হাকিম মুনশি	বর্ণি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৫২	আবদুর রহমান গাজি	মোঃ তোফেল গাজি	তারাশি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা, গোয়েন্দা
১৩৬১	মহিউদ্দিন সরদার পুলিশ ইনসপেক্টর	দলিলউদ্দিন সরদার	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধা ও সহযোগীদের নামের তালিকা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৩৬২	আবদুল আলি নাড়িয়া		কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৬৫	মোঃ হাশমত আলি		পাটগেতি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	লিয়াজোঁ যোদ্ধা
১৩৭২	মোঃ লিয়াকত আলি শেখ	মৃত তাহেরউদ্দিন শেখ	ধোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৭৩	হেমায়েত উদ্দিন মিনা	জেনার উদ্দিন মিনা	তেলিগাতি, কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৭৪	আজিজুল হক দাড়িয়া	ওয়াজেদ দাড়িয়া	ধোড়ার, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৭৫	মোঃ আবদুস সাত্তার শেখ	মৃত ধোনাউল্লাহ শেখ	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৭৬	আবদুস সামাদ শেখ	মৃত বুধাই শেখ	কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৭৭	মোঃ মোলেমান শেখ	মৃত হাচেনউদ্দিন শেখ	টুপারিয়া, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৯২	ঠাণ্ডা তালুকদার	গেয়াসুদ্দিন তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৯৩	ইউসুফ তালুকদার	রতন তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৯৪	আবুল কালাম মোল্লা	আবদুর রশিদ মোল্লা	বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৯৫	মোঃ মকিত তালুকদার		বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৯৬	শহিদ সোহরাব হোসেন	ছবদার উদ্দিন তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৯৭	বদু মিয়া		মধুখালি, বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৯৮	হেমায়েতউদ্দিন তালুকদার	সৈয়দ আলি তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৩৯৯	আবের তালুকদার	বেলায়েত হোসেন তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৪০০	আকরাম তালুকদার	বেলায়েত হোসেন তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	শহিদ যোদ্ধা, উপরের উল্লিখিত দুই ভাই আর্মির গানবোট দখলের যুদ্ধে চুমারিয়া নামক স্থানে শাহাদত বরণ করেন।
১৪০১	বসার তালুকদার	ধলামিয়া তালুকদার	বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৪০২	শহিদ বাদশা মিয়া তালুকদার		বাঁশবাড়িয়া, ঝনঝনিয়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	সংগঠক, যোদ্ধা
১৪০৩	আবদুর রশিদ তালুকদার	মৃত আনেচ তালুকদার	সেনারগাতি, কাজুলিয়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৪০৪	আকবর আলি গাজি	মৃত ছহিরউদ্দিন গাজি	আটরাবাড়ি, মাঝবাড়ি, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
১৪০৬	জহিরুল হক চৌধুরী	নূরুল হক চৌধুরী	বাউরগাতি, কাঠি, গোপালগঞ্জ	যোদ্ধা
জেলা : ফরিদপুর				
২১০	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত মোঃ ছবির উদ্দিন	পাতারাইল দীঘির পাড়, ভাংগা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
২৭৬	আবু হানিফ হাওলাদার	মালেক হাওলাদার	পশ্চিম সাহেব রাজাপুর, কালকিনি, ফরিদপুর	যোদ্ধা
৩৯৪	আবদুস ছাত্তার মোল্লা	মৃত আমির হোসেন মোল্লা	গোয়াল চামট, আংগিনা, কোতয়ালী, ফরিদপুর	যোদ্ধা
৬৭০	মোঃ সুলতান খান	মোঃ মানিক খান	পূর্ব সদরদি, ভাংগা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
৭৬১	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	আবদুল খালেক চৌধুরি	ফুলসুতি, নগরকান্দা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
৭৬৬	আফজাল হোসেন	শেখ নাজিম উদ্দিন	পরমেশ্বর, বোয়ালমারি, ফরিদপুর	যোদ্ধা

হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধা ও সহযোগীদের নামের তালিকা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৭৭২	খন্দকার হুমায়ন কবির	খন্দকার আব্দুল জলিল	তেজাতিয়া, নগরকান্দার, ফরিদপুর	যোদ্ধা
৭৯২	কোরবান খাঁ	জয়েনউদ্দিন খাঁ	গোপালপুর, কাসিয়ানি, ফরিদপুর	যোদ্ধা
৭৯৭	মোঃ হাবিবুর রহমান	নেছার উদ্দিন মোল্লা	পশ্চিম উজানচর, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২২০	ইবরাহিম মিয়া	মোতাহার মিয়া	বালিয়ারচর, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২৫৬	মোঃ হাবিবুর রহমান	হামিদ শেখ	আইকদিয়া, মুকসেদপুর, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২৫৭	আকবর ফকির	পেটু ফকির	পাইকদিয়া, আইকদিয়া, মুকসেদপুর, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২৫৮	ইউনুস ফকির	রহিম ফকির	পাইকদিয়া, আইকদিয়া, মুকসেদপুর, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২৫৯	আবদুস সালাম মুনশি	চান মুনশি	বালিয়া চারা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২৬০	মোঃ এমদাদ মুনশি	মোতাহার মুনশি	বালিয়া চারা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২৬৪	খন্দকার মোঃ সফিউদ্দিন	খন্দকার আবদুল আজিজ	গোয়ালদি, মালিগ্রাম, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২৭০	লেবু মিয়া শেখ	রঙ্গু মিয়া শেখ	বামনডাঙ্গা, গোহালা, মুকসেদপুর, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২৭১	আবদুল আমিন	মেহের শেখ	বালিয়াছড়া, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১২৭২	সিরাজুল ইসলাম	আবদুর রাজ্জাক মুনশি	বালিয়াচরা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১৩১৮	মোঃ টুকু মোল্লা	আনিছ মোল্লা	সোনাখোলা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১৩১৯	দেলোয়ার মোল্লা	মোঃ দলিলউদ্দিন মোল্লা	বালিয়াছড়া, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১৩৭৯	সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী	আবদুল মালেক চৌধুরী	ফুলসুতি, নগরকান্দা, ফরিদপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৩৮০	কে এম ওবায়দুর রহমান		লস্করদি, নগরকান্দা, ফরিদপুর	এম.এন.এ., সংগঠক, উপদেষ্টা, যোদ্ধা
১৩৮১	ইমামউদ্দিন আহমদ		ফরিদপুর টাউন, ফরিদপুর	এম.সি.এ., সংগঠক, উপদেষ্টা, যোদ্ধা
১৩৮২	আবদুর রহিম		চরকমলাপুর, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১৩৮৩	ফিরোজ মাস্টার		ঝিলটুলি, ফরিদপুর	সংগঠক, যোদ্ধা
১৩৮৪	জি এস হায়দার আলি		চরকমলাপুর, ফরিদপুর	ছাত্র সংগঠক, যোদ্ধা
১৩৮৫	সেন্টু মিয়া		চরকমলাপুর, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১৩৮৬	সেপাই আইউব		ভাঙ্গা, ফরিদপুর	যোদ্ধা; ইবিআর
১৩৮৭	নূরুল ইসলাম (নুরু)		নগরকান্দা, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১৩৮৮	নিমাই চন্দ্র		ফরিদপুর	যোদ্ধা
১৩৮৯	দুলাল গোলজার	আনোয়ার হোসেন	ফরিদপুর টাউন, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১৩৯০	মোজাম		ফরিদপুর টাউন, ফরিদপুর	যোদ্ধা
১৩৯১	আলমগীর হোসেন		ফরিদপুর টাউন, ফরিদপুর	সাংবাদিক, যোদ্ধা
জেলা : মানিকগঞ্জ				
৭৪৮	রেখা বানিগুপ্ত	স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র	দশড়া, মানিকগঞ্জ	যোদ্ধা, সেবিকা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
জেলা : কিশোরগঞ্জ				
৫৯	মোঃ ইব্রাহিম	ইন্তাজ আলি	পশ্চিম নয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	যোদ্ধা
জেলা : কুমিল্লা				
৬১	মোঃ হানিফ	মোঃ আরজু মিয়া	বেওলাইন, আড্ডাবাজার, বরুড়া, কুমিল্লা	যোদ্ধা, সিপাহি
জেলা : ঢাকা				
৬০	জহুরুল হক মাঝি	আবদুল ফকির	বলসাতা, সাকতলা, কেরানিগঞ্জ, ঢাকা	যোদ্ধা, মাঝি
১০২	মোঃ আবদুল লতিফ ফকির	ময়েজ উদ্দিন ফকির	পশ্চিম কাফরুল, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	যোদ্ধা
৩৭৮	গফুর আলি	করুন মিয়া	আগারগাঁও, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	যোদ্ধা
৭৩৭	মোহাম্মদ আলি	ওমর আলি	ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	যোদ্ধা
৭৪০	মোঃ জিয়াউল হক	আবদুল ফকির	বোয়ালসাথা, খিলজি বাজার, কেরানিগঞ্জ, ঢাকা	যোদ্ধা, মাঝি
৭৪১	এম এ মোত্তালিব	মরহুম সৈয়দ আলি	২৫/১, পশ্চিম আগারগাঁও, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	যোদ্ধা, মাঝি
৭৪২	মোঃ আবদুল আউয়াল	মোঃ কদম আলি	৬/২, পশ্চিম আগারগাঁও, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	যোদ্ধা
৭৪৫	মোঃ সিরাজুল হক	মন্তাজ উদ্দিন	আগারগাঁও, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	যোদ্ধা
৭৪৭	শেখ রহমত উল্লাহ	শেখ আবদুস সাত্তার	৬/এ, লেইন, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা	যোদ্ধা, শহিদ
৭৫৬	মোঃ তাহের আলি	শেখ ওমর আলি	শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	যোদ্ধা
৭৭১	মোঃ শওকত আলি	মনসুর আলি	কল্যাণপুর, মিরপুর, ঢাকা	যোদ্ধা
৭৮৫	আহম্মদ আলি	জহুর আলি	শেরে বাংলা নগর, তেজগাঁও, ঢাকা	যোদ্ধা
৭৮৮	মোঃ আমিন উল্লাহ (নিরু)	সিদ্দিক বেপারী	আটিভাউয়াল, কেরানিগঞ্জ, ঢাকা	যোদ্ধা
৭৮৯	মোঃ আলমাছ আলি	মোঃ তৈয়ব আলি	জহুরি মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৭১০	সাহাবুদ্দিন আহমেদ	রমিজ উদ্দিন	ঘটকপুর, টুঙ্গিবাড়ি, ঢাকা	যোদ্ধা
১৩৩৬	মোঃ আলি হোসেন	মোঃ বশিরউদ্দিন	১৬ রায়েরবাজার, রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	যোদ্ধা
জেলা : দিনাজপুর				
১১৬৪	মোঃ হাবেজুল ইসলাম	রমিজউদ্দিন আহমেদ	ধাপতলা, সেতাবগঞ্জ, বচাগঞ্জ, দিনাজপুর	যোদ্ধা
জেলা : ঝিনেদা				
১০৮৯	মোঃ আসাদুজ্জামান	মোঃ কেরামত আলি জোয়ার্দার	মনিগ্রাম, আবাইপুর, শৈলকুপা, ঝিনেদা	যোদ্ধা
জেলা : নরসিংদী				
৭৪৩	মোঃ রবিউল্লাহ	মোঃ হোসেন আলি	চরমিহর, নরসিংদী, ঢাকা	যোদ্ধা
১৩৩৪	অনাথ চন্দ্র দাস (মোহাম্মদ আলি) [স্বাধীনতার পর ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়]	বাউর চন্দ্র দাস (মহরউদ্দিন) [মূলত বিহারি হিন্দু। দেশ স্বাধীনের পর ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়]	পাঘুরিয়া, আইনদিয়া, নরসিংদী	বাবুর্চি, যোদ্ধা।
			নোট : তিনি জেনারেল ওসমানীর বাবুর্চি। যুদ্ধ ট্রেনিংপ্রাপ্ত সি-ইন-সি স্পেশাল ফোর্সের সদস্য। নভেম্বর ১৯৭১ এর প্রথম সপ্তাহে ষোল জনের স্পেশাল ফোর্সকে নায়েব সুবেদার আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপালগঞ্জ অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়। তাঁরা হেমায়েতবাহিনীর অধীনে যুদ্ধ করেন।]	
জেলা : শরিয়তপুর				
২১	আবু তালেব মীর	নোয়াবালি মীর	রামভদ্রপুর, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
২০৯	গঞ্জর আলি খাঁ	মোঃ নাদেম আলি খাঁ	মহিশার, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	শহিদ
৫৬০	মোহাম্মদ রেজাউল মোস্তফা	মৃত এম এ হক	চর চান্দা, চর ভয়রা, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	যোদ্ধা

হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধা ও সহযোগীদের নামের তালিকা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৫৮৭	মোহাম্মদ আবদুর রউফ	মৃত মফিজউদ্দিন	রামভদ্রপুর, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
৭০১	আইয়ুব আলি	মোঃ সেকেন্দার আলি	চিথলিয়া, পালং, শরিয়তপুর	যোদ্ধা, মাঝি
৭৩৯	আবদুল হাকিম	কাসেম মিয়াজি	ডুমুরিয়া, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
৭৫১	মোঃ আইয়ুব আলি	সেকান্দার আলি	চিথলিয়া, পালং, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
৭৫৯	মোঃ রেজাউল মোস্তফা	এম এ-হক	চরকান্দা, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
৭৬২	মতিউর রহমান	হামেদ আলি	চামটা, নড়িয়া, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
৭৬৯	মোঃ ছবির উদ্দিন বেপারী	মোঃ আব্বাস আলি বেপারী	জাজিরা, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
৭৭৪	আদেল উদ্দিন	মোঃ জালাল উদ্দিন	শিবপুর, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
৭৭৭	আবদুল হাকিম	মোঃ কাসেম মিয়াজি	ডামুরদিয়া, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
৭৮২	মীর সাইফুল ইসলাম	মীর আপ্তাব আলি	ভুয়াগাড়া, নড়িয়া, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
৭৯৬	সেকেন্দার পাল্লা	চান শহিদ মিয়া	ডামারাম, নড়িয়া, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৩৮	আবুল কালাম কাজি	বাছের কাজি	টুমচর, নাগেরপাড়া, গোসাইরহাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৫৫	মোবারক হোসেন মৃধা	আকবর আলি মৃধা	শিবপুর, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৫৬	মোঃ নুরুল হক ঘরামি	মোঃ মোসলেম ঘরামি	মলংচড়া, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৬৮	মোঃ মনসুর আলম	মোঃ ছাত্তার বেপারী	শিবপুর, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৬৯	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	রমিজ উদ্দিন ঢালি	দক্ষিণ ছয় গাঁও, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৭০	আব্দুল খালেক খান	তালেব আলি খান	বড় কাচনা, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৭১	মোঃ শাহ আলম	জলিল বেপারী	টাকের হাট, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৭২	আবদুল হক মোল্লা	তাজেম আলি মোল্লা	তাদ্রের চর, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১১৭৩	মোঃ আবুল কালাম কাজি	মোঃ বাসের কাজি	টুম চর, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৭৪	মোঃ এনামুল হক বাচ্চু	মহসিন বেপারী (মাস্টার)	পক্ষন সার, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৭৫	সিরাজুল হক শিকদার	সোনাব আলি শিকদার	কেচুয়ারচর, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৭৬	মোঃ কদম রাড়ী	জোনাব আলি রাড়ী	মলংচর, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৭৭	মোঃ আব্দুল মালেক শিকদার	আজিজ শিকদার	বড় কাচনা, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৭৮	মোঃ নুরুল ইসলাম বেপারী	মেছের বেপারী	বড় কাচনা, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৭৯	মোঃ কাদের হিলালু	ছমেদ হিলালু	বড় কাচনা, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৮০	মোঃ আলি হোসেন	হাসান খাঁন	বড় কাচনা, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৮১	শাজাহান সরদার	মোঃ রহিম সরদার	নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৮২	আদেল উদ্দিন খন্দকার	জালাল খন্দকার	শিবপুর, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৮৪	দলিল উদ্দিন ওস্তা	মরন আলি ওস্তা	বড় কাচনা, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৮৫	মোঃ হাবিবুর রহমান হাওলাদার	খলিলুর রহমান	শিবপুর, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৮৬	মোঃ মোতালেব মাস্টার	আবেদ আলি মুনশি	নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৮৭	আবুল কালাম মোল্লা	ওহাব আলি মোল্লা	ভাদ্রের চাপ, নাগের পাড়া, গোসাইর হাট, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৮৯	গফুর আলি	নাদের আলি মীর	মহিশার, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
১১৯০	আবু তালেব মীর	নোয়াব আলি মীর	রামযোদ্ধা ভদ্রপুর, ভেদারগঞ্জ, শরিয়তপুর	যোদ্ধা
জেলা : নাটোর				
৭৪৬	আবুল হোসেন	আবদুল গনি সরদার	চক ফুল বাড়ি, নাটোর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
জেলা : পিরোজপুর				
৪৯৯	মোঃ নুরুল হক হাওলাদার	আবদুল জলিল হাওলাদার	হোগলা, হোগলা বেতাকা, কাউখালি, পিরোজপুর	যোদ্ধা
৭০৫	মনি মোহন বিশ্বাস	লাল গোপাল বিশ্বাস	লড়া, সাচিয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর	যোদ্ধা
৭১৬	মোঃ আজিজুর রহমান শেখ	আবদুর রহমান শেখ	ঝনঝনিয়া, সাচিয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর	যোদ্ধা
৭১৭	এ. এম. কামরুন্নবী	মোঃ ইসহাক তালুকদার	ঝনঝনিয়া, সাচিয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর	যোদ্ধা
৭৮৬	মোঃ লিয়াকত আলি খাঁ	আবদুল মজিদ খান	ইকরি, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর	যোদ্ধা
১১৬০	বাবলু তালুকদার	আবদুল ওয়াহিদ তালুকদার	ঝনঝনিয়া, সাচিয়া, নাজিরপুর, পিরোজপুর	যোদ্ধা
জেলা : গাইবান্ধা				
১৩৮	মজিবুর রহমান	দরাজ উদ্দিন সরকার	গাইবান্ধা, কলেজপাড়া, গাইবান্ধা	যোদ্ধা
জেলা : নারায়নগঞ্জ				
৮৫৪	আব্দুল কাদের	পানচাঁদ আলি	দড়িগাঁও, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ	যোদ্ধা
জেলা : খুলনা				
৭৫৭	কানাই সরদার	বগরতি সরদার	৯৫ ইকবাল রোড, খুলনা সদর, খুলনা	যোদ্ধা
৫৬২	মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান (মনি)	মৃত আমিলুজ্জামান	খুলনা	যোদ্ধা
জেলা : নড়াইল				
৩৮০	মোহাম্মদ আবুল কাশেম শিকদার [বর্তমানে মৃত]	মোঃ আবদুল শিকদার	জয়নগর, কালিয়া, নড়াইল	যোদ্ধা
৬৪৮	শেখ কামরুজ্জামান	দলিলউদ্দিন	লোহাগড়া, নড়াইল	যোদ্ধা
৭৫৮	মোঃ নাছির উদ্দিন শেখ	মোঃ আমির হোসেন শেখ	জোগানির, কালিয়া, নড়াইল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১০৬৭	আব্দুল আজিজ	মজিবর রহমান	তেলকাড়া, বড়দিয়া, লোহাগড়া, নড়াইল	যোদ্ধা
১০৬৮	আবুল কাশেম	আব্দুল শিকদার	জয়নগর, জয়গ্রাম, কালিয়া, নড়াইল	যোদ্ধা
১০৬৯	শিকদার আলাউদ্দিন আদ আজাদ	মহিউদ্দিন শিকদার	জয়নগর, জয়গ্রাম, কালিয়া, নড়াইল	যোদ্ধা
১২৩৮	নোয়াব আলি খন্দকার	জলিল খন্দকার	যোগানিয়া, কালিয়া, নড়াইল	যোদ্ধা
১২৫৪	আবদুল মান্নান শেখ	আদিলউদ্দিন শেখ	ডুমারিয়া, যোগানিয়া, কালিয়া, নড়াইল	যোদ্ধা
১২৫৫	নির্মলচন্দ্র বিশ্বাস	নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস	যোগানিয়া, কালিয়া, নড়াইল	যোদ্ধা
জেলা : বগুড়া				
৫৩২	এস এম আকরাম হোসেন	শেখ মোঃ রমজান হোসেন	শাবলা, তরলা, দুপচাচিয়া, বগুড়া	যোদ্ধা
জেলা : বরগুনা				
৭২৯	মোঃ আলতাফ হোসেন	মোঃ হোসেন আলি	আয়লাবাঙ্কুখালি, বেতাগি, বরগুনা	যোদ্ধা
জেলা : সাতক্ষীরা				
৭৫০	শেখ বজলুর রহমান	লিয়াকত আলি	নগরঘাটা, সাতক্ষীরা	যোদ্ধা
১৩১৫	এম এ খালেক	মোজাম্মেল হক	ভাদিয়াল, কড়াগাছি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা	কমান্ডার
জেলা : নোয়াখালি				
৪৩২	মোঃ গোলাম সরোওয়ার	সামাদ আলি	কেশারপাড়, সেনবাগ, নোয়াখালি	যুদ্ধাহত
৫৭৫	আবদুল লতিফ	আবদুল হক	কেশরপাড়, সেনবাগ, নোয়াখালি	যোদ্ধা
৫৭৬	মফিজউল্যা	মোহাম্মদ সামাদ আলি	কেশরপাড়, সেনবাগ, নোয়াখালি	যোদ্ধা
৭৭৩	আমির হোসেন	খলিলুর রহমান	মাইজদি, নোয়াখালি	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
জেলা : লক্ষীপুর				
৭৮০	আবুল খায়ের	আবদুল হাকিম	পূর্ব রমজানপুর, লক্ষীপুর	যোদ্ধা
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া				
৭৭৬	মোঃ শুকুর আলি	কারুন মিয়া	আইয়ুবপুর, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	যোদ্ধা
জেলা : ময়মনসিংহ				
৩২২	আবদুল মান্নান সরদার	মহর আলি সরদার	দুলালপুর, বারোপাপাড়া, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	যোদ্ধা, গোয়েন্দা
৫১৫	মোঃ আকতার হোসেন	মনিরউদ্দিন শেখ	চরদড়িকুস্টিয়া, বিদ্যাগঞ্জ, কোতওয়ালি, ময়মনসিংহ	যোদ্ধা
৭৮৪	ইব্রাহিম আলি	মোঃ এন্তাজ আলি	পশ্চিম নয়নাকান্দা, ফরিদগঞ্জ, ময়মনসিংহ	যোদ্ধা
জেলা : কুষ্টিয়া				
২৫৫	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	মৃত মোঃ খবির উদ্দিন	ছাতারপাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	যোদ্ধা
৭৯৪	আলতাফ হোসেন শেখ	আফছার উদ্দিন শেখ	গোপগ্রাম, খোকশা, কুষ্টিয়া	যোদ্ধা
জেলা : চাঁদপুর				
৫৩৬	এম শাহ আলম	এম বেলায়েত হোসেন	চর চাঁদপুর, খাদেরগাঁও, মতলব, চাঁদপুর	যোদ্ধা
৭৪৪	মোঃ আবুল বাসার	আশ্রাব আলি মৃধা	মালিগাঁও, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর	যোদ্ধা
জেলা : মুন্সিগঞ্জ				
৬৫২	মোঃ নুরুর রহমান	মৃত ফয়জুর রহমান	রাজদিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৫৩	এস. এম মাহমুদুর রহমান	ফয়জুর রহমান	রাজদিয়া বড়বাড়ি, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ	যোদ্ধা
৬৫৭	মোঃ লুৎফার রহমান	ফয়জুর রহমান	রাজদিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ	যোদ্ধা
৭৩৩	মোঃ হাদিস শেখ	কফিল উদ্দিন শেখ	রাজদিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
জেলা : গাজিপুর				
৫৮৮	মোহাম্মদ শাহজাহান	মৃত ইদ্রিস আলি	মির্জানগর, কাপাসিয়া, গাজিপুর	যোদ্ধা
৭৫২	ইব্রাহীম খাঁন	সোনামিয়া	চুমুরখী, কাপাসিয়া, গাজিপুর	শহিদ
৭৫৩	নায়েক মোঃ শাহজাহান	মোঃ ইদ্রিস আলি	মীর্জানগর, কাপাসিয়া, গাজিপুর	যোদ্ধা
৭৯১	শেখ আঃ আজিজ	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	দরগাচালা, শ্রীপুর, গাজিপুর	যোদ্ধা
জেলা : রাজশাহী				
৭৮১	এ. বি. এম শামছুজ্জামান	তবারক আলি	চর আকড়িয়াদহ, গোদাবাড়ি, রাজশাহী	যোদ্ধা
জেলা : পটুয়াখালি				
৩৯	মোঃ সেকান্দার আলি শিকদার	মৃত আবদুল হাফেজ শিকদার	গোয়ালিয়াবাগ, গুলবাগ, বাউফল, পটুয়াখালি	যোদ্ধা
৭১	মিসেস জোবায়দা	আবদুর রহমান (মীর)	ইসলামপুর রোড, খেপুপাড়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালি	যোদ্ধা
৭৩৫	তৈয়ব আলি রাঢ়ী	রহম আলি রাঢ়ী	হোসেনপুর, দৌলতপুর, কলাপাড়া, পটুয়াখালি	যোদ্ধা
৭৪৯	নুরজাহান বেগম	স্বামীঃ জবেদ আলি গাজি	বাড়ি রতনদি, গলাচিপা, পটুয়াখালি	যোদ্ধা
৭৯৯	আবদুর রব শিকদার (মাস্টার)	হাজি জিন্নাত আলি শিকদার	টুঙ্গি বাড়ি, দৌলতপুর, কলাপাড়া, পটুয়াখালি	যোদ্ধা
১০৩৯	মোঃ চানসে আলি খাঁন	মোঃ ইউসুফ আলি খাঁন	আদমপুর, দৌলতপুর, কলাপাড়া, পটুয়াখালি	যোদ্ধা
১০৭৩	মোঃ সালেহ উদ্দিন	দবির উদ্দিন শিকদার	আন্দুয়া, কালিকাপুর, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালি	যোদ্ধা
১১১৬	আবদুল গনি আকন	লেহাজ উদ্দিন আকন	মুসলিমপাড়া, খেপুপাড়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালি	যোদ্ধা
১১১৯	আব্দুল কাদের আকন	লেহাজ উদ্দিন আকন	হোসেনপুর, পাখিমাড়া, কলাপাড়া, পটুয়াখালি	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১১২৩	মোঃ সালেউদ্দিন	ছবিরউদ্দিন শিকদার	আন্দুরা, কালিকাপুর, মৃজাগঞ্জ, পটুয়াখালি	যোদ্ধা
জেলা : বাগেরহাট				
৬৪৪	মোজাম্মেল হক শিকদার	আবদুল করিম শিকদার	চালিতাবুনিয়া, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট	যোদ্ধা
৭৫৫	মোঃ মোজাম্মেল হক শিকদার	করিম শিকদার	চালিতাবুনিয়া, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট	যোদ্ধা
৭৬৫	হাবিলদার আকরামুজ্জামান	মোঃ নুরুউদ্দিন খান	আস্তাইল, মোল্লারহাট, বাগেরহাট	যোদ্ধা
৭৯৩	আক্কাস আলি মিয়া	মোঃ মান্দার আলি	রহমতপুর, চিতলমারি, বাগেরহাট	যোদ্ধা
জেলা : ভোলা				
৬	সৈয়দ আলি ঢালি	মোঃ মকবুল ঢালি	লালমোহন, ফুলবাগিচা, লালনমোহন, ভোলা	যোদ্ধা
৮৯	মোঃ হারুন মিয়া	মোঃ সাইফুল মিয়া	ছোটপাতা, তালুকদার বাড়ি, বোরহানুদ্দিন, ভোলা	যোদ্ধা
৭৬৮	মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার	আবদুর রব হাওলাদার	আলিনগর, ভোলা	যোদ্ধা
৭৭৫	আবদুল মান্নান	মৃত বাজা মিয়া	শিবপুর, ভোলা	যোদ্ধা
৭৭৮	মোঃ ইউসুফ হাওলাদার	মুন্সু মিয়া হাওলাদার	ভবানীপুর, দৌলতখান, ভোলা	যোদ্ধা
৭৭৯	বারেক হাওলাদার	আবুল হাওলাদার	ভবানীপুর, দৌলতখান, ভোলা	যোদ্ধা
৭৮৩	আবুল কাশেম বক্সী	মৃত আবদুল গফুর আলি	আলিনগর, ভোলা	যোদ্ধা
৭৮৯	আবদুল বারেক হাওলাদার	আহমত আলি হাওলাদার	আলিনগর, ভোলা	যোদ্ধা
৭৯৫	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত আবদুল হক মোল্লা	দক্ষিণ ইলশা, ভোলা	যোদ্ধা
জেলা : টাঙ্গাইল				
৭৬০	জানে আলম	কেপাতুল মিয়া	মিয়াধোপুরী, নগরপুর, টাঙ্গাইল	যোদ্ধা
৭৭০	মোসাম্মাৎ সাজেদা বেগম	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	পাথাইল কান্দি, কালিহাতি, টাঙ্গাইল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
জেলা : ঝালকাঠি				
২৩	ওসমান শেখ	মৃত কালু শেখ	বৈচতি, নলছিটি, ঝালকাঠি	শহিদ
৭৪	মোঃ আলমগীর মিয়া	মোঃ আলি মিয়া	চৌদ্দপুরিয়া, বোয়ালিয়া, নলছিটি, ঝালকাঠি	যোদ্ধা
২০৪	মোঃ আবদুল খালেক ফকির	মৃত বেনাজ উদ্দিন ফকির	বীরনারায়ন, নলছিটি, ঝালকাঠি	যোদ্ধা
৩০৮	নুর মোহাম্মদ হাওলাদার	সেরাজ উদ্দিন হাওলাদার	ভারুকাঠি, নলছিটি, ঝালকাঠি	যোদ্ধা
৭৮৭	আয়নে আলি শিকদার [বর্তমানে মৃত]	মৃত মোঃ মফিজ উদ্দিন শিকদার	গোপালপুর, কামদেবপুর, নলছিটি, ঝালকাঠি	যোদ্ধা
৭৯৮	মোঃ কদম আলি হাওলাদার	মোঃ মমতাজউদ্দিন হাওলাদার	নলবুনিয়া, নলছিটি, ঝালকাঠি	যোদ্ধা
১০৩৮	মোঃ শাহজাহান হাওলাদার	নুর আলি হাওলাদার	উত্তমপুর, রাজাপুর, ঝালকাঠি	যোদ্ধা
১১১৭	কদম আলি হাওলাদার	মোঃ মন্তাজ উদ্দিন হাওলাদার	নলবুনিয়া, নলছিটি, ঝালকাঠি	যোদ্ধা
জেলা : মাগুরা				
৭৬৪	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোকাম ফকির	শালিকা, মাগুরা	যোদ্ধা
১০৮৮	হাবিবুর রহমান হাবিব	আব্দুল কাদের মিয়া	পূর্বশ্রীকোল, খামারপাড়া, শ্রীপুর, মাগুরা	যোদ্ধা
জেলা : চট্টগ্রাম				
৭৬৩	এম এ হাশেম আফগানী	ওজিউল্যা পাটোয়ারি	হারামিয়া, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম	যোদ্ধা
জেলা : বরিশাল				
০৩	মোঃ মোতালেব ফকির	মৃত জৈনদ্দিন ফকির	বড় কসবা, টরকি বন্দর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩	আলতাব হোসেন বেপারী	মকবুল হোসেন বেপারী	মধ্য মিহিপাশা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২২	আবুল আহমেদ শিকদার	মৃত লতিফ শিকদার	ইলুহার, বানরিপাড়া, বরিশাল	শহিদ

হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধা ও সহযোগীদের নামের তালিকা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৬৩	মোঃ হোসেন মিয়া	সফিজ উদ্দিন মিয়া	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	মাঝি, যোদ্ধা
৬৪	আলতাফ হোসেন	কালু সরদার	সন্তোষপুর, মেহেদিগঞ্জ, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৬	আস্রাব আলি বয়াতী	হামেদ বয়াতী	খাঞ্জাপুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৭	রেয়াশাত আলি আঁকন	রফিজ উদ্দিন আঁকন	খাঞ্জাপুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৮	হাতেম আলি হাওলাদার (বর্তমানে মৃত)	গৈজুদ্দিন হাওলাদার	বাগিচার পাড়, বাথী, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৯	আবদুস সাত্তার হাওলাদার	গৈজুদ্দিন হাওলাদার	বাগিচার, পাড়, বাথী, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৭০	বরকত আলি আকঁন	রফিজ উদ্দিন আঁকন	খাঞ্জাপুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৭২	কাজি ইলিয়াস হোসেন	কাজি আব্দুল হাই	্রুকশী, ইউনিয়ন- রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৭৩	সেকান্দার আলি তালুকদার	তাহের আলি তালুকদার	বাদুর তলা, ভুরঘাটা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮	সার্জেন্ট কাঞ্চন শিকদার (অবঃ)	মৃত মোঃ চান উদ্দিন শিকদার	আশোকাঠি, গৌরনদী, বরিশাল	কমান্ডার, যুদ্ধাহত
৯০	আবদুর রহমান	মৃত মোঃ আবদুস ছোবহান	জল্লা, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৬	মোঃ আবদুস ছাত্তার হাওলাদর	গৈজউদ্দিন হাওলাদার	বাগীসেরাপুর, বাথী, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৭	মোঃ আশরাফ আলি বয়াতী	মৃত মোঃ হাসা বয়াতী	খামিজাপুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৮	মোঃ বরকত আলি আকন	মৃত রফিজ উদ্দিন আকন	খাঞ্জাপুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৯	মোঃ রেশাশত আলি আকন	মৃত রফিজ উদ্দিন আকন	খামিজাপুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১০০	হাশেম আলি হাওলাদার (বর্তমানে মৃত)	মৃত গৈজদ্দীন হাওলাদার	বাগিসের পাড়, বাথী, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৭	বিশ্বনাথ মল্লিক	মৃত অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস	দোমার কান্দি, বাকাই, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১১৯	অমল কৃষ্ণ দাস	মৃত হরেন্দ্রনাথ দাস	চরগাধাতলি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১২৯	আবদুল মালেক সরদার	চাঁন মুন্সিন সরদার	মিয়ারচর, হোসনাবাদ, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩২	এম. এ. হক	মৃত আবদুস সাত্তার	নগরবাড়ি, ফুলশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৫	কাজি সাইফুল ইসলাম	কাজি আঃ কাদের	ভালুকসী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৬	আব্দুল কাশেম মোল্যা	আবদুল মজিদ মোল্যা	টুমচর, বাটামারা, মুলাদি, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৭	মোঃ হারুন সরদার	গোঞ্জের আলি সরদার	খাঞ্জাপুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৯	গোলাম মোস্তফা সরদার	আলহাজ্ব সুলতান মাহমুদ সরদার	বগরবাড়ি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১৪১	কাজি বদিউজ্জামান	কাজি আবদুল হাই	ভালুকসী, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২০৩	কে. এম. জাকির হোসেন	মৃত খলিল উল্লাহ খান	দক্ষিণ আলেকান্দা, বরিশাল, কোতয়ালী, বরিশাল	যুদ্ধাহত
২০৫	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত ক্বারী আবদুল আউয়াল	ভবানীপুর, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
২২৯	কাজি আকরাম হোসেন	কাজি মুজ্জাফর হোসেন	ভালুকসী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৪২	পুষ্পরানি হালদার	শীতল হালদার	পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	সেবিকা, যোদ্ধা
২৫৩	মোঃ আব্দুল খালেক পাইক	মোঃ আজহার আলি পাইক	ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা, কমান্ডার
২৫৪	কাজি আলাউদ্দিন	মৃত কাজি আবেতাম	ভালুকসী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৫৬	আবদুল কাইউম বখতিয়ার	মৃত আবদুল লতিফ বখতিয়ার	উত্তর চাঁদ ত্রিশিরা, পয়শার হাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৫৭	মোঃ আশরাফ আলি পাইক	মৌঃ মোঃ মণ্ডল পাইক	যবসেন, ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৫৮	মোঃ আবদুল আজিজ মোল্লা	মৃত লেহাজ উদ্দিন মোল্লা	বসুণ্ডা, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৫৯	মোঃ মাহবুবুর রহমান	আবদুল আহেদ সরদার	ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৬০	মোঃ আলি দেওয়ান	মৃত ইসমাইল দেওয়ান	পয়সা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
২৬১	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত নওয়াব আলি ফকির	ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৬২	এ. কে. এম আলমগীর হোসেন	মৃত নওয়াব আলি ফকির	ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৬৩	মোঃ আলি আকবর শিকদার	মৃত মোবারক আলি শিকদার	মঙ্গলপট্টি, বিলগ্রাম, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
২৬৪	আইয়ুব আলি মৃধা	মৃত আকব্বাত আলি মৃধা	মোল্লাগ্রাম, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৬৫	শামসুল হক	মৃত. খাদেম আলি	পয়সা, পয়সার হাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	শহিদ যোদ্ধা
২৬৬	আব্দুল আলি পাইক	মৃত মাতাব আলি পাইক	যবসেন, ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৬৭	শ্যামল ব্যানার্জী	ডাঃ বি কে রঞ্জিত	পয়সার হাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৬৮	মোঃ আশরাফ আলি	মৃত মোঃ হাছান আলি	পয়সা, পয়সার হাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৬৯	মোঃ হোসেন মিয়া	মৃত শফি উদ্দিন মিয়া	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৭০	আবদুল লতিফ সরদার [বর্তমানে মৃত]	মৃত আক্কেল আলি সরদার	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৭১	মোঃ সামছুল আলম ফকির	মৃত জসিম উদ্দিন ফকির	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৭২	কাজি শাহ আলম	মৃত কাজি আব্দুস সোবহান	ভালুকসী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	সংগঠক, যোদ্ধা
২৭৩	কাজি মর্তুজা আলম	কাজি শাহ আলম	ভালুকসী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৭৪	কাজি আব্দুল মজিদ	মৃত কাজি শুকুর মাহমুদ	ভালুকসী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৭৫	এস.এম. হাবিবুর রহমান	মৃত রজব আলি সরদার	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
২৯৯	আবুল কালাম আজাদ	মৃত মোহাম্মদ মল্লিক	সরিকল, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৩০০	আবদুল মজিদ সরদার	কামাল উদ্দিন সরদার	রামনগর, চরকি কদর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৩১৪	মোঃ সাদেক আলি সরদার	মৃত লালু সরদার	ব্রাহ্মণগাঁও, মাউড়াপুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৩২০	গোলাম মোস্তফা সরদার	আলহাজ্ব সুলতান মাহমুদ	নগর বাড়ি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৩২১	সরদার মাহবুবুল আলম	আলহাজ্ব সুলতান মাহমুদ	নগর বাড়িয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৩৬০	সিপাহি মোঃ মোকতার আলি	মৃত মাহমুজান বেপারী	গোরাকুল, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৩৮১	মোঃ খোরশেদ জালাল	মৃত মাহমুজান বেপারী	যবসেন, ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৩৮২	আহম্মেদ আলি জালাল	হাসান উদ্দিন জালাল	যবসেন ফুলশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৩৮৬	এস, এম, আবুল হোসেন [বর্তমানে মৃত]	মৃত হাজি মিলন সরদার	নগরবাড়ি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৩৮৭	মোঃ মোশাররফ হোসেন খান	আবদুল জলিল খান	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৩৯২	শেখ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন [বর্তমানে মৃত]	মৃত মোঃ আবুল হোসেন	পয়সা, পয়সার হাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৩৯৩	মোঃ রাজে আলি শিকদার [বর্তমানে মৃত]	মৃত নাজির মাহমুদ শিকদার	পয়সা, পয়সার হাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা, সংগঠক
৩৯৫	আবদুস সালাম (সেলিম)	মৃত হাজি সেকান্দার আলি	দিনার, চরকডিয়া, কোতওয়ালি, বরিশাল	যোদ্ধা
৩৯৬	আতাহার হোসেন চৌধুরি	মৃত হাজি মকবুল হোসেন চৌধুরি	চরহোগলা, চরহোগলা মডেল, কোতওয়ালি, বরিশাল	যোদ্ধা
৪০৫	আবুল হাশেম খান	রাহেনউদ্দিন খান	পয়সা, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪০৬	মোঃ বিশাই হাওলাদার	বাবরউদ্দিন হাওলাদার	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪০৭	মোঃ শওকত মিয়া	আশেক আলি মিয়া	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪০৮	মোঃ করম আলি সরদার	লেহাজুদ্দিন সরদার	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪০৯	মোঃ সামসুর রহমান	সাহেব আলি মিয়া	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪১০	মোঃ ছবর আলি	রাজে আলি	জলিরপাড়, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৪১১	মকেলউদ্দিন মিয়া	হাশেম আলি মিয়া	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪১২	আবদুল খালেক	রাহেনউদ্দিন খান	পয়সা, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪১৩	আমজেদ শিকদার	তোরকান শিকদার	পয়সা, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪২৩	কাজি নজরুল ইসলাম	কাজি আবদুস সোবহান	ভালুকসী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৪৩	নাদের আলি আকন	দলিলউদ্দিন আকন	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৪৪	মিসেস সেলিনা আহমেদ	স্বামীঃ সৈয়দ মোতাহেরউদ্দিন আহমেদ	নলচিড়া, কাস্তপাশা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা, সেবিকা
৪৪৫	সৈয়দ আনোয়ারউদ্দিন আহমেদ	সৈয়দ আতাহারউদ্দিন আহমেদ	নলচিড়া, কাস্তপাশা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৪৬	এ.টি.এম. সিরাজুল হক	মৌলভী কফিলউদ্দিন আহমেদ	দক্ষিণ চাঁদশি, উত্তর চাঁদশি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৫২	আবদুল খালেক পাইক	আনছারউদ্দিন পাইক	যবসেন, ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৫৩	আবদুস সাত্তার পাইক	আবদুল খালেক পাইক	যবসেন, ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৫৪	জি.এম. আবু তালেব	আফেল গাজি	পয়সা, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৫৫	মোঃ মফসের আলি পাইক	সোনামুদ্দিন পাইক	যবসেন, ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৫৬	আবদুল করিম পাইক	আহম্মদ ফকির পাইক	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৫৭	মোঃ কাশেম আলি ফকির	শহর আলি ফকির	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৫৮	ফকির আবদুল মাজেদ	ফকির মেনাজুদ্দিন	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৫৯	মোঃ শাহজাহান হাওলাদার	কালাই হাওলাদার	চেঙ্গুটিয়া, ধানডোবা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৬৭	রেজাউল মিয়া চৌকিদার	জবেদ আলি চৌকিদার	পয়সা, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৪৯৭	হাবিবুর রহমান মির	জয়নাল আবেদিন মীর	খাঞ্জাপুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৪৯৮	আবদুর রশীদ মজুমদার	তাহের মজুমদার	কমলাপুর, খাঞ্জাপুর, গৌরনদী, বরিশাল	
৫০৬	মোঃ হাচেন আলি ফকির	কাশেম আলি ফকির	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫০৭	মোঃ আবদুস সবুর খান	রাহেনউদ্দিন খান	বাকলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫০৮	মোঃ জিয়াউল হক	একরাম আলি মিয়া	হরিণাহাটিয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫০৯	বাবুল আহম্মদ	লালমিয়া হাওলাদার	চেঙ্গঠিয়া, ধানডোবা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫২৯	কাজি আকরাম হোসেন	কাজি মোজাফফর হোসেন	ভাল্লুশী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৩১	নুরুল আলম হাওলাদার	বদিউজ্জামান হাওলাদার	নগরকাঠি, সিংহেরকাঠি, কোতয়ালি, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৩৩	আবদুল আজিজ বেপারী	মৌঃ রসুল বেপারী	কচুয়া, শোলাক, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৪৪	সাখাওয়াত হোসেন খান	মৃত খলিলউদ্দিন খান	দক্ষিণ আলেকান্দা, কোতয়ালি, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৬১	মোঃ শহিদুল্লাহ	মোহাম্মদ আলি গাজি	আমলা, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৬৪	মোঃ মকবুল হোসেন ফকির	মৃত হাতেম আলি ফকির	অশোকসেন, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৬৬	সুবেদার মোঃ আবদুল খালেক মোল্লা	মৃত মফিজউদ্দিন মোল্লা	রমজানকাঠি, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৬৯	এম.এ.সুবহান মাসুদ	আলি বেপারী	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	কমান্ডার
৫৭০	সিদামচন্দ্র হাওলাদার	মৃত ব্রজেন্দ্রনাথ হাওলাদার	অশোকসেন, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৭৭	নুর মোহাম্মদ মোস্তফা	মৃত হাজি গহর আলি	পতিহার, বিতপাগ্রাম, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা/কমান্ডার
৫৭৮	অতুলচন্দ্র নাগ	মৃঃ বনমালী নাগ	দাসপট্টি, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৭৯	ধীরেন্দ্রনাথ সরকার	কালীচরণ সরকার	টেমার, সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৮০	লক্ষণচন্দ্র নাগ	কুঞ্জবিহারি নাগ	সুরিহার, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৫৮১	নিত্যানন্দন নাগ	জীতেন্দ্র নাথ নাগ	সুরিহার, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৮২	আবদুল কাদের গোমস্তা	মৃত হাজি সোনামুদ্দিন গোমস্তা	পতিহার, বিল্লোলগ্রাম, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৮৩	আবদুর রহমান গোমস্তা	কুদ্দাত আলি গোমস্তা	পতিহার, বিল্লোলগ্রাম, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৮৪	আবদুল বারেক গোমস্তা	মোহব্বত আলি গোমস্তা	পতিহার, বিল্লোলগ্রাম, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৮৫	মোঃ হারুন সরদার	মৃত জোনাব আলি সরদার	বিল্লোলগ্রাম, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৮৬	অজিতকুমার দাশ	মৃত বিশ্বেশ্বর দাশ	চাঁদশি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৯২	মোঃ নুরুদ্দিন দেওয়ান	মোঃ ফজলুর রহমান দেওয়ান	টিকাসার, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৯৪	মিজান বেপারী	নিবারণ বেপারী	দাসপট্টি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
			[আবদুর রব সেরনিয়াবাত-এর বাসভবনের মুজিব ঘাতকদের দ্বারা নিহত]	
৫৯৫	আলতাফ হোসেন	রজ্জব শিকদার	দক্ষিণ চাঁদশি, চাঁদশি,গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৯৬	মোঃ সুলতান শিকদার	জয়নাল শিকদার	দক্ষিণ চাঁদশি, চাঁদশি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৯৭	আবদুল মালেক শিকদার	খাদেম আলি শিকদার	বড়কসবা, টরকি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৯৮	মোঃ মাজেদ মিয়া	আর্শেদ আলি	দক্ষিণ চাঁদশি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৫৯৯	মোঃ হানিফ সরদার	লক্ষী সরদার	পূর্ব সুজনকাঠি, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬০০	এ কে এম আজিজুল হক	কফিলউদ্দিন	দক্ষিণ চাঁদশি, চাঁদশি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৬০১	সোহরাব হোসেন	তাহের সরদার	দক্ষিণ চাঁদশি, চাঁদশি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৬০৫	জুলহাস হাওলাদার	বেল্লাত আলি হাওলাদার	সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬০৬	মৃণাল কান্তি পাল	নিমাই পাল	পতিহার, বিল্লগ্রাম, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬০৭	ইসমাইল সরদার	আর্শেদ আলি সরদার	বিল্লগ্রাম, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৬০৮	মোঃ সেকান্দার আলি মৃধা	হাসানউদ্দিন মৃধা	উত্তর সিহিপাশা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬০৯	ছবর আলি শাহ	মৃত কাশেম আলি শাহ	বারপাইকা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬১০	মোঃ ইউনুছ মোল্লা	আবদুল গফুর মোল্লা	শোলক, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৬১১	মতিয়ার রহমান সরদার	ভাওরি সরদার	নগরবাড়ি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬১২	আবদুল মালেক পাইক	মোঃ কালু পাইক	সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬১৬	আবুল হাসেম হাওলাদার	আলিমুদ্দীন হাওলাদার	বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬১৭	মোঃ ইসাহাক সরদার	আসমত আলি সরদার	কসবা, টরকি বন্দর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৬২১	আবুল হাসেম মৃধা	আলিমদ্দিন মৃধা	রক্ষারমাটিয়া, বাসাই, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬২২	জালাল সেকান্দার আলি	মৃত আবদুল মালেক জালাল	উত্তর শিহিপাশা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬২৩	মিসেস জাহেদা বেগম	আলি আহাম্মদ ভূঁইয়া	উত্তর শিহিপাশা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা, সেবিকা
৬২৪	আবদুল লতিফ মৃধা	হাছানউদ্দিন মৃধা	উত্তর শিহিপাশা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬২৫	মিসেস ফরিদা বেগম	আবদুল গনি বেপারী	রাংতা, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা, সেবিকা
৬২৬	মোঃ মেজবাহউদ্দিন	রাজ্জাক মিয়া	হোসনাবাদ, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৩৫	আবদুল হাকিম হাওলাদার	মৃত জিন্নাত আলি হাওলাদার	ভুরাঘাটা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৩৭	আবদুল আউয়াল হাওলাদার	মৃত আবদুল করিম হাওলাদার	জয়শ্রী, শিকারপুর, উজিরপুর, বরিশাল	কমান্ডার, আর্মি
৬৩৮	আবদুল করিম হাওলাদার [বর্তমানে মৃত]	মৃত মন্তাজ উদ্দিন	জয়শ্রী, শিকারপুর, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৪৯	মোঃ আলি খান (সেকান্দার)	কালু খান	আমবৌলা, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৫১	মোঃ সেকান্দার আলি সরদার	মৃত আছরউদ্দিন সরদার	যোগীহাটি, বাটাজোর, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা

হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধা ও সহযোগীদের নামের তালিকা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৬৫৪	হোসেন আলি মোল্লা	বিশাই আলি মোল্লা	বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	সহঃ কমান্ডার
৬৫৮	আবদুল গফুর খান	জোনাব আলি খান	জলিলপাড়, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৫৯	মোঃ আলমগীর (রাজু)	কছিরউদ্দিন	ধামুরা, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৬৭৪	সৈয়দ মোঃ মোশারফ হোসেন	মোঃ ফজলুর রহমান	পতিহার, বিল্বগ্রাম, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৭২৪	তৈয়ব আলি বখতিয়ার	মৃত ইউসুফ আলি বখতিয়ার	চান্ড, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৭২৬	জবেদ আলি সরদার	সোনামুদ্দিন সরদার	পশ্চিম সুজনকাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৭২৮	গোলাম কিবরিয়া বখতিয়ার	আবদুল লতিফ বখতিয়ার	চাঁদশ্রী, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৭৩৪	তুবর আলি শাহ	কাশেম আলি শাহ	বারপাইকা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৭৩৬	আবদুছ ছাত্তার মৃধা	আজেদ আলি মৃধা	কালনা, সিংহল কাঠি, গৌরনদী, বরিশাল	শহিদ
৮৬৩	শরীফ মোশারফ হোসেন	মৃত সৈজদ্দিন হোসেন	শোলক, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৬৪	মোঃ জিন্নাত আলি হাওলাদার	সৈয়দ আলি হাওলাদার	যোগীহাটি, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৬৫	মহেন্দ্রনাথ সরকার	কালিচরণ সরকার	ঘোমায়খানা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৬৬	জোনাম ঢাকি	জিতেন্দ্রনাথ ঢাকি	মাগুরা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৬৭	আবদুল বারেক	জবেদ জোমাদ্দার	সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৬৮	হারারচন্দ্র ধর	বিজয়চন্দ্র ধর	পাতিহার, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৬৯	মোঃ আবু বক্কর	আবদুল হক হাওলাদার	পশ্চিম ভূতেরদিয়া, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৭০	সোহরাব সরদার	মৃত সোনামুদ্দিন সরদার	দত্তশর, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৭১	অমলেন্দু পাল	মৃত নিশিকান্ত পাল	পাতিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৭২	নুর মোহম্মদ হাওলাদার	মৃত সিরাজউদ্দিন হাওলাদার	ভারাকাঠি, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৮৭৩	প্রশান্তকুমার বাড়ৈ	প্রমোদ কান্ত বাড়ৈ	ছবিখার গাঁও, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৭৪	জাহাঙ্গীর শিকদার	সামসুদ্দিন শিকদার	দক্ষিণ চাঁদশি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৭৫	মোঃ ইসকান্দার আলি শিকদার	ইমতাজউদ্দিন শিকদার	দক্ষিণ চাঁদশি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৭৬	মোঃ হায়দার আলি হাওলাদার	জবেদ আলি হাওলাদার	উত্তর শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৭৭	মাজেদ আলি হাওলাদার	আবুল কাসেম হাওলাদার	যোগীহাটি, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৭৮	আবদুল গফুর তালুকদার	মৃত মৈজউদ্দিন তালুকদার	খানজোবা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৭৯	মোঃ শহিদুল ইসলাম	আফসারউদ্দিন মিয়া	জয়রামপট্টি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮০	আয়নাল হক আকন্দ	সোনামুদ্দিন আকন্দ	বাদোরহাট, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮১	মোঃ আলিউল হাসান	হাজি আবদুল মজিদ খান	বিল্বগ্রাম, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮২	নগেন্দ্র নাথ বাড়ৈ	নিরোদন বাড়ৈ	উত্তর শাতলা, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮৩	নিকোলাস সরকার	সাইমন সরকার	রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮৪	রমেশচন্দ্র বৈদ্য	স্বর্ণকুমার বৈদ্য	উত্তর যাতলা, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮৫	আহসান হাবিব	হাবিবুর রহমান	ওটরা, উজিরপুর, বরিশাল	ক্যাপ্টেন অ্যাডজুট্যান্ট
৮৮৬	মোঃ মজিবর রহমান হাওলাদার	আবদুস সামাদ হাওলাদার	ধারিয়াইল, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮৭	আবদুল কাদের আকন	মোঃ জিন্নাত আলি	বাহেরহাট, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮৮	মোঃ নুরুজ্জামান বালি	মোঃ হোসেন আলি বালি	পশ্চিম সাতলা, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৮৯	মোঃ বারেক আলিগোমস্তা	মোঃ মজবুত আলি গোমস্তা	পাতিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৯০	মহাশীন গোমস্তা	আবদুল মালেক গোমস্তা	জহুল গতি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৮৯১	কাজি মনির হোসেন	কাজি নজরুল ইসলাম	ভালুকশী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৯২	কাজি আবদুল হামিদ	কাজি আবদুল খালেক	ভালুকশী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৯৩	প্রফেসর এম এ কাদের	মমিন হাওলাদার	চাদত্রিশিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৯৪	শামসুল হক	আবদুল লতিফ	আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৯৫	জামিলউদ্দিন শিকদার	মিনহাজউদ্দিন শিকদার	ভালুকশী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৯৬	কাজি মোঃ রেজাউল আলম	কাজি আবদুল ফরহাদ	ভালুকশী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৯৭	ফ্রান্সিস ঢাকি	জিতেন্দ্রনাথ ঢাকি	দক্ষিণ শাওড়া, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৯৮	আবদুস সালাম মোল্লা (মন্টু)	ডা. হারেছ মোল্লা	সুজন কাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৮৯৯	আকব্বেল আলি	রাহেনউদ্দিন	বাহেরঘাট, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯০০	আবদুল আলি বেপারী	ছয়েদ আলি বেপারী	আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯০১	দিলীপ জি বেপারী	রাফে বেপারী	দক্ষিণ বিজয়পুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯০২	আমিনউদ্দিন সরদার	মন্তাজউদ্দিন সরদার	আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯০৩	মোঃ ইদ্রিস মোল্লা	আবদুল গফুর মোল্লা	শোলক, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯০৪	হাবিলদার সৈয়দ আবুল হোসেন		নাঠৈ, গৌরনদী, বরিশাল	কমান্ডার
৯০৫	মিহির দাস গুপ্ত		গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা, ডাক্তার
৯০৬	মোঃ কামরুল আলম শরীফ	শরীফ শারুক হোসেন	গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯০৭	নাসিরউদ্দিন সরদার	ওহেদ আলি	গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯০৮	মোঃ আবদুর রহমান	মোকসেদ বেপারী	কেশবকাঠি, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯০৯	মজিবুর রহমান	আজিজুজ্জামান	বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৯১০	আবদুর রব তালুকদার	আবদুল গফুর তালুকদার	ধানডোবা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯১১	মোসলেম খান	জোন্নাত আলি খান	শোলক, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯১২	প্রদ্যুত গোস্বামী	ললিত মোহন	গোয়নদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯১৩	মোঃ আলমগীর হাওলাদার	আবুল কাশেম হাওলাদার	রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯১৪	হাবিবুর রহমান	ফজলে করিম.	সাতলা, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯১৫	দীন বন্ধু সমাদ্দার	যদুনাথ সমাদ্দার	গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯১৬	শান্তিরঞ্জন দাস	শীতলচন্দ্র দাস	গোয়াইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯১৭	রাফেল বেপারী	হরিচরণ বেপারী	দক্ষিণ বিজয়পুর, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা, গোয়েন্দা
৯১৮	পঙ্খু বৈদ্য	শারদা কান্ত বৈদ্য	আস্কার কালীবাড়ি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯১৯	মোঃ আনিসুর রহমান	হাবিবুর রহমান	সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯২০	শহিদুল ইসলাম তালুকদার	ইসমাইল তালুকদার	শোলক, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯২১	সাহাদুল ইসলাম ফকির	মোঃ দলিলউদ্দিন ফকির	বাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯২২	মোঃ সাহা সেকান্দার মোল্লা	হাফেজ মোল্লা	কালিসুবি, বরিশাল	যোদ্ধা
৯২৩	রেজাউল করিম	এরফানউদ্দিন হাওলাদার	শেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯২৪	বকুল মৃধা	ফেলান মৃধা	ভালুকশী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯২৫	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	মোঃ মমিনউদ্দিন	পাছুয়া, মুলাদি, বরিশাল	যোদ্ধা
৯২৬	ডা. বি. কে. রঞ্জিত ব্যানার্জি	ইন্দ্রভূষণ ব্যানার্জি	আগৈলঝাড়া, বরিশাল	ডাক্তার; যোদ্ধা
৯২৭	মোঃ শাহজাহান	বালু মিয়া	ভালুকশী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯২৮	মোঃ আলমগীর হোসেন	এখলাস বেপারী	ভালুকশী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৯২৯	বিমল চন্দ্র	রসিক চন্দ্র	বিল্বগ্রাম, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৩০	এক এম জয়নুল আবেদিন	এম এম ওয়াজেদ উদ্দিন	জলিরপাড়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৩১	মোঃ আবদুল আজিজ খান	জেন্নাত আলি খান	শোলক, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৩২	আলি হোসেন খান	জেন্নাত আলি খান	শোলক, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৩৩	উপন জয়ধর	হবিজন বীর	দোনারকান্দি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৩৪	মোঃ শাহজাহান হাওলাদার	সুলতান হাওলাদার	যোগীহাটি, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৩৫	সিরাজুল ইসলাম বেপারী	কাসেম বেপারী	যবসেন, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
৯৩৬	আলি আহম্মদ মোড়ল	মৈজুদ্দিন মোড়ল	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৫৫	হাবিবুর রহমান	আবদুল গফুর	কচুয়া, শোলক, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৫৬	আবদুর রহমান	মোকসেদ বেপারী	উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৫৭	সেকান্দার আলি ফকির	আবদুল কাদের ফকির	ছোট বাশাইল, বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৫৮	মোজাফফর হোসেন	রবিউল্লা	চান্দো, বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৫৯	আবদুল হামিদ হাওলাদার	শফিজউদ্দিন হাওলাদার	আটক, বাটাজোর, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৬০	মোঃ শাহজাহান	সরসের আলি হাওলাদার	বৈরজদ্দিন, দাসেরহাট, উজিরপুর, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৬১	কাজি সাইফুল ইসলাম	কাজি আবদুল কাদের	ভালুখি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৬২	এনায়েত হোসেন মিয়া	সাকুদ্দীন মিয়া	ছোটবাশাইল, বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৬৩	ইসকান্দার আলি শিকদার	মোজারউদ্দিন শিকদার	পশ্চিম জোয়াইল, বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৬৪	প্রতাপ চন্দ্র মুনশি	পার্বতীচরণ মুনশি	বড় বাশাইল, বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৬৫	কাজি শাহআলম	কাজি মোতাহার হোসেন	ভালুখি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১০৯৭	আবদুর রশিদ শিকদার	হেচেনউদ্দি শিকদার	ছোট বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৯৮	এস এম আলতাফ হোসেন	আবদুল লতিফ শিকদার	ছোট বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১০৯৯	সেকেন্দার আলি শিকদার	এলেমউদ্দিন শিকদার	পশ্চিম গোয়াইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১০০	ফজলুল হক বেপারী	আবদুর রহমান বেপারী	বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১০১	গোলাম মোস্তফা হাওলাদার	কেরামত আলি হাওলাদার	ভালুকশি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১০২	এস এম জালাল ফিরোজ নান্নু	আবদুল হাকিম শিকদার	ছোট বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১০৩	আবদুর রাজ্জাক তালুকদার	গফুর তালুকদার	গোবেরধন, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১১০৪	লন্তু মাঝি	ছবদের বেপারী	বড় বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	বাবুর্চি, যোদ্ধা
১১০৫	বড় মালেক বেপারী	ছবদের বেপারী	ছোট বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১০৬	আবদুল মালেক বেপারী	লেদু বেপারী	ছোট বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১০৭	মোছলেম শিকদার	আরশেদ শিকদার	গোয়াইল, বাশাইল,আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১০৮	আবদুল ওয়াজেদ মিয়া	লেহাজউদ্দিন মিয়া	ছোট বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১০৯	আবদুল আলি বেপারী	ছবদের বেপারী	ছোট বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১১০	আবদুল আজিজ শিকদার	এয়াসিন শিকদার	পশ্চিম গোয়াইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১১১	সেকান্দার আলি বেপারী	সামছুদ্দিন বেপারী	ছোট বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১১২	সামছুল হক বেপারী	সামছুদ্দিন বেপারী	ছোট বাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১১৩	আবদুল লতিফ সরদার	আক্কেল আলি সরদার	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১১৪	শ্রী হরিপদ সরকার	কালীচরণ সরকার	মোল্লাপাড়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১১৫	শ্রী জিতেন্দ্রনাথ সরকার	ডাওরিনাথ সরকার	মোল্লাপাড়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১১২২	মোঃ সোহরাব সরদার	মোঃ রমজান আলি সরদার	উত্তর শিহি পাশা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১২৪	শাহ সেকেন্দার আলি	শাহ সাহজুদ্দিন	গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১২৫	মোঃ রুহুল আমিন খান	সাহাজুদ্দিন খান	সোমাইরপাড়, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১২৬	মোঃ নজরুল ইসলাম মিয়া	তালেব আলি মিয়া	সোমাইরপাড়, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১২৭	মুজিবুল হক	মহরউদ্দিন	গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১২৮	সেরনিয়াবাত আবদুল মান্নান	আবদুল আজিজ	টেমার, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১২৯	হারুন অর রশিদ	রাহেন উদ্দিন সরদার	গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৩০	শাহজাহান সরদার	আবদুল বাকের সরদার	ভদ্রপাড়া, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৩১	আবদুর রহমান মোল্লা	নাদের আলি মোল্লা	বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৩২	সিরাজ বেপারী	কাশেম বেপারী	যবসেন, ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৩৩	মোঃ মোজাম্মেল হক হাওলাদার	রজ্জব আলি হাওলাদার	আমবৌলা, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৩৪	মোঃ আবদুর রশিদ ভূঁইয়া	আবদুল জব্বার ভূঁইয়া	বাসাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৩৫	মোঃ আবদুল মজিদ ফরাজি	মোসলেম ফরাজি	আমবৌলা, পয়সারহাট, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৩৬	আবদুল গনি সেরনিয়াবাত	মোঃ আবুল হাশেম সেরনিয়াবাত	পশ্চিম সুজনকাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৩৭	মোঃ রকিব হোসেন সেরনিয়াবাত	মোঃ কাঞ্চন সেরনিয়াত	সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল [স্বাধীনতার পর সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত]	যোদ্ধা; কমান্ডার
১১৩৯	মোঃ মহিউদ্দিন মোল্লা (মানিক)	করম আলি মোল্লা	আশোকসেন, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৪০	নারায়ণ চক্রবর্তী	রাখাল চক্রবর্তী	সুতারবাড়ি, ভালুকশি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৪১	আবদুল গনি হাওলাদার	শফিজউদ্দিন হাওলাদার	সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১১৪২	মোঃ সিরাজুল হক খান	মমিনউদ্দিন খান	ভান্ডুকশি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৪৩	মোঃ সায়েদুর রহমান ময়েন্দি	রহিউদ্দিন ময়েন্দি	চাঁদ ত্রিশিয়া, বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৪৪	আবদুর রাজ্জাক সেরনিয়াবাত	জবেদ সেরনিয়াবাত	শিহিপাশা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৪৫	আবদুস সোবহান	মোঃ সোনামদ্দিন	বাসাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৪৬	মোঃ সিরাজুল হক সরদার	মোঃ আবদুল কাদের সরদার	পূর্বসুজনকাঠি, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৪৭	জহিরুল হক চৌধুরি	নুরুল হক চৌধুরি	বাউরগাতি, কাঠস্থল, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৪৮	মিহির দাসগুপ্ত	ফণি দাসগুপ্ত	উত্তর শিহিপাশা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা; গোয়েন্দা; সংগঠক
১১৫১	মোঃ সামছুল হক বেপারী	সামসুদ্দিন বেপারী	ছোটবাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৫২	সেকান্দার আলি বেপারী	সামসুদ্দিন বেপারী	ছোটবাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৫৩	আবদুল খালেক বেপারী	লেদু বেপারী	ছোটবাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৫৪	মোঃ এসকান্দার বেপারী	সামসুদ্দিন বেপারী	ছোটবাশাইল, বড় বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৫৬	নুরুল হক ঘরামি	মোসলেম ঘরামি	মঙ্গলচড়া, নাগেরপাড়া, গোসাইরহাট, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৫৭	মোঃ ইকবাল তালুকদার	আবদুল গফুর তালুকদার	খাজুরিয়া, বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৫৮	মোঃ মনির উদ্দিন মিয়া	আদিলউদ্দিন মিয়া	খেজুরিয়া, বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৫৯	আবদুল মালেক বেপারী	মোঃ লেছু বেপারী	ছোটবাশাইল, বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৬১	বাবু লাল সরকার	নেপাল চন্দ্র সরকার	টৈমার, সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৬৩	আবদুল আলিম সরদার	মোঃ আকব্বর আলি সরদার	বাহাদুরপুর, বসদিপপাড়া, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৬৫	কাজি আজিজুল হক	কাজি জয়নাল হক	উত্তর শিহিপাশা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১১৮৬	সুলতান হোসেন তালুকদার	হোসেন তালুকদার	বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৮৯	হাওলাদার মজিবর রহমান	দলিলউদ্দিন হাওলাদার	ছোট ডুমরিয়া, তালুকশি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৯০	হরিদাস হালদার	গনেশচন্দ্র হালদার	আহুতি বাটরা, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৯২	সোহরাব বেপারী	কাদের বেপারী	ছোট বাসাইল, বাসাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৯৩	মিঞা আবদুল মান্নান	এলেমউদ্দিন সরদার	কালুপাড়া, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৯৪	মোঃ শাহ আলম আকন	তমিজউদ্দিন আকন	ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৯৫	কাজি সাহেব আলি	কাজি বন্দে আলি	তালুকশি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১১৯৮	হাওলাদার মজিবুর রহমান	দলিলউদ্দিন হাওলাদার	ছোট ডুমরিয়া, তালুকশি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১২০৭	মোঃ শাহজাহান সরদার	আইজউদ্দিন সরদার	পুর্বসুজনকাঠি, ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১২১৫	জাহাঙ্গির হোসেন তালুকদার	আবদুর রব তালুকদার	পুর্বসুজনকাঠি, ফুল্লশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১২৪৭	মোঃ মোতাহার খান	আচমত আলি খান	দক্ষিণ শিহিল, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১২৫১	আবদুর রাজ্জাক রাজু	মোঃ মৌজে আলি শিকদার	দক্ষিণ চাঁদশি, চাঁদশি, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১২৬৭	মোঃ আলম বেপারী	লেদু বেপারী	ছোট বাসাইল, বাসাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১২৬৮	আবদুল কাদের বেপারী	লেদু বেপারী	ছোট বাসাইল, বাসাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১২৮৫	আবদুস সাত্তার খান	মোঃ আজিমউদ্দিন খান	বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৩৭	আবদুল মোল্লা	তফি মোল্লা	বাসুদেবপাড়া, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৫৯	শাহজাহান আকন্দ	মোঃ কাশেম আলি	কেদারপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৬০	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মোঃ কাশেম আলি হাওলাদার	রাজকর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	এসিসি, যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৩৬৫	মোকসেদ আলি হাওলাদার	হোমেদ আলি হাওলাদার	চেঙ্গুটিয়া, ধানডোবা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল	বেসামরিক করণিক, যোদ্ধা
১৩৬৬	অজয় দাশগুপ্ত [বর্তমানে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার একজন সিনিয়র সাংবাদিক]	সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত	গৈলাদাশের বাড়ি, গৈলা, গৌরনদী, বরিশাল	সাংবাদিক, যোদ্ধা
১৩৬৭	জন বেপারী		যবসেন, গৈলা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৬৮	আশিস দাশগুপ্ত [বর্তমানে মৃত] অজয় দাশগুপ্তের ভাই]		গৈলাদাশের বাড়ি, গৈলা, গৌরনদী, বরিশাল [১৯৭৫ সালে মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত এর বাড়িতে সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত]	যোদ্ধা
১৩৬৯	শাহআলম মতি	আশরাক হোসেন সরদার	সুজনকাঠি, গৈলা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৭০	সরদার সিরাজুল ইসলাম	আবদুল কাদের সরদার	গৈলা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
১৩৭১	মালিক তালুকদার		গৈলা, গৌরনদী, বরিশাল	যোদ্ধা
জেলা : মাদারিপুর				
৭	মোঃ মোকসেদ আলি হাওলাদার	মোঃ আওয়াজ উদ্দিন হাওলাদার	উত্তর রাজদি, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫	আবদুর রহিম সরদার	মৃত এলফাজ উদ্দির সরদার	দক্ষিণ আকাল বরিশ, খাসেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৪	মোঃ মজিবুর রহমান খান	রেফোর্ট খান	আদিত্যপুর, হুগলি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৬	মোঃ ফজলুল হক সরদার	মৃত বাসাই সরদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৭	দয়জুদ্দিন বেপারী	মৃত কাছের বেপারী	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

হেমায়েতবাহিনীর যোদ্ধা ও সহযোগীদের নামের তালিকা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
২৮	মোঃ হারুন সরদার	রমজান আলি সরদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৯	বাদশা সরদার	রমজান আলি সরদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৭৫	মোঃ আইউব আলি হাওলাদার	তালেব আলি হাওলাদার	দক্ষিণ চর আইড় কান্দি, রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৭৬	মোঃ হারুন আর রশিদ হাওলাদার	অত্তের হাওলাদার	উত্তর চর আইড়াকান্দি, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৭৭	হেমায়েত হোসে জমাদার	মতলেব জমাদ্দার	উত্তর চর আইড় কান্দি, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৭৮	হেমায়েতউদ্দিন হাওলাদার	খাদেম হোসেন হাওলাদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৭৯	সেকেন্দার হাওলাদার	আবদুল আজিজ হাওলাদার	টুকরাকান্দি, ময়দানেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৮০	মোঃ শাহজাহান বেপারী	অহেদ আলি বেপারী	উত্তর রমজানপুর, ইউনিয়ন রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	কমান্ডার
৮১	হাওলাদার আবজাল হক	জামসেদ আলি হাওলাদার	উত্তর রমজানপুর, রামজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৮২	মোঃ আরোজ আলি হাওলাদার	হাচেন হাওলাদার	উত্তর রমজানপুর, রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৮৩	আজাহার হাওলাদার	হোমেদ আলি হাওলাদার	উত্তর রমজানপুর, রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৮৪	আবদুর রহমান হাওলাদার	কাজেম হাওলাদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯২	বঙ্কিমচন্দ্র মণ্ডল	মৃত বিশ্বেশ্বর মণ্ডল	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৩	কমলেশ চন্দ্র ভক্ত	মনিন্দ্র নাথ ভক্ত	রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪	আবদুর রশিদ হাওলাদার	মৃত আবদুল মল্লিক হাওলাদার	উত্তর চড়াই কান্দি, রামেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৫	মোঃ হারুন হাওলাদার	মৃত আত্তোর হাওলাদার	উত্তর চড়াই কান্দি, রামেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১০১	মোঃ নুরুল হক হাওলাদার	মৃত হাফেজ হাওলাদার	উত্তর চড়াই কান্দি, রামেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২২	মোঃ তমিজউদ্দিন হাওলাদার	মোঃ ইসলাম হাওলাদার	সাহেব রামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২৫	মোঃ সিরাজুল হক	নুর মোহাম্মদ মোল্লা	কয়ারিয়া, ময়দানেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩১	গোলাম কিবরিয়া (ইছহাক)	মৃত অজেদ আলি	কাশিমপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৩	আক্কেল আলি শিকদার	মৃত মোঃ ইসমাইল শিকদার	উত্তর চর আইরকান্দি, রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৪	মোঃ শামসুল আলম	আদিলউদ্দিন বেপারী	সাহেব রামপুর, সাহেবপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৪২	আবদুর রহমান হাওলাদার	মৃত দিলমন হাওলাদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৪৩	আবদুর রশিদ হাওলাদার	মৃত আবদুল মালেক হাওলাদার	উত্তর চর আইরকান্দি, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৪৪	মোঃ সিরাজুল হক	মৃত মোঃ আমির হোসেন খান	ঠেঙ্গামারা, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৪৫	বোরহানউদ্দিন	মৃত আবদুল গনি বিশ্বাস	পাড়িচর লক্ষিপুর, করিমগঞ্জ, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৪৬	মোঃ মোক্তার হোসেন মাতবর	মৃত ইয়ারউদ্দিন আহম্মেদ	পশ্চিম বনগ্রাম, আমেরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৪৭	আবদুল করিম চৌকিদার	মৃত মেলাই চৌকিদার	পূর্ব বনগ্রাম, আমেরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৪৮	আবদুর রাজ্জাক মাতবর	মৃত মোসেলেম মাতবর	পূর্ব বনগ্রাম, আমেরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৪৯	আবদুল আজিজ মাতবর	মৃত মেলাই মাতুব্বর	পূর্ব বনগ্রাম, আমেরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫০	আবদুল মতিন সন্নামত [বর্তমানে মৃত]	মতিয়ার রহমান সন্নামত	পশ্চিম বনগ্রাম, আমেরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫১	আবদুল বারেক বেপারী	ছাদেক বেপারী	পশ্চিম বনগ্রাম, আমেরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫২	মোঃ হজরত আলি মৃধা	আলফাজউদ্দিন মৃধা	মৃধাকান্দি, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫৩	আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার	মৃত নসাই হাওলাদার	মৃধাকান্দি, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৫৪	মোঃ সৈয়দ আলি শিকদার	আবদুল হামিদ শিকদার	কালাই সরদারের চর, এনায়েতনগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫৫	মোঃ আতাহার মৃধা	মৃত আফতাজউদ্দিন মৃধা	মৃধাকান্দি, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫৬	মোঃ নুরুল ইসলাম বেপারী	মৃত আবদুল মজিদ বেপারী	ডিমচর, সিডি খাস, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫৭	আতুব আলি খাঁ	মোঃ টেমর খাঁ	কালাই সরদারের চর, এনায়েতনগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫৮	মোঃ এসকান্দার আলি মৃধা	মফিজউদ্দিন মৃধা	মৃধাকান্দি, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৫৯	মোঃ রত্তন মৃধা	মোঃ মোসলেম মৃধা	মৃধাকান্দি, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬০	মোঃ হেলালউদ্দিন	মৃত আবদুল আজিজ হাওলাদার	রমজানপুর, উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬১	শাহ আলম তালুকদার [বর্তমানে মৃত]	মৃত মফিজউদ্দিন তালুকদার	রমজানপুর, উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬২	আলি আকবর খাঁ	মৃত হাজি তেঙ্গর খাঁ	কালাই সরদারের চর, এনায়েতনগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬৩	মোঃ নুরুল ইসলাম খাঁ	জোনাব আলি খান	কালাই সরদারের চর, এনায়েতনগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬৪	মোঃ আকুবালি সরদার	মৃত নয়ন সরদার	কালাই সরদারের চর, এনায়েতনগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬৫	মোঃ মতিন শিকদার	জালাল শিকদার	কালাই সরদারের চর, এনায়েতনগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬৬	আবদুল জব্বার হাওলাদার		কালাই সরদারের চর, এনায়েত নগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬৭	আবদুল হাকিম তালুকদার	মৃত হাবিব তালুকদার	কালাই সরদারের চর, এনায়েত নগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬৮	মোঃ আমির হোসেন খাঁ		কালাই সরদারের চর, এনায়েত নগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৬৯	হাচেন আকন	সিতু আকন	কালাই সরদারের চর, এনায়েত নগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৭০	আবদুল খালেক তালুকদার	আবুল হাসেম তালুকদার	কালাই সরদারের চর, এনায়েত নগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৭১	মোঃ বশিরউল্লাহ (বশির)	মোঃ আবদুল গনি খান	ক্রোকীর চর, সাহেব রামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৭২	মোঃ আবুল হোসেন	মোঃ নাসিরউদ্দিন খান	কালাই সরদারের চর, এনায়েত নগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৭৩	মোঃ বাদশা মিয়া	মৃত তিতাই খান	কালাই সরদারের চর, এনায়েত নগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৭৪	মোঃ বালাচান খাঁ	মোঃ ধলাচান খাঁ	কালাই সরদারের চর, এনায়েত নগর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৭৫	মোঃ বজু মৃধা	আবদুল খালেক মৃধা	মৃধা কান্দি, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৭৬	নূর মোহাম্মদ মৃধা	মৃত ইসলাম মৃধা	মৃধা কান্দি, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৭৭	মোঃ আলেছ বেপারী	মৃত আবদুল মজিদ বেপারী	মৃধা কান্দি, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৭৮	সুধাংশু সরকার	মৃত শম্ভুনাথ সরকার	রাজারচর, রাজারচর হাই স্কুল, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৭৯	অসিত রঞ্জন মিস্ত্রি	অনন্ত কুমার মিস্ত্রি	কর্মপাড়া, খুয়াসার, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৮০	মৃত্যুঞ্জয় মিস্ত্রি	সিদ্ধেশ্বর মিস্ত্রি	কর্মপাড়া, খুয়াসার, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৮১	সুধাংশু কুমার বিশ্বাস	সুধীর চন্দ্র বিশ্বাস	আমগ্রাম, রাজৈর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৮২	পরেশচন্দ্র সরকার	মৃত বারদা কান্ত সরকার	রাজারচর, রাজারচর হাই স্কুল, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৮৪	সুনিল চন্দ্র দাস	মৃত যদুনাথ দাস বৈদ্য	জাজিরা, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৮৫	মনোহর ভক্ত	পার্শনাথ ভক্ত	রজজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৮৬	আরবালি হাওলাদার	মৃত আবদুল গনি হাওলাদার	উত্তর চর আইরকান্দি, রজজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৮৭	হরেকৃষ্ণ মণ্ডল	মৃত চন্দ্র কান্ত মণ্ডল	জাজিরা, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৮৮	মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার	মৃত অহেদ আলি তালুকদার	চর আইরকান্দি, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৮৯	মোঃ জোরাফ ফকির	মৃত আনোয়ার উদ্দিন ফকির	পূয়ালি, চর আইরকান্দি, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৯০	কাজি গোলাম মোস্তফা	মোঃ আবুল হাশেম গাজি	কমলাপুর, ডাসার, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৯১	মোঃ মকবুল হোসেন বেপারী	জাবেদ আলি বেপারী	গোপালপুর, আমেরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৯২	মোঃ সিরাজ হাওলাদার	মৃত জামশেদ আলি হাওলাদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৯৩	মোশারেফ হোসেন	মৃত ভাশাই হাওলাদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৯৭	আবু আলি খান	আরোজ আলি খান	রাজারচার মাদারকান্দি, সন্যাসীর চর, শিবচর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৯৮	আবদুল হামিদ মিয়া [বর্তমানে মৃত]	মোশারফ হোসেন	কেরানির হাট, বরহামগঞ্জ, শিবচর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৯৯	এ কে এম সালাউদ্দিন	আমজাদ আলি	খানকান্দি, শিবচর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৭৬	মোঃ আবু হানিফ হাওলাদার	মৃত আবদুল মালেক হাওলাদার	পশ্চিম সাহেব রামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৭৭	আবদুল মালেক চৌকিদার	মৃত মাজেদ আলি চৌকিদার	পশ্চিম সাহেব রামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৭৮	মোঃ হুমায়ন কবির	মৃত মুনশি আইজউদ্দিন হাওলাদার	পশ্চিম সাহেব রামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৭৯	মোঃ আবুল কালাম	মৃত দলিলউদ্দিন ভূঁইয়া	দক্ষিণ সাহেব রামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৮০	আরোবালি হাওলাদার	মৃত আবদুল গনি হাওলাদার	চর আইরকান্দি, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৮২	মোঃ আবদুল মোত্তালেব	মৃত আবদুল আজিজ চৌকিদার	দক্ষিণ রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৮৩	আবদুল হাকিম সরদার	মৃত কাজেম আলি সরদার	দক্ষিণ রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৮৪	মোঃ আবদুল মজিদ মিয়া	মৃত আবদুল জব্বার	দক্ষিণ রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৮৫	মোঃ হেমায়েত জমাদ্দার	মৃত মতলেব জমাদ্দার	দক্ষিণ রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৮৬	অধ্যাপক মোফাজ্জেল হক	মৃত আবদুছ ছাত্তার শিকদার	দক্ষিণ রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৮৭	মোঃ কাওছার শিকদার	মৃত আরশেদ আলি শিকদার	দক্ষিণ রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
২৮৮	মোঃ আবু তাহের শিকদার	মৃত আলতাফ শিকদার	কয়ারিয়া, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৮৯	মোঃ আতাহার শিকদার	মৃত খাদেম শিকদার	দক্ষিণ রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৯০	মোঃ আবুল কাশেম	আবদুল মজিদ ফকির	দক্ষিণ রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৯১	সুনিল চন্দ্র দাস বৈদ্য	মৃত যদুনাথ বৈদ্য	জাজিরা, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৯২	মোঃ মোজাম্মেল খান	মৃত ইয়াছিন খান	জাজিরা, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৯৩	আবদুল গনি খান	মৃত রোস্তম খান	জাজিরা, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৯৪	মোঃ সোহরাব হোসেন	মৃত ইসমাইল শিকদার	জাজিরা, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৯৬	শরৎচন্দ্র বিশ্বাস	মৃত নিত্যানন্দ বিশ্বাস	রমজানপুর, রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
২৯৭	আয়নাল ফকির	মৃত নজেব আলি ফকির	নয়াকান্দি, উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	প্রত্যক্ষ যুদ্ধে শহিদ
২৯৮	মোঃ তৈয়ব আলি হাওলাদার	মৃত ছদরউদ্দিন হাওলাদার	পাঙ্গাশিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৩০১	মোঃ আবদুল গনি হাওলাদার	মৃত ইজ্জত আলি হাওলাদার	কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৩০২	সেকেন্দার আলি শিকদার	মৃত আবদুল গনি শিকদার	পুর্ব চর কয়ারিয়া, কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৩০৩	মোঃ আজাহার চৌকিদার	মৃত কালাই চৌকিদার	চর কয়ারিয়া, কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৩০৪	এ বি এম আলাউদ্দিন	মৃত আবদুল কাদের হাওলাদার	রামারপোল, মোল্লারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৩০৫	শাজাহান সরদার	মৃত মতিন সরদার	গজারিয়া কান্দি, সাহেবরামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	শহিদ
৩০৭	ইস্কান্দার আলি বেপারী	মৃত দলিলউদ্দিন বেপারী	উত্তর চর আইরকান্দি, রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	শহিদ
৩০৯	মোঃ ইদ্রিস মিয়া	মোঃ ওমর আলি মিয়া	দক্ষিণ ভাউতলি, বীরমোহন, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৩১৩	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মৃত আবদুল কুদ্দুছ হাওলাদার	দক্ষিণ রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৩৪৯	এস এম লোকমান হোসেন	মৃত মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন	দক্ষিণ রমজানপুর, দক্ষিণ রমজানপুরহাট, কালকিনি,	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
		শিকদার	মাদারিপুর	
৩৮৩	আবদুর রাজ্জাক মাতবর	মোসলেম মাতবর	পশ্চিম বনগ্রাম, আমিরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৩৮৪	আবদুল করিম চৌকিদার	মেলাই চৌকিদার	পূর্ব বনগ্রাম, আমিরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৪০১	আবদুল মন্নান খান	মৃত ছাবেদ আলি খান	কানুরগাঁও, ঘাসেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৪০২	মোঃ ছলেমান শিকদার	আলিমুদ্দিন শিকদার	কানুরগাঁও, ঘাসেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৪৪৯	মোঃ কুতুবুদ্দিন আইবেক	হাজি হাবিবুর রহমান ফকির	কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৪৯৬	মোঃ আলমগীর হাওলাদার	মোঃ আলি আহম্মদ হাওলাদার	দক্ষিণ আকালবরিশ, ঘাসেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৫১০	হুকুম আলি বেপারী	সোদাই বেপারী	বিভাগদি, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৫১২	মোক্তার হোসেন মাতবর	মুনশি ইয়ারউদ্দিন মাতবর	পশ্চিম বনগ্রাম, আমিরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৫১৩	মোঃ মতিয়ার রহমান সন্যামত	আপ্তাজউদ্দিন সন্যামত	পশ্চিম বনগ্রাম, আমিরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৫১৪	আবদুল আজিজ মাতবর	মিলন মাতবর	পশ্চিম বনগ্রাম, আমিরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৫৬৭	এইচ এম হাবিবুর রহমান	হাজি তালেব আলি হাওলাদার	দক্ষিণ চর আইরকান্দি, রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৫৬৮	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত আফফাত আলি আকন	চর পালরদি, রমজানপুরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৫৭২	মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত জাবেদ আলি সরদার	গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা, শহিদ
৫৭৩	মুনশি আবদুল জব্বার	মৃত রফিজউদ্দিন আহম্মেদ	দয়ালি মাদারিপুর, গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা,
৫৭৪	মোঃ আবদুছ ছালাম	মৃত সৈয়দ জাফর আলি	ডাসার, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা, শহিদ
৬৩১	তালুকদার আবদুস সালাম	মোঃ ছলিমউদ্দিন তালুকদার	খোয়াজপুর, টেকেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৬৭৩	নগেন্দ্র নাথ বাড়ৈ	জুরান চন্দ্র বাড়ৈ	লখণ্ডা, রাজৈর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৭২৫	মোঃ গণি চৌকিদার	নুর মোহাম্মদ চৌকিদার	কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৮৩৬	প্রশান্ত কুমার বাড়ৈ	গোপাল বাড়ৈ	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৩৭	মোঃ হারুন মুনশি	আবদুল জব্বার মুনশি	কালাইচর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৩৮	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মোঃ রহম আলি	উত্তর চর আইরকান্দি, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৩৯	মোসাম্মৎ কহিনুর বেগম	মুনশি আমিনউদ্দিন	কাসিমনগর, রাজৈর, মাদারিপুর	যোদ্ধা; সেবিকা
৯৪০	সৈয়দ আবুল হোসেন	মৃত সৈয়দ আতাহার আলি	ডাসার, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪১	আবদুস সাত্তার	মাজেদ আলি	করাবিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪২	মোঃ এবাদত আলি খান	মৃত নয়ন খাঁন	আদমপুর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪৩	গকুল চন্দ্র মণ্ডল	গনেশ চন্দ্র মণ্ডল	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪৪	আবদুল মজিদ	হাজি রসুল মাহমুদ	আদমপুর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪৫	মোঃ কামরুল হাসান	মোঃ ইউসুফ আলি বেপারী	দক্ষিণ রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪৬	মোঃ হাফেজ মোল্লা	মৃত ইউসুফ মোল্লা	ঝিকরহাটি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪৭	মোঃ আমজেদ মুনশি	মোঃ তাহের মুনশি	ঝিকরহাটি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪৮	আবদুল মন্নান খান	ছমেদ আলি	কানরগাঁও, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৪৯	সরদার সিরাজুল হক	আবদুল ওয়াহেদ মিয়া	পাঙ্গাশিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৫০	ডা. মোঃ আবুল বাসার	আবুল হাশেম মিয়া	ঝিকরহাটি, মাদারিপুর	যোদ্ধা; চিকিৎসক
৯৫১	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	আবদুর রহিম হাওলাদার	দক্ষিণ রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৫২	মোঃ হাবিবুর রহমান	আদেল উদ্দিন মোল্লা	কর্মপাড়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৫৩	মোঃ ফজলুল হক শিকদার	মোঃ কোব্বাত আলি শিকদার	কানরগাঁও, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৫৪	সুধীর রঞ্জন সরকার	বাশীরাম	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৯৫৫	আদিত্যকুমার হাওলাদার	রাজকুমার হাওলাদার	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৫৬	রাজেশ্বর মিস্ত্রি	মনোহর মিস্ত্রি	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৫৭	জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাওলাদার	বেনুন্দি নাথ হাওলাদার	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৫৮	ডা. সুরেন্দ্রনাথ সরকার	মোহন বাসী সরকার	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা; চিকিৎসক
৯৫৯	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	নূর মোহাম্মদ মোল্লা	কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬০	নীল রতন হাওলাদার	নিশিকান্ত হাওলাদার	বনগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬১	মোঃ ইস্কান্দার খালাসি	আবদুস সাত্তার খালাসি	দুর্গাবাদি, রাজৈর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬২	সাহেদা লস্কর	আবদুল কাদের লস্কর	রাজৈর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬৩	নিরঞ্জন হাওলাদার	হরিমোহন হাওলাদার	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬৪	ধীরেন্দ্র নাথ ভক্ত	একাকড়ি ভক্ত	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬৫	মোঃ সিরাজ বেপারী	জিন্নাত আলি বেপারী	চরঝাউতলা, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬৬	আলি হোসেন বেপারী	মৌজে আলি বেপারী	রমজান, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬৭	নিরঞ্জন মল্লিক	দ্বিজেন্দ্র মল্লিক	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬৮	দিলীপ কুমার মিস্ত্রি	মহানন্দ মিস্ত্রি	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৬৯	অখিল চন্দ্র মিস্ত্রি	অতুল চন্দ্র মিস্ত্রি	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৭০	যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস	নদীরাম বিশ্বাস	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৭১	জগদীশ চন্দ্র মিস্ত্রি	মহানন্দ মিস্ত্রি	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৭২	মন্টু সরকার	মতিন সরকার	গজারিয়াকান্দি, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৭৩	রাজ্জাক খান	দলিলউদ্দিন	জাজিরা, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৯৭৪	মোঃ আবদুস সালাম শেখ	সাহেব আলি শেখ	উঁচিয়ামোড়, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৭৫	আবুল বাশার চৌকিদার	আইউব চৌকিদার	কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৭৬	শামসুল হক মল্লিক	ছয়জুদ্দিন মল্লিক	শোলপুর, শিবচর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৭৭	মোঃ সিরাজুল হক	লাল মিয়া	কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৭৮	হরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৭৯	গোলাম মাওলা মাতব্বর	ইসমাইল হোসেন	বণিকের হাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮০	কাজি মিজানুর রহমান	কাজি আবদুর রহিম	কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮১	আমজাদ হোসেন	আদমুদ্দিন	রাজারচর, শিবচর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮২	বিভূতিভূষণ মণ্ডল	বলরাম মণ্ডল	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮৩	আবদুস সালাম	হামিজুদ্দিন	শোলপুর, রাজৈর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮৪	মোঃ সাজেদুল হক	মালেক সরদার	কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮৫	ছলেমান শিকদার	আলি শিকদার	কানরগাঁও, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮৬	কামজুদ্দিন	জোনাব আলি আকন	দক্ষিণ আকাল বরিশ, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮৭	রেজাউল করিম মুনশি	মুনশি মুজিবুর রহমান	কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮৮	আবদুল মালেক চৌকিদার	মাজেদ আলি চৌকিদার	সাহেবরামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৮৯	মান্নান তালুকদার	কুশাই তালুকদার	দক্ষিণ আকাল বরিশ, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৯০	বীরেন হাওলাদার	পণ্ডিত হাওলাদার	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৯১	মতিয়ার রহমান	হোসেন কাজি	বড় চর কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৯২	বাহারুল ইসলাম	দলিলউদ্দিন হাওলাদার	ক্রোপেরচর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
৯৯৩	আবদুস সাত্তার ঘরামি	আর্শেদ আলি	পাঙ্গাশিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৯৪	মোঃ লাল খান	মোঃ মান্দু খান	আদমপুর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৯৫	এস এম লোকমান হোসেন	মফিজউদ্দিন	দক্ষিণ রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৯৬	মিন্টু রঞ্জন দে	রাধা কান্ত দে	জাজিরা, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৯৭	মকবুল হাওলাদার	বিশাই হাওলাদার	দক্ষিণ রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৯৮	আবদুর রব কাজি	হায়দার কাজি	কানরগাঁও, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
৯৯৯	আবুবক্কর কাজি	চান কাজি	কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০০০	মোশারফ হাওলাদার	বাছের হাওলাদার	পূর্বমাইজপাড়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০০১	রবীন্দ্রনাথ হাওলাদার	তিনকড়ি হাওলাদার	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০০৩	রাধেশ্যাম মণ্ডল	নিতাই মণ্ডল	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০০৪	মোঃ আবদুল হাই মোল্লা	আবদুর রহিম মোল্লা	ঝিকেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০০৫	মোঃ আজাহার	কানাই চৌকিদার	চরকয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০০৬	জাফর আলি মোল্লা	জহর আলি মোল্লা	ক্রোকচর, শিবচর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০০৭	সঞ্জয় হাওলাদার	কানাই লাল হাওলাদার	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০০৮	রামক বালা	রঞ্জিত জীবন	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০০৯	গুরুদাস মজুমদার	সুরেন্দ্রনাথ	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০১০	আবু হানিফ হাওলাদার	মোঃ মালেক হাওলাদার	সাহেব রামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০১১	কলিন্দ্রকান্ত চৌকির	কালিকান্ত চৌকিদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০১২	নিকুঞ্জ চন্দ্র মণ্ডল	নিত্যহরি	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১০১৩	বাসুদেব মল্লিক	কার্ত্তিক মল্লিক	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০১৪	দেব নারায়ন হাওলাদার	রামচন্দ্র হাওলাদার	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০১৫	লালবিহারি হাওলাদার	দেবেন্দ্রনাথ হাওলাদার	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০১৬	অখিল চন্দ্র মন্ডল	রাজেন্দ্র নাথ	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০১৭	কৌশিকলাল চক্রবর্তী	ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০১৮	সেকেন্দার আলি	শেখ মেছের আলি	ডিক্রিরচর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০১৯	গুণধর বৈদ্য	হরিধর বৈদ্য	বেদগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২০	মোঃ সোহরাব হোসেন	ইসমাইল শিকদার	জাজিরা, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২১	গদাধর বিশ্বাস	গনেশচন্দ্র বিশ্বাস	দক্ষিণ চলবল, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২২	ধীরেন্দ্রনাথ বাড়ৈ	ধুলচরণ বাড়ৈ	দক্ষিণ চলবল, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২৩	আবদুল মালেক বেপারী	দাইমুদ্দিন বেপারী	কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২৪	ধীরেন্দ্রনাথ হাওলাদার	আদিত্যচন্দ্র হাওলাদার	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২৫	মাখনলাল জয়ধর	মঙ্গলচন্দ্র জয়ধর	দক্ষিণ চলবল, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২৬	অনিলচন্দ্র বাড়ৈ	পূর্ণচন্দ্র বাড়ৈ	চলবল, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২৭	আরজ আলি মিয়া	কানাই ফকির	কড়াইলকড়ি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২৮	আবদুল মজিদ মোল্লা	ময়নুদ্দিন মোল্লা	ঝিকরহাটি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০২৯	মোঃ আজিজুল খাঁ	আবদুর রহমান খাঁ	মিয়াকান্দি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০৩০	হাবিবুর রহমান হাওলাদার	আবদুল গণি হাওলাদার	পূর্বমাইজপাড়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০৩১	আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার	আবদুল গণি হাওলাদার	পূর্বমাইজপাড়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১০৩২	হাওলাদার আবদুস সামাদ	আবদুল গণি হাওলাদার	পূর্বমাইজপাড়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০৩৩	মইনুল ইসলাম (মানিক)	আবদুল গণি হাওলাদার	পূর্বমাইজপাড়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০৩৪	হাজি আবদুল কাদের হাওলাদার	আবদুল গনি হাওলাদার	পূর্বমাইজপাড়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০৩৫	আবদুর রব হাওলাদার	আবদুল গনি হাওলাদার	পূর্বমাইজপাড়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০৩৬	মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমদ	হাজি রসুল মাহমুদ	আদমপুর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০৩৭	অখিলচন্দ্র মিস্ত্রি	অতুলচন্দ্র মিস্ত্রি	শশিকর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১০৬৬	রাধিকা মোহন পাল	রাইচরণ পাল	ডুলঘাটা, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১১১৮	পরেশ সরকার	বরদা কান্ত সরকার	রাজারচর, রাজারচর হাই স্কুল, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১১২০	জিমুত বর	নারায়ন বর	কদম বাড়ি, রাজৈর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১১৬২	মোঃ লাল মিঞা	মোঃ বশিরউদ্দিন হাওলাদার	গুয়ালি মজিদবাড়ি, আমিরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১১৭৭	মোঃ ইচাহাক সরদার	নসাই সরদার	রামনগর, শেয়ালপট্টি, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২০১	মোতালেব চৌকিদার	আবদুল আজিজ চৌকিদার	দক্ষিণ রমজানপুর, রামেরহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২০২	মোতালেব হাওলাদার	ধোলাই হাওলাদার	উত্তর রমজানপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২২৩	আমিরউদ্দিন সরকার	হাজি আলা বকস্	কুপচুরি, লক্ষিপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২২৬	শৈলেনচন্দ্র মন্ডল	শুকচান মন্ডল	চরফতেহাবাদুর, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২২৭	নুরুল ইসলাম দর্জি	তাজেম আলি দর্জি	রামনগার, শেয়ালপট্টি, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২২৯	অনিল চন্দ্র পাল	যতিন্দ্রনাথ পাল	চরবিভাগদি, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২৩০	এচহাক বেপারী	ফৈজুদ্দিন বেপারী	চরদৌলতখান, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১২৩১	আবুল হাশেম সরদার	মোতালেব সরদার	রায়পুর, লক্ষিপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২৪৬	মোসতফা ইদ্রিস	মোঃ তাজেল মিয়া	আমগ্রাম, রাজৈর, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১২৬৬	নিজামউদ্দিন সরদার	তাকা সরদার	ক্রোকিরচর, সাহেবরামপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩১৬	আবদুল খালেক ফরাজি	আবদুল ফরাজি	উত্তর রাজদি, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩১৭	মোঃ আজাহার সরদার	মোঃ ইসলাম সরদার	চর ঠেঙ্গামারা, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৩১	সিকিম আলি মোল্লা	সৈয়দ আলি	জালালপুর, লক্ষিপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৩২	আবদুল লতিফ মিয়া	ওয়াজেদ আলি বেপারী	মহরউদ্দিনচর, এনায়েতপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৩৩	এ আর এম শামসুল আলম	আবদুর রাজ্জাক মিয়া	ডাসার, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৪১	মোঃ আবদুর রশিদ মিয়া [পরবর্তীকালে অনারারি ক্যাপ্টেন (অব.)]	মুনশি আবদুল হামিদ	কুমারখালি, পেয়ারপুর, মাদারিপুর	যোদ্ধা, দপ্তর, কমান্ডার
১৩৪২	আবদুল ওহাব হাওলাদার	কাজেম হাওলাদার	পূর্ব মাইজপাড়া, বীরমোহন, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৪৩	মীর হারুনুর রশিদ	মীর আশরাফ আলি	পুয়ালি, আমেরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৪৪	মোঃ জাহাঙ্গির শিকদার	জবেদ আলি শিকদার	বড়চর, কয়ারিয়া, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৪৫	আবদুল মোতালেব	সফিজুদ্দিন	মিনারজি, আমেরিয়া গোপালপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৪৬	মোঃ শাহজাহান মোল্লা	সিরাজুদ্দিন মোল্লা	কুলচরি, লক্ষিপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৪৭	মকবুল মোল্লা	সিরাজদ্দিন মোল্লা বিদ্যাবাগিশ	লক্ষিপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৪৮	হাশেম সরদার	আবদুল মোতালেব সরদার	রায়পুর ঘাটবাড়ি, লক্ষিপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৪৯	আয়নাল সিদ্দিক		কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

যোদ্ধা নং	যোদ্ধার নাম	পিতার নাম	গ্রাম, ডাকঘর, থানা ও জেলা	মন্তব্য
১৩৫০	আইউব আলি		কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৫১	ডা. দিলিপ		কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৫৪	মোঃ সিরাজুল হক খান	মোঃ আমির হোসেন খান	উত্তর ঠেঙ্গামারা, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৫৫	বীরেন্দ্রনাথ ভদ্র	এককড়ি ভদ্র	নবগ্রাম, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৫৬	সৈয়দ আলি ইমাম	সৈয়দ আনসারউদ্দিন	দাসার, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৫৭	সৈয়দ আবুল হোসেন	সৈয়দ জুলফিকার আলি	দাসার, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৫৮	মোঃ নজরুল ইসলাম আকন্দ	আবদুল হক আকন্দ	লক্ষিপুর, কালকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা
১৩৬৪	এনামুল হক		[illegible]লকিনি, মাদারিপুর	যোদ্ধা

এই তালিকা অসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে আরও তথ্য পাওয়া গেলে এতদসঙ্গে সংযুক্ত হবে।

পরিশিষ্ট-১

কবি হেমায়েত

যুদ্ধাহত হেমায়েত-এর হাতে আজ অস্ত্র নেই। আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় তাঁর লেখনিতে। জানি তার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নেই। তবু বীর অনুভূতির বেদনা ভারাক্রান্ত স্মৃতির মূল্য আছে। তাই তাঁর কিছু কবিতা দিয়ে ইতি টানছি।

"আবার তোরা বিদ্রোহ কর"

তোরা আজ বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ কর।।
একাত্তরের রক্ত ধারায় আবার তোরা অস্ত্র ধর।।
ক্ষুধার ঐ কান্না মুখে রুটি দিয়ে শান্ত কর।
বুর্জোয়াদের দালান কোঠা, ভেঙ্গে দে ঐ আড্ডা ঘর।
তোরা আজ বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ কর।
৭১-এর রক্ত ধারায় আবার তোরা অস্ত্র ধর।।
শ্রমিক, মজুর, গরিব, চাষা, সব মানুষের চাইতে খাসা
আমলা আর, বুর্জোয়ারা, ওরা যে সর্বনাশা,
ওদের ঐ দর্প আশায়, জোট বেঁধে সব লাথি মার।
তোরা সব বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ কর।।
তোদেরই রক্ত চুষে অট্টালিকা গড়ছে ওরা,
মদ, মাগি আর জুয়ার নেশায় আজকে ওরা মাতোয়ারা
ওদের ঐ কালো হাতে, ছোবল মেরে ভাই তোদের ঘর।
তোরা আজ বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ কর।।
বিলাসিতায় মেতে ওরা, তোদের টাকায় ভরছে ঘর;
করিস না ভয়, নাই তোদের ক্ষয়, ওরা ভীতু জানোয়ার;
উচ্চ শিরে, এগিয়ে চল, ভাংরে ওদের রঙ্গ মহল;
তোরা আজ বিদ্রোহ কর, বিদ্রোহ কর।।
একাত্তরের রক্ত ধারায় আবার তোরা অস্ত্র ধর।। [রচনা কাল : ০১/০৫/১৯৯৪]

শপথ

মুক্ত আমি, মুক্ত সবাই, মুক্ত আমার দেশ।
আত্মনিয়োগ করব এবার, গড়ব পরিবেশ।
অস্ত্র ছেড়ে ধরব কলম, কাগজ যুদ্ধের মাঠ
কলুষতায় মারব লাথি, অহংকারে ঝাট।
একাত্তরের স্মৃতি আমার, এখনও মনে পড়ে।
মানবতার আর্তনাদ, বাংলার ঘরে ঘরে।
সেই স্মৃতি লক্ষ্য করে, শিক্ষার আলো জ্বাল।
ওরে আমার বীর বাঙালি, ছেড়ে দে কোলাহল।
আয়রে দামাল ছেলে, দেশকে মোরা গড়ি
বাসব ভাল বাংলা মাকে, ধাকব আঁচল ধরি।

হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, বাংলার ঘরে ঘরে
একাত্তরের লক্ষ যুবা, পড়ছিল ঝরে ঝরে।
কালো রাত্রি ২৫ শে মার্চ, রক্তে রাঙ্গা হল
বল সবাই বল এবার, বিদ্রোহীর বাংলা বল।
নজরুলের সেই স্বপ্নে দেখা, ছন্দে লেখা বাংলাদেশ
স্বাধীন শুধু পূর্ব বাংলা, সবটুকু যে হয় নি শেষ।
এপার বাংলা ওপার বাংলা, যেদিন স্বাধীন হবে
আমার মায়ের বুক জুড়াবে, স্মৃতি শুধু রবে
ওরে তোরা জাগরে এবার, বীর বাঙালির দল
ওপার বাংলা মুক্ত করি, স্বাধীন করি চল।
চলরে এবার চল, দামাল ছেলের দল
কাগজ কলম হাতে নিয়ে, এবার তবে চল।
[রচনাকাল ঃ তারিখ : ০৩/০৩/১৯৭৩]

শহিদ স্মরণে

লক্ষ শহিদের রক্ত থেকে অর্জিত স্বাধীনতা
একাত্তরের রক্ত থেকে উড়ছে দেশে জয় পতাকা।
বীর দেহের রক্ত দিয়ে রাখছি অবদান
গা তোরা গা বীর শহিদের গান
সালাম, রফিক, বরকত, সফিক, আরো কত বীর সেনা।
কত মায়ের ধন হয়েছে গোপন তোমরা তাদের চিনও না।
মরিতে গিয়াও মরিতে পারি নি আহত হয়েছি বটে,
এগারটি দাঁত ভেঙ্গে গেল মোর গুলিতে অকপটে।
স্বজন হারিয়ে বেঁচে আছি আমি কি অধিকার নিয়ে
একুশে আজি প্রার্থনা কর শহিদ মিনারে গিয়ে।
[রচনাকাল ঃ তারিখ : ২১/০২/১৯৭২]

গোপনপুরে

আমার দেশের মুক্তিযোদ্ধা আছি গোপন পুরে।
স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিলাম নাক দূরে।
অস্ত্র নিয়ে হাতে মোরা, গর্জে উঠেছিলাম।
তার বিনিময়ে আজকে তোরা উজির নাজির রাজা।
পর দেশীরা পালিয়ে গেছে এখন তোদের মজা।
ছোট্ট থেকে বড় শহর, দালান ভুরি ভুরি।
বেঁচে থাকা বীর সেনারা হইছে গুড়ি গুড়ি।
ভাত নাই তাদের পেটে রক্ত দিছে যারা।
চাটুয়্যার দল খেয়ে দেয়ে পেট করেছে পুরা।
বাইশ থেকে বাইশ লুটায়, বাংলা মায়ের কোলে।
শহিদানের বাচ্চা বিবি, পড়ছে ঢলে ঢলে।
ভুয়া বীরের অভাব নাই, গল্প ভারি ভারি।
আচার বিচার কিছুই নাই, লজ্জায় মোরা মরি।

শহিদানের আত্মা আজি, দিচ্ছে অভিশাপ।
হুশিয়ার হে শোষকের দল, করব নাক মাপ।
একাত্তরের মুক্তি পাগল, বেঁচে যারা আছে।
সময় হলেই ধরবে তারা, ধরবে তোদের কষে।
হুশিয়ার দিচ্ছি মোরা বাইশ শ পরিবার
অল্প সময় বাকি আছে, তোদের ধরিবার।
হুশিয়ার! হুশিয়ার!! [নব অভিযান- ২৬ মার্চ, ১৯৮৬]

স্বাধীনতার মুক্তি মন

ওরে দামালের দল অস্ত্র হাতে এসেছি আমি
স্বাধীনতার শপথ নিয়ে।
বাংলার আকাশ বাতাস কেঁপে থর থর,
ভাইয়েরা আমার ঝরে পড়িছে রক্ত দিয়ে।
মায়ের চিৎকার শুনে বাংলার দামাল ছেলে,
হাতিয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
আমিও এসেছি চাকুরিতে লাথি মেরে,
উদ্যত প্রতিশোধ নিতে।
অজানা পথ পেরিয়ে, রক্তে রঞ্জিত হয়ে
পৌঁছি এসে ফরিদপুরে।
ভেঙ্গে দেই তালা, সেপাই পান্থশালা,
হাতে দিই গুলির মালা।
বলি সব কথা, পথের ঘটনা, ঢাকার কাহিনী,
খুলে দেই মনের ডালা।
দামালের দল শুনে মোর কথা, উচ্চ শিরে এগিয়ে আসে,
ভিড় করে ধরে মোরে।
অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে
মৃত্যুকে লাথি মেরে।
শত জনতায় শত ছালাম, মাতৃকা তরে শত সম্মান,
নতুন করে শপথ নিলাম
দামালের তরে চিৎকার দিয়ে, উদাত্তভাবে বলেছিলাম।
সকলের তরে লাল সালাম।
ওরে রণ বীর উন্নত শির, জাগ্রত হও, আজকে তুমি,
মুক্তি কর এ মাতৃভূমি।
কর শিক্ষা অস্ত্র বিদ্যা, এগিয়ে চলহে নওজোয়ান
রাখিতে বাংলার মান।
ধর অস্ত্র কর মুক্ত, শোনিত ধারা অনির্বাণ,
যায় যাক না আমাদের প্রাণ,
সেদিন শহরের শত শত ছেলে জয়ধ্বনি দিয়ে
আসে মোর দলে।
অহংকার বেগে হুংকার ছাড়ে, মুখে জয়বাংলা বলে
বাতাসের তালে তালে।

হাতিয়ার হাতে নেয়, দামালের দল, যেমন সৈন্য বহর,
কেঁপে উঠে সেই ছোট্ট শহর।
রণ দামামার, মায়ের চিৎকার, আরো কত আর্তনাদ,
লালে লাল রক্ত পাই।
এক দুই করে পেরিয়ে গেল, দীর্ঘ নয়টি মাস,
পথে- প্রান্তরে বাস।
স্বামীহারা বোন, ছেলে হারা মা, চার দিকে
শুধু রণ ঝংকার।
উদিত হয়েছে রঙিন সূর্য, বহু ত্যাগের পর,
উনিশ শ' একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। [তারিখ : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১]

আমি এক দুর্বার মুক্তি সেনা

আমি এক দুর্বার মুক্তি সেনা করি না কারো ভয়
বন্দি আছি বন্দি খানায় তবুও নেই মোর ভয়।
রক্ত দিয়ে গড়িয়াছি দেশ করিনাকো নত শির
শত অনাচার সহিয়া রইবো আমি যে জাতীয় বীর।
সদা জাগ্রত আমি নেব প্রতিশোধ আঘাত হানিবো তায়
ভেঙ্গে দিব তার বিষদাঁতগুলি ফুরাবে অন্তরায়।
অসি হাতে নিয়ে দুরাচার সব কাটিয়া খান খান
নরকে পাঠাব পাপিষ্ঠের দল রাখিব নিজের মান।
আল্লাহ আমায় দাও গো শকতি করিতে পুনর্বার
ধ্বংস করিতে অসুর দলের যতসব অত্যাচার।

বন্দি সেনা

ওরে তোরা আজ জাগরে এবার বন্দি সেনার দল
কাঁদিস নারে চোখ মুছে নে বাহুতে আনরে বল।
শত অত্যাচার ভেঙ্গে দে রে আজ করে দেব চুরমার
গারদে আটক বন্দি সেনা সব জাগরে এবার হ হুশিয়ার।
এই পাহারা মেটে পুলিশ তোদের চেয়ে আমরা খাঁটি
চোরের থেকে লুট করে আজ জেলখানাটা করছ মাটি।
আবার যারা দম্ভ করে বলছো মোরা জেল প্রহরা
মানবো বিবেক করছো মাটি ভীষণ তোরা লজ্জা ছাড়া।
এরাও মানুষ ঐ সমাজের এই মায়েরই সন্তান এরা
দিচ্ছ আঘাত খাচ্ছ লুটে তাই পেয়ে আজ দেয়াল ঘেরা।
করিনা ভয় জাগ্রত আজ অবিচার সব বন্ধ করো
দেয়াল ঘেরা জেল সেনারা জাগ এবার শক্তিধর।
জীবন যাবে যাক না চলে ভয় করি না মরতে হবে
হৃদয় মাঝে বিষাদ নিয়ে বেঁচে তারা সমাজ ছাড়া।
আত্ম-কুটুম সবাই আছে তবু এরা সর্বহারা
জেলখানার এই কালাকানুন
সংস্কার আজ করতে হবে।

স্মৃতি

পুরাতন চলে গেল স্মৃতি রেখে বুকের মাঝে,
তাই নতুনকে আঁকড়ে ধরে, তুমি কি বাঁচতে চাও নতুন করে?
যদি তাই হবে তবে কেন, দিয়েছিলাম ভালবাসা
কেনই বা শপথ নিয়েছিলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরে?
সব কথা সব কাহিনী, ভালবাসা প্রেম-পিরিতি
উপচানো আনন্দ-মোহ, তবে কি এখানেই শেষ?
যদি তাই হয়, তবে লিখে দিও শেষ স্মৃতির পাতায়
পুরাতন কাহিনী সহ, তোমার নতুন পরিবেশ।
সংগ্রাম করেছি দিবা-রজনী, তোমাকে পাওয়ার আশায় হে স্বাধীনতা
বহুদিন পর খুঁজে পেয়েছিলাম, সেই পিচঢালা রাস্তায় হে স্বাধীনতা।
আনন্দ মুখর হয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরে,
কত কথা বলেছিলাম, সে যে বীর চির অবক্ষয়।
আজ ভাবছি অনেক কিছু শত জ্বালা নিয়ে
বেঁচে আছি আমি নির্মম দেয়ালের মাঝে।
তবে কি কোনোদিন বলবো না কথা
তুমি কি আসবে না বঁধুয়ার সাজে?
আমি বন্ধু করি দোয়া, আমার এই পাপিষ্ঠ হৃদয় থেকে
বেঁচে থাক তুমি, সুখি হও, শুদ্ধ সব স্মৃতি গেঁথে রেখো হৃদয় মাঝে।
মরণের পরে ওপারে গিয়ে দেখা হবে আমাদের
এপারের স্মৃতি বুকে নিয়ে তারার সাজে সকলের।

শপথ

সিরাজ তোমায় স্বীকার করি, জানাই তব লাল সালাম
আদর্শকে রাখতে আছি, কঠোরভাবে শপথ নিলাম।
বুর্জোয়া আর আমলারা সব, খেয়েদেয়ে পেট পুরা
সব হারানো স্বাধীন সেনা, বিজয় নিশান এবার উড়া।
স্বাধীনতার সূর্য সেনা, মরছি ধুঁকে জেল খানায়
বুর্জোয়াদের অত্যাচারে, সবহারারা শিক্ষা পায়।
সিরাজ ভাইয়ের সৈন্য সেনা, এবার সবাই আগে বাড়
বুর্জোয়াদের রক্ত খাব, আমলা বাবুর ভাঙবো ঘাড়।
এই দেশেরই সরোস মাটি, গড়বো হাতে করবো খাঁটি
ঘাতক দলের রক্ত নিব, সবহারারা গড়বো ঘাঁটি।
পেটে যারা লাথি মেরে, দুঃস্থ মানুষ খাচ্ছে লুটে
শপথ নিয়ে দামাল ছেলে, অস্ত্র হাতে আসবে ছুটে।
বন্দি আছি তাই বলে আজ, জেল সেপাহি দিচ্ছ আঘাত
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে, শিক্ষা দিবে ভাঙবে রে দাঁত।
বাংলা আজি মুক্তি পাবে, মুক্ত হবে বন্দি রাজ
রক্ত শপথ করছি মোরা, সিরাজ শিকদার জিন্দাবাদ।

পরিশিষ্ট-২

সহযোদ্ধা আজিজুল হক খান-এর কবিতা

হানাদার তাড়াই

আয়রে আয় হানাদার তাড়াই
আয়রে আয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যাই
দেশের মাটি
তোমায় বলছে কথা কানে কানে
আয় আমার বাংলার ভাই
যুবতী যুবা পুরুষ মহিলা
গেরিলা সমরে যাই।
ওরা শোষণ করছে শাসনের নামে
ওরা দলে টানে ধর্মের নামে
ওরা খাবার কেড়ে খায় গায়ের বলে
না খেয়ে দিন আমরা কাটাই।
ওরা পশু হেন করে নারী ধর্ষণ
জনতায় করে হীন গুলি বর্ষণ
ওরা জ্বালে ঘর আর শিশুর মাথায়
পুঁতে দেয় পাপ "পাক-কেতন"
ভাল-মন্দ জানাশোনা নাই।
রেখে হাত হাতিয়ার লাথি মারে মুখে
তাড়িয়ে দিয়ে শোষণ-কল রবো মহা সুখে।
লও সবে চাকু, ছোরা, কাস্তে, কোদাল
শাবল খোন্তা যাকু কাজের বটাল
আর ওদের হাতের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে
আয়রে ওদের তাড়াই।
[রচনাকাল : ৩/৫/১৯৭১]

পরিশিষ্ট-৩

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের যে-সকল স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্বের পৃষ্ঠপোষকতা ও স্বীকৃতিতে ধন্য হেমায়েতবাহিনী

ক্রমিক নং ও নাম	পরিচিতি	মন্তব্য
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঢাকা জেল হত্যায় নিহত
তাজউদ্দিন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঢাকা জেল হত্যায় নিহত
এ.এইচ.এম.কামরুজ্জামান	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ, পুনর্বাসন, স্বরাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ বিষয়	ঢাকা জেল হত্যায় নিহত
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঢাকা জেল হত্যায় নিহত
আবদুল মালেক উকিল	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	প্রয়াত
মিজানুর রহমান চৌধুরী	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	এরশাদ প্রশাসনের প্রধান মন্ত্রী
আবদুস সামাদ আজাদ	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	শেখ হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধি
কোরবান আলী	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	
সোহরাব হোসেন	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	মুজিবনগর সরকারের বন ও পশু বিষয়ক মন্ত্রী বর্তমানে প্রয়াত
দেওয়ান ফরিদ গাজী	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	
অধ্যাপক ইউসুফ আলী	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী
কে.এম.ওবায়দুর রহমান	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	মুক্তিযুদ্ধকালে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য
মহিউদ্দিন আহমদ	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ	প্রয়াত

	সরকার	
ফণিভূষণ মজুমদার	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	প্রয়াত
গৌরচন্দ্র বালা	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	
মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	প্রয়াত
আবদুর রব সেরনিয়াবাত	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	মুজিব হত্যাকারীদের হাতে নিহত
আবদুর রাজ্জাক	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	প্রাক্তন ছাত্রনেতা শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী
আমির হোসেন আমু	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	
ডা. এস.এ. মালেক	মুক্তিযুদ্ধকালের প্রশাসক, বৃহত্তর ফরিদপুর	
কমরেড মনি সিং	চেয়ারম্যান, কমিউনিস্ট পার্টি	
অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ	চেয়ারম্যান, ন্যাপ	
জহির রায়হান	চলচ্চিত্র শিল্পী/নির্মাতা	স্বাধীনতার পর ঢাকার মিরপুরে নিহত
সুভাষ দত্ত	চলচ্চিত্র শিল্পী/নির্মাতা	
বিশপ থিজেন মন্ডল	পুরোহিত	
মোঃ শামসুদ্দিন মোল্লা	প্রাক্তন এম.পি.	
ইমাম উদ্দিন আহমদ	প্রাক্তন এম.পি.	
এম. এ. খায়ের	প্রাক্তন এম.পি.	
আক্তারুজ্জামান	প্রাক্তন এম.পি.	
কাজি আবদুর রশিদ	প্রাক্তন এম.পি.	
সতীশচন্দ্র হালদার	প্রাক্তন এম.পি.	
ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন	প্রাক্তন এম.পি.	
ইলিয়াস আহমদ	প্রাক্তন এম.পি.	
নজির আহমদ	প্রাক্তন এম.পি.	
মেজর জেনারেল এম.এ.মঞ্জুর	সেক্টর কমান্ডার, ৮ নং সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধকালে মেজর। প্রয়াত
মেজর এম.এ. জলিল	সেক্টর কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধকালে মেজর। প্রয়াত
কর্নেল শওকত আলী	জাতীয় সংসদ সদস্য	
শেখ মোশাররফ হোসেন	বঙ্গবন্ধুর চাচা	
জগলুল কাদের (জন্নু)	প্রাক্তন এম.পি.	

ডা. ফরিদ আহমদ	প্রাক্তন সভাপতি, গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগ	
কামরুল ইসলাম (রইচ)	প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগ	
নূর মোহাম্মদ বাবুল	সাব-সেক্টর কমান্ডার, ফরিদপুর	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি
তোফায়েল আহমদ	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	তদানীন্তন ছাত্র নেতা
রসরাজ মণ্ডল	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	
মুকুন্দলাল সরকার	প্রাক্তন মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	
প্রেমদাশ মল্লিক	প্রাক্তন জাতীয় ছাত্রনেতা	
অধ্যাপক আইউবুর রহমান	পলিটিক্যাল মটিভেটর	

রেফারেন্স : জেমস শ্রীদাশ শিকদার, পিতামৃত: ডা. এস.এন. শিকদার, গ্রাম: কলিগ্রাম, পো: জলিলপাড়, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ।

পরিশিষ্ট-৪

"রণাঙ্গনে হেমায়েত বাহিনী"-গ্রন্থের জন্য শুভেচ্ছা বাণী

বাঙালি জাতির মহান নেতা, বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সকল সংগঠক, বুদ্ধিজীবী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিবাদন। হেমায়েত বাহিনীকে জানাই সংগ্রামী সালাম। আত্মত্যাগ স্বীকার করে এদেশ স্বাধীন করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছেন, স্বজন হারিয়েছেন তাঁদের জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

হেমায়েত বাহিনীর সকল ঘটনাপঞ্জির সঙ্গে জড়িত ছিলেন আমার মরহুম পিতা মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক কাজি বেলায়েত হোসেন সাহেব। আমি বেদনাবিধুর চিত্তে স্মরণ করি আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে যাকে হারিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে, ভারত গমনের পথে। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

১৯৭১ সাল বাঙালি জাতির জীবনে অত্যন্ত স্মরণীয়। সে রক্ত ঝরা দিনগুলিতে এ- দেশের দামাল ছেলেরা মা-মাটির টানে জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গনে মরণজয়ী যুদ্ধ করেছে। আর সে ৯-মাসে আমরা হারিয়েছি ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ, ইজ্জত দিয়েছে ২ লক্ষ মা-বোন, হারিয়েছি অনেক সম্পদ। আর তার বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাংলার আকাশে উদিত হয় রক্তিম সূর্য।

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বে এক অনন্য ঘটনা। সশস্ত্র পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সেদিন প্রত্যেক বাঙালি রক্ত দিতে প্রস্তুত ছিল। সবাই প্রস্তুত ছিল চরম আত্মত্যাগের জন্য। জাতি ছিল সেদিন বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় নেতৃত্বে একতাবদ্ধ ও এক মনোভাবাপন্ন। পাকিস্তানি বর্বরদের হাত থেকে মুক্ত করতেই হবে প্রিয় মাতৃভূমিকে—এই শপথ ছিল সকলের। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরকে পরাভূত করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু সমৃদ্ধি, প্রগতি ও শান্তি অর্জিত হয়নি। এই ৩২ বছরেই কি জাতি সেই রক্তের কথা ভুলে গেছে! ভুলে গেছে যাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এত রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে তাঁর কথা? সেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কথা। ৭ই মার্চ, ১৯৭১ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের আহবান সমগ্র জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধ না হলে আমরা এতটা অগ্রসরও হতে পারতাম না। কেউ ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে আরোহণ করতে পারতো না। পারতাম না বিলাসবহুল দালান কোঠায় বসবাস করতে। কোনকিছুই হতো না, যদি বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ বাঙালি জাতিকে দিকনির্দেশনা না দিতেন। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে ও তাঁর আহবানেই এ দেশ স্বাধীন হয়েছে।

তাই আসুন আজ সেই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ি। তা হলেই সকল শহিদ জায়ানের আত্মা শান্তি পাবে।

কাজি আকরাম উদ্দিন আহমদ
চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকিং লিঃ
চেম্বার বিল্ডিং, মতিঝিল, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৫

মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণে কয়েকজন সহযোদ্ধার কথা
হেমায়েতউদ্দিন-এর বীরত্বের ঋণ পরিশোধ্য নয়

আমি সার্জেন্ট মো: কাঞ্চন শিকদার (অব.) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিলাম। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বে পাকিস্তান থেকে ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে আসি। ৭ই মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে স্বাধীনতা যুদ্ধে মেজর এম. এ. জলিলের সঙ্গে গ্রুপ কমান্ডার হিসাবে যোগদান করি এবং বরিশাল বিলেইজ পার্কে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক হিসাবে তাদের যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ দিই। বেশ কিছুদিন পরে পাক সেনারা বরিশাল শহর দখল করে। তার পর আমি ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে গিয়ে হেমায়েত বাহিনীর প্রধানের সাথে আলোচনা করে ক্যাম্পে যোগদান করি। তখন দেখি ৫ থেকে ৭ হাজার মুক্তিযোদ্ধা সদস্য তাঁর বাহিনীতে নিয়োজিত আছে। এর পরে হেমায়েত বাহিনীর প্রধান আমাকে ৬০ জনের একটি গ্রুপের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আমি এই গ্রুপটি নিয়ে বহু জায়গায় হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। যেমন ঘাগর থানা, কুরপাল্লা, পয়সারহাট, ঘোবারপার, কমলাপুর, গোপালগঞ্জ, গৌরনদী, আরও বহু জায়গায় সাফল্যের সঙ্গে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করাতে সক্ষম হই। শেষ পর্যন্ত ২১ অক্টোবর, ১৯৭১ বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার, বাটাজোর পুলিশ ফাঁড়িতে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সকাল ৮ ঘটিকার সময় সামনা সামনি যুদ্ধে আমার বাম পায়ে এল. এম. জি-র গুলির আঘাতে পা খানা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এই যুদ্ধে দুজন মুক্তিসেনা পরে পাক-আর্মির গুলিতে শহিদ হন। তাঁদের নাম মো: হাজি সোনামুদ্দিন ও মো: আর্শেদ আলি; আহত হন মো: হায়দার আলি জমাদার। পরে হেমায়েত বাহিনীর চিকিৎসা ক্যাম্পে ডাক্তার রঞ্জিত বাবু এবং ডাক্তার মোহাম্মদ আলির কল্যাণে অন্যান্যের সাথে আমার ও হায়দার জমাদারের চিকিৎসা করা হয়। কিছুদিন পরেই দেশ পাক হানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত হয়।

এ অবস্থায় আমার জানামতে হেমায়েত বাহিনীর প্রধান হেমায়েতউদ্দিন বীর বিক্রম বীরত্বের সাথে পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে 'স্বাধীন বাংলা' ঘোষণা করেন। বাংলার মানুষ কোন দিন তাঁর এই অবদানের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। সারা বাংলায় স্বর্ণাক্ষরে তাঁর নাম লেখা থাকবে এটাই আমার কাম্য।

সার্জেন্ট মো: কাঞ্চন শিকদার (অব:) ২২.৭.২০০৩
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, (যুদ্ধকালীন একটি মুক্তি-গ্রুপের ক্যাপ্টেন)
গ্রাম - আড় কাঠি, পো: গৌরনদী, থানা - গৌরনদী, জেলা-বরিশাল।

পরিশিষ্ট-৬

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক হেমায়েত বাহিনীর প্রতি স্বীকৃতির প্রামাণ্য দলিল

Monogram

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Mujibnagar

GOVERNMENT OF THE PEOPLES OF BANGLADESH
MINISTRY OF RELIEF, REHABILITATION, HOME
AND INTERIOR AFFARIS

D.O. No. HM-71/C Dated : November 17, 1971

My dear Mr. James,

I am glad to learn that you have formed an organization styled "BANGALI CHRISTIYA SAHAYAK SAMITI" with a view to helping the people of Bangladesh irrespective of caste, creed and colour. You have also expressed your unequivocal allegiance to the Govt. of the People's Republic of Bangladesh. As you know we are committed to build up a secular state, it will be much appreciated if the people inside Bangladesh do refrain from forming any organization purely on communal lines and possibly agreeing with our enunciated policy you have decided to help all the people through the Govt. of Bangladesh.

In case you go for collection you will please maintain strict account of the same and hand over the entire articles, materials, money etc. to the Relief Commissioner, Govt. of Bangladesh against clear receipt. You will also maintain close touch with the Relief Commissioner and do nothing against the principles and policies laid down by him.

Thanking you.

Yours sincerely,

(A.H.M. Karruzzaman
Minister
for Relief, Rehabiliation, Home
& Interior Affairs.

Mr. James Christdas Sikdar,
President,
BANGALI CHRISTIYA SAHAYAK SAMITI.

পরিশিষ্ট-৭

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন

একটি দেশের উন্মেষকালের ঘটনাবহুল নির্ভেজাল সত্য ইতিহাসকে শাশ্বত ও শ্বেত পাথরে খোদাই করে রাখার প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। অঢেল মিথ্যা দিয়েও সত্যকে যেমন মিথ্যা বানানো যায় না, একইভাবে অসত্যকে চেষ্টা করেও সত্যে রূপান্তর করা অসম্ভব। নৃতত্ত্ববিদগণ হাজার হাজার বছর পূর্বের বাস্তবতা যাচাই-বাছাই ও ইতিহাসের নিরিখে বিশ্লেষণপূর্বক প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে আলোকে নিয়ে আসেন। সে অর্থে-এই তো সেদিন মাত্র বাঙালি স্বাধীন হলো-তার অসংখ্য ধারক-বাহক এখনো দিব্যি জীবিত, কর্মক্ষম এবং সক্রিয়-তাঁরা আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবেন। বাঙালির লব্ধ স্বাধীনতার ঘটনাবহুলতা এবং বেঁচে থাকা মানুষগুলো থেকে নির্ভেজাল সত্য উদ্ঘাটন করা দুরূহ হলেও কঠিন কোন বিষয় হয়ে পড়েনি।

বাঙালি জাতি ব্রিটিশ-পাকিস্তানসহ সকল বৈদেশিক শোষককুলের রাহুগ্রস্ততা থেকে শোষণমুক্ত হবার সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালায় একাত্তরের নয় মাসে। মনে হয় সেটি মাত্র গতকালের ঘটনা। ইচ্ছা করে কেউ চেপে না গেলে ভুল হবার কথা নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, সত্য ঘটনা বর্ণনা করা, বলা ও লিপিবদ্ধ করাই শ্রেয়। সত্যই সুন্দর, সত্যই চির অহংকার।

লেখকের প্রচেষ্টা সুন্দর। একইভাবে তথ্য সরবরাহকারীগণও যদি সঠিক সুন্দর তথ্য সরবরবাহ করেন তাঁহলে লেখক-পাঠকসমাজ-ভবিষ্যত প্রজন্ম সবাই সঠিক ইতিহাস ও ঘটনা লিখতে-পড়তে-জানতে সক্ষম হবেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে লেখক-সম্পাদক-প্রকাশকের অবিরাম প্রচেষ্টা এবং অদম্য ইচ্ছার প্রতি রইল আমার সংগ্রামী অভিনন্দন। লেখক নিজেও একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাংলার মানুষ ও বাংলার ভূমিকে স্বাধীনতা এনে দিতে সফল বীরত্ব দেখিয়েছেন বলেই তিনি একজন বীরপ্রতীক।

তাঁর প্রয়াস সফল হোক। বাঙালি জাতি উপহার পাক মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস।

৫/১১/২০০৩

আশালতা বৈদ্য

মহিলা কমান্ডার, হেমায়েত বাহিনী

পরিশিষ্ট-৮

এক শহিদ তনয়ার অনুভূতি

[ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি)-এর ছাত্রছাত্রীদের তথ্যাদি দেখছি। তথ্যের বহরে সাক্ষাৎ পেলাম ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্মুখ সমরে শাহাদত বরণকারী এক বীর যোদ্ধার কন্যার। তাঁকে খুঁজে এনে "একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েতবাহিনী" বইটির খসড়া তুলে দেয়া হলো অনুভূতি জানার জন্য। নিম্নে সে-অনুভূতিই উপস্থাপিত হলো।]

শ্রদ্ধাভরে আপনাকে জানাই ২০০৩ সালের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। আমি আপনার পাণ্ডুলিপি পড়েছি। উপলব্ধি করেছি বেদনা, আনন্দ, মুক্তিযুদ্ধের মর্মকাহিনী। আমি মুক্তিযুদ্ধের অনেক বই পড়েছি কিন্তু এমন অনুভূতি কারও বইয়ে খুঁজে পাইনি। সত্যিই আপনার নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ ও লেখার ভাষা ও উপস্থাপনা-নৈপুণ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনি রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত একজন মুক্তিযোদ্ধা। আপনার সাহসী কলম ও ভাষার দিক থেকে এ-প্রচেষ্টা অনন্যতার দাবি রাখে। এ-গ্রন্থের সম্পাদনাও প্রশংসার দাবি রাখে। মহান প্রভু আপনাদের আশা পূরণ করুন এ-প্রার্থনাই করি।

আমি মুক্তিযুদ্ধের একজন শহিদ-এর কন্যা। স্বাধীনতা যুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর একজন বীর সাহসী যোদ্ধা হিসেবে ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ আমার পিতা ফরিদপুরের মাটিতে সম্মুখ-যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। আমি তখন ৫/৬ বছরের শিশু মাত্র। এই মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাকে করেছে স্বাধীন। বিনিময়ে এ-স্বাধীনতা পিতৃস্নেহ থেকে আমাকে করেছে বঞ্চিত। মাকে করেছে বিধবা। আর এতটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি স্বাধীন বাংলা। আমাদের এনে তুলেছে এক বস্তিতে। চির দুঃখিনী মা শহিদের বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও দুটি শিশু কন্যা বুকে জড়িয়ে ধরে ভাসতে শুরু করেন শ্যাওলার মতন। আজ আমরা ঢাকার মুক্তিযোদ্ধা বস্তিতে কোনরকমে মাথা গুঁজে আছি। এখানে নেই পানি, গ্যাস, উপযুক্ত ঘর-দরোজা, এটাই কি ছিল স্বাধীনতার কাছে শহিদ পরিবারের জন্য মহান উপহার?

হায়রে দেশ! বত্রিশ বছরেও পারোনি শহিদ পরিবারকে দিতে একটু বাসস্থান! লেখকের ধারালো কলমে 'গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েতবাহিনী'র ইতিহাসের সঙ্গে এ-ফরিয়াদ যেন জাতির কাছে উপস্থাপিত হয়। এ-লেখা যেন আজকের জাতি, যুবক, ছাত্র সমাজকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত করতে সহায়ক হয় এটাই কামনা করি। আর দোয়া করি হেমায়েতবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতার জন্য। মহান আল্লাহ সকলকে রোগমুক্ত করুন। আমিন।

চম্পা আখতার, পিতা: শহিদ ওসমান শেখ, মাতা: আলেয়া শেখ, ৩/৮ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা। আইইউবিএটিতে 'ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর শিক্ষার্থী। আইডি নম্বর : ০৪১০১০০১।

[লেখকের নোট : কন্যাসম অসুস্থ ছাত্রীকে দেখতে গিয়ে দুঃখ-বেদনা-গর্বে হতবাক হই। মানবেতর জীবন যাপন করছেন শহিদ কন্যা। রাজধানী ঢাকার বুকে শহিদ পরিবার কমপ্লেক্স-এর ভেতরে প্রবেশ করলে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন। অসংখ্য নির্মমতার সাক্ষ্য বহন করছে এই মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স। বহুতর খেতাবপ্রাপ্ত বীর যোদ্ধা সপরিবারে এখানে বসবাস করেন। খোদ ঢাকার বুকে এঁদের এই অবস্থা হলে অদেখা-গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।]

পরিশিষ্ট-৯

অনারারি ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদ মিয়া (অব.)

এই গেরিলা সৈনিকের জন্ম ৮ জানুয়ারি ১৯৫২, মাদারিপুর জেলার কুমড়াখালি, পিতা মুনশি আবদুল হামিদ, ১৯৬৯ সালের ১২ মার্চ, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ভর্তি হন। চট্টগ্রামের ইবিআরসিতে তাঁর সৈনিক প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর কর্ম জীবনের প্রথম পোস্টিং ইবিআরসি রেকর্ড শাখায়।

সময়টা প্রাক-মুক্তিযুদ্ধকাল; প্রশিক্ষণ শেষে ২২০০ বাঙালি সৈনিক শপথ প্যারেডের অপেক্ষায়। এ-সব সৈনিকের সাহায্যে ৯, ১০, ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রেইজিং-এর প্রস্তুতি চলছিল। শুরুতে যা সম্ভব হয়নি, মুক্তিযুদ্ধের চলমানতায় তাদের ব্যাটালিয়ন রেইজিংয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়।

১৯৭১ সাল। ২৫ মার্চের ভয়াল রাতে ঘুমন্ত বাঙালি সৈনিকদের ওপর অতর্কিত পাকিস্তানি হামলার ঘৃণ্য ঘটনা ইতিহাস বিদিত। উপযুক্ত অফিসার-এর নির্দেশনা ও নেতৃত্বের অভাবে ইবিআরসি'র বাঙালি সৈনিকদের প্রতিরোধ হামলা ব্যর্থ হয়। বস্তুত, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তেমন প্রতিরোধযুদ্ধ করার আদলে গড়েও উঠেনা। যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন, এতো বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রিক্রুট-সৈনিক কেবল নেতৃত্বের অভাবেই শত্রু-আক্রমণ প্রতিরোধের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়, এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

ইবিআরসি'র পিছু হটে আসা সৈনিক ইপিআর, আনসার, পুলিশ এবং যুদ্ধমাণ ছাত্র-জনতার সঙ্গে মিশে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তদানীন্তন তরুণ সৈনিক আবদুর রশিদ মিয়া তাৎক্ষণিক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। চট্টগ্রাম রক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিরোধযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ব্যর্থতায়ও দমে যাননি তিনি। রেলওয়েতে কর্মরত ফরিদপুরের নড়িয়া থানার জনৈক আবদুল হাই-এর স্ত্রী ও দুটি শিশু সন্তান রক্ষার উদ্যোগ নেন। এক পর্যায়ে সে-সব দুঃস্থ অসহায় নারী ও শিশুদের নিয়ে দুস্তর বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে তিনি পৌঁছেন গ্রামের বাড়ি। মুক্তিযুদ্ধপর্বে বাঙালির পারস্পরিক সহমর্মিতার এমন্তা এক নমুনা মাত্র।

চট্টগ্রাম সেনানিবাসে রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়া অগণিত সৈনিকের সঙ্গে নিজের সন্তানও মৃত ভেবে রশিদের পিতা রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে পাগলের মতো কেঁদে বেড়াতেন। এমনি না পাওয়ার পাওয়া সন্তানকে অভাবিতভাবে পেয়ে আকাশের চাঁদ পাওয়ার আনন্দে আপ্লুত হন তিনি।

আবদুর রশিদের পিতা মুনশি আবদুল হামিদ বরাবরই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। পরবর্তীকালে আবদুর রশিদের হেমায়েতবাহিনীতে যোগদান (এপ্রিল ১৯৭১) বেশ খুশির সঙ্গে গ্রহণ করেন তাঁর পিতা। হেমায়েত বাহিনীতে যোগদানের পর আবদুর রশিদের কাছে মনে হয় এটাই একজন যোদ্ধার সঠিক ঠিকানা।

"জীবন বাজি রেখে বহু দুঃসাহসিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি আমি। আমার প্রিয় যোদ্ধা হেমায়েতউদ্দিনের সাহসী নেতৃত্বে হেমায়েতবাহিনী গোটা কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। আমি বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল নক্ষত্র বীর যোদ্ধা হেমায়েতউদ্দিন, বীর বিক্রম-এর সংগ্রামী সঙ্গী হিসাবে অতি নিকটে থেকে তাঁর শৌর্য, বীর্য, রণকৌশল, যুদ্ধ-পরিচালনাসহ অদম্য উৎসাহ ও সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করেছি। মুমূর্ষু যুদ্ধাহত যোদ্ধাটি মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধ-নির্দেশনা থেকে বিরত থাকেননি। বরং আহত হবার পরপরই যেন তাঁর সুপ্ত শৌর্য-বীর্যের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে। আহত বাঘের থাবা বিস্তার করে পূর্বের চাইতে অধিক উদ্যমে তিনি শত্রুর ওপর আপতিত হন। তাঁর বীরত্বের বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত করা সম্ভব নয়।

"হেমায়েত যখন আহত, খাওয়ানো থেকে শুরু করে তাঁর অনেক কাজই আমার করে দেবার সৌভাগ্য হয়েছে। এ-ছাড়া তাঁর নিকটাত্মীয়দের অনেকেই সার্বক্ষণিকভাবে বাহিনী প্রধানকে সাহচর্য দিতেন।

তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল অসীম। গ্রাম থেকে মুক্তিপাগল যুবকদের এনে প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি বিশাল যোদ্ধা-বাহিনী তিনি গড়ে তোলেন। তাঁর দলের প্রত্যেকেই ছিলেন জানবাজ যোদ্ধা। আমি ছিলাম

হেমায়েতবাহিনীর সাড়ে পাঁচ হাজার যোদ্ধার দলিল-দস্তাবেজ রক্ষণাবেক্ষণকারী ও অফিসিয়াল কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত। এ-সবের বাইরে গোলাবারুদ ও খাদ্য-সামগ্রীর হিসাব-নিকাশ রাখাসহ প্রশাসনিক অনেক দায়িত্বও আমাকে পালন করতে হয়েছে। অন্যান্য যাঁরা আমার সঙ্গে প্রশাসনিক ও সেক্রেটারিয়েল কাজকর্ম করেছেন, তাঁরা হলেন: হেড ক্লার্ক হাবিব (ইপিআর), হাবিলদার গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। স্পেশাল বাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট লেফটেন্যান্ট আহসান হাবিব-এর মত যোগ্য নেতৃত্বের সহযোগিতার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ।

"যুদ্ধদিনের আবেগময় সহমর্মিতার কিছু স্মৃতি মনকে আলোড়িত করে। সম্ভবত আগস্ট মাসের কোন একদিনের কথা। কমান্ডারের নির্দেশে যুদ্ধাহত দুজন মুক্তিযোদ্ধার নিরাপদ আশ্রয় ও মর্টার গোলা আনতে নৌকাযোগে রামদিয়া কলেজে অবস্থিত ক্যাপ্টেন বাবুলের ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হই। রোজার দিনে রোজা রেখেছি। মাঝি ও আমরা তিনজন পথিমধ্যে রাজাকার ও পাক-বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে চান্দার বিলের খারপ্রান্তে এসে পৌঁছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সাথে কোন খাবার নেই। এক বাড়ির লোকজন কৌতূহলবশত আমাদের অবস্থা জেনে কিছু ভাত দেন। যার দ্বারা দুজনের এক-বেলা কোন মতে আহার হতে পারে। অথচ চারজন খাওয়ার পরও ভোর রাতে এক আহত সঙ্গী ডাকছেন, 'ভাইয়া সেহরি খাবেন না?' তিনি বললেন: 'আমরা জানি আপনি রোজা থাকবেন, তাই কিছু ভাত পানি দিয়ে রেখে দিয়েছি।' ভালবাসার সহমর্মিতার এ এক অপূর্ব নিদর্শন। আনন্দ ও আবেগে নিজের অজান্তে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আহত যোদ্ধা তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যাবার কথা চিন্তা না করে, নিজে না খেয়ে রোজায় আমার কষ্টের কথা ভেবে ভাত রেখে দিয়েছেন। এ অভূতপূর্ব আন্তরিকতা কি কেউ কখনো ভুলতে পারে! আজ আমার সে-সব সঙ্গীরা কোথায় জানিনা। এমনিতর আছে আরো বহু স্মরণীয় ঘটনা। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মরতে মরতেও বেঁচে যাওয়ার আরও কত না ঘটনা রয়েছে। স্বল্প পরিসরে সে সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বারান্তরে প্রকাশের জন্য সে-সব উহ্য রইল।

"বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ হানাদার মুক্ত হয়। পূর্ণ মুক্তির স্বাদ পেলাম। এক সময় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে দেখার সাধ জাগলো। হেমায়েত ভাইয়ের সঙ্গে ঢাকা এলাম। স্বপ্নের মানুষটিকে দেখার জন্য ধানমন্ডি বাড়ির সামনে সুশৃংখল সৈনিকের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রত্যেকের কাঁধে নিজ নিজ অস্ত্র। আমাদের আগমন ও দেখা করার অনুমতি আগেই হয়েছিল। তিনি এলেন। আমাদের সামনে আসতেই আবেগে সকলেই কেঁদে ফেললেন। বঙ্গবন্ধু পিতৃস্নেহে সকলকে বুকে টেনে নিলেন। আদর মাখা দরাজ কণ্ঠে বললেন, 'ওরে তোরা কিছু খেয়েছিস? বাবা কামাল (তাঁর বড় ছেলে) দেখতো ছেলেরা দেশ থেকে এসেছে। ওরা বোধ হয় কিছু খায়নি। ওদের খাবার ব্যবস্থা কর'। সুধার মত স্নেহমাখা এ বাণী আজো আমার মর্মে বেজে ওঠে। এরপর বঙ্গবন্ধুর পিতা-মাতার দোয়া নিয়ে চলে আসি।

"স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করি। দীর্ঘ ৩৩ বছর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করি। কর্মজীবনের সাফল্যের পুরস্কারে অনারারি ক্যাপ্টেনের সম্মাননা পাই। ১৪ এপ্রিল ২০০২ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করি।

"আমার তেত্রিশ বছর চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতার উপলব্ধিতে নির্দ্বিধায় বলছি: আমার প্রিয় হেমায়েত বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের অংশ গ্রহণকারী একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল, যার নেতৃত্বে ছিলেন সেই অকুতোভয় বীর সৈনিক হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম। অতি নিকট থেকে দেখা আমার প্রিয় অধিনায়ককে কোনদিন ভুলবো না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন কোন ইউনিটও এত সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে কি-না জানিনা। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সেনাকে নিয়মিত বেতন পরিশোধ করা হতো। তৎকালীন পাকবাহিনীর একজন কমিশনড্ অফিসারসহ বহুসৈনিক, পুলিশ, ইপিআর, মোজাহিদ, ছাত্র, যুবক, কৃষক ও সাধারণ জনতার সমন্বয়ে গঠিত হেমায়েতবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এ-বাহিনীর কমান্ডার হেমায়েতউদ্দিন, বীর বিক্রম অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। আমি তাঁর সর্বাংগীন মঙ্গল ও নিরাময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।"

আনারারি ক্যাপ্টেন মো: আব্দুর রশীদ মিয়া (অব.)
সাভার গলফ ক্লাব
সাভার, ঢাকা। ফোন: ৭৭০৮০২৬

পরিশিষ্ট-১০

হেমায়েত কমান্ডারদের মতামত

"একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলাযুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী" শীর্ষক গ্রন্থের প্রাক-প্রকাশনা এর ওপর ২৬ (ছাব্বিশ) জন প্রত্যক্ষ যোদ্ধা, কমান্ডার, সহকারী কমান্ডার প্রমুখের স্বাক্ষরসহ মতামত :-

গ্রন্থকার ও সম্পাদকের উদ্দেশ্যে, 'আমরা মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েতবাহিনীর গ্রুপ কমান্ডারবৃন্দ আপনাদের উষ্ণ শুভেচ্ছার সাথে ঈদ মোবারক জানাই"। আমরা জানতে পারলাম যে আপনি মুক্তিযুদ্ধ-বিখ্যাত হেমায়েত বাহিনীর ইতিহাস প্রণয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সত্যিই এটা একদিকে প্রশংসনীয়, অন্যদিকে আমরা গর্ববোধ করছি। এ-কাজের জন্য আপনি ও গণ-প্রতিষ্ঠিত হেমায়েত বাহিনী বাংলার মাটিতে চির অমর হয়ে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে জনগণ একান্ত বন্ধু হিসাবে কাছে পেয়েছিল হেমায়েত বাহিনীকে। হেমায়েত বাহিনীর অভিযান শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের ঠিক দুর্যোগময় মুহূর্তে। যখন বাস্তবে কোন মুক্তিযোদ্ধা সৃষ্টি হয়নি তখনই সেনাবাহিনীর কিছু সাহসী বাঙালি বীর জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান। শুরু করেন মরণ-পণ মুক্তিযুদ্ধ। সংগঠিত করেন শত শত দামাল ছেলেকে। হেমায়েত বাহিনীর ফৌজের প্রাথমিক প্রতিরোধ তিন পর্যায়ে সংগঠিত হয় :-

ক। স্থানীয় দালাল গোষ্ঠী যাতে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্যে চরম তৎপরতা;

খ। স্বাধীনতাকামী জনগণকে সুসংগঠিত করা ও দালাল গোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত রাখা; এবং

গ। পাক হানাদার বাহিনীকে সন্ত্রস্ত রেখে তাদের মোকাবেলা করা।

প্রথম পদক্ষেপে বাংলার মাটিতে এ ধরনের প্রতিরক্ষা গড়ে না উঠলে দালাল আর পাক বাহিনী দেশের প্রতিটি ঘরে তাদের দোসর বানাতে সক্ষম হতো। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত কিংবা গতি ব্যাহত হতো। পরিণতিতে প্রবাসী সরকার গঠন করেও বিশেষ কিছু করতে পারাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ মুক্তিযোদ্ধাদের চাপ সৃষ্টির কারণে উৎসাহিত হয়ে গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্তির জন্য লড়াকু হতে পারতোনা। এছাড়া হেমায়েত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের মত অভ্যন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করার কারণে পাক বাহিনী সন্ত্রস্ত ও ভীত ছিল। পাক বাহিনী হেমায়েত অঞ্চলের ভিতরে ঢুকে সশস্ত্র সন্ত্রাসে তাদের কর্মতৎপরতা চালাতে ভয় পেতো।

তাই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা-পর্ব থেকে হেমায়েত বাহিনীসহ যাঁরাই অভ্যন্তরে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাঁদেরই আমরা প্রথম সারির মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে মনে করি। কারণ, যাঁরা প্রবাসে গিয়ে মিত্র দেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, আমাদের জানা মতে তাঁদের কেউই ১৯৭১-এর আগস্ট মাসের পূর্বে ফিরে আসেননি। ইতিহাসের পাতায় এ-সত্যটুকু তুলে ধরার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

যুদ্ধের শুরু থেকে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধে জারি না-থাকলে প্রবাসী সরকার গঠিত হতে বা প্রবাসে প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়া-আসায় ভাটাপড়ে যেতো। অন্তত পক্ষে জুলাই মাসের পূর্বে ভারতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়নি। তাই জুলাই মাস পর্যন্ত যাঁরা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে যারা পাকা হানাদার বাহিনী ও দালাল গোষ্ঠীকে দাবিয়ে রেখেছেন তাঁরাই মুক্তিযুদ্ধের বেশি প্রশংসিত বলে মনে করি।

আপনি "একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী" সম্পর্কে যে ধারালো কলম ধরেছেন সত্যিই "ইহা একটি সাহসী পদক্ষেপ। আপনার এ-পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাস বেরিয়ে আসবে।" বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রজন্ম ১৯৭১-এর ভয়াল দিনগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে। অবহিত হতে পারবে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। আপনার তীক্ষ্মধার লেখনি সঠিক ইতিহাস তুলে ধরুক এটাই আমাদের কাম্য। সেই সঙ্গে মাননীয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সা'দাত আলী ও আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। পরিশেষে আপনাকে ও সম্পাদক মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করে ইতি টানছি। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন।

হেমায়েত বাহিনীর গ্রুপ কমান্ডার ও কয়েকজন যোদ্ধার (১৯৭১) নাম ও স্বাক্ষর :

ক্রমিক নং	নাম	পদ	স্বাক্ষর
১.	মকবুল হোসেন দাড়িয়া	গ্রুপ কমান্ডার	
২.	শেখ আবদুল খালেক	ট্রেনিং কমান্ডার	
৩.	আবদুল জলিল দাড়িয়া (লাল মিয়া)	সহকারী কমান্ডার	
৪.	শাজাহান শিকদার	সহকারী গ্রুপ কমান্ডার	
৫.	কামাল আহমেদ	সহকারী কমান্ডার	
৬.	গিলবার্ট নির্মল বাইন	মুক্তিযোদ্ধা	
৭.	পিতর বাইন মাঝি	মুক্তিযোদ্ধা	
৮.	চান মিয়া শেখ	মুক্তিযোদ্ধা	
৯.	ফরমনা আলী শেখ	সহকারী কমান্ডার	
১০.	লিয়াকত শাহ	মুক্তিযোদ্ধা	
১১.	মো: মসুর আলী শেখ	সহকারী কমান্ডার	
১২.	মোরশেদ আল তালুকদার	সহকারী কমান্ডার	
১৩.	বিদ্যাধর শিকদার	মুক্তিযোদ্ধা	
১৪.	মোঃ খোকন সরদার	সহকারী কমান্ডার	
১৫.	খালেক মোল্লা	মুক্তিযোদ্ধা	
১৬.	আশরাফ আলি শেখ	কমান্ডার	
১৭.	আবু তালেব শেখ	মুক্তিযোদ্ধা	
১৮.	মোদাচ্ছের খান	মুক্তিযোদ্ধা	
১৯.	আকব্বর মোল্লা	মুক্তিযোদ্ধা	
২০.	মোঃ মোসলেম মোল্লা	মুক্তিযোদ্ধা	
২১.	গোপাল বাইন	মুক্তিযোদ্ধা	
২২.	গাজি কুদ্দুছুর রহমান	মুক্তিযোদ্ধা	
২৩.	আইয়ুব আলি শিকদার	সহকারী কমান্ডার	
২৪.	আবদুস ছাত্তার খাঁন (নায়েব সুবেদার অবসরপ্রাপ্ত)	কমান্ডার	
২৫.	সরদার সাহাবউদ্দিন (মোহন)	মুক্তিযোদ্ধা	
২৬.	আবুল কালাম আজাদ (সদস্য সচিব, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কোটালি পাড়া)	মুক্তিযোদ্ধা	

গ্রন্থকারের নোট

মান্যবর হেমায়েত বাহিনীর যোদ্ধা-কমান্ডারগণ মিত্রদেশ ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলছি। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় আর্মির হাতে সুসংবদ্ধ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলছেন। ভারতে বিহার রাজ্যের চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পাওয়া গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তা যথার্থ। জুলাই, ১৯৭১-এর পূর্বে প্রশিক্ষণ পাওয়া গ্রুপ সম্ভবত বের হয়নি।

তবে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ বিষয়ে ভিন্নতর সত্যনিষ্ঠ তথ্য আছে। মে, ১৯৭১-এর দিকে বাংলাদেশের বেনাপোল বর্ডার সংলগ্ন ভারতের বনগাঁয় ছাত্রদের ফুটড্রিল ধরনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ চালু করেন ৮নং সেক্টর 'ই' কোম্পানির ক্যাপ্টেন/প্রফেসর মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ ওরফে ক্যাপ্টেন টপচি (ছদ্মনাম)। প্রশিক্ষণার্থীদের পঞ্চাশ (৫০) টাকা পকেট মানি দেয়া হতো। ৮নং সেক্টরের প্রতিষ্ঠাতা সর্বাধিনায়ক মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর আশীর্বাদে এ প্রশিক্ষণ চলে। সেক্টর কমান্ডার-এর নির্দেশে কলেজ প্রফেসরের হাজিরা খাতার আলোকে প্রশিক্ষণ মাঠে উপস্থিতির বিচারে পকেট মানি বিতরণ করা হতো। নড়াইলের গণপ্রতিনিধি লে: (অব.) মতিউর রহমান তাঁদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও পকেট মানি বিতরণ না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এখানে ছাত্রদের গ্রেনেড খোলা/জোড়া/ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্টেন ও থ্রি-নট-থ্রি ব্রিটিশ রাইফেলের উপরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সহায়তায় মে, ১৯৭১-এর শেষ দিকে বনগাঁর অদূরে ভারতের মোস্তফাপুর বিওপি'র বিপরীতে রাতের আঁধারে দখলদার দেশের গেরিলা আক্রমণ পরিচালিত হয় মুক্তিযোদ্ধা আর্টিলারি ক্যাপ্টেন এ.টি.এম. সালাহউদ্দীন, আর্টিলারি (চট্টগ্রাম) উদ্যোগে। পরবর্তীতে ৮নং সেক্টর 'ই' কোম্পানি সাতক্ষীরার বিপরীতে হিংগলগঞ্জ, সাতক্ষীরার বর্ডার ভাদিয়ালি গ্রামের বিপরীতে চব্বিশ পরগণার হাকিমপুরে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ চালায় বাংলাদেশের ভিতরে। মুক্তির নৈশ অভিযানের আড়ালে দিনে নিজ কোম্পানির অস্ত্র প্রশিক্ষক ওস্তাদের সাহায্যে ছাত্র যুবকদের স্টেন/রাইফেল/গ্রেনেড খোলা/জোড়া/ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছিল 'ই' কোম্পানি। দিনে ও রাতের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে গুটিংয়ের প্রশিক্ষণ চলত। হাকিমপুরের যুব/ইউথ শিবিরে ছাত্র/ যুবকরা থাকতো ও আহার করতো। তাই তাদের প্রশিক্ষণ দিতে 'ই' কোম্পানি কমান্ডারদের বিশেষ অসুবিধা হতো না। এসব প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সাহসের বিচারে উত্তীর্ণদের কমান্ড সার্টিফিকেটে নিয়মিত যোদ্ধার খাতায় আনা হতো। সোজা কথায় নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধা বলতো। তখন তাদের রেশন, অস্ত্র, পকেটমানি, বস্ত্র, ঔষধ-চিকিৎসা নিয়মিত ফৌজের আদলে হতো। তারা নিয়মিত আর্মি শৃংখলায় আসতো।

বেনাপুল বার্ডার থেকে সাতক্ষীরা ভোমরা বার্ডার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ভাদিয়ালি কাকডাঙ্গায় একটি মাত্র মুক্তিকোম্পানির অবস্থান। এক কোম্পানির এই বিশাল দখলদার দেশের যুদ্ধ এলাকা সামাল দেয়া দুরূহ। বেনাপুল-ভোমরার মাঝে অপর একটি কোম্পানি মোতায়েনের উর্ধ্বতন বাংলাদেশ ও ভারতীয় কমান্ড পর্যায়ের সিদ্ধান্ত হয়। ভারতীয় বি.এস.এফ. জুন, ১৯৭১-এর মাঝে দুশ (২০০) বাংলাদেশ ত্যাগী ছাত্র/যুবকদের যথারীতি সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়। তাদের কসম প্যারেড হয়। প্রতিটি যোদ্ধাকে একটি করে রাইফেল, বেডিং ধরনের সবকিছু দেয়া হয়। শুধুমাত্র একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসারের অভাবে স্বতন্ত্র কোম্পানি খাড়া করা যায়নি। পরে সে সব প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অন্যান্য কোম্পানিতে বণ্টন করে দেয়া হয়। ৮নং সেক্টরের একটি মাত্র কোম্পানির প্রশিক্ষণ তৎপরতায় বিষয় বলা হলো। ৮নং সেক্টরের অন্যান্য কোম্পানিগুলিতেও প্রায় একই অবস্থা বিরাজ করেছে। অন্যান্য সেক্টরের একই ধরনের বিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ চালু ছিল। আগরতলায় মুক্তি অফিসার মেজর হায়দার যাঁদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তাঁরা তাঁদের কীর্তিতে খ্যাত। গেরিলা যুদ্ধ জগতের দুর্ধর্ষ অপারেশনে ঢাকার বুকে প্রলয় নাচনের তাণ্ডব নাচায় হায়দার-গ্রুপের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা-যোদ্ধা গ্রুপ। পাক-প্রশাসনের দুর্গ ঢাকার আর্মিদের আগরতলা ট্রেইন্ড হায়দার গ্রুপ টুপির তলা দেয়ে মালামাল রাখার তাকের আড়ালের মত লুকানোর স্থান দেখিয়ে ছাড়ে।

হেমায়েত বাহিনীর কমান্ডারদের অভ্যন্তরীণ গেরিলা সংগঠনের গৌরব যথার্থ। দেশের গভীরে গেরিলা যোদ্ধাদের জুলাই/আগস্ট, ১৯৭১-এর পূর্বে প্রবেশ না করা সম্পর্কে তাদের ধারনাও তথ্য ও সত্যনিষ্ঠ। আগস্ট, ১৯৭১ পূর্বে মুক্তি অফিসারদের হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধারা বর্ডার সংলগ্ন দখলদার বাংলাদেশে অ্যাম্বুশ, রেইড, প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেছে। তবে জুন, জুলাই, আগস্ট-১৯৭১-এর পূর্বে হেমায়েত বাহিনী বা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ বাহিনীর নিয়মিত মুক্তিসেনার যুদ্ধ প্রশিক্ষণ হয় নাই ভাবার ধারনাটাই ভুল। সে ভুল ভাঙানোর প্রয়োজনে এ প্রসংগ।

পরিশিষ্ট-১১

মতামত : গ্রুপ কমান্ডার এম.ই.এ. কামাল

'একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী গ্রন্থের লেখক কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ, বীর প্রতীক-এর জন্য রক্তিম শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী সালাম। সম্পাদক মোহাম্মদ সা'দাত আলীর জন্য রইল উষ্ণ ভালবাসা।

৩২ বছর পেরিয়ে গেল, জাতি স্বাধীনতা পেয়েছে। কমবেশি হলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অনেক লেখকই লিখেছেন। আপনার রচিত রণাঙ্গনে হেমায়েত বাহিনী গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পড়ে সত্যিই মনে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। আপনার সংগ্রামী তীক্ষ্ণ কলম হেমায়েত বাহিনীর ইতিহাসকে জাতির কাছে চির উজ্জ্বল অক্ষয় করে রাখুক এটাই কামনা।

আমি ১৯৭১ এর রক্তঝরা দিনে হেমায়েত বাহিনীর সক্রিয় যোদ্ধা ছিলাম। হেমায়েত বাহিনী প্রধান আমার কর্মতৎপরতা ও সাহসিকতার জন্য আমাকে গ্রুপ কমান্ডার (ক্যাপ্টেন) হিসাবে নিযুক্ত করে ভারতে পাঠান। আমি ৮নং সেক্টরের প্রতিষ্ঠাতা সেক্টর কমান্ডার মেজর (পরবর্তীকালে লে: কর্নেল) আবু ওসমান চৌধুরী, দ্বিতীয় সেক্টর কমান্ডার মেজর (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) এম এ মঞ্জুর, ৯নং সেক্টরের প্রতিষ্ঠাতা সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল-এর মত সেনানায়কদের মাধ্যমে হেমায়েত বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। হেমায়েত বাহিনী প্রধানের যুদ্ধ শৌর্যে আমি বিমুগ্ধ। হেমায়েত বাহিনীর বিস্তারিত তথ্য আমি ৮ ও ৯নং সেক্টরকে জানাই। পরে ৮ ও ৯নং সেক্টর হেমায়েত বাহিনীকে স্বীকৃতি দেয়। বাহিনী প্রধান হেমায়েতকে অত্র যুদ্ধ-অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করে। আমার মারফত হেমায়েত বাহিনীর জন্য প্রচুর অস্ত্র-গোলাবারুদ ধরনের যুদ্ধ-উপকরণ পাঠায়। সেপ্টেম্বর, ১৯৭১-এর দিকে আমার দৌত্যে ৮ ও ৯ নং সেক্টর হেমায়েত বাহিনীর জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট পাঠায়। অনেক গোপনীয় তথ্য সংকেত বার্তার মত পত্র আমার হাত দিয়ে বাহিনী প্রধান হেমায়েত সমীপে পৌঁছে। আমার মত বাহকের পক্ষে গোপনীয় তথ্যাদি তখন জানা ছিল না। কারণ আমি ধরা পড়লেও যাতে সংবাদের তথ্য প্রকাশ না পায়। সেপ্টেম্বরের পর থেকে আমি হেমায়েত বাহিনী প্রধানের কমান্ডে গ্রুপ কমান্ডার হিসাবে যুদ্ধ করি। একাধিক যুদ্ধে সাহস ধৈর্য ও স্থৈর্যের অগ্নি পরীক্ষায় হেমায়েত বাহিনীর সুনাম বৃদ্ধির সাথে বীর যোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিনের পূর্ণ আস্থা অর্জনে সক্ষম হই।

আমি আল্লাহতায়ালা সর্বশক্তিমানের কাছে আপনার ও সম্পাদক সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনা করি। বাহিনী প্রধান হেমায়েতউদ্দিন, বীর বিক্রমের সমস্ত রোগমুক্তি কামনাসহ ও তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

এম.ই.এ কামাল
৭১-এর গ্রুপ কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী
ও সভাপতি, জয়বাংলা বাস্তবায়ন পরিষদ, ঢাকা, বাংলাদেশ
০৫-১২-২০০৩

পরিশিষ্ট-১২

একটি আহ্বান

রণাঙ্গনের সাথী ও বন্ধুগণ

আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনারা অনেকেই জানেন আবার কেউ কেউ নাও জানতে পারেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় হেমায়েত ভাই আজ কঠিন রোগ শয্যায় শায়িত। হেমায়েত উদ্দিন (বি.বি.) যিনি মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে এ-অঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত বাহিনী প্রধান সর্বোপরি যুদ্ধে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজের নয়টি দাঁত বিসর্জন দিয়ে দুর্ধর্ষ পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করেছেন, শত্রুমুক্ত করে দেশকে স্বাধীন করেছেন, তিনি আজ ঢাকাস্থ ১টি হার্ট ফাউন্ডেশন ক্লিনিকে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। দেশের অন্যতম স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ দ্বারা কঠিন অস্ত্রোপচারের জন্য অপেক্ষমাণ। তার পরেও শয্যাগত অবস্থায় তিনি দেশ, জাতি ও মুক্তিযোদ্ধার জন্য নানাভাবে চিন্তিত।

আসুন আমরা সকলে মিলে মহান রাব্বুল আলামিন/ঈশ্বরের পাক দরবারে সেই মহান নেতার আশু রোগ মুক্তির জন্য দোয়া ও আশীর্বাদ করি। আশা করবো আমাদের নেতা প্রিয় হেমায়েত ভাই যেন অচিরেই সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন। আবার যেন আমরা তাকে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনার কাণ্ডারি হিসাবে আমাদের মাঝে ফিরে পাই।

আবুল কালাম আজাদ
সাংগঠনিক কমান্ডার, কোটালিপাড়া উপজেলা কমান্ড
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।

[চিঠিটি জনাব হেমায়েতউদ্দিন বীর বিক্রম হয়ে লেখক মারফত ৫ আগস্ট ২০০৩ তারিখে সম্পাদকে কাছে পৌঁছে।]

পরিশিষ্ট-১৩

বরাবর
কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, বিপি
লেখক : 'একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী'
জনাব,

বিজয়ের মাসে আপনাকে জানাই রক্তিম সালাম ও শুভেচ্ছা। আমি জানতে পারলাম 'একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী' বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আপনাকে ও সম্পাদক মহোদয়কে গোপালগঞ্জ জেলা ইউনিট কমান্ডের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য হোক, এটাই আমাদের কাম্য।

আর প্রকাশ থাকে যে, গোপালগঞ্জের গেরিলা যোদ্ধাদের আপনার লেখনিতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

ধন্যবাদান্তে,

শেখ আজাদুর রহমান
২৯/১২/২০০৩
আহবায়ক
গোপালগঞ্জ জেলা ইউনিট কমান্ড
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

পিতা মুক্তিযোদ্ধা নওয়াব আলী শেখ
গ্রাম : হরিদাসপুর
থানা ও জেলা : গোপালগঞ্জ।

পরিশিষ্ট-১৪

সহযোদ্ধা লুৎফর রহমান শেখ-এর অনুভূতি

শ্রদ্ধেয় লেখক কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ, বীর প্রতীক

হেমায়েত বাহিনীর উপর তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লিখেছেন শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। এইজন্য আপনাকে ও সম্পাদক সাহেবকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা। আপনার ধারালো কলমে সত্যিকারের সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হোক, এ-আশাই করি।

জনাব, আমি ভারতে যাইনি, অভ্যন্তরীণভাবে মুক্তিযুদ্ধে দুর্ধর্ষ হেমায়েতবাহিনী গঠনে আমার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে নয়টি মাস সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম। স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ভারত থেকে আগত যোদ্ধাদের সমন্বয়ে যে যুদ্ধ করেছে, আজ পর্যন্তও সে-যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান কোনোভাবেই লেখকের কলমে লিপিবদ্ধ হয়নি। হেমায়েতবাহিনীর সাড়ে পাঁচ হাজার যোদ্ধার শতাধিক অপারেশন ও কাহিনী আছে। এগুলো আপনার কলমে মহিমান্বিত হয়ে লিপিবদ্ধ হোক। আপনার লেখায় আগামী প্রজন্মের জন্য ফুট উঠুক হেমায়েত বাহিনীর সত্যিকারের ইতিহাস।

আলহাজ্ব লুৎফর রহমান শেখ,
আহবায়ক, কোটালিপাড়া উপজেলা কমান্ড, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
১/১/২০০৪

পরিশিষ্ট-১৫

সহযোদ্ধা রাজ্জাক হাওলাদার-এর একটি চিঠি

প্রিয় হেমায়েত ভাই,

সালাম, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিবেন। ১২ মে, ২০০৩-এ কানাডা ফিরে আসার আগে আপনার সাথে দেখা করেছিলাম। ঠিক ওই তারিখেই আপনার অপারেশন হবার কথা ছিল। ১৬ মে কানাডা এসে পৌঁছেছি। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফোন করে আপনার ছেলে সোহেলের কাছে জানলাম ৩ জুলাই অপারেশন হবে। ইচ্ছে ছিল সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি লিখার কিন্তু সময়াভাবে হয়ে ওঠে নি। আজকাল চিঠি লেখার চেয়ে ফোনে সরাসরি কথা বলা যায়। তবুও মাঝে মাঝে লিখি, তবে সহজে কেউ জবাব দেয় না। আর চিঠি খানা প্রাপকের হাতে পৌঁছালো কিনা তাও জানার উপায় থাকে না। বলতে পারেন, যদি কেউ প্রাপ্তি সংবাদ দিতে পারে তা হলে তো সে তোমাকে লিখতেই পারে। আজ ৪ জুলাই শুক্রবার। আশা করি অপারেশন সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়ে গেছে। চিঠি পাওয়ার আগেই হয়তো বা বাসায় চলে আসবেন।

২ মে এর প্রকাশনা উৎসবে আপনার উপস্থিতির জন্য সবাই আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আসলে আমি এত দূর থেকে গিয়ে কোন কিছুই নিজে করতে পারি নি। যাদের বলেছি তারা আপনার ব্যাপারে উৎসাহী তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সময়াভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে নি। তা ছাড়াও ওই সময় আপনার বাসার ফোন নম্বরটাও আমার কাছে দেন নি। আপনার দেয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সবার মন কেড়েছে।

বইয়ের ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন, তাতে অনুভব করছি, মনে কষ্ট পেয়েছেন। আসলে হেমায়েত ভাই প্রথম লেখায় অনেক কিছুই বুঝে উঠতে পারি নি। আমার ধারণা যে, কোন প্রতিকী কথা ব্যক্তিগত ভাবে না নিলে ভাল হয়। আপনার প্রতি সবারই একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনার অবদানকে কেউ ভুলতে পারবে না, যতদিন বাংলার ইতিহাস থাকবে আপনার ইতিহাসও থাকবে। যদিও ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে, এটাও তো ইতিহাসেরই ধারা। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে, তা না হলে মানুষ এই বিকৃতির শিক্ষা পেল কেমন করে। যারা সরাসরি যুদ্ধের মাঠে এবং বাংলাদেশে রক্তাক্ত প্রান্তরের ইতিহাসের সাথে জড়িত তাদেরও ঐতিহাসিক কিছু দায়িত্ব আছে-বিকৃত তথাকথিত মনগড়া ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে সঠিক ইতিহাস রচনা করার।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমাদের মতো শত শত মুক্তিযোদ্ধা আজ দারিদ্র্যের কারণে গৃহত্যাগী। শুধু কি তাই। আজ সেই সব মহান যোদ্ধারা, খেয়ে না খেয়ে, অর্ধাহারে, অনাহারে, রোগে-শোকে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে। জাতির এ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কারা ! এ প্রশ্নের জবাব দেবে কে !! আমার বিশ্বাস জবাব আছে, কিন্তু আমাদের ভাষা মৌন হয়ে ঝিমুচ্ছে।

ভাই দূরে আছি, তার অর্থ এই নয় যে দেশটাকে ভুলে গেছি। সবসময়ই আপনাদের কথা, আমার গ্রাম মাইজপাড়ার কথা মনে আসে। মাঝে মাঝে ছুটে যাই সেখানে মাথা ঠেকাই, চোখের পানি ফেলি। প্রবাসের এ নির্জন কারাগার আমার ভাল লাগে না। এখানে সবই আছে, আবার কিছুই নেই। হয়তো এমনি করে এ জীবন কেটে যাবে, একদিন সবার অলক্ষ্যে চলে যাব সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে।

ছেলে মেয়ে সবাই ভাল আছে। স্ত্রী ফরিদা পারভীন সালাম জানিয়েছে। তাকে আজ পরিচিত করাতে পারি নি আপনার সঙ্গে। ঢাকায় গিয়ে থাকার কোন জায়গা ছিল না। সেখানে জরুরি কাজটুকু সেরে গ্রামের বাড়ি চলে যাই, ফলে সময় হয়ে উঠেনা। এ বছরের গোড়ায় জানুয়ারিতে যখন দেশে গিয়ে ছিলাম সে সময় শেওড়া পাড়ায় রোকেয়া সরণির সাথে ছোট্ট একটা এপার্টমেন্ট কিনেছি, সেখানে আমার মা ও ছোট বোন ভগ্নিপতি থাকে। আমরাও গিয়ে থাকতে পারবো। মাত্র ক'দিন আগেই সে বাসায় তারা উঠেছে। এখনও গ্যাস লাইন দেয় নি। যদি এর মধ্যে বেঁচে থাকি আর থাকেন, তা হলে একদিন নিয়ে যাব, এপার্টমেন্ট দেখানোর কিছু নেই, তবে মা'র সাথে আপনার দেখা করানোর ইচ্ছে আছে।

হেমায়েত ভাই, খুব বেশি লিখলাম না, আরও কিছু কথা লেখার ইচ্ছে ছিল। চিঠি যেতে যেতে হয়তো এরই মাঝে বাসায় চলে আসবেন। আপনার সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করে আজ এখানে শেষ

করলাম। মেশিনের সাহায্যে লিখছি বলে আন্তরিকতার প্রশ্ন তুলবেন না। হাতের লেখা খুব খারাপ, মানে বিশ্রী।

হেমায়েত উদ্দীন একাত্তরের যোদ্ধা, বীরবিক্রম
রোগ শোক জড়া জীর্ণ বাধার প্রাচীর ঠেলে
চালিয়ে যাও আজও শক্ত হাতে কঠিন সংগ্রাম
মৃত্যুরে তুমি ডরনি কভু মৃত্যুকে টেনেছ কোলে।
হে বীর, তোমাকে আমার সংগ্রামী সালাম শত বার
হয়তো আমি আসবো ফিরে তব কাছে আরেকবার

তব গুণমুগ্ধ সহযোদ্ধা- রাজ্জাক
৪ জুলাই ২০০৩

[Razzak Howlader, 4785 Bouchette, Apt.41
Montreal, H3w 1c6 Canada.
Tel. (514) 739-7761]

[চিঠিটি জনাব হেমায়েতউদ্দিন বীর বিক্রম হয়ে লেখক মারফত ৫ আগস্ট ২০০৩ তারিখে সম্পাদকে কাছে পৌছে।]

টোকা: পত্র লেখক রাজ্জাক হাওলাদাররা ৬ ভাই। সবাই ছিল সশস্ত্র সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। হেমায়েত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ছয় ভাইই অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধ শেষ করেন। সাং ডাসার, থানা কালকিনি, জেলা : মাদারিপুর,

[নিচের অংশটুকু ২৪ মে ২০০৩ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সৌজন্যে]

রাজ্জাক হাওলাদারের জন্ম ১০ মে, ১৯৫২, মাদারিপুর, খাইজপাড়া, বাংলাদেশে। পড়াশোনা করেছেন বীরমোহন হাইস্কুলে ও পরে বরিশালের গৌরনদী কলেজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে চলে যান বিদেশে। প্রবাসে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। জার্মানি থেকে ফিরে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকায়। বুঝতে শুরু করেন স্বদেশ-বিদেশের আর্থ-সামাজিক জীবন প্রবাহের দ্বন্দ্ব, যা তাঁর লেখাতেও ছাপ ফেলে যায় বারেবারে। বর্তমানে সপরিবারে কানাডার অধিবাসী। শিল্প সংস্কৃতিপ্রাণ রাজ্জাক হাওলাদারের প্রিয় শখ গান গাওয়া, বই পড়া। লিখেছেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'বাকী রয়ে গেছে কিছু'।

পরিশিষ্ট-১৬

বরাবর,
জনাবমন্য হেমায়েতউদ্দিন, বীর বিক্রম
'৭১-এর হেমায়েত বাহিনী প্রধান
৮ ও ৯ নং সেক্টর
কোটালিপাড়া, ফরিদপুর।

বিষয় : প্রেরিত পত্র ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্তি প্রসঙ্গে।

মহাত্মন,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার নিজ হাতে লেখা পত্র ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট যথাসময়ে পেয়েছি এবং আনন্দ ও উৎফুল্ল চিত্তে সেগুলি মা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী এবং বাড়ির আপন আত্মীয়-স্বজন সকলকে দেখিয়েছি। তাঁরা সকলে পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের কাছে আপনার জন্য দোয়া করেছেন। আপনার লিখিত এই ক্ষুদ্র চিঠিখানা আমার জীবনে সব থেকে বড় সম্পদ। গচ্ছিত আমানত হিসেবে তা আমার হৃদয় মন্দিরে দীপশিখাসম প্রজ্জ্বলিত, চির অনির্বাণ হয়ে থাকবে এবং আগামী দিনের পথ চলার পথে চির পাথেয় হয়ে সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে। আমার সন্তান-সন্ততিগণ ও ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ঐ চিঠি এবং সার্টিফিকেটগুলি দালিলিকরূপে সংরক্ষণ করবে এবং তাদের মনের গভীরে "শ্রদ্ধাবিতরে" কেবলমাত্র আপনাকেই স্মরণ করবে।

পরিশেষে মহান করুণাময় প্রতিপালকের কাছে উত্তরোত্তর আপনার সাফল্য, সুসম্মান, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

আপনার গুণমুগ্ধ ছোটভাই,
মোঃ ফেরদৌস আলম
১০/১০/২০০৩
সহকারী কমান্ডার সাংগঠনিক, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কমান্ড
ও
ইপিআই টেকনিশিয়ান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

পরিশিষ্ট-১৭

মুক্তিযোদ্ধা মনিরুজ্জামান বিশ্বাসের মতামত

শ্রদ্ধেয় লেখক কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ বীর প্রতীক,

আমি শুনে অতীব আনন্দিত যে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে আপনি '৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর "হেমায়েত বাহিনী" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এজন্য আপনাকে এবং সম্পাদক সাহেবকে জানাই কোটালিপাড়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও রক্তিম শুভেচ্ছা।

আপনার একনিষ্ঠ সাধনা ও হীরকধার কলমে হেমায়েত বাহিনীর সকল সদস্যের বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ফুটে উঠুক। ভবিষ্যত প্রজন্ম জানুক মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস।

আমি মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীকে একটি দুর্ধর্ষ অজেয় বাহিনীরূপে গড়ে তুলতে অক্লান্ত এবং আন্তরিকভাবে কাজ করেছি। আমি মনে করি আমার শ্রম স্বীকৃত। দীর্ঘ ৯-মাস হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রমের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছি। হেমায়েত বাহিনীতে আমার মত অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, যা মহান বীর বিক্রম মহোদয় জানেন। আপনার কলমে সকলের শৌর্য বীর্যের জীবন্ত চিত্রায়ন কামনা করি।

আপনার সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

মনিরুজ্জামান বিশ্বাস
যুগ্ম-আহবায়ক
কোটালিপাড়া উপজেলা কমান্ড
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
২৮/১২/২০০৩

পরিশিষ্ট-১৮

হেমায়েত বাহিনীর প্রতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের স্বীকৃতি ও শুভেচ্ছা

২৪৬২৪২

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প
৮১বি সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুবেদার হেমায়েত উদ্দীন (বীর বিক্রম) তারিখ : ২৪/৮/১৯৭৮ ইং
কোটালিপাড়া
ডাকঘর- কোটালিপাড়া , ফরিদপুর।
জনাব,

শুভেচ্ছা জানবেন। আমাদের সংগ্রাহকের কাছে আপনার সাক্ষাৎকারটি পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। সংগ্রাহকের কাছে জানতে পারলাম যে আপনার কাছে মুক্তিযুদ্ধকালীন মূল্যবান দলিলপত্র জমা আছে। আপনি যদি দলিলপত্রগুলো দিয়ে ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেন তবে আমরা ও আমাদের দেশ বড়ই উপকৃত হবে।

আপনি যদি মূল দলিলগুলো ফেরত চান তবে ও-গুলো ফটোস্টেট করে ফেরত দেয়া হবে। আপনার সুবিধামত কোন এক সময়ে যদি আপনি আমাদের অফিসে পদার্পণ করেন, তবে অত্যন্ত বাধিত ও খুশী হবো। আশা করি আমাদের শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষর ২৪/৮/৭৮
(হাসান হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত অফিসার
বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
প্রণয়ন ও লিখন প্রকল্প

পরিশিষ্ট-১৯

২৪৬২৪২
বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্প
৮১বি সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হেমায়েত উদ্দীন (বীর বিক্রম) এর কাছ থেকে ১৫০ পৃষ্ঠা মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বলিত দলিল ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করা হলো।

আফসান চৌধুরী ৯/১০/৭৮
রিসার্চ অফিসার
ইতিহাস লিখন প্রকল্প
তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-২০

ঢাকা যাদুঘর
বাংলাদেশের জাতীয় যাদুঘর

DACCA MUSEUM
THE NATIONAL MUSEUM OF BANGLADESH

পত্র নং -২-সি-২/৭৯-৮০/২২১০ তারিখ ২-৬-১৯৮০

জনাব হেমায়েত উদ্দিন, বীরবিক্রম
কোটালিপাড়া
ডাকঘর ঃ কোটালিপাড়া
ফরিদপুর।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার উপহৃত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত নথি-পত্র (সংলগ্ন তালিকা দ্রষ্টব্য) আমরা ধন্যবাদের সংগে গ্রহণ করছি। এ গুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা আশা করবো ভবিষ্যতেও আপনি এমনিতর আরো মূল্যবান নথি-পত্র উপহার দিয়ে ঢাকা যাদুঘরের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত,

(ডঃ এনামুল হক)
পরিচালক
ঢাকা যাদুঘর

স্ব. র/

জিপিও বক্স ৩৫৫, ঢাকা-২, বাংলাদেশ, ফোন : ২৮ ১৬ ৮৮ ২৪ ৬৬ ০০
GPO BOX 355, Dacca-2, BANGLADESH, PHONE : 28 16 88 24 66 00

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দুষ্প্রাপ্য নথিপত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন উত্তর-পশ্চিম বরিশাল ও দক্ষিণ ফরিদপুর অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধরত হেমায়েত বাহিনী প্রধান নায়েব সুবেদার হেমায়েত উদ্দিনের নিকট থেকে প্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তাঁর কাগজপত্রের তালিকা-

১। কমান্ড কোটালিপাড়ার নায়েব সুবেদার হেমায়েত উদ্দিনের প্রশিক্ষণদানের আলোকচিত্র।

২। হেমায়েত বাহিনী প্রধান কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিনের যুদ্ধকালীন ব্যবহৃত প্যাডের কাগজ।

৩। ১৯৭১ এর এপ্রিলের প্রথম দিকে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্টের নিহত হাবিলদার মেজর ফজলে রাব্বীর পে'বুক ও পে'স্লিপ। এই হাবিলদার মেজরসহ আরো ১৭ জন সাধারণ সৈনিক ঢাকার কালিয়াকৈর এর কাছে হেমায়েত বাহিনীর কাছে নিহত হয়।

৪। এই মর্মে প্রদত্ত হেমায়েত উদ্দিনের সাক্ষ্য পত্র।

৫। নায়েব সুবেদার হেমায়েত উদ্দিনের পদোন্নতি সংক্রান্ত মেজর এম. এ. জলিলের হস্তলিপি।

৬। হেমায়েত উদ্দিনকে প্রদত্ত তৎকালীন ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রি জনাব মোল্লা জালাল উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত সনদ পত্র।

৭। ফ্রান্সে হেমায়েত উদ্দিনের চিকিৎসাকালীন সু-বন্দোবস্তের জন্য তৎকালীন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশস্থ দূত জনাব আবুল ফাত্তার কাছে প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর লিখিত সুপারিশ পত্র।

৮। হেমায়েত উদ্দিনের ফ্রান্সে গমন উপলক্ষ্যে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরের পেপার কাটিং।

৯। বঙ্গবন্ধুর সাথে কোটালিপাড়ার প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত খবরের পেপার কাটিং।

১০। হেমায়েত বাহিনীর অন্যতম সদস্য শহীদ ইব্রাহিমের গচ্ছিত টাকা তাঁর পরিবার বর্গকে ফিরিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত খবরের পেপার কাটিং।

১১। শহীদ ইব্রাহিমের মাতা তাঁর পুত্রের গচ্ছিত টাকা ফিরে পাওয়া সংক্রান্ত খবরের পেপার কাটিং।

১২। হেমায়েত উদ্দিনের জন্মদিন উদযাপন মুহূর্তে দৈনিক অবজারভারের ক্যামেরায় গৃহিত আলোক চিত্র।

১৩। নির্মল সেন রচিত হেমায়েত বাহিনীর উপর একটি রিপোর্ট ও সাক্ষাৎকার।

১৪। ফরিদপুর জেলাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'গণমনে' নায়েব সুবেদার হেমায়েত উদ্দিনের মুদ্রিত আলোক চিত্র।

পরিশিষ্ট-২১

Government of The Peoples Republic of Bangladesh
Directorate General of Health Services
Mohakhali, Dhaka-1212

S-HB/FEMB/2003/965 **Dated 21-10-03**

The General Manager
Foreign Exchange Policy Department,
Bangladesh Bank, Head Office, Dhaka.

Sub : Medical Treatment abroad in respect of Mr. Hemayet Uddin Birbkrom.

Mr. Hemayet Uddin Birbikrom, S/o-late : Abdul Karim, 2/F/1/6 Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh was examined by the foreign exchange medical board on 16/10/2003 for grant of foreign exchange for treatment abroad. After examination of his health the board has opined that he has been suffering from **"Coronary artery disease (TVD) with depressed respiratory Function."**

The same foreign exchange medical board has recommended him to proceed to India / Singapore for investigation and treatment. For the purpose of his treatment the board has recommended release of foreign exchange of US $1000 (One thousand) and also recommended one attendant to go with patient for whom a release of foreign exchange of US $200 (Two hundred) only.

The proceeding of the medical board in respect of Mr. Hemayet Uddin Birbikrom, is sent here with for release of necessary foreign exchange for treatment abroad.

The order will remain valid up to (six) months only.

Enclo : 2 copies of original certificate of the medical board.

Director (Hospital & Clinics) 21.10.03
for Director General of Health Services
Mohakhali, Dhaka

Memo No-DGHA-HB/FEMB/2003

Dated :

Copy forward for information of necessary action to :

1. The secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
2. The secretary, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh.
3. His Excellency the Hon'ble Ambassador/Charge'd the affairs/High Commissioner, India/Singapore, Bangladesh.
4. Director General (Passport and Immigration), Dhaka, Bangladesh.
5. Mr. Hemayet Uddin Birbikrom, S/o-late: Abdul Karim, 2/F/1/6 Mirpur Dhaka-1216, Bangladesh.

Director (Hospital & Clinics)
for Director General of Health Services
Mohakhali, Dhaka

লেখক কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ'র জন্ম ১৯৪১ সালের ২৬ অক্টোবর। জেলা-কুমিল্লা, থানা-চান্দিনা, গ্রাম-কৈলাইন এর সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম জমিদার পরিবারের সন্তান। ১৯৫১ সালে স্কুল জীবনে বন্দুক হাতে নেয়া যোদ্ধার বাস্তব যুদ্ধ পরীক্ষা হয় '৭১-এর রণাঙ্গনে। ৮-নং সেক্টর-এর 'ই' কোম্পানিসহ ৫নং গেরিলা ইউনিট কমান্ড করেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যোদ্ধাহত অফিসার বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সেনাসদর, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, আর্মি স্কুল অব এডুকেশন এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন-এ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণের পর আই. ইউ. বি. এ. টি.- তে ট্রেজারার পদে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলা একাডেমিসহ বিভিন্ন বিদ্বত সংঘের সঙ্গে তিনি জড়িত। তাঁর ১ম প্রকাশিত বই 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী' (২০০৩)।